আল-মিসবাহুন নূরী
শরহে
মুখতাসারুল কুদূরী

আল্লামা আবুল হাসান আহমাদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে
আহমাদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামাদান আল বাগদাদী আল-কুদূরী
[জন্ম : ৩৬২ হিঃ ও মৃত্যু : ৩৯৮ হিঃ]

উর্দূ অনুবাদ

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম
শায়খুল হাদীস, দারুল উলূম হোসাইনিয়া মাদ্রাসা, ওলামা বাজার, ফেনী

বঙ্গানুবাদ

শায়খুল হাদীস, মাওলানা মুহাম্মদ আজিজুল হক
মাওলানা মুহাম্মদ আবুল কালাম মাসূম
ফাযেলে দারুল উলূম দেওবন্দ, ভারত
মাওলানা মুহাম্মদ আনোয়ারুল হক এম.এম.

সম্পাদনায়
মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.

পরিবেশনায়
ইসলামিয়া কুতুবখানা
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশক
মাওলানা মুহাম্মদ মুস্তফা এম.এম.
৩০/৩২, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা-১১০০

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ ১৯৮৮ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ ইং
তৃতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ২০০১ ইং

হাদিয়া : ৩০০.০০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
বাড কম্প্রিন্ট এন্ড পাবলিকেশন্স
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০

মুদ্রণে
ইসলামিয়া অফসেট প্রেস
প্যারীদাস রোড, বাংলাবাজার
ঢাকা- ১১০০

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

مقدمة الكتاب ঃ কিতাবের ভূমিকা

কুদূরী গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৭
ফিকাহ্ শাস্ত্রের পরিচয়	৮
ফিকাহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত	৯
ফিকাহ শাস্ত্রের মূল উৎস	১০
ফিকাহ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা	১১
ফিকাহ শাস্ত্রের ফযীলত	১১
ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন	১১
ফিকাহ শাস্ত্রের নামকরণ	১২
শরীয়তের বিধানের বর্ণনা	১২
ফকীহদের পরিচয়	১৪
ফকীহদের স্তরসমূহ	১৪
ইমাম চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি	১৫
হানাফী ফিক্হের বৈশিষ্ট্যাবলী	১৬
হানাফী ফিক্হের চার স্তম্ভ	১৭
ফিকাহ শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা	১৮
কিতাবের খুতবা	১৯

كتاب الطهارة ঃ পবিত্রতার পর্ব

ওযূর ফরযসমূহ	২১
ওযূর সুন্নত ও মুস্তাহাবসমূহ	২৫
ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ	২৮
গোসলের ফরয ও সুন্নতসমূহ	২৮
গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ	৩০
পানিতে নাপাকী পড়লে তা পাক করার বিধান	৩২
উচ্ছিষ্টের বিধান	৩৭
তায়াম্মুমের অধ্যায়	৪০
মোজার ওপর মাসাহের অধ্যায়	৪৬
হায়েযের অধ্যায়	৫০
অপবিত্রতার অধ্যায়	৫৫

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

كتاب الصلوة ঃ সালাতের পর্ব

সালাতের ওয়াক্তসমূহ ৫৯
আযানের অধ্যায় ৬৪
সালাতের পূর্ব শর্তসমূহের অধ্যায় ৬৭
সালাতের রুকনসমূহ ৭০
জামাআতের অধ্যায় ৮০
কাযা সালাতের অধ্যায় ৮৮
সালাতের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহের অধ্যায় ৮৯
নফল সালাতের অধ্যায় ৯০
সাহু সিজদার অধ্যায় ৯৪
রুগ্ণ ব্যক্তির সালাতের অধ্যায় ৯৭
তিলাওয়াতে সিজদার অধ্যায় ৯৯
মুসাফিরের সালাতের অধ্যায় ১০১
জুমুআর সালাতের অধ্যায় ১০৫
দুই ঈদের সালাতের অধ্যায় ১১০
সূর্য গ্রহণের সালাতের অধ্যায় ১১৪
বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের অধ্যায় ১১৫
রমযান মাসে তারাবীহ পড়ার অধ্যায় ১১৬
ভয়কালীন সালাতের অধ্যায় ১১৭
জানাযার সালাতের অধ্যায় ১১৯
শহীদের অধ্যায় ১২৫
কা'বা শরীফের ভিতরে সালাতের অধ্যায় ১২৭

كتاب الزكوة ঃ যাকাতের পর্ব

যাকাত কার ওপর ওয়াজিব ১২৮
উটের যাকাতের অধ্যায় ১৩০
গরুর যাকাতের অধ্যায় ১৩৩
ছাগলের যাকাতের অধ্যায় ১৩৫
ঘোড়ার যাকাতের অধ্যায় ১৩৬

বিষয়	পৃষ্ঠা নং

রৌপ্যের যাকাতের অধ্যায় ১৩৯
স্বর্ণের যাকাতের অধ্যায় ১৪০
আসবাবপত্রের যাকাতের অধ্যায় ১৪১
ফসল ও ফলের যাকাতের অধ্যায় ১৪৩
যাকাত কাকে দেয়া জায়েয আর কাকে দেয়া জায়েয নয় সে সম্পর্কীয় অধ্যায় ১৪৫
সদকায়ে ফিতরের অধ্যায় ১৪৯

كتاب الصوم ঃ সাওমের পর্ব

সাওমের প্রকারভেদ ১৫১
সাওমের কাফ্‌ফারা ১৫৩
রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখার হুকুম ১৫৮
ই'তিকাফের অধ্যায় ১৬১

كتاب الحج ঃ হজ্জের পর্ব

হজ্জ কাদের ওপর ওয়াজিব ১৬৩
মীকাতসমূহের বর্ণনা ১৬৪
হজ্জ করার নিয়মাবলী ১৬৫
হজ্জে কিরানের অধ্যায় ১৮১
হজ্জে তামাত্তুর অধ্যায় ১৮৪
ত্রুটি-বিচ্যুতির অধ্যায় ১৮৮
অবরুদ্ধ করার অধ্যায় ২০২
হজ্জ না পাওয়ার অধ্যায় ২০৫
হাদী প্রেরণ অধ্যায় ২০৭

كتاب البيوع ঃ বেচাকেনার পর্ব

খেয়ারে শর্ত-এর অধ্যায় ২২৩
খেয়ারে রুইয়াত-এর অধ্যায় ২২৬
খেয়ারে আয়েব-এর অধ্যায় ২২৯
ফাসিদ বেচাকেনার অধ্যায় ২৩৩
একালার অধ্যায় ২৪০

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
মুরাবাহা ও তাওলিয়া-এর অধ্যায়	২৪২
সুদী কারবারের অধ্যায়	২৪৬
সলম বিক্রির অধ্যায়	২৫৪
সরফ বিক্রির অধ্যায়	২৫৯
كتاب الرهن ঃ বন্ধক পর্ব	২৬৬
كتاب الحجر ঃ হাজর পর্ব	২৭৮
كتاب الاقرار ঃ স্বীকারোক্তি পর্ব	২৮৮
كتاب الاجارة ঃ ইজারা পর্ব	২৯৭
كتاب الشفعة ঃ শুফ‘আ পর্ব	৩১৪
كتاب الشركة ঃ অংশীদারিত্ব পর্ব	৩২৮
كتاب المضاربة ঃ মুদারাবা পর্ব	৩৩৭
كتاب الوكالة ঃ ওকালাত পর্ব	৩৪৬
كتاب الكفالة ঃ জামানত পর্ব	৩৬০
كتاب الحوالة ঃ হাওয়ালাহ্ পর্ব	৩৬৭
كتاب الصلح ঃ আপস-মীমাংসা পর্ব	৩৭০
كتاب الهبة ঃ হিবার পর্ব	৩৭৮
كتاب الوقف ঃ ওয়াক্‌ফের পর্ব	৩৮৮
كتاب الغصب ঃ অপহরণ পর্ব	৩৯৪
كتاب الوديعة ঃ আমানত পর্ব	৩৯৯
كتاب العارية ঃ ‘আরিয়ত পর্ব	৪০৩
كتاب اللقيط ঃ পতিত শিশু পর্ব	৪০৬
كتاب اللقطة ঃ পতিত সম্পদ পর্ব	৪০৮
كتاب الخنثى ঃ হিজড়া পর্ব	৪১০
كتاب المفقود ঃ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির পর্ব	৪১৩
كتاب الاباق ঃ পলাতক কৃতদাসের পর্ব	৪১৫
كتاب احياء الموات ঃ পতিত ভূমি পর্ব	৪১৬
كتاب الماذون ঃ অনুমতি প্রাপ্ত দাসের পর্ব	৪২০
كتاب المزارعة ঃ পারস্পরিক চাষাবাদ পর্ব	৪২৪
كتاب المساقات ঃ বাগান বর্গা পর্ব	৪২৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مُقَدِّمَةُ الْكِتَابِ

কিতাবের ভূমিকা

কুদূরী গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জন্ম ও বংশ পরিচয় ঃ চতুর্থ স্তরের ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রখ্যাত ফকীহ ও মুহাদ্দিস আল্লামা আবুল হাসান আহমাদ ইবনে আবূ বকর মুহাম্মদ ইবনে আহমাদ ইবনে জা'ফর ইবনে হামাদান বাগদাদী আল-কুদূরী ৩৬২ হিজরী সালে বাগদাদে জন্ম গ্রহণ করেন।

কুদূরী নামে নামকরণ ঃ মাদীনাতুল উলূম গ্রন্থ প্রণেতা কুদূরী নামকরণের স্বার্থকতা সম্পর্কে বলেন যে, গ্রন্থকার হাঁড়ি-পাতিল তৈরি করতেন, কিংবা ব্যবসা করতেন, নতুবা কুদূর নামক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন আর সে হিসেবেই তিনি কুদূরী নামে পরিচিতি লাভ করেন।

শিক্ষা ও কর্মজীবন ঃ ইমাম কুদূরী ফিকাহশাস্ত্র এবং হাদীসশাস্ত্র ইসলামের স্তম্ভ, আল্লামা ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহ্ইয়া ইবনে মাহদী জুরজানী (ওফাত ৩৯৮হিঃ) হতে শিক্ষা লাভ করেন। তিনি ইমাম আবূ বকর জাস্সাস -এর শিষ্য ছিলেন।

খাতীবে বাগদাদী বলেন, আমি ইমাম কুদূরী থেকে হাদীস বর্ণনা করেছি। তিনি সত্যবাদী এবং হাদীস খুব কমই বর্ণনাকারী।

ইমাম সাম'আনী বলেন–

كَانَ فَقِيْهًا صَدُوْقًا اِنْتَهَتْ اِلَيْهِ رِيَاسَةُ اَصْحَابِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ بِالْعِرَاقِ وَعَزَّ عِنْدَهُمْ قَدْرُهٗ وَارْتَفَعَ جَاهُهٗ وَكَانَ حَسَنَ الْعِبَارَةِ فِى النَّظْرِ مُدِيْمًا لِتِلَاوَةِ الْقُرْاٰنِ.

অর্থাৎ তিনি ইসলামী আইন বিশেষজ্ঞ, সত্যবাদী। তাঁর মাধ্যমেই হানাফীদের শৌর্য-বীর্য ইরাকের মাটিতে পদাপর্ণ করেছে। তাঁর খুবই সম্মান ও মর্যাদা হয়েছে। তাঁর বক্তৃতা ক্ষুরধার, লিখনী বাস্তবিকই চিত্তাকর্ষক। প্রাত্যহিক জীবনে কুরআনে হাকীম তিলাওয়াত করতেন।

তিনি তৎকালীন বিশ্বের ফকীহদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অক্ষুন্ন রেখেই সঠিক সমস্যাবলী আলোচনা-পর্যালোচনা করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, ইমাম কুদূরী এবং শায়খ আবূ হামেদ ইসফারাইনী শাফিয়ীর মাঝে সর্বদাই জ্ঞানভিত্তিক ও তাত্ত্বিক আলোচনা-পর্যালোচনা এবং বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হত; কিন্তু তাঁর মর্যাদার কদর করতেন।

কুদূরীর বৈশিষ্ট্য ঃ প্রায় একহাজার বছরের প্রাচীনতম গ্রন্থ হতে প্রায় ১২ হাজার প্রয়োজনীয় বাছাইকৃত মাস্আলার সংকলন গ্রন্থ। গ্রন্থটির রচনাকাল থেকে আজ পর্যন্ত পাঠ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তাশে কুবরাযাদা লেখেছেন—

اِنَّ هٰذَا الْمُخْتَصَرَ الْقُدُوْرِىْ تَبَرَّكَ بِهِ الْعُلَمَاءُ حَتّٰى جَرَّبُوْا قِرَاءَتَهٗ اَوْقَاتَ الشَّدَائِدِ وَاَيَّامَ الطَّاعُوْنِ.

অর্থাৎ এই সেই 'আল-মুখতাসারুল কুদূরী' যা কর্তৃক মহাজ্ঞানীরা বরকত ও কল্যাণ অর্জন করে থাকেন এবং এই কুদূরীর পাঠ কঠিন বিপদ সংকুল অবস্থার প্রাক্কালে ও মহামারীর সময়ে পরীক্ষিত হয়েছে।

'মিসবাহে আনোয়ারে আইয়াদ' গ্রন্থ প্রণেতা লিখেছেন– যে ব্যক্তি কুদূরী গ্রন্থটি স্মৃতিপটে রাখবে, সে দুর্ভিক্ষ হতে নিষ্কৃতি পাবে।

রচনাবলী ঃ ইমাম কুদূরী 'আল-মুখতাসারুল কুদূরী' ছাড়াও যেসব গ্রন্থাবলী রচনা করেন তাহল–

১. তাজরীদ– এটি সাত খণ্ডে বিভক্ত। হানাফী ও শাফিয়ীদের মধ্যে যেসব মাসআলায় মতান্তর রয়েছে তার বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে।

২. মাসাইলুল খিলাফ– এতে দলিল-প্রমাণসহ এমন সব মাসআলার উল্লেখ রয়েছে, যাতে ইমাম আবূ হানীফা ও তাঁর ছাত্রদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।

৩. তাকরীব– এতে দলিলসহ মাসআলা সমূহের উল্লেখ রয়েছে।

৪. শরহে মুখতাসারুল কারখী।

৫. শরহে আদাবুল কাযী।

কারামাত ঃ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী হিদায়ার ব্যাখ্যার কোন এক স্থানে উপস্থাপন করেছেন যে, গ্রন্থকার রচনা থেকে অবসর হয়ে হজ্জে যাওয়ার প্রাক্কালে গ্রন্থটি সাথে করেই নিয়ে গেলেন। কা'বা প্রদক্ষিণ শেষে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন, প্রভু হে! যদি কোথাও ভুল হয়ে থাকে আমাকে অবহিত করাও। পরবর্তী পর্যায়ে এক এক পাতা করে উল্টায়ে দেখলেন ৫/৬ স্থানে বিষয়বস্তু মোছানো অবস্থায় ছিল। ইহা গ্রন্থটির কারামতেরই বহিঃপ্রকাশ।

ইন্তেকাল ঃ এই মহান সাধক দীনের একনিষ্ঠ সেবক ৪২৮ হিঃ সনের ৫ ই রজব রবিবার ৬৬ বছর বয়সে বাগদাদে ইন্তেকাল করেন এবং সেদিনই তাঁকে আবূ বকর খাওয়ারেজমী হানাফীর পাশে সমাধিস্থ করা হয়। আল্লাহ তাঁর অবস্থান জান্নাতে করুক।

ফিকাহ শাস্ত্রের পরিচয়

শাব্দিক অর্থ ঃ فِقْهٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে– সূক্ষ্মদর্শীতা ও গভীর জ্ঞান, কোন কিছু জানা, উপলব্ধি ও স্মৃতিপটে আনা, জ্ঞান রাজ্যে তাত্ত্বিক অনুসন্ধান করা, ছেদন করা, খোলা ও বাস্তবতা অর্জনের নিমিত্ত পর্যালোচনা করা।

পারিভাষিক অর্থ ঃ

هُوَ الْعِلْمُ بِالْاَحْكَامَاتِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ مِنْ اَدِلَّتِهَا التَّفْصِيْلِيَّةِ ·

অর্থাৎ ইসলামী আইনশাস্ত্র ঐ জ্ঞান বা বিদ্যার নাম, যা শরীয়তের বিধানসমূহ বিস্তারিত প্রমাণ ও বাস্তবতাসহ তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালিয়ে উপলব্ধি করা যায়।

আল্লামা ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতীর ভাষায়– اَلْفِقْهُ الْمَعْقُوْلُ مِنَ الْمَنْقُوْلِ

অর্থাৎ কুরআন-হাদীস হতে বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানকে ফিক্‌হ বলে।

এই সংজ্ঞাটিও প্রসিদ্ধ– اَلْفِقْهُ مَجْمُوْعَةُ الْاَحْكَامِ الْمَشْرُوْعَةِ فِى الْاِسْلَامِ

অর্থাৎ ফিক্‌হ সেই নির্দেশাবলীর সমষ্টির নাম, যা ইসলামের বিধিবদ্ধ।

মূল কথা হল, মানুষের জীবন যাপনের নিয়মাবলী, ব্যবস্থাবলী, আইন-কানুন ও বিধি-বিধানই হল ফিক্‌হে ইসলামী। এক কথায় এটা হল ইসলামের আইনশাস্ত্র; এর ওপরই নির্ভর করবে মানব জীবনের যাবতীয় কর্মপন্থা।

مَوْضُوْع عِلْم فِقْه বা ইল্‌মে ফিক্‌হ -এর আলোচ্য বিষয় ঃ ইল্‌মে ফিক্‌হ -এর আলোচ্য বিষয় হল –

اَفْعَالُ الْمُكَلِّفِيْنَ مِنْ حَيْثُ التَّكْلِيْفِ

অর্থাৎ মুকাল্লিফীনদের সার্বিক অবস্থা ও দিক সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনা করাই এ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

এক কথায়, জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত মানব জীবনের সকল স্তর তথা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সর্বস্তরের যাবতীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ইসলামী বিধানসমূহ আলোচনা এ সকল বিধানের দলিল-প্রমাং যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করাই হল ফিকাহ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

غَرْض عِلْم فِقْه বা ইলমে ফিক্‌হ-এর উদ্দেশ্য ঃ মানব জীবনের সকল স্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত বিধানসমূহ অবগত হয়ে সে অনুযায়ী আমল করে ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি অর্জন করাই হল ইলমে ফিক্‌হ -এর উদ্দেশ্য।

ফিকাহ শাস্ত্রের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) -এর ঐশী বাণী প্রাপ্তির পর হতেই মিল্লাতে ইসলামিয়ার মাঝে সত্যিকার ওহি জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন ও অনুধাবনের চর্চার উন্মেষ ঘটে। জিন্দেগীর বিভিন্ন পর্যায়ের সংঘটিত সমস্যাবলীর মাঝে মতদ্বৈধতার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআন ও সুন্নাহ নিঃসৃত বাণী কর্তৃক গবেষণামূলক কিছু কাজ আঞ্জাম দেয়ার প্রয়োজন অনুভূত হয়। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সমস্যাবলীর কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক সমাধান পরোক্ষভাবে আঞ্জাম দেয়ার নিমিত্ত-ই সাহাবায়ে কিরাম তাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালাতে সচেষ্ট হন।

এ গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল শাস্ত্রে রাসূলে আকরাম (সাঃ) -এর ফায়জ পেয়ে এবং নিজেদের সুগভীর জ্ঞান ও সচ্চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে একদল সাহাবী "ফকীহ" খেতাবে ভূষিত হন।

সাহাবায়ে কিরামের মধ্যে যারা ইসলামী আইনশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন, তাঁদের সংখ্যা নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে ১৪৯ জন। এ মহামান্য ইসলামী আইনশাস্ত্র বিশারদগণ মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত—

(١) مُكَثِّرِيْن (٢) مُتَوَسِّطِيْن (٣) مُقِلِّيْن

১. মুকাস্সিরীন সাহাবীদের সংখ্যা মাত্র সাতজন ঃ

১. আমীরুল মু'মিনীন হযরত ওমর (রাঃ) শাহাদাত - ২৩ হিঃ
২. আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী (রাঃ) শাহাদাত - ৪০ "
৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) ওফাত - ৩২ "
৪. উম্মুল মু'মিনীন হযরত আয়িশা (রাঃ) " - ৫৭ "
৫. হযরত যায়েদ ইবনে ছাবিত (রাঃ) " -
৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) " - ৬০ "
৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) " - ৭৩ "

২. মুতাওয়াস্সিত্বীন ফকীহ সাহাবী ছিলেন ২০ জন ঃ

১. হযরত আবূ বকর (রাঃ), ২. হযরত উম্মে সালমা (রাঃ), ৩. হযরত আনাস (রাঃ), ৪. হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ), ৫. হযরত ওছমান (রাঃ), ৬. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ), ৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবাইর (রাঃ), ৮. হযরত আবূ মূসা আশআরী (রাঃ), ৯. হযরত সাআদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রাঃ), ১০. হযরত সালমান ফারসী (রাঃ), ১১. হযরত জাবির (রাঃ), ১২. হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ), ১৩. হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), ১৪. হযরত ত্বালহা (রাঃ), ১৫. হযরত যুবাইর (রাঃ), ১৬. হযরত আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রাঃ), ১৭. হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রাঃ), ১৮. হযরত আবূ বকরা (রাঃ), ১৯. হযরত উবাদাহ ইবনে সামিত (রাঃ), ২০. হযরত আমীরে মুআবিয়া (রাঃ)।

৩. মুকিল্লীন সাহাবীদের সংখ্যা ১২২ জন।

তাবেয়ীনদের মধ্যে ইল্মে ফিক্হ -এর চর্চা ঃ

তাবেয়ীনদের মধ্যে মদীনার সপ্তরত্ন বিরাট খেদমত আঞ্জাম দেন। তাঁরা হচ্ছেন—

(১) হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব (রঃ), (২) উরওয়াহ ইবনে যুবাইর (রঃ), (৩) কাসিম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবূ বকর (রঃ), (৪) খারেজাহ ইবনে যায়েদ ইবনে ছাবিত (রঃ), (৫) ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রঃ), (৬) সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রঃ), (৭) সালিম ইবনে আবদুল্লাহ ওমর (রঃ)।

উপরোক্ত আইনশাস্ত্র বিশেষজ্ঞরা এ শাস্ত্রে কোন সংকলন বা সমস্যার সমাধান কল্পে গ্রন্থকারে ধারাবাহিকতার পরম্পরা অব্যাহত রেখে কোন কাজ আঞ্জাম দেননি; বরং স্মৃতি শক্তিতে নির্ভরশীল থেকে সাতটি কেন্দ্র হতে ইলমে ফিক্হ -এর চর্চা অব্যাহত রাখেন।

সাতটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র নিম্নরূপ ঃ (১) মদীনা, (২) মক্কা, (৩) কূফা, (৪) বসরা, (৫) সিরিয়া, (৬) মিশর ও (৭) ইয়ামান।

এসব কেন্দ্রের ফকীহগণ হলেন—

১. মদীনা মুনাওয়্যারাহ ঃ

সাহাবী ঃ হযরত ওমর, ওছমান, আলী, ইবনে মাসঊদ, যায়েদ ইবনে ছাবিত, ইবনে ওমর, ইবনে আব্বাস, আয়িশা ও আবূ হুরায়রা (রাঃ) প্রমুখ।

তাবেয়ীন ঃ সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব, উরওয়াহ ইবনে যুবায়ের, যাইনুল আবেদীন ইবনে হুসাইন, আব্দুল্লাহ ইবনে তওবা, সুলাইমান ইবনে ইয়াসার (রঃ) প্রমুখ।

২. মক্কা মুকাররামাহ ঃ

সাহাবী ঃ হযরত মুআয ও ইবনে আব্বাস (রাঃ)।

তাবেয়ীন ঃ মুজাহিদ ইবনে যুবায়ের, ইকরামা ও আতা ইবনে রাবাহ (রঃ) প্রমুখ।

৩. কূফা ঃ

সাহাবী ঃ হযরত ইবনে মাসঊদ ও হযরত আলী (রাঃ)।

তাবেয়ীন ঃ আলকামা ইবনে কায়েস, মাসরুক ইবনে আল-আজদাহ, ওবায়দাহ ইবনে আমর, ইব্রাহীম ইবনে ইয়াজিদ, সাঈদ ইবনে যুবায়ের, আমর ইবনে সুরাহবীল (রঃ) প্রমুখ।

৪. বসরা ঃ

সাহাবী ঃ হযরত আবূ মুসা আল-আশাআরী ও আনাস ইবনে মালিক (রাঃ)।

তাবেয়ী' ঃ আবুল আলিয়া, হাসান বসরী (রঃ) প্রমুখ।

৫. শাম ঃ

সাহাবী ঃ হযরত মুআয ইবনে জাবাল, ওবাদাহ ইবনে সামিত ও আবুদ দারদা (রাঃ)।

তাবেয়ীন ঃ আবদুর রহমান ইবনে গানাম, আবূ ইদ্‌রীস খাওলানী, ওমর ইবনে আবদুল আযীয (রঃ) প্রমুখ।

৬. মিশর ঃ

সাহাবী ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আল-আস (রাঃ)।

তাবেয়ীন ঃ মুরশিদ ইবনে আবদুল্লাহ ও ইয়াযীদ ইবনে আবী হাবীব (রঃ)।

৭. ইয়ামান ঃ

সাহাবী ঃ হযরত আলী, মুআয ও আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)।

তাবেয়ীন ঃ তাউস ইবনে কাইসান ও ওহাব ইবনে মুনাব্বিহ (রঃ)।

ফিকাহ শাস্ত্রের মূল উৎস

ফিকহে ইসলামীর মূল উৎস হল চারটি। সেগুলো হল– (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ, (৩) ইজমা ও (৪) কিয়াস।

১. কুরআন ঃ মহানবী (সাঃ) -এর নবুয়ত লাভের পর মৃত্যু পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেইশ বছরে প্রয়োজন ও চাহিদা অনুযায়ী পবিত্র কুরআন মাজীদ অবতীর্ণ হয়েছে। এতে সর্বমোট ৬৬৬৬ টি আয়াত রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় পাঁচশত আয়াত হল শুধু আইন-কানুন সম্পর্কীয়। অবশিষ্টগুলো হল ওয়াজ-নসীহত ও ইতিহাস। তবে এই ওয়াজ-নসীহত ও ইতিহাসের মধ্য হতেও কিছু আইন-কানুন বের হয়েছে। এ সবগুলোই হল ফিক্‌হের মূল উৎস।

২. সুন্নাহ ঃ রাসূল (সাঃ) -এর অনুসরণ ও অনুকরণ করার জন্য মহান আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করেছেন। সে কারণেই সাহাবীগণ সর্বদা রাসূল (সাঃ) -এর পদাঙ্ক অনুসরণ করতেন। যা করতে দেখতেন তাই করতেন এবং কখনো তারা কোন সমস্যায় পড়লে তা রাসূল (সাঃ) -এর নিকট এসে জেনে নিতেন। মহানবী (সাঃ) -এর অসংখ্য সুন্নাহ হতে প্রায় (১০০০) এক হাজার হাদীস ইসলামী ফিক্‌হের মূলউৎস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এগুলোতেই যাবতীয় সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে।

৩. ইজমা ঃ ইজমা হল উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বসম্মত অভিমত। কুরআন ও হাদীসে নব উদ্ভাবিত কোন সমস্যার সুস্পষ্ট সমাধান না পাওয়া গেলে তখন এ উম্মতের মুজতাহিদগণ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে এর গবেষণা চালাতেন। এরপর কোন নির্দিষ্ট সমাধান নির্গত হলে যদি তাতে সকলে ঐকমত্য পোষণ করতেন, তবে তাকে ইজমা বলত। এটি ফিক্‌হে ইসলামীর একটি মূল উৎস। যেমন– হযরত আবূ বকর (রাঃ) -এর খালীফা নিযুক্ত করার ব্যাপারে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকার ফলে সকল সাহাবীদের সর্বসম্মত অভিমত দ্বারা তাঁর খিলাফতের বৈধতা প্রমাণিত হয়েছে।

৪. কিয়াস ঃ কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা মীমাংসিত কোন বিষয়ের সাথে অনুরূপ কোন বিষয়কে উপমা দ্বারা সাদৃশ্য বিধান করে উপমানের হুকুম উপমেয়ের ওপর আরোপ করাকে কিয়াস বলে। এটা হাদীস দ্বারা সাবেত আছে। যেমন– দশম হিজরীতে হযরত মুআয (রাঃ)-কে ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠাবার সময় রাসূল (সাঃ) কুরআন ও সুন্নায় কোন সমাধান না পাওয়া গেলে কিভাবে সমাধান করবে বলে জিজ্ঞাসা করেছিলেন; জবাবে হযরত মুআয (রাঃ) বললেন যে, আমি ইজতিহাদ করে তার ফয়সালা করব। এ জবাবে রাসূল (সাঃ) অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন। এতে বোঝা যায় যে, কিয়াসও ইসলামী ফিক্‌হের মূল উৎসের অন্যতম।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা

পবিত্র কুরআনে কারীমে সকল বিষয়ের স্পষ্ট বর্ণনা করা হয়েছে কথাটি সত্য। তথাপিও ওয়াহিয়ে গায়রে মাত্‌লু বা প্রিয় নবী (সাঃ)-এর হাদীস দ্বারাও মানুষের জীবন যাত্রার অনেক সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। কিন্তু সকল মানুষের পক্ষেই কুরআন ও সুন্নাহ মনথন করে মাসায়েল বের করে উহার ওপর আমল করা সম্ভব নয়। কেননা সকল মানুষই সম পর্যায়ের বিজ্ঞ আলিম নন। তদুপরি যারা আলিম তারাও সকলেই সকল মাসআলা বের করতে সক্ষম নন। অথচ আলিমের চেয়ে জাহিলের সংখ্যাই অনেক বেশি। তাই যদি ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন না করা হত তবে সাধারণ মানুষ ইসলামের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যেত। আর এ কারণেই ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কাজেই এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলা যায় যে, ফিকাহ শাস্ত্রের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের ফযীলত

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে ইরশাদ করেন— وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا অর্থাৎ যাকে হিকমত দান করা হয়েছে, তাকে প্রভূত কল্যাণ দান করা হয়েছে। (সূরায়ে আলে-ইমরান– ২৬৯) এ আয়াতে হিকমত দ্বারা ফিকাহ শাস্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

অন্য আয়াতে বর্ণিত আছে— فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ "তাদের প্রত্যেক দল হতে এক এক জামাআত কেন বের হয় না! যাতে তারা দীনের জ্ঞান লাভ করত এবং প্রত্যাবর্তন করে স্বীয় সম্প্রদায়কে সতর্ক করত।" এখানেও দীনের জ্ঞান দ্বারা ফিকাহ্ শাস্ত্রকেই বোঝানো হয়েছে।

প্রিয় নবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ

অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যার মঙ্গল কামনা করেন, তাকে দীনের সঠিক বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা দান করে থাকেন।

অন্যত্র নবী কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেন— فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ

অর্থাৎ একজন ফকীহ বা দীনের জ্ঞানে পাণ্ডিত্ব অর্জনকারী ব্যক্তি একহাজার ইবাদতকারীর চেয়েও উত্তম।

এ ধরনের আরো বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে যেগুলো দ্বারা ফিক্‌হ শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায়।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের সংকলন

মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এমন বহু ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যার স্পষ্ট বর্ণনা পবিত্র কুরআনে কারীমে নেই এবং হাদীসেও হুবহু তা উল্লেখ নেই। তাই নবী কারীম (সাঃ) -এর যুগ হতেই এর উৎপত্তি শুরু হয়। যেমন– হযরত মুআয ইবনে জাবাল (রাঃ)-কে প্রিয় নবী (সাঃ) ইয়ামানের গভর্নর নিযুক্ত করে যখন জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কিভাবে বিচার করবে? তখন তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কুরআন-হাদীসের মাধ্যমে। প্রিয় নবী (সাঃ) তাঁকে বললেন, যদি কুরআন ও হাদীসে উহার সমাধান না পাও তখন কি করবে? তিনি বললেন, কুরআন-হাদীস হতে নিঃসৃত আমার মতামত দ্বারা উহার সমাধান দেব। মহানবী (সাঃ) এ কথা শুনে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। এর দ্বারা বোঝা গেল যে, রাসূল (সাঃ)-এর জামানা হতে ফিকাহ শাস্ত্রের উৎপত্তি শুরু হয়।

এ ভিত্তিতেই একদল সাহাবী (রাঃ) মুসলিম জাতি সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দেন এবং তাঁদেরকে এ কারণেই ফকীহ্ খেতাবে ভূষিত করা হয়। তাঁদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলেন, হযরত ওমর (রাঃ), হযরত আলী (রাঃ), হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ), হযরত আয়িশা (রাঃ) প্রমুখ সাহাবীগণ। এবং তাঁদের পরবর্তীতে তাদের শিষ্যগণ এ সমস্যার সমাধান দিতে থাকেন। এভাবেই হিজরীর প্রথম শতাব্দী তার পরিসমাপ্তির পথে অগ্রসর হয়।

প্রথম শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে জন্ম লাভ করেন উম্মতে মুহাম্মদী (সাঃ) -এর উজ্জ্বল নক্ষত্র হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)। তাঁকে মহান রাব্বুল আলামীন কুরআন ও হাদীসের অগাধ জ্ঞান দান করেন। তিনি মুসলমানদের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে সৃষ্ট বিভিন্ন সমস্যাকে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সুষ্ঠু সমাধান দিতে থাকেন। আর যে বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন স্পষ্ট ধারণা নেই সে ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কিরামের চিন্তাধারা অনুযায়ী মাসআলা বের করে উহারও সমাধান দিতে থাকেন। এবং এক্ষেত্রে তিনি কুরআন, হাদীস ও আছারে সাহাবার ওপর বিশেষ গবেষণা চালিয়ে সর্বপ্রথম ফিকাহ শাস্ত্রের কতিপয় মূলনীতি প্রণয়ন করেন। অতঃপর তিনি আপন শিষ্য ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) সহ অন্যান্য প্রমুখ সাহাবীদের নিয়ে একটি ফিকাহ বোর্ড গঠন করেন। উক্ত বোর্ডের সদস্যগণের আলোচনা-পর্যালোচনা শেষে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোকে লিখে রাখা হয়। আর যে সকল ক্ষেত্রে মতবিরোধ হত সেগুলোও লিখে রাখা হত। এভাবেই অসংখ্য মাসআলা মাসায়েলের সুষ্ঠু সমাধান দেয়া হয়। এভাবে একটি শাস্ত্রের রূপ গ্রহণ করলে উহাকে ফিকাহ শাস্ত্র বলে নামকরণ করা হয়।

পরবর্তীতে ইমাম শাফিয়ী (রঃ), ইমাম মালিক (রঃ), ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), দাউদে জাহেরী ও আওযায়ী (রঃ) প্রমুখগণ কিছু কিছু উসূল ও মূলনীতির মধ্যে মতানৈক্য করে আপন চিন্তাধারা অনুযায়ী মাসায়েল সৃষ্টি করে বিভিন্ন পুস্তক রচনা করেন। এগুলোই পরবর্তীকালে শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাব নামে পরিচিতি লাভ করে।

এবং হানাফী মাযহাবের প্রামাণিক কিতাবগুলোকে একত্রে "উসূলে সিত্তাহ্" বলা হয়। আর এর সবগুলোই ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর শাগরেদ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) কর্তৃক সংকলিত। কিতাবগুলো হল— (১) জামে' সাগীর, (২) জামে' কাবীর, (৩) সিয়ারে স্যগীর, (৪) সিয়ারে কাবীর, (৫) মাবসূত, (৬) যিয়াদাত।

ফিক্হে হানাফী রচনার ক্ষেত্রে কবিতার দু'টি পুংক্তি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুংক্তি দু'টি হল—

اَلْفِقْهُ زَرَعَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ وَعَلْقَمَةُ + حَصَّادُهُ ثُمَّ اِبْرَاهِيْمُ دَوَّاسُ

نُعْمَانُ طَاحِنُهُ يَعْقُوْبُ عَاجِنُهُ + مُحَمَّدٌ خَابِزٌ وَالْاٰكِلُ النَّاسُ

অর্থাৎ ফিকহে হানাফীর বীজ বপনকারী হলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)। আর উহার ফসল কর্তনকারী হলেন হযরত আলকামা (রঃ)। এবং হযরত ইবরাহীম নাখঈ হলেন তার পরিষ্কারকারী। আর ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) হলেন উহার আটা পেষণকারী। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) হলেন উহার খামির তৈরিকারী। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) হলেন উহার রুটি তৈরিকারী। আর বাকি সকলেই হল উহার ভক্ষণকারী।

মোদ্দাকথা হল, ইমাম নু'মান ইবনে ছাবিত আবূ হানীফা (রঃ) হলেন ফিকাহ শাস্ত্রের প্রধান স্থপতি। আর বাকি সকলেই তার অনুসারী। তাইতো তায্কেরাতুল হুফ্ফায গ্রন্থের লেখক বলেন— اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ অর্থাৎ লোকেরা ফিকাহশাস্ত্র রচনার ক্ষেত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মুখাপেক্ষী।

ইমাম শাফিয়ী (রঃ) -এর শাগরেদ ইমাম মাযেনী (রঃ) বলেন—

اَبُوْ حَنِيْفَةَ اَوَّلُ مَنْ دَوَّنَ عِلْمَ الْفِقْهِ وَاَفْرَدَهُ بِالتَّالِيْفِ مِنْ بَيْنِ الْاَحَادِيْثِ النَّبُوِيَّةِ فَبَدَأَ بِالطَّهَارَةِ ثُمَّ بِالصَّلٰوةِ ثُمَّ بِسَائِرِ الْعِبَادَاتِ ثُمَّ الْمُعَامَلَاتِ اِلٰى اَنْ خَتَمَ بِالْمَوَارِيْثِ.

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) সর্বপ্রথম হাদীসে নববী হতে ফিকাহ শাস্ত্রের সংকলন করেন। অতঃপর পবিত্রতার পর্ব দিয়ে শুরু করে সালাত এবং সমস্ত ইবাদাত, এরপর মুআমালাত এবং সর্বশেষে মিরাসের বর্ণনা দ্বারা কিতাবের পরিসমাপ্তি টানেন।

ফিকাহ্ শাস্ত্রের নামকরণ

কুরআনে কারীমের আয়াত– وَتَفَقَّهُوْا فِى الدِّيْنِ এবং হাদীসে রাসূল– مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُّفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ -হতে ফিকাহ্ শাস্ত্রের নামকে গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা ফিক্হ-এর আভিধানিক অর্থ হল, সঠিক বুঝ বা সঠিক জ্ঞান। আর সঠিক জ্ঞান বলতে কেবল মাত্র দীনের জ্ঞানকেই বোঝানো হয়।

শরীয়তের বিধানের বর্ণনা

শরীয়তের বিধানগুলো দু'ধরনের; করণীয় ও বর্জনীয়। এবং করণীয় বিধানগুলো আবার দু'ধরনের; আযীমত ও রুখসত। আযীমত দ্বারা এমন বিধান সমূহকে বোঝানো হয়, যা শরীয়তের আদেশে আসল রূপে পালিত হয়। আর রুখসত বলা হয়

এমন সকল বিধানকে যা অভীষ্ট ব্যক্তির কষ্ট লাঘবের জন্য বিধি-বিধানের আসল রূপের পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত সহজভাবে পালনের জন্য অনুমোদিত।

আযীমতের বিধানগুলো আবার চার প্রকার ঃ (১) ফরয, (২) ওয়াজিব, (৩) সুন্নত ও (৪) নফল।

ফরযের বর্ণনা ঃ ফরযের শাব্দিক অর্থ হল, অপরিহার্য করণ, সাব্যস্ত করণ, বিশদ বিবরণ দান ও সীমা নির্ধারণ ইত্যাদি। ইমাম ত্বাহাবী (রঃ) ফরয শব্দের প্রায় ৩০টি অর্থ নির্ধারণ করেছেন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (রঃ) হিদায়ার ভাষ্য গ্রন্থে বলেন, শরীয়তের পরিভাষায় এমন বিধানকে ফরয বলা হয়, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত; যাতে কোন ধরনের সন্দেহের অবকাশ নেই। যথা– পবিত্র কুরআন, হাদীসে মুতাওয়াতির, ইজমা ও নস্ দ্বারা প্রমাণিত কিয়াস।

উল্লেখ্য যে, শরীয়তের দলিল মোট চার প্রকার ঃ

১. قَطْعِيُّ الثُّبُوت قَطْعِيُّ الدِّلَالَة যথা— মুতাওয়াতির নসসমূহ।

২. قَطْعِيُّ الثُّبُوت ظَنِّيُّ الدِّلَالَة যথা— কুরআনে কারীমের এমন সকল আয়াত, যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে।

৩. ظَنِّيُّ الثُّبُوت قَطْعِيُّ الدِّلَالَة যথা— একক সনদে বর্ণিত হাদীস, যা অর্থের দিক থেকে অকাট্যরূপে প্রমাণিত হয়।

৪. ظَنِّيُّ الثُّبُوت ظَنِّيُّ الدِّلَالَة যথা— একক সনদে বর্ণিত হাদীস, যা ব্যাখ্যার অবকাশ রাখে বা একাধিক অর্থের সম্ভাবনা রাখে।

ফকীহগণ এ চার প্রকারের দলিলের প্রথমটি দ্বারা ফরয প্রমাণিত করেছেন, আর দ্বিতীয়টি দ্বারা ওয়াজিব প্রমাণিত করেছে এবং চতুর্থটি দ্বারা সুন্নত ও মুস্তাহাব সাব্যস্ত করেছেন।

ফরযের প্রকারভেদ ঃ ফরয আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

১. ফরযে আইন ঃ শরীয়তের আরোপিত এমন বিধান, যা প্রত্যেক ব্যক্তির ওপর অবশ্যই কর্তব্য। যথা– সালাত।

২. ফরযে কিফায়া ঃ শরীয়তে আরোপিত এমন বিধান, যা কিছু লোক পালন করলে সকলের পক্ষ হতে আদায় হয়ে যায়। তবে সকলেই যদি ছেড়ে দেয়, তাহলে সকলেই গুনাহ্গার হবে। এবং ফরযের অস্বীকারকারীকে কাফির বলা হয়। আর ফরয তারককারীকে ফাসিক বলা হয়।

ওয়াজিবের বর্ণনা ঃ ওয়াজিব এমন বিধানকে বলা হয়, যার দলিলে কিছুটা সংশয় রয়েছে বা যা অকাট্য ভাবে প্রমাণিত নয়। যথা– বিতরের সালাত, সদকায়ে ফিতর ইত্যাদি। এগুলো একক সনদে বর্ণিত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। উল্লেখ্য যে, ওয়াজিব আমলের দিক হতে ফরযের তুল্য, কাজেই ফরযের ন্যায় ওয়াজিবও অবশ্যই পালনীয় এবং ওয়াজিব ছুটে গেলে ফরযের ন্যায় উহারও কাযা আদায় করতে হয়, তবে বিশ্বাসগত দিক হতে এটাকে নফল হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই ওয়াজিবের অস্বীকারকারী কাফির হবে না।

সুন্নতের বর্ণনা ঃ সুন্নতের শাব্দিক অর্থ– পদ্ধতি, পন্থা, তরিকা, অভ্যাস। পরিভাষায় সুন্নত এমন আমলকে বলা হয়, যা প্রিয় নবী (সাঃ) সর্বদা করেছেন এবং যা করলে প্রতিদান রয়েছে, আর না করলে তিরস্কারের মুখোমুখী হতে হয়।

সুন্নতের প্রকারভেদ ঃ সুন্নত আবার দু'প্রকার ঃ সুন্নতে হুদা ও সুন্নতে যায়েদা। সুন্নাতে হুদা হল ইবাদত সংক্রান্ত, আর সুন্নতে যায়েদা আচার-আচরণের সাথে সংশ্লিষ্ট।

সুন্নতে হুদাটা আবার দু'ভাগে বিভক্ত ঃ মুয়াক্কাদা ও গায়রে মুয়াক্কাদা। মহানবী (সাঃ) যে আমলকে সদাসর্বদা করেছেন এবং উহা ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্তও নয় উহাকে সুন্নতে মুয়াক্কাদা বলা হয়। আর যে কর্মকে মহানবী (সাঃ) কখনো করতেন আবার কখনো ছেড়ে দিতেন উহাকে সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা বলা হয়। সুন্নতে গায়রে মুয়াক্কাদা -এর নাম হল মুস্তাহাব বা মানদূব।

নফলের বর্ণনা ঃ নফল শব্দের অর্থ হল অতিরিক্ত। শরীয়তের পরিভাষায় নফল এমন সকল ইবাদতকে বলা হয়, যা ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নত -এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

শরীয়তের বর্জনীয় বিষয়গুলো আবার দু'ধরনের; হারাম ও মাকরূহ। মাকরূহটা আবার দু'ধরনের; মাকরূহে তাহরীমী ও মাকরূহে তানযীহী।

হারামের বর্ণনা ঃ হারাম এমন সকল বিধানকে বলা হয়, যার নিষিদ্ধ হওয়াটা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত। যথা— মদ্যপান করা, ব্যভিচার করা ইত্যাদি।

মাকরূহের বর্ণনা ঃ মাকরূহে তাহরীমী এমন সকল বিষয়কে বলা হয়, যা সংশয়যুক্ত দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ। যথা– দাবা খেলা, গুই-সাপ ভক্ষণ করা। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মাকরূহে তাহরীমীকে হারামের এক প্রকার বলে গণ্য করেন, আর শায়খাইন (রঃ) উহাকে এমন হালালের অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, যা অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত নয়। কাজেই বোঝা গেল যে, মাকরূহে তাহরীমী যা আস্ত হারাম নয়, তবে হারামের কাছাকাছি। আর মাকরূহে তানযীহী হল তাহরীমীর বিপরীত। উহাকে করার চেয়ে না করাই শ্রেয়।

শরয়ী বিধানের নকশা

শরয়ী বিধান

- নাহী
  - হারাম
  - মাকরূহ
    - মাকরূহে তাহরীমী
    - মাকরূহে তানযীহী
- আমর
  - ফরয
    - ফরযে আইন
    - ফরযে কিফায়া
  - ওয়াজিব
  - সুন্নত
    - সুন্নাতে মুয়াক্কাদা
    - সুন্নতে যায়েদা
  - নফল

ফকীহদের পরিচয়

ফকীহদের পরিচয় দিতে গিয়ে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেন—

اَلْفَقِيْهُ هُوَ الزَّاهِدُ فِى الدُّنْيَا اَلرَّاغِبُ اِلَى الْاٰخِرَةِ اَلْبَصِيْرُ بِاُمُوْرِ دِيْنِهِ الْمُدَاوِمُ عَلٰى عِبَادَةِ رَبِّهٖ

অর্থাৎ ফকীহ হলেন ঐ ব্যক্তি যিনি দুনিয়ার প্রতি অনাগ্রহী, পরকালের দিকে আকৃষ্ট, দীনি ব্যাপারে সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পন্ন এবং স্বীয় রবের ইবাদতে সর্বদা নিমগ্ন।

আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী 'উমদাতুল কারী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন—

اَلْفَقِيْهُ الْعَالِمُ الَّذِىْ يَشُقُّ الْاَحْكَامَ وَيُفَتِّشُ عَنْ حَقَائِقِهَا وَيَفْتَحُ مَا اسْتَغْلَقَ مِنْهَا

অর্থাৎ ফকীহ বলতে এমন বিদ্বান ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি চিন্তা ও গবেষণার মাধ্যমে শরীয়তের বিধান ও উহার নিগূঢ় তথ্য উদঘাটন করেন এবং কঠিন বিষয়াবলীর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা প্রদান করেন।

طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ (ফকীহদের স্তরসমূহ)

ফকীহগণ সাতটি স্তরে বিভক্ত। তাঁদের শ্রেণীবিন্যাসের স্তর যুগের সাথে সম্পৃক্ত নয়। প্রথম যুগের ফকীহও শেষ তবকার হতে পারেন, আবার শেষ যুগের ফকীহও প্রথম তবকার হতে পারেন।

১. প্রথম তবকা ঃ فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ فِى الدِّيْنِ (ফাকীহুন মুজতাহিদুন ফিদ্দীন) ঃ তাঁরা স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করতেন। কারো কোন নির্ধারিত নীতির শৃঙ্খলে আবদ্ধ না হয়ে কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখেই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন। এ স্তরের ফকীহদের মধ্যে (১) ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), (২) ইমাম মালিক (রঃ), (৩) ইমাম শাফিয়ী (রঃ), (৪) ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ), (৫) ইমাম আওযায়ী (রঃ), (৬) ইমাম তাবারী (রঃ), (৭) ইমাম যাহেরী (রঃ), (৮) ইমাম লাইছ (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ।

২. দ্বিতীয় তবকা ঃ فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ فِى الْمَذْهَبِ (ফাকীহুন মুজতাহিদুন ফিল মাযহাব) ঃ তাঁরাও স্বাধীনভাবে ইজতিহাদ করে রায় প্রদান করতেন, তবে তাঁরা মাযহাব প্রবর্তক ইমামদের নীতি-নির্ধারণী নিয়ম মোতাবেক ইজতিহাদ করতেন। এ তবকায় (১) ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ), (২) ইমাম যুফার (রঃ), (৩) ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ও সমসাময়িক ফকীহগণ প্রসিদ্ধ।

৩. তৃতীয় তবকা ঃ فَقِيْهٌ مُجْتَهِدٌ فِى الْمَسَائِلِ (ফাকীহুন মুজতাহিদুন ফিল মাসায়িল) ঃ তাঁরা মুজতাহিদ ফিদ্দীন ইমামগণ কর্তৃক ইস্তিম্বাতকৃত আহকামে ইমামদের গ্রহণীয় নীতিতে গবেষণা করতেন এবং প্রয়োজনে ইজতিহাদও করতেন।

এ তবকায় (১) ইমাম আবূ বকর খাস্‌সাফ (রঃ), (২) ইমাম ত্বাহাবী (রঃ), (৩) ইমাম আবুল হাসান কারখী (রঃ), (৪) ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখ্‌সী (রঃ), (৫) ইমাম শামসুল আইম্মা হালুয়ানী (রঃ), (৬) ইমাম ফখরুদ্দীন কাযী খান (রঃ) ও তাঁদের সমকালীন ফকীহগণ।

৪. চতুর্থ তবকা ঃ اَصْحَابُ التَّخْرِيْجِ (আসহাবুত্ তাখরীজ) ঃ পূর্ববর্তী ইমামগণ কর্তৃক উপস্থাপিত মাসআলার কারণ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করাই তাঁদের কাজ। তাঁরা عِلَّتْ وَ مَنَاط বের করা ছাড়াও ফিকাহ শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে (১) ইমাম আবূ বকর জাস্‌সাস রাযী (রঃ), (২) আবুল হুসাইন কুদূরী (রঃ) এবং তাঁদের সমসাময়িক ফকীহগণ।

৫. পঞ্চম তবকা ঃ اَصْحَابُ التَّرْجِيْحِ (আসহাবুত্ তারজীহ) ঃ যুক্তির কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে এক হুকুমকে অন্য হুকুমের ওপর প্রাধান্য দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের সমাহার হল এ স্তরে। তাঁদের মধ্যে (১) আল্লামা বুরহানুদ্দীন আবুল হাসান আলী ফারগানানী মুরগেনীয়ানী (রঃ), (২) আল্লামা আসবীজাবী (রঃ) প্রমুখ এ স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৬. ষষ্ঠ তবকা ঃ اَصْحَابُ التَّمْيِيْزِ (আসহাবুত্ তামঈয) ঃ এ স্তরের আইন শাস্ত্রবিদগণ উত্তম, মধ্যম, অধম, প্রকাশ্য মাযহাব, প্রকাশ্য রিওয়ায়াত ও বিরল রিওয়ায়াতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতেন। তাঁদের মধ্যে (১) সাহেবে কাঞ্জিদ্ দাক্বায়েক্ব, (২) সাহেবে বিক্বায়া, (৩) সাহেবে মুখতাসার, (৪) সাহেবে মাজমা ও তাঁদের সমকক্ষগণ এ তবকার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

৭. সপ্তম তবকা ঃ মাসআলার পার্থক্য নির্ণয় করার ক্ষমতা তাঁদের নেই। শুধু মাসাআলা লেখে ইতিহাসের মতো আলোচনা করে যাবেন এবং মাসাআলা শিখবেন ও শিখাবেন; ফতোয়া দেয়া তাঁদের জন্য জায়েয নেই।

ইমাম চতুষ্টয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

১. ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ঃ নাম নু'মান, পিতার নাম ছাবিত, উপনাম আবূ হানীফা। উমাইয়া শাসনামলে আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ানের রাজত্ব কালে ৮০ হিজরী সালে পারস্য সম্রাজ্যের কূফা নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দাদা চতুর্থ খালীফা হযরত আলী (রাঃ)-এর খিলফাতকালে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসেন।

বাল্যকালে পিতামাতার স্নেহে লালিত-পালিত হয়ে একটু বড় হলে পৈত্রিক পেশা ব্যবসা-বাণিজ্যে আত্মনিয়োগ করেন। জিন্দেগীর প্রায় দেড়যুগ অতিবাহিত হওয়ার পর জ্ঞান অর্জনে বেরিয়ে পড়েন। প্রথমে কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করেন। পরে হাদীস ও ফিক্‌হ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অর্জনের বিরল দৃষ্টান্ত ধরাপৃষ্ঠে স্থাপন করেন। তাঁর সময় সাহাবীদের মাত্র চারজন ধরাপৃষ্ঠে ছিলেন। (১) হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বসরায়। (২) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রাঃ) কূফায়। (৩) হযরত সাহল ইবনে সা'আদ সাঈদী (রঃ) মদীনায়। (৪) হযরত আবূ তোফাইল আমর ইবনে ওয়াসেলা (রাঃ) মক্কায়। তিনি তাঁদের সান্নিধ্য লাভ করেন। সমসাময়িক কালের মধ্যে ইমাম আবূ হানীফাই তাবেয়ী ছিলেন।

জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ও মদীনাসহ বিভিন্ন দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি চার সহস্র ওস্তাদের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ফিকাহ শাস্ত্রের গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তিনিই সর্বপ্রথম ফিকাহ শাস্ত্রকে স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় আসীন করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি পৃথিবীর চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য মানুষ তাঁর নিকট জ্ঞান অর্জনের জন্য ছুটে আসেন। অত্যন্ত সহজ ও সরল যুক্তির মাধ্যমে তিনি মাসআলাসমূহ উদ্ভাবন করে ব্যাপক জনগোষ্ঠির জন্য ফিকাহ শাস্ত্রকে সহজবোধ্য করে দেন। তাঁর সম্পর্কে হযরত ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বলেছেন- "اَلنَّاسُ فِى الْفِقْهِ عِيَالُ اَبِىْ حَنِيْفَةَ" অর্থাৎ "ফিকাহ শাস্ত্রে মানুষ ইমাম আবূ হানীফার মুখাপেক্ষী।" এই মহা মানব রাষ্ট্রীয় কাযীর পদ প্রত্যাখ্যান করায় খালীফা মানসূরের রোষানলে পড়ে কারারুদ্ধ হন। অতঃপর কারাগারেই গোপন বিষ প্রয়োগের মাধ্যমে ১৫০ হিজরীতে শাহাদাত বরণ করেন।

২. ইমাম শাফিয়ী (রঃ) ঃ উনার পুরো নাম ইমাম আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইদ্‌রীস ইবনে আব্বাস ইবনে ওছমান ইবনে শাফে' ইবনে সায়েব ইবনে ওয়ায়েদ ইবনে আবদ ইয়াবিদ হাশেম ইবনে আবদুল মুত্তালিব ইবনে আবদে মানাফ ১৫০ হিজরীতে ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। দুই বছর বয়সে লালন-পালন ও উত্তম প্রশিক্ষণের নিমিত্ত মক্কায় আনয়ন করা হয়। কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকাহ শাস্ত্রে বুৎপত্তি অর্জন করত মাত্র ১৫ বছর বয়সে শিক্ষকের মতো মহা সম্মানের পদ অলঙ্কৃত করেন।

১৮৯ হিজরী সনে ৪৮ বছর বয়সে ইরাকের বাগদাদে গমন করে পাঠ দান অব্যাহত রাখেন এবং পরে মিশর গিয়ে ফিকাহ শাস্ত্রের মহান খিদমত আঞ্জাম দেন। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রে অনেক মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। উসূলে ফিক্‌হ শাস্ত্রের তিনিই স্থপতি। শাফিয়ী মাযহাবের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ২০৪ হিজরী সালে মদীনায় ইন্তেকাল করেন।

৩. ইমাম মালিক (রঃ) ঃ ইমাম মালিক ইবনে আনাস (রঃ) ৯৩ হিজরীতে মদীনায় জন্ম গ্রহণ করেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি হাদীসে পারদর্শীতা অর্জন করেন। তাঁর সংকলিত মুয়াত্তাই প্রথম হাদীস সংকলন গ্রন্থ।

তাঁর সম্মানিত শিক্ষক ঃ (১) ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী, (৩) ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, (৩) নাফে, (৪) মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদের, (৫) হিশাম ইবনে উরওয়াহ, (৬) যায়েদ ইবনে আসলাম, (৭) রাবিয়া ইবনে আবূ আবদির রহমান (রঃ) প্রমুখ।

তাঁর শিষ্যদের মধ্যে (১) ইমাম শাফিয়ী, (২) মুহাম্মদ ইবনে ইব্রাহীম ইবনে দীনার, (৩) আবূ হাশিম, (৪) আবদুল আযীয, (৫) মা'আন ইবনে ঈসা, (৬) আবদুল্লাহ ইবনে মাসলামা ও (৭) আবদুল্লাহ ইবনে ওহাব (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি একাধারে ফকীহ, মুহাদ্দিস ও মুফাসসির ছিলেন। ইমাম মালিক (রঃ) মালিকী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাসজিদে নববীতে হাদীস শিক্ষা দিতেন। অসংখ্য মানুষ তাঁর নিকট হাদীস ও ফিক্হ শিখতে আসত। মালিকী মাযহাবের তিনিই প্রবর্তক। তিনি ১৬৯ হিজরীতে ৭৬ বৎসর বয়সে মদীনা শরীফেই ইন্তেকাল করেন।

৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ) ঃ ইমাম আবূ আবদিল্লাহ আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাম্বল শায়বানী মেরওয়াযী ১৬৪ হিজরীতে বাগদাদে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিক্হ, হাদীস ও আধ্যাত্মিকতায় বিশেষজ্ঞ ছিলেন। প্রথমে বাগদাদে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিক্হের জ্ঞানার্জন করেন। পরে কূফা, বসরা,মক্কা,মদীনা, ইয়ামান, সিরিয়া ও আরব্য উপদ্বীপে গমন করত কুরআন, হাদীস ও ফিক্হের দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি হাম্বলী মাযহাবের প্রতিষ্ঠাতা।

তাঁর শিক্ষা গুরুদের মধ্যে (১) ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ কাত্তান, (২) সুফিয়ান ইবনে ওয়াইনাহ, (৩) মুহাম্মদ ইবনে ইদ্‌রীস শাফিয়ী, (৪) ইয়াযীদ ইবনে হারূন ও (৫) আবদুর রায্যাক ইবনুল হাম্মাম (রঃ) প্রমুখ প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তাঁর নিকট থেকে বর্ণনা করেন ঃ (১) ইমাম সালেহ, (২) আবদুল্লাহ, (৩) হাম্বল ইবনে ইসহাক, (৪) মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী, (৫) মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ, (৬) আবূ যুরআহ ও (৭) ইমাম আবূ দাঊদ সুলাইমান ইবনে আশআছ সিজেস্তানী (রঃ) প্রমুখ।

তাঁর হাদীস সংকলন 'মুসনাদ' প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ। তিনি ১২৫ টি মৌলিক বিধিতে ইমাম আবূ হানীফার অনুসারী ছিলেন। তিনি কুরআন কাদীম হবার মাসআলায় অটল থাকাতে উমাইয়া খালীফার রোষানলে পতিত হন। উমাইয়াদের দ্বারা তিনি নির্যাতিত হন। অবশেষে এই মহান সাধক ২৪১ সালের ১২ ই রবিউল আউয়াল তারিখে ৭৭ বছর বয়সে বাগদাদে ইহধাম ত্যাগ করেন।

হানাফী ফিক্হের বৈশিষ্ট্যাবলী

হানাফী ফিক্হ অতি সহজ-সরল ও অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মুসলিম বিশ্বে এর জনপ্রিয়তা সর্বাধিক। মুসলমানদের তিন চতুর্থাংশ ফিক্হে হানাফীর অনুসারী। ইমাম আবূ হানীফা কর্তৃক প্রবর্তিত হানাফী ফিক্হের কিছু বৈশিষ্ট্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

প্রথমত ঃ হানাফীদের মতে, ইসলামের যাবতীয় হুকুম-আহকাম হিকমতপূর্ণ ও কল্যাণকর। পক্ষান্তরে ইমাম শাফিয়ী (রঃ) সহ অন্যান্যদের মতে, শরীয়তের মাসআলাসমূহ নিছক দাসানুগ, এতে কল্যাণ নেই। যেমন– মদ্যপান, ফাসিকী ও অন্যায় ইত্যাদি এ জন্য শুধু হারাম যে, শরীয়ত উহাকে নিষেধ করেছে। আর দান-খয়রাত ইত্যাদি এ জন্য পছন্দনীয় যে, শরীয়ত তার আদেশ দিয়েছেন।

আর হানাফীদের মতে, মদ্যপান ও ফিসক-ফুজূরী সমাজ ও ব্যক্তি জীবনেও মন্দ। আর দান-খয়রাত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনেও কল্যাণকর।

দ্বিতীয়ত ঃ হানাফী ফিক্হ অত্যন্ত সহজ-সরল, যা অনায়াসে আমল করা যায়। যেমন– চোরের শাস্তির ব্যাপারে হানাফী ও অন্যান্য ইমামদের মধ্যকার মাসআলার কিছু আলোচনা।

১. হানাফীদের মতে, হাত কাটার জন্য চুরিকৃত সম্পদ একশত স্বর্ণমুদ্রা বা তৎসমতুল্য হওয়া আবশ্যক। আর অন্যান্যদের মতে, এক স্বর্ণ মুদ্রার চতুর্থাংশ হলেই হাতকাটা যাবে।

২. হানাফীদের মতে, চুরির এক নিসাব সম্পদে একাধিক চোর হলে হাত কাটা কার্যকর হবে না। আর ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের মতে, প্রত্যেকের হাত কাটা হবে।

৩. হানাফীদের মতে, শিশুর ওপর হাত কাটা কার্যকর হবে না। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, হাত কাটা কার্যকর হবে।

৪. হানাফীদের মতে, কুরআন শরীফ চোরের হাত কাটা যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর মতে, হাত কাটা যাবে ইত্যাদি।

তৃতীয়ত ঃ মানুষ হিসেবে মুসলিম রাষ্ট্রে সকলে সমান অধিকার ভোগ করবে। সকলের ধর্মীয় অধিকার সংরক্ষিত থাকবে। যেমন– হানাফীদের মতে, জিম্মিগণ মুসলমানদের ন্যায় ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পাড়বে। কিন্তু ইমাম মালিক (রঃ)-এর মতে, তা পারবে না। এমনিভাবে যদি কোন অগ্নিপূজক নিজ কন্যাকে বিবাহ করে, তবে ইসলামী সরকার তার ধর্মীয় বিধান অনুযায়ী তা কার্যকর করবে। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রঃ) বিপরীত মত পোষণ করেন।

এছাড়াও অসংখ্য বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। যেমন– (১) এতে তাহযীব ও তামাদ্দুন সংক্রান্ত আলোচনা অধিক বিদ্যমান। (২) বাস্তব-জীবন ব্যবস্থার অংশ খুব ব্যাপক, দৃঢ় এবং নিয়মতান্ত্রিক। (৩) মনের সাথে যুক্তিভিত্তিক মাসআলা ব্যাপক। (৪) কুরআন সুন্নাহর হুকুমসমূহ দৃঢ় ও যুক্তিভিত্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে নেয়া ইত্যাদি।

হানাফী ফিক্‌হের চার স্তম্ভ

১. ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ইয়াকূব ১১৩ কিংবা ১১৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৩ হিজরী সনে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রখ্যাত ফকীহ ছিলেন। আব্বাসীয় খিলাফতের প্রাক্কালে প্রধান বিচারপতির দায়িত্ব আঞ্জাম দেন। তিনি বলেন— بَرَكَةُ إِمَامٍ أَعْظَمِ أَبِي حَنِيفَةَ فَتَحَ لَنَا سَبِيلَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

অর্থাৎ ইমাম আবূ হানীফার বরকত এতই মহান ছিল যে, তিনি আমাদের জন্য দীন-দুনিয়া ও আখিরাতের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

২. ইমাম যুফার (রঃ) ঃ জন্ম ১১০ হিজরী; মৃত্যু ১৮১ হিজরী। প্রখ্যাত ফকীহ এবং ইমাম আবূ হানীফার অন্যতম ছাত্র।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) ঃ জন্ম ১৩২ হিজরী; মৃত্যু ১৮৯ হিজরী। তাঁর সংকলিত জামে' সাগীর, জামে' কাবীর, সিয়ারে সাগীর, সিয়ারে কাবীর, মাবসূত ও যিয়াদাত প্রসিদ্ধ ইসলামী আইনশাস্ত্র গ্রন্থ।

৪. ইমাম হাসান (রঃ) ঃ (ওফাত ২০৪ হিজরী) ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ লুলুবী ইমাম আবূ হানীফার নিকট ফিকাহ শিক্ষা শুরু করেন এবং সাহেবাইনের নিকট সমাপ্ত করেন। ফিক্‌হে হানাফীর ওপর অনেক কিতাব লেখেছেন । কিয়াসে দক্ষ ছিলেন।

এ চারজন ইমাম দ্বারাই হানাফী ফিকাহশাস্ত্র বিস্তার লাভ করেছে। "রদ্দুল মুখতার" গ্রন্থে আছে–

إِذَا حَكَمَ الْحَنَفِيُّ بِمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ أَوْ مُحَمَّدٌ أَوْ نَحْوُهُمَا مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ فَلَيْسَ حُكْمًا بِخِلَافِ رَأْيِهِ

অর্থাৎ যদি কোন মাসআলায় কোন হানাফী-ইমাম আবূ ইউসুফ কিংবা ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বা অনুরূপ কোন ইমামের রায় মুতাবিক হুকুম দেয়, তবে উহা ইমাম আবূ হানীফার রায়ের পরিপন্থী বিবেচিত হবে না।

ফিক্‌হে হানাফীর ক্রম বিকাশ

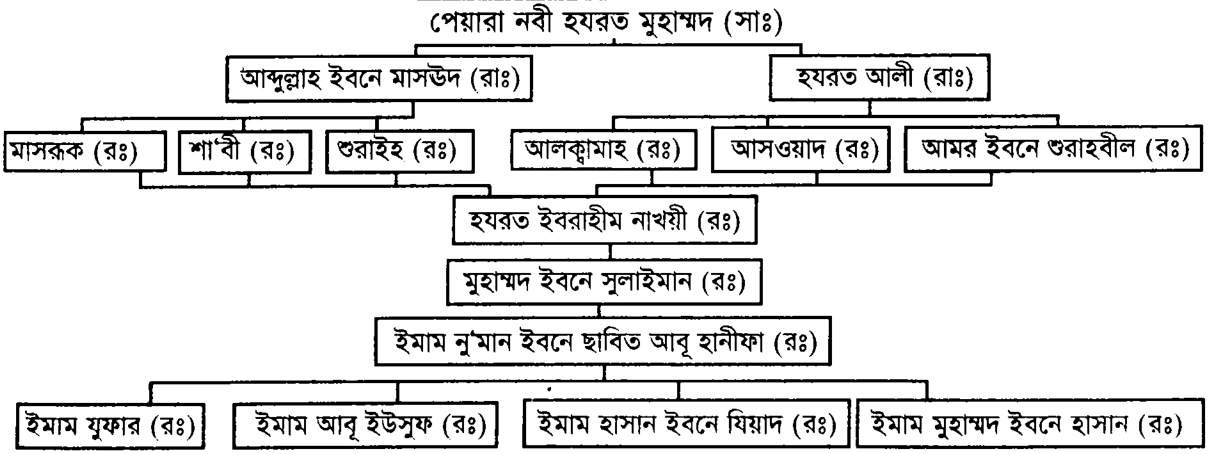

ফিকাহ্ শাস্ত্রের কতিপয় পরিভাষা

صَاحِبَيْن (সাহেবাইন) ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-কে একত্রে সাহেবাইন বলা হয়।

شَيْخَيْن (শায়খাইন) ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-কে একত্রে শায়খাইন বলা হয়।

طَرَفَيْن (ত্বরফাইন) ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-কে একত্রে ত্বরফাইন বলা হয়।

اَئِمَّتُنَا الثَّلَاثَة (আইম্মাতুনাছ্ ছালাছাহ) ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ), ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) -কে একত্রে আইম্মাতুনাছ্ ছালাছাহ বলা হয়।

مُتَقَدِّمِيْن (মুতাক্বাদ্দিমীন) ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) ফিকাহ শাস্ত্র সম্পাদনার জন্য যে সম্পাদনা কমিটি গঠন করেছিলেন তাঁদেরকে এবং তাঁদের সম-সাময়িক ফিকাহবিদ গণকে মুতাক্বাদ্দিমীন (পূর্ববর্তী ফকীহগণ) বলা হয়। যেমন- ইমাম আবূ ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার (রঃ) প্রমুখ।

اَلْاَكَابِرُ الْمُتَأَخِّرِيْن (আল-আকাবিরুল মুতাআখ্‌খিরীন) ঃ মুতাক্বাদ্দিমীন-এর পরবর্তী যুগে ইমাম আবূ বকর খাস্‌সাফ, কারখী, হালুয়ানী, সারাখসী, ত্বাহাবী, কাযী খান (রঃ) ও তাঁদের সম-সাময়িক ফকীহগণকে আকাবিরে মুতাআখ্‌খিরীন বলা হয়।

مُتَأَخِّرِيْن (মুতাআখ্‌খিরীন) ঃ আকাবিরে মুতাক্বাদ্দিমীন-এর পরবর্তী যুগের ফকীহ্‌গণকে মুতাআখ্‌খিরীন বলা হয়।

رِوَايَةُ الظَّاهِر (রিয়ায়াতুয্ যাহির বা প্রকাশ্য বর্ণনা) ঃ ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) কর্তৃক বিরচিত নিম্নোক্ত ছয়টি ফিকাহ গ্রন্থে যেসব বর্ণনার উল্লেখ রয়েছে, সেগুলোকে রিওয়াতুয্ যাহির বা প্রকাশ্য বর্ণনা বলা হয়। সে গ্রন্থগুলো হল এই- (১) জামে' সাগীর, (২) জামে' কাবীর, (৩) মাবসূত, (৪) যিয়াদাত, (৫) আস্-সিয়ারুস সাগীর (৬) আস্-সিয়ারুল কাবীর।

كُتُبُ النَّوَادِر (কুতুবুন নওয়াদির বা বিরল গ্রন্থরাজি) ঃ উপরোক্ত ছয়টি গ্রন্থ (যেগুলাকে যাহিরে রিওয়ায়াত বলে, সেগুলো) ছাড়া ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর অন্যান্য ফিকাহ গ্রন্থকে কুতুবুন নাওয়াদের বলে।

اَلْاِمَامُ الْاَعْظَم (ইমাম আযম বা বড় ইমাম) ঃ বলতে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-কে বোঝায়।

اَلْمَذَاهِبُ الْاَرْبَعَة (মাযহাবে আরবাআহ বা মাযহাব চতুষ্টয়) ঃ এর দ্বারা হানাফী, শাফিয়ী, মালিকী ও হাম্বলী মাযহাবকে বোঝায়।

اَلْعِرَاقِيُّوْن (আল-ইরাক্বিইয়্যূন) ঃ হানাফী মতাবলম্বী ইরাক নিবাসী ফকীহগণকে বোঝায়।

اَلْحِجَازِيُّوْن (আল-হিজাযিইয়্যূন) ঃ এর দ্বারা শাফিয়ী ও মালিকী মাযহাবভুক্তদেরকে বোঝানো হয়ে থাকে।

اَلْاَئِمَّةُ الْاَرْبَعَة (আল-আইম্মাতুল আরবাআহ বা ইমাম চতুষ্টয়) ঃ বলতে আবূ হানীফা (রঃ), শাফিয়ী (রঃ), মালিক (রঃ) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-কে বোঝায়।

اَلصَّدْرُ الْاَوَّل (আস্‌সাদরুল আউয়াল) ঃ এর দ্বারা প্রথম তিন যুগের লোকদেরকে বোঝানো হয় অর্থাৎ সাহাবায়ে কিরাম, তাবেয়ীন ও তাবে-তাবেয়ীনকে বোঝানো হয়ে থাকে।

اَلْاَئِمَّةُ الثَّلَاثَة (আল-আইম্মাতুছ্ ছালাছাহ) ঃ বলতে ইমাম মালিক (রঃ), শাফিয়ী (রঃ) ও আহমদ ইবনে হাম্বল (রাঃ)-কে বোঝানো হয়।

وَصَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى خَيْرِ خَلْقِهٖ وَنُوْرِ عَرْشِهٖ مُحَمَّدٍ (ص) وَاٰلِهِ الطَّيِّبِيْنَ وَالطَّاهِرِيْنَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

[পরম করুণাময় দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مُحَمَّدٍ وَّاٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ قَالَ الشَّيْخُ الْاِمَامُ الْاَجَلُّ الزَّاهِدُ اَبُو الْحَسَنِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْبَغْدَادِيُّ الْمَعْرُوْفُ بِالْقُدُوْرِيِّ -

সরল অনুবাদ ঃ সমস্ত প্রশংসা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ তা'আলার জন্যই (নির্দিষ্ট)। আর পরকালীন (উত্তম) পরিণাম ফল খোদাভীরুদের জন্য। রহমত ও শান্তি আল্লাহ তা'আলার রাসূল মুহাম্মদ (সাঃ) এবং তাঁর সাথীবর্গ ও বংশধর গণের ওপর বর্ষিত হোক। মহান তাপস বুজুর্গ আবুল হাসান ইবনে আহমাদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে জা'ফর আল-বাগদাদী যিনি কুদূরী নামে সুপরিচিত তিনি বলেছেন—

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিতাবের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার কারণ ঃ

قَوْلُهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الخ ঃ গ্রন্থকার তাঁর কিতাব বিসমিল্লাহর সাথে শুরু করার কয়েকটি কারণ রয়েছে—

১. মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআন বিসমিল্লাহর সাথে আরম্ভ করেছেন। এমনকি প্রথম অবতীর্ণ আয়াতে আল্লাহর নামে শুরু করার নির্দেশ রয়েছে। অধিকাংশ গ্রন্থকার এ নিয়ম অনুসরণ করেছেন। তাই মুসান্নিফ (রঃ)ও এ রীতি মেনে চলেছেন।

২. রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— كُلُّ اَمْرٍ ذِىْ بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فِيْهِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ اَوْ اَبْتَرُ

অর্থাৎ প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ যা "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" দ্বারা শুরু করা হয়নি তা অসম্পূর্ণ বা লেজকাটা। অন্য বর্ণনায় "আল্‌হামদুলিল্লাহ"-এর কথা উল্লেখ রয়েছে। তাই লেখক উভয়টা দ্বারা শুরু করেছেন।

৩. অথবা, আল্লাহর নাম ও তাঁর প্রশংসার মাধ্যমে শুরু করেছেন তাওফীক ও বরকত লাভের উদ্দেশ্যে।

بِسْمِ اللّٰهِ الخ-এর মধ্যস্থ "بَاء"-এর অর্থ ঃ এখানে "بَ" টি হরফে জার, এর অনেকগুলো অর্থ রয়েছে; তবে এ স্থানে اِلْصَاق – মিলন অথবা اِسْتِعَانَة – সাহায্য প্রার্থনা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর مُتَعَلَّق হল اَبْتَدِئُ বা اِبْتَدَأْتُ যা উহ্য রাখা হয়েছে।

আল্লাহর পরিচয় ঃ

قَوْلُهٗ اَللّٰهُ ঃ আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি সবার পূর্বে ছিলেন এবং পরেও থাকবেন। তিনি চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব। যাঁর মধ্যে পরিপূর্ণ গুণসমূহ একত্রিত হয়েছে। তিনি সর্ব রকমের অংশীদার হতে মুক্ত। তিনি সকলের স্রষ্টা, রিযিকদাতা এবং পালনকর্তা।

اَلرَّحْمٰنِ ও اَلرَّحِيْمِ-এর মধ্যকার পার্থক্য ঃ

قَوْلُهٗ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ঃ اَلرَّحْمٰنُ ও اَلرَّحِيْمُ উভয়টি رَحْمٌ মূলধাতু হতে নির্গত। উভয়টি اِسْمُ فَاعِلٍ مُبَالَغَة-এর সীগাহ। অর্থ– দয়ালু, দাতা, অনুকম্পা দানকারী। তবে رَحِيْمٌ হতে رَحْمٰنٌ-এর মধ্যে রহমতের আধিক্য বেশি। কেননা, আরবী ভাষায় একটা কথা আছে যে, كَثْرَةُ الْمَبَانِىْ تَدُلُّ عَلٰى كَثْرَةِ الْمَعَانِىْ অর্থাৎ "অধিক অক্ষর অধিক অর্থের ওপর দালালাত করে।" এ জন্য মহানবী (সাঃ) দোয়ার মধ্যে يَا رَحْمٰنَ الدُّنْيَا وَ رَحِيْمَ الْاٰخِرَةِ বলেছেন। যেহেতু দুনিয়াতে আল্লাহর রহমত মু'মিন ও কাফির উভয়ই সমানভাবে ভোগ করে; কিন্তু পরকালে শুধু মু'মিনরাই আল্লাহর রহমতের অধিকারী হবেন।

حَمْد ، مَدْح ও شُكْر-এর মধ্যে পার্থক্য ঃ

قَوْلُهُ اَلْحَمْدُ الخ ঃ حَمْد ، مَدْح ও شُكْر এ তিনটি শব্দের অর্থ হল প্রশংসা; কিন্তু حَمْد শব্দটি خَاص আর مَدْح শব্দটি عَام অর্থাৎ শুধু ইখতিয়ারী সৌন্দর্যাবলীর উল্লেখকে حَمْد বলা হয়, আর ইখতিয়ারী ও ইখতিয়ারী নয় উভয় প্রকারের সৌন্দর্যাবলীর উল্লেখকে مَدْح বলা হয়।

এছাড়াও আরো অনেক গুলো পার্থক্য রয়েছে—

১. হামদ حَمْد জীবিত ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, আর مَدْح মৃত ও জীবিত উভয়ের জন্য হতে পারে।

২. حَمْد জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য নির্দিষ্ট, আর مَدْح জ্ঞানী ও জ্ঞানহীন উভয়ের জন্য হয়।

৩. حَمْد দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে হয়, পক্ষান্তরে مَدْح দৃঢ় বিশ্বাস ও ধারণার মাধ্যমে হয় ইত্যাদি।

আর حَمْد ও مَدْح নিয়ামতের বিপরীতে হওয়া শর্ত নয়। পক্ষান্তরে شُكْر নিয়ামতের মোকাবেলায় হওয়া আবশ্যক।

রাসূলের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ رَسُوْلِهِ الخ ঃ এ رَسُوْلٌ শব্দটি مُرْسَلٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থ– প্রেরিত পুরুষ। রাসূল বলা হয়, যারা নতুন কিতাব ও শরীয়ত পেয়েছেন। এখানে রাসূল দ্বারা বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-কে বোঝানো হয়েছে।

اَلْقُدُوْرِىْ-এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اَلْقُدُوْرِىْ الخ ঃ قُدُوْرِىْ এখানে ইয়া টি নিসবতী। বাগদাদ শহরের একটি গ্রামের নাম قُدُوْر, অত্র কিতাবের গ্রন্থকার সে গ্রামের অধিবাসী বিধায় তাকে সে গ্রামের দিকে সম্পৃক্ত করে قُدُوْرِىْ বলা হয়েছে।

অথবা, قُدُوْرٌ শব্দটি قِدْرٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হল হাঁড়ি-পাতিল। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ হাঁড়ি-পাতিলের ব্যবসা করতেন, তাই তাঁকে সে দিকে সম্বন্ধ করে قُدُوْرِىْ বলা হয়েছে।

كِتَابُ الطَّهَارَةِ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ط فَفَرْضُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْاَعْضَاءِ الثَّلٰثَةِ وَمَسْحُ الرَّأْسِ -

পবিত্রতার পর্ব

সরল অনুবাদ : মহান আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন, হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা সালাত পড়তে ইচ্ছা কর, তখন তোমরা (পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে) তোমাদের মুখমন্ডল এবং হাতসমূহ কনুই (সহ) পর্যন্ত ধৌত কর, আর তোমাদের মাথাসমূহ মাসাহ কর এবং পা গুলো গোড়ালিসহ ধৌত কর। কাজেই পবিত্রতা বা ওযূর ফরয তিনটি অঙ্গ ধৌত করা ও মাথা মাসাহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ শব্দের বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ كِتَابُ : كِتَابٌ শব্দটি فِعَالٌ -এর ওযনে اِسْم ذَات এটি مَكْتُوْبٌ অর্থে ব্যবহৃত। অর্থাৎ লিখিত বা লিপিবদ্ধ। যেমনি لِبَاسٌ টি مَلْبُوْسٌ অর্থে ব্যবহৃত হয়। كِتَابٌ বলা হয়, যাতে এক জাতীয় মাসআলা গুলোকে একত্রিত করা হয়, আর بَاب -এর অধীনে এক প্রকারের মাসআলা গুলোকে বর্ণনা করা হয়, আর فَصْلٌ -এর মধ্যে ঐ বিষয়বস্তু উল্লেখ করা হয়, যা পূর্বোক্ত বিষয় হতে সম্পূর্ণ পৃথক।

طَهَارَةٌ শব্দের বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ الطَّهَارَةِ : طَهَارَةٌ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল পবিত্রতা। পরিভাষায় নাজাসাতে হাকীকী ও হুকমী দূর করাকে طَهَارَةٌ বলা হয়।

ওযূ ও গোসল দ্বারা নাজাসাতে হুকমী বা বিধানগত নাপাকী দূরীভূত হয়। আর ইসতিঞ্জা দ্বারা নাজাসাতে হাকীকী বা প্রকৃত নাপাকী দূর করা হয়। ইসলামে পবিত্রতার গুরুত্ব অপরিসীম। পবিত্রতাকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়া সালাত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত, আর উহার পূর্ব শর্ত হল طَهَارَةٌ বা পবিত্রতা। তাই গ্রন্থকার তার কিতাবকে كِتَابُ الطَّهَارَةِ দ্বারা আরম্ভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিয়তের শর্ত আবশ্যক নয়, তাই كِتَابُ الطَّهَارَةِ বলেছেন كِتَابُ التَّطْهِيْرِ বলেননি। কেননা, ইচ্ছা করে পবিত্রতা অর্জন করাকে 'তাত্বহীর' বলা হয়। আর اَلطَّهَارَةُ -এর الف ولام টিও اِسْتِغْرَاقِى বা جِنْسِى তাই পবিত্রতার যাবতীয় সকল অংশকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ কারণে اَلطَّهَارَةُ -কে বহুবচন নেয়া হয়নি। অথবা, এটা মাসদার হওয়ার কারণে বহুবচন নেয়া হয়নি।

উল্লিখিত আয়াতটির বিশ্লেষণ :

قَوْلُهُ اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلٰوةِ الخ : তাফসীর কারকগণ قُمْتُمْ শব্দের অর্থ করেছেন اَرَدْتُمْ বা তোমরা ইচ্ছা করবে। কেননা, সালাতে দন্ডয়মান হওয়ার পূর্বে ওযূর প্রয়োজন হয়, সালাত শুরু করার পর ওযূর প্রয়োজন হয় না। উল্লিখিত আয়াতে وَاَنْتُمْ مُحْدِثُوْنَ অংশটি উহ্য রয়েছে। এ জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মতে, অপবিত্র না হলে ওযূর প্রয়োজন হয় না। অবশ্য আসহাবে যাহেরিয়াদের নিকট ওযূ ফরয হবার জন্য সালাতে দন্ডয়মান হওয়া কারণ। এ কারণে তাঁদের মতে, ওযূর জন্য অপবিত্রতা শর্ত নয়।

গোসলের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ فَاغْسِلُوْا الخ ঃ غَسْلٌ শব্দটি غ (গাইন) -এর ওপর فَتْح বা যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে পানি দিয়ে ময়লা আবর্জনা দূর করা। আর غ (গাইন) -এর ওপর পেশ দিয়ে পড়লে অর্থ হবে সমস্ত শরীর ধৌত করা তথা গোলস করা। এবং যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে খিতমী বা অন্যান্য বস্তু যদ্বারা মাথা ধৌত করা হয়।

এখানে غَسْل দ্বারা ওযূ তথা মুখ, হাত এবং পা ধৌত করা উদ্দেশ্য।

মুখ মণ্ডল ধোয়ার সীমা ঃ কপালের চুলের গোড়া হতে থুতনির নিচ পর্যন্ত এবং এক কানের লতি হতে অপর কানের লতি পর্যন্ত। এ জন্য ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট যে শ্মশ্রু চেহারা ও কানের মধ্যবর্তী স্থানে অবিস্থত উহা ধৌত করাই ফরয।

وَارْجُلَكُمْ -এর لَام এর কিরাআতের ব্যাপারে মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ وَارْجُلَكُمْ الخ ঃ মুতাওয়াতির কিরাআত অনুযায়ী وُجُوْهَكُمْ -এর ওপর আতফ করে লামে যবর দিয়ে পাঠ করা হয় অর্থাৎ তোমরা ওযূর মধ্যে মুখ-মন্ডল, হাত এবং পা ধৌত কর। আর কোন কোন রিওয়ায়াতে وَاَرْجُلِكُمْ -এর লাম এর নিচে যের দিয়ে পড়া হয়েছে। এর ওপর ভিত্তি করে শীয়া সম্প্রদায় বলে, পা মাসাহ করা ফরয– ধৌত করা ফরয নয়; কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা রাসূল (সাঃ) ও সাহাবীদের কাজ দ্বারা পা ধৌতকরণ প্রমাণিত হয়েছে। আর এটাও বলা যেতে পারে যে, যের বিশিষ্ট কিরাআত মোজা পরিহিত অবস্থার প্রতি নির্দেশ করবে অর্থাৎ মোজা পরিহিত অবস্থায় ওযূর সময় মোজার ওপর মাসাহ করা যথেষ্ট অথবা, جَرِجوار তথা পার্শ্ববর্তী শব্দে যের হবার কারণে لَام -এর নিচে যের দেয়া হয়েছে। এরূপ দৃষ্টান্ত আরবী ভাষায় বহু রয়েছে।

ওযূর ফরযসমূহ ঃ

قَوْلُهُ فَرْضُ الطَّهَارَةِ الخ ঃ পবিত্রতা তথা ওযূর ফরয চারটি—

১. সমস্ত মুখমন্ডল ধৌত করা, ২. কনুই পর্যন্ত উভয় হাত ধৌত করা, ৩. উভয় পা গোড়ালিসহ ধৌত করা এবং ৪. মাথা মাসাহ করা।

উল্লেখ্য যে, যেসব অঙ্গ ধৌত করা ফরয তার কোন একটি অংশ তথা এক চুল পরিমাণও যদি শুকনো থেকে যায়, তবে তার ওযূ হবে না। আর মাথা মাসাহের বেলায় কমপক্ষে এক চতুর্থাংশ মাসাহ করতে হবে।

وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ تَدْخُلَانِ فِى فَرْضِ الْغَسْلِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلٰثَةِ خِلَافًا لِزُفَرَ (رحـ) وَالْمَفْرُوْضُ فِى مَسْحِ الرَّأْسِ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ وَهُوَ رُبْعُ الرَّأْسِ لِمَا رَوَى الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةَ (رضـ) اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتٰى سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ وَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى النَّاصِيَةِ وَخُفَّيْهِ -

সরল অনুবাদ ঃ আর আমাদের তিনজন ওলামা তথা ইমাম আবূ হানীফা, ইমাম আবূ ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, উভয় কনুই এবং উভয় টাখনু ধৌত করা ফরযের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইমাম যুফার এতে দ্বিমত প্রকাশ করেন। মাথা মাসাহের ফরয হল কপাল পরিমাণ, আর তাহল মাথার এক চতুর্থাংশ। কেননা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, নবী কারীম (সাঃ) একবার কোন এক সম্প্রদায়ের ময়লা-আবর্জনা ফেলবার স্থানে গিয়ে পেশাব করলেন, এরপর ওযূ করলেন এবং কপাল পরিমাপ ও উভয় মোজার ওপর মাসাহ করলেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাতের কনুই এবং পায়ের গোড়ালির পরিচয় ও হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَالْمِرْفَقَانِ وَالْكَعْبَانِ الخ-এর পরিচয় ঃ হাতের কব্জি ও ডানার মধ্যবর্তী সংযোগ স্থলকে مِرْفَق (মিরফাক) বা কনুই বলা হয়। পায়ের নালা ও পাঞ্জার মধ্যস্থ জোড়ার মধ্যে যে উঁচু হাড্ডি রয়েছে উহাকে كَعْب (কা'ব) বা গোড়ালি বলা হয়।

হুকুম ঃ ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, উভয় হাতের কনুই এবং উভয় পায়ের গোড়ালি ধৌত করার অন্তর্ভুক্ত।

ইমাম যুফার (রঃ)-এর মতে, কনুই এবং গোড়ালি ধৌত করা ফরয নয়। তিনি তাঁর অভিমতের স্বপক্ষে দলিল দিতে সাওমের বিধান সম্পর্কীয় আয়াত উল্লেখ করেন যে, وَاَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ অর্থাৎ "তোমরা রাত পর্যন্ত সাওম সম্পন্ন কর।" এখানে اِلٰى -এর পরবর্তী অংশ তথা রাত সাওমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

জমহুর ওলামাদের পক্ষ হতে জবাব ঃ জমহুর ওলামাদের পক্ষ হতে উত্তরে বলা হয়েছে যে, اِلٰى-এর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী বস্তুটি যদি এক জাতীয় হয়, তবে তাহলে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে; আর যদি এক জাতীয় না হয়, তাহলে পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী অংশের অন্তর্ভুক্ত হবে না। আর সাওমের আয়াতে اِلٰى -এর পরবর্তী অংশ পূর্ববর্তী বস্তুর অন্তর্ভুক্ত নয়, কেননা একটি হল দিন অপরটি হল রাত; তাই পরবর্তীটি পূর্ববতীর সাথে সংযুক্ত হবে না। কিন্তু ওযূর আয়াতে اِلٰى -এর পূর্ববর্তী অংশ পরবর্তী অংশের সমাজাতীয় হবার কারণে পরবর্তী অংশটি পূর্ববর্তীটির হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। কাজেই কনুই ও পায়ের গোড়ালি ধৌত না করলে ওযূ হবে না।

مَسْئَلَةُ مَسْحِ الرَّأْسِ বা মাথা মাসাহ সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ مِقْدَارُ النَّاصِيَةِ الخ ঃ আহনাফের মাযহাব ঃ পুরো মাথা মাসাহ ফরয না আংশিক ফরয এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে মতান্তর রয়েছে।

১. হানাফীদের নিকট মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করা ফরয। কেননা, কুরআন পুরো মাথা মাসাহ করার নির্দেশ দেয়নি; বরং (وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ) মাথার কোন অংশ মাসাহ করা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর সে অংশের ব্যাখ্যা হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ)-এর হাদীসে পাওয়া যায়। তাহল "মহানবী (সাঃ) একবার কোন কওমের আবর্জনা ফেলবার স্থানে গমন করে পেশাব করলেন, অতঃপর ওযূ করলেন এবং নাসিয়া পরিমাণ ও মোজাদ্বয় মাসাহ করলেন।

নাসিয়ার পরিমাণ ঃ মাথা মোট চার ভাগে বিভক্ত ঃ ১. نَاصِيَة (নাসিয়া) মাথার সম্মুখের অংশ, ২. قِذَال (ক্বিযাল) মাথার পিছনের অংশ, ৩-৪. فَوْدَان (ফাওদান) উভয় কানের সংলগ্ন অংশ। এ হিসেবে নাসিয়া মাথার এক চতুর্থাংশ হবে। এ জন্যই হানাফীগণ মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করাকে ফরয বলে থাকেন।

ইমাম মালিকের মাযহাব ঃ ইমাম মালিক (রঃ)-এর মতে, সমস্ত মাথা মাসাহ করা ফরয। তাঁর দলিল হল, পবিত্র কুরআনে তায়াম্মুম সম্পর্কীয় আয়াতে فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ সমস্ত মুখমণ্ডল মাসাহ করতে বলা হয়েছে। এটা সর্বসম্মত। কাজেই ওযূতেও পুরো মাথা মাসাহ করা ফরয।

জবাব ঃ হানাফীগণ এর উত্তরে বলেন যে, পবিত্রতা অর্জনের জন্য ওযূ হল মৌলিক, আর তায়াম্মুম হল তার প্রতিনিধি। কাজেই তায়াম্মুমের ওপর কিয়াস করে ওযূর হুকুম সাব্যস্ত করা যাবে না।

ইমাম শাফিয়ীর মাযহাব ঃ ইমাম শাফিয়ী হতে দু'টি বর্ণনা পাওয়া যায়—

১. তাঁর নতুন মতানুসারে কমপক্ষে তিনটি চুল পরিমাণ মাসাহ করা ফরয।

২. আর পূর্বতম মত হল, কমপক্ষে যেটুকু মাসাহ করলে মাসাহ বলা যায় তাই ফরয।

তাঁর যুক্তি ঃ তিনি বলেন, কুরআনের আয়াতের নির্দেশ শর্তহীন বা মুতলাক, হাদীস দ্বারা কুরআনের শর্তহীন (مُطْلَق)-কে শর্তযুক্ত (مُقَيَّد) করা অবৈধ।

জবাব ঃ হানাফীগণ এর জবাবে বলেন যে, কুরআনের উক্ত আয়াত মুতলাক নয়; বরং মুজমাল বা অস্পষ্ট। হাদীস দ্বারা মুজমালকে ব্যাখ্যা করা বৈধ। কাজেই হযরত মুগীরা (রাঃ)-এর হাদীস দ্বারা মাথার এক চতুর্থাংশ মাসাহ করলে ফরয আদায় হয়ে যাবে।

وَسُنَنُ الطَّهَارَةِ غَسْلُ الْيَدَيْنِ ثَلَاثًا قَبْلَ اِدْخَالِهِمَا الْاِنَاءَ اِذَا اسْتَيْقَظَ الْمُتَوَضِّيْ مِنْ نَوْمِهٖ وَتَسْمِيَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى فِىْ اِبْتِدَاءِ الْوُضُوْءِ وَالسِّوَاكُ وَالْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ وَمَسْحُ الْاُذُنَيْنِ وَتَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ وَالْاَصَابِعِ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ اِلَى الثَّلٰثِ وَيَسْتَحِبُّ لِلْمُتَوَضِّىْ اَنْ يَّنْوِىَ الطَّهَارَةَ وَيَسْتَوْعِبَ رَأْسَهٗ بِالْمَسْحِ وَيُرَتِّبُ الْوُضُوْءَ فَيَبْتَدِأُ بِمَا بَدَأَ اللّٰهُ تَعَالٰى بِذِكْرِهٖ وَبِالْمَيَامِنِ وَالتَّوَالِىْ وَمَسْحُ الرَّقَبَةِ -

ওযূর সুন্নত ও মুস্‌তাহাবসমূহ

সরল অনুবাদ ঃ **ওযূর সুন্নতসমূহ ঃ** (১) ঘুম হতে জাগ্রত হয়ে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবার পূর্বে হস্তদ্বয় তিনবার ধৌত করা, (২) ওযূর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা, (৩) মিসওয়াক করা, (৪) কুলি করা, (৫) নাকে পানি দিয়ে পরিষ্কার করা, (৬) দুই কান মাসাহ করা, (৭) দাড়ি খিলাল করা, (৮) আঙুলসমূহ খিলাল করা, (৯) প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার করে ধৌত করা।

ওযূর মুস্‌তাহাবসমূহ ঃ (১) পবিত্রতা অর্জনের নিয়ত করা, (২) সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা, (৩) ওযূতে নিয়মতান্ত্রিকতা অনুসরণ করা তথা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে যেভাবে শুরু করেছেন সেই তারতীব অনুযায়ী ওযূ আরম্ভ করবে, (৪) ডান দিক হতে শুরু করা, (৫) পর পর ধৌত করা (তথা এক অঙ্গ শুকাবার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা।) এবং (৬) ঘাড় মাসাহ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

سُنَنُ الطَّهَارَةِ বা ওযূর সুন্নতসমূহ ঃ

قَوْلُهٗ غَسْلُ الْيَدَيْنِ الخ ঃ কোন ব্যক্তি ঘুম হতে জাগ্রত হবার পর পানি পাত্রে তার হাত প্রবেশ করাবার পূর্বে হাতকে তিনবার ধুয়ে নিতে হবে। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—

اِذَا اسْتَيْقَظَ اَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهٖ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهٗ فِى الْاِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهٗ فَاِنَّهٗ لَايَدْرِىْ اَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ.

অর্থাৎ "যদি তোমাদের কেউ ঘুম হতে জাগ্রত হয়, তখন হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে প্রবেশ করাবে না। কেননা সে জানে না যে, রাতে তার হাত কোথায় পৌঁছে ছিল।" এর দ্বারা সাব্যস্ত হয় যে, হাত ধোয়া আবশ্যক।

হাত ধোয়ার কতগুলো নিয়ম ঃ

১. দিনে হোক বা রাতে হোক নিদ্রা হতে ওঠলে সর্ব সম্মতিক্রমে হাত ধৌত করা ওয়াজিব, তবে ওযূর প্রয়োজন ছাড়া হাত ধৌত করা মুস্‌তাহাব।

২. সাধারণভাবে হাত অপবিত্র হলে ধৌত করা ওয়াজিব, আর অপবিত্র না হলে ধৌত করা সুন্নত।

৩. ধৌত করবার সময় দুই হাত কনুইসহ ধৌত করা সুন্নত।

৪. তিনবার ধৌত করা সুন্নত।

বিসমিল্লাহ পড়ার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ تَعَالٰى تَسْمِيَةُ اللّٰهِ الخ ঃ ওযূতে বিসমিল্লাহ বলা সুন্নত। বিশুদ্ধ মতানুসারে বিসমিল্লাহ বলা মুস্‌তাহাব। তবে এতে তিনটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য— ১. كَيْفِيَّة (কাইফিয়্যাত), ২. صِفَة (সিফাত), ৩. وقت (ওয়াক্ত)।

১. **কাইফিয়াত বা নিয়ম ঃ** বিসমিল্লাহ দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মে আল্লাহর নাম নেয়া। এক বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى دِيْنِ الْاِسْلَامِ উল্লেখ রয়েছে। অন্য বর্ণনায় بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ পড়া উত্তম বলা হয়েছে। আর

'মুজতাবা' নামক কিতাবে আছে যে, উভয়টি একসাথে পড়বে। আর 'মুহিতে' বর্ণিত আছে যে, যদি لَآاِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ অথ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ অথবা اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الخ এ বাক্য গুলোর মধ্য হতে যে কোন একটি পাঠ করলে জমহুরের নিক বিসমিল্লাহ আদায় হয়ে যাবে। আর কিছুসংখ্যক বলেছেন, প্রথমে اَعُوْذُ بِاللّٰهِ পরে بِسْمِ اللّٰهِ পাঠ করবে।

২. সিফাত বা গুণাগুণ ঃ ইমাম কুদূরী বিসমিল্লাহকে সুন্নত বলেছেন, আর হিদায়া গ্রন্থকার একে মুস্তাহাব হিসে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা বিসমিল্লাহ ছাড়াও রাসূল (সাঃ) ওযূ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

৩. ওয়াক্ত বা সময় ঃ কখন বিসমিল্লাহ পড়বে এ নিয়ে মতান্তর রয়েছে। কেউ বলেন ইস্তিনজার পূর্বে পড়বে, আর কে বলেন পরে। তবে বিশুদ্ধ মত হলো ইস্তিনজা আগে ও পরে উভয় সময়ই বিসমিল্লাহ পাঠ করা যায়। তাহলে ওযূর যাবতী কার্যাবলী বিসমিল্লাহর সাথে আদায় হয়ে যাবে। তবে ইস্তিনজা খানায় প্রবেশ করে বা সতর খোলার পর বিসমিল্লাহ পড়বে ন বরং প্রবেশের পূর্বেই পড়ে নিতে হবে।

মিসওয়াক করার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ اَلسِّوَاكُ ঃ মিসওয়াক করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। কুলি করার সময় মিসওয়াক করতে হবে। মিসওয়াক ওযূর সুন্ন না সালাতের সুন্নত এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে।

শাফিয়ীদের মতে, মিসওয়াক সালাতের সুন্নত। অতএব প্রত্যেক নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করতে হবে। তাঁরা দলি হিসেবে বলেন যে, রাসূল (সাঃ) বলেছেন– لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِىْ لَاَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ

অর্থাৎ যদি আমি আমার উম্মতের ওপর কষ্টকর মনে না করতাম, তবে প্রত্যেক সালাতের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।

হানাফীদের মতে মিসওয়াক ওযূর সুন্নত। তাঁরাও দলিল হিসেবে উল্লিখিত হাদীসটি পেশ করেন। তবে তাঁরা বলেন যে عِنْدَ كُلِّ صَلٰوةٍ -এর মধ্যে وُضُوْءُ শব্দটি উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে عِنْدَ وُضُوْءِ كُلِّ صَلٰوةٍ অর্থাৎ "প্রত্যেক সালাতের ওযূতে"। এছাড়া সালাতের পূর্বে মিসওয়াক করলে মুখ অপরিষ্কার হওয়া ও রক্ত বের হবার সম্ভাবনা থাকে। পক্ষান্তরে ওযূর পূর্বে মিসওয়াক করলে এগুলো দুরিভূত হয়ে যাবে। কাজেই কোন ব্যক্তি যোহরের সময় মিসওয়াক করে ওযূ করে সালাত আদায় করে, আর সে ওযূ দ্বারা যদি আসরের সালাত আদায় করে, তবে হানাফীদের নিকট আসরের সময় দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করতে হবে না; বরং তার প্রথম মিসওয়াকই যথেষ্ট হবে। আর শাফিয়ীদের নিকট আসরের সময় তাকে দ্বিতীয়বার মিসওয়াক করতে হবে।

মিসওয়াক করার নিয়ম ঃ মিসওয়াক দাঁতের ওপরে নিচে না করে ডানে বামে করতে হবে। আর জিহ্বার মিসওয়াক ওপরে নিচে করবে; ডানে বামে তথা পাশের দিকে নয়। মিসওয়াক যাইতুন বা নীম জাতীয় গাছের ডাল দ্বারা করা উত্তম। লম্বায় এক বিগতের বেশি হওয়া ঠিক নয়। আর মিসওয়াক না পাওয়া গেলে কাপড় অথবা ডান হাতের শাহাদাত তথা তর্জনী আঙুল দ্বারা মিসওয়াক করে নেবে।

মিসওয়াকের গুরুত্ব ঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মিসওয়াক মুখের পবিত্রতা দানকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। তিনি আরো বলেছেন, মিসওয়াক করে সালাত পড়লে মিসওয়াক বিহীন সালাত হতে সত্তরগুণ বেশি নেকী হয়।

কুলি করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ اَلْمَضْمَضَةُ ঃ হানাফীদের নিকট কুলি করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা। নিয়ম হল, মুখে তিনবার পানি দেবে এবং প্রত্যেকবার নতুন পানি ব্যবহার করবে। পানি দিয়ে গড়গড়া করে কুলি করতে হবে। সাওম আদায়কারীর জন্য গড়গড়া করা ঠিক নয়। কারণ তাতে পানি ভিতরে প্রবেশ করার সম্ভাবনা রয়েছে। গড়গড়া করে পানি ফেলে দেয়ার নিয়ম। অবশ্য পানি ভিতরে চলে গেলেও কুলি হয়ে যাবে।

কর্ণদ্বয় মাসাহের বিধান ঃ

قَوْلُهُ مَسْحُ الْاُذُنَيْنِ ঃ দুই কান মাসাহ করা সুন্নত দুই হাতের তর্জনী আঙুলদ্বয় কানের ভিতর প্রবেশ করিয়ে নড়াচড়া করবে। আর বৃদ্ধাঙুলি কানের বাহির অংশে ফিরাবে। এতে বোঝা যায় যে, কানের বাহির ও ভিতর উভয় অংশে মাসাহ করতে হবে।

ঘাড় মাসাহের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ مَسْحُ الرَّقَبَةِ ঃ ইমাম ত্বাহাবী (রঃ)-এর মতে, ঘাড় মাসাহ করা সুন্নত। আর ইমাম সদরুশ শহীদ (রঃ)-এর নিকট মুস্তাহাব। হাতের পৃষ্ঠদেশ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করতে হবে। যে পানি দ্বারা মাথা মাসাহ করবে তা দ্বারাই কান মাসাহ করবে, নতুন পানি লওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর মতে, নতুন পানি নিতে হবে।

দাড়ি খিলাল করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ تَخْلِيْلُ اللِّحْيَةِ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, দাড়ি খিলাল করা সুন্নত। কেননা, হযরত জিব্‌রাঈল (আঃ) রাসূল (সাঃ)-কে দাড়ি খিলাল করার জন্য আদেশ করেছেন।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর নিকট দাড়ি খিলাল করা সুন্নতে যায়িদা। দাড়ি যদি ঘন না হয় এবং চামড়া দৃষ্টিগোচর হয়, তবে মুখমন্ডলের সাথে দাড়ি ধৌত করা আবশ্যক। আর ঘন হলে সমস্ত দাড়ি খিলাল করা উত্তম। দাড়ি যদি ঝুলানো থাকে, তবে এক চতুর্থাংশ মাসাহ করতে হবে।

আঙুল খিলাল করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ تَخْلِيْلُ الْاَصَابِعِ ঃ সমস্ত হানাফী ওলামা এ কথার ওপর একমত যে, আঙুল খিলাল করা সুন্নত। কেননা. রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— خَلِّلُوْا اَصَابِعَكُمْ كَيْ لَاتَتَخَلَّلُهَا نَارُ جَهَنَّمَ এটা ফরযের পূর্ণতা সাধন করে। পায়ের আঙুল খিলাল করার পদ্ধতি হল, বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুল দ্বারা খিলাল করবে। যদি পানি পৌঁছে যায় তাহলে খিলাল করা সুন্নত, আর যদি পানি পৌঁছে না থাকে তাহলে খিলাল করা ফরয। খিলাল ডান পায়ের কনিষ্ঠা আঙুল হতে আরম্ভ করে বৃদ্ধা আঙুলে শেষ করবে এবং বাম পায়ের বৃদ্ধা আঙুল হতে শুরু করে কনিষ্ঠা আঙুলে শেষ করবে। দাড়ি খিলাল করাবার নিয়ম হল, নিচ হতে ওপরে হাতের আঙুল দ্বারা খিলাল করবে।

প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَتَكْرَارُ الْغَسْلِ اِلَى الثَّلْثِ ঃ ওযূর মধ্যে প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধোয়া আবশ্যক। প্রথমবার ধৌত করা ফরয, পরবর্তী দু'বার সুন্নত। যদি কোন অংশ শুকনো না থাকে, তবে তিনবারের বেশি ধৌত করা বিদআত। ইমাম নববী (রঃ) বলেছেন, ওলামাগণ এ কথার ওপর একমত যে, প্রত্যেক অঙ্গ একবার ধৌত করা ফরয আর তিনবার ধৌত করা সুন্নত।

مُسْتَحَبَّاتُ الْوُضُوْءِ বা ওযূর মুস্‌তাহাবসমূহ ঃ

قَوْلُهُ وَيَسْتَحِبُّ ঃ গ্রন্থকার ওযূর মুস্‌তাহাব ছয়টি বর্ণনা করেছেন— (১) নিয়ত করা, (২) পুরো মাথা মাসাহ করা, (৩) কুরআনে যেভাবে উল্লিখিত হয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ী করা, (৪) ডান দিক হতে শুরু করা, (৬) এক অঙ্গ শুকাবার পূর্বে অন্য অঙ্গ ধৌত করা ও (৬) ঘাড় মাসাহ করা।

তবে জমহুর ফুকাহার মতে– (১) ডান দিক হতে শুরু করা এবং (২) ঘাড় মাসাহ করা ব্যতীত বাকি চারটি সুন্নত। উল্লিখিত দু'টিই হল মুস্‌তাহাব। তবে গ্রন্থকার اعم। তথা ব্যাপকতার ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন।

ওযূতে নিয়তের বিধান ঃ

قَوْلُهُ اَنْ يَنْوِىَ الطَّهَارَةَ ঃ ওযূর মধ্যে নিয়ত করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। এমন কি دُرُّ الْمُخْتَارِ গ্রন্থকার লেখেছেন। নিয়ত ছেড়ে দিলে পাপ হবে।

ইমাম শাফিয়ী, মালিক ও আহমদ (রঃ)-এর মতে, ওযূতে নিয়ত করা ফরয। তাঁরা দলিল হিসেবে اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ الخ হাদীসটি পেশ করেন। অবশ্য তায়াম্মুমে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর নিকটও নিয়ত ফরয। নিয়ত করার নিয়ম, রাসূল (সাঃ) সর্বদা نَوَيْتُ اَنْ اَتَوَضَّأَ الخ বলতেন। কারো মতে نَوَيْتُ لِرَفْعِ الْحَدَثِ অথবা نَوَيْتُ اِسْتِبَاحَةَ الصَّلٰوةِ অথবা نَوَيْتُ الطَّهَارَةَ এসব বাক্য দ্বারা নিয়্যত করা যায়। বস্তুত মুখে উচ্চারণ নিয়ত নয়; বরং আন্তরিক সংকল্পই হল নিয়ত।

মাথা মাসাহের নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ يَسْتَوْعِبُ رَأْسَهُ بِالْمَسْحِ ঃ পুরো মাথা মাসাহ করা সুন্নত। উভয় হাতের তিন তিন আঙুল মাথার অগ্রভাগে রাখতে হবে। বৃদ্ধা ও তর্জনী অঙুল পৃথক রাখবে এবং হাতদ্বয়ের পেটও পৃথক রাখবে। এরপর মাথার অগ্রভাগ হতে পিছনের দিকে নিয়ে একেবারে নিচে নামাবে। তারপর পিছন হতে হস্তদ্বয়ের পেট দ্বারা সম্মুখ দিকে টেনে এনে বৃদ্ধা আঙুল দ্বারা কানের ওপর এবং তর্জনী দ্বারা কানের ভিতর মাসাহ করবে। অবশেষে হাতের পিঠ দ্বারা ঘাড় মাসাহ করবে। সাবধান! গলা মাসাহ করবে না।

وَالْمَعَانِى النَّاقِضَةُ لِلْوُضُوْءِ كُلُّ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ وَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ إِذَا خَرَجَ مِنَ الْبَدَنِ فَتَجَاوَزَ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيْرِ وَالْقَيْءُ إِذَا كَانَ مِلْأَ الْفَمِ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيْلَ لَسَقَطَ عَنْهُ وَالْغَلَبَةُ عَلَى الْعَقْلِ بِالْإِغْمَاءِ وَالْجُنُوْنِ وَالْقَهْقَهَةُ فِى كُلِّ صَلٰوةٍ ذَاتِ رُكُوْعٍ وَسُجُوْدٍ وَفَرْضُ الْغُسْلِ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاقُ وَغَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ وَسُنَّةُ الْغُسْلِ أَنْ يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ بِغَسْلِ يَدَيْهِ وَفَرْجِهِ وَيُزِيْلَ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدَنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوْءَهُ لِلصَّلٰوةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يُفِيْضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَعَلَى سَائِرِ بَدَنِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ يَتَنَحّٰى عَنْ ذٰلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِى الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُوْلَ الشَّعْرِ -

ওযূ ভঙ্গের কারণসমূহ

সরল অনুবাদ ঃ (১) উভয় পথ তথা পায়খানা-পেশাবের রাস্তা দিয়ে যে কোন বস্তু বের হওয়া, (২) শরীরের কোন স্থান হতে রক্ত, জখমের পানি এবং পুঁজ বের হয়ে এমন স্থানে পৌঁছল যা পবিত্র করণের হুকুম রয়েছে, (৩) বমি যখন মুখ ভরে হয়, (৪) কাত হয়ে নিদ্রা যাওয়া, (৫) অথবা বালিশের ওপর শুয়ে নিদ্রা যাওয়া, (৬) অথবা এমন বস্তুর সাথে হেলান দিয়ে ঘুম যাওয়া, যা সরালে সে পড়ে যাবে, (৭) অজ্ঞান বা মস্তিষ্ক বিকৃতি বশত জ্ঞান হারা হলে, (৮) রুকু সিজদা বিশিষ্ট সালাতে উচ্চৈঃস্বরে (হা হা করে) হাসলে।

গোসলের ফরয ও সুন্নতসমূহ

গোসলের ফরযসমূহ ঃ (১) কুলি করা, (২) নাকে পানি দেয়া, (৩) সমস্ত শরীর ধৌত করা।

গোসলের সুন্নতসমূহ ঃ (১) হস্তদ্বয় ও লজ্জাস্থান ধৌত করে আরম্ভ করা, (২) যদি শরীরের কোন স্থানে নাপাকী লেগে থাকে তবে তা দূর করা, (৩) এরপর সালাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করা, কিন্তু পা দু'খানা ধৌত করবে না। (৪) অতঃপর স্বীয় মাথা ও সমস্ত শরীরে তিনবার পানি প্রবাহিত করবে। তৎপর ঐ স্থান হতে একটু সরে গিয়ে উভয় পা ধৌত করবে। মহিলাদের গোসলের সময় খোঁপা বা বেনী খোলা আবশ্যক নয়; যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌঁছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উভয় পথ দিয়ে যা বের হয় ঃ

قَوْلُهُ مَا خَرَجَ مِنَ السَّبِيْلَيْنِ ঃ পেশাবের রাস্তা দিয়ে যা বের হয়ে থাকে তাহল- পেশাব, বীর্য, মযী, ওদী, পাথরের কণা, কীট এবং হায়েয ও নিফাসের রক্ত। আর পায়খানার দ্বার দিয়ে যা বের হয়ে থাকে, যেমন- পায়খানা, বাতাস, কীট, পানি ইত্যাদি। সর্ব সম্মতিক্রমে এসব বস্তু দ্বারা ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়। তবে বীর্য, হায়েয ও নিফাসের রক্তের দ্বারা গোসল ফরয হয়ে যায়। স্ত্রীলোকের রোগের কারণে পেশাব ও পায়খানার রাস্তা এক হয়ে গেলে আর পেশাবের রাস্তা দিয়ে বাতাস নির্গত হলে ওযূ মুস্তাহাব। কেননা, এ বাতাস পাকস্থলির বাতাস নয়, তাই ওযূ ভঙ্গ হবে না।

রক্ত, পানি ও পুঁজ বের হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالدَّمِ وَالْقَيْحِ وَالصَّدِيْدِ الخ ঃ শরীরের জখমকৃত স্থান হতে রক্ত, পানি বা পুঁজ বের হয়ে যদি গড়িয়ে পড়ে, তবে তাতে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু এসব বস্তু যদি জখমকৃত স্থানের অগ্রভাগে আটকে থাকে তথা গড়িয়ে না পড়ে,

তবে তাতে ওযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি কারো চোখ, কান অথবা নাকের ভিতর ফোঁড়া পেঁকে ফেটে তা হতে পুঁজ, পানি বা রক্ত বাহিরে না এসে সম্পূর্ণ ভিতরে চলে যায়, তাহলে ওযূ ভঙ্গ হবে না। এসব অবস্থাগুলো বের করে দেবার জন্যই গ্রন্থকার مَوْضِعٌ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ বাক্যটি উল্লেখ করেছেন।

বমি সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ وَالْقَيْءُ الخ ঃ বমির মধ্যে যদি পানি অথবা খাদ্যবস্তু অথবা পীতের পানি বের হয় আর তা যদি মুখ ভরে হয়, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর যদি শ্লেষ্মা বা কাশ বের হয়, তাহলে তরফাইনের নিকট ওযূ ভঙ্গ হবে না। কেননা তা নাপাক বস্তুর ওপরে থাকে, খাদ্যবস্তুর সাথে মিলিত হয় না। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট মুখ ভরে কাশ নির্গত হলে ওযূ ভঙ্গ হবে। তবে যদি তা মস্তিষ্ক হতে নির্গত হয়, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে ওযূ ভঙ্গ হবে না। আর যদি বমির মধ্যে জমাট রক্ত বের হয়, তবে মুখ ভরে হলে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর পাতলা হলে শায়খাইনের নিকট ওযূ ভঙ্গ হবার জন্য কোন শর্ত নেই; কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) মুখ ভরে হওয়ার শর্ত আরোপ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, এ মতানৈক্য ঐ রক্ত সম্পর্কে প্রযোজ্য যা পাকস্থালী হতে নির্গত হয়। আর যে রক্ত মস্তিষ্ক হতে বের হবে, তাতে কোন মতান্তর নেই; বরং অল্প হোক আর বেশি হোক সর্বাবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ঘুম সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ النَّوْمُ الخ ঃ চিত বা কাত হয়ে ঘুম গেলে এবং এমন বস্তুতে হেলান দিয়ে ঘুমালে যা সরিয়ে ফেললে সে পড়ে যাবে, তবে এসব অবস্থায় ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। কেননা এসব অবস্থায় তার পায়খানার রাস্তা ঢিলা হয়ে বায়ু বের হবার সম্ভাবনা প্রবল। বেহুঁশ ও মস্তিষ্ক বিকৃতির সময়ও বায়ু বের হবার সম্ভাবনার কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায়।

হাসির প্রকারভেদ ও বিধান ঃ

قَوْلُهُ الْقَهْقَهَةُ الخ ঃ **হাসি মোট তিন রকম ঃ**

১. اَلْقَهْقَهَةُ (আল্-ক্বাহ্ক্বাহাতু) **অট্টহাসি ঃ** এটা ঐ হাসিকে বলে, যার আওয়াজ অন্য লোকে শুনে। এরূপ হাসা শরীয়তে নিষিদ্ধ। বালেগ ব্যক্তি রুকু-সিজদা বিশিষ্ট সালাতে এরূপ হাসলে তার ওযূ ও সালাত উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যাবে। তবে জানাযার সালাত ভঙ্গ হবে না। কেননা তাতে রুকু-সিজদা নেই।

২. ضِحْكٌ (যেহেক) **মৃদু হাসি ঃ** এটা এমন হাসি, যার আওয়াজ হবে না, শুধুমাত্র এ হাসিতে দাঁত দেখা যাবে। এতে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে, তবে ওযূ ভঙ্গ হবে না।

৩. تَبَسُّمٌ (তাবাস্সুম) **মুচকি হাসি ঃ** এ হাসিতে সামান্যও আওয়াজ হবে না এবং সামান্য দাঁতও দেখা যাবে না। এরূপ হাসা শরীয়তে বৈধ। এতে সালাত এবং ওযূ কোনটাই ভঙ্গ হবে না।

গোসলের ফরযসমূহ ঃ

قَوْلُهُ فَرْضُ الْغُسْلِ الخ ঃ **গোসলের ফরয তিনটি ঃ**

১. اَلْمَضْمَضَةُ ঃ গড়গড়া করে কুলি করা। অর্থাৎ এমনভাবে মুখের ভিতর পানি নড়াচড়া করা যে, কণ্ঠনালীর গোড়ায় যেন পানি পৌছে যায় পানি ভিতরে প্রবেশ করার আশঙ্কা থাকলে সাওম অবস্থায় গড়গড়া করা যাবে না।

২. اَلْاِسْتِنْشَاقُ ঃ নাকে পানি দেয়া তথা হাতে পানি নিয়ে হালকাভাবে টান দেয়া, যাতে নাকের শক্ত অংশে পৌছে যায়। এভাবে তিনবার করে প্রত্যেকবার পানি ঝেড়ে ফেলে দেবে। রমযানে এরূপ করা ঠিক নয়।

৩. غَسْلُ سَائِرِ الْبَدَنِ ঃ সমস্ত শরীরে পানি প্রবাহিত করা তথা মাথার ওপর পানি ঢেলে শরীরের সমস্ত অংশে পানি পৌছে দেবে। পুকুরে ডুব দিয়ে করলেও চলবে। এভাবে তিনবার করবে।

স্ত্রীলোকের চুলের খোঁপা খোলার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ الخ ঃ স্ত্রীলোকের জন্য গোসলের সময় চুলের খোঁপা খোলা আবশ্যক নয়, যদি তার চুলের গোড়ায় পানি পৌছে। কেননা, চুলের গোড়ায় পানি পৌছানো আবশ্যক– আগায় নয়। এটাই জমহুর ফকীহদের অভিমত।

ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, (ঋতুস্রাবের অবস্থায় তথা) ফরয গোসলের অবস্থায় মহিলাদের গোসলের সময় চুল খোলা ওয়াজিব। স্ত্রীলোক যদি তার চুলে সুগন্ধি লাগায়, এতে যদি চুলের গোড়ায় পানি পৌছতে না পারে, তবে তা উঠিয়ে ফেলা ওয়াজিব, যাতে গোড়ায় পানি পৌছতে পারে।

وَالْمَعَانِى الْمُوْجِبَةُ لِلْغُسْلِ اِنْزَالُ الْمَنِيِّ عَلٰى وَجْهِ الدَّفْقِ وَالشَّهْوَةِ مِنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَالْتِقَاءُ الْخَتَانَيْنِ مِنْ غَيْرِ اِنْزَالٍ وَالْحَيْضُ وَالنِّفَاسُ وَسَنَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلَ لِلْجُمُعَةِ وَالْعِيْدَيْنِ وَالْاِحْرَامِ وَعَرَفَةَ وَلَيْسَ فِى الْمَذِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ وَفِيْهِمَا الْوُضُوْءُ وَالطَّهَارَةُ مِنَ الْاَحْدَاثِ جَائِزَةٌ بِمَاءِ السَّمَاءِ وَالْاَوْدِيَةِ وَالْعُيُوْنِ وَالْاٰبَارِ وَمَاءِ الْبِحَارِ وَلَا تَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ اُعْتُصِرَ مِنَ الشَّجَرِ وَالثَّمَرِ وَلَا بِمَاءٍ غَلَبَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَاَخْرَجَهُ عَنْ طَبْعِ الْمَاءِ كَالْاَشْرِبَةِ وَالْخَلِّ وَالْمَرَقِ وَمَاءِ الْبَاقِلَّاءِ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَمَاءِ الزَّرْدَجِ وَتَجُوْزُ الطَّهَارَةُ بِمَاءٍ خَالَطَهُ شَيْءٌ طَاهِرٌ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ كَمَاءِ الْمَدِّ وَالْمَاءِ الَّذِىْ يَخْتَلِطُ بِهِ الْاُشْنَانُ وَالصَّابُوْنُ وَالزَّعْفَرَانُ -

গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ

সরল অনুবাদ ঃ গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ হল– (১) যৌন উত্তেজনা বা কামভাবের সাথে পুরুষ কিংবা স্ত্রীলোকের বীর্যপাত হলে, (২) লিঙ্গদ্বয়ের মিলনে বীর্যপাত না হলেও, (৩) স্ত্রীলোকের হায়েয (মাসিক ঋতুস্রাব) এবং নিফাস (প্রসবের পরবর্তী রক্তস্রাব) এরপর পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্ত গোসল ফরয।

আর রাসূল (সাঃ) জুমুআ, দুই ঈদ, ইহরাম বাঁধা এবং আরাফাত দিনের উপস্থিতির জন্য গোসল সুন্নত করেছেন। মযী এবং ওদীতে গোসল ফরয নয়; এতে শুধু ওযূ করলেই চলবে।

আসমানের (বৃষ্টির) পানি, উপত্যকার পানি, (হ্রদ বা বিল) ঝর্না, কূপ ও সমুদ্রের পানি দ্বারা অপবিত্রতা হতে পবিত্রতা অর্জন (ওযূ-গোসল) সিদ্ধ হবে। ফল বা বৃক্ষ হতে নিংড়ানো (চিবানো) পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন (ওযূ-গোসল) জায়েয হবে না এবং ঐ পানি দ্বারাও জায়েয হবে না যাতে অন্য বস্তু প্রাধান্য লাভ করে পানির স্বভাব হতে তাকে বের করে দিয়েছে। যেমন– (শরবত) পানীয় বস্তুসমূহ, সিরকা, শুরবা, তরিতরকারির পানি, গোলাপের পানি এবং গাজরের পানি (ইত্যাদি)। আর ঐ পানি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন জায়েয, যাতে কোন পবিত্র জিনিস মিশ্রিত হয়ে পানির কোন একটি গুণ পরিবর্তন করে দিয়েছে। যেমন– বন্যার পানি এবং ঐ পানি যাতে উশনান, (এক জাতীয় ঘাস যা দ্বারা জামা ধোয়া যায়) সাবান ও জাফরান মিলিত হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বীর্য নির্গত হবার সময় উত্তেজনা শর্ত কিনা?

قَوْلُهُ اِنْزَالُ الْمَنِيِّ الخ ঃ সাধারণত উত্তেজনা বশত বীর্য বের হলে গোসল ফরয হবে। কিন্তু কোন রোগ বা অন্য কোন কারণে বিনা উত্তেজনায় নারী ও পুরুষের বীর্যপাত হলে হানাফীদের নিকট গোসল ফরয হবে না।

আর শাফিয়ীদের নিকট উত্তেজনা বা অনুত্তেজনায় যে কোন ভাবে বীর্যপাত হলে গোসল ওয়াজিব (ফরয) হবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, বীর্য স্বীয় স্থান হতে নির্গত হবার সময় উত্তেজনা শর্ত। বের হবার সময় উত্তেজনা থাকুক বা না থাকুক।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, বীর্যপাত হবার সময় গোসলের জন্য উত্তেজনা শর্ত।

উল্লেখ্য যে, পুরুষ এবং স্ত্রী লিঙ্গ মিলিত হলে বীর্যপাত না হলেও গোসল ফরয হবে।

গোসলের প্রকারভেদ ঃ

قَوْلُهُ اَقْسَامُ الْغُسْلِ الخ ঃ গোসল মোট চার ভাগে বিভক্ত ঃ

১. ফরয গোসল ঃ এটা চারভাগে বিভক্ত ঃ (১) উত্তেজনার সাথে বীর্য নির্গত হলে, (২) লিঙ্গদ্বয়ের মিলনে বীর্যপাত না হলেও, (৩) হায়েযের গোসল ও (৪) নিফাসের গোসল।

২. ওয়াজিব গোসল ঃ তথা মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানো।

৩. সুন্নত গোসল ঃ এটাও চার প্রকারঃ (১) জুমুআর দিনের গোসল, (২) উভয় ঈদের গোসল, (৩) ইহ্‌রাম বাঁধার গোসল, (৪) আরাফাতের ময়দানে উপস্থিত হবার জন্য সে দিনের গোসল।

৪. মুস্‌তাহাব গোসল ঃ মুস্‌তাহাব গোসল কয়েক প্রকার। যেমন– (১) কাফির হতে মুসলমান হলে, (২) বালেগ হবার পরে গোসল ও (৩) পাগলের জ্ঞান ফিরে আসার পরে গোসল করা ইত্যাদি।

মযী ও ওদীর মধ্যে পার্থক্য ঃ মযী বলা হয় ঐ পিচ্ছিল পদার্থকে, যা উত্তেজনার প্রথম অবস্থায় প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের হয়। এতে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায়।

আর ওদী বলা হয় ঐ পিচ্ছিল পদার্থকে, যা বীর্য স্খলনের পর কখনো দুই এক ফোটা খুব ধীর গতিতে বেরিয়ে আসে অথবা পেশাবের আগে ও পরে যে সাদা বস্তু বের হয় তা-ই হল ওদী।

মযী এবং ওদী বের হবার ফলে ওযূ ভেঙ্গে যায়, তবে গোসল ওয়াজিব হয় না। লিঙ্গ ও অন্ডকোষ ধৌত করে ওযূ করা আবশ্যক।

حُكْمُ مَاءِ الْاَوْدِيَةِ বা উপত্যকার পানির হুকুম ঃ

اَوْدِيَةٌ শব্দটি وَادِىٌ-এর বহুবচন। এর অর্থ হল বন-জঙ্গল তথা যে পানি অধিবাসীদের আওতাধীন নয়, যার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন সুব্যবস্থা নেই, আর নাপাকী পড়বারও যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

এরূপ পানিতে যদি প্রকাশ্যে কোন নাপাকী দৃষ্টিগোচর না হয়, তখন ঐ পানি পাক বলে ধরে নিতে হবে। এটা দ্বারা ওযূ ও গোসল জায়েয হবে। কেননা অপবিত্রতার সম্ভাবনা দ্বারা পানি অপবিত্র হয় না।

পানির প্রকারভেদ ঃ পানি মোট দু'ভাগে বিভক্ত ঃ (১) مَاءٌ مُطْلَقٌ (মায়ে মুত্বলাক), (২) مَاءٌ مُقَيَّدٌ (মায়ে মুকাইয়্যাদ)।

১. مَاءٌ مُطْلَقٌ ঃ এটা ঐ পানিকে বলা হয়, যা আসমান হতে অবতীর্ণ গুণের ওপর বিদ্যমান থাকে।

২. مَاءٌ مُقَيَّدٌ ঃ যে পানি আসমান হতে অবতীর্ণ গুণের ওপর বিদ্যমান থাকে না, তাকে مَاءٌ مُقَيَّدٌ বলা হয়।

পানির গুণাবলীর বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ فَغَيَّرَ اَحَدَ اَوْصَافِهِ الخ ঃ ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর সর্বসম্মত যে, পানির তিনটি গুণ রয়েছে রং, স্বাদ ও গন্ধ। সুতরাং পানিতে কোন পবিত্র বস্তু মিশ্রিত হয়ে গেলে অথবা অনেক দিন পর্যন্ত অবস্থান করে থাকলে যদি উহার একটি গুণ পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহলে ঐ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল বৈধ হবে। আর দু'টি গুণ নষ্ট হয়ে গেলে তা দ্বারা ওযূ-গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

উল্লেখ্য যে, ওলামাদের মতে শীতকালে যে পুকুর বা হাউজের পানিতে গাছের পাতা পড়ে পানির রং, গন্ধ ও স্বাদ পরিবর্তন করে দেয়, তখন এ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল জায়েয, তবে পানির স্বীয় স্বভাব তথা তরলতা থাকতে হবে।

উশনানের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ الْاُشْنَانُ ঃ এটা এক প্রকার ঘাস, যা ভূমিতে উৎপাদন হয়। এটা দ্বারা মানুষ কাপড় ধৌত করে। উশনানের পানি গাঢ় হয়ে গেলে তা দ্বারা ওযূ-গোসল বৈধ হবে না। এমনিভাবে সাবানের পানিও গাঢ় হয়ে গেলে তা দ্বারা ওযূ-গোসল জায়েয হবে না।

জাফরানের পানির হুকুম ঃ

قَوْلُهُ الزَّعْفَرَانُ ঃ হানাফীদের নিকট জাফরানের পানি দ্বারা ওযূ-গোসল সবই বৈধ। শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী জাফরানের পানি দ্বারা ওযূ-গোসল বৈধ নয়। আর হানাফীরা বলেন, গোলাপের পানি দ্বারা ওযূ গোসল বৈধ নয়। কেননা, এ পানি ঐ রসকে বলা হয়, যা গোলাপ হতে বের করা হয়– পানির সাথে গোলাপ মিশ্রণ করা পানি নয়। পক্ষান্তরে জাফরানের পানি দ্বারা ওযূ-গোসল জায়েয। কেননা, জাফরান হতে নির্গত রসকে জাফরানের পানি বলা হয় না; বরং যে পানিতে জাফরান মিশানো হয়, তাকে জাফরানের পানি বলা হয়। তবে জাফরানের পানি যদি অধিক গাঢ় হয়ে যায়, তবে তা দ্বারাও ওযূ-গোসল বিশুদ্ধ হবে না।

وَكُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ لَمْ يَجُزِ الْوُضُوْءُ بِهٖ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحِفْظِ الْمَاءِ مِنَ النَّجَاسَةِ فَقَالَ لَايَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ وَلَا يَغْتَسِلَنَّ فِيهِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهٖ فَلَا يَغْمِسَنَّ يَدَهٗ فِي الْإِنَاءِ حَتّٰى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا فَإِنَّهٗ لَايَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهٗ ، وَأَمَّا الْجَارِي إِذَا وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنْهُ إِذَا لَمْ يُرَ لَهَا أَثَرٌ لِأَنَّهَا لَاتَسْتَقِرُّ مَعَ جَرَيَانِ الْمَاءِ وَالْغَدِيرُ الْعَظِيمُ الَّذِي لَايَتَحَرَّكُ أَحَدُ طَرَفَيْهِ بِتَحْرِيكِ الطَّرَفِ الْاٰخَرِ إِذَا وَقَعَتْ فِي أَحَدِ جَانِبَيْهِ نَجَاسَةٌ جَازَ الْوُضُوْءُ مِنَ الْجَانِبِ الْاٰخَرِ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ النَّجَاسَةَ لَاتَصِلُ إِلَيْهِ وَمَوْتُ مَالَيْسَ لَهٗ نَفْسٌ سَائِلَةٌ فِي الْمَاءِ لَايُفْسِدُ الْمَاءَ كَالْبَقِّ وَالذُّبَابِ وَالزَّنَابِيرِ وَالْعَقَارِبِ وَمَوْتُ مَايَعِيشُ فِي الْمَاءِ لَايُفْسِدُ الْمَاءَ كَالسَّمَكِ وَالضِّفْدَعِ وَالسَّرَطَانِ -

পানিতে নাপাকী পড়লে তা পাক করার বিধান

সরল অনুবাদ ঃ প্রত্যেক আবদ্ধ পানি কম হোক আর বেশি হোক যদি তাতে নাপাকী পতিত হয়, তবে তা দ্বারা ওযূ করা জায়েয হবে না। কেননা নবী কারীম (সাঃ) নাপাকী হতে পানিকে সংরক্ষণ করার জন্য নির্দেশ দিয়ে বলেছেন যে, তোমাদের কেউ যেন বদ্ধ পানিতে পেশাব না করে, আর তাতে যেন কেউ অপবিত্রতার গোসল না করে। রাসূল (সাঃ) আরো বলেছেন, "তোমাদের কেউ নিদ্রা হতে জাগ্রত হলে তিনবার হাত ধৌত না করে পানির পাত্রে হাত প্রবেশ করাবে না। কেননা সে জানেনা যে তার হাত রাতে কোথায় যাপন করেছে।" কিন্তু প্রবাহিত পানিতে নাজাসাত পতিত হলে যদি তার কোন চিহ্ন দেখা না যায়, তবে তাতে ওযূ জায়েয হবে। কেননা পানি প্রবাহের কারণে অপবিত্র বস্তু স্থির থাকতে পারে না। আর বড় পুকুর যার এক পার্শ্ব নাড়া দিলে অন্য পার্শ্ব (তথা পানি) নড়ে উঠে না। যদি এর এক পার্শ্বে নাজাসাত পতিত হয়, তবে অন্য পার্শ্বে ওযূ জায়েয। কেননা এটা প্রকাশ্য যে, সে কিনারায় নাপাকী পৌঁছেনি। পানিতে প্রবহমান রক্তবিহীন প্রাণীর মৃত্যুতে পানিকে অপবিত্র করে না। যেমন– মশা, মাছি, ভীমরুল ও বিচ্ছু। আর পানিতে বসবাসকারী প্রাণীর মৃত্যুতেও পানিকে নষ্ট করে না। যেমন– মাছ, ব্যাঙ ও কাঁকড়া (ইত্যাদি)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বদ্ধ পানির পরিচয় ঃ

قَوْلُهٗ كُلُّ مَاءٍ دَائِمٍ الخ ঃ স্থির পানি বলতে যেমন– ছোট পুকুর বা হাউজের পানি। এরূপ পানিতে অপবিত্র বস্তু পড়লে সাথে সাথে নাপাক হয়ে যাবে। এরূপ পানি দ্বারা ওযূ বিশুদ্ধ হবে না।

প্রবাহিত পানির পরিচয় ঃ

قَوْلُهٗ اَلْمَاءُ الْجَارِي الخ ঃ প্রবাহিত পানি কাকে বলে? এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে–

১. কিছু সংখ্যক বলেন, যে পানিতে খড়কুটা নিক্ষেপ করলে প্রবাহিত হয়ে চলে যায়, তাকে মায়ে জারী বলা হয়।

২. কারো মতে, যাকে জনসাধারণ প্রবাহিত পানি বলে মনে করে তা-ই প্রবাহিত পানি।

৩. কেউ কেউ বলেন, যেখানে প্রথম অঞ্জলিতে যে পানি ওঠে তা দ্বিতীয় অঞ্জলিতে ওঠে না তা-ই প্রবাহিত পানি।

এরূপ পানিতে নাপাকী পড়লে তার চিহ্ন দেখা না গেলে ওযূ বিশুদ্ধ।

বড় পুকুরের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ الْغَدِيْرُ الْعَظِيْمُ الخ ঃ বড় পুকুরের পরিচয় সম্পর্কেও মতান্তর রয়েছে—

কিছু সংখ্যকের মতে, যার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ কমপক্ষে ১০ × ১০ হাত হয়, তাকে বড় পুকুর বলা হয়। তবে গভীরতা সাধারণত অঞ্জলি ভরে পানি নিতে যেন পানি ঘোলা না হয়।

তবে হানাফীদের সর্বসম্মত অভিমত হল, যার এক প্রান্ত নাড়া দিলে অন্য প্রান্তের পানি নড়ে ওঠে না, তাকে বড় পুকুর বলা হয়। এ নাড়ার বিষয়েও মতভেদ রয়েছে—

শায়খাইনের অভিমত হল গোসলের সময় যে হরকত হয় তা ধর্তব্য।

ইমাম মুহাম্মদের এক রিওয়ায়াত হল, শুধু হাত ধৌত করণের নড়া ধর্তব্য। আর দ্বিতীয় মত হল, ওযূ করতে যে হরকত হয়, তা-ই হরকত বা নড়া হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে।

প্রবহমান রক্তবিহীন প্রাণীর হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَوْتُ مَالَيْسَ لَهُ نَفْسٌ سَائِلَةٌ الخ ঃ نَفْسٌ سَائِلَةٌ বলতে প্রবহমান রক্তকে বোঝানো হয়েছে।

জমহুর হানাফী এবং ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর এক মত অনুযায়ী যেসব প্রাণীর প্রবহমান রক্ত নেই যেমন- মাছি, মশা, ছারপোকা, বোলতা ইত্যাদি এগুলোর মৃত্যুতে পানি নাপাক হবে না।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর দ্বিতীয় মত হল, এসব প্রাণীর মৃত্যুর ফলেও পানি নাপাক হয়ে যাবে।

তবে মধুর মৌমাছি এবং ফুলের পোকা এগুলো মরলে তা নাপাক হবে না। কেননা তখন নিরুপায় অবস্থায় একে পাক বলতে হয়।

আমরা হানাফীরা স্বমতের পক্ষে হযরত সালমান (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করি। যখন রাসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, যেসব প্রাণীর প্রবাহিত রক্ত নেই সেগুলা কোন খাদ্য ও পানীয় জাতীয় বস্তু রক্ষিত পাত্রে পড়ে মৃত্যুবরণ করলে তখন তার হুকুম কি? রাসূল (সাঃ) জবাবে বলেছেন- هٰذَا هُوَ الْحَلَالُ اَكْلُهُ وَشُرْبُهُ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ

অর্থাৎ উহা খাওয়া এবং পান করা হালাল এবং উহা হতে ওযূ করাও বৈধ।

وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ لَا يَجُوزُ اِسْتِعْمَالُهُ فِي طَهَارَةِ الْاَحْدَاثِ وَالْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ كُلُّ مَاءٍ اُزِيْلَ بِهِ حَدَثٌ اَوِ اسْتُعْمِلَ فِي الْبَدَنِ عَلٰى وَجْهِ الْقُرْبَةِ وَكُلُّ اِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ جَازَتِ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْوُضُوْءُ مِنْهُ اِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيْرِ وَالْاٰدَمِيِّ وَشَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرَانِ وَ اِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ نُزِحَتْ وَكَانَ نَزْحُ مَافِيْهَا مِنَ الْمَاءِ طَهَارَةً لَهَا فَاِنْ مَاتَتْ فِيْهَا فَارَةٌ اَوْ عُصْفُوْرَةٌ اَوْ صَعْوَةٌ اَوْ سُوْدَانِيَّةٌ اَوْ سَامُ اَبْرَصَ نُزِحَ مِنْهَا مَا بَيْنَ عِشْرِيْنَ دَلْوًا اِلٰى ثَلٰثِيْنَ بِحَسَبِ كِبَرِ الدَّلْوِ اَوْ صِغَرِهَا وَاِنْ مَاتَتْ فِيْهَا حَمَامَةٌ اَوْ دَجَاجَةٌ اَوْ سِنَّوْرٌ نُزِحَ مِنْهَا مَابَيْنَ اَرْبَعِيْنَ دَلْوًا اِلٰى خَمْسِيْنَ -

সরল অনুবাদ ঃ অপবিত্রতাসমূহ হতে পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্ত ব্যবহৃত পানি ব্যবহার করা জায়েয নেই। মায়ে মুস্তা'মাল বা ব্যবহৃত পানি ঐ সব পানিকে বলা হয়, যা দ্বারা নাপাকী দূর করা হয়েছে অথবা নৈকট্য অর্জনের জন্য শরীরে ব্যবহার করা হয়েছে।

শূকর ও মানুষের চামড়া ব্যতীত বাকি সকল (কাঁচা) চামড়া দাবাগত (সংস্কার) করার দ্বারা পাক হয়ে যায়। তাতে সালাত পড়া এবং (তাতে রক্ষিত পানি দ্বারা) ওযূ করা জায়েয। আর মৃতের পশম ও হাড় পবিত্র।

যদি কোন কূপে নাপাকী পতিত হয়, তা উঠিয়ে ফেলতে হবে। আর কূপের সমস্ত পানি উঠিয়ে ফেলা কূপের পবিত্রতা। যদি কোন কূপে ইঁদুর, চড়ুই বা ছোট পাখি, টুনটুনি, গিরগিট অথবা টিকটিকি পড়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে বালতির ছোট বড় তারতম্য অনুযায়ী ২০ হতে ৩০ বালতি পানি কূপ হতে তুলে ফেলে দিতে হবে। আর যদি কবুতর, মুরগি অথবা বিড়াল পড়ে মারা যায়, তবে ৪০ হতে ৫০ বালতি পানি তা হতে তুলে ফেলে দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ব্যবহৃত পানির পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اَلْمَاءُ الْمُسْتَعْمَلُ الخ ঃ ব্যবহৃত পানি বলতে সেসব পানি, যা ওযূ-গোসল করার সময় শরীর হতে ঝড়ে পড়ে। শরীরের সাথে যতক্ষণ লেগে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যবহৃত পানি বলা যাবে না। ব্যবহৃত পানির হুকুম সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে তিনটি মত পাওয়া যায়—

১. হাসান ইবনে যিয়াদের বর্ণনায়, এটা নাজাসাতে গলীযা তথা প্রকৃত নাপাকী। এ মত অগ্রহণীয়।

২. ইমাম আবূ ইউসুফের বর্ণনায়, এটা যেসব প্রাণীর গোশ্‌ত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর পেশাবের ন্যায় নাজাসাতে খফীফা।

৩. ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর বর্ণনায়, এ পানি নিজে পাক, কিন্তু অন্যকে পাক করতে পারে না। আর এ কথার ওপর সকলে একমত হয়েছেন।

চামড়া দাবাগাত সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ كُلُّ اِهَابٍ الخ ঃ কাঁচা চামড়াকে দাবাগাত করলে পবিত্র হয়ে যায়। দাবাগাত করার পদ্ধতি দু'টি—

১. লবণ বা ঔষধ দিয়ে রোদ্রে শুকিয়ে পাকানো।

২. আর শুধু রোদ্রে শুকিয়ে দাবাগত বা সংস্কার করা।

প্রথম অবস্থায় দাবাগাত করলে চামড়া কখনো অপবিত্র হয় না।

আর দ্বিতীয় অবস্থায় দাবাগাত করার পর যদি পানিতে ডুবে বিকৃত হয়ে যায়, তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতে দু'টি মত পাওয়া যায়। প্রথম মতানুযায়ী তা নাপাক হয়ে যাবে, আর দ্বিতীয় মত হল তা নাপাক হবে না। এ মতই অধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য বলে ইমাম মুহাম্মদ ও ত্বাহাবী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন।

শূকর ও মানুষের চামড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِلَّا جِلْدَ الْخِنْزِيرِ وَالْآدَمِيِّ ঃ শূকর ও মানুষের চামড়া দাবাগাত করলেও পবিত্র হবে না। কেননা,

১. শূকর হলো নাজাসাতে আইন বা প্রকৃত নাজাসাত, তাই দাবাগাত করলে তা কখনো পাক হবে না।

২. মানুষের চামড়া দাবাগাত করে ব্যবহার করলে অত্যন্ত অসম্মান করা হয়, তাই তা দাবাগাত করলেও পাক হবে না।

উল্লেখ্য যে, হিদায়া গ্রন্থকার কুকুরকে প্রকৃত নাপাকী বলে সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই এটাও দাবাগাত করলে পাক হবে না। কাযী যহীরুদ্দীন বলেছেন— কুকুরের চামড়া নাপাক কিন্তু পশম পাক। এটাই গ্রহণযোগ্য মত।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হাতিকেও প্রকৃত নাপাকী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু শায়খাইন হাতিকে হিংস্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কাজেই হাতির চামড়াকে দাবাগত করলে পাক হবে।

মৃতের হাড় ও লোম সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ شَعْرُ الْمَيْتَةِ وَعَظْمُهَا طَاهِرَانِ ঃ মৃতের লোম পাক, আর হাড়ও পাক যদি তাতে রক্ত বা গোশ্ত না থাকে। তবে শূকরের লোম ও হাড় কিছুই পাক নয়। অতএব যে পানিতে শূকরের লোম বা হাড় পতিত হবে তা নাপাক বলে গণ্য হবে। এমনিভাবে ঐ সব প্রাণীর ক্ষুর, শিং এবং রগও পবিত্র।

কূপে নাপাকী পড়লে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ إِذَا وَقَعَتْ فِي الْبِئْرِ نَجَاسَةٌ ঃ কূপের মধ্যে নাপাকী পড়লে তার পানি অপবিত্র হয়ে যায়, কাজেই নাপাকী তুলে ফেলার পর তার পানি বের করে ফেলে দিতে হবে। যেমন- পেশাব বা পায়খানা পতিত হলে তার সব পানি ফেলে দিতে হবে। অবশ্য কূপের দেয়াল এবং মাটি সরিয়ে ফেলতে হবে না।

ইঁদুর বা তৎসমতুল্য প্রাণী সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ مَاتَتْ فِيهَا فَارَةٌ الخ ঃ কূপের পানিতে যদি ইঁদুর, চড়ুই বা তৎসমতুল্য প্রাণী পড়ে মারা যায়, তাহলে মৃতপ্রাণী তুলে ফেলার পর সে কূপ হতে ২০ হতে ৩০ বালতি পানি ফেলে দিলে কূপের পানি পবিত্র হয়ে যাবে।

আর কবুতর, মুরগি বা তৎসমতুল্য প্রাণী পড়ে মৃত্যুবরণ করলে ৪০ থেকে ৬০ বালতি পানি বের করে ফেলে দিতে হবে।

আর কুকুর ছাগল বা তৎসমতূল্য প্রাণী পড়ে মারা যায়, তবে কূপের সমস্ত পানি তুলে ফেলে দিতে হবে।

আর যদি দু'টি ইঁদুর পড়ে মরে যায়, তবে শায়খাইনের মতে ২০ হতে ৩০ বালতি পানি ফেললে চলবে।

যদি তিনটি ইঁদুর পড়ে মারা যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) -এর মতে ৪০ হতে ৬০ বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। এমনিভাবে নয়টি পর্যন্ত এ হুকুম বর্তাবে।

আর যদি ১০টি ইঁদুর পড়ে মারা যায়, তবে কূপের সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে।

উল্লেখ্য যে, গরু ও ছাগলের বিষ্টা বা মল যদি বেশি পরিমাণ পড়ে, তবে পানি নাপাক হয়ে যাবে এবং মোরগের বিষ্টা পড়লেও পানি নাপাক হয়ে যাবে, তখন সমস্ত পানি ফেলে দেয়া আবশ্যক।

চড়ুই ও কবুতরের মল পড়লে হানাফীদের নিকট কূপের পানি অপবিত্র হবে না, শাফিয়ীদের নিকট অপবিত্র হবে।

وَاِنْ مَاتَ فِيْهَا كَلْبٌ اَوْ شَاةٌ اَوْ اٰدَمِيٌّ نُزِحَ جَمِيْعُ مَافِيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَاِنْ اِنْتَفَخَ الْحَيَوَانُ فِيْهَا اَوْ تَفَسَّخَ نُزِحَ جَمِيْعُ مَا فِيْهَا صَغُرَ الْحَيَوَانُ اَوْ كَبُرَ وَعَدَدُ الدِّلَاءِ يُعْتَبَرُ بِالدَّلْوِ الْوَسْطِ الْمُسْتَعْمَلِ لِلْاٰبَارِ فِى الْبُلْدَانِ فَاِنْ نُزِحَ مِنْهَا بِدَلْوٍ عَظِيْمٍ قَدْرَ مَايَسَعُ مِنَ الدِّلَاءِ الْوَسْطِ اُحْتُسِبَ بِهٖ وَاِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِيْنًا لَايُنْزَحُ وَ وَجَبَ نَزْحُ مَافِيْهَا اَخْرَجُوْا مِقْدَارَ مَا فِيْهَا مِنَ الْمَاءِ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنَّهٗ قَالَ يُنْزَحُ مِنْهَا مِأَتَا دَلْوٍ اِلٰى ثَلٰثِمِائَةٍ وَاِذَا وُجِدَ فِى الْبِئْرِ فَارَةٌ مَيْتَةٌ اَوْ غَيْرُهَا وَلَا يَدْرُوْنَ مَتٰى وَقَعَتْ وَلَمْ تَنْتَفِخْ وَلَمْ تَنْفَسِخْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اِذَا كَانُوا تَوَضَّئُوْا مِنْهَا وَغَسَلُوْا كُلَّ شَيْءٍ اَصَابَهٗ مَاؤُهَا وَاِنْ اِنْتَفَخَتْ اَوْ تَفَسَّخَتْ اَعَادُوْا صَلٰوةَ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ عَلَيْهِمْ اِعَادَةُ شَيْءٍ حَتّٰى يَتَحَقَّقُوْا مَتٰى وَقَعَتْ وَسُؤْرُ الْاٰدَمِيِّ وَمَا يُؤْكَلُ لَحْمُهٗ طَاهِرٌ وَسُؤْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ وَسِبَاعِ الْبَهَائِمِ نَجِسٌ وَسُؤْرُ الْهِرَّةِ وَالدَّجَاجَةِ الْمُخَلَّاةِ وَسِبَاعِ الطُّيُوْرِ وَمَا يَسْكُنُ فِى الْبُيُوْتِ مِثْلَ الْحَيَّةِ وَالْفَارَةِ مَكْرُوْهٌ وَسُؤْرُ الْحِمَارِ وَالْبَغْلِ مَشْكُوْكٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدِ الْاِنْسَانُ غَيْرَهٗ تَوَضَّأَ بِهٖ وَتَيَمَّمَ وَبِاَيِّهِمَا بَدَأَ جَازَ –

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি কুকুর বা ছাগল অথবা মানুষ কূপে পড়ে মৃত্যুবরণ করে, তখন সমস্ত পানিই তুলে ফেলে দিতে হবে। মৃত প্রাণী যদি পানিতে ফুলে যায় অথবা ফেটে (বা গলে) যায়, তবে ছোট হোক বা বড় হোক সমস্ত পানিই ফেলে দিতে হবে। বালতির সংখ্যা গণনায় ধর্তব্য হবে মধ্যম ধরনের বালতি, যা শহরের কূপ সমূহে পানি উঠাতে ব্যবহৃত হয়। অতএব যদি বড় বালতি দ্বারা এমন পরিমাণ পানি উঠানো হয়, যা মধ্যম ধরনের বালতি সমূহে ধরে, তাহলে ঐ মধ্যম ধরনের বালতি দ্বারা উহার হিসাব করা হবে। আর যদি কূপ প্রবহমান হয়, যার সমস্ত পানি উঠানো সম্ভব নয় তখন অনুমান করে তাতে যে পরিমাণ পানি আছে তা ফেলে দেয়া অবশ্য কর্তব্য। মুহাম্মদ ইবনে হাসান (রহঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন, এরূপ কূপ হতে দু'শত হতে তিনশত বালতি পানি ফেলে দিতে হবে। যদি কূপের ভিতর ইঁদুর বা অনুরূপ কিছু মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং কখন পড়েছে তা জানা যায়নি অথচ ফুলেনি এবং ফাটেওনি এ কূপের পানি দ্বারা ওযূ করে থাকলে একদিন ও এক রাত্রের সালাত পুনরায় পড়তে হবে এবং যে সমস্ত জিনিসে ঐ পানি লেগেছে সে সমস্ত বস্তু ধুয়ে নিতে হবে। আর যদি ফুলে বা ফেটে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, তিনদিন তিন রাতের সালাত পুনরায় পড়তে হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, কখন পতিত হয়েছে তা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কিছুই পুনরায় করতে হবে না।

উচ্ছিষ্টের বিধান

মানুষ এবং যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া যায় তাদের উচ্ছিষ্ট পাক। কুকুর, শূকর এবং হিংস্র জন্তুর উচ্ছিষ্ট অপবিত্র। বিড়াল, ছাড়া মুরগি, হিংস্র পাখি এবং যা পানিতে বসবাস করে, যেমন– সাপ, ইঁদুর ইত্যাদি এদের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। আর গাধা এবং খচ্চরের উচ্ছিষ্ট মাশকূক (সন্দেহযুক্ত)। যদি মানুষ এ (মাশকূক) পানি ছাড়া আর কোন পানি না পায়, তবে এটা দ্বারা ওযূ করবে এবং তায়াম্মুমও করবে। এক্ষেত্রে ওযূ ও তায়াম্মুমের যে কোনটি আগে করলে জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুকুর জীবন্ত বেরিয়ে এলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ مَاتَ فِيْهَا كَلْبٌ الخ ঃ গ্রন্থকার কূপের মধ্যে কুকুরের মৃত হবার হুকুম বর্ণনা করেছেন। কুকুর কূপে পড়ে জীবন্ত অবস্থায় বেরিয়ে এলেও কূপের সমস্ত পানি ফেলে দিতে হবে। এমনিভাবে যেসব প্রাণীর উচ্ছিষ্ট হারাম, যেমন– শূকর, শৃগাল এবং যেসব প্রাণীর উচ্ছিষ্ট মাশকূক (সন্দেহযুক্ত), যেমন– গাধা। এসব প্রাণী কূপে পড়ে জীবন্ত বেরিয়ে এলেও কূপের সব পানি ফেলে দিতে হবে।

বালতির গণনার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ عَدَدُ الدِّلَاءِ الخ ঃ ওলামায়ে কিরাম সর্বসম্মত যে, বালতির গণনা আবশ্যক নয়; বরং অনুমান করে ফেললেও চলবে। মধ্যম ধরনের বালতির হিসাবে বের করতে হবে। অতএব যে অবস্থায় ১০ বালতি ফেলতে হয় সে অবস্থায় বড় একটি ঢোল দ্বারা যদি একবারই সে পরিমাণ পানি ফেলে দেয়া হয়, তবে কূপটি পবিত্র হয়ে যাবে।

প্রবহমান কূপের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ الْبِئْرُ مَعِيْنًا الخ ঃ যে কূপের তলদেশ দিয়ে অনবরত পানি বের হয় তার সমস্ত পানি অনুমান করে বের করতে হবে। তবে এ বিষয়ে অনেকগুলো মত পাওয়া যায়। আবূ হানীফা (রহঃ) হতে দু'টি কাওল পাওয়া যায়–

১. কূপের মালিকদের কথাই গৃহীত হবে অর্থাৎ তারা যদি বলে যে, আমাদের কূপে এ পরিমাণ পানি রয়েছে, তাই গ্রহণযোগ্য।

২. অথবা দু'জন ব্যক্তি কূপে নেমে পানি অনুমান করে বলবে যে, এ পরিমাণ পানি এতে রয়েছে। হিদায়া গ্রন্থকারও এ মত ব্যক্ত করেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) হতে দু'টি মত পাওয়া যায়–

৩. কূপের পরিমাণ আরেকটি কূপ খনন করে ঐ কূপ হতে পানি বের করে এ কূপ ভর্তি করা।

৪. কূপের মধ্যে একটি বাঁশ ফেলে মেপে মেপে বের করা।

ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) হতে দু'টি মত পাওয়া যায়–

৫. ২০০ হতে ৩০০ বালতি পানি বের করে ফেলে দেয়া।

৬. ২৫০ হতে ৩০০ বালতি পরিমাণ পানি বের করে ফেলা।

সালাত পুনরায় আদায়ের মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ أَعَادُوْا صَلٰوةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ الخ ঃ কূপে যদি ইঁদুর বা তৎসমতুল্য প্রাণী পড়ে মারা যায় অথচ ফুলেওনি এবং ফেটেও যায়নি, আর ঐ পানি দ্বারা ওযূ করে সালাত পড়ে থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, একদিন এক রাতের সালাত পুনরায় পড়তে হবে। আর সাহেবাইনের মতে, প্রাণীটি কূপে কখন পড়ে মরেছে তা নিশ্চিত ভাবে না জানা পর্যন্ত কোন সালাতই পুনরায় পড়তে হবে না। তবে নিশ্চিতভাবে প্রাণীটি পড়ার সময় জানতে পারলে সে সময়ের পরের সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

قَوْلُهُ أَعَادُوْا صَلٰوةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ الخ ঃ আর যদি প্রাণীটি কূপে পড়ে ফুলে যায় এবং ফেটে যায়, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে তিনদিন তিন রাতের সালাত পুনরায় পড়তে হবে। কেননা সাধারণত তিনদিনের কমে মৃত প্রাণী ফুলে না। এ জন্য জানাযাবিহীন কোন মৃতকে কবর দেয়া হলে তিনদিন পর্যন্ত জানাযা পড়ার অনুমতি রয়েছে। এরপর লাশ ফুলে বা ফেটে যাবার সম্ভাবনার কারণে জানাযার অনুমতি রাখা হয়নি।

مَسْئَلَةُ السُّوْرِ বা উচ্ছিষ্ট সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

উচ্ছিষ্ট বলা হয় কোন প্রাণীর খাওয়া বা পান করার পরের অবশিষ্টাংশকে। উচ্ছিষ্ট পাঁচ ভাগে বিভক্ত ঃ
১. সর্ব সম্মতিক্রমে পাক। যেমন– মানুষের উচ্ছিষ্ট।
২. সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক। যেমন– কুকুর ও শূকরের উচ্ছিষ্ট।
৩. মতভেদযুক্ত। যেমন– বাঘ, ভল্লুক, চিতা ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট। হানাফীদের নিকট নাপাক, শাফিয়ীদের নিকট পাক।
৪. মাকরূহ। যেমন– বিড়াল, ছাড়া মুরগি, বাজপাখি ও চিল ইত্যাদির উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।
৫. মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত। যেমন– গৃহপালিত গাধা এবং খচ্ছরের উচ্ছিষ্ট।

মানুষের উচ্ছিষ্টের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ سُوْرُ الْاٰدَمِيِّ الخ ঃ মানুষ কাফির হোক বা মুসলমান হোক, পুরুষ হোক বা স্ত্রীলোক হোক, স্বাধীন হোক বা পরাধীন হোক, ওযূর সাথে হোক বা অন্য কোন ভাবে হোক সকলের উচ্ছিষ্টই পাক। তবে যে মানুষের মুখ হতে রক্ত বের হয়েছে অথবা মদপান করে তৎক্ষণাৎ পানি পান করেছে, তার উচ্ছিষ্ট নাপাক। মদ্যপায়ী ব্যক্তি কয়েকবার থু থু গিলে ফেলার পর পানি পান করলে তার উচ্ছিষ্টও পাক। এমনিভাবে যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া জায়েয তাদের উচ্ছিষ্টও পাক। তবে যে মুরগি নাপাকী খেয়ে চলাফেরা করে এবং যে উট বা ভেড়া নাপাকী খেয়ে চলে তাদের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ।

কুকুর ও শূকরের উচ্ছিষ্টের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ سُوْرُ الْكَلْبِ وَالْخِنْزِيْرِ الخ ঃ কুকুর, শূকর এবং হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট হানাফীদের নিকট নাপাক। ইমাম মালিক (রহঃ) কুকুরের উচ্ছিষ্টকে পাক বলেন; কিন্তু যে প্লেটে কুকুর মুখ লাগিয়েছে তা সাতবার ধৌত করা ওয়াজিব বলেন। হানাফীদের নিকট তিনবার ধুয়ে ফেললে চলবে।

শাফিয়ী মাযহাবে কুকুর ও শূকর ছাড়া অন্যান্য হিংস্র প্রাণীর উচ্ছিষ্ট নাপাক নয়।

বিড়ালের উচ্ছিষ্টের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ سُوْرُ الْهِرَّةِ الخ ঃ বিড়াল, ছাড়া মুরগি, হিংস্রপাখি এবং গৃহে বসবাসকারী ইঁদুর, সাপ এদের উচ্ছিষ্ট মাকরূহ। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পানি ব্যতীত অন্য কোন পানি না পাওয়া গেলে বিড়ালের উচ্ছিষ্ট পাক, অবশ্য যে বিড়াল ইঁদুর ভক্ষণ করে তৎক্ষণাৎ পানি পান করেছে তার উচ্ছিষ্ট সর্ব সম্মতিক্রমে নাপাক।

হিংস্র জন্তু ও পাখির পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ سِبَاعِ الْبَهَائِمِ الخ ঃ যেসব চতুষ্পদ জন্তু দাঁত দ্বারা শিকার করে তাদেরকে হিংস্র প্রাণী বলা হয়। আর যেসব পাখি নখ দ্বারা শিকার করে তাদেরকে হিংস্র পাখি বলা হয়।

গাধা ও খচ্ছরের উচ্ছিষ্টের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ سُوْرُ الْحِمَارِ وَالْبِغَالِ الخ ঃ গাধা ও খচ্ছরের উচ্ছিষ্ট পাক ও নাপাক হওয়ার ব্যাপারে দু'রকম হাদীস বর্ণিত আছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী উহা পাক, আর ইবনে ওমর (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী তাদের উচ্ছিষ্ট নাপাক। তাই ওলামায়ে কিরাম গাধা বা গচ্ছরের উচ্ছিষ্ট পানিকে মাশকূক বা সন্দেহযুক্ত বলেছেন। এরকম পানি ছাড়া যদি অন্য কোন পানি না পাওয়া যায়, তবে তা দ্বারা ওযূ করে তায়াম্মুমও করতে হবে। যে কোনটি আগে বা পরে করতে পারবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। طَهَارَة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? نَوَاقِض وُضُوْء কয়টি ও কি কি? কোন্ কোন্ পানি দ্বারা طَهَارَة হাসিল জায়েয? বর্ণনা কর।
২। نَوَاقِض وُضُوْء কয়টি ও কি কি? বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩। ওযূর ফরয, সুন্নত ও মুস্তাহাবগুলো আলোচনা কর।
৪। طَهَارَة-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কি? فَرَائِض وُضُوْء কয়টি ও কি কি? সীমাসহ বর্ণনা কর।
৫। اَلْغَدِيْرُ الْعَظِيْم কাকে বলে? এর হুকুমসহ প্রকারভেদ আলোচনা কর।
৬। তাহারাত বহু প্রকার হওয়া সত্ত্বেও "كِتَابُ الطَّهَارَةِ" -এর মধ্যে طَهَارَة শব্দটিকে একবচন ব্যবহার করার কারণ কি?

৭। فَرَائِض وُضُوْء ও উহার সীমা বর্ণনা কর।
৮। ওযূর ফরযসমূহ কুরআনের আয়াত উল্লেখ করে প্রমাণসহ বর্ণনা কর।
৯। إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلٰوةِ ..... وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ আয়াতে উল্লিখিত أَرْجُلَكُمْ -এর কিরাআত বর্ণনা কর।
১০। গ্রন্থকার কিতাবের শুরুতে ওযূর আয়াতকে উল্লেখ করার কারণ কি? উল্লেখ কর।
১১। مِرْفَقَان ও كَعْبَان ধৌতকরণ ফরযের অন্তর্ভুক্ত কিনা? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।
১২। মাথা মাসাহের পরিমাণ কতটুকু? ইমামদের মতভেদ দলিলসহ উল্লেখ কর।
১৩। প্রত্যেক অঙ্গ তিনবার ধৌত করা কি?
১৪। মাথা মাসাহ করার নিয়ম উল্লেখ কর।
১৫। ওযূর সুন্নত কয়টি ও কি কি? বর্ণনা কর।
১৬। ওযূর মুস্তাহাব কয়টি ও কি কি? বর্ণনা কর।
১৭। ওযূতে বিসমিল্লাহ পড়া কি? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।
১৮। দাড়ি আঙুল দ্বারা খিলাল করার হুকুম ও পদ্ধতি বর্ণনা কর।
১৯। نَوَاقِض وُضُوْء তথা ওযূ ভঙ্গের কারণ কাকে বলে? উহা কয়টি ও কি কি?
২০। ওযূর মধ্যে মাকরূহ কাজ কি কি? বর্ণনা কর।
২১। গোসলের ফরয কয়টি ও কি কি?
২২। গোসলের সুন্নত কয়টি ও কি কি?
২৩। গোসল ফরয হবার কারণগুলো বর্ণনা কর।
২৪। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গোসল করা সুন্নত? বর্ণনা কর।
২৫। স্ত্রীলোকের জন্য গোসলের সময় তার চুলের খোঁপা খুলে ফেলা আবশ্যক কিনা?
২৬। مَاء مُطْلَق ও مَاء مُقَيَّد -এর পরিচয় দাও।
২৭। ওযূ ও গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা লাভের জন্য কোন্ প্রকার পানি ব্যবহার করা সিদ্ধ?
২৮। কিরূপ পানি দ্বারা ওযূ-গোসল সিদ্ধ নয়?
২৯। مَاء رَاكِد (আবদ্ধ পানি)-এর পরিচয় ও উহার হুকুম বর্ণনা কর।
৩০। مَاء جَارِى (প্রবাহিত পানি)-এর সংজ্ঞা ও উহার হুকুম বর্ণনা কর।
৩১। مَاء مُسْتَعْمَل (ব্যবহৃত পানি)-এর সংজ্ঞা ও উহার হুকুম বর্ণনা কর।
৩২। গোসলের মুস্তাহাব কাজ কি কি? বর্ণনা কর।
৩৩। دِبَاغَة কাকে বলে? حُكْم সহ دِبَاغَة করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৩৪। শূকর ও মানুষের চামড়া দাবাগত করলে পাক হয় কিনা এবং তা দ্বারা নির্মিত পাত্রের পানি দ্বারা ওযূ গোসল জায়েয কি-না।
৩৫। اَلْمَاءُ الدَّائِمُ ও اَلْغَدِيْرُ الْعَظِيْمُ কাকে বলে? উহাতে নাপাকী পড়লে উহার হুকুম কি? বর্ণনা কর।
৩৬। কূপে নাপাকী পতিত হলে উহা কিভাবে পাক করতে হয় উল্লেখ কর।
৩৭। যে কূপের তলদেশ দিয়ে পানি বের হয় তা পাক করার নিয়ম বর্ণনা কর।
৩৮। কোন্ কোন্ প্রাণী পানিতে মরলে পানি নাপাক হয় না।
৩৯। প্রাণী কূপে পড়ে মরে গেলে সে কূপের পানি দিয়ে ওযূ করে সালাত পড়লে উহার হুকুম কি?
৪০। "মৃত প্রাণীর চুল ও হাড় পাক।" কথাটি ব্যাখ্যা কর।
৪১। مَشْكُوك পানি কাকে বলে এবং উহার হুকুম কি? বর্ণনা কর।
৪২। سُوْر কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি? বর্ণনা কর।
৪৩। মানুষের উচ্ছিষ্টের হুকুম বর্ণনা কর।
৪৪। কোন্ প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক এবং কোন্ প্রাণীর উচ্ছিষ্ট পাক নয়? বর্ণনা কর।

بَابُ التَّيَمُّمِ

وَمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ مُسَافِرٌ اَوْخَارِجُ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوَ الْمِيْلِ اَوْ اَكْثَرَ اَوْ كَانَ يَجِدُ الْمَاءَ اِلَّا اَنَّهُ مَرِيْضٌ فَخَافَ اِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ اِشْتَدَّ مَرَضُهُ اَوْخَافَ الْجُنُبُ اِنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَقْتُلُهُ الْبَرْدُ اَوْ يُمَرِّضُهُ فَاِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِالصَّعِيْدِ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ يَمْسَحُ بِاِحْدٰهُمَا وَجْهَهُ وَبِالْاُخْرٰى يَدَيْهِ اِلَى الْمِرْفَقَيْنِ ، وَالتَّيَمُّمُ فِى الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ سَوَاءٌ وَيَجُوْزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى بِكُلِّ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ كَالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ وَالْحَجَرِ وَالْجَصِّ وَالنُّوْرَةِ وَالْكُحْلِ وَالزَّرْنِيْخِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ اِلَّا بِالتُّرَابِ وَالرَّمْلِ خَاصَّةً ، وَالنِّيَّةُ فَرْضٌ فِى التَّيَمُّمِ وَمُسْتَحَبَّةٌ فِى الْوُضُوْءِ وَيَنْقُضُ التَّيَمُّمَ كُلُّ شَيْءٍ يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَيَنْقُضُهُ اَيْضًا رُؤْيَةُ الْمَاءِ اِذَا قَدَرَ عَلٰى اِسْتِعْمَالِهِ وَلَايَجُوْزُ التَّيَمُّمُ اِلَّا بِصَعِيْدٍ طَاهِرٍ -

তায়াম্মুমের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি পানি পায় না অথচ সে মুসাফির, অথবা শহরের এমন বাহিরে থাকে যে তার মাঝে ও শহরের মাঝে এক মাইল কিংবা তার চাইতেও বেশি দূরত্ব থাকে, অথবা সে পানি পায় কিন্তু অসুস্থ- পানি ব্যবহার করলে তার রোগ বৃদ্ধি পাওয়ার ভয় করে, অথবা অপবিত্র ব্যক্তি ভয় করে যে যদি সে পানি ব্যবহার করে তবে ঠাণ্ডা তাকে মেরে ফেলবে কিংবা তাকে রোগাক্রান্ত করে ফেলবে, এসব অবস্থায় সে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে।

আর তায়াম্মুম হল, মাটিতে দু'বার হাত মেরে তার মুখমণ্ডল মাসাহ করবে, আর দ্বিতীয়বার মেরে কনুইসহ উভয় হাত মাসাহ করবে। ফরয গোসল ও ওযূ ভঙ্গ উভয় অবস্থার তায়াম্মুম একই রকম। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, মাটি জাতীয় সমস্ত বস্তু দ্বারাই তায়াম্মুম জায়েয, যেমন- মাটি, বালি, পাথর, চুনা, সুরকী, সুরমা এবং হরিতাল। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, তায়াম্মুম মাটি এবং বালি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা জায়েয হবে না।

তায়াম্মুমে নিয়ত ফরয আর ওযূতে মুস্‌তাহাব। যে সকল কারণ ওযূকে নষ্ট করে দেয় সেগুলো তায়াম্মুমকেও নষ্ট করে ফেলে। আর এমন পানি দেখলেও তায়াম্মুকে নষ্ট করে যা ব্যবহার করতে সে সক্ষম হয়। পবিত্র মাটি ব্যতীত তায়াম্মুম জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَيَمُّم-এর পরিচয় ঃ

تَيَمُّم শব্দের আভিধানিক অর্থ হল ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। শরীয়তের পরিভাষায় পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্ত পাক মাটি দ্বারা হাত ও মুখমন্ডল মাসাহ করা।

তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হবার ঘটনা ঃ

তায়াম্মুম উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য এক মহা অনুগ্রহ। তায়াম্মুম ফরয হবার আয়াত গাযওয়ায়ে মুরাইসীতে হয়েছে। অর্থাৎ এ যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল (সাঃ) ও তাঁর সাথীবর্গ একস্থানে যাত্রা বিরতি করেন। এ স্থানে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর গলার হার হারিয়ে যায়। সাহাবায়ে কিরাম তা খুঁজতে খুঁজত হয়রান হয়ে যায়। এ দিকে সালাতের ওয়াক্তও হয়ে যায়। কিন্তু সে স্থানে পানি না থাকার কারণে সকলে মহা সংকটে পড়ে যান। হযরত আবূ বকর (রাঃ) অত্যন্ত রাগন্বিত হয়ে হযরত আয়িশা (রাঃ)-কে বকা ঝকা করতে লাগলেন। তখন মহান আল্লাহ তা'আলা তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল করে উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য মহা অনুগ্রহ বর্ষণ করেন। আর এতে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর শানও বুলন্দ করেছেন।

শহরের বাইরে তায়াম্মুমের মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ خَارِجُ الْمِصْرِ الخ ঃ ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষিকাজ অথবা অন্য কোন কারণে যদি কোন ব্যক্তি শহরের বাইরে এমন কোন স্থানে যায় যেখানে পানি নেই, তাহলে সেখানে সে তায়াম্মুম করে সালাত পড়বে। কিন্তু শহরে হলে জানাযা ও ঈদের সালাত ছুটে যাওয়া এবং রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা ছাড়া তায়াম্মুম করা যাবে না।

রুগ্ণ অবস্থার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيْضٌ الخ ঃ রুগীর তিন অবস্থা হতে পারে–

১. প্রথমত পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে, যেমন– জ্বর বা এ জাতীয় রোগ। এ অবস্থায় সর্ব সম্মতিক্রমে তায়াম্মুম করা জায়েয।

২. দ্বিতীয়ত এমন রোগ যাতে পানি ব্যবহার ক্ষতিকর নয়, তবে পানির নিকট যেতে সক্ষম নয়, যেমন– পা কেটে গেছে। এ অবস্থায় যদি তার কোন সাহায্যকারী না থাকে, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে তায়াম্মুম জায়েয। আর যদি সাহায্যকারী থাকে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তখনও তায়াম্মুম জায়েয, সাহেবাইনের নিকট তখন তায়াম্মুম জায়েয নেই।

৩. তৃতীয়ত এমন রুগ্ণ যে, নিজেও ওযূ করতে পারে না এবং অন্যের সাহায্যেও ওযূ করতে সক্ষম হয় না। এ অবস্থায় আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, সালাত পড়বে না, তবে পরে আদায় করবে। আর আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সালাতের মত ক্রিয়া কলাপ করবে এবং পরে সুস্থ হলে কাযা পড়ে নেবে।

তায়াম্মুম করা কখন জায়েয ঃ

১. মুসাফিরের জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয। কেননা সাথে পানি না থাকলে দূরে গিয়ে পানি সংগ্রহ করা অত্যন্ত কষ্টকর। এ কষ্ট লাঘবের জন্য শরীয়ত তাকে তায়াম্মুমের অনুমতি প্রদান করেছে।

২. রুগ্ণ ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধি আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা সিদ্ধ।

৩. জুনুবী তথা যার ওপর গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তি অধিক শীতের কারণে মৃত্যুর আশঙ্কা করলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করতে পারবে।

৪. শহরের বাইরে শরীয়তের এক মাইল বা ততোধিক দূরে থাকলে তায়াম্মুম করতে পারবে।

৫. পানির স্থানে যেতে কোন শত্রু বা হিংস্র প্রাণীর ভয় থাকলে, আর কোন উপায়ে পানি সংগ্রহ করতে না পারলে তায়াম্মুম করা জায়েয।

৬. পানির সংকটকালে বা অধিক দাম হলে তায়াম্মুম করা বৈধ।

৭. জানাযা ও ঈদের সালাত ছুটে যাবার আশঙ্কা থাকলে তায়াম্মুম করা জায়েয, তবে জানাযার ক্ষেত্রে ওলির (অভিভাবকের) জন্য জায়েয নেই।

তায়াম্মুম করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ اَلتَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ الخ ঃ প্রথমে তায়াম্মুম করার নিয়ত করে দু'বার মাটিতে হাত মারতে হয়।

১. প্রথমবার উভয় হাত মাটিতে মেরে উভয় হাতের বৃদ্ধা আঙুলদ্বয় লাগিয়ে হালকাভাবে ঝেড়ে ফেলতে হবে, যদি বালু বেশি পরিমাণ লেগে যায়। এরপর পুরো মুখমন্ডল মাসাহ করবে। এতে একটুও যেন মাসাহ বাকি না থাকে।

২. দ্বিতীয়বারও অনুরূপভাবে মাটিতে হাত মেরে ঝেড়ে ফেলে উভয় হাত মাসাহ করবে এবং কনুইসহ পুরো হাত মাসাহ করবে।

ছোট ও বড় অপবিত্রতায় তায়াম্মুমের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ التَّيَمُّمُ فِى الْجَنَابَةِ وَالْحَدَثِ الخ ঃ হদছে আসগর বা ছোট অপবিত্রতা তথা ওযূর বেলায় তায়াম্মুমের যে বিধান রয়েছে হদছে আকবর বা বড় অপবিত্রতা তথা ফরয গোসলের বেলায়ও একই হুকুম। অর্থাৎ উভয় অবস্থায় নিয়ত করে মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করলেই যথেষ্ট হবে।

যে সকল বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয ঃ

قَوْلُهُ مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الْاَرْضِ الخ ঃ মাটি এবং মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। তবে যে সমস্ত মাটি জাতীয় বস্তু পোড়ালে জ্বলে যায়, যেমন – লাকড়ি, আর যেগুলো আগুনে জ্বালালে গলে যায়, যেমন– সোনা, রূপা, তামা, পিতল ইত্যাদি এগুলো দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয নয়। আর গ্রন্থকার যেগুলো উল্লেখ করেছেন সেগুলো জ্বালালে ছাই হয় না এবং পোড়ালে গলেও না। উল্লিখিত মতটি হল ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর। আর আবূ ইউসুফ (রহঃ) মতে, শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, শুধু ওঠানো তথা বিচ্ছিন্ন মাটি দ্বারা তায়াম্মুম বিশুদ্ধ অন্য মাটি দ্বারা বিশুদ্ধ নয়। তিনি صَعِيدًا শব্দের অর্থ ওঠানো মাটি করেন।

আর আমরা বলি যে, صَعِيْد শব্দটির অর্থ হল জমিনের উপরিভাগ, যা সকল অভিধানে উল্লিখিত আছে।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ ঃ

قَوْلُهُ رُؤْيَةُ الْمَاءِ الخ ঃ গ্রন্থকার ওযূ ভঙ্গের কারণ তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণ বলেছেন। বস্তুত যেসব কারণে গোসল ফরয হয়, তাতে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর "رُؤْيَةُ الْمَاءِ" তথা পানি দেখার অর্থ হল পানি ব্যবহারের সমর্থ হওয়া। অতএব কোন ব্যক্তি যদি এক বদনা পানি পায়, তবে তার ওযূর তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। কিন্তু ফরয গোসলের জন্য তায়াম্মুম করে থাকলে এক বদনা পনি পাবার কারণে তার গোসলের তায়াম্মুম নষ্ট হবে না; বরং গোসল করার মত পানি পেতে হবে।

وَيَسْتَحِبُّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ وَهُوَ يَرْجُوْ أَنْ يَجِدَهُ فِىْ اٰخِرِ الْوَقْتِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّلٰوةَ إِلٰى اٰخِرِ الْوَقْتِ فَإِنْ وَجَدَ الْمَاءَ تَوَضَّأَ وَصَلّٰى وَإِلَّا تَيَمَّمَ وَيُصَلِّىْ بِتَيَمُّمِهٖ مَاشَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ وَيَجُوْزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيْحِ الْمُقِيْمِ إِذَا حَضَرَتْ جَنَازَةٌ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهٗ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوْتَهٗ صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ فَلَهٗ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّىْ وَكَذٰلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيْدَ فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ يَفُوْتَهُ الْعِيْدُ وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمُعَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَنْ تَفُوْتَهُ الْجُمُعَةُ تَوَضَّأَ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ صَلَّاهَا وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا وَكَذٰلِكَ إِنْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَخَشِىَ إِنْ تَوَضَّأَ فَاتَهُ الْوَقْتُ لَمْ يَتَيَمَّمْ وَلٰكِنَّهٗ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّىْ فَائِتَتَهٗ ، وَالْمُسَافِرُ إِذَا نَسِىَ الْمَاءَ فِىْ رَحْلِهٖ فَتَيَمَّمَ وَصَلّٰى ثُمَّ ذَكَرَ الْمَاءَ فِى الْوَقْتِ لَمْ يُعِدْ صَلٰوتَهٗ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُعِيْدُ وَلَيْسَ عَلَى الْمُتَيَمِّمِ إِذَا لَمْ يَغْلِبْ عَلٰى ظَنِّهٖ أَنْ بِقُرْبِهٖ مَاءً أَنْ يَطْلُبَ الْمَاءَ وَإِنْ غَلَبَ عَلٰى ظَنِّهٖ أَنَّ هُنَاكَ مَاءً لَمْ يُجْزِئْهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ حَتّٰى يَطْلُبَهٗ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيْقِهٖ مَاءٌ طَلَبَهٗ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَتَيَمَّمَ فَإِنْ مَنَعَهٗ مِنْهُ تَيَمَّمَ وَصَلّٰى -

<u>সরল অনুবাদ ঃ</u> সে ব্যক্তির জন্য সালাতকে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত পিছিয়ে পড়া মুস্তাহাব যে ব্যক্তি পানি পায় না অথচ শেষ ওয়াক্তে পানি পাবার আশা করে। অতঃপর যদি সে পানি পায় তবে ওযূ করে সালাত পড়বে, অন্যথা তায়াম্মুম করে সালাত পড়বে। এক তায়াম্মুমে যত ইচ্ছা ফরয ও নফল সালাত পড়তে পারবে। জানাযা উপস্থিত হলে মৃতের ওলি ব্যতীত কোন সুস্থ ও মুকীম ব্যক্তি যদি ভয় করে যে, ওযূতে লিপ্ত হলে জানাযা ছুটে যাবে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করে (জানাযার) সালাত পড়া জায়েয। এমনিভাবে যদি ঈদের সালাতও উপস্থিত হয় আর সে ভয় করে যে, ওযূতে লিপ্ত হলে ঈদের সালাত তার থেকে ছুটে যাবে।

আর যে ব্যক্তি জুমুআর সালাতে উপস্থিত হয়ে ভয় করল যে, যদি সে ওযূতে লিপ্ত হয়, তবে তার জুমুআর সালাত ছুটে যাবে। এ অবস্থায় সে ওযূ করবে, অতঃপর জুমুআর সালাতে পেলে পড়বে, অন্যথা যোহরের চার রাকআত সালাত পড়বে।

এমনিভাবে যদি ওয়াক্ত সংকীর্ণ হয় আর সে ওযূ করতে গেলে ওয়াক্ত চলে যাবার আশঙ্কা করে, তাহলেও তায়াম্মুম করবে না; বরং ওযূ করবে এবং হারানো সালাত কাযা পড়বে।

কোন মুসাফির ব্যক্তি তার কাফেলাতে পানি থাকার কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত আদায় করল অতঃপর সময়ের মধ্যেই পানির কথা স্মরণ হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, সালাত পুনরায় পড়তে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, সালাত পুনরায় পড়তে হবে। তায়াম্মুম কারীর যদি প্রবল ধারণা না হয় যে, তার নিকটবর্তী কোন স্থানে পানি আছে, তাহলে তার ওপর পানি অন্বেষণ করা আবশ্যক নয়। আর যদি তার প্রবল ধারণা হয় যে, উমুক স্থানে পানি রয়েছে, তবে পানি অন্বেষণ না করা পর্যন্ত তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না। আর (ভ্রমণ অবস্থায়) যদি তার কোন সঙ্গীর নিকট পানি থাকে, তবে তায়াম্মুম করার পূর্বে তার থেকে পানি চাইবে। যদি সে পানি দিতে অস্বীকার করে, তাহলে তায়াম্মুম করবে এবং সালাত আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পানি পাবার আশায় সালাত শেষ ওয়াক্তে পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَهُوَ يَرْجُو الخ ঃ কোন ব্যক্তি যদি পানি সালাতের শেষ ওয়াক্তে পাবার আশা করে, তবে তায়াম্মুম না করে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত অপেক্ষা করা মুস্তাহাব। শেষ ওয়াক্তে পাওয়া গেলে ওযূ করে সালাত পড়বে, অন্যথা তায়াম্মুম করে সালাত পড়ে নেবে। আর যদি শেষ ওয়াক্তেও পানি পাবার আশা না থাকে, তবে তায়াম্মুম করে মুস্তাহাব ওয়াক্তে সালাত পড়ে নেবে।

এক তায়াম্মুমে একাধিক সালাতে পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ الخ ঃ হানাফী মাযহাব অনুযায়ী এক তায়াম্মুম দ্বারা যত ইচ্ছা ফরয, সুন্নত ও নফল সালাত আদায় করা জায়েয। কেননা এটা ওযূরই স্থলাভিষিক্ত। এক ওযূ দ্বারা যেরূপ পড়া যায় এটা দ্বারা অনুরূপ পড়া যাবে।

আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, এক তায়াম্মুম দ্বারা কয়েক ফরয সালাত আদায় করা বৈধ নয়; বরং প্রত্যেক ফরযের জন্য পৃথক পৃথক তায়াম্মুম করতে হবে। কেননা তিনি তায়াম্মুমকে প্রয়োজনীয় পবিত্রতা বলে থাকেন।

জানাযার সালাতে তায়াম্মুমের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالْوَلِيُّ غَيْرُهُ فَخَافَ الخ ঃ ওলি বা অভিভাবক ছাড়া মুকীম ও সুস্থ ব্যক্তির জন্য জানাযার সালাত তায়াম্মুম করে পড়া জায়েয, যদি সে আশঙ্কা করে যে, ওযূ করতে গেলে জানাযার সালাত পাবে না। (অলসতা করে এরূপ করা ঠিক হবে না) কেননা জানাযার সালাতের কাযা নেই এবং জামাআত ছাড়া পড়াও যায় না।

আর অভিভাবকের জন্য তায়াম্মুম করে পড়া জায়েয নেই। কেননা ওলির অনুমতি ছাড়া জানাযা হতে পারে না। আর জানাযা হয়ে গেলে ওলি দ্বিতীয়বার জানাযা পড়তে পারে, পক্ষান্তরে অন্যরা তা পারে না। এমনিভাবে ঈদের সালাত ছুটে যাবার আশঙ্কা থাকলেও তায়াম্মুম করে ঈদের সালাত পড়া জায়েয। কেননা ঈদের সালাতের কাযা নেই এবং জামাআত ছাড়া পড়া যায় না। এমনকি বছরে মাত্র দু'দিন এ সালাত পড়া হয়।

পানির কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَالْمُسَافِرُ اِذَا نَسِىَ الخ ঃ গ্রন্থকার এখানে মুসাফির শব্দটি গতানুগতিকভাবে দিয়েছেন, মুকীমের জন্যও এ হুকুম প্রযোজ্য হবে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি তার পানির কথা ভুলে গিয়ে যদি তায়াম্মুম করে সালাত পড়ে এবং ওয়াক্তের ভিতরে তার পানি থাকার কথা স্মরণ হয়, তবে তাকে পুনরায় সালাত পড়তে হবে না। কিন্তু তিন অবস্থায় নামায পুনরায় পড়তে হবে।

১. যদি সে ব্যক্তি ধারণা করে যে, পানি নেই এরপর তায়াম্মুম করে সালাত পড়লে পানি পেলে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

২. পানির মশক যদি নিজের ঘাড়ে থাকে অথবা সামনে রেখে ভুলে তায়াম্মুম করে সালাত পড়ে, তবে সর্ব সম্মতিক্রমে নামায পুনঃ পড়তে হবে।

৩. তায়াম্মুম করে সালাত পড়া অবস্থায় যদি পানির কথা স্মরণ হয়, তবে ওযূ করে সালাত পুনরায় পড়তে হবে।

কত দূর পর্যন্ত পানি অন্বেষণ করবে ঃ

কত দূর পর্যন্ত পানি খোঁজ করবে এ বিষয়ে মতান্তর রয়েছে।

হিদায়া এবং কানযের গ্রন্থকারদ্বয়ের মতে, এক গালওয়াহ পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পানি তালাশ করতে হবে। এ غَلْوَه-এর পথ সম্পর্কে মতান্তর দেখা যায়–

১. কিছু সংখ্যকের মতে ৪০০ গজ (শরয়ী গজ) দূরত্ব হল এক গালওয়াহ।

২. কেউ কেউ বলেন, এর দূরত্ব হল ৩০০ গজ।

৩. কারো মতে, তীর নিক্ষেপ করলে যতদূর যাবে তাই হল এক গালওয়াহ।

بَدَائِعُ الصَّنَائِع (বাদায়েউস্‌সানায়ে) নামক কিতাবে উল্লেখ রয়েছে যে, এমন দূরত্ব পর্যন্ত পানি খোঁজ করা আবশ্যক যেখান পর্যন্ত গেলে নিজেরও কোন ক্ষতি হয় না এবং সাথীদেরও কোনরূপ অপেক্ষার কষ্ট হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। تَيَمُّمٌ -এর لَغْوِى ও شَرْعِى অর্থ কি? কোন্ আয়াত দ্বারা উহা ফরয হয়েছে।
২। تَيَمُّمٌ -এর ফরয কয়টি ও কি কি?
৩। তায়াম্মুমের সুন্নতগুলো বর্ণনা কর।
৪। تَيَمُّمٌ করবার নিয়ম বা পদ্ধতি বর্ণনা কর।
৫। কার জন্য এবং কিরূপ ক্ষেত্রে তায়াম্মুম করবার বিধান রয়েছে?
৬। কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয এবং কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা জায়েয নয়।
৭। কি কি কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়?
৮। মুসাফির যদি তার নিকট রক্ষিত পানির কথা ভুলে গিয়ে তায়াম্মুম করে সালাত পড়ে অতঃপর সালাতের ওয়াক্তের ভিতর সে পানির কথা স্মরণ হয়, তাহলে উহার হুকুম কি?
৯। মুসাফিরের নিকট স্বল্প পরিমাণ পানি রয়েছে যা দ্বারা ওযূ করা হলে পান করার পানি থাকবে না। এমতাবস্থায় তার হুকুম কি?

بَابُ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ

اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ مِنْ كُلِّ حَدَثٍ مُوْجِبٍ لِلْوُضُوْءِ اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلٰى طَهَارَةٍ ثُمَّ اَحْدَثَ فَاِنْ كَانَ مُقِيْمًا مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا مَسَحَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَابْتِدَاؤُهَا عَقِيْبَ الْحَدَثِ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا خُطُوْطًا بِالْاَصَابِعِ يَبْتَدِأُ مِنَ الْاَصَابِعِ اِلَى السَّاقِ وَفَرْضُ ذٰلِكَ مِقْدَارُ ثَلٰثِ اَصَابِعَ مِنْ اَصَابِعِ الْيَدِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلٰى خُفٍّ فِيْهِ خَرْقٌ كَثِيْرٌ يَتَبَيَّنُ مِنْهُ قَدْرُ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ وَاِنْ كَانَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ جَازَ –

মোজার ওপর মাসাহের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ দুই মোজার ওপর মাসাহ করা হাদীস দ্বারা বৈধ, এমন সব অপবিত্রতা হতে যা ওযূ ওয়াজিব করে। যখন পবিত্র অবস্থায় মোজাদ্বয় পরিধান করে এরপর অপবিত্র হয়। অতঃপর যদি সে মুকীম হয়; তবে একদিন একরাত মাসাহ করবে। আর মুসাফির হলে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করবে। মাসাহের মুদ্দত শুরু হবে ওযূবিহীন হওয়ার পর থেকে। হাতের আঙুলসমূহ দ্বারা উভয় মোজার পৃষ্ঠদেশে রেখাকৃতি করে মাসাহ করা। পায়ের আঙুলসমূহ হতে শুরু করে নালার দিকে টেনে আনবে। এ মাসাহের ফরয হল হাতের তিন আঙুল পরিমাণ। আর এমন মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয নেই, যাতে ছেঁড়া এত বেশি যে, পায়ের তিন আঙুল পরিমাণ প্রকাশ পায়। আর ছেঁড়া যদি এর চেয়ে কম হয়, তবে মাসাহ জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মোজার ওপর মাসাহ শরীয়তে সাব্যস্ত ঃ

قَوْلُهُ جَائِزٌ بِالسُّنَّةِ الخ ঃ সমস্ত ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর একমত যে, মোজার ওপর মাসাহ শরীয়ত সম্মত। এটি মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত। ইমাম ইবনে বার (রহঃ) বলেন, মুহাজির ও আনসারের সমস্ত সাহাবী, সমস্ত তাবেয়ী এবং সমস্ত ফকীহ মোজার ওপর মাসাহকে জায়েয মনে করেন। এ জন্য ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেছেন যে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের অন্যতম শর্ত হল, মোজার ওপর মাসাহকে জায়েয মনে করা, শায়খাইন (আবূ বকর ও ওমর (রাঃ) সাহাবীদ্বয়-কে মর্যাদা প্রদান করা এবং দুই জামাতা (ওছমান ও আলী (রাঃ) সাহাবীদ্বয়-কে ভালোবাসা।

মোজার ওপর মাসাহের জন্য শর্ত ঃ

قَوْلُهُ اِذَا لَبِسَ الْخُفَّيْنِ عَلٰى طَهَارَةٍ الخ ঃ মোজার ওপর মাসাহ জায়েয হওয়ার জন্য এমন মোজা আবশ্যক, যা চামড়া দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, যা পায়ে দিয়ে অনায়াসে চলা যায়। এরূপ মোজা পবিত্র অবস্থায় পরিধান করার পর পুনরায় অপবিত্র হলে তখন থেকে মাসাহের মুদ্দাত শুরু হবে।

মাসাহের সময়সীমা ঃ

মাসাহের মুদ্দাত মুকীমের জন্য হল একদিন একরাত, আর মুসাফিরের জন্য হল তিনদিন তিনরাত। কেননা হযরত শুরাইহ (রহঃ) হযরত আলী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন যে,

اِنَّهُ جَعَلَ النَّبِيُّ (ص) ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ لِلْمُسَافِرِ وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيْمِ

অর্থাৎ নবী কারীম (সাঃ) মুসাফিরের জন্য তিনদিন তিনরাত আর মুকীমের জন্য একদিন একরাত মাসাহ করা নির্ধারণ করেছেন।

মাসাহের প্রথম সময় ঃ

قَوْلُهٗ اِبْتِدَاؤُهَا عَقِيْبَ الْحَدَثِ ঃ মাসাহের মুদ্দাত শুরু হবে অপবিত্র হবার পর থেকে। যেমন- কোন ব্যক্তি সকাল বেলায় ওযূ করে মোজা পরিধান করল, এরপর যোহরের সময় তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেল, তখন থেকে তার মুদ্দাত শুরু হবে তথা মুকীম হলে তার পরের দিন যোহর পর্যন্ত, আর মুসাফির হলে চতুর্থ দিন যোহর পর্যন্ত মাসাহ করতে পারবে। এরপর করতে চাইলে মোজা খুলে পা ধৌত করে নিতে হবে।

মাসাহের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلٰى ظَاهِرِهِمَا الخ ঃ মাসাহের নিয়ম হল, কমপক্ষে হাতের তিন আঙুল দ্বারা পায়ের আঙুলের মাথা হতে রেখা টেনে পায়ের নালার দিকে নিয়ে আসতে হবে। কেননা, তিরমিযী শরীফে উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত মুগীরা ইবনে শু'বা (রাঃ) রাসূল (সাঃ)-কে মোজার ওপরি ভাগে মাসাহ করতে দেখেছেন। অতএব এর বিপরীত তথা মোজার নিচে মাসাহ করা সিদ্ধ হবে না। ডান হাতের আঙুল দ্বারা ডান পায়ের ওপর আর বাম হাতের আঙুল দ্বারা বাম পায়ের ওপর মাসাহ করতে হবে। তিন আঙুলের কম হলে মাসাহের ফরয আদায় হবে না। মাসাহের সময় আঙুলগুলো ফাঁক করে রাখতে হবে। আর কেউ যদি হাতের পেট বা পিঠ দ্বারা মাসাহ করে, তবে তাতেও মাসাহ হয়ে যাবে। আর যদি হাতের এক আঙুল দ্বারা প্রত্যেক পায়ে তিনবার নতুন পানি দ্বারা মাসাহ করে, তবুও ফরয আদায় হয়ে যাবে। আর যদি একই পানি দ্বারা তিনবার মাসাহ করে, তাহলে ফরয আদায় হবে না।

উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক মোজার ওপর কমপক্ষে তিন আঙুল পরিমাপ মাসাহ করতে হবে। কেউ যদি এক মোজার ওপর এক আঙুল দ্বারা আর দ্বিতীয় মোজার ওপর পাঁচ আঙুল দ্বারা মাসাহ করে, তবে ফরয আদায় হবে না।

ছেঁড়া মোজার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ قَدْرَ ثَلٰثِ اَصَابِعِ الرِّجْلِ الخ ঃ মোজা যদি এ পরিমাণ ছেঁড়া হয় যে, চলার সময় পায়ের ছোট আঙুলের তিন আঙুল পরিমাণ খুলে বা ফাঁক হয়ে যায়, তবে তার ওপর মাসাহ জায়েয হবে না। আর এর চেয়ে কম তথা যদি ছোট আঙুলের দুই বা এক আঙুল পরিমাপ হয়, তবে তার ওপর মাসাহ জায়েয হবে।

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ وَيَنْقُضُ الْمَسْحَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوْءَ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ نَزَعَ خُفَّيْهِ وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ وَصَلَّى وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ بَقِيَّةِ الْوُضُوْءِ وَمَنْ اِبْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُقِيْمٌ فَسَافَرَ قَبْلَ تَمَامِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ مَسَحَ تَمَامَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَنْ اِبْتَدَأَ الْمَسْحَ وَهُوَ مُسَافِرٌ ثُمَّ أَقَامَ فَإِنْ كَانَ مَسَحَ يَوْمًا وَلَيْلَةً أَوْ أَكْثَرَ لَزِمَهُ نَزْعُ خُفَّيْهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُ تَمَّمَ مَسْحَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَمَنْ لَبِسَ الْجُرْمُوْقَ فَوْقَ الْخُفِّ مَسَحَ عَلَيْهِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُوْنَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنَعَّلَيْنِ وَقَالَا يَجُوْزُ إِذَا كَانَا ثَخِيْنَيْنِ لَا يَشِفَّانِ وَلَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ وَالْبُرْقُعِ وَالْقُفَّازَيْنِ وَيَجُوْزُ عَلَى الْجَبَائِرِ وَإِنْ شَدَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوْءٍ فَإِنْ سَقَطَتْ مِنْ غَيْرِ بُرْءٍ لَمْ يَبْطُلِ الْمَسْحُ وَإِنْ سَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ بَطَلَ -

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তির জন্য গোসল ফরয হয়েছে তার জন্য মোজার ওপর মাসাহ জায়েয নেই। যেসব বিষয় ওযূকে ভঙ্গ করে দেয় তা মাসাহকেও ভেঙ্গে দেয়। এমনিভাবে মোজা খুলেফেলা এবং মাসাহের মুদ্দাত শেষ হয়ে যাওয়াও মাসাহকে নষ্ট করে দেয়। অতঃপর যদি মাসাহের মুদ্দাত শেষ হয়ে যায়, (আর ওযূ ঠিক থাকে) তবে মোজাদ্বয় খুলে পদদ্বয় ধুয়ে নেবে এবং সালাত পড়ে নেবে। আর ওযূর অবশিষ্ট অঙ্গগুলোকে দ্বিতীয়বার ধৌত করতে হবে না। যে ব্যক্তি মুকীম অবস্থায় মাসাহ শুরু করল এরপর একদিন একরাত পূর্ণ হবার পূর্বে সফরে গেল, তখন সে পূর্ণ তিনদিন তিনরাত মাসাহ করবে। আর যে ব্যক্তি মুসাফির অবস্থায় মাসাহ শুরু করল, তারপর মুকীম হয়ে গেল, তাহলে সে যদি একদিন একরাত বা ততোধিক সময় মাসাহ করে থাকে, তবে তার ওপর আবশ্যক হবে মোজাদ্বয় খুলেফেলা। আর যদি এর চেয়ে কম সময় মাসাহ করে থাকে, তবে একদিন একরাত পরিপূর্ণ করবে। আর যে ব্যক্তি মোজার ওপর 'জুরমূক' পরিধান করে, সে উহার ওপরই মাসাহ করবে। জাওরাবাইনের ওপর মাসাহ জায়েয নেই, কিন্তু যদি তা চামড়া দ্বারা পূর্ণ বাঁধাইকৃত হয়, অথবা শুধু নিম্নভাগে চামড়া লাগানো হয়, তবে জায়েয হবে। আর সাহেবাইনের মতে, যদি তা খুব মোটা ও শক্ত হয় এবং ছেঁড়া না থাকে, তবে জায়েয হবে। পাগড়ি, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসাহ জায়েয নেই। তবে পটি বা ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহ জায়েয, যদিও তা বিনা ওযূতে বেঁধে থাকে। আর যদি ক্ষত না শুকিয়ে ব্যান্ডেজ পড়ে যায়, তবে মাসাহ বাতিল হবে না। আর যদি ক্ষত ভালো হয়ে ব্যান্ডিজ পড়ে যায়, তবে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোসল ফরয হলে মোজার ওপর মাসাহের বিধান ঃ

قَوْلُهُ لِمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْغُسْلُ الخ ঃ কোন ব্যক্তির ওপর যদি গোসল ফরয হয়, তবে তার জন্য মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয নেই। এটা হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত।

মাসাহ ভঙ্গ হবার কারণ ঃ

قَوْلُهُ يَنْقُضُ الْمَسْحَ الخ ঃ যেসব কারণে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যায় তা দ্বারা মোজার ওপর মাসাহও ভঙ্গ হয়ে যায়। এছাড়া মোজা খুলে ফেললে এবং মাসাহের মুদ্দাত শেষ হয়ে গেলেও মাসাহ ভঙ্গ হয়ে যায়। এরপর পা খুলে নতুন করে মাসাহ করে নিতে হয়।

মাসাহের মুদ্দাত শেষ হবার পর করণীয় ঃ

قَوْلُهٗ فَإِذَا مَضَتِ الْمُدَّةُ الخ ঃ মাসেহের মুদ্দাত শেষ হয়ে গেলে অথবা মোজা খুলে গেলে উভয় অবস্থায় যদি তার ওযূ থেকে থাকে, তবে তাকে শুধু পা ধৌত করে নিলেই চলবে, অন্যান্য অঙ্গগুলো ধৌত করতে হবে না।

মুকীম ও মুসাফির অবস্থায় মাসাহ করার পর অবস্থা পরিবর্তন করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنِ ابْتَدَأَ الْمَسْحَ الخ ঃ কোন ব্যক্তি যদি মুকীম অবস্থায় মাসাহ শুরু করে এরপর মাসাহের মুদ্দাত শেষ হবার পূর্বে সে মুসাফির হয়ে যায়, তখন মাসাহর মুদ্দাত তিনদিন তিনরাত হয়ে যাবে; ফলে সে তিনদিন তিনরাত মাসাহ করতে পারবে।

আর যদি কোন মুসাফির মাসাহ শুরু করার পর মুকীম হয়ে যায়, তবে সে একদিন একরাত মাসাহ করবে। যদি এর বেশি হয়ে যায়, তবে তৎক্ষণাৎ মোজাদ্বয় খুলে ফেলে পা ধৌত করে নেবে। আর একদিন এক রাতের কম হলে তা পূর্ণ করবে।

জুরমূকের পরিচয় ঃ জুরমূক ঐ মোজাকে বলা হয়, যা মোজার হেফাজতের জন্য মোজার ওপর পরিধান করা হয়। এর ওপর মাসাহ করা জায়েয।

পায়তাবার ওপর মাসেহের হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ الخ ঃ جَوْرَب বলা হয় পায়তাবাকে। পায়তাবার ওপর মাসাহ করা জায়েয নেই, তবে পায়তাবা যদি مُجَلَّد (মুজাল্লাদ) ও مُنَعَّل (মুনা'আ্যাল) হয় তবে মাসাহ জায়েয। এটি টাখনু বা গিড়া পর্যন্ত পরিধান করা হয়।

মুজাল্লাদের পরিচয় ঃ যে পায়তাবার পুরো অংশ চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়েছে, তাকে মুজাল্লাদ বলা হয়।

মুনা'অ্যালের পরিচয় ঃ যে পায়তাবার জুতা পরিমাপ চামড়া দ্বারা তৈরি করা হয়, তাকে মুনা'অ্যাল বলা হয়।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, জাওরাবাইন যদি (مُجَلَّد ও مُنَعَّل না হয়ে) শক্তভাবে নির্মিত হয় এবং তাতে কোন ছেঁড়া না থাকে, তবে ওহার ওপর মাসাহ জায়েয।

পাগড়ি, টুপি, বোরকা ও হাত মোজার ওপর মাসাহ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ لَا يَجُوْزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الخ ঃ পাগড়ি, টুপি, বোরকা এবং হাত মোজার ওপর মাসাহ করা জায়েয নেই। যেহেতু এগুলো আলাদা বস্তু, যা যে কোন সময় পড়ে ছুটে যাবে, আর এদের মাসাহ করা সম্পর্কীয় কোন হাদীস নেই।

ব্যান্ডেজের ওপর মাসাহের হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ عَلَى الْجَبَائِرِ الخ ঃ মোজার মত পট্টির ওপর মাসাহ করা জায়েয। ক্ষত ভালো হবার পূর্বে পটি পড়ে গেলে মাসাহ বাতিল হবে না। তবে ক্ষত ভালো হয়ে পড়ে গেলে মাসাহ বাতিল হয়ে যাবে।

মোজা ও ব্যাণ্ডেজের মাসাহের মধ্যে পার্থক্য ঃ

পটি ও মোজার ওপর মাসাহের মধ্যে কয়েক রকম পার্থক্য রয়েছে–

১. মোজার ওপর মাসাহের মুদ্দাত নির্ধারিত, পক্ষান্তরে পটির ওপর মাসাহের মুদ্দাত নির্ধারিত নয়; বরং ভালো হওয়া পর্যন্ত তার মুদ্দাত থাকবে।

২. বিনা ওযূতে পরিধান করলে মোজার ওপর মাসাহ জায়েয নেই, কিন্তু ব্যাণ্ডেজে এরূপ কোন শর্ত নেই।

৩. মোজা পা হতে খুলে গেলে মাসাহ বাতিল হয়ে যায়, আর ক্ষত ভালো হবার পূর্বে পটি খুলে পড়লে মাসাহ বাতিল হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْمَسْحُ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর।

২। মোজার ওপর মাসাহ করবার দলিল কি?

৪। اَلْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ -এর নিয়ম ও সময়সীমা (مُدَّت) উল্লেখ কর।

৫। جُرْمُوْق কাকে বলে? উহার হুকুম কি?

৬। جَوْرَبَيْن -এর পরিচয় ও উহার হুকুম লিখ।

৭। কি কি কারণে মাসাহ নষ্ট হয়ে যায়।

৮। পটির ওপর মাসাহের হুকুম বর্ণনা কর।

بَابُ الْحَيْضِ

اَقَلُّ الْحَيْضِ ثَلٰثَةُ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهَا وَمَا نَقَصَ مِنْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ بِحَيْضٍ وَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاَكْثَرُهُ عَشَرَةُ اَيَّامٍ وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ مِنَ الْحُمْرَةِ وَالصُّفْرَةِ وَالْكُدْرَةِ فِىْ اَيَّامِ الْحَيْضِ فَهُوَ حَيْضٌ حَتّٰى تَرَى الْبَيَاضَ خَالِصًا وَالْحَيْضُ يُسْقِطُ عَنِ الْحَائِضِ الصَّلٰوةَ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهَا الصَّوْمَ وَتَقْضِى الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِى الصَّلٰوةَ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَلَا يَأْتِيْهَا زَوْجُهَا وَلَايَجُوْزُ لِحَائِضٍ وَلَا لِجُنُبٍ قِرَاءَةُ الْقُرْاٰنِ –

হায়েযের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ হায়েযের সর্বনিম্ন সময়সীমা তিনদিন তিনরাত। যা এর কম সময়ে হবে তা হায়েয নয়; বরং ইস্‌তিহাযা। রক্তস্রাবের সর্বোচ্চ সময় দশদিন। যে রক্ত এর চেয়ে বেশি সময়ে হয় তা ইস্‌তিহাযা। হায়েযের দিনসমূহে লাল, হলুদ এবং মাটিয়া রং এর যা কিছু মহিলা দেখবে তা সবই হায়েয, খাঁটি সাদা রং দেখা পর্যন্ত। ঋতুস্রাব ঋতুবতী মহিলার ওপর সালাত রহিত করে দেয় এবং সাওম হারাম করে দেয়। পরে সাওম কাযা আদায় করবে, কিন্তু সালাত কাযা পড়বে না। ঋতুকালীন সময়ে মেয়েলোক মসজিদে প্রবেশ করবে না এবং কা'বা ঘর তওয়াফ করবে না, আর তার স্বামী তার সাথে সহবাস করবে না। ঋতুবতী মহিলা ও গোসল ফরয হয়েছে এরূপ ব্যক্তির কুরআন পাঠ করা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হায়েযের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ حَيْضٌ الخ ঃ হায়েয শব্দের অর্থ- প্রবাহিত হওয়া। যেমনি বলা হয়– حَاضَ الْوَادِىْ

পরিভাষায় হায়েযের পরিচয় হলো– هُوَدَمٌ يَنْفُضُهُ رَحِمُ اِمْرَأَةٍ سَلِيْمَةٍ عَنْ دَاءٍ وَ صِغَرٍ

অর্থাৎ হায়েয হল এমন রক্ত, যা কোন রোগ ও বয়সের স্বল্পতা ব্যতিরেকে মহিলার রাহেম হতে বের হয়।
অর্থাৎ প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলার বাচ্চাদানী হতে প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময়ে যে রক্ত বের হয় তাই হায়েয।

হায়েযের মুদ্দাত ঃ

قَوْلُهُ اَقَلُّ الْحَيْضِ الخ ঃ হায়েযের মুদ্দাত নিয়ে ইমামদের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়–

হানাফীদের নিকট হায়েযের সর্বনিম্ন সীমা তিনদিন তিনরাত, আর সর্বঊর্ধ্ব সীমা দশদিন। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ সর্ব নিম্নসীমা আড়াই দিন বলেন।

ইমাম শাফিয়ীর (রঃ) মতে, সর্বনিম্ন সীমা একদিন একরাত, আর ঊর্ধ্ব সীমা পনের দিন।

ইমাম মালিক (রঃ) -এর মতে, এর সর্বনিম্ন কোন সীমা নেই, এক ঘন্টাও হতে পারে।

সাদা ও কালো স্রাবের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ تَرَى الْبَيَاضَ الخ ঃ ঋতুকালীন কালো রক্তের ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতান্তর রয়েছে–

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, কালো রক্ত প্রথমে আসুক বা শেষে আসুক তা হায়েযের রক্ত।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর মতে, কালো বর্ণের যে রক্ত প্রথমে দেখা যাবে তা হায়েযের রক্ত নয়; বরং যা শেষে দেখা যাবে তা-ই হল হায়েযের রক্ত।

আর নারী যখন একেবারে বিশুদ্ধ সাদা রং দেখবে, তখন মনে করতে হবে যে তার হায়েয সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে গেছে, এখন সে পবিত্র হয়ে গেছে।

ঋতুগ্রস্ত মহিলার সালাত ও সাওমের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَتَقْضِى الصَّوْمَ الخ ঃ ঋতু অবস্থায় সালাত পড়া ও সাওম রাখা নিষিদ্ধ। তবে সাওমের কাযা করতে হবে, কিন্তু সালাতের কাযা আদায় করতে হবে না। কেননা সালাত দৈনন্দিন পাঁচবার পড়তে হয়। এর কাযার হুকুম দেয়া হলে কষ্টকর হয়ে পড়বে। পক্ষান্তরে সাওম বৎসরে একবার আসে, তাই তা কাযা করতে বান্দার ওপর কষ্টকর হয় না।

ঋতুবতী মহিলার মসজিদের প্রবেশের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا تَدْخُلُ الْمَسْجِدَ الخ ঃ ঋতুবতী মহিলা মসজিদে প্রবেশ করতে পারবে না, তবে মসজিদের ওপর দিয়ে যদি যাতায়াতের পথ হয়, তবে আসা যাওয়া করতে পারবে। আর স্রাব চলাকালীন বাইতুল্লাহ তওয়াফ করতে পারবে না।

কুরআন পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ قِرَاءَةَ الْقُرَانِ ঃ ঋতুবতী মহিলা কুরআন শরীফ পাঠ করতে পারবে না। তবে যে সমস্ত আয়াত দোয়া ও বরকতের জন্য পড়া হয় সেগুলো বরকতের নিয়তে পড়া জায়েয। ইমাম ত্বাহাবী (রঃ)-এর মতে, এক আয়াতের কম পড়া জায়েয। আর ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর একমত যে, কুরআনের শব্দসমূহকে বানান করে পড়তে পারবে, তবে মিলিয়ে পড়তে পারবে না।

وَلَا يَجُوزُ لِلْمُحْدِثِ مَسُّ الْمُصْحَفِ اِلَّا اَنْ يَأْخُذَهُ بِغِلَافِهٖ فَاِذَا انْقَطَعَ دَمُ الْحَيْضِ لِاَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ لَمْ يَجُزْ وَطْيُهَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ اَوْ يَمْضِىَ عَلَيْهَا وَقْتُ صَلٰوةٍ كَامِلَةٍ وَاِنْ اِنْقَطَعَ دَمُهَا لِعَشَرَةِ اَيَّامٍ جَازَ وَطْيُهَا قَبْلَ الْغُسْلِ وَالطُّهْرُ اِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ فِى مُدَّةِ الْحَيْضِ فَهُوَ كَالدَّمِ الْجَارِىْ وَاَقَلُّ الطُّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَلَا غَايَةَ لِاَكْثَرِهٖ وَدَمُ الْاِسْتِحَاضَةِ هُوَ مَاتَرَاهُ الْمَرْأَةُ اَقَلَّ مِنْ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ اَوْ اَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ اَيَّامٍ فَحُكْمُهٗ حُكْمُ الرُّعَافِ لَا يَمْنَعُ الصَّلٰوةَ وَلَا الصَّوْمَ وَلَا الْوَطْىَ وَاِذَا زَادَ الدَّمُ عَلَى الْعَشَرَةِ وَلِلْمَرْأَةِ عَادَةٌ مَعْرُوْفَةٌ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَمَازَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوْغِ مُسْتَحَاضَةً فَحَيْضُهَا عَشَرَةُ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَالْبَاقِىْ اِسْتِحَاضَةٌ -

---

সরল অনুবাদ ঃ মুহদিছ তথা যার ওযূ নেই এমন ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নেই, তবে গিলাফ তথা আচ্ছাদনীর দ্বারা ধরা জায়েয আছে। যদি দশ দিনের কমে হায়েযের রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করা বা পূর্ণ এক ওয়াক্ত সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত তার সাথে সহবাস করা জায়েয নেই। আর যদি দশদিন পরিপূর্ণ হবার পর রক্ত বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসলের পূর্বে তার সাথে সহবাস করা জায়েয।

হায়েযের মুদ্দাতের সময়ে দুই রক্তের মাঝে যে তুহর বা পবিত্রতা ফারাক সৃষ্টি করবে তা প্রবহমান রক্তের মতোই গণ্য হবে। আর পবিত্রতার সর্বনিম্ন সীমা হল পনের দিন, বেশির কোন সীমা নেই। ইস্‌তিহাযার রক্ত হল যা তিন দিনের কম সময়ে এবং দশ দিনের বেশি সময়ে মহিলা দেখে। এর হুকুম হল নাকসীরের হুকুম। এটা সালাত, সাওম এবং সহবাসকে বাধা প্রদান করবে না। যদি রক্তস্রাব দশ দিনের বেশি হয় এবং সে মহিলার হায়েযের নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে, তাহলে তাকে নির্দিষ্ট অভ্যাস মতো সময়ের দিকে ফেরানো হবে। আর নির্দিষ্ট সময়ের অতিরিক্ত যা হয় তা ইস্‌তিহাযা হিসেবে পরিগণিত হবে। যদি কোন মহিলার বালেগ হবার সাথে সাথে রোগাগ্রস্ত তথা ইস্‌তিহাযায় আক্রান্ত হয়, তাহলে প্রত্যেক মাসে দশদিন তার ঋতুস্রাব ধরতে হবে। আর বাকিগুলোকে ইস্‌তিহাযা হিসেবে গণ্য করতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওযূবিহীন ব্যক্তির কুরআন স্পর্শ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ بِغِلَافِهِ ঃ ওযূবিহীন ব্যক্তি, ঋতুবতী এবং জুনূবী ব্যক্তি কুরআন স্পর্শ করতে পারবে না, তবে গেলাফ তথা যে কাপড় দ্বারা কুরআনকে আবৃত করা হয় তা দ্বারা ধরতে পারবে। প্রয়োজনে গেলাফ না থাকলে আলাদা পবিত্র কাপড় দ্বারা ধরতে পারবে।

ঋতুবতীর সাথে সহবাসের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ وَطْيُهَا حَتّٰى تَغْتَسِلَ الخ ঃ ঋতু চলাকালীন সময়ে সহবাস করা নিষিদ্ধ; এতে অনেক ক্ষতিকর রোগের সৃষ্টি হয়, তাই ঋতু শেষ হবার পর সহবাস করতে হবে। যদি দশ দিনের কম সময়ে ঋতু বন্ধ হয়ে যায়, তবে গোসল করা অথবা পরিপূর্ণভাবে এক ওয়াক্ত সালাতের সময় অতিক্রম করা ছাড়া সহবাস করা যাবে না। তবে দশ দিনের পর হায়েয সমাপ্তি হলে তৎক্ষণাৎ সহবাস করা জায়েয।

মধ্যখানে ঋতু বন্ধ হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِذَا تَخَلَّلَ بَيْنَ الدَّمَيْنِ الخ ঃ ঋতু চলাকালীন যদি মধ্যখানে কিছু সময় বা দুই একদিন ঋতু বন্ধ থাকে, তবে তাকে ঋতুর সময় বলেই ধরে নিতে হবে। এ সময়ে সালাত সাওম করা যাবে না এবং সহবাসও করা যাবে না।

পবিত্রতার সর্বনিম্ন সীমা ঃ

قَوْلُهُ وَلَاغَايَةَ لِأَكْثَرِهِ الخ ঃ মহিলার পবিত্র অবস্থার সর্বোচ্চ কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই, তবে সর্বনিম্ন সময়ের ব্যাপারে কিছুটা মতান্তর দেখা যায়–

হযরত আতা (রঃ) -এর মতে, পবিত্র অবস্থার সর্বনিম্নসীমা ১৯ দিন। কেননা মাস যদি ২৯ দিনে হয় তবে ১০ দিন হায়েয আর বাকি ১৯ দিন পবিত্র অবস্থা হবে।

ইমাম মালিক (রঃ) হতে কয়েকটি মত পাওয়া যায়, যথাক্রমে ১০ দিন ৮ দিন কিংবা ৫দিন।

ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী (রঃ) সহ সমস্ত ফকীহের মতে, সর্বনিম্ন সীমা হল ১৫ দিন। এ বিষয়ে সাহাবীগণও একমত পোষণ করেছেন।

ইস্‌তিহাযার রক্তের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ دَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ الخ ঃ পাঁচ প্রকারের রক্তকে ইস্‌তিহাযা বা রোগের রক্ত বলা হয়–

১. যে রক্ত নয় বছরের কম বয়স্কা বালিকার প্রবাহিত হয়। ২. যে রক্ত দশ দিনের বেশি সময় হয়।

৩. যে রক্ত তিন দিনের কম সময় হয়। ৪. যে রক্ত গর্ভাবস্থায় প্রবাহিত হয়।

৫. যে রক্ত প্রসবান্তে চল্লিশ দিনের বেশি সময় প্রবাহিত হয়।

ইস্‌তিহাযাযুক্ত মহিলার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الرُّعَافِ الخ ঃ যে মহিলার ইস্‌তিহাযা হয় তার ইস্‌তিহাযা চলাকালীন সময়ের হুকুম হল, নাকসীর রোগে (তথা যার নাক দিয়ে অনবরত রক্ত পড়ে) আক্রান্ত ব্যক্তির হুকুমের ন্যায় তথা শরীয়তের ভাষায় তাকে অপারগ ব্যক্তি বলা হয়। এরূপ ব্যক্তিগণ প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন ওযূ করবে। সালাত সাওম কোনটাই তার ওপর মাফ নেই।

নির্দিষ্ট দিনের অতিরিক্ত রক্ত এলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ أَوْ أَكْثَرَ الخ ঃ যে নারীর প্রত্যেক মাসে একটি নির্দিষ্ট সময় তথা ৭ দিন বা ৩ দিন ঋতুস্রাব হবার নিয়ম, কোন মাসে যদি তার নির্দিষ্ট নিয়মের বেশি দিন হায়েয আসে, তবে অতিরিক্ত দিনগুলোকে ইস্‌তিহাযা ধরতে হবে এবং অতিরিক্ত দিনগুলোতে যথারীতি সালাত সাওম করতে হবে।

বালেগা হবার পর পরই ইস্‌তিহাযা শুরু হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنِ ابْتَدَأَتْ مَعَ الْبُلُوغِ الخ ঃ যে হায়েয দ্বারা মেয়ে বালেগা হল তা শুরু হবার পর দশ দিনেও যদি বন্ধ না হয়, তবে দশদিন হায়েয ধরে বাকি দিন গুলোকে ইস্‌তিহাযা হিসেবে গণ্য করতে হবে। তাই যথারীতি অতিরিক্ত দিনগুলোর সালাত ও সাওম আদায় করতে হবে।

وَالْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهٖ سَلِسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِىْ لَايَرْقَأُ يَتَوَضَّؤُوْنَ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ وَيُصَلُّوْنَ بِذٰلِكَ الْوُضُوْءِ فِى الْوَقْتِ مَاشَاءُوْا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ فَاِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ بَطَلَ وُضُوْءُهُمْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ اِسْتِيْنَافُ الْوُضُوْءِ لِصَلٰوةٍ اُخْرٰى وَالنِّفَاسُ هُوَ الدَّمُ الْخَارِجُ عَقِيْبَ الْوِلَادَةِ وَالدَّمُ الَّذِىْ تَرَاهُ الْحَامِلُ وَمَا تَرَاهُ الْمَرْأَةُ فِىْ حَالِ وِلَادَتِهَا قَبْلَ خُرُوْجِ الْوَلَدِ اِسْتِحَاضَةٌ وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَاحَدَّ لَهٗ وَاَكْثَرُهٗ اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ اِسْتِحَاضَةٌ وَاِذَا تَجَاوَزَ الدَّمُ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَقَدْ كَانَتْ هٰذِهِ الْمَرْأَةُ وَلَدَتْ قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَهَا عَادَةٌ فِى النِّفَاسِ رُدَّتْ اِلٰى اَيَّامِ عَادَتِهَا وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهَا عَادَةٌ فَنِفَاسُهَا اَرْبَعُوْنَ يَوْمًا وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِىْ بَطْنٍ وَاحِدٍ فَنِفَاسُهَا مَاخَرَجَ مِنَ الدَّمِ عَقِيْبَ الْوَلَدِ الْاَوَّلِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الْوَلَدِ الثَّانِىْ -

সরল অনুবাদ ঃ ইস্তিহাযার রোগিণী এবং যার অনবরত ফোটা ফোটা পেশাব ঝরে এবং যার সর্বদা নাক হতে রক্ত পড়ে এবং এমন ক্ষত যা (বন্ধ হয়নি) থেকে সর্বদা রক্ত বা পুঁজ পড়ে, এরূপ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক সালাতের ওয়াক্তে ওযূ করবে এবং সে ওযূ দিয়ে উক্ত ওয়াক্তের মধ্যে যত ইচ্ছা ফরয ও নফল সালাত পড়তে পারবে। কিন্তু সালাতের ওয়াক্ত চলে গেলে ওযূ বাতিল হয়ে যাবে, আর তাদের ওপর আবশ্যক হবে পরবর্তী সালাতের জন্য পুনরায় ওযূ করা।

নিফাস হল, সন্তান প্রসব হবার পর যে রক্ত বের হয়, আর গর্ভবর্তী যে রক্ত দেখবে এবং মহিলা সন্তান প্রসবের পূর্বে যে রক্ত প্রত্যক্ষ করবে তাকে ইস্তিহাযা বলা হয়। নিফাসের নিম্নতম কোন সময়সীমা নেই, তবে উর্ধ্বতম সময়সীমা হল চল্লিশ দিন, আর এর অতিরিক্ত যা হবে তা ইস্তিহাযা হিসেবে গণ্য হবে। যদি কোন মহিলার চল্লিশ দিনের বেশি স্রাব অতিক্রম করে অথবা এ নারী এর পূর্বেও সন্তান প্রসব করেছে এবং পূর্বের প্রসবে তার একটি নির্দিষ্ট সময়ের অভ্যাস ছিল, তবে তার অভ্যাসের দিনগুলোর দিকে নিফাসের মুদ্দাতকে ফেরাতে হবে। আর যদি তার কোন নির্ধারিত অভ্যাস না থাকে, তবে তার নিফাস চল্লিশ দিন (ধরতে) হবে। কোন মহিলা এক পেট হতে (জমজ) দু'টি সন্তান প্রসব করলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, প্রথম সন্তান প্রসবের পর হতে যে রক্ত বের হবে তা হতে নিফাস গণনা করতে হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (রহঃ)-এর মতে, দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর হতে নিফাস ধরতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্তিহাযাগ্রস্ত, নাকসীর এবং আঘাত হতে সর্বদা রক্ত ঝরা ব্যক্তির হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَالْمُسْتَحَاضَةُ الخ ঃ ইস্তিহাযাগ্রস্ত মহিলা, যার নাক দিয়ে অনবরত রক্ত পড়ে এবং যার সর্বদা পেশাব পড়ে এবং এমন আঘাতযুক্ত ব্যক্তি যার আঘাত হতে সর্বদা রক্ত বা পুঁজ বের হয়, এরূপ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক ওয়াক্ত সালাতের জন্য নতুন ওযূ করবে এবং এ ওযূ দ্বারা সে ওয়াক্তে ফরয সুন্নত নফল সালাত যত ইচ্ছা পড়তে পারবে। আর ওয়াক্ত শেষ হবার

সাথে সাথে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। পরবর্তী ওয়াক্তের জন্য তাকে পুনরায় ওযূ করতে হবে। এটা হানাফীদের অভিমত। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন— اَلْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلٰوةٍ

আর ইমাম শাফিয়ী (রঃ) -এর মতে, প্রত্যেক ফরয সালাতের জন্য পৃথক পৃথকভাবে ওযূ করতে হবে।

ওয়াক্ত শেষ হবার পর ওযূ ভঙ্গ হওয়া সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا خَرَجَ الْوَقْتُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর মতে, ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে ওযূ ভঙ্গ হবে এবং নতুন ওয়াক্ত প্রবেশ করার ফলেও ওযূ ভঙ্গ হবে।

আর ইমাম যুফার (রঃ) -এর মতে, শুধু নতুন ওয়াক্ত প্রবেশ করলেই ওযূ ভঙ্গ হবে। অতএব উল্লিখিত রোগগ্রস্ত কেউ যদি সুবহে সাদিকের সময় ওযূ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা, আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, সূর্য উদয়ের সাথে সাথে ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে। আর ইমাম যুফার (রঃ) -এর মতে, সূর্য হেলে গেলে তার ওযূ ভঙ্গ হবে। আর কেউ যদি সূর্য উদয়ের পর ওযূ করে, তবে যোহরের জন্য তরফাইনের নিকট তাকে আর ওযূ করতে হবে না। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ ও যুফার (রহঃ)-এর মতে, যোহরের ওয়াক্ত আসার সাথে সাথে তার ওযূ ভেঙ্গে যাবে, তাকে যোহরের জন্য নতুন করে ওযূ করতে হবে।

নিফাসের মুদ্দাত ঃ

وَاَقَلُّ النِّفَاسِ لَاحَدَّ لَهُ الخ ঃ নিফাসের সর্বনিম্ন সীমার ব্যাপারে কোন মতান্তর নেই তথা তা এক ঘন্টাও হতে পারে আবার ১০ /১৫ /২০ দিনও হতে পারে। তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা নিয়ে মতান্তর রয়েছে–

হানাফীদের নিকট নিফাসের সর্বোচ্চ সীমারেখা হল চল্লিশ দিন। এরপর যা হবে তা ইস্‌তিহাযা হিসেবে পরিগণিত হবে।

ইমাম শাফিয়ী ও মালিক (রঃ) -এর মতে, নিফাসের সর্বোচ্চ সময়সীমা হল ৬০ দিন।

দু'টি সন্তান প্রসব করলে নিফাসের হিসাব গণনার ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ الخ ঃ একই পেট হতে যদি দু'টি সন্তান পরপর জন্ম গ্রহণ করে, তখন নিফাস কখন হতে গণনা করা হবে এ বিষয়ে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়–

ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (রঃ) -এর মতে, দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের পর হতে নিফাস গণ্য হবে। কেননা একটি প্রসবের পর মেয়ে লোকটি অন্তঃসত্ত্বা থেকে যায়, আর অন্তঃসত্ত্বাদের রক্ত ইস্‌তিহাযা হিসেবে পরিগণিত হয়।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর মতে, প্রথম সন্তান প্রসবের পর হতে নিফাসের মুদ্দাত শুরু হবে। কেননা প্রথম সন্তান প্রসবের পর জরায়ুর মুখ খুলে যায়। অতএব এরপর যে রক্তস্রাব হয় তা জরায়ুর রক্তই বলতে হবে। কাজেই সন্তান প্রসবের পর রক্ত বের হবার ফলে একে নিফাস হিসেবে গণ্য করা হবে।

اَلتَّمَارِيْنُ [অনুশীলনী]

১। حَيْض -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।
২। حَيْض -এর মুদ্দাত ও হুকুম বর্ণনা কর।
৩। اِسْتِحَاضَة কাকে বলে? اِسْتِحَاضَة ও حَيْض -এর মধ্যে পার্থক্য কি?
৪। اِسْتِحَاضَة -এর লক্ষণ ও হুকুম বর্ণনা কর।
৫। طُهْر কাকে বলে? طُهْر -এর নিম্ন ও উর্ধ্ব সময়সীমা উল্লেখ কর।
৬। نِفَاس -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।
৭। نِفَاس -এর মুদ্দাত ও হুকুম বর্ণনা কর।
৮। دم اِسْتِحَاضَة কত প্রকার ও কি কি?
৯। অন্তঃসত্ত্বা কালীন যে রক্তস্রাব হয় উহার হুকুম কি?
১০। مَنْ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِى بَطْنٍ وَاحِدٍ -এর হুকুম ইমামগণের মতামতসহ উল্লেখ কর।
১১। اَلرُّعَافُ -এর পরিচয় ও হুকুম বর্ণনা কর।
১২। নিম্নলিখিত লোকদের হুকুম কি? اَلْمُسْتَحَاضَةُ وَمَنْ بِهٖ سَلِسُ الْبَوْلِ وَالرُّعَافُ الدَّائِمُ وَالْجُرْحُ الَّذِىْ لَايَرْقَأُ

بَابُ الْاَنْجَاسِ

تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ وَاجِبٌ مِنْ بَدَنِ الْمُصَلِّىْ وَثَوْبِهٖ وَالْمَكَانِ الَّذِىْ يُصَلِّىْ عَلَيْهِ وَيَجُوْزُ تَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ بِالْمَاءِ وَبِكُلِّ مَائِعٍ طَاهِرٍ يُمْكِنُ اِزَالَتُهَا بِهٖ كَالْخَلِّ وَمَاءِ الْوَرْدِ وَاِذَا اَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ لَهَا جِرْمٌ فَجَفَّتْ فَدَلَكَهٗ بِالْاَرْضِ جَازَ الصَّلٰوةُ فِيْهِ وَالْمَنِىُّ نَجَسٌ يَجِبُ غَسْلُ رَطْبِهٖ فَاِذَا جَفَّ عَلَى الثَّوْبِ اَجْزَاهُ فِيْهِ الْفَرْكُ ، وَالنَّجَاسَةُ اِذَا اَصَابَتِ الْمَرْاٰةَ اَوِ السَّيْفَ اِكْتَفٰى بِمَسْحِهِمَا وَاِنْ اَصَابَتِ الْاَرْضَ نَجَاسَةٌ فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ وَذَهَبَ اَثَرُهَا جَازَتِ الصَّلٰوةُ عَلٰى مَكَانِهَا وَلَا يَجُوْزُ التَّيَمُّمُ مِنْهَا -

অপবিত্রতার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সালাত আদায়কারীর শরীর, কাপড় এবং সালাত পড়ার স্থান হতে অপবিত্রতা দূর করে পবিত্র করা ওয়াজিব। পানি এবং প্রত্যেক এমন প্রবাহিত পবিত্র জিনিস যদ্বারা অপবিত্রতা দূর করা সম্ভব– এসব দ্বারা অপবিত্রতা দূর করে পবিত্র করা জায়েয, যেমন– সিরকা এবং গোলাপের পানি। যদি কোন দৃশ্যমান অপবিত্রতা মোজার সাথে লেগে শুকিয়ে যায়, তবে তাকে মাটির সাথে ঘর্ষণ করলে তা পরিধান করে সালাত পড়া জায়েয হবে। বীর্য নাপাক, উহা ভেজা হলে ধৌত করা ওয়াজিব। আর যদি তা কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যায়, তবে তা নখ দ্বারা খুটিয়ে বা ঘর্ষণ করে পৃথক করে দিলে যথেষ্ট হবে।

আয়না বা তরবারিতে অপবিত্রতা লেগে গেলে উভয়কে মোছে নিলেই যথেষ্ট হবে। আর অপবিত্রা যদি মাটিতে লেগে শুকিয়ে যায় আর তার চিহ্নও দুরীভূত হয়ে যায়, তবে ঐ স্থানের ওপর সালাত পড়া জায়েয। কিন্তু সে স্থানের মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রবহমান বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন ঃ

قَوْلُهٗ بِكُلِّ مَائِعٍ الخ ঃ পানি এবং পানি জাতীয় প্রবহমান বস্তু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয। এটা হানাফীদের অভিমত।

আর ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফিয়ী (রঃ) -এর মতে, পানি ছাড়া অন্য কোন প্রবাহিত বস্তু দ্বারা পবিত্রতা লাভ করা যায় না, তাই পানি ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয নেই।

তবে যে সমস্ত প্রবাহিত জিনিস দ্বারা অপবিত্রতা দূর করা যায় না, যেমন– তৈল এসব বস্তু দ্বারা সর্ব সম্মতিক্রমে পবিত্রতা অর্জিত হয় না।

মোজা পবিত্র করণের নিয়ম ঃ

وَاِذَا اَصَابَتِ الْخُفَّ نَجَاسَةٌ الخ ঃ আকৃতি বিশিষ্ট অপবিত্রতা যেমন– পায়খানা, রক্ত, বীর্য, গোবর ইত্যাদি এগুলো লেগে শুকিয়ে গেলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর নিকট মাটিতে ঘর্ষণ করলে পবিত্র হয়ে যাবে। আর এগুলো ভেজা হলে সর্ব সম্মতিক্রমে ধৌত করতে হবে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) -এর নিকট ভেজা-শুকনা উভয় অবস্থায় ধৌত করতে হবে।

বীর্য হতে পবিত্র করার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ اَجْزَاهُ فِيْهِ الْفَرْكُ ঃ বীর্য নাপাক। এটা হতে পবিত্রতা অর্জন আবশ্যক।

ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর মতে, বীর্য কাপড়ে লেগে শুকিয়ে গেলে কাপড়কে ঘষে নিলে কাপড় পাক হয়ে যায়। আর ভেজা হলে সর্ব সম্মতিক্রমে ধৌত করতে হবে।

ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (রঃ) -এর মতে, সর্বাবস্থায় ধৌত করতে হবে।

তরবারি, আয়না বা অনুরূপ শক্ত জিনিস পবিত্র করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ إِذَا اَصَابَتِ الْمِرْاَةَ اَوِ السَّيْفَ الخ ঃ তলোয়ার, আয়না বা অনুরূপ কঠিন কোন জিনিসে অপবিত্রতা লেগে গেলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর মতে, মোছে ফেললে পাক হয়ে যাবে। এটাই সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মত। ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিয়ী (রঃ) -এর নিকট ধৌত না করলে পাক হবে না।

মাটি অপবিত্র হলে পাক করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ اَصَابَتِ الخ ঃ মাটিতে নাপাকী লেগে রৌদ্রে শুকিয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ঐ মাটিতে সালাত পড়া জায়েয, কিন্তু সে মাটি দিয়ে তায়াম্মুম করা জায়েয হবে না।

ইমাম শাফিয়ী ও যুফার (রঃ) -এর মতে, সে মাটিতে সালাত পড়াও জায়েয নেই, তায়াম্মুম করাও জায়েয নেই।

ইমাম মালিক (রঃ) -এর মতে, নাপাকী কম হোক বা বেশি হোক কোন পরিমাণই গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং সর্বাবস্থায় অপবিত্র থেকে যাবে।

وَمَنْ اَصَابَتْهُ مِنَ النَّجَاسَةِ الْمُغَلَّظَةِ كَالدَّمِ وَالْبَوْلِ وَالْغَائِطِ وَالْخَمْرِ مِقْدَارَ الدِّرْهَمِ اَوْمَا دُوْنَهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ وَاِنْ زَادَ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ اَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ كَبَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ جَازَتِ الصَّلٰوةُ مَعَهُ مَالَمْ تَبْلُغْ رُبْعَ الثَّوْبِ وَتَطْهِيْرُ النَّجَاسَةِ الَّتِيْ يَجِبُ غَسْلُهَا عَلٰى وَجْهَيْنِ فَمَا كَانَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا زَوَالُ عَيْنِهَا اِلَّا اَنْ يَبْقٰى مِنْ اَثَرِهَا مَا يَشُقُّ اِزَالَتُهَا وَمَا لَيْسَ لَهُ عَيْنٌ مَرْئِيَّةٌ فَطَهَارَتُهَا اَنْ يَغْسِلَ حَتّٰى يَغْلِبَ عَلٰى ظَنِّ الْغَاسِلِ اَنَّهُ قَدْ طَهُرَ وَالْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ يُجْزِئُ فِيْهِ الْحَجَرُ وَالْمَدَرُ وَمَا قَامَ مَقَامَهُمَا يَمْسَحُهُ حَتّٰى يُنَقِّيَهُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ وَغَسْلُهُ بِالْمَاءِ اَفْضَلُ وَاِنْ تَجَاوَزَتِ النَّجَاسَةُ مَخْرَجَهَا لَمْ يَجُزْ فِيْهِ اِلَّا الْمَاءُ اَوِ الْمَائِعُ وَلَا يَسْتَنْجِىْ بِعَظْمٍ وَلَا رَوْثٍ وَلَا بِطَعَامٍ وَلَا بِيَمِيْنِهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ কোন ব্যক্তির (শরীর বা) কাপড়ে এক দিরহাম বা তার চেয়ে কম পরিমাণ গাঢ় অপবিত্রতা যেমন– রক্ত, পেশাব, পায়খানা এবং মদ লেগে যায়, তাহলে এগুলোসহ সালাত পড়া জায়েয। আর যদি এর চেয়ে বেশি হয়, তবে জায়েয হবে না। যদি কাপড়-চোপড়ে হালকা অপবিত্রতা লাগে, যেমন– সেসব জন্তুর পেশাব যাদের গোশ্‌ত খাওয়া জায়েয এটা কাপড়ের এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত না পৌছলে তা সহ সালাত পড়া জায়েয। যেসব অপবিত্রতা ধৌত করা ওয়াজিব সেগুলো দু'ভাবে পবিত্র করা যায়– (১) যেগুলোর আকৃতি দৃষ্টি গোচর হয় তার পবিত্রতা হল আকৃতি দূর হয়ে যাওয়া। কিন্তু যদি উহার এমন কোন চিহ্ন বা দাগ অবশিষ্ট থেকে যায়, যা উঠিয়ে ফেলা অসম্ভব। (তাতে কোন ক্ষতি নেই।) (২) আর যেটা অবিকল পরিদৃষ্ট হয় না তার পবিত্রতা হল এমনভাবে ধৌত করা যে, ধৌতকারীর স্থির ধারণা হয় যে, এখন পাক হয়েছে।

ইস্তিনজা (শৌচকার্য) করা সুন্নত। পাথর, মাটির ঢিলা আর যা উহাদের স্থলাভিষিক্ত হয় উহা দ্বারা ইস্তিনজা যথেষ্ট হবে। এগুলো দ্বারা এমন ভাবে মোছবে যাতে পরিষ্কার হয়ে যায়। এতে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা সুন্নত নয়, তবে উহা পানি দ্বারা ধৌত করাই উত্তম। যদি অপবিত্রতা বের হবার স্থান অতিক্রম করে যায়, তবে পানি বা ঐ জাতীয় প্রবাহিত জিনিস দ্বারা ধৌত না করলে (পাক) জায়েয হবে না। হাড়, গোবর, খাদ্যবস্তু এবং ডান হাত দ্বারা ইস্তিনজা করবে না তথা এগুলো দ্বারা ইস্তিনজা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নাজাসাতে গলীযার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَصَابَتْهُ مِنْ نَجَاسَةٍ الخ ঃ হানাফীদের নিকট নাজাসাতে গলীযা যদি এক দিরহাম বা তার কম পরিমাণ স্থানে লাগে, তবে তা সহ সালাত পড়া জায়েয। আর ইমাম শাফিয়ী ও যুফার (রঃ) -এর মতে, সামান্য পরিমাণে নাজাসাত লাগলেও ধৌত করা ওয়াজিব; যদিও তা এক দিরহাম অপেক্ষা কম হয়।

নাজাসাতে খফীফার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ ঃ নাজাসাতে খফীফা যদি শরীর অথবা কাপড়ে লাগে, তবে এক চতুর্থাংশ পর্যন্ত হলে তা মাফ তথা তা সহ সালাত পড়া জায়েয। এর অতিরিক্ত হলে ধৌত করা ওয়াজিব। এটা শায়খাইনের অভিমত। এর ওপরই ফতোয়া। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, নাজাসাতে খফীফা দ্বারা যদি সমস্ত কাপড়ও ভিজে যায়, তখনও তা সহ সালাত জায়েয হবে।

চিহ্নযুক্ত নাপাকী দূর করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ مَايَشُقُّ اِزَالَتُهَا الخ ঃ যে নাপাকীর চিহ্ন শুধু পানি দ্বারাই মোছা যায় না সাবান ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, উহা দূরীভূত করণকে দুরূহ বলা হয়। যদি পানি দ্বারা ধৌত করার পর চিহ্ন থেকে যায় তাতেই কাপড় পাক বলে গণ্য হবে। তবে গন্ধ দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

চিহ্নহীন নাপাকী দূর করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ حَتّٰى يَغْلِبَ عَلٰى الخ ঃ যে নাপাকী দেখা যায় না যেমন– পেশাব এরূপ নাপাকী ধৌতকারীর ধারণা অনুযায়ী পাক বলে গণ্য হবে তথা ধৌতকারী কয়েকবার ধৌত করার পর যদি নিশ্চিত হয় যে, এখন অপবিত্রতা দূরীভূত হয়ে গেছে তখনই পবিত্র বলে গণ্য হবে। ৩ বার, ৫ বার কিংবা ৭ বার ধৌত করা আবশ্যক নয়।

ইস্তিনজার প্রকারভেদ ঃ

قَوْلُهُ الْاِسْتِنْجَاءُ سُنَّةٌ الخ ঃ গ্রন্থকার ইস্তিনজাকে সুন্নত বলেছেন, বস্তুত ইস্তিনজা পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা–

১. **ফরয** ঃ নাজাসাত যদি গুহ্যদ্বার অতিক্রম করে চতুর্দিকে এক দিরহামের অধিক স্থান ছড়িয়ে যায়, তখন ইস্তিনজা করা ফরয।
২. **ওয়াজিব** ঃ নাপাকী যখন এক দিরহামের পরিমাণ স্থানে বিস্তার করে, তখন ইস্তিনজা করা ওয়াজিব।
৩. **সুন্নতঃ** এক দিরহামের কম হলে তখন ইস্তিনজা করা সুন্নত।
৪. **মুস্তহাব** ঃ নাপাকী যদি গুহ্যদ্বার অতিক্রম না করে, তখন ইস্তিনজা করা মুস্তাহাব।
৫. **মাকরূহ** ঃ ডান হাতে ইস্তিনজা করা মাকরূহ।

ইস্তিনজার আদাব ঃ

ইস্তিনজার আদাবসমূহ নিম্নরূপ– (১) কেবলাকে সামনে এবং পিছনে না রেখে বসা, (২) চন্দ্র, সূর্য এবং বায়ু প্রবাহের দিকে মুখ করে না বসা, (৩) নিচু জায়গায় বসে উঁচু জায়গায় পেশাব-পায়খানা না করা, (৪) দোয়া পড়ে পায়খানা বা পেশাবখানায় প্রবেশ করা, (৫) ঢিলা ব্যবহারের পর পানি ব্যবহার করা, (৬) রাস্তাঘাট, ফলদার ও ছায়াদার বৃক্ষের নিচে না বসা।

ঢিলার সংখ্যার ব্যাপারে মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِيْهِ عَدَدٌ مَسْنُوْنٌ الخ ঃ ইমাম শাফিয়ী (রঃ) -এর নিকট ঢিলা তিনটি হওয়া ওয়াজিব। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন— لَايَسْتَنْجِى احدكم بِاقلّ مِنْ ثَلَاثَةِ احجارٍ

আর হানাফীদের নিকট তিন ঢিলা ব্যবহার করা আবশ্যক নয়; বরং (إِنْقَاءُ مَحَلٍّ) নাপাকী বের হবার স্থান পরিষ্কার করাই আবশ্যক। আর তা এক ঢিলা দিয়ে হলেও চলবে, আর এক ঢিলার তিন মাথা দ্বারা তিনবার করলেও চলবে, তবে বেজোড় ঢিলা ব্যবহার করা উত্তম। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন— مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَاحَرَجَ

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। نَجَاسَة কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?

২। নাজাসাতে গলীযা ও খফীফা কাকে বলে ? তাদের হুকুম বর্ণনা কর।

৩। নাপাকী হতে কিসের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা জায়েয?

৪। যদি কারো শরীরে বা কাপড়ে নাপাক বস্তু লাগে তবে উহার হুকুম কি?

৫। দৃশ্যমান ও অদৃশ্যমান নাজাসাত কাকে বলে? এ সকল নাজাসাত হতে পাক হওয়ার নিয়ম বর্ণনা কর।

৬। আয়না, তলোয়ার ও জমিনে নাপাকী লাগলে উহার শরয়ী বিধান কি?

৭। মধু, তৈল, ঘৃত ও চিনিতে নাজাসাত পড়লে কিভাবে পাক করতে হয়?

৮। মোজায় নাপাক বস্তু থাকলে সালাত জায়েয হবে কিনা?

৯। اَلْاِسْتِنْجَاءُ -এর অর্থ কি? কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা ইস্তিনজা বৈধ, আর কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা বৈধ নয়? বর্ণনা কর।

১০। اِسْتِنْجَاء কত প্রকার ও কি কি?

১১। اِسْتِنْجَاء করার নিয়ম ও হুকুম বর্ণনা কর।

১২। কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা ইস্তিনজা করা জায়েয এবং কোন্ কোন্ বস্তু দ্বারা নাজায়েয? বর্ণনা কর।

كِتَابُ الصَّلٰوةِ

أَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ الثَّانِي وَهُوَ الْبَيَاضُ الْمُعْتَرِضُ فِي الْأُفُقِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ وَأَوَّلُ وَقْتِ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ سِوٰى فَيْءِ الزَّوَالِ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ إِذَا خَرَجَ وَقْتُ الظُّهْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ وَأَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ إِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَا لَمْ تَغِبِ الشَّفَقُ وَهُوَ الْبَيَاضُ الَّذِي يُرٰى فِي الْأُفُقِ بَعْدَ الْحُمْرَةِ عِنْدَ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ الْحُمْرَةُ -

সালাতের পর্ব

সালাতের ওয়াক্তসমূহ

সরল অনুবাদ ঃ ফজরের ওয়াক্ত শুরু হয়, যখন ফাজরে ছানী তথা সুবহি সাদিক উদিত হয়। আর তাহল (পূর্ব) আকাশের আড়াআড়ি সাদা আভা। ফজরের শেষ সময় হল সূর্য উদিত হবার পূর্ব পর্যন্ত। যোহরের প্রথম ওয়াক্ত সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে যাবার সময় হতে শুরু হয়। আর যোহরের শেষ ওয়াক্ত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, প্রত্যেক বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত তার দ্বিগুণ ছায়া হওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, (মূল ছায়া ব্যতীত) একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের শেষ ওয়াক্ত। আর উল্লিখিত উভয় মত অনুযায়ী যোহরের ওয়াক্ত চলে যাবার পরই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর সূর্যাস্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত থাকে। সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। আর শেষ ওয়াক্ত হল, শাফাক তথা আকাশের লালিমা ডুবে না যাওয়া পর্যন্ত। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, শাফাক হল সাদা আভা যা লাল আকৃতির পর আকাশে দেখা যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন— লাল আভাই হল শাফাক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الصَّلٰوةِ ঃ

মুসান্নিফ (রহঃ) طَهَارَتْ -এর আলোচনা শেষে সালাতের আলোচনা আরম্ভ করেছেন। কেননা সালাত হল আসল উদ্দেশ্য। আর সালাতের জন্য তাহারত হল شرط اعظم বা বড় শর্ত, আর কোন বিষয়ের শর্তকে তার পূর্বেই উল্লেখ করতে হয়, কাজেই এখানে শর্তকে উল্লেখ করার পর مشروط হিসেবে সালাতকে উল্লেখ করা হয়েছে।

صَلٰوة -এর পরিচয় ঃ

এটা صَلّٰى হতে নির্গত। এর অর্থ হল- تَحْرِيْكُ الصَّلْوَيْنِ বা পাঁজর নড়াচড়া করা। যেহেতু সালাতের মধ্যে পাঁজর নড়াচড়া করা হয়, তাই সালাতকে صلوة বলা হয়।

صلوة শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হল صَلَوَاتٌ, এর অনেকগুলো শাব্দিক অর্থ রয়েছে, যেমন- সালাত, দোয়া, রহমত, দরূদ, ইসতিগফার ইত্যাদি।

পরিভাষায় সালাতের পরিচয় হল—

هِىَ عِبَادَةٌ مَخْصُوصَةٌ بِأَرْكَانٍ مَخْصُوصَةٍ فِى أَوْقَاتٍ مَخْصُوصَةٍ مَعَ شَرَائِطَ مُعْتَبَرَةٍ.

অর্থাৎ নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত ইবাদত করা।

সালাতের গুরুত্ব ঃ

সালাত হল ইসলামের অন্যতম মূল স্তম্ভ। ইসলামী শরীয়তে সালাতের খুবই গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এমনকি জীবনের কোন অবস্থাতেই সালাত পরিত্যাগ করা যাবে না। মহানবী (সাঃ) সালাত সম্পর্কে এ কথাও বলেছেন যে, মুসলমান ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য হল সালাত অর্থাৎ মুসলমানগণ সালাত আদায় করে, আর কাফিরগণ সালাত আদায় করে না। পবিত্র কুরআনে অসংখ্যবার সালাত প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে। আর আল্লাহর কাছে কোন কিছু প্রার্থনা করতে হলেও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহ প্রার্থনা করতে বলেছেন। যথা, ইরশাদ হচ্ছে— وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ অর্থাৎ "তোমরা ধৈর্য ও সালাতের মাধ্যমে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন।" সূরায়ে বাক্বারার শুরুতে মহান রাব্বুল আলামীন মু'মিনদের পরিচয় তুলে ধরতে গিয়ে ঈমানের সাথে সাথে সালাতের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে- هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا رَزَقْنٰهُمْ يُنْفِقُوْنَ অর্থাৎ "হিদায়াত খোদাভীরুদের জন্য, যারা অদৃশ্যের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে, আর আমার দেয়া জীবনোপকরণ হতে খরচ করে।"

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন— وَأْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلٰوةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَانَسْئَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوٰى অর্থাৎ "আপনি স্বীয় পরিবার-পরিজনকে সালাতের আদেশ করুন, আর নিজে তার প্রতি অবিচল থাকুন। আমি আপনার নিকট জীবিকার অন্বেষণ করছি না, জীবিকা আমিই আপনাকে দান করব। আর শুভ পরিণাম তো খোদাভীরুদের জন্যই।"

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে— তাদের দান গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ হল, তাঁরা আল্লাহ ও তার রাসূলকে অস্বীকার করেছে এবং সালাত আদায় করেনি।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে— اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ

অর্থাৎ "নিশ্চয় সালাত মানুষকে অশ্লীলতা ও জঘন্য কার্য হতে নিষেধ করে।"

সূরায়ে মু'মিনে আল্লাহ তা'আলা বলেন— মু'মিনগণ একান্তই সফলকাম হয়েছে; যারা স্বীয় সালাতে বিনীত নম্র, যারা বাহুল্য কাজ হতে বিরত।"

হাদীসের আলোকে সালাত ঃ

হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) মহানবী (সাঃ) হতে বর্ণনা করেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি জিনিসের ওপর- (১) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবূদ নেই ও মুহাম্মদ (সাঃ) আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া, (২) সালাত প্রতিষ্ঠা করা, (৩) যাকাত প্রদান করা, (৪) হজ্জ আদায় করা, (৫) রমযান মাসের সাওম রাখা। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবূ যর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদা শীতকালে মহানবী (সাঃ) বের হলেন। তখন গাছের পাতাগুলো ঝড়ে পড়ছিল। তিনি একটি গাছের ডাল ধরে ঝাঁকি দিলেন, ফলে উহার পাতাগুলো ঝড়েগেল। তখন তিনি বললেন, হে, আবূ যর! যখন কোন মুসলমান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে নিয়মিত সালাত আদায় করে, তখন তার গুনাহ্সমূহ এ ভাবে ঝড়ে যায়। (মুসনাদে আহমাদ)

হযরত কাতাদাহ (রাঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন— আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন (হাদীসে কুদসী) যে, আমি আমার বান্দাদের ওপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয করেছি এবং তাতে আমি নিজের জন্য অঙ্গীকার করে নিয়েছি যে, যে ব্যক্তি এ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতকে যথা সময়ে আদায় করবে, আমি তাকে নিজ দায়িত্বে জান্নাতে প্রবেশ করাব। আর যে ব্যক্তি এর সংরক্ষণ করবে না তার জন্য আমার কোন দায়িত্ব নেই।

হযরত নওফাল ইবনে মুআবিয়া (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন— যার থেকে সালাত ছুটে গেল তার থেকে যেন তার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদকে ছিনিয়ে নেয়া হল।

হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন— যে ব্যক্তি কোন শরয়ী ওজর ব্যতীত দু'ওয়াক্ত সালাতকে একসাথে আদায় করল, সে কবীরা গুনাহের দরজাসমূহ হতে কোন একটিতে পৌঁছে গেল।

হযরত মু'আয ইবনে আনাস (রাঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন— কুফরী এবং নিফাকী প্রকাশ্য জুলুম। আর যে ব্যক্তি মুয়ায্যিনের আযান শুনেও সালাতে আসে না এটা উহাদের মতই জুলুম।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (সাঃ) বলেছেন— কিয়ামত দিবসে মানুষের আমলসমূহ হতে সর্বপ্রথম ফরয সালাতের হিসাব হবে। যদি সালাত ঠিক হয়ে যায়, তবে সে সফলতা লাভ করল। আর যদি সালাত বেহুদা প্রমাণিত হল, তবে সে ক্ষতিগ্রস্ত হল। আর যদি কিছু ফরযের কমতি হল তাহলে আল্লাহ পাক বলবেন, দেখো তার কোন নফল সালাত আছে কিনা, যার দ্বারা ফরযকে পূরণ করা হবে। যদি পাওয়া যায়, তবে তা দ্বারা ফরযকে পূর্ণ করা হবে। এরপর অনুরূপ ভাবে সাওম যাকাত ইত্যাদির হিসাব হবে।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের ভালোভাবে সালাত আদায় করাসহ দীনে শরীয়তের ওপর অটল ও অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন।

ফজরের সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ اَوَّلُ وَقْتِ الْفَجْرِ الخ ঃ ফজরের ওয়াক্ত "فَجر ثانى" তথা সুবহি সাদিক শুরু হবার সাথে সাথে আরম্ভ হয়। فَجرِاَوَّل হল সুবহি কাযিব। রাত্রির শেষ ভাগে আকাশে ওপরের দিকে লম্বাভাবে একটি কালো রেখা স্তম্ভের ন্যায় দৃশ্যমান হয়, তখন সামান্য সময়ের জন্য একটু অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ে, এটা হল সুবহি কাযিব। এরপর পূর্বাকাশে উত্তর দক্ষিণে আড়াআড়ি ভাবে একটি সাদা রেখা বিস্তৃত হয়, একেই ফাজরে ছানী বা সুবহি সাদিক বলা হয়। তখন থেকেই ফজরের সময় শুরু হয়। আর পূর্বাকাশে সূর্য উদয় হবার সাথে সাথে ফজরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

যোহরের সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ اَوَّلُ وَقْتِ الظُّهرِ الخ ঃ জমহুর ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর একমত যে, সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাবার পর যোহরের সালাতের সময় শুরু হয়। শেষ ওয়াক্ত নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, কোন বস্তুর মূল ছায়া ব্যতীত যখন উহার ছায়া দ্বিগুণ হবে, তখনই ওয়াক্ত শেষ হবে। আর সাহেবাইনের মতে, মূল ছায়া ব্যতীত বস্তুটির ছায়া যখন একগুণ হবে, তখনই যোহরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবে। তবে ফতোয়া আবূ হানীফা (রহঃ)-এর কথার ওপর।

ছায়ায়ে আসলী নির্ণয়ের পন্থা ঃ

মূল ছায়া নির্ণয় করার সহজ পদ্ধতি হল, কোন সমতল স্থানে একটি কাঠি পুঁতে দিলে প্রথমে সূর্যের আলোয় তা পশ্চিম দিকে বর্ধিত হতে থাকবে। এরপর কমতে কমতে যে স্থানে এসে স্থির হয়ে যাবে, তাই হবে ছায়ায়ে আসলী। তারপর পূর্বদিকে তা বাড়তে থাকে এবং বাড়ার সাথে সাথে যোহরের ওয়াক্ত শুরু হবে।

ঠিক দুপুরের সময় যে মৌসুমে প্রত্যেক বস্তুর যে পরিমাণ ছায়া থাকে, তাকে ছায়ায়ে আসলী বলা হয়। এটা বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কোন কোন স্থানে কোন কোন সময়ে একেবারেই ছায়ায়ে আসলী থাকে না। বিভিন্ন কিতাবে ছায়ায়ে আসলীর যে ছক দেয়া হয়েছে, তা সকল স্থানের জন্য প্রযোজ্য নয়। আল্লামা ছানাউল্লাহ্ পানিপতী (রহঃ) শ্রাবণ মাসে ছায়ায়ে আসলী দেড় কদম বলেছেন। এর পূর্বে ও পরে তিন মাস পর্যন্ত এক কদম করে বাড়বে।

নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে তা সহজেই বোঝা যায়–

কার্তিক	আশ্বিন	ভাদ্র	শ্রাবণ	আষাঢ়	জৈষ্ঠ	বৈশাখ
৪$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	২$\frac{১}{২}$	১$\frac{১}{২}$	২$\frac{১}{২}$	৩$\frac{১}{২}$	৪$\frac{১}{২}$

ওপরে সাত মাসের ছায়ায়ে আসলীর হিসাব প্রদান করা হল। বাকি পাঁচ মাসে মাঘ মাসের উভয় দিকে দু'কদম করে কমবে। যেমন–

অগ্রহায়ণ	পৌষ	মাঘ	ফাল্গুন	চৈত্র
৬$\frac{১}{২}$	৮$\frac{১}{২}$	১০$\frac{১}{২}$	৮$\frac{১}{২}$	৬$\frac{১}{২}$

আসরের সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ الخ ঃ ইমামদের মতভেদ অনুযায়ী যোহরের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে আসরের সালাতের সময় শুরু হয়। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, যোহরের সময় শেষ হবার পর চার রাকআত সালাত পড়ার সময়ের মধ্যে যোহর ও আসর উভয়ই পড়া যায়। এ সময়কে তিনি মুশতারিক ওয়াক্ত বলেন। আর সূর্যাস্তের সাথে সাথে আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়।

মাগরিবের সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ اَوَّلُ وَقْتِ الْمَغْرِبِ الخ ঃ মাগরিবের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে কোন মতভেদ নেই অর্থাৎ সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে শেষ সময় নিয়ে মতান্তর রয়েছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, সূর্যাস্তের পর ওযূ, আযান, ইকামত ও পাঁচ রাকআত সালাত পড়তে যত সময় লাগে ঐ সময় পর্যন্ত মাগরিবের ওয়াক্ত বাকি থাকে। অন্য

রিওয়ায়াতে শুধু তিন রাকআত পড়া পর্যন্ত বাকি থাকে। তৃতীয় বর্ণনানুয়ায়ী শাফাক (আকাশের লালিমা) ডুবে যাওয়া পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে।

আর হানাফীদের নিকট শাফাক ডুবে যাওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় থাকে। এ শাফক নিয়ে আবূ হানীফা (রহঃ) ও সাহেবাইনের মধ্যে মতান্তর রয়েছে।

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ)-এর মতে, শাফাক হল ঐ সাদা আভা যা আকাশের লালিমা চলে যাবার পর প্রকাশিত হয়। আর সাহেবাইনের মতে, আকাশের লালিমাই হল শাফাক।

وَاَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ اِذَا غَابَ الشَّفَقُ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلَعِ الْفَجْرُ الثَّانِى وَاَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَاٰخِرُ وَقْتِهَا مَالَمْ يَطْلُعِ الْفَجْرُ وَيَسْتَحِبُّ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ وَالْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِى الصَّيْفِ وَتَقْدِيْمُهَا فِى الشِّتَاءِ وَتَاخِيْرُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ وَتَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ اِلٰى مَاقَبْلَ ثُلُثِ اللَّيْلِ وَيُسْتَحَبُّ فِى الْوِتْرِ لِمَنْ يَالِفُ صَلٰوةَ اللَّيْلِ اَنْ يُّؤَخِّرَ الْوِتْرَ اِلٰى اٰخِرِ اللَّيْلِ وَاِنْ لَمْ يَثِقْ بِالْاِنْتِبَاهِ اَوْتَرَ قَبْلَ النَّوْمِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ ইশার প্রথম ওয়াক্ত শুরু হয় যখন শাফাক অদৃশ্য হয়। আর সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত উহার শেষ ওয়াক্ত। (অবশিষ্ট থাকে) বিতিরের সালাতের প্রথম ওয়াক্ত ইশার পর, আর শেষ ওয়াক্ত হল সুবহে সাদিক উদয় হওয়া পর্যন্ত। ফজরের সালাত আলোকোজ্জ্বল করে পড়া মুস্তাহাব। আর যোহরের সালাত গরমকালে ঠান্ডা করে তথা দেরি করে এবং শীতকালে অগ্রগামী করে পড়া মুস্তাহাব। আসরের সালাত সূর্যের রং পরিবর্তন (হলুদ বর্ণ) না হওয়া পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়া মুস্তাহাব। মাগরিবের সালাত (সব সময়) তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। আর ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশের পূর্ব পর্যন্ত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। যার রাতের সালাত তথা তাহাজ্জুদের সালাত পড়ার অভ্যাস রয়েছে তার জন্য বিতির সালাত দেরি করে শেষ রাতে পড়া মুস্তাহাব। আর যদি সে শেষ রাতে জাগ্রত হবার ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়, তবে নিদ্রা যাবার পূর্বেই বিতিরের সালাত পড়ে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইশার সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ اَوَّلُ وَقْتِ الْعِشَاءِ الخ ঃ ইমামদের মতভেদ অনুযায়ী মাগরিবের ওয়াক্ত শেষ হবার সাথে সাথে ইশার ওয়াক্ত শুরু হয়। এর শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়–

ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত বাকি থাকে।

ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর দ্বিতীয় রিওয়ায়াত অনুযায়ী অর্ধরাত পর্যন্ত ইশার ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে। আর হানাফীদের নিকট মধ্যরাত পর্যন্ত জায়েয ওয়াক্ত, আর মধ্য রাতের পর হতে সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে।

বিতিরের সালাতের ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ وَاَوَّلُ وَقْتِ الْوِتْرِ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, বিতিরের সালাতের ওয়াক্ত ইশার সালাতের পরেই শুরু হয়। আর ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ইশা ও বিতিরের ওয়াক্ত একই সময় শুরু হয়, তবে ক্রমধারা বজায় রাখা উত্তম। অতএব এ মত বিরোধের ফলাফল এই দাঁড়ায় যে, যদি কোন ব্যক্তি রাতের প্রথম ভাগে ইশা পড়ে শেষ রাতে বিতির পড়ার পর মনে হল যে, সে বিনা ওযূতে ইশা পড়েছে, তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে শুধু ইশার সালাত পুনরায় পড়তে হবে, বিতিরের সালাত পড়তে হবে না। আর সাহেবাইনের মতে, ইশা ও বিতির উভয় সালাত পুনঃ পড়তে হবে।

ফজরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ الْاِسْفَارُ بِالْفَجْرِ ঃ ফজরের সালাত ফর্সা হয়ে গেলে পড়া সুন্নত অর্থাৎ এমন সময়ে ফজরের সালাত পড়া শুরু করবে, যাতে সুন্নত অনুযায়ী কিরাআত পাঠ করে সালাত আদায় করার পর যদি কোন কারণে সালাত নষ্ট হয়ে যায়, তবে যেন পুনরায় সুন্নত কিরাআতের দ্বারা সূর্যোদয়ের পূর্বে সালাত পড়া যায়। কেননা, রাসূল (সাঃ) বলেছে- اَسْفِرُوْا بِالْفَجْرِ فَاِنَّهُ اَعْظَمُ لِلْاَجْرِ ·

অর্থাৎ তোমরা ফজরের সালাত ফর্সা করে পড়ো। কেননা এতে অধিক ছওয়াব পাওয়া যায়।

আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, غَلَس তথা অন্ধকারে পড়া উত্তম।

যোহরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ وَالْاِبْرَادُ بِالظُّهْرِ الخ ঃ হানাফীদের নিকট যোহরের সালাত গরমকালে দেরি করে এবং শীতের দিনে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- اَبْرِدُوْا بِالظُّهْرِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ

অর্থাৎ তোমরা যোহরের সালাতকে ঠান্ডা করে পড়ো। কেননা তাপের প্রখরতা জাহান্নামের নিঃশ্বাস হতে সৃষ্ট।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, সকল মৌসুমে যোহরের সালাতকে প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব।

আসরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ঃ

قَوْلُهُ تَاخِيْرُ الْعَصْرِ الخ ঃ হানাফীদের মতে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন না থাকলে সূর্যের রং বিবর্ণ হবার কিছু পূর্ব পর্যন্ত বিলম্ব করে আসরের সালাত পড়া মুস্তাহাব। আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব। কিন্তু অন্যান্যদের মতে, সর্বাবস্থায় তাড়াতাড়ি পড়া মুস্তাহাব।

মাগরিব ও ইশার মুস্তাহাব সময় ঃ

قَوْلُهُ وَتَعْجِيْلُ الْمَغْرِبِ وَتَاخِيْرُ الْعِشَاءِ الخ ঃ সকল ইমাম এ কথার ওপর একমত যে, মাগরিবের সালাত সর্বাবস্থায় প্রথম ওয়াক্তে পড়া মুস্তাহাব। আর ইশার সালাত রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত দেরি করে পড়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- لَاتَزَالُ اُمَّتِىْ بِخَيْرٍ مَاعَجَّلُوا الْمَغْرِبَ وَاَخَّرُوا الْعِشَاءَ

অর্থাৎ আমার উম্মত ততক্ষণ পর্যন্ত কল্যাণের ওপর থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা মাগরিবের সালাত তাড়াতাড়ি পড়বে এবং ইশার সালাত বিলম্ব করে পড়বে।

বিতিরের মুস্তাহাব ওয়াক্ত ঃ

যে ব্যক্তির শেষ রাতে জাগ্রত হবার অভ্যাস আছে, অথবা সে দৃঢ় বিশ্বাসী যে সে শেষ রাতে জাগ্রত হতে পারবে, তবে তার জন্য প্রথম রাতে বিতির না পড়ে শেষ রাতে তাহাজ্জুদের পর পড়া মুস্তাহাব। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- اِجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلٰوتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ الْوِتْرَ অর্থাৎ "তোমাদের রাতের সালাত গুলোর মধ্যে বিতেরকে সর্বশেষ পড়ো।" আর শেষ রাতে জাগ্রত হবার ভরসা না থাকলে রাতের প্রথম ভাগে ইশার পর পরই বিতির পড়ে নেয়া আবশ্যক। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন- اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لَّايَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ

অর্থাৎ তোমাদের কেউ যদি শেষ রাতে জাগ্রত হবার ব্যাপারে ভরসা রাখে, সে যেন বিতির পড়ে নিদ্রা যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلصَّلٰوةُ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা কর।

২। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের সময়সীমা এবং اَوْقَاتُ الْمُسْتَحَبَّة বর্ণনা কর।

৩। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মুস্তাহাব ওয়াক্ত বর্ণনা কর।

৪। فَيْءُ الزَّوَالِ চিনবার উপায় বর্ণনা কর।

৫। صُبْحِ كَاذِب ও صُبْحِ صَادِق-এর পরিচয় দাও।

৬। صَلٰوةُ الْوِتْرِ-এর সময়সীমা উল্লেখ কর।

بَابُ الْأَذَانِ

اَلْأَذَانُ سُنَّةٌ لِلصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَالْجُمُعَةِ دُونَ مَاسِوَاهَا وَلَا تَرْجِيعَ فِيهِ وَيَزِيدُ فِي أَذَانِ الْفَجْرِ بَعْدَ الْفَلَاحِ الصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ مَرَّتَيْنِ وَالْإِقَامَةُ مِثْلُ الْأَذَانِ إِلَّا أَنَّهُ يَزِيدُ فِيهَا بَعْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ مَرَّتَيْنِ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ وَيَحْدُرُ فِي الْإِقَامَةِ وَيَسْتَقْبِلُ بِهِمَا الْقِبْلَةَ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى الصَّلٰوةِ وَالْفَلَاحِ حَوَّلَ وَجْهَهُ يَمِينًا وَشِمَالًا وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ فَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ أَذَّنَ لِلْأُولٰى وَأَقَامَ وَكَانَ مُخَيَّرًا فِي الثَّانِيَةِ إِنْ شَاءَ أَذَّنَ وَأَقَامَ وَإِنْ شَاءَ اِقْتَصَرَ عَلَى الْإِقَامَةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يُّؤَذِّنَ وَيُقِيمَ عَلٰى طُهْرٍ فَإِنْ أَذَّنَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ جَازَ وَيُكْرَهُ أَنْ يُقِيمَ عَلٰى غَيْرِ وُضُوْءٍ أَوْ يُؤَذِّنَ وَهُوَ جُنُبٌ وَلَا يُؤَذِّنُ لِصَلٰوةٍ قَبْلَ دُخُولِ وَقْتِهَا إِلَّا فِي الْفَجْرِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى -

আযানের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ও জুমুআর সালাতের জন্য আযান সুন্নত। এগুলো ছাড়া অন্যান্য সালাতের জন্য আযান নেই। আযানে তারজী' নেই। আর ফজরের আযানে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ"-এর পর "আস্‌সালাতু খাইরুম মিনান্নাউম" দু'বার বলতে হবে। একামত আযানের মতোই, তবে "হাইয়্যা আলাল ফালাহ" -এর পরে, "ক্বাদ কামাতিস্‌সলাহ" দু'বার অতিরিক্ত করবে। আযানের মধ্যে থেমে থেমে বলবে, আর একামত তাড়াতাড়ি বলবে। আযান এবং একামত উভয়টির সময় কেবলামুখী হবে। "হাইয়্যা 'আলাস্‌সালাহ ও হাইয়্যা আলাল ফালাহ" যখন পৌঁছবে তখন যথাক্রমে ডান ও বাম দিকে মুখ ফেরাবে। কাযা সালাতের জন্যও আযান এবং একামত দুই-ই দিতে হবে। আর যদি একাধিক সালাত কাযা হয়, তবে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত উভয়ই দেবে, দ্বিতীয় ওয়াক্তের জন্য সে ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে আযান একামত উভয়ই দেবে, আর ইচ্ছা করলে শুধু একামত দেবে। পবিত্র অবস্থায় আযান ও একামত দেয়া আবশ্যক। যদি বিনা ওযূতে আযান দেয়, তবে জায়েয হবে। ওযূবিহীন অবস্থায় আযান দেয়া মাকরূহ। ওয়াক্ত আসার পূর্বে আযান দেবে না। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্ত আসার পূর্বে ফজরের আযান দেয়া জায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আযানের পরিচয় ঃ

أَذَانٌ শব্দটি বাবে تَفْعِيلٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল, ঘোষণা করা, সংবাদ প্রদান করা বা আহ্বান করা। শরীয়তের পরিভাষায় আযান হল, নির্দিষ্ট শব্দাবলীর দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ে সালাতের জন্য আহ্বান করা।

আযান প্রবর্তনের ঘটনা ঃ

ইসলামের প্রাথমিক যুগে মুসলমানদের সংখ্যা স্বল্প ছিল বিধায় সালাতের নিমিত্ত ডাকার প্রয়োজন ছিল না। সে যুগের মুসলমানগণ প্রায় সব সময়ই রাসূল (সাঃ)-এর দরবারে উপস্থিত থাকতেন। কিন্তু হিজরতের পর মুসলমানদের সংখ্যা বেড়ে

গেলে সকলে এক সময়ে একত্রিত হয়ে জামাআতে সালাত পড়ায় অসুবিধা দেখা দেয়। ফলে মহানবী (সাঃ) সাহাবীগণকে নিয়ে পরামর্শ সভায় বসলেন যে, সকলকে কিভাবে একই সময় জমায়েত করা যায়? সাহাবীগণের কেউ অগ্নি প্রজ্বলনের পরামর্শ দিলেন, কেউ ঘন্টা ধ্বনি দেয়ার প্রস্তাব করলেন, কেউবা শিঙ্গায় ফুৎকারের কথা বললেন। কিন্তু আগুন জালানো অগ্নি পূজকদের রীতি, ঘন্টা বাজানো খ্রিস্টানদের নীতি এবং শিঙ্গায় ফুঁকানো ইয়াহুদীদের পন্থা, বিধায় সকল প্রস্তাবই বাতিল হয়ে যায়। অবশেষে কোন সিদ্ধান্ত ছাড়াই সাহাবীগণ যে যার গৃহে চলে যান।

সেদিন রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ ও হযরত ওমর (রাঃ) সহ বহু সাহাবী প্রচলিত আযানের শব্দগুলো স্বপ্নযোগে দেখতে পান। পরদিন সকালে তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ স্বপ্ন রাসূলে কারীম (সাঃ)-কে অবহিত করেন। হুজুর (সাঃ) তাঁদের স্বপ্নকে সত্যায়িত করেন এবং হযরত বিলাল (রাঃ)-কে উক্ত শব্দগুলো শিখিয়ে দেন। আর সেদিন হতেই হযরত বিলাল (রাঃ)-এর কণ্ঠের মাধ্যমে আযানের প্রচলন শুরু হয়।

উল্লেখ্য যে, সকল সাহাবীই হুবহু একই স্বপ্ন দেখেন।

আযানের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ اَلْاَذَانُ سُنَّةٌ الخ ঃ পাঁচ ওয়াক্ত ও জুমুআর সালাতের জন্য আযান সুন্নতে মুয়াক্কাদা। অন্যান্য সালাত যথা- ঈদ, বিতির, তারাবীহ ইত্যাদির জন্য সুন্নত নয়। কোন কোন ইমামের মতে, আযান ওয়াজিব। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন যে, কোন এলাকার যদি সকলেই আযান ছেড়ে দেয়, তবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা জায়েয। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) -এর মতে, তাদেরকে বন্দি করা উচিত।

আযানের শব্দাবলীর ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

আযানের শব্দের সংখ্যা কয়টি এ বিষয়ে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতান্তর রয়েছে–

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, আযানের কালিমা হল ১৯টি তথা প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৪ বার, তারপর দুই শাহাদাত ৮ বার, এরপর حَيَّ عَلٰى দ্বয় দুই দুই করে ৪ বার, অতঃপর اَللّٰهُ اَكْبَرُ ২ বার এবং لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১ বার সর্বমোট ১৯টি।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, আযানের শব্দ মোট ১৭টি। তিনি শাফিয়ী (রহঃ)-এর মত তারজী' তথা শাহাতদ্বয়ের ৮ বারের প্রবক্তা, তবে প্রথমে اَللّٰهُ اَكْبَرُ ২ বার বলেন। বাকিগুলো একই রকম।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, আযানের শব্দ মোট ১৫টি। তিনি শাহাদাতদ্বয়ের মধ্যে তারজী'-এর পক্ষপাতী নন। অর্থাৎ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ৪ বার, শাহাদাতদ্বয় ৪ বার, حَيَّ عَلٰى দ্বয় ৪ বার, শেষের اَللّٰهُ اَكْبَرُ ২ বার এবং لَااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ ১ বার মোট ১৫টি।

(تَرْجِيْع) তারজী'-এর পরিচয় ঃ

শাহাদাতদ্বয় তথা اَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ বাক্যদ্বয়কে প্রথমে দুইবার নিম্ন স্বরে বলে পরবর্তী দুইবার উচ্চৈঃস্বরে বলা। প্রতিটি বাক্য চারবার করে মোট আটবার বলতে হয়। এটা শাফিয়ীদের নিকট সুন্নত। তাঁরা হযরত আবূ মাহযূরাহ (রাঃ)-এর হাদীসকে দলিল হিসেবে পেশ করেন, যাতে تَرْجِيْع রয়েছে।

আর হানাফীদের নিকট আযানে কোন তারজী' নেই, তাই শাহাদাতদ্বয় মোট চারবার। তাঁর দলিল হিসেবে হযরত বিলাল (রাঃ)-এর হাদীস পেশ করেন, যাতে কোন তারজী' নেই। আর আবূ মাহযূরার হাদীসের জবাবে বলেন যে, রাসূল (সাঃ) তাঁকে শিক্ষা দেয়ার জন্য একই শব্দ বার বার বলেছেন।

ফজরের আযানে "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" অতিরিক্ত বলা ঃ

قَوْلُهُ وَيَزِيْدُ فِيْ اَذَانِ الْفَجْرِ الخ ঃ একদা ফজরের আযান হবার পর রাসূল (সাঃ) তাঁর গৃহ হতে আসতে দেরি হলে হযরত বিলাল (রাঃ) তাঁর গৃহের পার্শ্বে গিয়ে "اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ" বললেন, এতে হুজুর (সাঃ) তাড়াতাড়ি বের হয়ে এলেন এবং তাঁর এই বাক্যটিকে অত্যন্ত পছন্দ করে ফজরের আযানে সংযুক্ত করার নির্দেশ দিলেন। আর সেদিন হতেই ফজরের আযানে এ বাক্যটি সংযোজিত হয়।

একামতের কালিমার ব্যাপারে মতান্তর ঃ

ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে, একামতের শব্দ এগারটি তথা তাকবীর দুইবার, শাহাদাতাইন একবার একবার, হাইয়্যা 'আলাস্ সালাহ একবার, হাইয়্যা 'আলাল ফালাহ একবার, ক্বাদক্বামাতিস্সালাহ দুইবার, এরপর তাকবীর দুইবার এবং লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু একবার।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, একামতের শব্দ দশটি অর্থাৎ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতই, তবে ক্বাদক্বামাতিস্সালাহ একবার বলবে।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, একামতের শব্দ ১৭টি। কেননা একামত আযানেরই মতো দুইবার দুইবার, অতিরিক্ত দুইবার হল ক্বাদক্বামাতিস্সালাহ।

আযান থেমে থেমে এবং একামত তাড়াতাড়ি দিতে হয় ঃ

قَوْلُهُ وَيَتَرَسَّلُ فِي الْأَذَانِ الخ ঃ تَرَسُّل শব্দের অর্থ হল থেমে থেমে বলা অর্থাৎ আযানের সময় প্রতিটি কালিমা বলে নিঃশ্বাস ফেলে অল্পক্ষণ থেমে পুনরায় আরেকটি বাক্য বলা। কিন্তু একামতে حَدَر বা তাড়াতাড়ি করতে হয় অর্থাৎ চার আল্লাহু আকবারই এক সাথে বলা। এটাই হল সর্বসম্মত নিয়ম।

কাযা সালাতের জন্য আযান ও একামতের হুকুম ঃ

হানাফীদের নিকট কাযা সালাতের জন্য আযান ও একামত প্রদান করা সুন্নত। কেননা রাসূল (সাঃ) খন্দকের যুদ্ধের সময় একাধারে ৪ ওয়াক্ত সালাত কাযা করেন পরে সবাইকে নিয়ে জামাআতে পড়েছেন এবং তাতে আযান ও একামত দিয়েছেন। তবে একসাথে কয়েক ওয়াক্ত কাযা সালাত পড়তে চাইলে প্রথম ওয়াক্তের জন্য আযান ও একামত উভয়ই দিতে হবে, আর পরের ওয়াক্তসমূহে শুধু একামত দিলেই চলবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। أَذَان -এর لُغْوِى ও شَرْعِى অর্থ বর্ণনা কর।

২। أَذَان ও إِقَامَت -এর কালিমার সংখ্যা কয়টি? ইমামদের মতভেদসহ লিখ।

৩। أَذَان -এর মধ্যে تَرْجِيْع কি? মতভেদসহ বর্ণনা কর।

৪। কাযা সালাতের জন্য আযান ও একামতের হুকুম লিখ।

৫। ওয়াক্ত হবার পূর্বে আযান দেয়া জায়েয আছে কি?

৬। أَذَان -এর مَشْرُوْعِيَّت -এর ঘটনাটি সংক্ষেপে বল।

৭। اَلصَّلٰوةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ বলার পটভূমি উল্লেখ কর।

بَابُ شُرُوطِ الصَّلٰوةِ الَّتِىْ تَتَقَدَّمُهَا

يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّىْ اَنْ يُقَدِّمَ الطَّهَارَةَ مِنَ الْاَحْدَاثِ وَالْاَنْجَاسِ عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ وَيَسْتُرُعَوْرَتَهُ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ مَاتَحْتَ السُّرَّةِ اِلَى الرُّكْبَةِ وَالرُّكْبَةُ عَوْرَةٌ دُوْنَ السُّرَّةِ وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ كُلُّهُ عَوْرَةٌ اِلَّا وَجْهَهَا وَكَفَّيْهَا وَمَا كَانَ عَوْرَةً مِنَ الرَّجُلِ فَهُوَ عَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ وَبَطْنُهَا وَظَهْرُهَا عَوْرَةٌ وَمَا سِوٰى ذٰلِكَ مِنْ بَدَنِهَا لَيْسَ بِعَوْرَةٍ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ مَايُزِيْلُ بِهِ النَّجَاسَةَ صَلّٰى مَعَهَا وَلَمْ يُعِدْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا صَلّٰى عُرْيَانًا قَاعِدًا يُؤْمِىْ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ فَاِنْ صَلّٰى قَائِمًا اَجْزَاهُ وَالْاَوَّلُ اَفْضَلُ -

সালাতের পূর্ব শর্তসমূহের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ পূর্বে যেসব অপবিত্রতা ও নাপাকীর বর্ণনা করেছি সেগুলো হতে সালাতের পূর্বে পবিত্র হওয়া মুসল্লির ওপর ফরয। আর সতর ঢাকাও আবশ্যক। পুরুষের সতর হল নাভির নিচে হতে হাঁটু পর্যন্ত। হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু নাভি ছতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। মুখমন্ডল ও হস্তদ্বয় ব্যতীত স্বাধীন নারীর সমস্ত শরীর সতরের অন্তর্ভুক্ত। পুরুষের সতর যা দাসীর সতরও তাই, তবে পেট ও পিঠ সতরের অন্তর্ভুক্ত। এ ছাড়া দাসীর শরীরের আর কোন অংশ সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। কোন ব্যক্তি নাজাসাত দূর করবার কিছু না পেলে ঐ নাজাসতসহ সালাত পড়বে এবং এ সালাত আর পুনরায় পড়তে হবে না। আর যে ব্যক্তি (সতর ঢাকবার) কাপড় পায় না সে উলঙ্গ অবস্থায় বসে ইশারা-ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা করবে। যদি সে দাঁড়িয়ে পড়ে, তা হলেও জায়েয হবে। তবে প্রথম নিয়মে (বসে পড়া) উত্তম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শর্তের পরিচয় ঃ

شَرْطٌ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো شُرُوْطٌ, শাব্দিক অর্থ হল চিহ্ন বা আলামত।

পরিভাষায়, যে বস্তুর ওপর আদিষ্ট বস্তু নির্ভরশীল হয়, তাকে شَرْطٌ বলা হয়।

সালাতের শর্তাবলী ঃ

قَوْلُهُ يَجِبُ عَلَى الْمُصَلِّىْ الخ ঃ সালাতের পূর্বশর্ত মোট ছয়টি—

(১) শরীর ও কাপড় পাক হওয়া, (২) সালাতের জায়গা পাক হওয়া, (৩) সতর ঢাকা, (৪) কেবলামুখী হওয়া, (৫) নিয়ত করা, (৬) নির্ধারিত ওয়াক্তের মধ্যে সালাত পড়া।

পুরুষদের সতর ঃ

قَوْلُهُ وَالْعَوْرَةُ مِنَ الرَّجُلِ الخ ঃ সালাতের মধ্যে যে অঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয তাকে সতর বলে। পুরুষের সতর হানাফীদের নিকট নাভির নিচ হতে হাঁটুর নিচে পর্যন্ত। হাঁটু সতরের অন্তর্ভুক্ত; কিন্তু নাভি সতরের অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট হাঁটু সতর নয়, কিন্তু নাভি সতর। এটা ইমাম আহমদ (রহঃ)-এরও এক মত।

ইমাম মালিক এবং ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর দ্বিতীয় মতানুযায়ী শুধু পুরুষাঙ্গ, গুহ্যদ্বার ও উভয় নিতম্ব সতর। এগুলো ছাড়া আর কিছু সতর নয়।

মহিলাদের সতর :

قَوْلُهُ وَبَدَنُ الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ الخ : আযাদ বা স্বাধীনা নারীর মুখমন্ডল, উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত এবং পদদ্বয় ব্যতীত সমস্ত অঙ্গই সতর। এগুলো চলাফেরা, লেনদেন এবং কথাবার্তার বিশেষ সুবিধার জন্য সতরের বাহিরে রাখা হয়েছে। তবে বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যুগে মুখমণ্ডল ঢেকে চলাই উত্তম।

قَوْلُهُ فَهُوَعَوْرَةٌ مِنَ الْاَمَةِ الخ : পুরুষের যে পর্যন্ত সতর তা-ই দাসীর সতর। তবে পেট ও পিঠ দাসীর সতরের অন্তর্ভুক্ত।

নাপাকী দূর করতে না পারলে তার হুকুম :

যদি কোন ব্যক্তি তার কাপড় হতে নাপাকী দূর করার কোন উপকরণ না পায়, শায়খাইনের মতে তার ইখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে ঐ কাপড়সহ দাঁড়িয়ে সালাত পড়বে, অথবা কাপড় বাদ দিয়ে বসে সালাত আদায় করবে। তবে অপবিত্র কাপড় পরিধান করে দাঁড়িয়ে সালাত পড়াই উত্তম। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, অপবিত্র কাপড় পরিধান করে দাঁড়িয়ে সালাত পড়তে হবে, উলঙ্গ হয়ে পড়া জায়েয নেই।

قَوْلُهُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ ثَوْبًا الخ : সালাত এমন এক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত, যা কোন অবস্থায় ছাড়া যাবে না। এমন কি কাপড় না থাকলে উলঙ্গ অবস্থায় সালাত আদায় করতে হবে। তবে এ অবস্থায় বসে বসে ইশারা ইঙ্গিতে রুকু-সিজদা করবে। আর দাঁড়িয়ে আদায় করলেও বিশুদ্ধ হবে, তবে বসে পড়াই উত্তম।

وَيَنْوِىْ لِلصَّلٰوةِ الَّتِىْ يَدْخُلُ فِيْهَا بِنِيَّةٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ التَّحْرِيْمَةِ بِعَمَلٍ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ اِلَّا اَنْ يَكُوْنَ خَائِفًا فَيُصَلِّىْ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ قَدَرَ فَاِنْ اشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ وَلَيْسَ بِحَضْرَتِهٖ مَنْ يَسْئَلُهٗ عَنْهَا اِجْتَهَدَ وَصَلّٰى فَاِنْ عَلِمَ اَنَّهٗ اَخْطَأَ بَعْدَ مَا صَلّٰى فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَاِنْ عَلِمَ ذٰلِكَ وَهُوَ فِى الصَّلٰوةِ اِسْتَدَارَ اِلَى الْقِبْلَةِ وَبَنٰى عَلَيْهَا -

---

সরল অনুবাদ : যে সালাতে প্রবেশ করবে তথা পড়তে ইচ্ছা করবে সে সালাতের জন্য এমনভাবে নিয়ত করবে যেন নিয়ত ও তাকবীরে তাহরীমার মধ্যে অন্য কোন কাজ দ্বারা পার্থক্য বা ব্যবধান করবে না এবং কেবলামুখী হবে কিন্তু যদি শত্রুর ভয় থাকে, তবে; যেদিকে ফিরতে সে সক্ষম হয় সে দিকে ফিরেই সালাত পড়বে। যদি তার নিকট কেবলার দিক সন্দেহযুক্ত হয় এবং তার নিকটে এমন কোন লোকও নেই যাকে কেবলা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে, তখন সে চিন্তা-ভাবনা করে (যেদিকে কেবলা মনস্থির করে) সালাত পড়বে। সালাত শেষে যদি জানতে পারে যে, সে ভুল করেছে তাহলে পুনঃ সালাত পড়তে হবে না। আর যদি সালাতে থাকা অবস্থায় তা জানতে পারে, তাহলে সালাতের মধ্যেই সেদিকে ঘুরে যাবে এবং বাকি সালাত উহার ওপর ভিত্তি করে আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিয়তের পরিচয় :

نِيَّةٌ শব্দের অর্থ হল اَلْقَصْدُ وَالْاِرَادَةُ তথা ইচ্ছা করা বা আকাঙ্ক্ষা করা। পরিভাষায় نِيَّةٌ-এর পরিচয় হল "قَصْدُ الْقَلْبِ نَحْوَ الْفِعْلِ" অর্থাৎ কোন কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্তরের সংকল্প।

قَوْلُهُ وَيَنْوِىْ لِلصَّلٰوةِ الخ : সালাতের জন্য নিয়ত করা ফরয। মুসল্লি যে সালাত পড়তে ইচ্ছা করেছে সে সালাতের কথা অন্তরে খেয়াল করাই হল নিয়ত। মনে মনে বললেই চলবে, মুখে উচ্চারণ করা মুস্তাহাব। আরবীতে নিয়ত করা আবশ্যক নয়। মুসল্লি যে ভাষায় সক্ষম হয় সে ভাষায় নিয়ত করলেই মুস্তাহাব আদায় হয়ে যাবে।

কেবলামুখী হওয়া ফরয ঃ

قَوْلُهُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ الخ ঃ সালাতে কেবলামুখী হওয়া ফরয। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন- فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ

মক্কাবাসীদের জন্য হুবহু কেবলামুখী হওয়া, আর অন্যান্যদের ওপর কেবলার দিকে মুখ করা ফরয।

কেবলা সম্পর্কে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তির হুকুম ঃ

قَوْلُهُ اِنْ اِشْتَبَهَتْ عَلَيْهِ الْقِبْلَةُ الخ ঃ কোন ব্যক্তি যদি কেবলা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে এবং তার নিকট এমন কোন লোকও নেই যে যাকে জিজ্ঞাসা করে কেবলা ঠিক করবে, তার হুকুম হল সে চিন্তা-গবেষণা করে যেদিক সম্পর্কে তার অন্তর সাক্ষ্য দেয় সেদিকে মুখ করে সালাত পড়বে। সালাত শেষ করার পর যদি সে জানতে পারে যে সে ভুল করেছে, তবে তাকে পুনরায় তা পড়তে হবে না। আর যদি সালাতের ভিতরই জানতে পারে যে, এটা সঠিক কেবলা নয়, তবে সালাতের ভিতরই তৎক্ষণাৎ কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট সালাত এর ওপর ভিত্তি করে পড়বে। এ অবস্থায় নতুন করে প্রথম হতে সালাত আরম্ভ করার প্রয়োজন নেই।

সালাতের ভিতর কেবলার দিকে ফিরে যাবার দলিল হল, দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসের ১৫ তারিখে রাসূল (সাঃ) বনূ সালমার মসজিদে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যোহরের সালাত পড়তেছিলেন। দুই রাকআত পড়ার পর কেবলা পরিবর্তনের হুকুম অবতীর্ণ হয়। তখন রাসূল (সাঃ) সালাতের মধ্যেই সবাইকে নিয়ে মক্কা শরীফের দিকে মুখ ফিরিয়ে নেন।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। شُرُوْطُ الصَّلٰوةِ ও رُكْنُ الصَّلٰوةِ -এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর এবং সালাতের শর্তগুলো লিখ।

২। شُرُوْطُ الصَّلٰوةِ কয়টি ও কি কি? লিখ।

৩। পুরুষ, স্ত্রীলোক ও ক্রীতদাসীর জন্য سَتْر -এর পরিমাণ কি? উল্লেখ কর।

৪। যদি কেউ নাজাসাত দূর করবার মতো কোন কিছু না পায় তখন সালাত পড়ার হুকুম কি?

৫। সালাতী যদি কিবলা সম্পর্কে দিকভ্রান্ত হয়ে পড়ে, তখন উহার হুকুম কি?

بَابُ صِفَةِ الصَّلٰوةِ

فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ سِتَّةٌ اَلتَّحْرِيْمَةُ وَالْقِيَامُ وَالْقِرَاءَةُ وَالرُّكُوْعُ وَالسُّجُوْدُ وَالْقَعْدَةُ الْاَخِيْرَةُ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ وَمَا زَادَ عَلٰى ذٰلِكَ فَهُوَ سُنَّةٌ وَاِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ فِىْ صَلٰوتِهٖ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ حَتّٰى يُحَاذِىْ بِاِبْهَامَيْهِ شَحْمَةَ اُذُنَيْهِ فَاِنْ قَالَ بَدَلًا مِّنَ التَّكْبِيْرِ اَللّٰهُ اَجَلُّ اَوْ اَعْظَمُ اَوِ الرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ اَجْزَاهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ اِلَّا اَنْ يَقُوْلَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ اَوْ اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى وَيَضَعُهُمَا تَحْتَ السُّرَّةِ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَيَقْرَأُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَيُسِرُّ بِهِمَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا اَوْ ثَلٰثَ اٰيَاتٍ مِنْ اَيِّ سُوْرَةٍ شَاءَ -

সালাতের রুকনসমূহের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সালাতের ফরয ছয়টি– (১) তাকবীরে তাহরীমা, (২) দণ্ডায়মান হওয়া, (৩) কিরাআত পড়া, (৪) রুকু করা, (৫) সিজদা করা, (৬) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ সময় বসা। আর এগুলোর অতিরিক্তগুলো সুন্নত। যখন কোন মানুষ সালাতে প্রবেশ করার ইচ্ছা করে তখন (প্রথমে) আল্লাহু আকবার বলবে এবং উভয় হাত এ পরিমাণ উঠাবে যেন বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় কানের লতি বরাবর হয়। যদি তাকবীরের পরিবর্তে اَللّٰهُ اَجَلُّ অথবা اَللّٰهُ اَعْظَمُ কিংবা اَلرَّحْمٰنُ اَكْبَرُ বলে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট যথেষ্ট হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, اَللّٰهُ اَكْبَرُ বা اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ অথবা اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ব্যতীত অন্য কোন শব্দ বললে জায়েয হবে না। ডান হাত বাম হাতের ওপর নাভির নিচে রাখবে। এরপর সুবহানাকা পড়বে, তারপর আউযুবিল্লাহ এবং বিসমিল্লাহ নিচু স্বরে পড়বে। অতঃপর সূরা ফাতিহা ও উহার সাথে একটি সূরা মিলিয়ে পড়বে, অথবা অন্য যে-কোন সূরা হতে ইচ্ছা করে তিন আয়াত পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সালাতের ফরযসমূহ ঃ

قَوْلُهُ فَرَائِضُ الصَّلٰوةِ الخ ঃ সালাতের ফরয মোট ছয়টি– (১) তাকবীরে তাহরীমা বলা, (২) দাঁড়িয়ে সালাত পড়া, (৩) কিরাআত পড়া, (৪) রুকু করা, (৫) সিজদা করা, (৬) শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন ফকীহ সালামের সাথে সালাত হতে বের হওয়াকে ফরয হিসেবে গণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, সালামের মাধ্যমে সালাত হতে বের হওয়া ওয়াজিব। এমনিভাবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়ানো এবং সিজদার মাঝে বসা ফরয। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ) এ গুলোকে ওয়াজিব বলেন।

সুন্নত বলার কারণ ঃ

قَوْلُهُ فَهُوَ سُنَّةٌ الخ ঃ মুসান্নিফ (রহঃ) উল্লিখিত ছয় ফরয ব্যতীত অন্যান্য কাজগুলোকে সুন্নত বলেছেন, অথচ এর মধ্যে অনেকগুলো কাজ ওয়াজিবও রয়েছে। বস্তুত লেখক ওয়াজিব গুলোকে সুন্নত বলে হাদীস দ্বারা যে সাবেত হয়েছে তা বুঝিয়েছেন।

তাকবীরে তাহ্রীমার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ قَالَ بَدَلًا مِنَ التَّكْبِيْرِ الخ ঃ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট শুধু 'আল্লাহু আকবার' অথবা 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া অন্য কোন শব্দ জায়েয নেই। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, শুধু 'আল্লাহু আকবার' ব্যতীত আর কোন শব্দ জায়েয নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, اَللّٰهُ الْاَكْبَرُ ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ এবং اَللّٰهُ الْكَبِيْرُ ছাড়া অন্য কোন শব্দ জায়েয নেই। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, اَللّٰهُ اَكْبَرُ -এর সমকক্ষ শব্দ হলেই চলবে।

হাত বাঁধার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَيَضَعُهَا تَحْتَ السُّرَّةِ ঃ হানাফীদের মতে, পুরুষ নাভির নিচে এবং স্ত্রীলোক বক্ষের ওপর হাত বাঁধবে। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ও আহলে হাদীসদের মতে, নারী-পুরুষ উভয়েরই বক্ষের ওপর হাত বাঁধা সুন্নত।

আউযুবিল্লাহ্ ও বিসমিল্লাহ্ পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَيَسْتَعِيْذُ بِاللّٰهِ الخ ঃ হানাফীদের মতে, ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারী আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়বে; কিন্তু মুক্তাদী পড়বে না। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, ইমাম আউযুবিল্লাহ ও ছানা কোনটিই পড়বে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, মুকতাদীও আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে। কেননা উহা ছানারই তাবে' বা অনুসারী। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, আউযুবিল্লাহ কিরাআতেরই তাবে', তাই মুকতাদীকে পড়তে হবে না।

قَوْلُهُ وَيُسِرُّ بِهِمَا الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা, আহমদ, ছাওরী, ইসহাক ও ইবনুল মুবারকের মতে, আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ চুপে চুপে পড়তে হবে। কেননা হযরত ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, ইমাম চারটি বিষয় চুপিসারে পড়বে– (১) আউযুবিল্লাহ, (২) বিসমিল্লাহ, (৩) আমীন ও (৪) ছানা।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, আলহামদুলিল্লাহ-এর সাথে বিসমিল্লাহও উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে হবে।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, ফরয সালাতে বিসমিল্লাহ্ মোটেই পড়তে হবে না।

وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَيَقُوْلُهَا الْمُؤْتَمُّ وَيُخْفِيْهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَرْكَعُ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَيُفَرِّجُ اَصَابِعَهُ وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَلَا يُنَكِّسُهُ وَيَقُوْلُ فِىْ رُكُوْعِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَقُوْلُ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَيَقُوْلُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا كَبَّرَ وَسَجَدَ وَاعْتَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَ وَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهٖ وَجَبْهَتِهٖ فَاِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى اَحَدِهِمَا جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَجُوْزُ الْاِقْتِصَارُ عَلَى الْاَنْفِ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ۔

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন ইমাম وَلَاالضَّالِّيْنَ বলবে তখন اٰمِيْن বলবে এবং মুক্তাদীও উহা নিচু স্বরে বলবে। তারপর তাকবীর বলে রুকু করবে এবং উভয় হাতকে হাঁটুর ওপর শক্তভাবে রাখবে। উভয় হাতের আঙুলসমূহকে ফাঁক করে রাখবে এবং পিঠকে বিস্তৃত করে রাখবে, আর মাথাকে উঁচু বা নিচু করে রাখবে না। সে তার রুকুতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' বলবে। এ তিনবার হল নিম্নতম সীমা। অতঃপর মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে। মুক্তাদী বলবে رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ, এরপর সোজা হয়ে দাঁড়াবার পর আল্লাহু আকবার বলে সিজদা করবে এবং উভয় হাত মাটিতে রাখবে, আর মুখমন্ডলকে হস্তদ্বয়ের মাঝে রেখে নাক ও ললাটের ওপর সিজদা করবে। শুধু নাক অথবা ললাটের ওপর সিজদা করলেও ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, বিনা ওজরে শুধু নাকের ওপর সিজদা করা জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আমীন বলার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَاِذَا قَالَ الْاِمَامُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে, ইমাম, মুক্তাদী ও একাকী সালাত আদায়কারী সকলেরই আমীন বলা সুন্নত, তবে ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর নিকট উচ্চৈঃস্বরে বলা সুন্নত। আর আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট চুপে চুপে বলা সুন্নত। হানাফীদের দলিল হল, হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর হাদীস যে, চারটি বিষয় চুপে চুপে বলবে– (১) আমীন, (২) ছানা, (৩) আউযুবিল্লাহ ও (৪) বিসমিল্লাহ।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, শুধু মুকতাদী এবং একাকী সালাত আদায়কারী আমীন বলবে, তবে ইমাম আমীন বলবে না।

রুকু করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهٗ وَيَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ الخ ঃ হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলছেন– রুকুতে উভয় হাত হাঁটুর ওপর রাখবে এবং আঙুলসমূহ প্রশস্ত করে রাখবে। পৃষ্ঠদেশ, মাথা ও নিতম্ব এক বরাবর রাখবে। মাথা উঁচু-নিচু করে রাখবে না।

قَوْلُهٗ وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ঃ রুকুর মধ্যে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা সুন্নত, তিনবারের কম পাঠ করলে সুন্নত আদায় হবে না। তিনবারের অধিক পাঠ করা অধিক ছওয়াবের কাজ, তবে বেজোড় সংখ্যা পাঠ করা উত্তম। ইমাম আহমদের মতে একবার পড়া ওয়াজিব।

قَوْلُهُ وَيَقُوْلُ الْمُؤْتَمُّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ইমাম শুধু سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ বলবে, আর মুকতাদী رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ বলবে।

সাহেবাইন ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, ইমামও 'রাব্বানা লাকাল হামদ' চুপে চুপে বলবে।

قَوْلُهُ فَإِذَا اسْتَوٰى قَائِمًا الخ ঃ রুকু হতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। কেননা দুই সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা এবং রুকুর পর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে ওয়াজিব, আর আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট ফরয।

সিজদার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَسَجَدَ عَلٰى اَنْفِهٖ وَجَبْهَتِهٖ الخ ঃ নাক ও কপালের ওপর সিজদা করতে হয়। ওজরের কারণে শুধু নাকের ওপর সিজদা করা সকলের নিকট জায়েয, কিন্তু সাহেবাইনের নিকট বিনা ওজরে জায়েয নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, মাকরূহে তাহরীমীর সাথে জায়েয। "দুররে মুখতার" কিতাবে রয়েছে যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) পরবর্তীতে সাহেবাইনের কথার দিকে প্রত্যাবর্তন করেছেন, তাই বিনা ওজরে নাকের ওপর সিজদা করা জায়েয হবে না।

فَاِنْ سَجَدَ عَلٰى كُوْرِ عِمَامَتِهٖ اَوْعَلٰى فَاضِلِ ثَوْبِهٖ جَازَ وَيُبْدِىْ ضَبْعَيْهِ وَيُجَافِىْ بَطْنَهٗ عَنْ فَخِذَيْهِ وَيُوَجِّهُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَيَقُوْلُ فِىْ سُجُوْدِهٖ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى ثَلٰثًا وَذٰلِكَ اَدْنَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهٗ وَيُكَبِّرُ وَاِذَا اطْمَأَنَّ جَالِسًا كَبَّرَ وَسَجَدَ فَاِذَا اطْمَأَنَّ سَاجِدًا كَبَّرَ وَاسْتَوٰى قَائِمًا عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ وَلَا يَقْعُدُ وَلَا يَعْتَمِدُ بِيَدَيْهِ عَلَى الْاَرْضِ وَيَفْعَلُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَافَعَلَ فِى الْاُوْلٰى اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَسْتَفْتِحُ وَلَا يَتَعَوَّذُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى فَجَلَسَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ الْيُمْنٰى نَصْبًا وَ وَجَّهَ اَصَابِعَهٗ نَحْوَ الْقِبْلَةِ وَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَيَبْسُطُ اَصَابِعَهٗ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ -

---

সরল অনুবাদ ঃ যদি পাগড়ির পেঁচের ওপর অথবা অতিরিক্ত কাপড়ের ওপর সিজদা করে, তবে জায়েয হবে। বগলদ্বয় প্রকাশ করবে এবং পেটকে উরুদ্বয় হতে দূরে রাখবে, আর উভয় পায়ের আঙুলগুলোকে কেবলামুখী করে রাখবে। সিজদাতে তিনবার 'সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা' পড়বে। এটা হল নিম্ন সীমা। এরপর মাথা উত্তোলন করবে এবং তাকবীর বলবে। যখন ভালোভাবে উপবেশন করবে তখন তাকবীর বলে সিজদা করবে। যখন স্থিরতার সাথে সিজদা করবে, তখন اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে উভয় পায়ের বক্ষ্যস্থলের ওপর বরাবর দাঁড়িয়ে যাবে। বসবে না এবং হস্তদ্বয়ের দ্বারা মাটির ওপর ভর দেবে না। (তথা ভর দিয়ে উঠবে না) দ্বিতীয় রাকআতেও অনুরূপ করবে যেরূপ প্রথম রাকআতে করেছে। কিন্তু ছা-না ও আউযুবিল্লাহ পাঠ করবে না। আর প্রথম তাকবীর ব্যতীত হাতও উঠাবে না। দ্বিতীয় রাকআতের দ্বিতীয় সিজদা হতে যখন মাথা উঠাবে, তখন বাম পা বিছিয়ে দিয়ে উহার ওপর বসে যাবে, আর ডান পাকে খাড়া করে রাখবে এবং আঙুলগুলোকে কেবলামুখী করে রাখবে। উভয় হাতকে রানের ওপর রাখবে এবং আঙুলগুলোকে ছড়িয়ে রাখবে। তারপর তাশাহহুদ পাঠ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সিজদা করার অবস্থা ঃ

قَوْلُهُ وَيُبْدِى ضَبْعَيْهِ الخ ঃ সিজদার সময় মুসল্লি তার উভয় বগল প্রকাশ করে দেবে তথা উভয় বাজু পেটের উভয় পার্শ্বের সাথে মিলাবে না; বরং পৃথক করে রাখবে।

قَوْلُهُ وَيُوَجِّهُ اَصَابِعَ رِجْلَيْهِ الخ ঃ সিজদার সময় পায়ের আঙুলসমূহ কেবলামুখী করে রাখবে। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- اِذَاسَجَدَ الْمُؤْمِنُ سَجَدَ كُلُّ عَضْوٍ مِنْهُ فَلْيُوَجِّهْ اَصَابِعَهُ الْقِبْلَةَ مَااسْتَطَاعَ

অর্থাৎ মু'মিন যখন সিজদা করে তখন তার প্রত্যেক অঙ্গ সিজদা করে তাই যথা সম্ভব আঙুলসমূহকে কেবলামুখী করে রাখবে।

সিজদার পরের কাজ ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا اِطْمَأَنَّ سَاجِدًا الخ ঃ ধীরস্থিরতার সাথে সিজদাদ্বয় শেষ করার পর উভয় হাঁটুর ওপর ভর করে পায়ে, বক্ষের ওপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এটাই নিয়ম, কিন্তু শাফিয়ীদের মতে, একটু বসে বিশ্রাম করে তারপর দাঁড়াতে হয়।

সালাতে হাত উঠানোর ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ لَايَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى ঃ ইমাম শাফিয়ী, আহমদ এবং আহলে হাদীসের নিকট রুকুতে যাবার সময় এবং রুকু হতে উঠে হাত উঠানো সুন্নত। তাঁরা দলিল হিসেবে হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস উল্লেখ করেন যে, اِنَّهُ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ رَفَعَ يَدَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) فَعَلَ مِثْلَ ذٰلِكَ.

অর্থাৎ তিনি যখন সালাত শুরু করতেন, তখন উভয় হাত উত্তোলন করতেন। যখন রুকু করতেন এবং রুকু হতে মাথা উঠাতেন, তখনও ঐরূপ করতেন এবং বলেন যে, আমি রাসূল (সাঃ)-কে এরূপ করতে দেখেছি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, সালাতের প্রারম্ভে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত আর কখনো হাত উঠানো সুন্নত নয়।

কেননা, হযরত বারা (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে,

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ (ص) يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِيْنَ افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ ثُمَّ لَمْ يَرْفَعْهُمَا حَتّٰى انْصَرَفَ

অর্থাৎ হযরত বারা ইবনে আযিব (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে দেখেছি, যখন তিনি সালাত শুরু করতেন তখন দুই হাত উঠাতেন, তারপর সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত হাত উঠাতেন না।

শাফিয়ীদের হাদীসের জবাবে হানাফীরা বলেন যে, হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস মানসূখ হয়ে গেছে। স্বয়ং হযরত জাবির (রাঃ) বলেন, একবার রাসূল (সাঃ) আমাদিগকে এভাবে হাত উঠাতে দেখে বলেন, তোমাদের কি হল যে তোমরা হাত উঠাও?

বসার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ اِفْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى الخ ঃ হানাফীদের নিকট পুরুষের উভয় বৈঠকে ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে উহার ওপর বসা সুন্নত। এরূপ বসাকে اِفْتِرَاش বলে। আর স্ত্রীলোকের উভয় বৈঠকে উভয় পা ডান দিকে বের করে নিতম্বের ওপর বসা সুন্নত। এরূপ বসাকে تَوَرُّك বলে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, প্রথম বৈঠকে اِفْتِرَاش আর দ্বিতীয় বৈঠকে تَوَرُّك সুন্নত।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর নিকট উভয় বৈঠকে تَوَرُّك সুন্নত।

ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে, দুই রাকআত, চার রাকআত এবং তিন রাকআত বিশিষ্ট সালাতের দুই রাকআতের পর اِفْتِرَاش সুন্নত। আর তিন বা চার রাকআতের পর تَوَرُّك সুন্নত।

রানের ওপর হাত রাখার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَيَبْسُطُ اَصَابِعَهُ الخ ঃ বসার সময় উভয় হাত রানের ওপর এভাবে রাখবে যে, আঙুলগুলো যেন কেবলামুখী হয় এবং প্রত্যেক দুই আঙুলের মাঝে কিছু দূরত্ব রাখতে হবে।

وَالتَّشَهُّدُ اَنْ يَّقُوْلَ التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَ رَسُوْلُهٗ وَلَا يَزِيْدُ عَلٰى هٰذَا فِى الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَخِيْرَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ خَاصَّةً فَاِذَا جَلَسَ فِىْ اٰخِرِ الصَّلٰوةِ جَلَسَ كَمَا جَلَسَ فِى الْاُوْلٰى وَتَشَهَّدَ وَصَلّٰى عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا بِمَا شَاءَ مِمَّا يُشْبِهُ اَلْفَاظَ الْقُرْاٰنِ وَالْاَدْعِيَةِ الْمَاْثُوْرَةِ وَلَا يَدْعُوْ بِمَا يُشْبِهُ كَلَامَ النَّاسِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَيَقُوْلُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَيُسَلِّمُ عَنْ يَسَارِهٖ مِثْلَ ذٰلِكَ -

সরল অনুবাদ ঃ আর তাশাহ্হুদ হল এটা বলা যে, আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্‌সালাওয়াতু ওয়াত্ত্বাইয়িবাতু। আস্‌সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্নাবীয়্যু ও রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্‌সালামু 'আলাইনা ওয়া'আলা ইবাদিল্লাহিস্‌সালেহীন। আশ্‌হাদু আল্‌লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশ্‌হাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। প্রথম বৈঠকে এর বেশি বলবে না। শেষ দুই রাকআতে শুধু ফাতিহা পাঠ করবে। যখন সালাতের শেষে বসবে তখন প্রথম বৈঠকের ন্যায় বসবে, তাশাহুদ পাঠ করবে এবং নবী কারীম (সাঃ)-এর ওপর দরূদ পাঠ করবে, আর কুরআনের শব্দের সাদৃশ্য অথবা হাদীসে বর্ণিত দোয়া সমূহের সাদৃশ্য যে কোন দোয়া ইচ্ছা পাঠ করবে। আর এমন দোয়া করবে না, যা মানুষের কথার সাথে মিলে যায়। তারপর ডান দিকে সালাম ফেরাবে এবং বলবে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ও বারাকাতুহু'। এরপর বাম দিকে অনুরূপভাবে সালাম ফেরাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাশাহ্হুদের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ وَالتَّشَهُّدُ اَنْ يَّقُوْلَ الخ ঃ কিতাবে বর্ণিত তাশাহ্হুদই হল উত্তম। এটি হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-এর তাশাহ্হুদ। যেমন– তিনি বলছেন যে, মহানবী (সাঃ) আমার হাত ধরে আমাকে তাশাহ্হুদ শিক্ষা দিয়েছেন, যেমনিভাবে কুরআন শিক্ষা দিতেন।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ইবনে আব্বাসের (রাঃ) তাশাহ্হুদকে গ্রহণ করেছেন। তাতে কিছুটা কমবেশি রয়েছে।

হানাফীদের নিকট শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ ফরয এবং প্রথম বৈঠকে ওয়াজিব, আর দরূদ শরীফ সুন্নত। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, তাশাহ্হুদ ও দরূদ শরীফ উভয়টি শেষ বৈঠকে ফরয।

ফরয সালাতে শেষ রাকআতদ্বয়ে ফাতিহা পড়া ঃ

قَوْلُهٗ وَيَقْرَأُ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاَخِيْرَيْنِ الخ ঃ ফরয সালাতের শেষ দুই রাকআতে কিছু না পড়ে তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় দন্ডায়মান থাকলেও সালাত হয়ে যাবে, অথবা তিন তাসবীহ পড়লেও চলবে। তবে সূরা ফাতিহা পড়া সুন্নত, এটা পড়াই উত্তম। হাসান ইবনে যিয়াদ হযরত আবূ হানীফা (রহঃ) হতে শেষ দুই রাকআতে ফাতিহা পাঠ করাকে ওয়াজিব বলে বর্ণনা করেছেন।

দুরূদের পরে যে দোয়া পাঠ করবে ঃ

قَوْلُهٗ وَ دَعَا بِمَا شَاءَ الخ ঃ দরূদ পাঠ করার পর সে সমস্ত দোয়া সমূহের কোন একটি পাঠ করবে, যা কুরআন ও হাদীসে রয়েছে বা কুরআন ও হাদীসের শব্দের সাথে মিল রয়েছে, যেমন– اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ وَلِوَالِدَىَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

মানুষের কথার সাথে মিল রাখে এমন কোন দোয়া পড়বে না, যথা- اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِزَيْدٍ وَعَمْرٍو وَبَكْرٍ তবে এই اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْلِىْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِىْ إِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۔ দোয়াটি পড়া উত্তম। وَالْمُؤْمِنَاتِ

সালাম ফেরাবার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ الخ ঃ 'আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু' বলে ইমাম সাহেব সর্বপ্রথম এমনভাবে ডান দিকে সালাম ফেরাবে যাতে মুক্তাদীগণ ইমামের চেহারা দেখতে পায়। পরে বাম দিকে ফেরাবে। ইমাম সাহেব সালামের মাধ্যমে সে দিকের ফেরেশতা ও মুসল্লিগণের নিয়ত করবে, আর মুক্তাদীগণ ইমামের নিয়ত করবে।

وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ وَفِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِنْ كَانَ إِمَامًا وَيُخْفِى الْقِرَاءَةَ فِيْمَا بَعْدَ الْاُوْلَيَيْنِ وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ جَهَرَ وَاَسْمَعَ نَفْسَهُ وَإِنْ شَاءَ خَافَتَ وَيُخْفِى الْإِمَامُ الْقِرَاءَةَ فِى الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْوِتْرُ ثَلٰثُ رَكْعَاتٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ قَبْلَ الرُّكُوْعِ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ وَيَقْرَأُ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ مِنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَّعَهَا فَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّقْنُتَ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ وَلَا يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةٍ غَيْرِهَا -

---

সরল অনুবাদ ঃ ফজরের সালাতে, মাগরিব ও ইশার প্রথম প্রথম দুই রাকআতে যদি ইমাম হয়, তবে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করবে এবং প্রথম দুই রাকআতের পরের রাকআত গুলোতে চুপে চুপে পড়বে। আর যদি একাকী সালাত আদায়কারী হয়, তবে তার ইচ্ছাধীন, ইচ্ছা করলে উচ্চৈঃস্বরে পড়ে নিজেকে শুনাতে পারে; ইচ্ছা করলে চুপে চুপেও পড়তে পারে। যোহর ও আসর সালাতে ইমাম কিরাআত চুপে চুপে পড়বে। বিতির হল তিন রাকআত, এর মাঝখানে সালাম দ্বারা পৃথক করবে না। আর সারা বৎসর বিতিরের তৃতীয় রাকআতে রুকূর পূর্বে দোয়ায়ে কুনূত পড়বে। বিতিরের প্রত্যেক রাকআতে ফাতিহা ও উহার সাথে অন্য যে কোন একটি সূরা পাঠ করবে। আর যখন কুনূত পড়তে ইচ্ছা করবে, তখন তাকবীর বলে দুই হাত উত্তোলন করবে, তারপর কুনূত পড়বে। বিতির ছাড়া অন্য কোন সালাতে কুনূত পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়ার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِى الْفَجْرِ الخ ঃ ফাজর, জুমুআ ও ঈদের সালাত এবং মাগরিব ও ইশার প্রথম দুই রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করা ইমামের জন্য ওয়াজিব। ভুলক্রমে ছেড়ে দিলে সাহু সিজদা ওয়াজিব হবে।

ঘটনা ঃ ইসলামের প্রথম দিকে রাসূল (সাঃ) প্রত্যেক সালাতেই উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পাঠ করতেন। এতে কাফিররা অপরাপর কাফির কুরআন শুনে মুসলমান হয়ে যাবার আশঙ্কায় রাসূল (সাঃ)-কে কষ্ট দিত এবং তাঁকে প্রকাশ্যে কুরআন পড়তে দিত না। এ কারণে আল্লাহর নির্দেশে রাসূল (সাঃ) যোহর ও আসর চুপে চুপে পড়তে শুরু করেন; মাগরিব, ইশা ও ফজর জোরে পড়তে লাগলেন। কেননা, মাগরিবের সময় ছিল কাফিরদের খাওয়া দাওয়ার সময়, আর ইশা ও ফজরের সময় তারা ঘুমিয়ে থাকত। এছাড়া জুমুআ ও ঈদের সালাত মদীনায় নাযিল হয়েছে বিধায় এসব সালাতে জোরে কিরাআত পড়া হত।

উচ্চৈঃস্বরে ও নিম্নস্বরে পড়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَاسْمَعْ نَفْسَهُ الخ ঃ উচ্চৈঃস্বরে পড়বার সীমা হল, সে এবং তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি যেন শুনতে পায়। আর নিম্নস্বরে পড়বার সীমা হল, যেন সে নিজ কানে শুনতে পায়। এর কমে স্বর হলে সালাত হবে না।

বিতিরের সালাতের ব্যাপারে ওলামাদের মতান্তর ঃ

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, বিতিরের সালাত ওয়াজিব। আর এ সালাত হলো এক সালামে তিন রাকআত।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) ও কিছু সংখ্যক ওলামার মতে, বিতিরের সালাত সুন্নত।

ইমাম যুফার ও ইব্রাহীম নখয়ীর মতে, এটা ফরয। ইমাম আবূ হানীফারও এরূপ এক উক্তি রয়েছে।

ইমাম শাফিয়ীর মতে, এটা সুন্নত। আবূ হানীফা (রহঃ)-এর সর্বশেষ অভিমত হল বিতির ওয়াজিব। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন– اَلْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيْسَ مِنِّىْ

অর্থাৎ বিতির ওয়াজিব। যে ব্যক্তি বিতির পড়েনি সে আমার দলভুক্ত নয়।

উল্লিখিত মতগুলোর সমাধান এভাবে করা যায় যে, কার্যত বিতির ফরয, যা পরিত্যাগ করলে ফাসিক হবে। আর বিশ্বাস গত ভাবে ওয়াজিব, ফলে তার অস্বীকারকারীকে কাফির বলা যাবে না। আর প্রমাণের দিক থেকে সুন্নাত অর্থাৎ সুন্নাতে রাসূল (সাঃ) দ্বারা সাবেত।

উল্লেখ্য যে, ইমাম শাফিয়ী ও মালিক (রহঃ)-এর নিকট বিতির এক রাকআত তথা সুন্নতের বা তাহাজ্জুদের দুই রাকআত পড়ে সালাম ফেরাবে এবং পরে এক রাকআত পড়বে।

কুনূত পড়ার ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَيَقْنُتُ فِى الثَّالِثَةِ الخ ঃ হানাফীদের মতে, সারা বৎসর বিতিরের তৃতীয় রাকআতের রুকুর পূর্বে কুনূত পড়তে হয়।

শাফিয়ীদের মতে, শুধু রমযান মাসের শেষ ১৫ দিনে বিতিরের সালাতে রুকুর পর কুনূত পড়তে হয়।

বিতির ছাড়া অন্য কোন সালাতে কুনূত নেই ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَقْنُتُ فِىْ صَلٰوةٍ غَيْرِهَا الخ ঃ শাফিয়ী মাযহাব মতে ফজরের সালাতের দ্বিতীয় রাকআতে রুকুর (হতে দাঁড়িয়ে) পর সারা বছর কুনূত পড়তে হবে।

আর হানাফী মাযহাব মতে, মুসলমানদের ওপর কোন বিপদ নাযিল হলে তা হতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য ফজরের সালাতে কুনূতে নাযিলা পড়তে হয়। শুধু মসিবতের দিবস গুলোতে পড়বে সর্বদা নয়।

وَلَيْسَ فِى شَئٍ مِنَ الصَّلٰوةِ قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا لَايَجُوْزُ غَيْرُهَا وَيُكْرَهُ اَنْ يَتَّخِذَ قِرَاءَةَ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا لِلصَّلٰوةِ لَايَقْرَأُ فِيْهَا غَيْرَهَا وَاَدْنٰى مَايَجْزِىْ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى الصَّلٰوةِ مَايَتَنَاوَلُهُ اِسْمُ الْقُرْاٰنِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ اَقَلُّ مِنْ ثَلٰثِ اٰيَاتٍ قِصَارٍ اَوْ اٰيَةٍ طَوِيْلَةٍ وَلَا يَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ خَلْفَ الْاِمَامِ وَمَنْ اَرَادَ الدُّخُوْلَ فِىْ صَلٰوةِ غَيْرِهِ يَحْتَاجُ اِلٰى نِيَّتَيْنِ نِيَّةِ الصَّلٰوةِ وَنِيَّةِ الْمُتَابَعَةِ –

সরল অনুবাদ ঃ কোন সালাতের মধ্যে এমন কোন নির্দিষ্ট সূরা পাঠ নেই যে উহা ছাড়া সালাত জায়েয হবে না। কোন সালাতের জন্য কোন সূরাকে এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ যে, ঐ সূরা ব্যতীত অন্য কোন সূরা সে সালাতে পড়া হয় না। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, সালাত বিশুদ্ধ হবার জন্য কমপক্ষে এই পরিমাণ কিরাআত পড়তে হবে যাকে কুরআন বলা চলে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াতের কমে সালাত জায়েয হবে না। ইমামের পিছনে মুক্তাদী কিরাআত পাঠ করবে না। যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়তে ইচ্ছা করে সে দু'টি নিয়তের মুখাপেক্ষী হবে; সালাতের নিয়ত ও এক্তেদার নিয়ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সালাতের জন্য সূরা নির্দিষ্ট করে নেয়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ اَنْ يَتَّخِذَ الخ ঃ কোন সালাতের জন্য কোন সূরা এমনভাবে নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ যে, সে সূরা ছাড়া অন্য সূরা জায়েয মনে করে না, কিন্তু এরূপ নিয়ত ছাড়া করে থাকলে মাকরূহ হবে না। আর রাসূল (সাঃ) পড়েছেন বিধায় পড়লে নাজায়েয হবে না। যদি কোন ব্যক্তি শুধুমাত্র একটি সূরা মুখাস্ত জানে, তবে তার জন্য মাকরূহ হবে না।

কিরাআতের পরিমাণ ঃ

قَوْلُهُ اَدْنٰى مَايَجْزِىْ مِنَ الْقِرَاءَةِ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, যে পরিমাণকে কুরআন বলা চলে ততটুকু পড়লেই সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, ছোট তিন আয়াত পরিমাণ পড়া ফরয।

মুক্তাদীর কিরাআতের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ لَايَقْرَأُ الْمُؤْتَمُّ الخ ঃ ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কিরাআত পড়া সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয।

তাঁদের দলিল হল– لَاصَلٰوةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ফাতিহা পড়েনি তার সালাত হয়নি।

হানাফীদের মতে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীর কোন কিরাআত পড়তে হয় না।

হানাফীদের দলিল হল হযরত জাবির (রাঃ)-এর হাদীস যে, রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— যে ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত পড়ে তার জন্য ইমামের কিরাআতই যথেষ্ট। এছাড়াও বহু হাদীস এ সম্পর্কে রয়েছে।

আর শাফিয়ীদের হাদীসের জবাবে বলেন যে, তাদের হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা অন্য হাদীসে রয়েছে "قِرَاءَةُ الْاِمَامِ قِرَاءَةٌ لَهُ" তথা ইমামের কিরাআতই মুক্তাদীর কিরাআত। শুধু ইমাম ও একাকী সালাত আদায়কারীর জন্য কিরাআত পড়তে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। সালাতের আরকান কয়টি ও কি কি?

২। সালাতে কতটুকু পরিমাণ আয়াত পড়া ফরয?

৩। সালাতের وَاجِب কয়টি ও কি কি?

৪। শুধু নাকের ওপর সিজদা করা সম্পর্কে ইমামগণের মতামত উল্লেখ কর।

৫। কোন্ কোন্ সালাতে কিরাআত সরবে আর কোন্ কোন সালাতে কিরাআত নীরবে পড়তে হয়।

৬। কোন সালাতে কোন সূরা নির্দিষ্ট করে পড়া জায়েয কিনা? বর্ণনা কর।

৭। তাকবীরের শব্দগুলো ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ কর।

৮। সালাত আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৯। اَلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الْاِمَامِ প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর।

بَابُ الْجَمَاعَةِ

وَالْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ وَ اَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ اَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَقْرَأُهُمْ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَوْرَعُهُمْ فَاِنْ تَسَاوَوْا فَاَسَنُّهُمْ وَيُكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْعَبْدِ وَالْاَعْرَابِيِّ وَالْفَاسِقِ وَالْاَعْمٰى وَ وَلَدِ الزِّنَاءِ فَاِنْ تَقَدَّمُوْا جَازَ وَيَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ اَنْ لَا يُطَوِّلَ بِهِمُ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ وَحْدَهُنَّ بِجَمَاعَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ وَقَفَتِ الْاِمَامَةُ وَسَطَهُنَّ كَالْعُرَاةِ وَمَنْ صَلّٰى مَعَ وَاحِدٍ اَقَامَهُ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَاِنْ كَانَا اِثْنَيْنِ تَقَدَّمَهُمَا وَلَا يَجُوْزُ لِلرِّجَالِ اَنْ يَقْتَدُوْا بِاِمْرَأَةٍ اَوْ صَبِيٍّ -

জামাআতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ জামাআত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ইমামতের জন্য সে সর্বত্তোম যে, সুন্নত (হাদীস ও মাসআলা) সম্বন্ধে সর্বাধিক জ্ঞাত। যদি এতে সকলেই সমান হয়, তবে সর্বাধিক বিশুদ্ধ কুরআন পাঠকারী ব্যক্তি। যদি এ বিষয়ে সবাই সমান হয়, তবে সকলের মধ্যে যে পরহেজগার। যদি এতেও সবাই সমান হয়, তবে যে বয়সে সবচেয়ে বড় (সে ইমামতের জন্য উত্তম)। কৃতদাস, বেদুইন, ফাসিক, অন্ধ ও জারজ সন্তানকে ইমামতের জন্য সামনে দেয়া মাকরূহ। যদি তারা সামনে অগ্রসর হয়ে যায়, তবে জায়েয হবে। ইমামের উচিত সে যেন মুক্তাদীদের নিয়ে কিরাআত দীর্ঘ না করে। শুধু মহিলাগণ জামাআতে সালাত পড়া মাকরূহ।

যদি তারা এরূপ করে, তবে উলঙ্গ ব্যক্তিদের ন্যায় তাদের ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াবে। আর কেউ যদি একজন মুক্তাদী নিয়ে সালাত পড়ে, তাহলে তাকে নিজের ডান পার্শ্বে দাঁড় করাবে। আর যদি দু'জন হয়, তবে ইমাম সম্মুখে চলে যাবে। পুরুষের জন্য স্ত্রীলোক অথবা অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকের পিছনে একতেদা করা জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জামাআত সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ اَلْجَمَاعَةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ ঃ জামাআতে সালাত আদায় করা সম্বন্ধে ইমামদের মাঝে ব্যাপক মতান্তর পরিলক্ষিত হয়–

১. ইমাম আহমদ ও আহলে জাওয়াহিরদের নিকট জামাআত ফরযে আইন, তবে সালাত বিশুদ্ধ হবার জন্য জামাআত শর্ত নয়।

২. ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট জামাআত ফরযে কিফায়া। কিছু সংখ্যক আদায় করলেই সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

৩. হানাফী মাযহাবের অনেক ওলামা বিশেষ করে ত্বাহাবী ও বাহরুর রায়েকসহ বিভিন্ন গ্রন্থে শাফিয়ী মাযহাব মতে, ফরযে কিফায়া উল্লেখ রয়েছে।

৪. অধিকাংশ হানাফীর নিকট জামাআত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা অর্থাৎ ওয়াজিবের কাছাকাছি। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হতেও এরূপ একটি উক্তি বর্ণিত আছে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنُ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفُ اِلٰى رِجَالٍ لَا يَشْهَدُوْنَ الصَّلٰوةَ فَاُحَرِّقُ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ .

ইমামতের জন্য সর্বোত্তম কে ঃ

قَوْلُهُ اَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ الخ ঃ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, اَقْرَأُ বা সর্বাপেক্ষা বড় কারী ইমামতের জন্য সর্বোত্তম, এরপর সর্বাপেক্ষা জ্ঞানী। কেননা হাদীসে اَقْرَأُ -কে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে।

আর হানাফীদের নিকট সর্বপ্রথম হল, অধিক জ্ঞানী ব্যক্তি, তারপর বড় কারী। কেননা কিরাআতের সম্পর্ক সালাতে এক রুকনের সাথে আর ইলমের সম্পর্ক সমস্ত রুকনের সাথে শাফিয়ীদের হাদীসের জবাবে বলা যায় যে, হাদীসের اَقْرَأُ দ্বারা সর্বাপেক্ষা বড় আলিমকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা রাসূল (সাঃ)-এর যুগে যারা বড় কারী হতেন তারা বড় আলিমও হতেন।

গোলাম, অন্ধ, ফাসিক, বেদুইন ও জারজ সন্তানের ইমামতের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ تَقْدِيْمُ الْعَبْدِ الخ ঃ অন্ধ, দাস, বেদুইন, ফাসিক ও জারজ সন্তানের ইমামতকে ইমাম কুদূরী মাকরূহ বলেছেন, তবে এদের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে, যেমন– ফাসিকের ইমামত মাকরূহে তাহরীমী; দাস, অন্ধ ও বেদুইনের ইমামত মাকরূহে তানযীহী। তবে তারা আলিম হলে তখন মাকরূহ হবে না। জারজ সন্তান আলিম হলে কোন কোন ইমামের মতে মাকরূহ হবে না। এরা যদি ইমাম হয়ে যায়, তবে তাদের পিছনে এক্তেদা করা জায়েয হবে।

সালাত দীর্ঘ না করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ اَنْ لَّا يُطَوِّلَ الخ ঃ ইমামের উচিত নয় সালাত দীর্ঘ করে পড়া। কেননা জামাআতে অনেক দুর্বল বয়োবৃদ্ধ লোক থাকে, সালাত দীর্ঘ করলে তাদের কষ্ট হয়। এ জন্য রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— তোমাদের কেউ ইমাম হলে মুকতাদীর মধ্যকার সবচাইতে দুর্বল ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে সালাত আদায় করবে। সালাত দীর্ঘ করার কারণে হুজুর (সাঃ) হযরত মুআয (রাঃ)-কে সতর্ক করে দিয়েছেন।

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ اَنْ يُّصَلِّيْنَ الخ ঃ যে জামাআতে সকলেই স্ত্রীলোক সে জামাআত মাকরূহে তাহরীমী, নফল হোক আর ফরয হোক। এ অবস্থায় উলঙ্গ ব্যক্তিদের মতো ইমাম মধ্যস্থলে দাঁড়াবে।

মুক্তাদী এক বা দু'জন হলে ইমাম দাঁড়াবার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى مَعَ وَاحِدٍ الخ ঃ মুক্তাদী একজন হলে ইমামের ডান পার্শ্বে একই কাতারে দাঁড়াবে, যেন মুক্তাদীর পায়ের আঙুল ইমামের গোড়ালি বরাবর থাকে। যদি মুক্তাদী দু'জন হয়, তবে ইমাম সামনে চলে যাবে, মাঝখানে দাঁড়ালে সালাত মাকরূহে তানযীহী হবে। আর মুক্তাদী দু'জনের অধিক হলে ইমাম মাঝখানে দাঁড়ালে মাকরূহে তাহরীমী হবে।

নাবালেগ ও মেয়ে লোকের পিছনে এক্তেদার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ اَنْ يَّقْتَدُوْا بِامْرَأَةٍ الخ ঃ মেয়ে লোকের পিছনে পুরুষ লোক এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক লোকের পিছনে বয়স্ক লোকের এক্তেদা জায়েয নেই। তবে তারাবীর সালাতে নাবালেগের পিছনে ইমাম আবূ হানীফার (রহঃ) এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী জায়েয। ইমাম শাফিয়ীর মতে, কোন সালাতেরই নাবালেগ ইমাম হতে পারে না।

وَيَصُفُّ الرِّجَالُ ثُمَّ الصِّبْيَانُ ثُمَّ الْخُنْثٰى ثُمَّ النِّسَاءُ فَاِنْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ اِلٰى جَنْبِ رَجُلٍ وَهُمَا مُشْتَرِكَانِ فِىْ صَلٰوةٍ وَاحِدَةٍ فَسَدَتْ صَلٰوتُهٗ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ وَلَابَأْسَ بِاَنْ تَخْرُجَ الْعَجُوْزُ فِى الْفَجْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ خُرُوْجُ الْعَجُوْزِ فِىْ سَائِرِ الصَّلٰوةِ وَلَايُصَلِّى الطَّاهِرُ خَلْفَ مَنْ بِهٖ سَلَسُ الْبَوْلِ وَلَا الطَّاهِرَاتُ خَلْفَ الْمُسْتَحَاضَةِ وَلَا الْقَارِئُ خَلْفَ الْاُمِّىْ وَلَا الْمُكْتَسِىْ خَلْفَ الْعُرْيَانِ -

সরল অনুবাদ ঃ প্রথমে পুরুষগণ কাতার করবে, তারপর অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেগণ, তারপর হিজড়া, (তথা পুরুষও নয় নারীও নয়) তারপর মহিলাগণ। যদি কোন মহিলা কোন পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ায় আর উভয়ে একই সালাতে অংশীদার হয়, (অর্থাৎ একই সালাত পড়ে) তাহলে পুরুষ ব্যক্তির সালাত নষ্ট হয়ে যাবে। জামাআতে উপস্থিত হওয়া মহিলাদের জন্য মাকরূহ। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে ফজর, মাগরিব ও ইশার সালাতে বৃদ্ধা মহিলাদের উপস্থিত হওয়াতে কোন ক্ষতি নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, বৃদ্ধা মহিলাগণ সকল সালাতের জামাআতে বের হওয়া জায়েয। বহুমূত্র রোগীর পিছনে সুস্থ (পবিত্র) ব্যক্তি সালাত পড়বে না। পবিত্রা নারী মুস্তাহাযা (অনবরত রক্ত প্রবহমান নারী) নারীর পিছনে, কারী উম্মির পিছনে এবং পোশাক (কাপড়) পরিহিত ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাতার করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهٗ وَيَصُفُّ الرِّجَالُ الخ ঃ কাতার করার নিয়ম হল, প্রথম কাতারে বয়স্ক পুরুষগণ, দ্বিতীয় কাতারে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেগণ, তারপর হিজড়া ও তারপর মহিলাগণ। কেননা হাদীসে এসেছে যে, রাসূল (সাঃ) যখন সালাতের কাতার করতেন। তখন প্রথম কাতারে বয়স্ক পুরুষগণকে, তারপর শিশুগণকে এবং শিশুদের পিছনে মহিলাদেরকে দাঁড় করাতেন।

একই সালাতে মহিলা পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়ালে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ فَاِنْ قَامَتْ اِمْرَأَةٌ الخ ঃ হানাফীদের মতে, একই সালাতে মহিলা পুরুষের পার্শ্বে দন্ডায়মান হলে পুরুষের সালাত নষ্ট হয়ে যাবে; কিন্তু মহিলার সালাত ফাসিদ হবে না। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট পুরুষের সালাতও ফাসিদ হবে না। উল্লেখ্য যে, পুরুষের সালাত নষ্ট হতে কয়েকটি শর্ত পাওয়া আবশ্যক—

(১) মহিলা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়া, (২) মধ্যখানে এক আঙুল পরিমাণ মোটা কোন বস্তুর দ্বারা পর্দা না থাকা, (৩) মহিলাটি সজ্ঞানী হওয়া– পাগল বা বেহুঁশ না হওয়া, (৪) রুকু-সিজদা বিশিষ্ট সালাত হওয়া, (৫) উভয়ে একই সালাতে শরিক হওয়া, (৬) পূর্ণ এক রুকনে শরিক হওয়া, (৭) ইমাম কর্তৃক মহিলার ইমামতের নিয়ত করা, (৮) নারী পুরুষের একই তাহরীমা হওয়া।

মহিলাদের জামাআতে হাজির হবার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَيُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ حُضُوْرُ الْجَمَاعَةِ الخ ঃ রাসূল (সাঃ) ও আবূ বকর (রাঃ)-এর যুগে প্রত্যেক সালাতেই মহিলাগণ উপস্থিত হতেন। ফিতনা-ফাসাদের আশঙ্কায় হযরত ওমর (রাঃ) মহিলাদেরকে জামাআতে হাজির হতে নিষেধ করেন। পরবর্তীতে ইমামগণ রাতের সালাতে বৃদ্ধাদের অনুমতি দিলেও দিনের সালাতের জামাআতে শরিক হতে কাউকে অনুমতি দেননি। বর্তমানে অত্যধিক ফিতনার কারণে বৃদ্ধাদেরও কোন জামাআতে উপস্থিত হবার অনুমতি নেই।

ইমামতের বিধান ঃ

قَوْلُهُ لَايُصَلِّى الطَّاهِرُ الخ ঃ হানাফীদের মতে, মাজুর ব্যক্তির পিছনে সুস্থ ব্যক্তির এক্তেদা বিশুদ্ধ নয়। কেননা ইমামকে মুক্তাদী হতে উন্নত বা সমান সমান অবস্থার অধিকারী হতে হয়। অতএব পবিত্র (সুস্থ) ব্যক্তির এক্তেদা বহুমূত্র রোগীর পিছনে জায়েয হবে না। এমনিভাবে কারী উম্মির পিছনে, পোশাক পরিহিত ব্যক্তি উলঙ্গ ব্যক্তির পিছনে এবং পবিত্রা নারী মুস্তাহাযা ওয়ালী নারীর পিছনে এক্তেদা জায়েয হবে না।

وَيَجُوْزُ اَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الْمُتَوَضِّئِيْنَ وَالْمَاسِحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْغَاسِلِيْنَ وَيُصَلِّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ وَلَايُصَلِّى الَّذِى يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ خَلْفَ الْمُوْمِى وَلَايُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ وَلَا مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا خَلْفَ مَنْ يُصَلِّى فَرْضًا اٰخَرَ وَيُصَلِّى الْمُتَنَفِّلُ خَلْفَ الْمُفْتَرِضِ وَمَنْ اِقْتَدٰى بِاِمَامٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهُ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ اَعَادَ الصَّلٰوةَ وَيُكْرَهُ لِلْمُصَلِّى اَنْ يَعْبَثَ بِثَوْبِهٖ اَوْ بِجَسَدِهٖ وَلَا يَقْلِبُ الْحَصٰى اِلَّا اَنْ لَايُمْكِنُهُ السُّجُوْدُ عَلَيْهِ فَيُسَوِّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُفَرْقِعُ اَصَابِعَهُ وَلَايُشَبِّكُ وَلَايَتَخَصَّرُ وَلَايَسْدُلُ ثَوْبَهُ وَلَايَكُفُّهُ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا -

---

সরল অনুবাদ ঃ তায়াম্মুমকারী ওযূকারীদের এবং মোজার ওপর মাসাহকারী পা ধৌতকারীদের ইমামত করা জায়েয। দন্ডায়মানকারী উপবিষ্ট ব্যক্তির পিছনে সালাত পড়তে পারে। রুকু-সিজদাকারী ইশারাকারীর পিছনে সালাত পড়তে পারবে না। ফরয আদায়কারী নফল আদায়কারীর পিছনে সালাত পড়বে না। এক ফরয আদায়কারী ভিন্ন ফরয আদায়কারীর পিছনে সালাত পড়বে না। তবে নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর পিছনে সালাত পড়তে পারে। কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে এক্তেদা করার পর যদি জানতে পারে যে, সে অপবিত্র ছিল তবে মুক্তাদী সে সালাত পুনরায় পড়বে। (মাকরূহসমূহ) মুসল্লি ব্যক্তি তার স্বীয় কাপড়-চোপড় অথবা শরীরের কোন অঙ্গ নিয়ে খেলা করা মাকরূহ। কণা সরাবে না, কিন্তু যদি তার ওপর সিজদা করা সম্ভব না হয়, তবে শুধু একবার উহাকে (সরিয়ে) সমান করে দেবে। আঙুলের মটকা ফুটাবে না। এক হাতের আঙুল অপর হাতের আঙুলের মধ্যে প্রবেশ করাবে না। কোমরে হাত দেবে না। কাপড় (কাঁধ বা মাথার ওপর) লটকিয়ে দেবে না, (ধুলাবালি হতে) টেনে নেবে না। চুল বাঁধবে না এবং ডান ও বামে দেখবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তায়াম্মুমকারীর ইমাম হবার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوْزُ اَنْ يَؤُمَّ الْمُتَيَمِّمُ الخ ঃ জমহুর ইমামদের মতে, তায়াম্মুমকারী ওযূকারীদের ইমামত করতে পারে। কেননা তায়াম্মুম পানির অভাবে পূর্ণাঙ্গ পবিত্রতা।

قَوْلُهُ وَيُصَلِّى الْقَائِمُ خَلْفَ الْقَاعِدِ ঃ দাঁড়িয়ে সালাত পড়া ব্যক্তি বসা ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা করা শায়খাইনের নিকট জায়েয; ইমাম মুহাম্মদের নিকট জায়েয নেই; ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) মুক্তাদীও বসে পড়ার শর্তে জায়েয বলেন। তবে ইশারা-ইঙ্গিতে পড়া ব্যক্তির পিছনে রুকু-সিজদা করা ব্যক্তির এক্তেদা করা জায়েয নেই।

ইমাম ও মুক্তাদীর সালাত এক না হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يُصَلِّى الْمُفْتَرِضُ الخ ঃ ফরয আদায়কারীর নফল আদায়কারীর পিছনে এক্তেদা করা ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) ব্যতীত সকল ইমামের নিকট নাজায়েয। কেননা ইমামের সালাত মুক্তাদীর সালাতের বরাবর হবে নতুবা উন্নতমানের

হবে। নিম্নমানের হলে চলবে না। এমনিভাবে এক ফরয আদায়কারীর পিছনে ভিন্ন ফরয আদায়কারীর এক্তেদা বিশুদ্ধ হবে না। কারণ এক্তেদার জন্য একই সালাত হওয়া শর্ত। তবে ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারী এক্তেদা করতে পারবে।

ওযূবিহীন ব্যক্তির পিছনে এক্তেদা করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اِقْتَدٰى الخ ঃ কোন ব্যক্তি ইমামের পিছনে সালাত পড়বার পর জানতে পারল যে, ইমামের ওযূ ছিল না, তাহলে ঐ সালাত পুনঃ পড়তে হবে। ইমাম শাফিয়ীর নিকট মুক্তাদীর সালাত হয়ে যাবে, তবে ইমামকে পুনঃ পড়তে হবে। এ ছাড়া যদি কোন হানাফী কোন শাফিয়ী ইমামের পিছনে এক্তেদা করার পর জানতে পারল যে, প্রবাহিত রক্ত বের হবার পর ওযূ না করে ইমাম সাহেব সালাত পড়িয়েছেন, (শাফিয়ীদের মতে রক্ত প্রবাহিত হলে ওযূ নষ্ট হয় না।) তখন হানাফী মুক্তাদীকে সালাত পুনঃ পড়তে হবে।

সালাতের মাকরূহসমূহ ঃ

قَوْلُهُ اَنْ يَّعْبَثَ بِثَوْبِهِ الخ ঃ عَبَثْ ঐ কাজকে বলা হয়, যাতে ইহকালীন ও পরকালীন কোন উপকার হয় না। আর খেলাধুলায় সাময়িক আনন্দ পাওয়াকে لَعَبْ বলে। শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কাপড়-চোপড় নিয়ে খেলা করাকে عَبَثْ বলে। এটা সালাত করলে মাকরূহ হবে। মহানবী (সাঃ) কোন মুসল্লিকে সালাতের মধ্যে দাড়ি নিয়ে খেলা করতে দেখে বললেন, "যদি এর অন্তর বিনয়ী হত, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলোও বিনয়ী হত।"

আঙুল ফুটানোর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُفَرْقِعُ اَصَابِعَهُ وَلَايُشَبِّكُ ঃ আঙুল ফুটালে শয়তান খুশি হয়, তাই সালাতে আঙুল ফুটানো মাকরূহ। কেউ কেউ সালাতের বাহিরেও একে মাকরূহ বলেছেন এবং এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলে প্রবেশ করানোও মাকরূহ।

কোমরে হাত রাখার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَتَخَصَّرُ ঃ সালাতের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ। এটা অহঙ্কারীদের চিহ্ন। আর শয়তানকে বেহেশ্ত হতে কোমরে হাত রাখা অবস্থায় বের করে দেয়া হয়েছে।

সালাতে কাপড় লটকানোর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَسْدُلُ ثَوْبَهُ الخ ঃ সদল অর্থ হল, রুমাল বা চাদর মাথা বা কাঁধে রেখে উহার দুই দিক দুই পার্শ্বে লটকিয়ে দেয়া। এটা সালাতে করা মাকরূহ। এমনিভাবে ধুলাবালি হতে সালাতের ভিতর টেনে নেয়াও মাকরূহ।

সালাতে চুল বাঁধার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَعْقِصُ شَعْرَهُ ঃ যে পুরুষ ব্যক্তি সুন্নত নিয়মে লম্বা চুল রাখে, সে সালাতে রত অবস্থায় এ চুলগুলো যেন বেঁধে না রাখে, তাহলে সিজদার সময় চুলগুলোও সিজদা করতে পারবে। তাই চুল বাঁধা মাকরূহ। স্ত্রীলোকের জন্য এ আদেশ প্রযোজ্য নয়। এ কারণেই লেখক شعرها না বলে شعره বলেছেন।

ডানে বামে দেখার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَلْتَفِتُ يَمِيْنًا وَشِمَالًا ঃ সালাতের ভিতর ডান ও বাম দিকে তাকানোও মাকরূহ। কেননা এতে সালাতের মধ্যে মনোযোগ কমে যায়।

উল্লেখ্য যে, ডানে বামে ফেরা তিন রকম হতে পারে— (১) চোয়াল ও বক্ষ ফিরবে না, শুধু চক্ষু দিয়ে আড়চোখে দেখা, এতে মাকরূহ হয় না, (২) বক্ষ ফিরবে না, শুধু মুখমন্ডল ফিরিয়ে দেখা, এর ফলে সালাত মাকরূহ হয়ে যায়, (৩) মুখমন্ডল ও বক্ষ ফিরিয়ে দেখা, এর ফলে সালাত নষ্ট হয়ে যায়।

وَلَا يُقْعِيْ كَاِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ بِلِسَانِهِ وَلَا بِيَدِهِ وَلَا يَتَرَبَّعُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَلَا يَأْكُلُ وَلَا يَشْرَبُ فَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ اِنْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهِ اِنْ لَمْ يَكُنْ اِمَامًا فَاِنْ كَانَ اِمَامًا اِسْتَخْلَفَ وَتَوَضَّأَ وَبَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهِ مَالَمْ يَتَكَلَّمْ وَالْاِسْتِيْنَافُ اَفْضَلُ وَاِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ جُنَّ اَوْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ اَوْ قَهْقَهَ اِسْتَأْنَفَ الْوُضُوْءَ وَالصَّلٰوةَ وَاِنْ تَكَلَّمَ فِىْ صَلٰوتِهِ سَاهِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ وَاِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ تَوَضَّأَ وَسَلَّمَ وَاِنْ تَعَمَّدَ الْحَدَثَ فِىْ هٰذِهِ الْحَالَةِ اَوْ تَكَلَّمَ اَوْ عَمِلَ عَمَلًا يُنَافِى الصَّلٰوةَ تَمَّتْ صَلٰوتُهُ -

সরল অনুবাদ ঃ আর কুকুরের বসার মতো বসবে না। মুখ ও হাতের দ্বারা সালামের উত্তর দেবে না। কোন ওজর ছাড়া চার জানু হয়ে (আসন পেতে) বসবে না। খানা খাবে না এবং পান করবে না। যদি সালাতের মধ্যে ওযূ ভেঙ্গে যায়, আর যদি সে ইমাম না হয়, তবে সালাত ছেড়ে দিয়ে ওযূ করে তার সালাতের ওপর ভিত্তি করে সালাত শেষ করবে। আর যদি সে ইমাম হয়, তবে একজনকে (টেনে) স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে দেবে এবং ওযূ করে এসে প্রথম সালাতের ওপর ভিত্তি করে সালাত পড়বে, যে পর্যন্ত কোন কথা না বলে। তবে প্রথম হতে নতুন করে সালাত পড়া উত্তম। যদি কোন ব্যক্তি সালাতে নিদ্রা যায় এবং এ অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয় অথবা পাগল হয়ে যায় বা বেহুঁশ হয়ে যায়, অথবা উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠে, তবে এসব অবস্থায় ওযূ করে পুনঃ সালাত পড়তে হবে। আর যদি সালাতে ভুলে বা স্বেচ্ছায় কথা বলে, তবে সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ওযূ চলে যায়, তবে শুধু ওযূ করে সালাম ফেরাবে। আর যদি এ অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে ওযূ নষ্ট করে অথবা কথা বলে অথবা এমন কাজ করে যা সালাতের বিপরীত, তাহলে সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কুকুরের মতো বসা মাকরূহ ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يُقْعِيْ كَاِقْعَاءِ الْكَلْبِ ঃ اِقْعَاء ইক'আ শব্দের অর্থ হল, উভয় নিতম্বের ওপর বসে উভয় উরু দাঁড় করিয়ে বক্ষের সাথে মিশিয়ে হস্তদ্বয় দ্বারা মাটিতে ঠেস দিয়ে বসা। একে কুকুরের বসা বলে। এরূপ বসা মাকরূহ। কেননা হাদীসে এসেছে —

عَنْ اَبِىْ ذَرْغِفَارِيْ (رض) قَالَ نَهَانَا خَلِيْلِىْ (ص) عَنْ ثَلَاثٍ اَنْ نُقِرَ كَنَقْرِ الدِّيْكِ وَاَنْ اُقْعِىَ كَاِقْعَاءِ الْكَلْبِ وَاَنْ اَفْتَرِشَ كَاِفْتِرَاشِ الضَّبِّ.

সালামের জবাব দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَرُدُّ السَّلَامَ الخ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে সালাতের মধ্যে কথা বলা, সালাম দেয়া ও নেয়া জায়েয ছিল। এরপর "وَقُوْمُوْا لِلّٰهِ قَانِتِيْنَ" অবতীর্ণ হবার পর সব নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। তাই সালামের জবাব দেয়া যাবে না।

চারজানু হয়ে বসার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَتَرَبَّعُ الخ ঃ চারজানু হয়ে তথা আসন পেতে বসা বিনা ওজরে মাকরূহ। কেননা এতে অহঙ্কারের ভাব প্রকাশ পায়। তবে ওজর থাকলে জায়েয হবে।

সালাতের ভিতর ওযূ চলে গেলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ سَبَقَهُ الْحَدَثُ الخ ঃ সালাতের ভিতর ওযূ চলে গেলে যদি সে মুক্তাদী হয় বা একাকী সালাত আদায়কারী হয়, তবে সে ওযূ করে এসে কারো সাথে কথা না বললে অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে। আর যদি সে ইমাম হয়, তবে কাউকে তার স্থলাভিষিক্ত করে ওযূ করে এসে কারো সাথে কথা না বললে অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে। (একে বেনা বলা হয়) তবে প্রথম হতে সালাত পড়াই উত্তম। আর তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ওযূর চলে গেলে ওযূ করে শুধু সালাম ফেরালেই যথেষ্ট হবে। আর এ পরিমাণ বসার পর ইচ্ছা করে ওযূ ভঙ্গ করলে সালাত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

সালাতে ঘুমালে, পাগল হলে বা হাসলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ أَوْجُنَّ أَوْ أُغْمِىَ الخ ঃ সালাতে ঘুমালে, (এখানে اِحْتَلَمَ দ্বারা গভীর ঘুমকে বোঝানো হয়েছে) পাগল হলে বা বেহুঁশ হলে, শব্দ করে হাসলে এবং ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কথা বললে সালাত ভঙ্গ হয়ে যাবে। প্রথম চার অবস্থায় ওযূ ও সালাত উভয়ই ভঙ্গ হয়ে যায়।

وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ فِى صَلٰوتِهٖ بَطَلَتْ صَلٰوتُهٗ وَإِنْ رَاٰهُ بَعْدَمَا قَعَدَ قَدْرَ التَّشَهُّدِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا فَانْقَضَتْ مُدَّةُ مَسْحِهٖ أَوْ خَلَعَ خُفَّيْهِ بِعَمَلٍ قَلِيْلٍ أَوْ كَانَ أُمِّيًّا فَتَعَلَّمَ سُوْرَةً أَوْ عُرْيَانًا فَوَجَدَ ثَوْبًا أَوْ مُوْمِيًا فَقَدَرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ أَوْ تَذَكَّرَ اَنَّ عَلَيْهِ صَلٰوةً قَبْلَ هٰذِهٖ أَوْ أَحْدَثَ الْإِمَامُ الْقَارِى فَاسْتَخْلَفَ أُمِّيًّا أَوْطَلَعَتِ الشَّمْسُ فِى صَلٰوةِ الْفَجْرِ أَوْ دَخَلَ وَقْتُ الْعَصْرِ فِى الْجُمُعَةِ أَوْ كَانَ مَاسِحًا عَلَى الْجَبِيْرَةِ فَسَقَطَتْ عَنْ بُرْءٍ أَوْ كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً فَبَرَأَتْ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ فِى قَوْلِ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَمَّتْ صَلٰوتُهُمْ فِى هٰذِهِ الْمَسَائِلِ-

---

সরল অনুবাদ ঃ তায়াম্মুমকারী তার সালাত অবস্থায় পানি দেখলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর পানি দেখে, অথবা মোজার ওপর মাসাহকারী ছিল (তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর) তখন তার মাসাহের মুদ্দাত শেষ হয়ে গেছে, অথবা আমলে কালীল দ্বারা (তখন) পা হতে মোজাদ্বয় খুলে যায়, অথবা সে উম্মি ছিল তখন কেবল একটি সূরা শিখে ফেলেছে, অথবা উলঙ্গ ছিল তখন কাপড় পেয়েছে, অথবা ইশারায় সালাত আদায়কারী ছিল তখন রুকু-সিজদার ক্ষমতা লাভ করেছে, অথবা তখন স্মরণ হল যে তার ওপর পূর্বের এক ওয়াক্ত সালাত বাকি (কাযা) রয়েছে, অথবা তখন কারী ইমামের ওযূ চলে যাবার পর উম্মিকে স্থলাভিষিক্ত বানিয়েছে, অথবা তখন ফজরের সালাতের মধ্যে সূর্য উদয় হয়ে গেছে, অথবা তখন জুমুআর সালাতের মধ্যে আসরের সময় এসে গেছে, অথবা পটির ওপর মাসাহকারীর সে অবস্থায় পটি পড়ে গেছে, অথবা মুস্তাহাযা ছিল তখন ভালো হয়ে গেছে, এ সব অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, সালাত বাতিল হয়ে যাবে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, এ সব মাসআলায় তাদের সালাত পূর্ণ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তায়াম্মুমকারী সালাত অবস্থায় পানি দেখলে তার হুকুম ঃ

وَإِنْ رَأَى الْمُتَيَمِّمُ الْمَاءَ الخ ঃ কোন ব্যক্তি পানি না পাওয়া অবস্থায় তায়াম্মুম করে সালাত পড়তে থাকল, এ অবস্থায় যদি সে পানি দেখে তথা পানি ব্যবহার করার সুযোগ পায়, তবে তার ওযূ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর অনিচ্ছা সত্ত্বেও কতগুলো কাজ হয়ে গেলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وإن رآه بَعْدَ مَاقَعَدَ الخ ঃ তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর তায়াম্মুমকারী পানি দেখলে, মাসাহকারীর মুদ্দাত শেষ হয়ে গেলে, অথবা সামান্য কাজে মোজা খুলে গেলে, উম্মি ব্যক্তি সূরা শিখলে, বিবস্ত্র ব্যক্তি কাপড় পেলে, ইশারাকারী রুকু-সিজদায় সক্ষম হলে, কাযা সালাতের স্মরণ হলে, কারী ইমাম উম্মিকে স্থলাভিষিক্ত বানালে, ফজরের সালাতে সূর্য উদিত হয়ে গেলে, জুমুআর সালাতে আসরের সময় এসে গেলে, পটি ভাল হয়ে পড়ে গেলে এবং মুস্তাহাযা নারী তখন (তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর) সুস্থ হলে, এ ১২ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, তাদের নামায বাতিল হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। জামাআতের হুকুম কি? ইমামতের জন্য অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি কে? বর্ণনা কর।
২। কার ইমামতি মাকরূহ? বর্ণনা কর।
৩। কার পিছনে এক্তেদা করা জায়েয এবং কার পিছনে জায়েয নেই।
৪। মহিলাগণের জামাআতে অংশগ্রহণের হুকুম লিখ।
৫। সালাতের মধ্যে কোন্ কোন্ কাজ করা মাকরূহ? লিখ।
৬। সালাত ভঙ্গের কারণগুলো উল্লেখ কর।
৭। সালাতের ভিতর ওযূ ভঙ্গ হয়ে গেলে তার হুকুম কি?
৮। মুহাযাত কি? এর মাসআলা বর্ণনা কর।
৯। سَدْلِ ثَوْب -এর ব্যাখ্যা কর এবং তার হুকুম বিস্তারিত লিখ।

بَابُ قَضَاءِ الْفَوَائِتِ

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ قَضَاهَا إِذَا ذَكَرَهَا وَقَدَّمَهَا عَلٰى صَلٰوةِ الْوَقْتِ إِلَّا أَنْ يَّخَافَ فَوْتَ صَلٰوةِ الْوَقْتِ فَيُقَدِّمُ صَلٰوةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِتَةِ ثُمَّ يَقْضِيْهَا وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلَوَاتٌ رَتَّبَهَا فِي الْقَضَاءِ كَمَا وَجَبَتْ فِي الْأَصْلِ إِلَّا أَنْ تَزِيْدَ الْفَوَائِتُ عَلٰى خَمْسِ صَلَوَاتٍ فَيَسْقُطُ التَّرْتِيْبُ فِيْهَا -

কাযা সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তির এক ওয়াক্ত সালাত কাযা হয়ে গেছে, যখন স্মরণ হবে তখনই সে তা আদায় করে নেবে। আর তাকে ওয়াক্তিয়া সালাতের ওপর অগ্রাধিকার দেবে, তবে ওয়াক্তিয়া সালাত ছুটে যাবার (কাযার) আশঙ্কা থাকলে ওয়াক্তিয়া সালাত প্রথমে পড়ে নেবে, তারপর কাযা সালাত পড়বে। যে ব্যক্তির একাধিক সালাত কাযা হয়ে গেছে সে কাযা আদায় করার সময় ধারাবাহিকতা ঠিক রাখবে, যে তারতীবে (ধারাবাহিকতায়) মূল সালাত ফরয হয়েছিল। কিন্তু যদি কাযা সালাত পাঁচ ওয়াক্তের বেশি হয়, তবে ধারাবাহিকতা রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কাযা সালাতের তারতীবের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ مَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ الخ ঃ সালাত কাযা হয়ে গেলে স্মরণ হবার সাথে সাথে পড়ে নেয়া আবশ্যক। যদি কারো পাঁচ ওয়াক্ত বা তার চেয়ে কম সালাত কাযা হয়ে থাকে, তবে তার ওপর তারতীব আবশ্যক। তখন সে কাযা সালাত না পড়ে ওয়াক্তিয়া সালাত পড়লে শুদ্ধ হবে না। তবে তিনটি কারণ পাওয়া গেলে তারতীব আবশ্যক হবে না— (১) কাযার কথা ভুলে গেলে, (২) যদি সময় এত সংকীর্ণ হয় যে, কাযা পড়লে ওয়াক্তিয়া সালাত পড়ার সময় থাকবে না, (৩) পাঁচ ওয়াক্তের অধিক সালাত কাযা হলে কাযা পড়া ব্যতীত ওয়াক্তিয়া পড়া যাবে।

ইমাম আহমদ, মালিক ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, পাঁচ ওয়াক্ত কাযা হলেই তারতীব ছুটে যাবে, পাঁচ ওয়াক্তের কম হলে তারতীব ফরয। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, তারতীব আবশ্যক নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَدَاء ও قَضَاء কাকে বলে? বর্ণনা কর।

২। قَضَاء -এর হুকুম বর্ণনা কর।

৩। কাযা সালাত আদায়ের নিয়ম বর্ণনা কর।

৪। صَاحِب تَرْتِيْب কাকে বলে? تَرْتِيْب রক্ষা করা কখন ওয়াজিব আর কখন ওয়াজিব নয়? বর্ণনা কর।

بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ تُكْرَهُ فِيْهَا الصَّلٰوةُ

لَايَجُوْزُ الصَّلٰوةُ عِنْدَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَلَا عِنْدَ غُرُوْبِهَا اِلَّا عَصْرَ يَوْمِهٖ وَلَا عِنْدَ قِيَامِهَا فِى الظَّهِيْرَةِ وَلَا يُصَلِّىْ عَلٰى جَنَازَةٍ وَلَا يَسْجُدُ لِلتِّلَاوَةِ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يُّصَلِّىْ فِىْ هٰذَيْنِ الْوَقْتَيْنِ الْفَوَائِتَ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ بِاَكْثَرَ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَلَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَغْرِبِ -

সালাতের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সূর্য উদয় ও অস্তের সময় কোন সালাত পড়া জায়েয নেই, তবে সে দিনের আসরের সালাত (না পড়ে থাকলে মাকরূহের সাথে সূর্যাস্তের সময়) পড়া জায়েয। আর ঠিক দ্বিপ্রহরে সূর্য (মধ্যাকাশে) অবস্থান করার সময়ও কোন প্রকার সালাত জায়েয নেই। এসব সময়ে জানাযার সালাতও পড়বে না এবং তিলাওয়াতের সিজদাও দেবে না। ফজরের সালাত পড়ার পর সূর্য উদয় হওয়া পর্যন্ত এবং আসরের সালাত পড়ার পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল পড়া মাকরূহ, তবে এ দুই সময়ের মধ্যে কাযা সালাতসমূহ পড়তে কোন অসুবিধা নেই। সুবহে সাদিকের পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নতের অতিরিক্ত নফল সালাত পড়া মাকরূহ এবং মাগরিবের পূর্বেও কোন নফল পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মাকরূহ ওয়াক্তের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ بَابُ الْاَوْقَاتِ الَّتِىْ تُكْرَهُ الخ ঃ গ্রন্থকার এ স্থানে শুধু মাকরূহ ওয়াক্ত বলেছেন, পক্ষান্তরে এখানে হারাম ওয়াক্তও রয়েছে, যাতে কোন সালাতই পড়া জায়েয নেই– সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

উদয়, দ্বিপ্রহর ও অস্তের সময়ে সালাত নিষেধ হবার কারণ ঃ

قَوْلُهٗ وَلَايَجُوْزُ الصَّلٰوةُ الخ ঃ সূর্য উদয়, অস্ত ও ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় সালাত পড়তে মহানবী (সাঃ) নিষেধ করেছেন। এ সময়সমূহে সর্বপ্রকার সালাত এমন কি তিলাওয়াতে সিজদাও নিষেধ। কেননা, এসব সময়ে সূর্য পূজারীগণ সূর্যকে সিজদা করে এবং উদয় ও অস্তের সময় শয়তান এসে সূর্যের সামনে দাঁড়ায়, যেন সেও মুশরিকের সিজদা পায়। তবে সে দিনের আসরের সালাত পড়তে না পারলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তা পড়তে পারবে।

ফজর ও আসরের পর নফল পড়া মাকরূহ ঃ

قَوْلُهٗ وَيُكْرَهُ اَنْ يَّتَنَفَّلَ الخ ঃ ফজর ও আসরের ফরযের পর নফল সালাত পড়া মাকরূহ, তবে কাযা সালাত পড়া, সিজদায় তিলাওয়াত এবং জানাযার সালাত পড়া মাকরূহ নয়।

সুবহে সাদিকের পর নফল পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ مِنْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ الخ ঃ সুবহে সাদিক হয়ে যাবার পর ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ব্যতীত অন্য কোন নফল পড়া মাকরূহ। এমনিভাবে মাগরিবের পূর্বেও নফল পড়া মাকরূহ। তবে শাফিয়ী মাযহাব অনুযায়ী মাগরিবের পূর্বে দুই রাকআত নফল পড়া জায়েয।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَوْقَاتِ مَنْهِيَة কি কি বর্ণনা কর।
২। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের اَوْقَاتِ مَكْرُوْهَه বর্ণনা কর।
৩। কোন্ কোন্ সময় নফল পড়া মাকরূহ লিখ।

بَابُ النَّوَافِلِ

اَلسُّنَّةُ فِي الصَّلٰوةِ اَنْ يُّصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعَصْرِ وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَاَرْبَعًا قَبْلَ الْعِشَاءِ وَاَرْبَعًا بَعْدَهَا وَاِنْ شَاءَ رَكْعَتَيْنِ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ وَاِنْ شَاءَ اَرْبَعًا وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ فَاَمَّا نَوَافِلُ اللَّيْلِ فَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ صَلّٰى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَزِيْدُ بِاللَّيْلِ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ بِتَسْلِيْمَةٍ وَاحِدَةٍ -

নফল সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সুবহে সাদিক উদিত হবার পর ফজরের দুই রাকআত সালাত পড়া সুন্নত। যোহরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে দুই রাকআত পড়া সুন্নত। আসরের ফরযের পূর্বে চার রাকআত পড়া সুন্নত, ইচ্ছা করলে দুই রাকআতও পড়তে পারে। মাগরিবের ফরযের পর দুই রাকআত, ইশার ফরযের পূর্বে চার রাকআত এবং পরে চার রাকআত সুন্নত, ইচ্ছা করলে দুই রাকআতও পড়তে পারে। আর দিনের নফলসমূহ ইচ্ছা করলে এক সালামে দুই রাকআত বা চার রাকআত পড়তে পারে, এর বেশি পড়া মাকরূহ। কিন্তু রাতের নফলের বেলায় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, যদি এক সালামে আট রাকআত পড়ে তাহলেও জায়েয হবে, এর বেশি পড়া মাকরূহ। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, রাতের নফল এক সালামে দুই রাকআতের বেশি পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নফল বলার কারণ ঃ

قَوْلُهُ بَابُ النَّوَافِلِ ঃ গ্রন্থকার এখানে নফল দ্বারা সুন্নত, নফল উভয় সালাতকে উদ্দেশ্য করেছেন। কেননা ফরয ও ওয়াজিব ছাড়া সকল সালাতকে ফকীহগণ নফল বলে থাকেন। সর্বপ্রকার সুন্নতকে নফল বলা হয়, কিন্তু নফলকে সুন্নত বলা হয় না। তাই তিনি নফল বলে সকল প্রকার সুন্নতকেও উদ্দেশ্য নিয়েছেন।

সুন্নত সালাতের প্রকারভেদ ঃ

قَوْلُهُ اَلسُّنَّةُ فِى الصَّلٰوةِ الخ ঃ সুন্নত সালাত দুই রকম ঃ সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ও সুন্নাতে যায়েদা। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে বারো রাকআত হল সুন্নতে মুয়াক্কাদা। ফজরের পূর্বে দুই রাকআত, যোহরের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত, মাগরিবের পরে দুই রাকআত এবং ইশার পরে দুই রাকআত এ বারো রাকআত সম্বন্ধে রাসূল (সাঃ) বলেছে—

مَنْ ثَابَرَ عَلٰى اِثْنَىْ عَشَرَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ بَنَى اللّٰهُ لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্বদা এ বারো রাকআত রাত দিনে পড়বে, তার জন্য আল্লাহ তা'আলা বেহেশ্তের মধ্যে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।

এ ছাড়া অবশিষ্টগুলো হল সুন্নতে যায়েদা। সেগুলো হল আসরের পূর্বে চার রাকআত, ইশার পূর্বে চার রাকআত এবং পরে সুন্নতে মুয়াক্কাদার পর দুই রাকআত।

ফজরের দুই রাকআত সুন্নত ঃ

قَوْلُهُ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ ঃ ফজরের দুই রাকআত সুন্নাতে মুয়াক্কাদা অতি গুরুত্বপূর্ণ। হাদীসে এসেছে যে, সমগ্র জগতের চাইতে এ দুই রাকআত সালাত অতি মূল্যবান। যদি কোন ব্যক্তি এ দুই রাকআত ফরযের পূর্বে আদায় করতে না পারে, তাহলে সূর্যোদয়ের পর দ্বিপ্রহরের পূর্বে যে কোন সময়ে আদায় করে নিতে হবে।

নফলের উত্তম হবার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ اِنْ شَاءَ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, দিনের নফল এক সালামে দুই রাকআত বা চার রাকআত পড়া উত্তম, এর বেশি রাকআত পড়া মাকরূহ। আর রাতের সালাত এক সালামে আট রাকআত পর্যন্ত পড়া জায়েয, এর বেশি পড়া মাকরূহ।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, রাতের বেলায় দুই রাকআত করে পড়া উত্তম, এর বেশি ঠিক নয়। আর দিনের নফল চার রাকআত করে পড়া উত্তম।

وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْاُخْرَيَيْنِ اِنْ شَاءَ قَرَأَ الْفَاتِحَةَ وَاِنْ شَاءَ سَكَتَ وَاِنْ شَاءَ سَبَّحَ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِى جَمِيْعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ وَجَمِيْعِ الْوِتْرِ وَمَنْ دَخَلَ فِىْ صَلٰوةِ النَّفْلِ ثُمَّ اَفْسَدَهَا قَضَاهَا فَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعَ رَكْعَاتٍ وَقَعَدَ فِى الْاُوْلَيَيْنِ ثُمَّ اَفْسَدَ الْاُخْرَيَيْنِ قَضٰى رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ وَاِنِ افْتَتَحَهَا قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَجُوْزُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ وَمَنْ كَانَ خَارِجَ الْمِصْرِ يَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهٖ اِلٰى اَىِّ جِهَةٍ تَوَجَّهَتْ يُوْمِىْ اِيْمَاءً -

সরল অনুবাদ ঃ (ফরয সালাতের) প্রথম দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ওয়াজিব, (ফরয) শেষ দুই রাকআতে সে ইচ্ছাধীন; ইচ্ছা করলে সে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে চুপ করে থাকতে পারে, আর যদি সে চায় তবে তাসবীহ্ পাঠ করতে পারে। নফল এবং বিতিরের সকল রাকআত কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। কোন ব্যক্তি নফল সালাত শুরু করল এরপর ভেঙ্গে ফেলল, তখন উহা কাযা করতে হবে। আর যদি চার রাকআত নফল পড়া শুরু করে দুই রাকআতে (তাশাহ্হুদ পরিমাণ) বসে তারপর শেষ দুই রাকআত নষ্ট করে ফেলে, তাহলে দুই রাকআত কাযা করবে। দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও বসে নফল সালাত পড়তে পারে। যদি দাঁড়িয়ে নফল আরম্ভ করবার পর বসে যায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে, আর সাহেবাইন বলেন, ওজর ব্যতীত জায়েয হবে না। কোন ব্যক্তি শহরের বাইরে (মুসাফির) থাকলে সওয়ারির ওপর বসে নফল সালাত পড়তে পারবে। যে দিকেই তার বাহন ফিরে যায় সে দিকে ফিরেই ইশারা-ইঙ্গিতে সালাত পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সালাতে কিরাআত পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ الخ ঃ ফরয সালাতের দুই রাকআতে কিরাআত পড়া ফরয এবং উহা প্রথম দুই রাকআত হওয়া ওয়াজিব। কেননা সর্বপ্রথম প্রত্যেক সালাতই দুই রাকআত ফরয ছিল, পরে মুকীমের জন্য দুই রাকআত বৃদ্ধি করা হয়েছে। রাত্রিকালীন বিতিরের সালাতের সাদৃশ্যের কারণে মাগরিবের এক রাকআত বৃদ্ধি করা হয়েছে, আর ফজরে দীর্ঘ কিরাআতকে উত্তম করে দেয়া হয়েছে। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি প্রথম দুই রাকআত কিরাআত না পড়ে শেষের দুই রাকআতে পড়ে, তবে তার সাহু সিজদা দিলে সালাত বিশুদ্ধ হয়ে যাবে। আর ফরযের শেষ দুই রাকআতে কিরাআত পড়া আবশ্যক নয়, শুধু তিন তাসবীহ পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেই চলবে।

নফল সালাতে কিরাআতের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَالْقِرَاءَةُ وَاجِبَةٌ فِىْ جَمِيْعِ رَكْعَاتِ النَّفْلِ الخ ঃ নফল, সুন্নত এবং বিতিরে প্রত্যেক রাকআতে কিরাআত পাঠ করা ওয়াজিব। কেননা নফল সালাত দুই রাকআত পর্যন্ত পড়লে পূর্ণ হয়ে যায়, তৃতীয় রাকআতের জন্য দণ্ডায়মান না হওয়া পর্যন্ত উহা ওয়াজিব হবে না তথা প্রত্যেক দুই রাকআত পৃথক সালাত হিসেবে গণ্য।

নফল শুরু করে ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ دَخَلَ فِى صَلٰوةِ النَّفْلِ الخ ঃ নফল সালাত শুরু করে ফাসিদ করলে কাযা করা ওয়াজিব। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট নফল সালাত ভঙ্গ করলে তার কোন কাযা নেই।

قَوْلُهُ قَضٰى رَكْعَتَيْنِ ঃ চার রাকআত নফলের নিয়ত করে দুই রাকআত তাশাহ্হুদ পরিমাণ বসার পর ভঙ্গ করলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, শেষ দুই রাকআত কাযা করতে হবে, প্রথম দুই রাকআত কাযা করতে হবে না। কেননা নফল সালাত সাধারণত দুই রাকআত করেই পড়তে হয়, আর দুই রাকআত হলেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট চার রাকআতই কাযা করতে হবে।

নফল সালাত বসে পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيُصَلِّى النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ الخ ঃ দাঁড়াবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নফল সালাত বসে পড়া জায়েয, তবে এতে অর্ধেক ছওয়াব পাওয়া যাবে। আর দাঁড়িয়ে নফল শুরু করে বিনা ওজরে অবশিষ্ট সালাত বসে পড়লে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে, কিন্তু সাহেবাইনের নিকট বিনা ওজরে জায়েয হবে না।

সফর অবস্থায় নফলে কেবলার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيَتَنَفَّلُ عَلٰى دَابَّتِهِ الخ ঃ মুসাফির অবস্থায় যানবাহনের ওপর নফল সালাত পড়া জায়েয, আরোহণ অবস্থায় সওয়ারি যে দিকে মুখ করে সে দিকে ফিরে নফল পড়া জায়েয; এ অবস্থায় কেবলামুখী হবার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যে সুন্নাতে মুয়াক্কাদা কত রাকআত? বর্ণনা কর।
২। ফরয ও নফল সালাতের কিরাআত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ বর্ণনা কর।
৩। একই সালামে দিন ও রাতে কয় রাকআত সালাত পড়া জায়েয আছে?
৪। যদি কেউ নফল শুরু করে ভেঙ্গে ফেলে তবে তার হুকুম কি?
৫। দাঁড়িয়ে নফল শুরু করে বসে আদায় করলে তার হুকুম কি?

بَابُ سُجُوْدِ السَّهْوِ

سُجُوْدُ السَّهْوِ وَاجِبٌ فِي الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بَعْدَ السَّلَامِ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيُسَلِّمُ وَيَلْزَمُهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ اِذَا زَادَ فِيْ صَلٰوتِهٖ فِعْلًا مِنْ جِنْسِهَا لَيْسَ مِنْهَا اَوْتَرَكَ فِعْلًا مَسْنُوْنًا اَوْتَرَكَ قِرَاءَةَ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ اَوِ الْقُنُوْتِ اَوِ التَّشَهُّدِ اَوْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ اَوْ جَهَرَ الْاِمَامُ فِيْمَا يُخَافَتُ اَوْخَافَتَ فِيْمَا يُجْهَرُ وَسَهْوُ الْاِمَامِ يُوْجِبُ عَلَى الْمُؤْتَمِّ السُّجُوْدَ فَاِنْ لَمْ يَسْجُدِ الْاِمَامُ لَمْ يَسْجُدِ الْمُؤْتَمُّ فَاِنْ سَهَى الْمُؤْتَمُّ لَمْ يَلْزَمِ الْاِمَامَ وَلَا الْمُؤْتَمَّ السُّجُوْدُ وَمَنْ سَهٰى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى ثُمَّ تَذَكَّرَ وَهُوَ اِلٰى حَالِ الْقُعُوْدِ اَقْرَبُ عَادَ فَجَلَسَ وَتَشَهَّدَ وَاِنْ كَانَ اِلٰى حَالِ الْقِيَامِ اَقْرَبَ لَمْ يَعُدْ وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاَخِيْرَةِ فَقَامَ اِلَى الْخَامِسَةِ رَجَعَ اِلَى الْقَعْدَةِ مَالَمْ يَسْجُدْ وَاَلْغَى الْخَامِسَةَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ بَطَلَ فَرْضُهٗ وَتَحَوَّلَتْ صَلٰوتُهٗ نَفْلًا وَكَانَ عَلَيْهِ اَنْ يَضُمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً سَادِسَةً –

সাহু সিজদার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ (সালাতের মধ্যে) কমবেশি হলে সাহু (ভুলের) সিজদা ওয়াজিব হয়। (এক দিকে) সালাম ফেরাবার পর দুই সিজদা করবে, তারপর তাশাহ্হুদ পড়বে এবং সালাম ফেরাবে। মুসল্লির ওপর তখন ভুলের সিজদা ওয়াজিব হয়, যখন তার সালাতের মধ্যে সালাত জাতীয় এমন কাজ বৃদ্ধি করবে যা সালাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, অথবা কোন সুন্নাত (ওয়াজিব) পরিত্যাগ করলে, অথবা সূরা ফাতিহা ছেড়ে দিলে, অথবা দোয়ায়ে কুনূত বা তাশাহ্হুদ কিংবা দুই ঈদের সালাতের তাকবীরসমূহ ছেড়ে দিলে, অথবা যেসব সালাতে কিরাআত গোপনে পড়া হয় সেসব সালাতে উচ্চৈঃস্বরে পড়ল বা উচ্চৈঃস্বরের সালাতে চুপে কিরাআত পড়ল। ইমামের ভুল মুক্তাদীর ওপরও সিজদা ওয়াজিব করে দেয়। যদি ইমাম সিজদা না করে, তবে মুক্তাদীরাও সিজদা করবে না; আর যদি মুক্তাদী ভুল করে, তবে ইমাম মুক্তাদী কারো ওপর সাহু সিজদা আবশ্যক হবে না। যে ব্যক্তি প্রথম বৈঠক ভুলে গেল, তারপর এমন সময় স্মরণ হল যে, সে বসার অবস্থার দিকে অতি নিকটবর্তী, তাহলে সে ফিরে এসে বসবে এবং তাশাহহুদ পড়বে। আর যদি দাঁড়াবার অতি নিকটবর্তী হয়, তবে ফিরে আসবে না (পরে) ভুলের সিজদা দেবে। আর যদি শেষ বৈঠকে ভুল করে পঞ্চম রাকআতের দিকে দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে সিজদা না করা পর্যন্ত বসার দিকে ফিরে আসবে, পঞ্চম রাকআতকে রহিত করে দেবে এবং সিজদায়ে সাহু দেবে। আর যদি পঞ্চম রাকআতকে সিজদা দ্বারা বেঁধে ফেলে, তাহলে তার এ ফরয বাতিল হয়ে যাবে এবং এ সালাত নফলে পরিণত হয়ে যাবে এবং তার ওপর ওয়াজিব হবে উহার সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলিয়ে নেয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সিজদায়ে সাহুর বিধান ঃ

قَوْلُهُ سُجُوْدُ السَّهْوِ وَاجِبٌ فِى الزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ ঃ সালাতের মধ্যে ভুলবশত কোন কাজ কমবেশি হলে ক্ষতি পূরণের লক্ষ্যে যে সিজদা দিতে হয়, তাকে সাহু সিজদা বলে। সাহু অর্থ– ভুল। সালাতে কোন অঙ্গ কম করা যেমন ত্রুটি তেমনি বেশি করারও ভুল। কেননা কোন মানুষের আঙুল পাঁচ এর স্থলে চারটি হওয়া যেমন দোষজনক তেমনি ছয়টি হওয়াও দোষজনক। অধিকাংশ ওলামার মতে, এই সিজদা দেয়া ওয়াজিব।

সাহু সিজদা কখন দেবে ঃ

قَوْلُهُ بَعْدَ السَّلَامِ ঃ হানাফীদের মতে, সাহু সিজদা এক সালাম তথা ডান দিকে সালাম ফেরাবার পর দিতে হবে। সালাতে ভুলবশত কম হোক বা বেশি হোক একই হুকুম।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, সালাতে ভুলবশত কম হলে সালামের পূর্বে আর বেশি হলে সালামের পর সাহু সিজদা দিতে হবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, সর্বাবস্থায় সালামের পূর্বে দিতে হবে।

প্রথম বৈঠক ভুল হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ سَهٰى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاُوْلٰى الخ ঃ প্রথম বৈঠকে বসতে ভুলে গিয়ে যদি দাঁড়িয়ে যায়, অথবা দাঁড়াবার নিকটবর্তী হলে দাঁড়িয়ে যাবে বসার দিকে ফিরবে না। সালাত শেষে এই ভুলের জন্য সাহু সিজদা করবে। কেননা সে প্রথম বৈঠক ছেড়ে দিয়েছে, যা ওয়াজিব ছিল। আর যদি বসার নিকটবর্তী থাকে তবে বসে যাবে, এরপর সাহু সিজদা দিতে হবে না।

শেষ বৈঠকে ভুল করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ سَهٰى عَنِ الْقَعْدَةِ الْاَخِيْرَةِ الخ ঃ শেষ বৈঠকে বসতে ভুলে গিয়ে যদি পঞ্চম রাকআতে দাঁড়িয়ে যায়, তবে সিজদা দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত মনে এলে বৈঠকে চলে আসবে এবং পঞ্চম রাকআতকে বাতিল করে দেবে এবং সাহু সিজদা দেবে। আর যদি সিজদা দিয়ে ফেলে, তবে তার ফরয বাতিল হয়ে নফলে রূপান্তরিত হবে এবং এর সাথে ষষ্ঠ রাকআত মিলিয়ে নিতে হবে। কেননা এক রাকআত কোন সালাত হয় না। আর যদি শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় বসে প্রথম বৈঠক মনে করে দাঁড়িয়ে যায় এবং পঞ্চম রাকআতের সিজদা দিয়ে ফেলে, তবে এর সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে ছয় রাকআত পড়বে।

وَاِنْ قَعَدَ فِى الرَّابِعَةِ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يُسَلِّمْ بِظَنِّهَا الْقَعْدَةَ الْاُوْلٰى عَادَ اِلَى الْقُعُوْدِ مَا لَمْ يَسْجُدْ لِلْخَامِسَةِ وَسَلَّمَ وَسَجَدَ لِلسَّهْوِ وَاِنْ قَيَّدَ الْخَامِسَةَ بِسَجْدَةٍ ضَمَّ اِلَيْهَا رَكْعَةً اُخْرٰى وَقَدْ تَمَّتْ صَلٰوتُهٗ وَالرَّكْعَتَانِ نَافِلَةٌ وَمَنْ شَكَّ فِىْ صَلٰوتِهٖ فَلَمْ يَدْرِ اَثَلٰثًا صَلّٰى اَمْ اَرْبَعًا وَذٰلِكَ اَوَّلُ مَاعَرَضَ لَهٗ اِسْتَانَفَ الصَّلٰوةَ فَاِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهٗ كَثِيْرًا بَنٰى عَلٰى غَالِبِ ظَنِّهٖ اِنْ كَانَ لَهٗ ظَنٌّ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ ظَنٌّ بَنٰى عَلَى الْيَقِيْنِ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ আর যদি চতুর্থ রাকআতে বসে তারপর দাঁড়িয়ে যায়, এ ধারণায় সালাম ফিরায়নি যে, এটা প্রথম বৈঠক, তাহলে পঞ্চম রাকআতের সালাম ফেরাবার পূর্ব পর্যন্ত বসার দিকে ফিরে আসবে, সালাম ফেরাবে এবং ভুলের সিজদা দেবে। আর সিজদা দ্বারা যদি পঞ্চম রাকআতকে বেঁধে ফেলে, তবে তার সাথে আরো এক রাকআত মিলিয়ে নেবে, এতে তার সালাত পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আর (শেষ) দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে। কোন ব্যক্তি যদি তার সালাতে সন্দেহে পড়ে যে, সে জানতে পারে না তিন রাকআত পড়েছে নাকি চার রাকআত আর এটাই তার জীবনের প্রথম ঘটনা, তাহলে সে সালাত পুনঃ পড়বে। আর যদি এরূপ ঘটনা তার অনেক বার ঘটে থাকে, তাহলে সে প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে সালাত পড়বে, যদি তার ধারণা হয়ে থাকে। আর যদি কোন প্রকার ধারণা না থাকে, তাহলে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে (বাকি) সালাত আদায় করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

প্রথমবার সন্দেহ সৃষ্টি হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ اَوَّلُ مَا عَرَضَ الخ ঃ কোন ব্যক্তির প্রথম বারের মতো যদি এমন সন্দেহ হয় যে, সে তিন রাকআত পড়েছে নাকি চার রাকআত পড়েছে? কিছুই স্থির করতে পারে না, এই অবস্থায় তাকে প্রথম থেকে সালাত পড়তে হবে।

সন্দেহ বার বার হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ فَاِنْ كَانَ يَعْرِضُ لَهٗ كَثِيْرًا الخ ঃ কোন ব্যক্তির সালাতে যদি প্রায়ই সন্দেহ হয় যে, তিন রাকআত পড়েছে নাকি চার রাকআত? তখন সে তার প্রবল ধারণার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী রাকআতগুলো আদায় করবে। আর যদি ধারণার প্রবলতা না থাকে, তবে দৃঢ় বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে সালাত আদায় করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। سُجُوْدُ السَّهْوِ কি কি কারণে ওয়াজিব হয়? বর্ণনা কর।
২। সিজদায়ে সাহু আদায় করার নিয়ম ইমামদের মতান্তরসহ উল্লেখ কর।
৩। যদি কোন ব্যক্তি সন্দিহান হয়ে পড়ে যে, সে কি তিন রাকআত পড়েছে নাকি চার রাকআত তাহলে তার হুকুম কি?
৪। কোন ব্যক্তি যদি শেষ বৈঠককে ভুল করে প্রথম বৈঠক মনে করে দাঁড়িয়ে যায় তবে তার হুকুম কি?
৫। سُجُوْدُ السَّهْوِ কাকে বলে? তার হুকুম বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْمَرِيْضِ

اِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ الْقِيَامُ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ اَوْمٰى اِيْمَاءً وَجَعَلَ السُّجُوْدَ اَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوْعِ وَلَا يَرْفَعُ اِلٰى وَجْهِهٖ شَيْئًا يَسْجُدُ عَلَيْهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ اِسْتَلْقٰى عَلٰى قَفَاهُ وَجَعَلَ رِجْلَيْهِ اِلَى الْقِبْلَةِ وَاَوْمٰى بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ وَاِنِ اضْطَجَعَ عَلٰى جَنْبِهٖ وَ وَجْهُهٗ اِلَى الْقِبْلَةِ وَ اَوْمٰى جَازَ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْاِيْمَاءَ بِرَأْسِهٖ اَخَّرَ الصَّلٰوةَ وَلَا يُوْمِيْ بِعَيْنَيْهِ وَلَا بِحَاجِبَيْهِ وَلَا بِقَلْبِهٖ فَاِنْ قَدَرَ عَلَى الْقِيَامِ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ وَجَازَ اَنْ يُصَلِّيَ قَاعِدًا يُوْمِيْ اِيْمَاءً فَاِنْ صَلَّى الصَّحِيْحُ بَعْضَ صَلٰوتِهٖ قَائِمًا ثُمَّ حَدَثَ بِهٖ مَرَضٌ تَمَّهَا قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ وَيُوْمِيْ اِيْمَاءً اِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الرُّكُوْعَ وَالسُّجُوْدَ اَوْ مُسْتَلْقِيًا اِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ وَمَنْ صَلّٰى قَاعِدًا يَرْكَعُ وَيَسْجُدُ لِمَرَضٍ ثُمَّ صَحَّ بَنٰى عَلٰى صَلٰوتِهٖ قَائِمًا فَاِنْ صَلّٰى بَعْضَ صَلٰوتِهٖ بِاِيْمَاءٍ ثُمَّ قَدَرَ عَلَى الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ اِسْتَانَفَ الصَّلٰوةَ وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فَمَادُوْنَهَا قَضَاهَا اِذَا صَحَّ وَاِنْ فَاتَتْهُ بِالْاِغْمَاءِ اَكْثَرُ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يَقْضِ -

রুগ্‌ণ ব্যক্তির সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ রুগ্‌ণ ব্যক্তির ওপর দন্ডায়মান কষ্টকর হলে বসে রুকু-সিজদার মাধ্যমে সালাত আদায় করবে। যদি রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তবে ইশারা করে সালাত পড়বে; এ অবস্থায় রুকুর তুলনায় সিজদাকে অধিক নত করবে। কোন জিনিসকে মুখমন্ডলের দিকে উত্তোলন করবে না এ উদ্দেশ্য যে, তার ওপর সিজদা করবে। যদি বসবারও ক্ষমতা না রাখে, তাহলে পিঠের ওপর ভর করে শুয়ে যাবে এবং উভয় পা কেবলার দিকে ফিরিয়ে দিয়ে (মাথার) ইশারায় রুকু-সিজদা করবে। আর যদি পার্শ্বদেশের ওপর শুয়ে কেবলার দিকে মুখ করে ইশারা ইঙ্গিতে সালাত পড়ে, তবুও সালাত জায়েয হবে। যদি মাথা দ্বারা ইশারা করতে সক্ষম না হয়, তবে সালাত পিছিয়ে দেবে, (তথা তখন পড়বে না) চক্ষুদ্বয়, ভ্রুদ্বয় এবং অন্তরের ইশারায় সালাত পড়বে না। আর যদি কোন ব্যক্তি দাঁড়াতে সক্ষম হয়, কিন্তু রুকু-সিজদা করতে সক্ষম না হয়, তাহলে তার ওপর দাঁড়ানো আবশ্যক নয়, বসে বসে ইশারা ইঙ্গিতে সালাত পড়লেই জায়েয হবে। আর যদি কোন সুস্থ ব্যক্তি সালাতের কিছু অংশ দাঁড়িয়ে পড়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়ে, তাহলে সে বসে রুকু-সিজদা করে সালাত পরিপূর্ণ করবে। রুকু-সিজদা করতে যদি সক্ষম না হয়, তবে ইশারায় সালাত পড়বে। আর যদি বসার শক্তিও না রাখে, তাহলে চিৎ হয়ে শুয়ে সালাত পড়বে। কোন ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে বসে বসে রুকু-সিজদা করতেছিল, এ অবস্থায় সে সুস্থ হয়ে গেল তখন সে বাকি সালাত দাঁড়িয়ে আদায় করবে। আর যদি কোন ব্যক্তি সালাতের কিছু অংশ ইশারায় পড়ার পর রুকু-সিজদা করার ক্ষমতাবান হয়, তখন সে সালাত প্রথম হতে পুনঃ পড়বে। কোন ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত বা তার কম ওয়াক্ত সালাত বেহুঁশ থাকলে সুস্থ হবার পর সে সালাতগুলো কাযা পড়ে নেবে। আর বেহুঁশ অবস্থায় এর চেয়ে বেশি সালাত ছুটে গেলে তার কাযা দেবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাঁড়াতে অক্ষম হলে সালাত পড়ার পদ্ধতি ঃ

قَوْلُهُ إِذَا تَعَذَّرَ عَلَى الْمَرِيْضِ الخ ঃ যদি কোন ব্যক্তি অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হয়, অথবা দাঁড়াতে সক্ষম হলেও মাথা ঘুরে পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা রয়েছে, এ সব অবস্থায় বসে বসে সালাত আদায় করবে। যদি রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হয়, তবে মাথার সাহায্যে ইশারা করে সালাত পড়বে। রুকু'র তুলনায় সিজদার সময় মাথাকে একটু বেশি ঝুঁকাবে, তবে মাথার দিকে কিছু উঠিয়ে আনতে পারবে না, কিন্তু মাটিতে লাগানো কোন উঁচু জায়গায় সিজদা দেয়া যাবে। উল্লেখ্য যে, অতিস্বল্প পরিমাণ সময় দাঁড়াতে সক্ষম হলেও দাঁড়াবে, পরে বসে যাবে।

বসতে অক্ষম হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْقُعُوْدَ الخ ঃ যদি বসবার ক্ষমতা না রাখে, তবে কেবলার দিকে পা দিয়ে মাথার নিচে একটি বালিশ দিয়ে কিছুটা উঁচু করে মাথার ইশারায় সালাত পড়বে। আর যদি পার্শ্বদেশের ওপর শুয়ে মুখমন্ডলকে কেবলামুখী করে ইশারায় সালাত পড়ে, তাহলেও জায়েয হবে।

সালাত ছেড়ে দেয়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ أَخَّرَ الصَّلٰوةَ ঃ শয়ন করে ইশারা ইঙ্গিতেও যদি সালাত পড়তে সক্ষম হয়, তাহলে সালাত ছেড়ে দেবে অর্থাৎ তখন পড়বে না; বরং সুস্থ হলে কাযা করে নেবে।

সালাতে অসুস্থ হয়ে পড়লে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ صَلَّى الصَّحِيْحُ الخ ঃ কোন সুস্থ ব্যক্তি সালাত শুরু করে কিছু অংশ পড়ার পর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাকি সালাত বসে বসে পড়বে। রুকু-সিজদা করতে অক্ষম হলে মাথার ইশারায় পড়বে। আর বসে পড়তে অক্ষম হলে শুইয়ে সালাত আদায় করবে।

সালাতে সুস্থ হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا الخ ঃ কোন ব্যক্তি রোগের কারণে বসে সালাত শুরু করে কিছু অংশ পড়ার পর সুস্থতা অনুভব করলে দাঁড়িয়ে বাকি সালাত আদায় করবে। আর যদি ইশারায় সালাত শুরু করে কিছু অংশ পড়ার পর সুস্থ হলে সালাত পুনঃ পড়তে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। রুগ্ণ ব্যক্তির সালাত কিভাবে আদায় করতে হয়।
২। অসুস্থতার কারণে বসে রুকু-সিজদা করে সালাত আদায় করা অবস্থায় যদি সুস্থ হয়ে যায় তবে তার হুকুম কি?
৩। কি পরিমাণ অসুস্থ হলে সালাত ছেড়ে দেবে।

بَابُ سُجُوْدِ التِّلَاوَةِ

فِى الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ سِجْدَةً فِىْ اٰخِرِ الْاَعْرَافِ وَفِى الرَّعْدِ وَفِى النَّحْلِ وَفِى بَنِى اِسْرَائِيْلَ وَمَرْيَمَ وَالْاُوْلٰى فِى الْحَجِّ وَالْفُرْقَانِ وَالنَّمْلِ وَالٓمٓ تَنْزِيْلِ وَصٓ وَحٰمٓ السَّجْدَةِ وَالنَّجْمِ وَالْاِنْشِقَاقِ وَالْعَلَقِ ، وَالسُّجُوْدُ وَاجِبٌ فِىْ هٰذِهِ الْمَوَاضِعِ عَلَى التَّالِىْ وَالسَّامِعِ سَوَاءٌ قَصَدَ سِمَاعَ الْقُرْاٰنِ اَوْلَمْ يَقْصُدْ فَاِذَا تَلَا الْاِمَامُ اٰيَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا وَسَجَدَ الْمَامُوْمُ مَعَهٗ فَاِنْ تَلَا الْمَامُوْمُ لَمْ يَلْزَمِ الْاِمَامَ وَلَا الْمَامُوْمَ السُّجُوْدُ وَاِنْ سَمِعُوْا وَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ اٰيَةَ سِجْدَةٍ مِنْ رَجُلٍ لَيْسَ مَعَهُمْ فِى الصَّلٰوةِ لَمْ يَسْجُدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ وَسَجَدُوْهَا بَعْدَ الصَّلٰوةِ فَاِنْ سَجَدُوْهَا فِى الصَّلٰوةِ لَمْ تُجْزِئْهُمْ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُمْ وَمَنْ تَلَا اٰيَةَ سِجْدَةٍ خَارِجَ الصَّلٰوةِ وَلَمْ يَسْجُدْهَا حَتّٰى دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا وَسَجَدَ لَهُمَا اَجْزَأَتْهُ السَّجْدَةُ عَنِ التِّلَاوَتَيْنِ وَاِنْ تَلَاهَا فِىْ غَيْرِ الصَّلٰوةِ فَسَجَدَهَا ثُمَّ دَخَلَ فِى الصَّلٰوةِ فَتَلَاهَا سَجَدَهَا ثَانِيًا وَلَمْ تُجْزِئْهُ السَّجْدَةُ الْاُوْلٰى وَمَنْ كَرَّرَ تِلَاوَةَ سِجْدَةٍ وَاحِدَةٍ فِىْ مَجْلِسٍ وَاحِدٍ اَجْزَأَتْهُ سِجْدَةٌ وَاحِدَةٌ وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ وَسَجَدَ ثُمَّ كَبَّرَ وَ رَفَعَ رَأْسَهٗ وَلَا تَشَهُّدَ عَلَيْهِ وَلَا سَلَامَ -

তিলাওয়াতে সিজদার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ কুরআনে ১৪টি সিজদা রয়েছে– (১) সূরা আ'রাফের শেষ ভাগে, (২) সূরা রা'দে। (৩) সূরা নাহলে, (৪) সূরা বনী ইসরাঈলে, (৫) সূরা মারইয়ামে, (৬) সূরা হজ্জের প্রথম অংশে, (৭) সূরা ফুরকানে, (৮) সূরা নামলে, (৯) সূরা আলিফ-লাম-মীম তানযীলে, (১০) সূরা সা-দে, (১০) সূরা হা-মীম সিজদাতে, (১২) সূরা নাজমে, (১৩) সূরা ইনশিকাকে, (১৪) সূরা 'আলাকে।

উল্লিখিত স্থানসমূহে পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের ওপর সিজদা করা ওয়াজিব। শ্রোতা ইচ্ছা করে শুনুক কিংবা ইচ্ছাবিহীন শুনে থাকুক উভয়ই সমান। যখন ইমাম সিজদার আয়াত তিলাওয়াত করে সিজদা করবেন, তখন মুক্তাদীও তাঁর সাথে সিজদা করবে। আর যদি মুক্তাদী সিজদার আয়াত পাঠ করে, তাহলে ইমাম ও মুক্তাদী কারো ওপর সিজদা আবশ্যক হবে না। সালাতে রত অবস্থায় কিছু সংখ্যক লোক যদি এমন ব্যক্তির নিকট হতে সিজদার আয়াত শুনে যে তাদের সাথে সালাতে অংশীদার নয়, তাহলে তারা সালাত অবস্থায় সিজদা করবে না; বরং সালাত শেষে সিজদা করবে। আর যদি তারা সালাতের ভিতর সিজদা করে নেয়, তাহলে এটা যথেষ্ট হবে না, এতে তাদের সালাতও বিনষ্ট হবে না। কোন ব্যক্তি সালাতের বাহিরে সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা না করে সালাতে প্রবেশ করে পুনঃ সে আয়াত পাঠ করে উভয়টির জন্য সিজদা করলে তার একটি সিজদাই উভয় তিলাওয়াতের জন্য যথেষ্ট হবে। আর যদি কোন ব্যক্তি সালাতের বাহিরে সিজদার আয়াত পাঠ করে সিজদা করল,

তারপর সালাত প্রবেশ করে পুনঃ সে আয়াত পাঠ করল, তখন সে দ্বিতীয়বার সিজদা করবে; তার প্রথম সিজদাটি যথেষ্ট হবে না। আর কোন ব্যক্তি একই মজলিসে কোন সিজদার আয়াত বারবার পাঠ করলে তার জন্য একটি সিজদাই যথেষ্ট হবে। যে কোন ব্যক্তি সিজদা দিতে ইচ্ছা করে সে তাকবীর বলবে কিন্তু হাতদ্বয় না উঠিয়ে সিজদায় যাবে, তারপর তাকবীর বলে মাথা উত্তোলন করবে। তার ওপর তাশাহহুদ পড়া এবং সালাম দেয়া কোন কিছুই করতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তিলাওয়াতে সিজদা সম্পর্কে ওলামাদের মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ فِي الْقُرْاٰنِ اَرْبَعَةَ عَشَرَ سِجْدَةً الخ ঃ

১. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ)-এর মতে, পবিত্র কুরআনে মোট ১৫টি সিজদা রয়েছে।

২. ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, মোট ১১টি সিজদা।

৩. ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, ১৪টি সিজদা, তবে সূরা 'হজ্জে' দুই সিজদা আর সূরায়ে 'সা-দ' এ কোন সিজদা নেই।

৪. হানাফীদের নিকট মোট সিজদা ১৪টি। সূরা 'হজ্জে' এক সিজদা এবং 'সা-দে' ও এক সিজদা।

সিজদার জন্য পড়া ও শুনা শর্ত ঃ

قَوْلُهُ وَالسُّجُوْدُ وَاجِبٌ الخ ঃ সিজদা দেয়ার জন্য সিজদার আয়াত পড়া ও শুনা আবশ্যক। ইচ্ছা করে শুনুক বা অনিচ্ছা সত্ত্বেও শুনুক উভয় অবস্থায় সিজদা দেয়া ওয়াজিব। তবে সিজদার আয়াত লিখলে কিংবা বানান করলে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

قَوْلُهُ وَالْاُوْلٰى فِى الْحَجِّ ঃ সূরা হজ্জের দ্বিতীয় সিজদাকে হানাফীগণ তিলাওয়াতে সিজদা বলেন না, কিন্তু ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ) দ্বিতীয় সিজদাকে তিলাওয়াতের সিজদা বলেন।

তিলাওয়াতকারীর বিধান ঃ

قَوْلُهُ عَلَى التَّالِىْ وَالسَّامِعِ ঃ তিলাওয়াতকারী পবিত্র হোক বা অপবিত্র হোক, ওযূযুক্ত হোক বা ওযূবিহীন হোক, সর্বাবস্থায় সিজদা ওয়াজিব হবে। কিন্তু শ্রবণকারী ঋতুস্রাবী, নিফাসওয়ালী, নাবালেগ, হুঁশহারা বা পাগল হলে সিজদা ওয়াজিব হবে না।

মুক্তাদী পড়লে ইমামের ওপর আবশ্যক নয় ঃ

قَوْلُهُ لَمْ يَلْزَمِ الْاِمَامَ الخ ঃ ইমাম সিজদার আয়াত পড়লে ইমাম মুক্তাদী উভয়ের ওপর সিজদা ওয়াজিব হয়, কিন্তু মুক্তাদী সিজদার আয়াত পড়লে ইমামের ওপর সিজদা ওয়াজিব হবে না।

তিলাওয়াতে সিজদায় সালাত নষ্ট হয় না ঃ

قَوْلُهُ وَلَمْ تَفْسُدْ صَلٰوتُهُمْ الخ ঃ সালাতে রত অবস্থায় বাইরের কারো পড়া সিজদার আয়াত শুনতে পেলে, সে সিজদা সালাতে দেবে না; আর যদি সালাত দিয়ে দেয়, তবে সিজদা আদায় হবে না এবং সালাতও ভঙ্গ হবে না। কেননা সালাতের মধ্যে অতিরিক্ত সিজদায় সালাত ভঙ্গ হয় না। যেমন– মাসবূক ব্যক্তি রুকুর পর ইমামের সাথে শরিক হলে যেসব সিজদা করে তা সালাতে গণনা করা হয় না এবং এতে সালাতেরও ক্ষতি হয় না।

সিজদা করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَرَادَ السُّجُوْدَ كَبَّرَ الخ ঃ তিলাওয়াতে সিজদা করার নিয়ম হল দাঁড়ানো অবস্থা থেকে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে হাত না উঠিয়ে সোজা সিজদায় চলে গিয়ে اَللّٰهُ اَكْبَرُ বলে উঠে যাওয়া। এতে কোন তাশাহহুদ পড়তে হয় না এবং সালাম ও ফেরাতে হয় না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। তিলাওয়াতে সিজদা কয়টি? সূরাসমূহের নামসহ উল্লেখ কর।

২। سُجُوْدُ التِّلَاوَةِ -এর হুকুম বর্ণনা কর।

৩। তিলাওয়াতে সিজদা আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْمُسَافِرِ

اَلسَّفَرُ الَّذِىْ يَتَغَيَّرُ بِهِ الْاَحْكَامُ هُوَ اَنْ يَقْصِدَ الْاِنْسَانُ مَوْضِعًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَقْصَدِ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ بِسَيْرِ الْاِبِلِ وَمَشْيِ الْاَقْدَامِ وَلَا مُعْتَبَرَ فِىْ ذٰلِكَ بِالسَّيْرِ فِى الْمَاءِ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَنَا فِىْ كُلِّ صَلٰوةٍ رُبَاعِيَّةٍ رَكْعَتَانِ وَلَاتَجُوْزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا فَاِنْ صَلّٰى اَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ فِى الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ اَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ وَكَانَتِ الْاُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً وَاِنْ لَمْ يَقْعُدْ فِى الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُ ، وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اِذَا فَارَقَ بُيُوْتَ الْمِصْرِ وَلَايَزَالُ عَلٰى حُكْمِ الْمُسَافِرِ حَتّٰى يَنْوِىَ الْاِقَامَةَ فِىْ بَلْدَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَصَاعِدًا فَيَلْزَمُهُ الْاِتْمَامُ فَاِنْ نَوَى الْاِقَامَةَ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُتِمَّ وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ اَنْ يُقِيْمَ فِيْهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا وَاِنَّمَا يَقُوْلُ غَدًا اَخْرُجُ اَوْ بَعْدَ غَدٍ اَخْرُجُ حَتّٰى بَقِىَ عَلٰى ذٰلِكَ سِنِيْنَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ -

মুসাফিরের সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যে সফরের দ্বারা শরীয়তের হুকুম পরিবর্তন হয়ে যায়, তাহল মানুষ এমন স্থানে ভ্রমণের ইচ্ছা করা, যে স্থান ও তার মধ্যে উটের চলা ও পায়ে হাটার পথে তিন দিনের দূরত্ব হয়। আর এ দূরত্বের পরিমাণ জলভাগের ভ্রমণে গ্রহণযোগ্য হবে না। আমাদের (হানাফীদের) নিকট মুসাফিরের জন্য প্রত্যেক চার রাকআত বিশিষ্ট সালাত দুই রাকআত ফরয। মুসাফিরের জন্য দুই রাকআতের অধিক পড়া জায়েয নেই। যদি চার রাকআত পড়ে, কিন্তু দুই রাকআতের পর তাশাহহুদ পরিমাণ বসে, তাহলে তার প্রথম দুই রাকআত ফরযের জন্য যথেষ্ট হবে এবং শেষ দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে। আর যদি প্রথম দুই রাকআতের পরে তাশাহহুদ পরিমাণ সময় না বসে, তাহলে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে বের হবে সে যখন শহরের বাড়ি-ঘর হতে পৃথক হয়ে যাবে, তখনই দুই রাকআত পড়বে এবং যে পর্যন্ত কোন শহরে পনের বা ততোধিক দিন অবস্থান করবার নিয়ত না করবে, সে পর্যন্ত মুসাফিরের হুকুম থাকবে। যখন পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তখন পুরোপুরি চার রাকআত পড়া আবশ্যক হবে। আর যদি পনের দিনের কম অবস্থানের নিয়ত করে, তখন পুর্ণ সালাত পড়বে না। কোন ব্যক্তি কোন শহরে প্রবেশ করে তাতে পনের দিনের নিয়ত করেনি; বরং শুধু একথাই বলে যে আমি আগামী কাল যাব. অথবা আগামী দিনের পর পরশু চলে যাব এ অবস্থায় কয়েক বৎসর সে শহরে অবস্থান করলেও দুই রাকআত পড়বে (তথা কসর করবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সফরের জন্য নিয়ত করা ঃ

قَوْلُهُ اَنْ يَقْصِدَ الْاِنْسَانُ الخ ঃ যে সফরের দ্বারা শরীয়তের হুকুমের পরিবর্তন হয় তা সাব্যস্ত হবার জন্য ব্যক্তিকে সফরের কসদ বা নিয়ত করতে হবে। কেননা কোন নির্দিষ্ট স্থানের নিয়ত করা ব্যতীত সারা জগত ভ্রমণ করলেও মুসাফির হবে না। দ্বিতীয়ত শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত দূরত্বের নিয়ত করতে হবে, এর কম হলে মুসাফির হবে না।

দূরত্বের ব্যাপারে মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ مَسِيْرَةَ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ الخ ঃ হানাফীদের মতে, উটের বা পায়ে চলার সাধারণ গতিতে তিন দিনের দূরত্বকে সফরের দূরত্ব ধরা হবে। এখানে রাতের চলা অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা, মানুষ সাধারণত রাতের বেলায় বিশ্রাম করে থাকে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) সফরের দূরত্বকে ষোল ফারসাখ বলেছেন।

ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) ও ১৬ ফারসাখকে সফরের দূরত্ব বলেছেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর এক বর্ণনানুযায়ী ১৮ ফারসাখ হল সফরের দূরত্ব। উল্লেখ্য যে, তিন মাইলে এক ফারসাখ।

স্থল পথের হিসাব জলপথে গ্রহণযোগ্য নয় ঃ

قَوْلُهُ بِالسَّيْرِ فِى الْمَاءِ ঃ স্থল পথের দূরত্ব জল পথের বেলায় গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে জল পথের দূরত্ব ধরতে হলে এমন তিন দিনের ভ্রমণের হিসাব করতে হবে, যাতে না বাতাস বন্ধ ছিল– না প্রচন্ড ঝড় ছিল।

উল্লেখ্য যে, কোন ব্যক্তি এমন একটি স্থানে যাবার ইচ্ছা করেছে সেখানে যাবার দু'টি পথ আছে জলপথ ও স্থলপথ। স্থলপথে গেলে সে মুসাফির হয়, কিন্তু জলপথে গেলে সে মুসাফির হয় না, তাহলে যে পথে যাবে সে পথেরই হুকুম কার্যকরী হবে।

মুসাফিরের জন্য সালাতের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَاتَجُوْزُ لَهُ الزِّيَادَةُ الخ ঃ হানাফীদের নিকট মুসাফির ব্যক্তির জন্য চার রাকআত বিশিষ্ট ফরয সালাত দুই রাকআত পড়া ফরয, এর বেশি পড়লে গুনাহগার হবে। কোন ব্যক্তি দুই রাকআতের পর তাশাহ্হুদ পরিমাণ সময় না বসে দাঁড়িয়ে গেলে সর্ব সম্মতিক্রমে তার সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর দুই রাকআতে বসলে শায়খাইনের মতে, সালাত হয়ে যাবে এবং শেষ দুই রাকআত নফল হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট সালাত বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট কসর পড়া ইচ্ছাধীন– ফরয নয়। কাজেই চার রাকআত পড়লেও জায়েয হবে।

কখন মুকীম হবে ঃ

حَتّٰى يَنْوِىَ الْاِقَامَةَ الخ ঃ কোন ব্যক্তি মুসাফির হয়ে কোন শহরে গমন করে ১৫ দিন বা ততোধিক দিন থাকার নিয়ত করলে মুকীম হয়ে যাবে। তখন আর মুসাফিরের হুকুম বর্তাবেনা। আর যদি নিয়ত না করে অনিশ্চিতভাবে আজ যাব কাল যাব করে কয়েক বছরও থাকে, তাহলেও মুকীম হবে না। আর মুসাফির ব্যক্তি সফরের নিয়ত করে নিজ শহর হতে বের হলেই মুসাফির হয়ে যাবে।

وَإِذَا دَخَلَ الْعَسَاكِرُ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ فَنَوُوا الْإِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمُّوا الصَّلٰوةَ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِى صَلٰوةِ الْمُقِيْمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ دَخَلَ مَعَهُ فِى فَائِتَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلٰوتُهُ خَلْفَهُ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيْمِيْنَ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ وَسَلَّمَ ثُمَّ أَتَمَّ الْمُقِيْمُوْنَ صَلٰوتَهُمْ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا سَلَّمَ أَنْ يَّقُوْلَ لَهُمْ أَتِمُّوا صَلٰوتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ مِصْرَهُ أَتَمَّ الصَّلٰوةَ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ الْإِقَامَةَ فِيْهِ وَمَنْ كَانَ لَهُ وَطَنٌ فَانْتَقَلَ عَنْهُ وَاسْتَوْطَنَ غَيْرَهُ ثُمَّ سَافَرَ فَدَخَلَ وَطَنَهُ الْأَوَّلَ لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَإِذَا نَوَى الْمُسَافِرُ أَنْ يُّقِيْمَ بِمَكَّةَ وَمِنًى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ لِلْمُسَافِرِ يَجُوْزُ فِعْلًا وَلَا يَجُوْزُ وَقْتًا وَتَجُوْزُ الصَّلٰوةُ فِى سَفِيْنَةٍ قَاعِدًا عَلٰى كُلِّ حَالٍ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعِنْدَهُمَا لَاتَجُوْزُ إِلَّا بِعُذْرٍ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى السَّفَرِ قَضَاهَا فِى الْحَضَرِ رَكْعَتَيْنِ وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةٌ فِى الْحَضَرِ قَضَاهَا فِى السَّفَرِ أَرْبَعًا وَالْعَاصِىْ وَالْمُطِيْعُ فِى السَّفَرِ فِى الرُّخْصَةِ سَوَاءٌ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ মুসলিম সৈন্যদল যখন দারুল হরবে (অমুসলিম রাজ্যে) প্রবেশ করে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করে, তখন (তাদের এই নিয়ত শুদ্ধ হবে না।) তারা পূর্ণ সালাত পড়বে না। (বরং কসর পড়বে।) মুসাফির ওয়াক্ত বাকি থাকতে মুকীমের পিছনে এক্তেদা করলে পূর্ণ সালাত পড়বে। আর যদি মুসাফির কাযা সালাতে মুকীমের এক্তেদা করে, তাহলে তার সালাত জায়েয হবে না। মুসাফির মুকীম লোকদের ইমাম হলে দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে। এরপর মুকীম মুক্তাদীগণ বাকি দুই রাকআত পরিপূর্ণ করবে। তবে মুসাফির ইমামের জন্য (মুস্তাহাব) উত্তম হল, সালাম ফেরাবার পর একথা বলা যে, তোমরা তোমাদের সালাত পরিপূর্ণ কর, কেননা আমি মুসাফির।

মুসাফির ব্যক্তি নিজ শহরে প্রবেশ করলে ইকামতের নিয়ত না করলেও পূর্ণ সালাত পড়বে। কারো নিজস্ব একটি বাসস্থান রয়েছে, অতঃপর সে বাসস্থান ত্যাগ করে অন্যত্র বাসস্থান বানিয়েছে, এরপর সফর করে প্রথম বাসস্থানে প্রবেশ করলে পরিপূর্ণ সালাত পড়বে না। (বরং কসর পড়বে।) কোন মুসাফির মক্কা ও মিনায় ১৫ দিন অবস্থান করার নিয়ত করলে পূর্ণ সালাত পড়বে না। মুসাফিরের জন্য কার্যত দুই সালাত এক সাথে আদায় করা জায়েয, কিন্তু একই ওয়াক্তে জায়েয নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, নৌকাতে সর্বাবস্থায় বসে সালাত পড়া জায়েয। ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট বিনা ওজরে (বসে পড়া) জায়েয নেই। কোন ব্যক্তির ভ্রমণ অবস্থায় সালাত কাযা হয়ে গেলে ইকামত অবস্থায় উহার কাযা দুই রাকআত পড়বে। আর মুকীম অবস্থায় কোন সালাত কাযা হয়ে গেলে সফর অবস্থায় উহার কাযা চার রাকআত পড়বে। অন্যায়কারী ও ন্যায়কারী সফরের অবস্থায় রুখসতের (কসরের) হুকুম এক বরাবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দারুল হরবে প্রবেশ করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا دَخَلَ الْعَسَاكِرُ الخ ঃ মুসলিম সৈন্যরা কাফিরদের দেশে প্রবেশ করে ইকামতের নিয়ত করলেও মুকীম হবে না। কেননা সেটা তাদের ইকামতের স্থল নয়, তাই সালাত পূর্ণ পড়তে হবে না- কসর করতে হবে।

মুসাফির মুকীমের পিছনে পূর্ণ সালাত পড়ার শর্ত ঃ

قَوْلُهُ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ الخ ঃ মুসাফির মুকীমের পিছনে পূর্ণ সালাত পড়তে হলে ওয়াক্তের ভিতর পড়তে হবে। যেহেতু ওয়াক্ত শেষ হয়ে যাবার পর মুসাফিরের ওপর কাযা ফরয হবে দুই রাকআত, আর মুকীমের ওপর হবে চার রাকআত, ফলে এক্তেদার নিয়তের দ্বারা তার ফরয দুই রাকআত হতে চার রাকআতে পরিবর্তিত হবে না।

মুসাফিরের পিছনে এক্তেদা করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا صَلَّى الْمُسَافِرُ بِالْمُقِيمِيْنَ الخ ঃ মুসাফিরের পিছনে মুকীমগণ এক্তেদা করলে মুসাফির ইমাম যখন দুই রাকআত পড়ে সালাম ফিরাবে, তখন মুকীম মুক্তাদীগণ দাঁড়িয়ে অবশিষ্ট সালাত কিরাআত ছাড়া পড়বে। কারণ তারা লাহিকের হুকুমের মধ্যে শামিল। আর ইমামের জন্য এ কথা বলা উত্তম যে, তোমরা তোমাদের সালাত পূর্ণ কর, কেননা আমি মুসাফির।

দুই স্থায়ী বাসস্থানের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ لَمْ يُتِمَّ الصَّلٰوةَ ঃ কোন ব্যক্তি প্রথম স্থায়ী বাসস্থান পরিত্যাগ করে অন্যত্র স্থায়ী আবাস গড়ে তুললে প্রথম বাসস্থানে এসে পনের দিনের কম থাকার ইচ্ছা করলে মুসাফির হয়ে যাবে, যদি সফরের দূরত্ব হয়। যদি কোন ব্যক্তি নতুন স্থায়ী বাসস্থান বানায় যেখানে তার পরিবার-পরিজন আসা-যাওয়া করে, তবে উভয়টি তার জন্য স্থায়ী বাসস্থান হবে। আর যদি পরিবার-পরিজন নিয়ে স্থায়ীভাবে বাসস্থান বানায়, তবে তার পূর্বের স্থায়ী বাসস্থান পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং তাকে পূর্বের বাসস্থানে গেলে কসর পড়তে হবে। কেননা মহানবী (সাঃ) হিজরতের পর মক্কায় গেলে কসর আদায় করতেন, যেহেতু তিনি মদীনায় স্থায়ী আবাস গৃহ বানিয়ে নিয়েছিলেন।

মক্কা ও মিনায় অবস্থানের নিয়ত করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ بِمَكَّةَ وَمِنٰى الخ ঃ কোন ব্যক্তি মক্কা ও মিনা তথা উভয় স্থানে মিলিয়ে পনের দিন অবস্থানের নিয়ত করলে মুকীম হবে না, তাই সালাত কসরই পড়বে। কেননা, দুটি স্থান পৃথক পৃথক হবার কারণে তার নিয়ত বিশুদ্ধ হবে না।

দুই সালাত একত্র করণের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَالْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلٰوتَيْنِ الخ ঃ মুসাফির ব্যক্তি দুই ওয়াক্ত সালাত আদায় হিসেবে নয় অর্থাৎ যোহরকে শেষ ওয়াক্তে পড়ে সাথে সাথে প্রথম ওয়াক্তেই আসর পড়তে পারবে না। তবে হজ্জের সময় আরাফা ও মুযদালিফায় দুই ওয়াক্ত সালাত একসাথে পড়া জায়েয, এটা হানাফীদের অভিমত।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, মুসাফিরের জন্য একই ওয়াক্তে দুই সালাত পড়া জায়েয।

সফরের হুকুম সবার জন্য প্রযোজ্য ঃ

قَوْلُهُ وَالْعَاصِىْ وَالْمُطِيْعُ الخ ঃ যে ব্যক্তি পাপের নিয়তে সফর করে আর যে ভালো নিয়তে সফর করে উভয়ের ক্ষেত্রে হুকুম এক তথা উভয়ে কসর সালাত পড়বে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। مُسَافِر কাকে বলে? مُسَافِر -এর মুদ্দাত ও সফরের দূরত্ব উল্লেখ কর।
২। مُسَافِر এর হুকুম লিখ।
৩। قَصْر সালাতের বিবরণ দাও।
৪। মুসাফির মুকীমের পিছনে এক্তেদা করলে তার হুকুম কি?
৫। মুসাফিরের জন্য দুই ওয়াক্ত সালাত একত্র করা জায়েয আছে কিনা?

بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ

لَاتَصِحُّ الْجُمُعَةُ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ اَوْ فِىْ مُصَلَّى الْمِصْرِ وَلَا تَجُوْزُ فِى الْقُرٰى وَلَا تَجُوْزُ اِقَامَتُهَا اِلَّا لِلسُّلْطَانِ اَوْ لِمَنْ اَمَرَهُ السُّلْطَانُ وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْوَقْتُ فَتَصِحُّ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ وَلَاتَصِحُّ بَعْدَهٗ وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْخُطْبَةُ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يَخْطُبُ الْاِمَامُ خُطْبَتَيْنِ يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا بِقَعْدَةٍ وَيَخْطُبُ قَائِمًا عَلَى الطَّهَارَةِ فَاِنِ اقْتَصَرَ عَلٰى ذِكْرِاللّٰهِ تَعَالٰى جَازَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَابُدَّ مِنْ ذِكْرٍ طَوِيْلٍ يُسَمّٰى خُطْبَةً فَاِنْ خَطَبَ قَاعِدًا اَوْ عَلٰى غَيْرِ طَهَارَةٍ جَازَ وَيُكْرَهُ وَمِنْ شَرَائِطِهَا الْجَمَاعَةُ وَاَقَلُّهُمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى ثَلٰثَةٌ سِوَى الْاِمَامِ وَقَالَا اِثْنَانِ سِوَى الْاِمَامِ وَيَجْهَرُ الْاِمَامُ بِقِرَاءَتِهٖ فِى الرَّكْعَتَيْنِ وَلَيْسَ فِيْهِمَا قِرَاءَةُ سُوْرَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَاتَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلٰى مُسَافِرٍ وَلَا اِمْرَأَةٍ وَلَا مَرِيْضٍ وَلَا صَبِىٍّ وَلَا عَبْدٍ وَلَا اَعْمٰى فَاِنْ حَضَرُوْا وَصَلُّوْا مَعَ النَّاسِ اَجْزَأَهُمْ عَنْ فَرْضِ الْوَقْتِ -

জুমুআর সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ জনবহুল শহর অথবা শহরের ঈদগাহ ব্যতীত অন্য কোন স্থানে জুমুআ জায়েয নেই। গ্রামে জুমুআ জায়েয নেই। বাদশাহ অথবা বাদশাহ যাকে নির্দেশ দেবে সে ছাড়া আর কারো জন্য জুমুআ জায়েয হবে না। আর উহার শর্তসমূহের মধ্যে একটি হল ওয়াক্ত বা সময়। অতএব যোহরের সময়ে তা বিশুদ্ধ হবে এরপরে শুদ্ধ হবে না। জুমুআর শর্ত সমূহের মধ্যে (দ্বিতীয় শর্ত হল) খুতবা দেয়া। ইমাম দুই খুতবা পাঠ করবেন। উভয় খুতবার মাঝে অল্প সময় বসার দ্বারা পার্থক্য করবেন। আর পবিত্র অবস্থায় দাঁড়িয়ে খুতবা পড়বেন।

অতঃপর খুতবার মধ্যে যদি শুধু আল্লাহর যিকির করে থাকে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে। সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, যিকির দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক, যাকে খুতবা বলা যায়। যদি বসে অথবা বিনা ওযূতে খুতবা পড়ে, তবে জায়েয হবে এবং মাকরূহ হবে। জুমুআর শর্তসমূহের মধ্যে (তৃতীয় শর্ত) আরেকটি শর্ত হল জামাআত। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, জামাআতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হল ইমাম ছাড়া তিনজন হওয়া। আর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, ইমাম ছাড়া দুইজন হওয়া। জুমুআর সালাতে উভয় রাকআতে ইমাম উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বে। এতে কোন নির্দিষ্ট সূরা পড়ার প্রয়োজন নেই। মুসাফির, স্ত্রীলোক, রুগ্ণ ব্যক্তি, অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, গোলাম এবং অন্ধের ওপর জুমুআ ফরয নয়। তবে যদি তারাও জুমুআয় উপস্থিত হয়ে মানুষের সাথে সালাত আদায় করে, তাহলে তাদের ওয়াক্তিয়া ফরয তথা যোহরের জন্য যথেষ্ট হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুসাফির ও জুমুআর সালাতের মধ্যে সামঞ্জস্য ঃ

قَوْلُهُ بَابُ صَلٰوةِ الْجُمُعَةِ ঃ জুমুআর সালাত ও মুসাফিরের সালাত উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য হল শেষ দুই রাকআত বাদ যাবার দিক থেকে। জুমুআতে বাদ যায় খুতবার কারণে, আর মুসাফিরের জন্য বাদ যায় সফরের কারণে। এ কারণে গ্রন্থকার মুসাফিরের সালাতের সাথে জুমুআর সালাতের উল্লেখ করেছেন।

জুমুআর সালাত ফরয হবার জন্য শর্তাবলী ঃ

قَوْلُهُ لَاتَصِحُّ الْجُمُعَةُ الخ ঃ জুমুআ ফরয হবার জন্য মোট ১২টি শর্ত রয়েছে। এর মধ্যে প্রথম ছয়টি হল জুমুআ কায়েম হবার জন্য— (১) শহর হওয়া, (২) বাদশাহ বা তার নায়েব উপস্থিত হওয়া, (৩) ওয়াক্ত হওয়া, (৪) ইযনে আম তথা সর্ব সাধারণের অনুমতি, (৫) জামাআতে পড়া এবং (৬) খুতবা প্রদান করা।

পরবর্তী ছয়টি হল ব্যক্তির জন্য— (১) স্বাধীন হওয়া, (২) পুরুষ হওয়া, (৩) মুকীম হওয়া, (৪) সুস্থ হওয়া, (৫) বালেগ হওয়া এবং (৬) দৃষ্টি শক্তি সম্পন্ন হওয়া।

শহরের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اِلَّا فِىْ مِصْرٍ جَامِعٍ ঃ শহর ব্যতীত জুমুআ জায়েয নেই। শহরের পরিচয় সম্পর্কে হযরত আলী (রাঃ) বলেন—

لاَجُمُعَةَ وَلاَتَشْرِيْقَ وَلاَفِطْرَ وَلاَ اَضْحٰى اِلَّا فِىْ مِصْرٍ ٠

অর্থাৎ জুমুআ, কুরবানী ও উভয় ঈদের সালাত শহর ছাড়া অন্য কোথাও জায়েয নেই। আর শহর সে স্থানকে বলে, যেখানে আমির ও কাজি বিদ্যমান রয়েছে, যারা শরীয়তের বিধান প্রয়োগ করে থাকেন।

বাংলাদেশের গ্রামসমূহের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا تَجُوْزُ فِى الْقُرٰى ঃ হানাফীদের নিকট গ্রামে জুমুআ জায়েয নেই। বাংলাদেশের গ্রামসমূহ পরস্পর সংযুক্ত থাকার কারণে এবং অধিক সংখ্যক লোক বসবাস করাতে; বিচার-আচার গ্রামে সংঘটিত হবার ফলে এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যাওয়াতে শহরের হুকুমে শামিল হয়ে গেছে। তাই বাংলাদেশের গ্রামসমূহে জুমুআ জায়েয।

বাদশাহ না থাকলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ اِلَّا لِلسُّلْطَانِ الخ ঃ জুমুআর জন্য মুসলমান শাসক উপস্থিত থাকা আবশ্যক। যদি কোন কাফির বাদশাহ মুসলমানদের ওপর বিজয়ী হয়, তাহলে মুসলমানগণ কাউকে কাজি বানিয়ে জুমুআ ও ঈদের সালাত প্রতিষ্ঠা করবে। 'মাজমাউল ফাতাওয়া' নামক কিতাবে এরূপ করাকে ওয়াজিব বলা হয়েছে।

وَيَجُوْزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ وَالْمَرِيْضِ اَنْ يَّؤُمُّوا فِى الْجُمُعَةِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِى مَنْزِلِهٖ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صَلٰوةِ الْاِمَامِ وَلَاعُذْرَ لَهٗ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ وَجَازَتْ صَلٰوتُهٗ فَاِنْ بَدَا لَهٗ اَنْ يَّحْضُرَ الْجُمُعَةَ فَتَوَجَّهَ اِلَيْهَا بَطَلَتْ صَلٰوةُ الظُّهْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِالسَّعْيِ اِلَيْهَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاتَبْطُلُ حَتّٰى يَدْخُلَ مَعَ الْاِمَامِ وَيُكْرَهُ اَنْ يُّصَلِّىَ الْمَعْذُوْرُ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَكَذَالِكَ اَهْلُ السِّجْنِ -

সরল অনুবাদ ঃ দাস, মুসাফির এবং রুগ্ণ ব্যক্তির জুমুআর সালাতের ইমামতি করা জায়েয। আর যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের সালাত পড়ার পূর্বে নিজ গৃহে কোন কারণ ব্যতীত যোহরের সালাত পড়ে, তাহলে এটা তার জন্য মাকরূহ হবে, তবে সালাত জায়েয হবে। তারপর যদি তার অন্তরে জুমুআয় উপস্থিত হবার আগ্রহ দেখা দেয় এবং জুমুআর দিকে রওয়ানা দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, জুমুআর দিকে রওয়ানা দেয়ার সাথে সাথে যোহরের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, ইমামের সাথে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার সালাত বাতিল হবে না। জুমুআর দিনে (মাজুর) অক্ষম ব্যক্তিবর্গের জামাআতে যোহরের সালাত পড়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে বন্দীগণের জন্যও মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গোলাম, মুসাফির ও রুগ্ণ ব্যক্তির জুমুআর ইমামতি করার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَيَجُوْزُ لِلْعَبْدِ وَالْمُسَافِرِ الخ ঃ গোলাম, মুসাফির ও রুগ্ণ ব্যক্তির ওপর জুমুআ ফরয নয়, এটা তাদের ওপর সহজতার জন্য ইহসান করা হয়েছে। এরপর যদি তারা স্বেচ্ছায় জুমুআয় উপস্থিত হয়, তখন জুমুআ তাদের ওপর ফরয হয়ে যাবে, তাই তাদের ইমাম হতেও কোন আপত্তি নেই। এতে "اِقْتِدَاءُ الْمُفْتَرِضِ خَلْفَ الْمُتَنَفِّلِ" তথা নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর এক্তেদা হিসেবে পরিগণিত হবে না।

জুমুআর দিনে ঘরে সালাত পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ كُرِهَ لَهٗ ذٰلِكَ الخ ঃ জুমুআর দিন বিনা ওজরে নিজ গৃহে যোহরের সালাত জুমুআর পূর্বে পড়া মাকরূহ। যোহর পড়ার পর যদি জুমুআর দিকে রওয়ানা হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট যোহর বাতিল হয়ে যাবে, আর সাহেবাইনের মতে, ইমামের সাথে শরিক হলে বাতিল হয় যাবে, এর পূর্বে বাতিল হবে না।

অক্ষম ব্যক্তিদের জামাআত করার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ الظُّهْرَ بِجَمَاعَةٍ الخ ঃ জুমুআর দিন মাজুর ব্যক্তিদের যোহরের সালাত জামাআতে পড়া মাকরূহ। কেননা হাদীস শরীফে জুমুআর দিনে অন্য কোন জামাআত সে সময় করা হতে নিষেধাজ্ঞা এসেছে; বরং বলা হয়েছে "اَلْجُمُعَةُ جَامِعَةٌ لِلْجَمَاعَاتِ" অর্থাৎ "জুমুআ সমস্ত জামাআতকে একত্রকারী।" জামাআতে যোহর পড়লে জুমুআর মধ্যে ত্রুটি আসতে পারে বিধায় নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

وَمَنْ اَدْرَكَ الْاِمَامَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ صَلّٰى مَعَهٗ مَا اَدْرَكَ وَبَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَاِنْ اَدْرَكَهٗ فِى التَّشَهُّدِ اَوْ فِىْ سُجُوْدِ السَّهْوِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ اَدْرَكَ مَعَهٗ اَكْثَرَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بَنٰى عَلَيْهَا الْجُمُعَةَ وَاِنْ اَدْرَكَ مَعَهٗ اَقَلَّهَا بَنٰى عَلَيْهَا الظُّهْرَ وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَكَ النَّاسُ الصَّلٰوةَ وَالْكَلَامَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ وَقَالَا لَابَأْسَ بِاَنْ يَّتَكَلَّمَ مَالَمْ يَبْدَأْ بِالْخُطْبَةِ وَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْاَذَانَ الْاَوَّلَ تَرَكَ النَّاسُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ وَتَوَجَّهُوْا اِلَى الْجُمُعَةِ فَاِذَا صَعِدَ الْاِمَامُ الْمِنْبَرَ جَلَسَ وَاَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ بَيْنَ يَدَىِ الْمِنْبَرِ ثُمَّ يَخْطُبُ الْاِمَامُ وَاِذَا فَرَغَ مِنْ خُطْبَتِهٖ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যে ব্যক্তি জুমুআর দিন ইমামের সাথে সালাত পেল যে পরিমাণ পেয়েছে সে পরিমাণ তাঁর সাথে পড়বে এবং উহার ওপর ভিত্তি করে জুমুআর অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে। আর সে যদি ইমামকে তাশাহ্হুদ বা ভুলের সিজদায় পায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সে উহার ওপর জুমুআকে ভিত্তি করে পড়বে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যদি সে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পায়, তাহলে উহার ওপর ভিত্তি করবে। আর যদি দ্বিতীয় রাকআতের স্বল্প অংশ পায়, তবে উহার ওপর ভিত্তি করে যোহর পড়বে। জুমুআর দিন ইমাম যখন খুতবা দেয়ার জন্য বের হয়, তখন সকল মানুষ ইমাম সাহেব খুতবা হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত সালাত এবং কথাবার্তা পরিত্যাগ করবে। আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, খুতবা শুরু করার পূর্বে কথা বলাতে কোন ক্ষতি নেই। জুমুআর দিন মুয়ায্যিনগণ যখন প্রথম আযান দেবে, তখন মানুষ ক্রয়-বিক্রয় ছেড়ে দিয়ে জুমুআর দিকে রওয়ানা দেবে। অতঃপর ইমাম মিম্বরে বসবেন এবং মুয়ায্যিনগণ মিম্বরের সম্মুখে আযান দেবেন, এরপর ইমাম সাহেব খুতবা পাঠ করবেন। ইমাম খুতবা হতে অবসর হলে জুমুআর সালাত প্রতিষ্ঠা করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

<u>ইমামকে তাশাহ্হুদ ও সিজদায়ে সাহুতে পেলে তার হুকুম ঃ</u>

قَوْلُهٗ وَاِنْ اَدْرَكَهٗ فِى التَّشَهُّدِ الخ ঃ জুমুআর সালাতে ইমামকে তাশাহহুদ ও সিজদায়ে সাহুতে পেলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, এর ওপর ভিত্তি করে জুমুআর সালাত পড়তে পারবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, জুমুআ পড়বে না; বরং যোহর পড়বে। তাঁর মতে জুমুআ পড়তে হলে দ্বিতীয় রাকআতের অধিকাংশ পাওয়া যেতে হবে।

<u>খুতবার সময় মুসল্লিদের কর্তব্য ঃ</u>

قَوْلُهٗ وَاِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জুমুআর ইমাম স্বীয় হুজরা হতে বের হয়ে মিম্বরে আরোহণ করার পর হতে মুসল্লিগণের জন্য সালাত ও কথাবার্তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা হাদীসে এসেছে— اِذَا خَرَجَ الْاِمَامُ فَلَاصَلٰوةَ وَلَا كَلَامَ. সাহেবাইন ও অন্যান্য ইমামদের নিকট ইমামের খুতবা পাঠ শুরু করবার পূর্ব পর্যন্ত কথাবার্তা ও

সালাত জায়েয আছে। তবে যে ব্যক্তির ওপর তারতীব রক্ষাকারী তথা পাঁচ ওয়াক্তের কম কাযা সালাত রয়েছে তার জন্য কাযা সালাত আদায় করা সকলের নিকট জায়েয আছে। এমনিভাবে কোন ব্যক্তি খুতবা পাঠের পূর্বে জুমুআর চার রাকআত সুন্নত শুরু করে থাকলে তা সম্পন্ন করে খুত্বা শ্রবণ করবে। অতএব এর ফলে বোঝা গেল যে, ইমাম মিম্বরে আরোহণ করবার পর যে সালাত নিষেধ করা হয়েছে তাহল নফল সালাত।

প্রথম আযানের পর করণীয় ঃ

قَوْلُهٗ وَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُوْنَ الخ ঃ মুয়াযযিনগণ প্রথম আযান দিলে বেচাকেনাসহ দুনিয়ার সকল কাজ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা পবিত্র কুরআনে এসেছে— اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ الخ

অর্থাৎ যখন জুমুআর দিনে জুমুআর সালাতের আযান দেয়া হবে, তখন তোমরা আল্লাহর যিকির তথা সালাতের দিকে ছুটে যাও এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। তবে কোন ব্যক্তি নৌকা বা যানবাহনের মাধ্যমে জুমুআর দিকে যাবার পথে বেচাকেনা করলে কোন বাধা নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। জুমুআর সালাত ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ উল্লেখ কর।
২। صَلٰوةُ الْجُمُعَةِ আদায় হওয়ার শর্তসমূহ লিখ।
৩। কেউ যদি জুমুআর সালাতে তাশাহহুদ বা সাহু সিজদা পায়, তবে তার হুকুম কি? ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর।
৪। জুমুআর সালাত কার ওপর ওয়াজিব নয় বর্ণনা কর।
৫। নিজ গৃহে যোহরের সালাত আদায় করে জুমুআয় গমন করলে তার হুকুম কি? ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ কর।
৬। জুমুআর খুতবা সম্পর্কে যা জান লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ

يَسْتَحِبُّ يَوْمَ الْفِطْرِ اَنْ يَّطْعَمَ الْاِنْسَانُ شَيْئًا قَبْلَ الْخُرُوْجِ اِلَى الْمُصَلّٰى وَيَغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيَلْبَسَ اَحْسَنَ ثِيَابِهٖ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَلَا يُكَبِّرُ فِىْ طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَيُكَبِّرُ عِنْدَ هُمَا وَلَا يَتَنَفَّلُ فِى الْمُصَلّٰى قَبْلَ صَلٰوةِ الْعِيْدِ فَاِذَا حَلَّتِ الصَّلٰوةُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ دَخَلَ وَقْتُهَا اِلَى الزَّوَالِ فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ وَقْتُهَا وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِى الْاُوْلٰى تَكْبِيْرَةَ الْاِحْرَامِ وَثَلٰثًا بَعْدَهَا ثُمَّ يَقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً مَعَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ يَبْتَدِأُ فِى الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ بِالْقِرَاءَةِ فَاِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ ثَلٰثَ تَكْبِيْرَاتٍ وَكَبَّرَ تَكْبِيْرَةً رَابِعَةً يَرْكَعُ بِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ فِىْ تَكْبِيْرَاتِ الْعِيْدَيْنِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلٰوةِ خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَاَحْكَامَهَا -

দুই ঈদের সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহের দিকে বের হবার পূর্বে কিছু খাওয়া, গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা এবং নিজের উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব। এরপর ঈদগাহের দিকে রওয়ানা হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) মতে, পথে তাকবীর বলবে না। সাহেবাইন (রহঃ)-এর মতে, তাকবীর বলবে। ঈদের মাঠে ঈদের সালাতের পূর্বে নফল সালাত পড়বে না। সূর্য ওপরে ওঠে যাবার পর যখন সালাত পড়া জায়েয হয়, তখন হতে ঈদের সালাতের ওয়াক্ত শুরু হয়ে সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাকি থাকে। সূর্য যখন পশ্চিম গগনে হেলে যাবে, তখন ঈদের সালাতের সময় চলে যাবে। ইমাম মানুষদেরকে নিয়ে দুই রাকআত সালাত পড়বে। প্রথম রাকআতে তাকবীরে তাহরীমার পর আরো তিনটি তাকবীর বলবে, এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করবে এবং তার সাথে যে কোন একটি সূরা পড়বে, তারপর তাকবীর বলে রুকু করবে। এরপর দ্বিতীয় রাকআত কিরাআত পড়ার মাধ্যমে শুরু করবে। কিরাআত হতে অবসর হয়ে অতিরিক্ত তিন তাকবীর বলবে এবং চতুর্থ তাকবীর বলে রুকু করবে। দুই ঈদের তাকবীর গুলোর মধ্যে হাত উত্তোলন করবে। তারপর সালাতের পর ইমাম দুই খুতবা পাঠ করবেন। এ খুতবার মধ্যে মানুষদেরকে সাদকায়ে ফিতর ও উহার বিধানাবলী শিক্ষা দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদ ও জুমুআর সম্পর্ক ঃ

قَوْلُهُ بَابُ صَلٰوةِ الْعِيْدَيْنِ ঃ ঈদ ও জুমুআর মধ্যকার সম্পর্ক হল, জুমুআর সালাত দুই রাকআত, তেমনি ঈদের সালাতও দুই রাকআত। জুমুআর কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়তে হয়, তেমনি ঈদের কিরাআতও। ঈদের সালাতে যেমনি খুতবা রয়েছে, তেমনি জুমুআর সালাতেও খুতবা আছে।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ঈদের সালাত ওয়াজিব, আর সাহেবাইন ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট সুন্নত।

তাকবীরের ব্যাপারে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُكَبِّرُ فِىْ طَرِيْقِ الْمُصَلّٰى الخ ঃ সাহেবাইনের মতে, ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাবার সময় উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলা উত্তম। তারা ঈদুল আযহার ওপর কিয়াস করে একথা বলেন।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ঈদুল ফিতরে ঈদগাহে যাওয়া-আসার সময় যদিও উচ্চৈঃস্বরে তাকবীর বলার হুকুম নেই, কিন্তু চুপে চুপে বলার অনুমতি আছে। কারণ এটা হল আল্লাহর যিকির, আর খোদার যিকির নিম্নস্বরে করা উত্তম। আর ঈদুল ফিতরকে ইদুল আযহার ওপর কিয়াস করা শুদ্ধ নয়। কেননা ঈদুল আযহাতে তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলার ব্যাপারে প্রকাশ্য আদেশ এসেছে, কিন্তু ঈদুল ফিতরে কোন প্রকাশ্য আদেশ নেই।

ঈদের সালাতের পূর্বে নফলের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَتَنَفَّلُ فِى الْمُصَلّٰى الخ ঃ ঈদের সালাতের পূর্বে ঈদগাহে নফল সালাত পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহ। কিন্তু ঘরে নফল পড়ার ব্যাপারে মতভেদ দেখা যায়, জমহুর আলিমদের নিকট মাকরূহ; কিছু সংখ্যকের মতে মাকরূহ নয়। আর ঈদের সালাতের পর ঈদগাহে নফল পড়া অধিকাংশ আলিমের মতে মাকরূহ, তবে ঘরে পড়া মাকরূহ নয়।

ঈদের সালাতের সময় ঃ

قَوْلُهُ بِارْتِفَاعِ الشَّمْسِ الخ ঃ সূর্য উর্ধ্বে ওঠার পর হতে ঈদের সালাতের সময় শুরু হয়। এরপর সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সময় থাকে। এখানে হেলে যাওয়া বলতে মধ্যাহ্ন তথা বেলা ঠিক হওয়া। কেননা এ সময় সকল সালাত নিষিদ্ধ।

ঈদের সালাত পড়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الخ ঃ ইমাম সাহেব মুসল্লিদেরকে নিয়ে দুই রাকআত সালাত পড়বে। প্রথমে তাকবীরে তাহরীমা বলে একসাথে তিন তাকবীর বলবে, তারপর সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা মিলিয়ে প্রথম রাকআত শেষ করবে। এরপর দ্বিতীয় রাকআতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পড়ার পর তিন তাকবীর দিয়ে রুকুতে যাবে। এভাবে দুই রাকআত শেষ করবে।

ঈদের খুতবার বিবরণ ঃ

قَوْلُهُ خُطْبَتَيْنِ الخ ঃ ঈদের সালাত শেষে ইমাম সাহেব দাঁড়িয়ে দু'টি খুতবা পাঠ করবেন। ঈদুল ফিতরের খুতবায় সাদকাতুল ফিতর কার ওপর ওয়াজিব ও উহার পরিমাণ কত? এবং কাদেরকে দেয়া উচিত? সে সম্পর্কে আলোচনা করবেন। আর উভয় খুতবায় ইমাম তাকবীর বলবেন। জাহেরে রেওয়ায়াত অনুযায়ী এর কোন নির্দিষ্ট সংখ্যার উল্লেখ নেই, তবে ঈদুল ফিতরের খুতবার তুলনায় ঈদুল আযহার খুতবার তাকবীর বেশি বলা উচিত।

وَمَنْ فَاتَتْهُ صَلٰوةُ الْعِيْدِ مَعَ الْاِمَامِ لَمْ يَقْضِهَا فَاِنْ غُمَّ الْهِلَالُ عَنِ النَّاسِ وَشَهِدُوْا عِنْدَ الْاِمَامِ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّى الْعِيْدَ مِنَ الْغَدِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلٰوةِ فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ لَمْ يُصَلِّهَا بَعْدَهٗ وَيُسْتَحَبُّ فِىْ يَوْمِ الْاَضْحٰى اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَتَطَيَّبَ وَيُؤَخِّرَ الْاَكْلَ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلٰوةِ وَيَتَوَجَّهُ اِلَى الْمُصَلّٰى وَهُوَ يُكَبِّرُ وَيُصَلِّى الْاَضْحٰى رَكْعَتَيْنِ كَصَلٰوةِ الْفِطْرِ وَيَخْطُبُ بَعْدَهَا خُطْبَتَيْنِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهَا الْاُضْحِيَّةَ وَتَكْبِيْرَاتِ التَّشْرِيْقِ فَاِنْ حَدَثَ عُذْرٌ مَنَعَ النَّاسَ مِنَ الصَّلٰوةِ يَوْمَ الْاَضْحٰى صَلَّاهَا مِنَ الْغَدِ وَبَعْدَ الْغَدِ وَلَا يُصَلِّيْهَا بَعْدَ ذٰلِكَ وَتَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ اَوَّلُهٗ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَاٰخِرُهٗ عَقِيْبَ صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى صَلٰوةِ الْعَصْرِ مِنْ اٰخِرِ اَيَّامِ التَّشْرِيْقِ وَالتَّكْبِيْرُ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوْضَاتِ" اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ -

---

__সরল অনুবাদ ঃ__ যে ব্যক্তি ইমামের সাথে ঈদের সালাত পায়নি সে কাযা করবে না। যদি ঈদের চাঁদ মানুষের দৃষ্টি হতে অদৃশ্য থাকে আর পরের দিন সূর্য হেলে যাবার পর মানুষ এসে ইমাম সাহেবের নিকট চাঁদ দেখার সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহলে পরের দিন ঈদের সালাত পড়বে। যদি দ্বিতীয় দিনেও ঈদের সালাত পড়তে এমন কোন (ওজর) অপারগতা বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে এরপর আর পড়বে না। ঈদুল আযহার দিন প্রথমে গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, সালাত হতে অবসর হওয়া পর্যন্ত খাওয়াকে পিছিয়ে দেয়া এবং তাকবীর বলতে বলতে ঈদগাহের দিকে যাওয়া মুস্তাহাব। ঈদুল ফিতরের ন্যায় ঈদুল আযহাতেও দুই রাকআত পড়বে। সালাত শেষে দু'টি খুতবা দেবে, যাতে মানুষদেরকে কুরবানী এবং তাকবীরাতে তাশরীকের বিষয় শিক্ষা দেবে। যদি কোন ওজর সৃষ্টি হয়, যা মানুষদেরকে ঈদুল আযহার দিনে সালাত পড়তে বাধা সৃষ্টি করে, তাহলে পরের দিন বা তার পরের দিন সালাত পড়বে, এরপর পড়বে না। তাকবীরে তাশরীক আরাফার দিনে অর্থাৎ যিলহজ্জের নয় তারিখ ফজরের সালাতের পর হতে শুরু হবে এবং উহার শেষ সময় ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট নহরের দিন তথা বারো তারিখের আসর পর্যন্ত। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, (শেষ সময়) আইয়ামে তাশরীকের শেষ দিনের আসর পর্যন্ত। (অর্থাৎ তেরো তারিখের আসর পর্যন্ত।) প্রত্যেক ফরয সালাতের পর তাকবীর বলা (তাহল) আল্লাহু আক্‌বার আল্লাহু আকবার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদের সালাত কাযা পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ لَمْ يَقْضِهَا ঃ কোন কারণবশত ঈদের সালাত ঈমামের সাথে জামাআতে পড়তে না পারলে উহার কাযা পড়বে না। কেননা দুই ঈদের সালাত পড়ার জন্য এমন কিছু শর্ত রয়েছে যা একাকী পালন করা যায় না।

চাঁদ না দেখা গেলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ غُمَّ الْهِلَالُ الخ ঃ আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে বা অন্য কোন কারণে মানুষ চাঁদ দেখতে না পেলে পরের দিন সূর্য পূর্বাকাশে থাকা অবস্থায় চাঁদ দেখা যাওয়ার উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া গেলে সে দিনই ঈদের সালাত পড়বে। আর যদি সূর্য পশ্চিম গগনে হেলে যাবার পর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে পরের দিন সালাত পড়তে হবে, এরপর আর ঈদুল ফিতরের সালাত পড়বে না। কেননা, রাসূল (সাঃ) হতে তৃতীয় দিবসে ঈদুল ফিতরের সালাত পড়বার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ঈদুল আযহার সালাতের ব্যাপারে তিনদিন পর্যন্ত সালাত পড়ার হাদীস পাওয়া যায়, তাই বারো তারিখ পর্যন্ত পড়া জায়েয।

ঈদুল আযহার দিনের মুস্তাহাব ঃ

قَوْلُهُ وَيُسْتَحَبُّ فِيْ يَوْمِ الْأَضْحٰى الخ ঃ ঈদুল আযহার দিনের মুস্তাহাব কাজ হল— (১) গোসল করা, (২) সুগন্ধি মাখা, (২) সালাত পড়ার পূর্ব পর্যন্ত কিছু না খাওয়া, (৪) ঈদগাহের দিকে তাকবীর পড়তে পড়তে যাওয়া।

খুতবার বিধান ঃ

قَوْلُهُ يُعَلِّمُ النَّاسَ الخ ঃ সালাত শেষে ঈমাম সাহেব দু'টি খুতবা প্রদান করবেন। খুতবায় কুরবানীর বিধানাবলী এবং তাকবীরে তাশরীকের বিষয়ে মানুষদিগকে জানিয়ে দেবেন।

তাকবীরে তাশরীকের বিধান ঃ

قَوْلُهُ تَكْبِيْرُ التَّشْرِيْقِ أَوَّلُهُ الخ ঃ তাকবীরে তাশরীকের প্রথম ওয়াক্তের ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই তথা নয় তারিখের ফজর হতে শুরু হবে, কিন্তু শেষ ওয়াক্ত নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ১২ তারিখ আসর পর্যন্ত শেষ সময়, আর সাহেবাইনের নিকট ১৩ তারিখ আসর পর্যন্ত তাকবীর ওয়াজিব। সাহেবাইনের কথার ওপরই ফতোয়া। এ হিসাবে তেইশ ওয়াক্ত সালাতে তাকবীর বলতে হয়।

উল্লেখ্য যে, এ তাকবীর উচ্চৈঃস্বরে বলতে হয়। ইমাম তাকবীর বলতে ভুলে গেলে মুকতাদীগণ উচ্চৈঃস্বরে পড়ে স্মরণ করিয়ে দেবে। তাকবীর ভুলে গেলে স্মরণ হওয়া মাত্র কাযা করে নিতে হবে। সালাত জামাআতে পড়ুক বা একাকী পড়ুক তাকবীর বলা ওয়াজিব।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। عِيْدُ الْفِطْرِ ও عِيْدُ الْأَضْحٰى-এর দিনে কি কি কাজ করা সুন্নত ও কি কি মুস্তাহাব? বর্ণনা কর।

২। ঈদের সালাত পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

৩। ঈদের সালাতের কাযা আছে কি? বিস্তারিত লিখ।

بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوفِ

اِذَا انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ صَلَّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ فِى كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهِمَا وَيُخْفِى عِنْدَ اَبِى حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجْهَرُ ثُمَّ يَدْعُوْ بَعْدَهَا حَتّٰى تَنْجَلِىَ الشَّمْسُ وَيُصَلِّىْ بِالنَّاسِ الْاِمَامُ الَّذِىْ يُصَلِّىْ بِهِمُ الْجُمُعَةَ فَاِنْ لَمْ يَحْضُرِ الْاِمَامُ صَلَّهَا النَّاسُ فُرَادٰى وَلَيْسَ فِىْ خُسُوْفِ الْقَمَرِ جَمَاعَةٌ وَاِنَّمَا يُصَلِّىْ كُلُّ وَاحِدٍ بِنَفْسِهٖ وَلَيْسَ فِى الْكُسُوْفِ خُطْبَةٌ -

সূর্য গ্রহণের সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সূর্য গ্রহণ হলে ইমাম সাহেব মানুষদেরকে নিয়ে নফল সালাতের ন্যায় দুই রাকআত সালাত পড়বেন। প্রত্যেক রাকআতে একটি রুকু করবেন এবং উভয় রাকআতে দীর্ঘ কিরাআত পড়বেন। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, কিরাআত চুপি চুপি পড়বে, আর আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে। এরপর সালাত শেষে সূর্য উজ্জ্বল (খুলে যাওয়া) হওয়া পর্যন্ত দোয়া করতে থাকবেন। যিনি জুমুআর সালাত পড়ান তিনি মানুষদেরকে নিয়ে এই সালাত পড়বেন। যদি ইমাম উপস্থিত না হয়, তবে মানুষ একা একা সালাত পড়বে। চন্দ্র গ্রহণে কোন জামাআত নেই। প্রত্যেকে একা একা সালাত পড়বে। আর সূর্য গ্রহণের সালাতে কোন খুত্বা নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঈদের সালাত ও সূর্য গ্রহণের সালাতের মধ্যে সম্পর্ক ঃ

قَوْلُهٗ بَابُ صَلٰوةِ الْكُسُوْفِ ঃ ঈদের সালাতের সাথে সূর্য গ্রহণের সালাত উল্লেখ করার কারণ হল উভয় সালাত দিনের বেলায় আযান একামত ছাড়া হয়। উভয়টি দুই রাকআত।

নফল সালাতের সাথে সামঞ্জস্যের কারণ ঃ

قَوْلُهٗ كَهَيْئَةِ النَّافِلَةِ ঃ নফলের ন্যায় বলতে বোঝানো হয়েছে যে, আযান-একামত না থাকা, মাকরূহ সময় সমূহে জায়েয না হওয়া, কিরাআত ও দোয়া সমূহের সাথে কিয়াম লম্বা করা, এ সব নফলেই হয়ে থাকে।

এক রুকু বলার কারণ ঃ

قَوْلُهٗ فِىْ كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوْعٌ وَاحِدٌ ঃ গ্রন্থকার এখানে এক রুকুর কথা বলেছেন, কেননা ইমাম শাফিয়ী, মালিক ও আহমদ (রহঃ)-এর মতে, এ সালাতের প্রত্যেক রাকআতে দুই রুকু দিতে হবে। তাঁরা দলিল হিসেবে হযরত আয়িশা (রাঃ)-এর হাদীস পেশ করেন। আর আমাদের নিকট এক রুকু। আমাদের দলিল হল, হযরত ইবনে ওমরের (রাঃ) হাদীস। তাঁদের জবাবে আমরা বলি যে, রুকুর সংখ্যা সম্পর্কে অনেক বর্ণনা এসেছে। কোন রিওয়ায়াতে তিন রুকু— কোন রিওয়ায়াতে চার রুকু, পাঁচ রুকু এমনকি দশ রুকু পর্যন্ত বর্ণিত আছে। এ সবগুলো পরিত্যাগ করে স্বাভাবিক ভাবের এক রুকুর বর্ণনাই গৃহীত হবে।

কিরাআতের হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَيُطَوِّلُ الْقِرَاءَةَ فِيْهَا الخ ঃ সকল ইমাম এ কথার ওপর একমত যে, সূর্য গ্রহণের সালাতে খুব দীর্ঘ কিরাআত পড়তে হয়। ইমাম আবূ হানীফা, শাফিয়ী ও মালিক (রহঃ)-এর নিকট চুপে চুপে কিরাআত পড়বে। আর সাহেবাইন ও ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে, কিরাআত উচ্চৈঃস্বরে পড়বে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। صَلٰوةُ الْكُسُوْفِ ও صَلٰوةُ الْخُسُوْفِ আদায় করার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْاِسْتِسْقَاءِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَيْسَ فِى الْاِسْتِسْقَاءِ صَلٰوةٌ مَسْنُوْنَةٌ بِالْجَمَاعَةِ فَاِنْ صَلَّى النَّاسُ وُحْدَانًا جَازَ وَاِنَّمَا الْاِسْتِسْقَاءُ الدُّعَاءُ وَالْاِسْتِغْفَارُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُصَلِّى الْاِمَامُ رَكْعَتَيْنِ يَجْهَرُ فِيْهِمَا بِالْقِرَاءَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ وَيُقَلِّبُ الْاِمَامُ رِدَاءَهٗ وَلَا يُقَلِّبُ الْقَوْمُ اَرْدِيَتَهُمْ وَلَا يَحْضُرُ اَهْلُ الذِّمَّةِ لِلْاِسْتِسْقَاءِ۔

বৃষ্টি প্রার্থনার সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আযম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, বৃষ্টি প্রার্থনার সালাত জামাআতে পড়া সুন্নত নয়। যদি মানুষ একাকী সালাত পড়ে তাহলে জায়েয হবে। অবশ্য শুধু প্রার্থনা ও ইসতিগফার হল ইস্তিস্কা।

ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, ইস্তিসকার ইমাম দুই রাকআত সালাত পড়বেন, উভয় রাকআতে উচ্চৈঃস্বরে কিরাআত পড়বেন, তারপর খুতবা দেবেন এবং কেবলামুখী হয়ে দোয়া করবেন। আর ইমাম স্বীয় চাঁদর উল্টিয়ে দেবেন, কিন্তু মুক্তাদীগণ তাদের চাদর উল্টাবে না। আর জিম্মিগণ (ইসলামী রাষ্ট্রে বিধর্মী প্রজা) ইস্তিসকার জন্য উপস্থিত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্তিস্কার সালাত সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهٗ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ইস্তিসকা হল শুধু দোয়া ও ইস্তিগফার, তবে যদি মানুষ পৃথক পৃথকভাবে সালাত পড়ে তাতে কোন আপত্তি নেই। আর সাহেবাইনের মতে, ঈদের ন্যায় জামাআতে পড়া সুন্নত। ইমাম মালিক, শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ)-এর নিকটও জামাআতের সাথে পড়া সুন্নত।

খুতবা সম্পর্কে মাসআলা ঃ

قَوْلُهٗ ثُمَّ يَخْطُبُ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট যখন জামাআত নেই তখন খুতবাও নেই, আর সাহেবাইনের নিকট খুতবা দিতে হবে। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট এক খুতবা আর মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট দুই খুতবা।

দোয়া করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهٗ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ بِالدُّعَاءِ الخ ঃ ইমাম খুত্বা পাঠ শেষে চাদর উল্টিয়ে হাতের তালু নিচের দিকে রেখে দোয়া করবেন। চাদরের ডান দিক বাম দিকে, বাম দিক ডান দিকে উল্টিয়ে দেবে, এটা সাহেবাইনের অভিমত; কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, চাদর উল্টাতে হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اِسْتِسْقَاء বলতে কি বোঝায়? ইস্তিস্কার সালাত পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

بَابُ قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

يَسْتَحِبُّ اَنْ يَجْتَمِعَ النَّاسُ فِىْ شَهْرِ رَمَضَانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ فَيُصَلِّىْ بِهِمْ اِمَامُهُمْ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ فِىْ كُلِّ تَرْوِيْحَةٍ تَسْلِيْمَتَانِ وَيَجْلِسُ بَيْنَ كُلِّ تَرْوِيْحَتَيْنِ مِقْدَارَ تَرْوِيْحَةٍ ثُمَّ يُوْتِرُ بِهِمْ وَلَا يُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ فِىْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ -

রমযান মাসে তারাবীহ্ পড়ার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ রমযান মাসে ইশার সালাতের পর সকল মানুষের একত্রিত হওয়া মুস্তাহাব। অতঃপর তাদের ইমাম তাদেরকে পাঁচ তারাবীহ পড়বেন; প্রত্যেক তারাবীহ-এর মধ্যে দুই সালাম ফিরাবেন এবং দুই তারাবীহের মাঝে এক তারাবীহ পরিমাণ সময় বসবেন; তারপর মুক্তাদীদেরকে নিয়ে বিতির পড়বেন। রমযান মাস ছাড়া অন্য সময় বিতির জামাআতের সাথে পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তারাবীহ্ সালাতের বিধান ঃ

قَوْلُهُ يَسْتَحِبُّ اَنْ يَجْتَمِعَ الخ ঃ সমস্ত সাহাবী ও ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর একমত যে, তারাবীহের সালাত সুন্নতে মুয়াক্কাদা। আর এখানে তারাবীহের জন্য একত্রিত হওয়াকে মুস্তাহাব বলা হয়েছে। হযরত ওমর (রাঃ) সর্বপ্রথম সাহাবীদেরকে নিয়ে বিশ রাকআত জামাআতের সাথে পড়ার প্রথা চালু করেছেন; সাহাবীগণ উহাকে পছন্দ করছেন। আর বিশ রাকআতের হাদীসও রাসূল (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে।

তারাবীহ্ পড়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ خَمْسَ تَرْوِيْحَاتٍ الخ ঃ তারাবীহের সালাত মোট বিশ রাকআত। চার রাকআত পড়তে যে সময় লাগে চার রাকআতের পর ঐ পরিমাণ সময় আরাম নিতে হয়। এ জন্য একে تَرْوِيْحَه (বা প্রশান্তি লাভ) বলা হয়। এভাবে পাঁচ তারাবীহে বিশ রাকআত সালাত চার খলীফার আমলের দ্বারা প্রমাণিত। উত্তম হল ১০ সালামে বিশ রাকআত পড়া।

বিতিরের সালাত জামাআতে পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُصَلِّى الْوِتْرَ بِجَمَاعَةٍ الخ ঃ রমযানে বিতিরের সালাত জামাআতে পড়তে হয়। রমযানের বাহিরেও জামাআতে পড়া জায়েয, তবে মুস্তাহাব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। তারাবীহ্ সালাতের হুকুম কি? তারাবীহ্ সালাত পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।
২। তারাবীহ্ কত রাকআত? মতভেদসহ আলোচনা কর।
৩। বিশ রাকআত তারাবীহ পড়ার ইতিহাস বর্ণনা কর।

بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ

إِذَا اشْتَدَّ الْخَوْفُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ طَائِفَتَيْنِ طَائِفَةً إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَطَائِفَةً خَلْفَهُ فَيُصَلِّى بِهٰذِهِ الطَّائِفَةِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مَضَتْ هٰذِهِ الطَّائِفَةُ إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتْ تِلْكَ الطَّائِفَةُ فَيُصَلِّى بِهِمُ الْإِمَامُ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُسَلِّمُوا وَذَهَبُوا إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُوْلٰى فَصَلُّوْا وُحْدَانًا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِغَيْرِ قِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا وَمَضَوْا إِلٰى وَجْهِ الْعَدُوِّ وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرٰى وَصَلُّوْا رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ بِقِرَاءَةٍ وَتَشَهَّدُوْا وَسَلَّمُوْا فَإِنْ كَانَ مُقِيْمًا صَلّٰى بِالطَّائِفَةِ الْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَتَيْنِ وَيُصَلِّى بِالطَّائِفَةِ الْأُوْلٰى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ وَبِالثَّانِيَةِ رَكْعَةً وَلَا يُقَاتِلُوْنَ فِى حَالِ الصَّلٰوةِ فَإِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ بَطَلَتْ صَلٰوتُهُمْ وَإِنِ اشْتَدَّ الْخَوْفُ صَلُّوْا رُكْبَانًا وُحْدَانًا يُوْمُوْنَ بِالرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ إِلٰى أَيِّ جِهَةٍ شَاءُوْا إِذَا لَمْ يَقْدِرُوْا عَلَى التَّوَجُّهِ إِلَى الْقِبْلَةِ -

ভয়কালীন সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যখন শত্রুর ভয় খুব বেশি দেখা দেবে, তখন ইমাম মানুষ (সৈন্য) দিগকে দুই দলে বিভক্ত করে এক দলকে শত্রুর সম্মুখে দাঁড় করাবেন, আর অপর দলকে নিজের পিছনে দাঁড় করিয়ে এক রাকআত সালাত পড়বেন এবং দুই সিজদা দেবেন। ইমাম যখন দ্বিতীয় সিজদা হতে মাথা উঠাবেন, তখন এ দল শত্রুর মোকাবেলায় চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল আসবে। ইমাম তাদেরকে নিয়ে এক রাকআত পড়ে দুই সিজদা দেবেন এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবেন; কিন্তু তারা সালাম না ফিরিয়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। তারপর প্রথম দল এসে কিরাআত ব্যতীত পৃথক পৃথকভাবে এক রাকআত পড়ে দুই সিজদা দেবে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরায়ে শত্রুর সম্মুখে চলে যাবে। আর দ্বিতীয় দল এসে কিরাআত সহকারে দুই সিজদাসহ এক রাকআত পড়বে এবং তাশাহ্হুদ পড়ে সালাম ফিরাবে। আর যদি ইমাম মুকীম হন, তাহলে প্রথম দলকে দুই রাকআত এবং দ্বিতীয় দলকে দুই রাকআত পড়াবেন। আর মাগরিবের সালাত হলে প্রথম দলকে দুই রাকআত পড়াবেন এবং দ্বিতীয় দলকে এক রাকআত পড়াবেন। সালাত অবস্থায় যুদ্ধ করবে না, যদি এরূপ করে তাহলে তাদের সালাত বাতিল হয়ে যাবে। আর ভয় যদি খুব ভীষণ হয়, তাহলে আরোহণ অবস্থায় পৃথক পৃথক ভাবে ইশারায় রুকু-সিজদা করে সালাত পড়বে। যদি কেবলামুখী হতে সক্ষম না হয়, তাহলে যে দিকে সম্ভব সে দিকে ফিরেই সালাত পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভয়কালীন সালাতের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ بَابُ صَلٰوةِ الْخَوْفِ ঃ ভয়ের কারণে যে সালাত পড়া হয় তাকে সালাতুল খাওফ বলা হয়। এ সালাত ৭/৮ হিজরীতে 'যাতুররিকা' নামক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। ভয় না পাওয়া গেলে এ সালাত পড়ার অনুমতি নেই। কেননা এতে অনেক অতিরিক্ত কাজ করতে হয়, যাকে 'আমলে কাছীর' বলে, আর 'আমলে কাছীর' দ্বারা সালাত ফাসিদ হয়ে যায়, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজনে তা মার্জনীয়। 'সালাতুল খাওফ' আদায়ে বিভিন্ন পদ্ধতি রাসূল (সাঃ) হতে জানা যায়।

ভয়কালীন সালাত পড়ার পদ্ধতি ঃ

قَوْلُهُ جَعَلَ الْإِمَامُ النَّاسَ الخ ঃ ভীষণ ভয়ের সময় ইমাম মানুষদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করে একদলকে শত্রু সম্মুখে পাঠিয়ে দেবেন আর অপর দলকে নিয়ে এক রাকআত পড়বেন। তারপর এরা শত্রু সম্মুখে চলে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে দ্বিতীয় রাকআত পড়বে। ইমাম সালাম ফিরাবার পর এরা চলে যাবে এবং প্রথম দল এসে কিরাআত বিহীন ভাবে দ্বিতীয় রাকআত পড়ে সালাত শেষ করে শত্রুর সম্মুখে যাবে। এরপর দ্বিতীয় দল এসে কিরাআতসহ আরেক রাকআত পড়ে সালাত শেষ করবে।

ইমাম মুকীম হলে সালাতের নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ إِنْ كَانَ مُقِيْمًا الخ ঃ ইমাম যদি মুকীম হয় তাহলে প্রথম দলকে দুই রাকআত পড়াবেন। এরপর এরা শত্রুর সম্মুখে যাবে এবং দ্বিতীয় দল এসে পরের দুই রাকআত পড়বে। এভাবে উল্লিখিত নিয়ম অনুযায়ী সালাত শেষ করবে।

মাগরিবের সালাতের নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ بِالطَّائِفَةِ الْأُوْلٰى الخ ঃ মাগরিবের সালাত তিন রাকআত বিধায় দেড় রাকআত করে পড়া যায় না। তাই প্রথম দল দুই রাকআত পড়ে শত্রুর সম্মুখে যাবে, আর দ্বিতীয় দল এক রাকআত পড়বে। আর পূর্বোক্ত নিয়মে পরবর্তী সালাত শেষ করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। ভয়কালীন সালাত কাকে বলে? উহা আদায়ের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

২। ভয়ানক যুদ্ধ চলাকালীন সালাত আদায়ের পদ্ধতি বণনা কর এবং সালাত আদায় কখন مَوْقُوْف থাকবে তাও লিখ।

بَابُ الْجَنَائِزِ

إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ وُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ وَلُقِّنَ الشَّهَادَتَيْنِ وَإِذَا مَاتَ شَدُّوْا لِحْيَتَهُ وَغَمَّضُوْا عَيْنَيْهِ فَإِذَا أَرَادُوْا غُسْلَهُ وَضَعُوْهُ عَلَى سَرِيْرٍ وَجَعَلُوْا عَلَى عَوْرَتِهِ خِرْقَةً وَنَزَعُوْا ثِيَابَهُ وَ وَضَّاؤُهُ وَلَا يُمَضْمِضُ وَلَا يُسْتَنْشَقُ ثُمَّ يُفِيْضُوْنَ الْمَاءَ عَلَيْهِ وَيُجَمَّرُ سَرِيْرُهُ وِتْرًا وَيُغْلَى الْمَاءُ بِالسِّدْرِ وَبِالْحُرْضِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَالْمَاءُ الْقُرَاحُ وَيُغْسَلُ رَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ بِالْخِطْمِيِّ ثُمَّ يُضْجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْسَرِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ حَتَّى يُرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ يُضْجِعُ عَلَى شِقِّهِ الْاَيْمَنِ فَيُغْسَلُ بِالْمَاءِ حَتَّى يُرٰى أَنَّ الْمَاءَ قَدْ وَصَلَ إِلَى مَا يَلِي التَّخْتَ مِنْهُ ثُمَّ يُجْلِسُهُ وَيُسْنِدُهُ إِلَيْهِ وَيُمْسَحُ بَطْنُهُ مَسْحًا رَقِيْقًا فَإِنْ خَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ غَسَلَهُ وَلَا يُعِيْدُ غُسْلَهُ -

জানাযার সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন মানুষের মৃত্যু উপস্থিত হয়, তখন তাকে ডান পার্শ্বের ওপর কেবলামুখী করে শোয়ায়ে দেবে এবং উভয় শাহাদাতের কালিমা পড়তে থাকবে। আর যখন মরে যায়, তখন তার চোয়াল বেঁধে দেবে এবং চক্ষুদ্বয় বন্ধ করে দেবে। তারপর গোসল দেয়ার ইচ্ছা করলে একটি খাটের ওপর শোয়ায়ে দেবে। আর তার লজ্জাস্থানের ওপর একখন্ড কাপড় রেখে দিয়ে তার শরীর হতে কাপড় খুলে নেবে। তাকে ওযূ করাবে, কিন্তু কুলি করাবে না এবং নাকেও পানি দেবে না। তারপর তার ওপর পানি ঢেলে দেবে। আর তার খাটকে বেজোড় সংখ্যায় সুগন্ধি লাগাবে। বরই পাতা বা উশনান ঘাষ ফেলে পানি গরম করে নেবে। যদি এগুলো না হয়, তাহলে শুধু বিশুদ্ধ পানি হলেই চলবে। তার মাথা ও দাড়ি খিতমী নামক সুগন্ধি দ্বারা ধৌত করবে। তারপর বাম পার্শ্বদেশের ওপর কাত করে শোয়ায়ে পানি ও বরই পাতা দ্বারা এমনভাবে গোসল করাবে, যাতে অনুধাবন হয় যে, মৃতের নিচের দিকেও পানি পৌঁছেছে। এরপর তাকে বসাবে এবং নিচের দিকে একটু হেলান দিয়ে রাখবে এবং আস্তে আস্তে পেট মালিশ করবে। যদি এতে পেট হতে কিছু বের হয়, তাহলে উহা ধৌত করবে, পুনঃ গোসল করাতে হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জানাযার পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ بَابُ الْجَنَائِزِ ঃ جَنَائِزُ শব্দটি جَنَازَةٌ-এর বহুবচন। جَنَازَةٌ শব্দটি ج (জীম)-এর ওপর যবর দিয়ে পড়লে অর্থ হবে মৃতদেহ, আর যের দিয়ে পড়লে অর্থ হবে খাট তথা যার ওপর মৃতদেহ রাখা হয়।

মৃত্যুর সময় ব্যক্তিকে রাখার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ إِذَا احْتُضِرَ الرَّجُلُ الخ ঃ মৃত্যু যখন উপস্থিত হয়, তখন সে ব্যক্তিকে ডান কাতে কেবলামুখী করে শায়িত করায়ে কালিমায়ে শাহদাত তালকীন দেবে। তবে চিৎ করে শোয়ায়ে কেবলার দিকে মুখ করিয়ে মাথার নিচে বালিশ দিয়ে মাথা উঁচু করে দেয়া বেশি ভালো। কারণ এতে মুখমন্ডল কেবলামুখী হয় এবং সহজে প্রাণ বায়ু বের হয়ে যায়।

উল্লেখ্য যে, মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার লক্ষণ হল, চক্ষু বসে যাওয়া, নাক বাঁকা হয়ে যাওয়া এবং উর্ধ্বশ্বাস জারী হওয়া।

তালকীনের পদ্ধতি ঃ

قَوْلُهُ لَقِّنِ الشَّهَادَتَيْنِ ঃ রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— "لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ الخ" "অর্থাৎ তোমরা মৃত্যুমুখী ব্যক্তিগণকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তালকীন কর।" এ তালকীন দেয়ার পদ্ধতি সম্পর্কে হিদায়া গ্রন্থকার বলেছেন যে, জীবিত ব্যক্তিবর্গ ঐ ব্যক্তির শিয়রে উচ্চৈঃস্বরে কালিমায়ে তাইয়্যেবা পাঠ করতে থাকবে। আর সে একবার কালিমা পাঠ করলে আর বলবে না। তাকে পড়ার জন্য কখনো আদেশ দেবে না। কেননা এ সময়টা বড়ো সংকটের, আল্লাহ্ জানেন তার মুখ হতে কি বের হয়ে পড়ে।

মৃত্যুবরণ করার পরের কাজ ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا مَاتَ شَدُّوا لِحْيَتَهُ الخ ঃ মৃত্যু হবার সাথে সাথে চোয়াল বেঁধে দেবে, নতুবা তা হা করে থাকবে। এবং চক্ষু বন্ধ করে দেবে, অন্যথা চক্ষু খোলা থাকতে পারে, ফলে মৃত দেহটি ভয়প্রদর্শক হয়ে যেতে পারে। চক্ষু বন্ধ করবার সময় এ দোয়া পড়বে—

بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ يَسِّرْ عَلَيْهِ اَمْرَهُ وَسَهِّلْ عَلَيْهِ مَابَعْدَهُ وَاَسْعِدْهُ بِلِقَائِكَ وَاجْعَلْ مَاخَرَجَ اِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ

গোসল দেয়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا اَرَادُوْا غَسْلَهُ الخ ঃ মৃতকে গোসল দেয়ার সময় তার লজ্জাস্থান ঢেকে রাখবে। হাতে কাপড় লাগিয়ে পর্দার অন্তরালে তার অঙ্গসমূহ ধৌত করতে হবে। যে খাটের ওপর রেখে গোসল দেবে তাতে বেজোড় সংখ্যায় খশবু লাগাবে। কুলি ও নাকে পানি দেয়া ব্যতীত ওযূ করাবে, তারপর বাম কাতে শোয়ায়ে ডান পার্শ্ব গোসল করাবে, তারপর ডান কাতে শোয়ায়ে বাম পার্শ্ব ধৌত করাবে। হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে বিশুদ্ধ পানি ঢালবে, তারপর কুলপাতা যুক্ত ঈষৎ গরম পানি ঢালবে, এরপর কাফুরযুক্ত পানি ঢালবে।

ثُمَّ يُنَشِّفُهُ فِي ثَوْبٍ وَيُدْرِجُ فِي أَكْفَانِهِ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطَ عَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ وَالْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِهِ وَالسُّنَّةُ أَنْ يُكَفَّنَ الرَّجُلُ فِي ثَلٰثَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَلِفَافَةٍ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَوْبَيْنِ جَازَ وَإِذَا أَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ عَلَيْهِ ابْتَدَأُوا بِالْجَانِبِ الْأَيْسَرِ فَأَلْقَوْهُ عَلَيْهِ ثُمَّ بِالْأَيْمَنِ فَإِنْ خَافُوا أَنْ يَنْتَشِرَ الْكَفَنُ عَنْهُ عَقَدُوهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِي خَمْسَةِ أَثْوَابٍ إِزَارٍ وَقَمِيصٍ وَخِمَارٍ وَخِرْقَةٍ تُرْبَطُ بِهَا ثَدْيَاهَا وَلِفَافَةٍ فَإِنِ اقْتَصَرُوا عَلَى ثَلٰثَةِ أَثْوَابٍ جَازَ وَيَكُونُ الْخِمَارُ فَوْقَ الْقَمِيصِ تَحْتَ اللِّفَافَةِ وَيُجْعَلُ شَعْرُهَا عَلَى صَدْرِهَا وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ وَلَا لِحْيَتُهُ وَلَا يُقَصُّ ظُفْرُهُ وَلَا يُقَصُّ شَعْرُهُ وَتُجَمَّرُ الْأَكْفَانُ قَبْلَ أَنْ يُدْرَجَ فِيهَا وِتْرًا فَإِذَا فَرَغُوا مِنْهُ صَلَّوْا عَلَيْهِ وَأَوْلَى النَّاسِ بِالْإِمَامَةِ عَلَيْهِ السُّلْطَانُ إِنْ حَضَرَ فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَيُسْتَحَبُّ تَقْدِيمُ إِمَامِ الْحَيِّ ثُمَّ الْوَلِيُّ فَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ غَيْرُ الْوَلِيِّ وَالسُّلْطَانِ أَعَادَ الْوَلِيُّ وَإِنْ صَلَّى عَلَيْهِ الْوَلِيُّ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُصَلِّيَ أَحَدٌ بَعْدَهُ فَإِنْ دُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ صُلِّيَ عَلَى قَبْرِهِ إِلَى ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ وَلَا يُصَلَّى بَعْدَ ذٰلِكَ وَيَقُومُ الْإِمَامُ بِحِذَاءِ صَدْرِ الْمَيِّتِ -

সরল অনুবাদ ঃ এরপর কোন কাপড় দ্বারা মোছে শুকিয়ে নেবে এবং কাফনের কাপড়ের মধ্যে প্রবেশ করাবে। তার মাথা ও দাড়ির ওপর সুগন্ধি এবং সিজদার স্থানগুলোতে কাফুর লাগাবে। আর পুরুষকে তিন কাপড় দেয়া সুন্নাত— (১) ইযার, (২) কামীস ও (৩) লিফাফা। যদি দুই কাপড়ের ওপর কাফন সীমিত রাখে, তবেও জায়েয হবে। যখন লিফাফা জড়াতে ইচ্ছা করবে, তখন প্রথমে বাম দিক হতে আরম্ভ করবে, বাম দিকের কাফন তার ওপর ঢেলে দেবে, তারপর ডানদিক হতে জড়াবে। যদি কাফন খুলে যাবার ভয় করে, তাহলে উহাকে বেঁধে দেবে। মেয়েলোককে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া হবে— (১) ইযার, (২) কামীস, (৩) ওড়না, (৪) সিনাবন্ধ, যা দ্বারা উভয় স্তন বেঁধে দেয়া হয় এবং (৫) লিফাফা। আর যদি তিন কাপড়ের (ইযার, লিফাফা ও ওড়না) ওপরে সংক্ষেপে করা হয়, তবুও জায়েয হবে। ওড়না কামীসের ওপর এবং লিফাফার নিচে থাকবে। মেয়েলোকের চুল তার বক্ষের ওপর রেখে দেয়া হবে। আর মৃতের চুল এবং দাড়ি আঁচড়াবে না এবং নখ ও চুল কাটবে না। কাফনের ভিতরে প্রবেশ করাবার পূর্বে কাফনের কাপড় গুলোকে বেজোড় সংখ্যায় সুগন্ধি দ্বারা ধোঁয়া দেবে। কাফন পরানো হতে অবসর হলে তার ওপর সালাত পড়বে। জানাযার ইমামের জন্য সর্বোত্তম ব্যক্তি হল বাদশাহ, যদি তিনি উপস্থিত থাকেন। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন, তাহলে মহল্লার ইমামকে অগ্রাধিকার দেয়া মুস্তাহাব। তারপর ওলির মর্যাদা। যদি ওলি এবং বাদশাহ ব্যতীত অন্য কেউ সালাত পড়ায়, তাহলে ওলি পুনরায় সালাত পড়তে পারে। আর যদি ওলি পড়ে থাকে, তাহলে এরপর কারো জন্য দ্বিতীয়বার সালাত পড়া জায়েয নেই। যদি সালাত না পড়ে মৃতকে দাফন করা হয়, তাহলে তিনদিন পর্যন্ত তার কবরের ওপর সালাত পড়া যাবে। তিন দিনের পর সালাত পড়া যাবে না। ইমাম সাহেব মৃতের সিনা বরাবর দাঁড়াবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সুগন্ধি ব্যবহারের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ الْحَنُوطُ الخ ঃ মৃত ব্যক্তির মাথা ও দাড়িতে সুগন্ধি লাগাবে। হানূত নামীয় সুগন্ধি লাগাবে। হানূত নামীয় সুগন্ধি উত্তম। আর সিজদার স্থানসমূহে কাফুর লাগাবে। এ স্থান বা অঙ্গগুলো হল নাক, কান, কপাল, উভয় হাতের তালু, উভয় হাঁটু এবং পা।

পুরুষের কাফনের কাপড়ের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فِى ثَلَاثَةِ اَثْوَابِ الخ ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে পুরুষকে তিন কপড়ে কাফন দেয়া সুন্নত। কেননা রাসূল (সাঃ)-কে তিন কাপড়ে কাফন দেয়া হয়েছে। সে তিন কাপড় হল— (১) ইযার, মাথা হতে পা পর্যন্ত। (২) কামীস, স্কন্ধ হতে পায়ের গিটের ওপর পর্যন্ত বা নিসফে সাক। (৩) লিফাফা, এটা মাথার ওপর হতে পায়ের নিচ পর্যন্ত আবরণী। দুই কাপড় তথা ইযার ও কামীসের ওপর সংক্ষেপ করলেও জায়েয হবে।

পুরুষের কাফন পরানোর নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا اَرَادُوا لَفَّ اللِّفَافَةِ الخ ঃ পুরুষ মৃতের কাফন পরানোর নিয়ম হল, খাটের ওপর প্রথমে লিফাফা তার ওপর ইযার এবং তার ওপর কামীস বিছাবে, তারপর উহার ওপর মৃতদেহকে রাখবে। এরপর কামীস পরিধান করায়ে ইযারের বামদিক তারপর ডানদিক পরাবে। অনুরূপ ভাবে লিফাফাকে জড়ায়ে দেবে।

মহিলাদের কাফন পরানোর নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ الخ ঃ মহিলাদেরকে পাঁচ কাপড়ে কাফন দেয়া সুন্নত। তাদেরকে কাফন পরানোর নিয়ম হল, প্রথমে কামীস পরাবে, তারপর তার চুল গুলোকে দুইভাগে বিভক্ত করে বক্ষের ওপর কামীসের ওপর রাখবে এবং ওড়না দ্বারা মাথাসহ চুলগুলো ঢেকে দেবে, তারপর ইযার পরাবে, এরপর বক্ষবন্ধনী দ্বারা বক্ষ জড়ায়ে দেবে, সর্বশেষ লিফাফা দ্বারা জড়ায়ে দেবে। 'বাহরুর রায়েক' গ্রন্থে আছে যে, বক্ষবন্ধনী লিফাফার ওপরে দেবে। এ সব কাপড়গুলোর দীর্ঘতা হল, ইযার মাথা হতে পা পর্যন্ত, কামীস কাঁধ হতে হাঁটুর নিম্ন পর্যন্ত, ওড়না তিন হাত লম্বা এবং সিনাবন্ধ বক্ষদেশ হতে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা হবে।

চুল আঁচড়ানোর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يُسَرَّحُ شَعْرُ الْمَيِّتِ الخ ঃ মৃতের চুল ও দাড়ি আচড়ানো, কাটা এবং নখ কাটা যাবে না। কেননা অচিরেই তার সবকিছু পঁচে যাবে, কাজেই এ গুলো সৌন্দর্য করার আর কোন প্রয়োজন নেই।

ধোঁয়া দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَتُجَمَّرُ الْاَكْفَانُ الخ ঃ মৃত ব্যক্তির প্রাণ বের হবার সাথে সাথে সুগন্ধির ধোঁয়া দেয়া উচিত। খাটের মধ্যে বেজোড় সংখ্যায় ধোঁয়া দেবে। আর কাফনের কাপড়কে পরাবার পূর্বে বেজোড় সংখ্যায় সুগন্ধি ধোঁয়া দেবে। লাশ কবরের স্থানের দিকে নিতেও ধোঁয়া দেয়া আবশ্যক।

ইমামতের জন্য অগ্রাধিকার ব্যক্তি ঃ

قَوْلُهُ وَاَوْلَى النَّاسِ بِالْاِمَامَةِ الخ ঃ জানাযার সালাতের ইমামতের জন্য অগ্রাধিকার ব্যক্তি হলেন মুসলিম বাদশাহ। যদি তিনি উপস্থিত না থাকেন তাহলে মহল্লার ইমাম অগ্রাধিকার পাবেন। এরপর অন্যরা।

وَالصَّلٰوةُ اَنْ يُّكَبِّرَ تَكْبِيْرَةً يَحْمَدُ اللّٰهَ تَعَالٰى عَقِيْبَهَا ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً وَيُصَلِّى عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً ثَالِثَةً يَدْعُوْ فِيْهَا لِنَفْسِهٖ وَلِلْمَيِّتِ وَلِلْمُسْلِمِيْنَ ثُمَّ يُكَبِّرُ تَكْبِيْرَةً رَابِعَةً وَيُسَلِّمُ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِلَّا فِى التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى وَلَا يُصَلِّى عَلٰى مَيِّتٍ فِىْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ فَاِذَا حَمَلُوْهُ عَلٰى سَرِيْرِهٖ اَخَذُوْا بِقَوَائِمِهِ الْاَرْبَعِ وَيَمْشُوْنَ بِهٖ مُسْرِعِيْنَ دُوْنَ الْخَبَبِ فَاِذَا بَلَغُوْا اِلٰى قَبْرِهٖ كُرِهَ لِلنَّاسِ اَنْ يَّجْلِسُوْا قَبْلَ اَنْ يُّوْضَعَ مِنْ اَعْنَاقِ الرِّجَالِ وَيُحْفَرُ الْقَبْرُ وَيُلْحَدُ وَيُدْخَلُ الْمَيِّتُ مِمَّا يَلِى الْقِبْلَةَ فَاِذَا وُضِعَ فِىْ لَحْدِهٖ قَالَ الَّذِىْ يَضَعُهُ بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَيُوَجِّهُهُ اِلَى الْقِبْلَةِ وَيُحَلُّ الْعُقْدَةُ وَيُسَوِّى اللَّبِنَ عَلَى اللَّحْدِ وَيُكْرَهُ الْاٰجُرُّ وَالْخَشَبُ وَلَا بَأْسَ بِالْقَصَبِ ثُمَّ يُهَالُ التُّرَابُ عَلَيْهِ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ وَلَا يُسَطَّحُ وَمَنِ اسْتَهَلَّ بَعْدَ الْوِلَادَةِ سُمِّىَ وَغُسِّلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَّمْ يَسْتَهِلَّ اُدْرِجَ فِىْ خِرْقَةٍ وَدُفِنَ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ -

সরল অনুবাদ ঃ জানাযার সালাতের নিয়ম হল, প্রথমে তাকবীর বলার পর আল্লাহর প্রশংসা করবে। তারপর দ্বিতীয় তাকবীর বলে নবী কারীম (সাঃ)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ করবে। এরপর তৃতীয় তাকবীর বলে নিজের, মৃতের এবং সকল মুসলমানের জন্য দোয়া করবে। প্রথম তাকবীর ব্যতীত অন্য কোন তাকবীরে হাত উঠাবে না। জুমুআর বা পাঞ্জেগানা মসজিদে মৃতের ওপর জানাযা পড়বে না। যখন লাশ খাটের ওপর ওঠাবে, তখন উহার চার পায়া ধরে তাড়াতাড়ি চলবে, তবে দৌড়াবে না। যখন কবরস্থানে পৌছবে, তখন লাশ মানুষের কাঁধ হতে নামাবার পূর্বে অন্য লোকদের বসা মাকরূহ। কবর খনন করে লহদ করে দেয়া হবে। মৃতকে কেবলামুখী করে কবরে প্রবেশ করাবে। যখন কবরে রাখা হবে, তখন যে ব্যক্তি মৃতকে রাখবে সে "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" পড়বে। আর তাকে কেবলামুখী করে দেবে এবং কাফনের বাঁধন খুলে দেবে। আর কাঁচা ইট লাহদের ওপর দিয়ে সমান করে দেবে, পাকা ইট বা কাঠ বসানো মাকরূহ। বাঁশ দেয়াতে কোন ক্ষতি নেই। তারপর উহার ওপর মাটি ঢেলে দেবে। আর কবরকে (উটের পিঠের ন্যায়) কুঁজো করে দেবে— চৌকোনো করবে না। যে শিশু জন্মের পর শব্দ করে কেঁদে ওঠে তারপর মরে যায়, তার নাম রেখে গোসল দিয়ে তার ওপর জানাযা পড়া হবে। আর যদি না কেঁদে থাকে, তাহলে একখণ্ড কাপড়ের টুকরায় পেঁচিয়ে দাফন করে দেবে। তার ওপর সালাত পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

জানাযা পড়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَالصَّلٰوةُ اَنْ يُّكَبِّرَ الخ ঃ জানাযার সালাতে চার তাকবীর বলতে হবে। প্রত্যেক তাকবীর এক এক রাকাআতের সমতুল্য। হানাফী মাযহাব অনুযায়ী শুধু প্রথম তাকবীরে হাত উঠাবে অন্যান্য তাকবীরে হাত ওঠাবে না। চার তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে। কেননা রাসূল (সাঃ) হতে এরূপ বর্ণিত আছে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, প্রথম তাকবীরের পর ফাতিহা পাঠ করবে। কিন্তু হানাফীদের নিকট জানাযায় কোন কিরাআত নেই, শুধু দোয়াই পড়তে হয়।

মসজিদে জানাযা পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُصَلِّيْ عَلٰى مَيِّتٍ فِيْ مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ ঃ যে মসজিদে জামাআত হয় তাতে জানাযা পড়া মাকরূহে তানযীহী। অন্য বর্ণনা মতে মাকরূহে তাহরীমী। তাই এরূপ মসজিদে জানাযার সালাত পড়া যাবে না। আর মসজিদে জানাযা মাকরূহ হবার কারণ সম্পর্কে ওলামাদের মতভেদ রয়েছে—

কিছু সংখ্যকের মতে, মসজিদসমূহ ফরয আদায়ের জন্য নির্মাণ করা হয়েছে জানাযার জন্য নয়, তাই জানাযা মাকরূহ।

কেউ কেউ বলেন, মৃতদের দেহ ফেটে নাজাসাত বের হয়ে মসজিদ নাপাক ও দুর্গন্ধযুক্ত হবার আশঙ্কা রয়েছে, তাই মাকরূহ।

অতএব, প্রথম কারণ অনুযায়ী যদি লাশ মসজিদের বাহিরে থাকে আর মুসল্লিগণ ভিতরে থাকে, তাহলেও মাকরূহ হবে; আর দ্বিতীয় কারণ অনুযায়ী মাকরূহ হবে না।

খাট মাটিতে রাখার পূর্বে বসার বিধান ঃ

قَوْلُهُ كُرِهَ لِلنَّاسِ اَنْ يَّجْلِسُوْا الخ ঃ লাশের খাট মাটিতে রাখবার পূর্বে লোকজনের বসে যাওয়া মাকরূহ। কেননা, রাসূল (সাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।

কবরের প্রক্রিয়া ঃ

قَوْلُهُ وَيُلْحَدُ ঃ لَحْد (লাহদ) বলে বগলী কবরকে তথা ডান পার্শ্বে মুর্দা রাখার মত জায়গা করে নেয়া। আর شق হল সিন্দুক কবর। এটা হল মধ্যস্থলে মুর্দা রাখার মতো জায়গা করে খনন করা। لَحْد বা বগলী কবর উত্তম। কেননা রাসূল (সাঃ) এরূপ কবরকে পছন্দ করেছেন। তবে মাটি নরম হলে সিন্দুক কবর দিতেও কোন আপত্তি নেই।

কবর দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا وُضِعَ فِىْ لَحْدِهٖ الخ ঃ "বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ" বলে কবরে রাখবে। কবরে কেবলামুখী করে বাঁধন খুলে দেবে। তারপর কাঁচা ইট বা বাঁশ দিয়ে লাহদকে সমান করে দেবে। পাঁকা ইট এবং তক্তা দেয়া মাকরূহ। এরপর মাটি দিয়ে ওপরি অংশকে উটের পিঠের ন্যায় কিছুটা উঁচু করে দিতে হবে, সমান করে দেবে না।

বাচ্চার জানাযার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنِ اسْتَهَلَّ الخ ঃ শিশু জন্মাবার পর উচ্চৈঃস্বরে কেঁদে ওঠলে তথা জীবন্ত বোঝা গেলে নামকরণ করে গোসল দিয়ে জানাযা পড়তে হবে। আর না কাঁদলে তথা জীবন্ত বোঝা না গেলে শুধু একখণ্ড কাপড়ে প্রবেশ করায়ে দাফন করে দেবে। তার ওপর জানাযা পড়তে হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। صَلٰوةُ الْجَنَائِزِ -এর পদ্ধতি উল্লেখ কর।
২। صَلٰوةُ الْجَنَازَةِ -এর হুকুম লিখ? মৃত্যু আসন্ন ব্যক্তির জন্য যা করণীয় তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। মৃত ব্যক্তিকে কাফন পরাবার পদ্ধতি উল্লেখ কর।
৪। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর নিয়ম উল্লেখ কর?
৫। جَنَازَة সালাতে ইমামতের জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি কে?

بَابُ الشَّهِيْدِ

اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ اَوْ وُجِدَ فِى الْمَعْرِكَةِ وَبِهٖ اَثَرُ الْجِرَاحَةِ اَوْ قَتَلَهُ الْمُسْلِمُوْنَ ظُلْمًا وَلَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهٖ دِيَةٌ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلّٰى عَلَيْهِ وَلَا يُغْسَلُ وَاِذَا اسْتُشْهِدَ الْجُنُبُ غُسِلَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ الصَّبِىُّ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُغْسَلَانِ وَلَايُغْسَلُ عَنِ الشَّهِيْدِ دَمُهٗ وَلَايُنْزَعُ عَنْهُ ثِيَابُهٗ وَيُنْزَعُ عَنْهُ الْفَرْوُ وَالْحَشْوُ وَالْخُفُّ وَالسِّلَاحُ وَمَنْ اُرْتُثَّ غُسِلَ وَالْاِرْتِثَاثُ اَنْ يَّأْكُلَ اَوْ يَشْرَبَ اَوْ يُدَاوٰى اَوْ يَبْقٰى حَيًّا حَتّٰى يَمْضِىَ عَلَيْهِ وَقْتُ صَلٰوةٍ وَهُوَ يَعْقِلُ اَوْ يُنْقَلُ مِنَ الْمَعْرِكَةِ حَيًّا وَمَنْ قُتِلَ فِىْ حَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ غُسِلَ وَصُلِّىَ عَلَيْهِ وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ اَوْ قُطَّاعِ الطَّرِيْقِ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ ـ

শহীদের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ শহীদ হল সে ব্যক্তি যাকে মুশরিক (কাফির)গণ হত্যা করেছে, অথবা যুদ্ধের ময়দানে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে এবং তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে, অথবা তাকে মুসলমানগণ অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে অথচ তার কতলের বিনিময়ে কোন দিয়াত ওয়াজিব হয়নি। এরূপ ব্যক্তিকে কাফন পরানো হবে এবং জানাযার সালাত পড়া হবে। আর জুনুবী (যার ওপর গোসল ফরয হয়েছে) ব্যক্তি শহীদ হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তাকে গোসল দেয়া হবে। এমনিভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছেলেকেও (যে শহীদ হয়েছে) ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, এ উভয় শহীদকে গোসল দেয়া হবে না। শহীদের রক্ত ধৌত করা হবে না এবং কাপড়-চোপড়ও খোলা হবে না। তবে চামড়া দ্বারা তৈরি পোশাক, তুলা ভরা কাপড়, মোজা এবং যুদ্ধাস্ত্র খুলে ফেলবে। যুদ্ধে আহত হয়ে পরবর্তীতে মৃত্যুবরণ করলে গোসল দিতে হবে। ইরতিছাছ অর্থ হল, আহত হবার পর কিছু পানাহার অথবা চিকিৎসা করার পর মৃত্যুবরণ করা, অথবা জ্ঞান থাকা অবস্থায় তার ওপর এক ওয়াক্ত সালাতের সময় অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত জীবিত থাকা, অথবা যুদ্ধের ময়দান হতে জীবিত অবস্থায় সরিয়ে আনা হয়। আর কোন ব্যক্তিকে শরীয়তের বিচারে কোন অপরাধের শাস্তিতে অথবা হত্যার বিনিময়ে হত্যা করা হলে গোসল দেয়া হবে এবং তার ওপর জানাযার সালাতও পড়া হবে। রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে অথবা ডাকাতি করতে গিয়ে নিহত হলে তার ওপর জানাযার সালাত পড়া যাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

শহীদের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اَلشَّهِيْدُ مَنْ قَتَلَهُ الْمُشْرِكُوْنَ الخ ঃ প্রকৃত শহীদ ঐ ব্যক্তি, যাকে কোন কাফির বা মুশরিক হত্যা করেছে অথবা যুদ্ধের ময়দানে আহত ও ক্ষত-বিক্ষত অবস্থায় মৃত পাওয়া গেছে, অথবা কোন মুসলমান তাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে এবং এ হত্যার বদলে কোন দিয়াত এবং কিসাস ওয়াজিব হয়নি।

শহীদের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَيُكَفَّنُ وَيُصَلَّى عَلَيْهِ الخ ঃ এরূপ শহীদের হুকুম হল, তাকে গোসল দেয়া যাবে না এবং রক্ত মাখা জামা কাপড়ও খুলবে না, শুধু জানাযা পড়ে এভাবেই দাফন করতে হবে। তবে যুদ্ধের হাতিয়ার, চামড়ার তৈরি ও তুলায় ভরা পোশাক খুলে ফেলতে হবে। রাসূল (সাঃ) তাঁদেরকে গোসল দিতে নিষেধ করেছেন। কেননা তাঁরা আল্লাহর পথে দেয়া রক্ত নিয়েই হাশরে ওঠবে। তবে জুনূবী হলে গোসল দেবে। কেননা হযরত হানযালা (রাঃ)-কে ফেরেশতাগণ গোসল দিয়েছেন। কিন্তু সাহেবাইনের নিকট গোসল দিতে হবে না।

ইরতিছাছের পরিচয় ও বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالْاِرْتِثَاثُ الخ ঃ যে ব্যক্তি যুদ্ধ ক্ষেত্রে আহত হয়ে পরে মৃত্যুবরণ করে তাকে মুরতাছ বলে। এরূপ ব্যক্তিকে গোসল দেয়া হবে।

রাষ্ট্রদ্রোহী ও ডাকাতদের হুকুম ঃ

وَمَنْ قُتِلَ مِنَ الْبُغَاةِ الخ ঃ রাষ্ট্রদ্রোহী হয়ে কিংবা ডাকাতি করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার জানাযা পড়া হবে না, এমনিতেই কবর দিয়ে দেয়া হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। شَهِيْد কাকে বলে? তার হুকুম কি? বর্ণনা কর।

২। مُرْتَثٌ কাকে বলে? তার হুকুম কি? লিখ।

৩। জুনূবী ব্যক্তি শহীদ হলে তাকে গোসল দেয়া হবে কিনা? মতভেদসহ লিখ।

৪। ডাকাত বা রাষ্ট্রদ্রোহী নিহত হলে তার হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

৫। হদ ও কিসাসে নিহত ব্যক্তির হুকুম বর্ণনা কর।

بَابُ الصَّلٰوةِ فِى الْكَعْبَةِ

اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا فَاِنْ صَلَّى الْاِمَامُ فِيْهَا بِجَمَاعَةٍ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهٗ اِلٰى ظَهْرِ الْاِمَامِ جَازَ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ وَجْهَهٗ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ جَازَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ مِنْهُمْ ظَهْرَهٗ اِلٰى وَجْهِ الْاِمَامِ لَمْ تَجُزْ صَلٰوتُهٗ وَاِذَا صَلَّى الْاِمَامُ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تَحَلَّقَ النَّاسُ حَوْلَ الْكَعْبَةِ وَصَلُّوْا بِصَلٰوةِ الْاِمَامِ فَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ اَقْرَبَ اِلَى الْكَعْبَةِ مِنَ الْاِمَامِ جَازَتْ صَلٰوتُهٗ اِذَا لَمْ يَكُنْ فِىْ جَانِبِ الْاِمَامِ وَمَنْ صَلّٰى عَلٰى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ جَازَتْ صَلَاتُهٗ -

কা'বা শরীফের ভিতরে সালাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ কা'বা গৃহের মধ্যে ফরয ও নফল উভয় সালাত পড়া জায়েয। কা'বা গৃহে যদি কোন ইমাম সালাত পড়ায় এতে কিছু মুক্তাদী যদি ইমামের পিঠের দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ায়, তাহলে সালাত জায়েয হবে। এবং কোন ব্যক্তি ইমামের মুখমণ্ডলের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেও সালাত জায়েয হবে, তবে মাকরূহ হবে। আর তাদের কোন ব্যক্তি ইমামের চেহারার দিকে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালে তার সালাত জায়েয হবে না। ইমাম যদি মাসজিদে হারামের মধ্যে সালাত পড়ান, তাহলে মুসল্লিগণ কা'বার চতুর্দিকে বৃত্তাকারে দাঁড়াবে এবং ইমামের সালাতের সাথে (এক্তেদা করে) সালাত পড়বে। আর যদি মুক্তাদীদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি ইমাম অপেক্ষা কা'বা গৃহের প্রাচীরের অধিক নিকটবর্তী হয়, এমন পার্শ্বে যে পার্শ্বে ইমাম দাঁড়ায়নি, তাহলে তার সালাত জায়েয হবে। আর যে ব্যক্তি কা'বা গৃহের ছাদের ওপর সালাত পড়ে তার সালাত জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কা'বা ঘরে কেবলা ও সালাত পড়ার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ اَلصَّلٰوةُ فِى الْكَعْبَةِ جَائِزَةٌ الخ ঃ হানাফীদের মতে কা'বা গৃহের ভিটা আকাশ পর্যন্ত কেবলা- প্রাচীর কেবলা নয়। তাই কা'বার ভিতরে ভিটার কিছু অংশ সামনে রেখে সালাত পড়লে বিশুদ্ধ হবে। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট কা'বা গৃহের প্রাচীর কেবলা, তাই ভিতরে সালাত পড়লে এক দিকের প্রাচীরকে পিছনে রাখতে হয়, যার অর্থ কেবলাকে পিছনে রাখা। তাই তাঁর মতে কা'বার ভিতরে কোন সালাত জায়েয নেই। এমনকি কা'বা গৃহের ছাদে সুতরা (আবরণী) ব্যতীত সালাত জায়েয নেই।

হানাফীদের মতে, কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে ফরয নফল সকল সালাত জায়েয। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, নফল জায়েয ফরয জায়েয নয়। আমাদের দলিল হল, হযরত বিলাল (রাঃ)-এর হাদীস যে, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (সাঃ) কা'বার ভিতর সালাত পড়েছেন। আর আমাদের মতে, কা'বা শরীফের ছাদের ওপরও সালাত পড়া জায়েয।

কা'বা ঘরে জামাআতে সালাত পড়ার নিয়ম ঃ

قَوْلُهٗ فَجَعَلَ بَعْضُهُمْ ظَهْرَهٗ الخ ঃ কা'বা গৃহে জামাআতের সাথে সালাত পড়ার সময় মুক্তাদীর পিঠ ইমামের পিঠের দিকে হলেও সালাত জায়েয হবে এবং ইমামের চেহারার দিকে মুখ করে সালাত পড়লেও মাকরূহের সাথে জায়েয হবে। কেননা কা'বা গৃহের প্রত্যেক অংশই কেবলা। তবে যে ব্যক্তি তার পিঠকে ইমামের চেহারার দিকে করে সালাত পড়বে তার সালাত জায়েয হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী].

১। কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে নামায পড়ার হুকুম বর্ণনা কর।

২। মাসজিদে হারামে নামায পড়ার পদ্ধতি বর্ণনা কর।

كِتَابُ الزَّكٰوةِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ اِذَا مَلَكَ نِصَابًا كَامِلًا مِلْكًا تَامًّا وَحَالَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ وَلَيْسَ عَلٰى صَبِيٍّ وَلَامَجْنُوْنٍ وَلَامُكَاتَبٍ زَكٰوةٌ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيْطٌ بِمَالِهٖ فَلَا زَكٰوةَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ مَالُهٗ اَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ زَكّٰى الْفَاضِلَ اِذَا بَلَغَ نِصَابًا وَلَيْسَ فِيْ دُوْرِ السُّكْنٰى وَثِيَابِ الْبَدَنِ وَاَثَاثِ الْمَنْزِلِ وَدَوَابِّ الرُّكُوْبِ وَعَبِيْدِ الْخِدْمَةِ وَسِلَاحِ الْاِسْتِعْمَالِ زَكٰوةٌ وَلَايَجُوْزُ اَدَاءُ الزَّكٰوةِ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارِنَةٍ لِلْاَدَاءِ اَوْ مُقَارِنَةٍ لِعَزْلِ مِقْدَارِ الْوَاجِبِ وَمَنْ تَصَدَّقَ بِجَمِيْعِ مَالِهٖ وَلَايَنْوِى الزَّكٰوةَ سَقَطَ فَرْضُهَا عَنْهُ -

যাকাতের পর্ব
যাকাত কার ওপর ওয়াজিব

সরল অনুবাদ ঃ যাকাত এমন এক ব্যক্তির ওপর ফরয যে স্বাধীন, মুসলমান, বালেগ এবং জ্ঞানসম্পন্ন, যখন সে পূর্ণনিসাব পরিমাণ সম্পদের পরিপূর্ণ মালিক হবে এবং সে সম্পদের ওপর এক বৎসর সময় অতিবাহিত হয়। আর নাবালেগ, পাগল এবং মুকাতাব গোলামের ওপর যাকাত ফরয নয়। যার সম্পদ পরিমাণ ঋণ আছে তার ওপর যাকাত ফরয নয়, আর যদি তার সম্পদ ঋণ হতে অধিক হয় তাহলে অতিরিক্ত সম্পদের যাকাত দেবে যদি তা নিসাব পরিমাণ হয়। বসবাসের ঘরসমূহে, শরীরের কাপড়ে, গৃহের আসবাবপত্রে, আরোহণের জানোয়ারসমূহে, খিদমতে নিয়োজিত দাসসমূহে আর ব্যবহারের অস্ত্রসমূহে কোন যাকাত নেই। যাকাত আদায় করবার সময় অথবা মূল সম্পদ হতে ওয়াজিব যাকাতের পরিমাণ সম্পদ পৃথক করবার সময় নিয়ত না করলে যাকাত আদায় জায়েয হবে না। আর যে ব্যক্তি নিয়ত ছাড়া সমস্ত সম্পদ সদকা করে দিল তার ওপর যাকাতের ফরয রহিত হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যাকাত ফরয হবার সময় ও শর্ত ঃ

قَوْلُهٗ اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ الخ ঃ যাকাত ইসলামী পঞ্চ স্তম্ভের অন্যতম একটি স্তম্ভ। ঈমান ও সালাতের পরেই যাকাতের বিধান। তাই মুসান্নিফ (রহঃ) সালাতের আলোচনা শেষ করার পর যাকাতের আলোচনা করেছেন। এখানে ওয়াজিব অর্থ–ফরয। দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হবার পূর্বে যাকাত ফরয হয়েছে। যাকাত ফরয হবার ৮টি শর্ত রয়েছে। পাঁচটি যাকাত দাতার জন্য, যথা: (১) স্বাধীন হওয়া, (২) মুসলমান হওয়া, (৩) বালেগ তথা প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া, (৪) আকেল বা জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া, (৫) নিসাব গ্রাস করে নেয় এমন ঋণী না হওয়া।

আর তিনটি শর্ত হল মালের জন্য, যথা—

(১) সম্পদ নিসাব পরিমাণ হওয়া, (২) উহার ওপর পূর্ণ এক বৎসর অতিবাহিত হওয়া এবং (৩) বিচরণশীল পশু বা ব্যবসায়ের মাল হওয়া।

পরিপূর্ণ মালিক হওয়া ঃ

قَوْلُهُ مِلْكًا تَامًّا ঃ যাকাত ফরয হবার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের পরিপূর্ণ মালিক হওয়া আবশ্যক। যে সম্পদের ওপর মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি তার ওপর যাকাত ফরয নয়। আর ঋণী ও মুকাতাব দাসের নিকট যে সম্পদ আছে তার ওপর যাকাত ফরয নয়। কেননা ঋণী ও মুকাতাব উহার মূল সত্তার অধিকারী নয়।

যাকাতের জন্য নিয়ত শর্ত ঃ

قَوْلُهُ اِلَّا بِنِيَّةٍ مُقَارَنَةٍ الخ ঃ যাকাত ইবাদত হবার কারণে অপরাপর ইবাদতের ন্যায় এতেও নিয়ত শর্ত। এ নিয়ত যাকাত দেয়ার সময় অথবা যাকাতের সম্পদ অন্য মাল হতে পৃথক করার সময় পাওয়া যাওয়া আবশ্যক, অন্যথা যাকাত আদায় হবে না। আর যদি সমস্ত সম্পদই দান করে দেয়, তবে নিয়ত ছাড়াই তার ফরয আদায় হয়ে যাবে।

কোন্ কোন্ বস্তুর ওপর যাকাত ফরয নয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِىْ دُوْرِ السُّكْنٰى الخ ঃ থাকার ঘর, পরিধানের বস্ত্র, গৃহের আসবাবপত্র, আরোহণের জানোয়ার, খিদমতের গোলাম এবং ব্যবহারের অস্ত্রসমূহে কোন যাকাত নেই।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১। زَكٰوةٌ-এর শাব্দিক ও আভিধানিক অর্থ লিখ ও যাকাতের ব্যায়ের খাত বর্ণনা কর।

২। যাকাত ওয়াজিব হবার শর্তগুলো বর্ণনা কর।

৩। زَكٰوةٌ কার ওপর ওয়াজিব? লিখ।

৪। কার ওপর زَكٰوةٌ ওয়াজিব নয়? বর্ণনা কর।

৫। কোন্ কোন্ মালের ওপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব।

৬। কোন্ কোন্ মালের ওপর যাকাত নেই।

৭। زَكٰوةٌ আদায়ের জন্য নিয়ত শর্ত কিনা? বর্ণনা কর।

بَابُ زَكٰوةِ الْاِبِلِ

لَيْسَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ خَمْسٍ ذَوْدٍ مِنَ الْاِبِلِ صَدَقَةٌ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى تِسْعٍ فَاِذَا كَانَتْ عَشْرًا فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى اَرْبَعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ خَمْسَ عَشَرَةَ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ اِلٰى تِسْعَ عَشَرَةَ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ اِلٰى اَرْبَعٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّثَلٰثِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّثَلٰثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُوْنٍ اِلٰى خَمْسٍ وَّاَرْبَعِيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّاَرْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ اِلٰى سِتِّيْنَ فَاِذَا بَلَغَتْ اِحْدٰى وَسِتِّيْنَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ اِلٰى خَمْسٍ وَّسَبْعِيْنَ -

উটের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ উট পাঁচটির কম হলে যাকাত দিতে হয় না। অতএব যখন চারণ ভূমিতে বিচরণশীল উট পাঁচটি হয় এবং উহার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তখন নয়টি পর্যন্ত একটি ছাগল যাকাত দিতে হবে; যখন দশটি হবে তখন চৌদ্দটি পর্যন্ত দু'টি বকরি দিতে হবে; তারপর যখন পনেরটি হবে তখন উনিশটি পর্যন্ত তিনটি বকরি দিতে হবে; এরপর যখন বিশটি হবে তখন চব্বিশটি পর্যন্ত চারটি ছাগল, আর যখন পঁচিশটি হবে তখন পঁয়ত্রিশটি পর্যন্ত একটি বিনতে মাখাজ দিতে হবে; তারপর যখন ছয়ত্রিশটি হবে তখন পঁয়তাল্লিশটি পর্যন্ত একটি বিনতে লাবূন; আর যখন ছয়চল্লিশটি হবে তখন ষাটটি পর্যন্ত একটি হিক্কা দিতে হবে; এরপর যখন একষট্টিটি হবে তখন পঁচাত্তর পর্যন্ত একটি জায'আ দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উটের যাকাতের আলোচনা প্রথমে আনার কারণ ঃ

قَوْلُهُ بَابُ زَكٰوةِ الْاِبِلِ ঃ মহানবী (সাঃ) যাকাত আদায়কারীদের নিকট যে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তার মধ্যে সর্ব প্রথম বিচরণশীল জানোয়ারের কথা উল্লেখ ছিল। আর সায়িমা তথা বিচরণশীল জানোয়ারের মধ্যে আরবদের নিকট উট ছিল অতি পরিচিত। তাই গ্রন্থকার সর্বপ্রথম অন্যান্য সায়িমা জানোয়ারের পূর্বে উটের যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন।

সায়িমার পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا سَائِمَةً الخ ঃ সায়িমা বা বিরচণশীল প্রাণী বলতে সেসব প্রাণীকে বলে, যেগুলো মালিকের পরিশ্রম ছাড়া সরকারী বিচরণ ভূমিতে বছরের অধিকাংশ সময় ঘাস খেয়ে থাকে। এ সব পশু মালিক দুধ ও গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য প্রতিপালন করে থাকে। আর যেসব প্রাণী হালচাষ বা বোঝা বহনের জন্য প্রতিপালন করা হয় সেগুলোতে যাকাত দিতে হয় না। আর যেগুলো ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিক্রি করার জন্য পালা হয়, সেগুলোর ওপর ব্যবসায়ের মাল হিসেবে যাকাত ফরয হবে।

বিনতে মাখায, বিনতে লাবূন, হিক্কা ও জায'আর পরিচয় ঃ

بِنْتُ مَخَاضٍ (বিনতে মাখায) ঃ মাখায শব্দের অর্থ হল গর্ভবতী। উট শাবকের বয়স এক বৎসর শেষ হবার পর স্বভাবত উষ্ট্রী গর্ভবতী হয়, তাই যার বয়স এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করেছে তাকে বিনতে মাখায বলা হয়।

بِنْتُ لَبُوْنٍ (বিনতে লাবূন) ঃ দুই বৎসর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বৎসরে পদার্পণ করলে সেই উটের বাচ্চাকে বিনতে লাবূন বলে। যেহেতু লাবূন অর্থ দুধওয়ালী, আর এ সময়ে দুধ প্রচুর হয় বলে এ নামে নামকরণ করা হয়েছে।

حِقَّة (হিক্কা) ঃ হিক্কা শব্দটি মুস্তাহিক্কার অর্থে ব্যবহৃত তথা যোগ্য হওয়া। আর শাবকের বয়স যখন তিন বৎসর হয় তখন বোঝা বহন করার যোগ্য হয়, তাই তিন বৎসর পূর্ণ হয়ে চতুর্থ বৎসরে পড়লে সে উটকে হিক্কা বলা হয়।

جَزَعَة (জায'আ) ঃ জায'আ অর্থ হল, যার দাঁত পড়ে যাওয়ার চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়। আর শাবকের বয়স চার বৎসর অতিবাহিত হবার পর দুধের দাঁত পড়তে শুরু করে, তাই চার বৎসর পূর্ণ হয়ে পাঁচ বৎসরে পড়লে জায'আ বলা হয়।

فَاِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَّسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتَا لَبُوْنٍ اِلٰى تِسْعِيْنَ وَاِذَا كَانَتْ اِحْدٰى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَيَكُوْنُ فِى الْخَمْسِ شَاةٌ مَعَ الْحِقَّتَيْنِ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِى عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ اِلٰى مِائَةٍ وَّخَمْسِيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا ثَلٰثُ حِقَاقٍ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ فَفِى الْخَمْسِ شَاةٌ وَفِى الْعَشْرِ شَاتَانِ وَفِىْ خَمْسَ عَشَرَةَ ثَلٰثُ شِيَاهٍ وَفِىْ عِشْرِيْنَ اَرْبَعُ شِيَاهٍ وَفِىْ خَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ بِنْتُ مَخَاضٍ وَفِى سِتٍّ وَّثَلٰثِيْنَ بِنْتُ لَبُوْنٍ فَاِذَا بَلَغَتْ مِائَةً وَّسِتًّا وَّتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ اِلٰى مِائَتَيْنِ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الْفَرِيْضَةُ اَبَدًا كَمَا تُسْتَأْنَفُ فِى الْخَمْسِيْنَ الَّتِى بَعْدَ الْمِائَةِ وَالْخَمْسِيْنَ وَالْبُخْتُ وَالْعِرَابُ سَوَاءٌ -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন ছিয়াত্তরটি হবে তখন নব্বই পর্যন্ত দু'টি বিনতে লাবূন, তারপর যখন একানব্বইটি হবে তখন একশত বিশ পর্যন্ত দু'টি হিক্কা দিতে হবে। এরপর যাকাতের হিসাব নতুন ভাবে শুরু করা হবে, তাই একশত বিশটির পরে পাঁচটি পর্যন্ত দু'টি হিক্কার সাথে একটি ছাগল, দশটির মধ্যে দু'টি ছাগল, পনেরটিতে তিনটি ছাগল, বিশটিতে চারটি ছাগল এবং পঁচিশটি হলে তথা একশত পঁয়তাল্লিশটি হলে একশত পঞ্চাশ পর্যন্ত দুই হিক্কার সাথে একটি বিনতে মাখাজ দিতে হবে; এরপর একশত পঞ্চাশটি হলে তিনটি হিক্কা দিতে হবে। তারপর নতুন ভাবে যাকাতের হিসাব শুরু করা হবে। পাঁচটিতে একটি ছাগল, দশটিতে দুইটি ছাগল, পনেরটিতে তিনটি ছাগল, বিশটিতে চারটি ছাগল, পঁচিশটিতে একটি বিনতে মাখাজ এবং ছয়ত্রিশটিতে তিনটি হিক্কার সাথে একটি বিনতে লাবূন দিতে হবে; তারপর যখন একশত ছিয়ানব্বইটি হবে তখন দুইশত পর্যন্ত চারটি হিক্কা দেবে। তারপর ফরয যাকাতের হিসাব সর্বদা নতুনভাবে শুরু করা হবে, যেমনিভাবে একশত পঞ্চাশটির পর পঞ্চাশটিতে হিসাব করা হয়। যাকাতের জন্য আরবী ও বুখতী উট একই বরাবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইস্তিনাফের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ ثُمَّ تُسْتَأْنَفُ الخ ঃ উটের যাকাতের মধ্যে তিনটি ইস্তিনাফ রয়েছে। সেগুলো হল—

১. প্রথমটি হল, ১২০ -এর পরে ১৪৫ পর্যন্ত প্রতি পাঁচে দুই হিক্কার সাথে এক বকরি, দশে দুই বকরি, পনেরতে তিন বকরি, বিশে চার বকরি এবং ২৫ (১৪৫) হতে ১৪৯ পর্যন্ত দুই হিক্কার সাথে একটি বিনতে মাখায দিতে হবে, ১৫০ হলে তিন হিক্কা দিতে হবে।

২. দ্বিতীয় ইস্‌তিনাফ হল, ১৫০ হতে ১৯৫ পর্যন্ত প্রতি পাঁচের হিসাবে ধরতে হবে তথা ৫টি (১৫৫) হলে তিন হিক্কার সাথে একটি ছাগল, ১০টি (১৬০) হলে দু'টি ছাগল, ১৫টি (১৬৫) হলে তিনটি ছাগল, ২০টি হলে (১৭০) চার ছাগল, ২৫টি (১৭৫) হলে একটি বিনতে মাখায, ৩৬টি (১৮৬) হলে একটি বিনতে লাবূন, এরপর ১৯৬টি হতে ২০০ পর্যন্ত ৪টি হিক্কা দিতে হবে।

৩. তৃতীয় ইস্‌তিনাফ হল, তৃতীয় ইস্‌তিনাফটি দ্বিতীয় ইস্‌তিনাফেরই মতো প্রথমটির মতো নয়। এভাবে ইস্‌তিনাফ হতেই থাকবে।

বুখতী উটের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ وَالْبُخْتُ الخ ঃ بُخْت শব্দটি بُخْتِي-এর বহুবচন, বুখ্‌তি বুখতে নসর নামক মহা দুর্ধর্ষ বাদশাহের প্রতি সম্বন্ধযুক্ত। আর আরবী ও আজমী উটের মিলনে যে উট জন্ম নেয় তাকে বুখতী উট বলা হয়। কেননা এ ব্যবস্থাটি সর্বপ্রথম বুখতে নসর বাদশাহ-ই করেছিলেন বিধায় এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। যাকাত ওয়াজিব হওয়া ও আদায় করার ব্যাপারে বুখতী ও আরবী উট সমান, কিন্তু শপথের ব্যাপারে সমান নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ (অনুশীলনী)

১। উটের যাকাতের نِصَاب ও مِقْدَار-এর বর্ণনা কর।

২। উটের যাকাতে اِسْتِيْنَاف বা নতুন করে শুরু করা বর্ণনা কর।

৩। بِنْت مَخَاض، بِنْت لَبُوْن، حِقَّه ও جَذَعَة-এর পরিচয় দাও।

بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

لَيْسَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ ثَلٰثِيْنَ مِنَ الْبَقَرِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ ثَلٰثِيْنَ سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ وَفِىْ اَرْبَعِيْنَ مُسِنٌّ اَوْ مُسِنَّةٌ فَاِذَا زَادَتْ عَلَى الْاَرْبَعِيْنَ وَجَبَ فِى الزِّيَادَةِ بِقَدْرِ ذٰلِكَ اِلٰى سِتِّيْنَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَفِى الْوَاحِدَةِ رُبْعُ عَشَرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الْعِشْرِيْنَ نِصْفُ عَشْرِ مُسِنَّةٍ وَفِى الثَّلٰثِ ثَلٰثَةُ اَرْبَاعِ عَشَرَةِ مُسِنَّةٍ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَئَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ سِتِّيْنَ فَيَكُوْنُ فِيْهَا تَبِيْعَانِ اَوْتَبِيْعَتَانِ وَفِىْ سَبْعِيْنَ مُسِنَّةٌ وَتَبِيْعٌ وَفِىْ ثَمَانِيْنَ مُسِنَّتَانِ وَفِىْ تِسْعِيْنَ ثَلٰثَةُ اَتْبِعَةٍ وَفِىْ مِائَةٍ تَبِيْعَتَانِ وَمُسِنَّةٌ وَعَلٰى هٰذَا يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ فِىْ كُلِّ عَشْرٍ مِنْ تَبِيْعٍ اِلٰى مُسِنَّةٍ وَالْجَوَامِيْسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ -

গরুর যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ত্রিশটি গরুর কমের মধ্যে কোন যাকাত নেই। অতঃপর যখন বিচরণশীল ত্রিশটি গরু হয়ে তার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত হয়, তখন এদের মধ্যে একটি تَبِيْعٌ (তাবী') অথবা تَبِيْعَةٌ (তাবী'আহ) ওয়াজিব হবে। আর চল্লিশটি হলে একটি مُسِنٌّ (মুসিন) অথবা مُسِنَّةٌ (মুসিন্নাহ) ওয়াজিব হবে; অতঃপর চল্লিশের ওপর বৃদ্ধি পেলে ষাট পর্যন্ত অতিরিক্তের পরিমাণ হিসেবে আবশ্যক হবে। কাজেই একটিতে (চল্লিশের ওপর একটি বেশি হলে) এক মুসিন্নার চল্লিশের একভাগ, আর দু'টিতে এক মুসিন্নার চল্লিশের দুই ভাগ, আর তিনটিতে এক মুসিন্নার চল্লিশ ভাগের তিনভাগ ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, চল্লিশের পর ষাট না হওয়া পর্যন্ত অতিরিক্তের ওপর কোন যাকাত নেই। অতএব ষাটটি হলে দুই تَبِيْعٌ অথবা تَبِيْعَةٌ ওয়াজিব হবে, আর সত্তরটিতে একটি মুসিন্নাহ এবং একটি তাবী'আহ ওয়াজিব হবে, আশিটিতে দু'টি মুসিন্নাহ এবং নব্বইটিতে তিনটি তাবী'আহ; আর একশতটিতে দু'টি তাবী'আহ এবং একটি মুসিন ওয়াজিব হবে। আর এ ভাবেই প্রত্যেক দশে তাবী'আহ হতে মুসিন্নাহ এর দিকে যাকাতের ফরয পরিবর্তিত হতে থাকবে। যাকাতের ব্যাপারে গরু ও মহিষ এক বরাবর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তাবী' ও মুসিন-এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ تَبِيْعٌ اَوْتَبِيْعَةٌ الخ ঃ গরুর নর বাচ্চা পূর্ণ এক বৎসর বয়স হলে تَبِيْعٌ (তাবী') বলে, আর পূর্ণ এক বৎসর বয়স্ক মাদী বাচ্চাকে تَبِيْعَةٌ (তাবী'আহ) বলে। এ ভাবে যে নর বাচ্চা পূর্ণ দুই বৎসর বয়স হয়, তাকে مُسِنٌّ (মুসিন) বলে, আর যে মাদী বাচ্চা পূর্ণ দুই বৎসর বয়স হয়, তাকে مُسِنَّةٌ (মুসিন্নাহ) বলে।

চল্লিশটির ওপর যাকাত নিয়ে মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ وَلَا شَئَ فِى الزِّيَادَةِ الخ ঃ চল্লিশ হতে ষাটটির মধ্যকার যাকাত নিয়ে আবূ হানীফা ও সাহেবাইনের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়—

ইমাম সাহেবের মতে, চল্লিশের ওপর একটি হলে মুসিন্নার চল্লিশের একভাগ, দু'টি হলে দুইভাগ, তিনটি হলে তিনভাগ, আর চারটি হলে চারভাগ, এ হিসাবে যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে সাহেবাইনের নিকট চল্লিশের ওপর ষাট পর্যন্ত কোন যাকাত দিতে হবে না। সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া।

যাকাতের পরিমাণ পরিবর্তিত হবার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ يَتَغَيَّرُ الْفَرْضُ الخ ঃ একশতের পর প্রতি ১০টিতে তাবী' হতে মুসিন্নায় পরিবর্তিত হবে তথা একশত দশটি হলে এক তাবী' ও দুই মুসিন্নাহ, একশত বিশটি হলে তিনটি মুসিন্নাহ অথবা চারটি তাবী' ওয়াজিব হবে; একশত ত্রিশটিতে তিনটি মুসিন্নাহ এবং একটি তাবী' ওয়াজিব হবে; আর একশত চল্লিশটিতে চারটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে এবং একশত ষাটটিতে পাঁচটি মুসিন্নাহ ওয়াজিব হবে। এভাবে প্রত্যেক দশে বাড়তে থাকবে।

যাকাতের বেলায় গরু ও মহিষ এক সমান ঃ

قَوْلُهُ وَالْجَوَامِيْسُ وَالْبَقَرُ سَوَاءٌ ঃ যাকাত গরুতে যে হিসাবে দেয়া হয় মহিষে অনুরূপ দেয়া হবে। যাকাত ও কুরবানীতে গরু এবং মহিষের হুকুম একই, কিন্তু শপথের বেলায় এক নয়; যেমন– গরুর গোশত খাবে না বলে শপথ করার পর মহিষের গোশত খেলে শপথ ভঙ্গকারী হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। গরু-মহিষের زَكٰوة-এর نِصَاب ও مِقْدَار বর্ণনা কর।

২। مُسِنّ ও تَبِيْع এর পরিচয় দাও।

بَابُ صَدَقَةِ الْغَنَمِ

لَيْسَ فِىْ اَقَلِّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً سَائِمَةً وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا شَاةٌ اِلٰى مِائَةٍ وَّعِشْرِيْنَ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا شَاتَانِ اِلٰى مِائَتَيْنِ فَاِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيْهَا ثَلٰثُ شِيَاهٍ فَاِذَا بَلَغَتْ اَرْبَعَ مِائَةٍ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَالضَّانُ وَالْمَعْزُ سَوَاءٌ -

---

ছাগলের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ চল্লিশটি ছাগলের কমের মধ্যে কোন যাকাত নেই। অতঃপর যখন বিচরণশীল চল্লিশটি ছাগল হবে এবং তার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত হবে তখন এ গুলোর ওপর একশত বিশ পর্যন্ত একটি ছাগল ওয়াজিব হবে; তারপর যখন একটি বেড়ে (তথা ১২১ টি হয়ে) যাবে, তখন তাতে দুইশত পর্যন্ত দু'টি বকরি আবশ্যক হবে; এরপর যখন একটি বেড়ে যাবে, (২০১টি হবে) তখন তিনটি বকরি ওয়াজিব হবে; তারপর যখন চারশতে পৌঁছে যাবে, তখন চারটি ছাগল ওয়াজিব হবে। এরপর প্রতি শতে একটি করে ছাগল ওয়াজিব হবে। আর দুম্বা ও ছাগল যাকাতের ব্যাপারে এক সমান।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ছাগলের যাকাতের নিসাবের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ فَاِذَا كَانَتْ اَرْبَعِيْنَ شَاةً الخ ঃ ছাগলের নিসাব হল চল্লিশটি, এর কমের মধ্যে যাকাত ফরয হয় না। ৪০ হতে ১২০ পর্যন্ত একটি, ১২১ হতে ২০০ পর্যন্ত দু'টি, ২০১ হতে ৩৯৯ পর্যন্ত তিনটি, আর ৪০০ হলে ৪টি ছাগল ওয়াজিব হবে। এরপর প্রত্যেক শতে একটি করে বাড়তে থাকবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। ছাগলের যাকাতের نِصَاب উল্লেখ কর।

২। ছাগলের যাকাতের পদ্ধতি বর্ণনা কর।

بَابُ زَكٰوةِ الْخَيْلِ

إِذَا كَانَتِ الْخَيْلُ سَائِمَةً ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَصَاحِبُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَعْطٰى مِنْ كُلِّ فَرَسٍ دِيْنَارًا وَإِنْ شَاءَ قَوَّمَهَا فَأَعْطٰى عَنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ فِيْ ذُكُوْرِهَا مُنْفَرِدَةً زَكٰوةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَازَكٰوةَ فِي الْخَيْلِ وَلَاشَيْءَ فِي الْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ لِلتِّجَارَةِ وَلَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ وَالْحُمْلَانِ وَالْعَجَاجِيْلِ زَكٰوةٌ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَعَهَا كِبَارٌ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى تَجِبُ فِيْهَا وَاحِدَةٌ مِنْهَا -

ঘোড়ার যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যখন কারো নিকট নর ও মাদী সায়িমা ঘোড়া থাকে আর উহার ওপর এক বৎসর অতিক্রম করে তখন উহাদের মালিকের ইচ্ছাধীন থাকবে, সে ইচ্ছা করলে প্রতি ঘোড়ার যাকাত এক দীনার দেবে, অথবা উহার মূল্য নির্ধারণ করে প্রতি দুইশত দিরহামে পাঁচ দিরহাম করে যাকাত দেবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট শুধু নর ঘোড়ার মধ্যে যাকাত নেই। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, ঘোড়া, খচ্চর ও গাধার ওপর কোন যাকাত নেই, কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য হলে যাকাত আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, উটের বাচ্চা, ছাগলের ছানা ও গরুর বাছুরের সাথে বড় জানোয়ার না থাকলে যাকাত ওয়াজিব নয়। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, উহাদের মধ্যে একটি বাচ্চা ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঘোড়ার যাকাতের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ بَابُ زَكٰوةِ الْخَيْلِ ঃ সাহেবাইনের নিকট ঘোড়ার মধ্যে যাকাত নেই। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে— মুসলমানদের গোলাম ও ঘোড়ার কোন যাকাত নেই। ইমাম শাফেয়ী, মালিক ও আহমদ (রহঃ)-এরও এই মত. তবে ব্যবসার ঘোড়ার ওপর সর্ব সম্মতিক্রমে যাকত ওয়াজিব।

ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট বিচরণশীল ঘোড়ার ওপর যাকাত রয়েছে, তবে শর্ত হল নর ও মাদী ঘোড়া এক সাথে থাকতে হবে। আবার শুধু মাদীর ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। তবে সাহেবাইনের কথার ওপর ফতোয়া বলে ইমাম ত্বাহাবীসহ অনেকে উল্লেখ করেছেন।

গাধা ও খচ্চরের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا شَيْءَ فِي الْبِغَالِ الخ ঃ খচ্চর ও গাধার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়, তবে ব্যবসার জন্য হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। কেননা মহানবী (সাঃ) বলেছেন যে, খচ্চর এবং গাধার ব্যাপারে আমার ওপর কোন কিছু নাযিল হয়নি।

উট, ছাগল ও গরু শাবকের যাকাতের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ لَيْسَ فِي الْفُصْلَانِ الخ ঃ فُصْلَان শব্দটি فَصِيْلٌ-এর বহুবচন, অর্থ হল, উট শাবক। حُمْلَان টি حَمَلٌ-এর বহুবচন; এর অর্থ ছাগল ছানা। আর عَجَاجِيْل টি عِجْلٌ-এর বহুবচন; অর্থ হল গরুর বাছুর। এ সব বড় জানোয়ারের সাথে থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে, আর পৃথক থাকলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, যাকাত ওয়াজিব হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সকল বাচ্চার পক্ষ হতে একটি বাচ্চা যাকাত হিসেবে দিতে হবে।

وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ مُسِنٌّ فَلَمْ يُوجَدْ اَخَذَ الْمُصَدِّقُ اَعْلٰى مِنْهَا وَرَدَّ الْفَضْلَ اَوْ اَخَذَ دُوْنَهَا وَاَخَذَ الْفَضْلَ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ فِى الزَّكٰوةِ وَلَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ وَالْحَوَامِلِ وَالْعَلُوْفَةِ زَكٰوةٌ وَلَايَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ خِيَارَ الْمَالِ وَلَارَذَالَتَهُ وَيَأْخُذُ الْوَسَطَ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ فَاسْتَفَادَ فِىْ اَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ جِنْسِهٖ ضَمَّهُ اِلٰى مَالِهٖ وَزَكَّاهُ بِهٖ وَالسَّائِمَةُ هِىَ الَّتِىْ تَكْتَفِىْ بِالرَّعْىِ فِىْ اَكْثَرِ الْحَوْلِ فَاِنْ عَلَفَهَا نِصْفَ الْحَوْلِ اَوْ اَكْثَرَ فَلَا زَكٰوةَ فِيْهَا وَالزَّكٰوةُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِى النِّصَابِ دُوْنَ الْعَفْوِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ وَ زُفَرُ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَجِبُ فِيْهِمَا وَاِذَا هَلَكَ الْمَالُ بَعْدَ وُجُوْبِ الزَّكٰوةِ سَقَطَتْ وَاِنْ قَدَّمَ الزَّكٰوةَ عَلَى الْحَوْلِ هُوَ مَالِكٌ لِلنِّصَابِ جَازَ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যার ওপর মুসিন দেয়া ওয়াজিব হয়েছে অথচ মুসিন (তার নিকট) পাওয়া যায়নি, তাহলে যাকাত আদায়কারী উহা হতে উত্তম জানোয়ার গ্রহণ করবে এবং অতিরিক্ত মূল্য মালিককে ফেরত দিয়ে দেবে, অথবা তা হতে নিকৃষ্ট জানোয়ার আদায় করে অবশিষ্ট মূল্য মালিক হতে গ্রহণ করবে। যাকাতের মধ্যে জানোয়ারের পরিবর্তে মূল্য দেয়া জায়েয আছে। কৃষি কাজের জানোয়ার, বোঝা বহনকারী জানোয়ার ও মালিক যে জানোয়ারের ঘাষ খাওয়ায় তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। যাকাত আদায়কারী একেবারে উত্তম বা একেবারে নিকৃষ্ট মাল গ্রহণ করবে না; বরং মধ্যম ধরনের মাল গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক ছিল আর বৎসরের মাঝখানে উহার সাথে একই প্রকারের কিছু সম্পদ লাভ করল, তাহলে লাভকৃত মালকে তার পূর্ব মালের সাথে মিলিয়ে সম্পূর্ণ মালের যাকাত দেবে। আর সায়িমা সেসব জন্তুকে বলে, যেগুলো বছরের অধিকাংশ সময় (সরকারী বিচরণ ভূমিতে) চরে বেড়ায়। যদি বৎসরের অর্ধেক বা ততোধিক সময় মালিক উহার খাবার যোগায়, তাহলে উহাদের যাকাত দিতে হবে না। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, নিসাবের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে, অতিরিক্তের ওপর ওয়াজিব হবে না। ইমাম মুহাম্মদ ও যুফার (রহঃ) বলেন, উভয়ের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। যাকাত ওয়াজিব হবার পর মাল ধ্বংস হয়ে গেলে যাকাত রহিত হয়ে যায়। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বে যাকাত প্রদান করলে জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

যাকাতে মালের বিপরীত মূল্য দেয়া জায়েয ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ دَفْعُ الْقِيْمَةِ الخ ঃ যে প্রাণী বা যে সম্পদ যাকাত বাবদ ওয়াজিব হয় উহার পরিবর্তে মূল্য দেয়াও জায়েয। কেননা মালের দিক দিয়ে মূল্য ও মূলবস্তু এক বরাবর। আর পবিত্র কুরআনে শর্তহীন ভাবে বলা হয়েছে যে, خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ الخ এখানে যাকাত লওয়ার কথা বলা হয়েছে, তাই যে কোনটি লওয়া যেতে পারে।

কাজে নিয়োজিত পশুর যাকাত নেই ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِى الْعَوَامِلِ الخ ঃ عَوَامِل শব্দটি عَامِلَةٌ-এর বহুবচন; অর্থ হল কর্মকার। যে পশু দ্বারা ক্ষেত-খামার বা পানি ওঠানোর জন্য মালিক লালন-পালন করে থাকে, তাকে عَامِلَة বলে।

حَوَامِلْ টি এটি حَامِلَةٌ -এর বহুবচন; অর্থ হল বহনকারী। যে জানোয়ার দ্বারা মালিক বোঝা বহন করায়, তাকে حَامِلَة বলে।

عَلُوفَة বলা হয় ঐ সব পশুকে যেগুলো মালিক নিজে খাদ্য পানীয় দিয়ে লালন-পালন করে। এসব প্রাণীর ওপর যাকাত ফরয নয়।

যাকাত গ্রহণের পদ্ধতি ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَأْخُذُ الْمُصَدِّقُ الخ ঃ যাকাত আদায়কারী বেছে বেছে উৎকৃষ্ট সম্পদ গ্রহণ করবে না। কেননা এতে মালিকের প্রতি জুলুম করা হয়। আর মহানবী (সাঃ) উৎকৃষ্ট মাল যাকাত হিসেবে গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। আর নিকৃষ্ট বা নিম্নমানের সম্পদও গ্রহণ করবে না। কেননা এতে বাইতুল মালের ক্ষতি হয়।

লাভকৃত সম্পদের যাকাত ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ كَانَ لَهُ نِصَابٌ الخ ঃ নিসাব পরিমাণ সম্পদের অধিকারী ব্যক্তি যদি বছরের মধ্যখানে সে জাতীয় কিছু সম্পদ লাভ করে, তাহলে লাভকৃত সম্পদের বৎসর পূর্তি না হলেও যাকাত দিতে হবে, যেমন– কারো নিসাব পরিমাণ উট ছিল, সে বছরের মাঝে আরো কিছু উট লাভ করল, তাহলে সবগুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি সে জাতীয় না হয়ে অন্য জাতীয় হয়, তাহলে লাভকৃতের ওপর যাকাত আবশ্যক হবে না, যেমন— তার নিসাব পরিমাণ সম্পদ হল উট, কিন্তু সে লাভ করল গরু।

মাল ধ্বংস হওয়া অবস্থায় যাকাতের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا هَلَكَ الْمَالُ الخ ঃ যাকাত ওয়াজিব হবার পর সম্পূর্ণ সম্পদ ধ্বংস হয়ে গেলে তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে। পুরো সম্পদ ধ্বংস না হয়ে যদি কিছু ধ্বংস হয়, তবে যেটুকু ধ্বংস হবে তার যাকাত রহিত হয়ে যাবে আর যেটুকু থাকবে তার যাকাত দিতে হবে।

পূর্বে যাকাত দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ قَدَّمَ الزَّكٰوةَ الخ ঃ নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বৎসর পূর্ণ হবার পূর্বেও যাকাত দেয়া জায়েয আছে এবং যাকাত দিলে তা আদায় হয়ে যাবে, তবে নিসাব পূর্ণ হবার পূর্বে যাকাত দিয়ে নিসাব পূর্ণ হলে পুনরায় দিতে হবে, পূর্বের যাকাত নফল হিসাবে গণ্য হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। ঘোড়ার زَكٰوة প্রসঙ্গে ইমামদের মতভেদ উল্লেখ কর।

২। গাধা ও খচ্চরের زَكٰوة ওয়াজিব কিনা?

৩। سَائِمَة -এর অর্থ কি? عَفْو -এর মধ্যে زَكٰوة ওয়াজিব কিনা?

৪। عَوَامِل ، حَوَامِل ও عَلُوفَة -এর মধ্যে زَكٰوة ওয়াজিব কিনা?

৫। فُصْلَان، حُمْلَان ও عَجَاجِيْل-এর মধ্যে যাকাত ওয়াজিব কিনা?

৬। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক বৎসরের মধ্যখানে কিছু লাভ পেলে তার হুকুম কি?

بَابُ زَكٰوةِ الْفِضَّةِ

لَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَاشَئَ فِى الزِّيَادَةِ حَتّٰى تَبْلُغَ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا فَيَكُوْنَ فِيْهَا دِرْهَمٌ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى مَازَادَ عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَزَكٰوتُهٗ بِحِسَابِهٖ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الْوَرَقِ الْفِضَّةُ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْفِضَّةِ وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْغِشُّ فَهُوَ فِىْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ وَيُعْتَبَرُ اَنْ تَبْلُغَ قِيْمَتُهَا نِصَابًا -

রৌপ্যের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ দুইশত দিরহামের কমে (রৌপ্যে) কোন যাকাত নেই। আর যখন দুইশত দিরহাম হবে এবং উহার ওপর এক বৎসর অতিবাহিত হবে, তখন উহাতে পাঁচ দিরহাম ওয়াজিব হবে, এরপর চল্লিশ দিরহাম পৌঁছা পর্যন্ত অতিরিক্ত গুলোতে কোন যাকাত নেই, অতঃপর চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম ওয়াজিব হবে। এরপর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, প্রত্যেক চল্লিশ দিরহামে এক দিরহাম করে ওয়াজিব হবে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, দুইশত দিরহামের ওপর যে পরিমাণ বেশি হয়, বেশির অনুয়ায়ী উহার ওপরও যাকাত ওয়াজিব হবে। আর যদি রৌপ্যের মুদ্রাতে রৌপ্যের ভাগ বেশি হয়, তাহলে তা রৌপ্যের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যদি তাতে খাদ্যের ভাগ বেশি হয়, তাহলে তা আসবাবপত্রের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং উহার মূল্য নিসাব পরিমাণ পৌঁছলে যাকাতের জন্য গণ্য করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

রৌপ্যের যাকাত ঃ

قَوْلُهٗ لَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ الخ ঃ রৌপ্যের নিসাবের পরিমাণ হল পাঁচ আওকিয়া। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন যে, পাঁচ আওকিয়ার কমে কোন যাকাত নেই। এক আওকিয়ার পরিমাণ হল চল্লিশ দিরহাম। অতএব পাঁচ আওকিয়ায় হবে দুইশত দিরহাম। ইংরেজি হিসাবে এক আওকিয়ায় সাড়ে দশ তোলা। অতএব পাঁচ আওকিয়া বা ২০০ দিরহামে হবে সাড়ে বায়ান্ন তোলা। কাজেই কারো নিকট ৫২ $\frac{১}{২}$ তোলা পরিমাণ রৌপ্য থাকলে এবং বৎসর পূর্ণ হলে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে যাকাত দিতে হবে।

দুইশত দিরহামের বেশি হলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَلَاشَئَ فِى الزِّيَادَةِ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, দুইশত দিরহামের ওপরে ৪০ দিরহাম হওয়া পর্যন্ত কোন যাকাত নেই। ২৪০ হলেই আরো এক দিরহাম মোট ৬ দিরহাম ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, দুইশত দিরহামের ওপর যে পরিমাণ বেশি হবে সে অনুযায়ী যাকাত ওয়াজিব হবে তথা এক দিরহাম বেশি হলে ৫ দিরহাম ও এক দিরহামের চল্লিশ ভাগের একভাগ দেবে।

রৌপ্যের মুদ্রার সাথে অন্য বস্তু মিশ্রিত থাকলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ الخ ঃ মুদ্রার মধ্যে যদি রৌপ্যের ভাগ বেশি হয়, তবে উহাকে রৌপ্য ধরতে হবে। এটা নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দিতে হবে। আর যদি রৌপ্যের ভাগ কম হয় এবং খাদ বেশি হয়, তাহলে উহাকে রৌপ্য না ধরে মাল হিসেবে গণ্য করা হবে এবং নিসাব পরিমাণ হলে যাকাত দেবে, অন্যথা যাকাত ওয়াজিব হবে না।

اَلتَّمَارِيْنُ [অনুশীলনী]

১। রৌপ্যের যাকাতের نِصَاب ও مِقْدَار উল্লেখ কর।
২। দুইশত দিহরহামের ওপরে হলে যাকাত প্রদানের নিয়ম বর্ণনা কর।

بَابُ زَكٰوةِ الذَّهَبِ

لَيْسَ فِىْ مَا دُوْنَ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنَ الذَّهَبِ صَدَقَةٌ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ مِثْقَالٍ ثُمَّ فِىْ كُلِّ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ قِيْرَاطَانِ وَلَيْسَ فِىْ مَادُوْنَ اَرْبَعَةِ مَثَاقِيْلَ صَدَقَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا مَازَادَ عَلَى الْعِشْرِيْنَ فَزَكٰوتُهُ بِحِسَابِهٖ وَفِىْ تِبْرِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَحُلِيِّهِمَا وَالْاٰنِيَةِ مِنْهُمَا زَكٰوةٌ -

স্বর্ণের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ বিশ মিসকালের কম পরিমাণ স্বর্ণে যাকাত আবশ্যক নয়। যখন কারো নিকট বিশ মিসকাল থাকে আর উহার ওপর এক বৎসর অতিক্রম করে, তখন উহাতে অর্ধ মিসকাল স্বর্ণ যাকাত দিতে হবে। এরপর প্রতি চার মিসকালে দুই কিরাত ওয়াজিব হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, চার মিসকালের কম হলে যাকাত দিতে হয় না। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, বিশ মিসকালের বেশি যা হয় উহার যাকাত হিসাব অনুযায়ী দিতে হবে। আর স্বর্ণ রৌপ্যের পাত, উহাদের অলঙ্কার এবং পাত্রের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্বর্ণের নিসাব ও উহার যাকাত ঃ

قَوْلُهٗ فَاِذَا كَانَتْ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا الخ ঃ স্বর্ণের নিসাব হল বিশ মিসকাল। বিশ মিসকালের কমে যাকাত ওয়াজিব হয় না। এক মিসকালের ওজন হল, সাড়ে চার মাশা এবং বারো মাশায় এক তোলা। অতএব, বিশ মিসকালের ওজন হল সাড়ে সাত তোলা।

উল্লেখ্য যে, তখনকার যুগে এক মিসকাল স্বর্ণের মূল্য ছিল দশ দিরহাম। এ হিসাবে ২০ মিসকালের মূল্য ছিল ২০০ দিরহাম। এতে বোঝা গেল যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের যাকাত মূল্যমানের দিক থেকে এক সমান ছিল। কাজেই এখন কেউ ৭ $\frac{১}{২}$ তোলা স্বর্ণের মালিক হয়ে এক বৎসর অতিক্রম করলে অর্ধ মিসকাল যাকাত দিতে হবে। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

وَمِنْ كُلِّ عِشْرِيْنَ مِثْقَالًا مِنْ ذَهَبٍ نِصْفُ مِثْقَالٍ

বিশ মিসকালের অতিরিক্তের যাকাত সম্পর্কে ওলামাদের মতান্তর ঃ

قَوْلُهٗ وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنَ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ২০ মিসকালের অতিরিক্ত চার মিসকাল না হওয়া পর্যন্ত সে অতিরিক্তের ওপর কোন যাকাত দিতে হবে না, আর সাহেবাইনের মতে, বিশ মিসকালের ওপর যাই হোক সে পরিমাণ অনুযায়ী যাকাত দিতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। স্বর্ণের যাকাতের نِصَاب ও مِقْدَار বর্ণনা কর।

২। ব্যবহৃত অলংকারের ওপর যাকাতের বিধান বর্ণনা কর।

بَابُ زَكٰوةِ الْعُرُوْضِ

اَلزَّكٰوةُ وَاجِبَةٌ فِىْ عُرُوْضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَاكَانَتْ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهَا نِصَابًا مِنَ الْوَرَقِ اَوِ الذَّهَبِ يُقَوِّمُهَا بِمَا هُوَ اَنْفَعُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِيْنَ مِنْهُمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُقَوِّمُ مِمَّا اِشْتَرَاهُ بِهٖ فَاِنْ اِشْتَرَاهُ بِغَيْرِ الثَّمَنِ يُقَوِّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ فِى الْمِصْرِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِغَالِبِ النَّقْدِ فِى الْمِصْرِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ وَاِذَا كَانَ النِّصَابُ كَامِلًا فِىْ طَرَفَيِ الْحَوْلِ فَنُقْصَانُهُ فِيْمَا بَيْنَ ذٰلِكَ لَايُسْقِطُ الزَّكٰوةَ وَيُضَمُّ قِيْمَةُ الْعُرُوْضِ اِلَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَكَذٰلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ حَتّٰى يُتِمَّ النِّصَابُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايُضَمُّ الذَّهَبُ اِلَى الْفِضَّةِ بِالْقِيْمَةِ وَيُضَمُّ بِالْاَجْزَاءِ -

আসবাবপত্রের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ব্যবসার আসবাবপত্রের যাকাত দেয়া ওয়াজিব, তা যে প্রকারের হোক না কেন; যখন উহার মূল্য স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ হয়। আসবাবপত্রকে স্বর্ণ-রৌপ্য হতে যার সাথে মূল্যমান নির্ধারণ করলে ফকির মিসকিনের বেশি উপকার হয় উহার সাথে মূল্য নির্ধারণ করবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যার (স্বর্ণ-রৌপ্য) দ্বারা সে উহা ক্রয় করেছে উহার দাম ধরবে। আর যদি মূল্য (স্বর্ণ-রৌপ্য) ছাড়া ক্রয় করে থাকে, তাহলে শহরে অধিক প্রচলিত মুদ্রার দ্বারা মূল্যমান নির্ধারণ করবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, সর্বাবস্থায়ই শহরে প্রচলিত মুদ্রা দ্বারা নির্ধারণ করবে।

আর যদি নিসাব বছরের প্রথম ও শেষে পরিপূর্ণ থাকে, তাহলে বছরের মাঝে নিসাব কমে গেলে তাতে যাকাত রহিত হবে না। আসবাবপত্রের মূল্য স্বর্ণ-রৌপ্যের সাথে মিলানো হবে। এমনিভাবে স্বর্ণকে রৌপ্যের সাথে মূল্য করে মিলানো হবে, যাতে নিসাব পূর্ণ হয়ে যায়। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মত, আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, স্বর্ণকে মূল্য ধরে রৌপ্যের সাথে মিলানো হবে না; বরং অংশ হিসাবে মিলানো হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আসবাবপত্রের যাকাত ঃ

قَوْلُهُ كَائِنَةً مَا كَانَتْ الخ ঃ ব্যবসার মাল যে ধরনেরই হোক না কেন উহা স্বর্ণ বা রৌপ্যের নিসাব পরিমাণ মূল্যমানের সমমান হলে যাকাত ওয়াজিব হবে, অর্থাৎ যে সকল মালে যাকাত নেই ঐ সব মালও যদি ব্যবসার নিমিত্ত হয়, তাহলে তাতেও যাকাত আবশ্যক হবে।

মালের মূল্য নির্ধারণে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ يُقَوِّمُ بِالنَّقْدِ الْغَالِبِ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, আসবাবপত্রকে স্বর্ণ বা রৌপ্যের যেটি দ্বারা ক্রয় করেছে তার সাথে মিলিয়ে মূল্যমান নির্ধারণ করবে। আর সোনা-রূপা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ক্রয় করে থাকলে শহরে স্বর্ণ বা রৌপ্যের যেটির প্রচলন অধিক তার মূল্যমান নির্ধারণ করবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, সর্বাবস্থায় শহরে সর্বাধিক প্রচলিত (স্বর্ণ বা রৌপ্যের) মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের মূল্য একত্র করণের হুকুম ঃ

وَكَذٰلِكَ يُضَمُّ الذَّهَبُ الخ ঃ স্বর্ণ এবং রৌপ্যে পৃথক পৃথকভাবে নিসাব পরিমাণ না হলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, স্বর্ণকে মূল্য নির্ধারণ করে রৌপ্যের সাথে মিলিয়ে রৌপ্যের হিসাবে নিসাব স্থির করতে হবে, আর সাহেবাইনের মতে, অংশ হিসাবে নিসাব নির্ধারণ করবে, অর্থাৎ রৌপ্যের নিসাব অর্ধেক এবং স্বর্ণের নিসাব অর্ধেক হলে এক নিসাব ধরে যাকাত দেবে, মূল্য ধরে একটাকে অপরটার সাথে মিলাবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। عُرُوْضُ التِّجَارَةِ -এর زَكٰوة-এর বিধান উল্লেখ কর।

২। ব্যবসার মালের যাকাত দেয়ার পদ্ধতি ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর।

৩। এককভাবে স্বর্ণ বা রৌপ্য কোনটিই نِصَاب পরিমাণ না হলে কিভাবে যাকাত দেবে? বর্ণনা কর।

بَابُ زَكٰوةِ الزُّرُوْعِ وَالثِّمَارِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ قَلِيْلِ مَا اَخْرَجَتْهُ الْاَرْضُ وَكَثِيْرِهِ الْعُشْرُ وَاجِبٌ سَوَاءٌ سُقِىَ سَيْحًا اَوْ سَقَتْهُ السَّمَاءُ اِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيْشَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجِبُ الْعُشْرُ اِلَّا فِيْمَا لَهٗ ثَمَرَةٌ بَاقِيَةٌ اِذَا بَلَغَتْ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ وَالْوَسَقُ سِتُّوْنَ صَاعًا بِصَاعِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلَيْسَ فِى الْخَضْرَوَاتِ عِنْدَ هُمَا عُشْرٌ وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ اَوْ سَانِيَةٍ فَفِيْهِ نِصْفُ الْعُشْرِ عَلَى الْقَوْلَيْنِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا لَايُوْسَقُ كَالزَّعْفَرَانِ وَالْقُطْنِ يَجِبُ فِيْهِ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَتْ قِيْمَتُهٗ قِيْمَةَ خَمْسَةِ اَوْسُقٍ مِنْ اَدْنٰى مَايَدْخُلُ تَحْتَ الْوَسَقِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجِبُ الْعُشْرُ اِذَا بَلَغَ الْخَارِجُ خَمْسَةَ اَمْثَالٍ مِنْ اَعْلٰى مَايُقَدَّرُ بِهٖ نَوْعُهٗ فَاعْتُبِرَ فِى الْقُطْنِ خَمْسَةُ اَحْمَالٍ وَفِى الزَّعْفَرَانِ خَمْسَةُ اَمْنَاءٍ وَفِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ اِذَا اُخِذَ مِنْ اَرْضِ الْعُشْرِ قَلَّ اَوْ كَثُرَ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَاشَئَ فِيْهِ حَتّٰى تَبْلُغَ عَشَرَةَ اَزْقَاقٍ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةَ اَفْرَاقٍ وَالْفَرَقُ سِتَّةٌ وَّثَلٰثُوْنَ رِطْلًا بِالْعِرَاقِيِّ وَلَيْسَ فِى الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ عُشْرٌ -

ফসল ও ফলের যাকাতের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বলেন, জমিন যা উৎপন্ন করে কম হোক বা বেশি হোক এক দশমাংশ ওয়াজিব হবে; চাই উহা নদ-নদীর পানি দ্বারা সিঞ্চন করা হোক বা আকাশের পানিতে উৎপন্ন করা হোক। কিন্তু কাঠ, বাঁশ এবং ঘাসে এক দশমাংশ ওয়াজিব নয়। আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, 'ওশর' শুধু সেসব ফলের মধ্যে ওয়াজিব হবে যা (পূর্ণ বৎসর) বাকি থাকে এবং যখন পাঁচ 'ওসাক' পরিমাণ পর্যন্ত পৌঁছে। আর নবী কারীম (সাঃ)-এর 'সা' অনুযায়ী এক ওসাকে ষাট 'সা'। সাহেবাইনের নিকট তরকারির মধ্যে কোন 'ওশর' নেই। ছোট বালতি, বড় বালতি বা পানি বহনকারী উষ্ট্রী দ্বারা যা সেচ করা হয়েছে উহার মধ্যে উভয় মতানুসারে বিশ ভাগের এক ভাগ যাকাত দেয়া ওয়াজিব। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যে সমস্ত বস্তু 'ওসাক' দ্বারা ওজন করা হয় না, যথা– যাফরান, তুলা এগুলোতে দশ ভাগের একভাগ ওয়াজিব হবে, যখন উহার মূল্য এমন নিম্নমানের শস্যের পাঁচ 'ওসাক" পর্যন্ত পৌঁছে যা ওসাক দ্বারা পরিমাপ করা হয়। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, উৎপন্ন দ্রব্য যদি সে জাতীয় দ্রব্যের পরিমাপের সর্বোচ্চ পরিমাপের পাঁচটির সমান হয়, তাহলে 'ওশর' ওয়াজিব হবে। অতএব তুলাতে পাঁচ বোঝা এবং জাফরানে পাঁচ সের ধর্তব্য হবে। আর মধু বেশি হোক বা কম হোক যদি তা 'ওশরী' জমিন হতে লওয়া হয়, তাহলে 'ওশর' ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, দশ মশক পর্যন্ত না পৌঁছলে 'ওশর' ওয়াজিব হবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, পাঁচ 'ফরকের' কমে মধুতে 'ওশর' ওয়াজিব হয় না। আর এক 'ফরকে' ইরাকী (৩৬) ছয়ত্রিশ রিতিল। খারাজী (তথা যে জমিনে খাজনা দেয়া হয়) জমিনের উৎপন্ন ফসলের 'ওশর' নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওশর সম্পর্কে মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, উৎপন্ন ফসলের মধ্যে ওশর ওয়াজিব, কম হোক আর বেশি হোক বৃষ্টির পানিতে হোক বা নদ-নদীর পানিতে হোক।

আর সাহেবাঈনের মতে, ওশর ওয়াজিব হবার জন্য পাঁচ ওসাক পরিমাণ হওয়া এবং বৎসরকাল গৃহে রাখার মতো ফসল হওয়া আবশ্যক।

কাঠ, বাঁশ ও ঘাষের ওশর নেই ঃ

قَوْلُهُ اِلَّا الْحَطَبَ وَالْقَصَبَ وَالْحَشِيْشَ ঃ যেগুলো স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন হয়– রোপণ করতে হয় না, সেগুলোতে ওশর ওয়াজিব হয় না, যেমন– কাঠ, বাঁশ ও ঘাষ ইত্যাদি।

পাঁচ ওসাকের হিসাব ঃ

قَوْلُهُ خَمْسَةَ اَوْسُقٍ الخ ঃ পাঁচ ওসাকের কম হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। প্রতি ওসাকে হল ৬০ 'সা', আর প্রতি 'সা' তে হল সাড়ে তিনসের। কাজেই প্রতি ওসাকে হবে ৫ মণ ১০ সের এবং ৫ ওসাকে হবে ২৬ মণ ১০ সের। অন্য বর্ণনায় ২৮ মণ ৩৬ সের ৪ ছটাক হয়।

বিশ ভাগের এক ভাগ দেয়ার বিধান ঃ

وَمَا سُقِىَ بِغَرْبٍ اَوْ دَالِيَةٍ الخ ঃ যে সমস্ত জমি স্বাভাবিক বৃষ্টি বা নদীর পানি দ্বারা সেচ দেয়া হয় না; বরং ঢোল, বালতি বা উটের মাধ্যমে পানি বহন করে সেচ দেয়া হয়, সেসব জমির উৎপাদিত ফসলের ওশর বা এক দশমাংশ দিতে হয় না, তবে এক বিশমাংশ যাকাত দিতে হয়।

ওসাকের মূল্যমান ধরার ব্যাপারে ওলামাদের মতান্তর ঃ

قَوْلُهُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ فِيْمَا لَايُوْسَقُ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, যেসব বস্তু ওসাকে পরিমাপ করা হয় না সেগুলির মূল্য ওসাকে পরিমাপকৃত নিম্নমানের বস্তুর ৫ ওসাক পরিমাণ মূল্যের সমান হলে যাকাত ওয়াজিব হবে।

আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, উহাদের মূল্য নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই; বরং ঐ সব দ্রব্যেকে যেসব আন্দাজের দ্বারা আন্দাজ করা হয় উহার উৎকৃষ্ট পরিমাপের যদি পাঁচগুণ হয়, তাহলে 'ওশর' ওয়াজিব হবে, যেমন– তুলা যখন পাঁচ বোঝা হবে তখন 'ওশর' ওয়াজিব হবে। কেননা তুলাতে বোঝা হল উৎকৃষ্ট আন্দাজ।

মধুর ওশর সম্পর্কীয় মাসআলা ঃ

قَوْلُهُ وَفِى الْعَسَلِ الْعُشْرُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, মধু কম হোক আর বেশি হোক তাতে 'ওশর' ওয়াজিব হবে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, দশ 'যাক' না হলে ওশর ওয়াজিব হবে না। ('যাক' হল এমন মশক যাতে পঞ্চাশ সের পানি ধরে।) ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, পাঁচ 'ফারাক' হলে ওশর ওয়াজিব হবে। আর প্রতি ফারাকে হল ৩৬ রিতিল, প্রতি রিতিলে হল পৌনে ৩৪ তোলা। কাজেই এক ফারাকে ১৫ সের এর থেকে কিছু বেশি হবে।

খারাজী ভূমির পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِى الْخَارِجِ مِنْ اَرْضِ الْخَرَاجِ الخ ঃ যে দেশ সন্ধি সূত্রে বিজীত হওয়ার পর সে দেশের ভূমি স্বীয় মালিকদের অধীনে রেখে দেয়া হয়, আর এ মালিকগণকে স্বীয় ধর্মে থাকাকে মেনে নেয়া হয়, এরূপ ভূমিকে খারাজী ভূমি বলা হয়।

এভাবে যুদ্ধে বিজয় লাভ করার পর মুসলিম খলীফা যে ভূমি যে দেশের স্বীয় মালিকের নিকট রেখে দেয়, সে ভূমিকেও খারাজী ভূমি বলা হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। عُشْر (ওশর) কাকে বলে? কোন্ কোন্ বস্তুর মধ্যে ওশর ওয়াজিব হয়? মতভেদসহ লিখ।

২। ওশর ওয়াজিব হবার শর্তসমূহ উল্লেখ কর।

بَابُ مَنْ يَجُوْزُ دَفْعُ الصَّدَقَةِ اِلَيْهِ وَمَنْ لَا يَجُوْزُ

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَ الْمَسَاكِيْنِ الْاٰيَة فَهٰذِهٖ ثَمَانِيَةُ اَصْنَافٍ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوْبُهُمْ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَزَّ الْاِسْلَامَ وَاَغْنٰى عَنْهُمْ وَ الْفَقِيْرُ مَنْ لَهٗ اَدْنٰى شَيْءٍ وَالْمِسْكِيْنُ مَنْ لَا شَيْءَ لَهٗ وَالْعَامِلُ يَدْفَعُ اِلَيْهِ الْاِمَامُ اِنْ عَمِلَ بِقَدْرِ عَمَلِهٖ وَ فِى الرِّقَابِ اَنْ يُعَانَ الْمُكَاتَبُوْنَ فِىْ فَكِّ رِقَابِهِمْ وَ الْغَارِمُ مَنْ لَزِمَهٗ دَيْنٌ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مُنْقَطِعُ الْغُزَاةِ وَابْنُ السَّبِيْلِ مَنْ كَانَ لَهٗ مَالٌ فِىْ وَطَنِهٖ وَهُوَ فِىْ مَكَانٍ اٰخَرَ لَا شَيْءَ لَهٗ فِيْهِ فَهٰذِهٖ جِهَاتُ الزَّكٰوةِ وَلِلْمَالِكِ اَنْ يَّدْفَعَ اِلٰى كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ وَلَهٗ اَنْ يَّقْتَصِرَ عَلٰى صِنْفٍ وَاحِدٍ وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَّدْفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى ذِمِّيٍّ وَلَا يُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ وَلَا يُكَفَّنُ بِهَا مَيِّتٌ وَلَا يُشْتَرٰى بِهَا رَقَبَةٌ يُعْتَقُ وَلَا تُدْفَعُ اِلٰى غَنِيٍّ وَلَا يَدْفَعُ الْمُزَكِّىْ زَكٰوتَهٗ اِلٰى اَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَاِنْ عَلَا وَلَا اِلٰى وَلَدِهٖ وَ وَلَدِ وَلَدِهٖ وَاِنْ سَفَلَ وَلَا اِلٰى اُمِّهٖ وَجَدَّاتِهٖ وَاِنْ عَلَتْ وَلَا اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ ۔

যাকাত কাকে দেয়া জায়েয আর কাকে দেয়া জায়েয নয় সে সম্পর্কীয় অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেছেন যে, সদকাসমূহ শুধু ফকিরগণকে, মিসকিনগণকে, সদকা আদায়কারীদেরকে, অমুসলিমদের মধ্যে যাদের অন্তরসমূহ ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট তাদেরকে, দাসত্ব মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের ঋণ পরিশোধের জন্য, আল্লাহর পথে জিহাদকারীদেরকে এবং নিঃস্ব মুসাফিরগণকে, এই আট প্রকারের লোকদের সাহায্যার্থে দেবে। তবে এই আট প্রকার থেকে 'মুয়াল্লাফাতুল কুলূব' বাদ পড়ে গেছে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে সম্মান দান করেছেন আর অমুসলিমদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করেছেন।

(১) ফকির ঐ ব্যক্তিকে বলে, যার সামান্য সম্পদ রয়েছে। (২) মিসকিন হল সে ব্যক্তি, যার সামান্য সম্পদ রয়েছে। (৩) যাকাত আদায়কারী যদি কাজ করে, তবে তার কাজ অনুযায়ী ইমাম দেবে। (৪) দাসত্ব মুক্ত করা অর্থাৎ মুকাতাবগণকে তাদের দাসত্ব হতে মুক্ত করার জন্য সাহায্য করা। (৫) আর গারিম হল সে ব্যক্তি, যার ওপর ঋণ আবশ্যক হয়ে পড়েছে। (৬) 'সাবীলিল্লাহ' (আল্লাহর রাহে) অর্থ– অর্থাভাবে যোদ্ধা ব্যক্তি যুদ্ধ করতে অক্ষম। (৭) 'ইবনুস্‌সাবীল' অর্থ– এমন মুসাফির যার বাড়িতে অর্থ আছে অথচ সে এমন স্থানে আছে যেখানে তার কিছুই নেই। এ গুলো হল যাকাত ব্যয় করার খাত। মালিক এ সব দলের প্রত্যেক দলকে দিতে পারে এবং যে কোন এক শ্রেণীর লোককেও দিতে পারে। জিম্মি তথা বিধর্মীকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। যাকাতের টাকা দ্বারা মসজিদ নির্মাণ করা, মৃতকে কাফন পরানো এবং মুক্ত করার জন্য দাস ক্রয় করা কোনটাই জায়েয নেই। ধনীকে যাকাত দেয়া যাবে না। যাকাতদাতা তার যাকাত আপন পিতাপিতামহ, প্রপিতামহ এ ভাবে ওপরের দিকে দেবে না এবং স্বীয় সন্তান ও সন্তানের সন্তানকেও দিতে পারবে না, যদিও নিম্নস্তরের হয়। আর নিজ মাতা-দাদীগণকেও দিতে পারবে না, যদিও ওপরের স্তরের হয়। এবং নিজ স্ত্রীকেও দিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুয়াল্লাফাতে কুলূবের পরিচয় ও বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَقَدْ سَقَطَ مِنْهَا الْمُؤَلَّفَةُ قُلُوبُهُمْ الخ ঃ মুয়াল্লাফাতে কুলূব সে সমস্ত কাফিরদেরকে বলে, যারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট কিন্তু এখনও ইসলাম গ্রহণ করেনি, অথবা এমন মুসলমান যারা বাধ্য হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছে কিন্তু তাদের মন এখনও কুফরীর দিকে ঝুঁকে আছে। ইসলামের প্রাথমিক অবস্থায় এদের মন আকর্ষণ করার জন্য মহানবী (সাঃ) যাকাত প্রদান করতেন, কিন্তু পরবর্তীতে ইসলামকে আল্লাহ তা'আলা শক্তিশালী ও বিজয় দান করলে যাকাতের এ খাত রহিত হয়ে যায়।

যাকাত আদায়কারীর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَ الْعَامِلُ يَدْفَعُ الخ ঃ মুসলমান বাদশাহ বা খলীফা যাকাত ও ওশর আদায় করার জন্য যেসব কর্মচারী নিয়োগ করেন তাদেরকে আমিল বলা হয়। এদেরকে যাকাতের সম্পদ হতে ভাতা দেয়া জায়েয।

গোলাম আযাদ ঃ

قَوْلُهُ وَفِي الرِّقَابِ الخ ঃ গোলাম আযাদ তথা এমন গোলাম যাকে মনিব নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আযাদ করে দেয়ার চুক্তি করেছে। এরূপ গোলামকে মুকাতাব বলা হয়, এদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয।

প্রত্যেক খাতে দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلِلْمَالِكِ اَنْ يَّدْفَعَ اِلَى كُلِّ وَاحِدٍ الخ ঃ হানাফীদের নিকট যাকাতের খাত সমূহের প্রত্যেক খাতে অথবা শুধু এক খাতে দিলেও চলবে। তথা মালিকের ইচ্ছানুযায়ী যে কোন এক খাতে অথবা সকল খাতে দিতে পারে। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রঃ)-এর মতে, প্রত্যেক শ্রেণী হতে কমপক্ষে তিন জনকে যাকাত দেয়া ওয়াজিব অন্যথা যাকাত আদায় হবে না।

অমুসলিমদের যাকাত না দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَجُوزُ اَنْ يَدْفَعَ الزَّكٰوةَ اِلَى ذِمِّيٍّ ঃ জিম্মি সে সকল কাফিরদেরকে বলে, যারা জিযিয়া বা কর দিয়ে ইসলামী রাষ্ট্রে বসবাস করে। আর জিযিয়া সে ট্যাক্স যা ইসলামী রাষ্ট্র কাফিরদের জান-মালের নিরাপত্তার জন্য তাদের ওপর ধার্য করে। তাদেরকে যাকাত দেয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ

অর্থাৎ যাকাত ধনী মুসলমানদের থেকে গ্রহণ করে গরীব মুসলমানদেরকে দেয়া হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে কাফিরদেকে যাকাত দেয়া যাবে না।

যাকাতের সম্পদে মালিক বানানোর শর্ত ঃ

وَلَا يُبْنٰى بِهَا مَسْجِدٌ الخ ঃ যাকাতের অর্থ দিয়ে মসজিদ নির্মাণ, কাফনের কাপড় ক্রয় করা এবং আযাদের উদ্দেশ্যে গোলাম ক্রয় করা, জায়েয নেই। কেননা এসব অবস্থায় মালের কাউকে মালিক বানানো পাওয়া যায় না, অথচ যাকাত আদায়ের জন্য মালিক করা শর্ত। তবে যদি যাকাতের মাল কোন গরিবকে মালিক বানিয়ে দেয়ার পর সে স্বেচ্ছায় এ সব কাজ করে, তাহলে জায়েয হবে অন্যথা যাকাত আদায় হবে না।

পিতা ও পুত্রকে যাকাত দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَدْفَعُ الْمُزَكِّيْ زَكٰوتَهُ اِلَى اَبِيْهِ الخ ঃ যাকাতদাতা তার মাতা-পিতা, দাদা-দাদী, নানা-নানী এমনিভাবে ওপরের দিকে, আর ছেলে-মেয়ে, নাতি-নাতনি নিম্নের দিকের কাউকেও যাকাত দেয়া জায়েয নেই। কেননা তাদেরকে যাকাত দেয়ার অর্থ হল মালকে নিজের কাছে রাখা।

وَلَا تَدْفَعُ الْمَرْأَةُ اِلٰى زَوْجِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا تَدْفَعُ اِلَيْهِ وَلَا يُدْفَعُ اِلٰى مُكَاتَبِهٖ وَلَا مَمْلُوْكِهٖ وَلَا مَمْلُوْكِ غَنِيٍّ وَ وَلَدِ غَنِيٍّ اِذَا كَانَ صَغِيْرًا وَلَا يُدْفَعُ اِلٰى بَنِىْ هَاشِمٍ وَهُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَبَّاسٍ وَ اٰلُ جَعْفَرٍ وَ اٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ حَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَمَوَالِيْهِمْ وَقَالَ اَبُوْحَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا دَفَعَ الزَّكٰوةَ اِلٰى رَجُلٍ يَظُنُّهٗ فَقِيْرًا ثُمَّ بَانَ اَنَّهٗ غَنِىٌّ اَوْهَاشِمِىٌّ اَوْ كَافِرٌ اَوْدَفَعَ فِىْ ظُلْمَةٍ اِلٰى فَقِيْرٍ ثُمَّ بَانَ اَنَّهٗ اَبُوْهُ اَوْ اِبْنُهٗ فَلَا اِعَادَةَ عَلَيْهِ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَعَلَيْهِ الْاِعَادَةُ وَلَوْدَفَعَ اِلٰى شَخْصٍ ثُمَّ عَلِمَ اَنَّهٗ عَبْدُهٗ اَوْمُكَاتَبُهٗ يَجْزِ فِىْ قَوْلِهِمْ جَمِيْعًا وَلَا يَجُوْزُ دَفْعُ الزَّكٰوةِ اِلٰى مَنْ يَّمْلِكُ نِصَابًا مِنْ اَيِّ مَالٍ كَانَ وَيَجُوْزُ دَفْعُهَا اِلٰى مَنْ يَمْلِكُ اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا مُكْتَسِبًا وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكٰوةِ مِنْ بَلَدٍ اِلٰى بَلَدٍ اٰخَرَ وَاِنَّمَا يُفَرَّقُ صَدَقَةُ كُلِّ قَوْمٍ فِيْهِمْ اِلَّا اَنْ يَّحْتَاجَ اَنْ يَّنْقُلَهَا الْاِنْسَانُ اِلٰى قَرَابَتِهٖ اَوْ اِلٰى قَوْمٍ هُمْ اَحْوَجُ اِلَيْهِ مِنْ اَهْلِ بَلَدِهٖ-

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, স্ত্রী তার স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে না। আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, স্ত্রী স্বামীকে দিতে পারবে। আর স্বীয় মুকাতাব দাস, কৃতদাস এবং ধনী লোকের গোলামকে যাকাত দেবে না। আর ধনী ব্যক্তির নাবালেগ ছেলেকেও যাকাত দেবে না। বনী হাশেমকেও যাকাত দেবে না। আর বনী হাশিম হলেন, হযরত আলী (রাঃ), আব্বাস (রাঃ), জাফর (রাঃ), আকীল (রাঃ) এবং হারিছ ইবনে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ ও তাদের দাসগণ।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন যে, যখন কোন ব্যক্তি কাউকে ফকির মনে করে যাকাত প্রদান করল এরপর প্রকাশ পেল যে, সে ধনী বা হাশিমী বা অমুসলিম, অথবা অন্ধকারে কোন ফকিরকে দেয়ার পর প্রকাশ পেল যে সে তার পিতা বা তার ছেলে, তাহলে (উল্লিখিত অবস্থাসমূহে) পুনঃ যাকাত দিতে হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, (উল্লিখিত অবস্থাসমূহে) পুনঃ যাকাত দিতে হবে। আর কোন ব্যক্তিকে যাকাত দেয়ার পর জানতে পারল যে, সে তার দাস অথবা মুকাতাব গোলাম, তাহলে সকল ইমামের মতানুসারে জায়েয হবে না। নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিককে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না, যে কোন প্রকারের মাল হোক না কেন। যে ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের চেয়ে কমের অধিকারী তাকে যাকাত দেয়া জায়েয, যদিও সে সুস্থ ও উপার্জন করবার ক্ষমতা সম্পন্ন হয়। এক শহরের যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তরিত করা মাকরূহ। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের যাকাত তাদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে, কিন্তু যদি মানুষ নিজ আত্মীয়কে দিতে স্থানান্তর করা প্রয়োজন মনে করে, অথবা তার শহরে লোক হতে অন্য শহরের লোক যাকাতের অধিক মুখাপেক্ষী হয়, তাহলে স্থানান্তর করা মাকরূহ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَاتَدْفَعُ الْمَرْأَةُ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দেয়া জায়েয হবে না, আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, জায়েয হবে। কেননা রাসূল (সাঃ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর স্ত্রীকে বলেছেন যে, তুমি তোমার সদকা স্বামীকে দিলে দ্বিগুণ ছওয়াব পাবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর উত্তরে বলেন যে, অত্র হাদীসে নফল সদকার কথা বলা হয়েছে যা দেয়া জায়েয।

বনী হাশিমকে না দেয়ার কারণ ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَدْفَعُ اِلَى بَنِى هَاشِمٍ الخ ঃ হযরত আলী, আব্বাস, জা'ফর, আকীল (রাঃ) ও হারিছ ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের বংশধর এবং তাঁদের গোলামগণকে বনী হাশিম বলা হয়েছে। মহানবী (সাঃ) বনী হাশিম বংশে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তাঁরা সকলের সম্মানের পাত্র। আর তাঁরা কুফরী ও ইসলাম উভয় যুগে রাসূল (সাঃ)-কে সাহায্য করেছেন। তাই তাদেরকে যাকাত দেয়া বা তাঁদের যাকাত লওয়া সম্পূর্ণ হারাম। কেননা যাকাত হল মালের ময়লা।

যাকাতের খাত ছাড়া অন্য খাতে যাকাত দিয়ে ফেললে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ اِذَا دَفَعَ الزَّكٰوةَ اِلَى رَجُلٍ يَظُنُّهُ فَقِيْرًا الخ ঃ এ মাসআলাটির তিনটি রূপ—

প্রথম ঃ যাকাতদাতা দেখে শুনে যাকাতের উপযুক্ত মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানা গেল যে, সে হাশেমী বা ধনী কিংবা কাফির।

দ্বিতীয় ঃ অন্ধকারে কাউকে ফকির মনে করে যাকাত দেয়ার পর জানা গেল যে, সে যাকাতের উপযুক্ত নয়; বরং সে তার পিতা বা পুত্র।

তৃতীয় ঃ কোন ব্যক্তিকে চিন্তা ভাবনা ছাড়াই যাকাতের পাত্র মনে করে যাকাত দেয়ার পর প্রকাশ পেল যে, সে তার দাস বা মুকাতাব গোলাম।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় যাকাত আদায় হয়ে যাবে পুনঃ দিতে হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, যাকাত আদায় হবে না; বরং পুনঃ দিতে হবে। আর তৃতীয় অবস্থায় সকল ইমামের ঐকমত্যে যাকাত আদায় হবে না, পুনঃ দিতে হবে।

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ صَحِيْحًا الخ ঃ অর্থাৎ যে সুস্থ সবল ব্যক্তি নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক নয়, সে না চাওয়া অবস্থায় তাকে যাকাত দিলে বৈধ হবে। আর প্রার্থনা করার পর দিলে জায়েয হবে না। কেননা সবল ব্যক্তির জন্য হস্ত প্রসারিত করা হারাম। আর এ জাতীয় ভিক্ষুককে যাকাত দিলে অন্যায়ের সাহায্য করা হবে।

এক স্থান হতে অন্যত্র যাকাত স্থানান্তরের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ نَقْلُ الزَّكٰوةِ الخ ঃ এক শহরের যাকাত অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহ। কেননা যে শহরের যাকাত সে শহরের অধিবাসীরাই তার হকদার। তবে যদি অন্য শহরে যাকাত দাতার গরিব আত্মীয় থাকে, অথবা এ শহর হতে অন্য শহরের লোক বেশি মুখাপেক্ষী হয়, তবে যাকাত স্থানান্তর করা জায়েয আছে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। مَصَارِفُ الزَّكٰوةِ বা যাকাতের খাত বলতে কি বুঝ? বিস্তারিত বিবরণ দাও।
২। مُؤَلَّفَةُ الْقُلُوْبِ-কে যাকাত না দেয়ার কারণ কি? উল্লেখ কর।
৩। কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে যাকাত দেয়া যায় না? বিশদভাবে বর্ণনা কর।
৪। স্ত্রী স্বামীকে যাকাত দিতে পারবে কিনা? ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর।
৫। যাকাতের মাল এক শহর হতে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ কিনা? বর্ণনা কর।

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ إِذَا كَانَ مَالِكًا لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ مَسْكَنِهِ وَثِيَابِهِ وَأَثَاثِهِ وَفَرَسِهِ وَسِلَاحِهِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ يُخْرِجُ ذٰلِكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْ أَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيْدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَلَا يُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ وَلَا عَنْ أَوْلَادِهِ الْكِبَارِ وَ إِنْ كَانُوْا فِيْ عِيَالِهِ وَلَا يُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَلَا عَنْ مَمَالِيْكِهِ لِلتِّجَارَةِ وَ الْعَبْدُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ لَافِطْرَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَيُؤَدِّي الْمُسْلِمُ الْفِطْرَةَ عَنْ عَبْدِهِ الْكَافِرِ وَ الْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيْبٍ أَوْ شَعِيْرٍ وَالصَّاعُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ وَقَالَ أَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثُ رِطْلٍ وَ وُجُوْبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ بِطُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِيْ مِنْ يَّوْمِ الْفِطْرِ فَمَنْ مَاتَ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ وُلِدَ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ لَمْ تَجِبْ فِطْرَتُهُ وَالْمُسْتَحَبُّ أَنْ يُخْرِجَ النَّاسُ الْفِطْرَةَ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ الْخُرُوْجِ إِلَى الْمُصَلّٰى فَإِنْ قَدَّمُوْهَا قَبْلَ يَوْمِ الْفِطْرِ جَازَ وَإِنْ أَخَّرُوْهَا عَنْ يَوْمِ الْفِطْرِ لَمْ تَسْقُطْ وَكَانَ عَلَيْهِمْ إِخْرَاجُهَا -

সদকায়ে ফিতরের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক স্বাধীন মুসলমানের ওপর ওয়াজিব, যখন সে নিসাব পরিমাণ মালের মালিক হবে এবং সে নিসাব তার বাসস্থান, পরিধেয় বস্ত্র, প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, আরোহণের ঘোড়া এবং দাসসমূহ হতে অতিরিক্ত হবে। আর এ সদকায়ে ফিতর নিজের পক্ষ হতে এবং তার নাবালেগ সন্তান ও খিদমতের গোলামের পক্ষ হতে আদায় করবে। তার স্ত্রী ও প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পক্ষ হতে আদায় করবে না, যদিও তারা তার পরিবারভুক্ত হয়। তার মুকাতাব গোলাম এবং ব্যবসার গোলামদের পক্ষ হতে সদকা আদায় করবে না। যে গোলাম দুই শরিকের মালিকানাধীন তার সদকা কারো ওপর ওয়াজিব হবে না। আর মুসলমান ব্যক্তি তার কাফির দাসের সদকায়ে ফিতর আদায় করবে। সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ অর্ধ 'সা' গম অথবা এক 'সা' খেজুর বা কিসমিস অথবা যব। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, এক 'সা' হল ইরাকী আট রিতিল। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, এক 'সা' হল পাঁচ রিতিল ও এক রিতিলের তিন ভাগের এক ভাগ। আর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার সম্পর্ক ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদিকের উদয়ের সাথে। অতএব যে ব্যক্তি ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে মৃত্যুবরণ করে তার ফিতরা দেয়া ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পর ইসলাম গ্রহণ করে বা জন্ম গ্রহণ করে তার ফিতরা দেয়া ওয়াজিব নয়। ঈদুল ফিতরের দিন মানুষ ঈদগাহে যাবার পূর্বে সদকায়ে ফিতর আদায় করে দেয়া মুস্তাহাব। যদি ঈদের দিনের পূর্বে সদকায়ে ফিতর দিয়ে ফেলে, তবে জায়েয হবে। আর ঈদের দিনের পরে পিছিয়ে দিলেও তথা ঈদের দিন আদায় না করলেও তা বাদ যাবে না। উহা পরে আদায় করে দেয়া মানুষের ওপর অপরিহার্য কর্তব্য।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার শর্ত ঃ

قَوْلُهُ صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَاجِبَةٌ الخ ঃ সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার জন্য নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া আবশ্যক। এ নিসাব বৃদ্ধি হওয়া এবং এক বৎসর অতিবাহিত হওয়াও শর্ত নয়; বরং যে ব্যক্তি ঈদের দিন সুবহে সাদিকের পূর্বে এ নিসাবের মালিক হবে তার ওপরও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবে।

উল্লেখ্য যে, এ নিসাব থাকার ঘর, পরিধানের কাপড়, নিত্য প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র, ঘোড়া, অস্ত্র এবং খিদমতের গোলাম হতে অতিরিক্ত হতে হবে। আর এ ধরনের লোকের ওপর কুরবানীও ওয়াজিব হয়।

স্ত্রী ও বয়স্ক সন্তানদের পক্ষ হতে ফিতরা আদায় করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُؤَدِّي عَنْ زَوْجَتِهِ الخ ঃ স্ত্রী ও বালেগ সন্তানদের পক্ষ হতে সদকায়ে ফিতর আদায় করা আবশ্যক নয়। কেননা তারা একই পরিবারভুক্ত হলেও তার আওতাধীন নয়। তাদের নিজস্ব সম্পদের মালিক নিজেরা।

মুকাতাব ও ব্যবসার গোলামের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَايُخْرِجُ عَنْ مُكَاتَبِهِ الخ ঃ মনিব তার মুকাতাব দাস ও ব্যবসার গোলামের যাকাত দেবে না এবং যে দাসের মালিক দু'জন তারও ফিতরা কারো ওপর আবশ্যক নয়। তবে একক ব্যক্তি মালিকানার গোলাম কাফির হোক বা মুসলমান হোক তার সদকায়ে ফিতর আদায় করা আবশ্যক।

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ ঃ

قَوْلُهُ وَالْفِطْرَةُ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ الخ ঃ সদকায়ে ফিতর মাথাপিছু এক 'সা' গম অথবা অর্ধ 'সা' খেজুর বা কিসমিস অথবা যব।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, এক 'সা' -এর পরিমাণ হল, ইরাকী রিতিল অনুযায়ী ৮ রিতিল। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, এক 'সা' তে ৫ রিতিল ও এক রিতিলের তিনের একাংশ। এটা হল মদীনার 'সা'-এর হিসাবে।

কূফী 'সা' এর হিসাবে এক রিতিলে (২০) বিশ আসতার, আর এক আসতারে সাড়ে চার (৪ $\frac{১}{২}$) মিসকাল, যার ওজন হল এক তোলা, (৮) আট মাশা, দুই রতি। অতএব এক 'সা'তে হবে (২৭০) দুইশত সত্তর তোলা। যেমনি হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী বলেছেন—

صاع كوفى هست اى مرد فهيم * دو صد وهفتاد توله مستقيم

সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হবার সময় ঃ

قَوْلُهُ وَ وُجُوبُ الْفِطْرَةِ يَتَعَلَّقُ الخ ঃ হানাফীদের মতে, ঈদের দিন সুবহে সাদিক উদয়ের সাথে ফিতরার সম্পর্ক বা ফিতরা তখন ওয়াজিব হয়। আর শাফিয়ীদের মতে, শেষ রমযানের সূর্যাস্তের সাথে ফিতরা ওয়াজিব হবার সম্পর্ক। অতএব যে ব্যক্তি সুবহে সাদিকের পূর্বে মৃর্তুবরণ করবে তার পক্ষ হতে ফিতরা ওয়াজিব নয়, আর সুবহে সাদিকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছে বা কেউ জন্ম গ্রহণ করেছে তার ওপর ফিতরা ওয়াজিব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রহঃ)-এর মতে, মৃত ব্যক্তির ওপর ফিতরা ওয়াজিব, আর সুবহে সাদিকের পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বা ভূমিষ্ঠ শিশুর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। صَدَقَةُ الْفِطْرِ কার ওপর এবং কখন ওয়াজিব হয়?
২। صَدَقَةُ الْفِطْرِ -এর পরিমাণ ইমামদের মতভেদসহ উল্লেখ কর।
৩। صَدَقَةُ الْفِطْرِ কাদের পক্ষ হতে আদায় করা ওয়াজিব আর কাদের পক্ষ হতে ওয়াজিব নয়? বিস্তারিত লিখ।
৪। صَدَقَةُ الْفِطْرِ আদায়ের সুন্নত নিয়ম বর্ণনা কর।
৫। صَدَقَةُ الْفِطْرِ ও زَكٰوة -এর মধ্যে পার্থক্য কি? বর্ণনা কর।

كِتَابُ الصَّوْمِ

اَلصَّوْمُ ضَرْبَانِ وَاجِبٌ وَنَفْلٌ فَالْوَاجِبُ ضَرْبَانِ مِنْهُ مَايَتَعَلَّقُ بِزَمَانٍ بِعَيْنِهِ كَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ فَيَجُوزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَإِنْ لَمْ يَنْوِ حَتّٰى اَصْبَحَ اَجْزَأَتْهُ النِّيَّةُ مَابَيْنَهُ وَبَيْنَ الزَّوَالِ وَالضَّرْبُ الثَّانِيْ مَايَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ كَقَضَاءِ رَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُطْلَقِ وَالْكَفَّارَاتِ فَلَايَجُوزُ صَوْمُهُ اِلَّابِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَكَذٰلِكَ صَوْمُ الظِّهَارِ وَالنَّفْلِ كُلِّهِ يَجُوْزُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ وَيَنْبَغِيْ لِلنَّاسِ اَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ فِي الْيَوْمِ التَّاسِعِ وَالْعِشْرِيْنَ مِنْ شَعْبَانَ فَإِنْ رَأَوْهُ صَامُوْا وَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِمْ اَكْمَلُوْا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلٰثِيْنَ يَوْمًا ثُمَّ صَامُوْا وَمَنْ رَأَى هِلَالَ رَمَضَانَ وَحْدَهُ صَامَ وَإِنْ لَمْ يَقْبَلِ الْاِمَامُ شَهَادَتَهُ وَإِذَا كَانَ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ قَبِلَ الْاِمَامُ شَهَادَةَ الْوَاحِدِ الْعَدْلِ فِيْ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ رَجُلًا كَانَ اَوْ اِمْرَأَةً حُرًّا كَانَ اَوْعَبْدًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي السَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ تُقْبَلِ الشَّهَادَةُ حَتّٰى يَرَاهُ جَمْعٌ كَثِيْرٌ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ -

সাওমের পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ সাওম দুই প্রকার ঃ (১) ওয়াজিব ও (২) নফল। অতঃপর ওয়াজিব (ফরয) সাওম দুই প্রকার ঃ প্রথমত যা নির্দিষ্ট সময়ের সাথে সম্পর্ক রাখে, যেমন— রমযানের সাওম এবং নির্দিষ্ট মানতের সাওম। এ জাতীয় সাওম রাতের নিয়তে জায়েয হবে। আর যদি ভোর পর্যন্ত নিয়ত না করে থাকে, তাহলে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করলে যথেষ্ট হবে। আর দ্বিতীয় প্রকার হল সে ওয়াজিব সাওম, যা দায়িত্বে আবশ্যকীয় হয়ে পড়ে, যেমন— রমযানের কাযা সাওম (শর্তহীন) মানতের সাওম এবং কাফ্‌ফারার সাওম। সুতরাং এ ধরনের সাওম রাতে নিয়ত করা ব্যতীত জায়েয হবে না। এমনিভাবে যিহারের সাওমও। আর সকল নফল সাওম সূর্য ঢলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত নিয়ত করলে জায়েয হবে। মানুষের উচিত হল শাবান মাসের উনত্রিশ তারিখে রমযানের চাঁদ তালাশ করা। অতঃপর যদি চাঁদ দেখে তাহলে সাওম রাখবে। আর যদি চাঁদ তাদের ওপর অদৃশ্য হয়, তাহলে শাবানের ত্রিশদিন পূর্ণ করে তারপর সাওম রাখবে। আর যে ব্যক্তি রমযানের চাঁদ একা দেখবে সে একা সাওম রাখবে, যদিও ইমাম তার সাক্ষ্য গ্রহণ না করে। আর যদি আকাশে কোন প্রকার বাধা-বিপত্তি থাকে, (মেঘ, ধোঁয়া, ধূলিবালি ইত্যাদি) তাহলে ইমাম চাঁদ দেখার ব্যাপারে একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবে। চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী লোক হোক, দাস হোক বা আযাদ হোক। যদি আকাশে কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে, তাহলে সাক্ষ্য গৃহীত হবে না; যে পর্যন্ত না অধিক লোক সাক্ষ্য না দেয়, যাদের খবরে চাঁদ দেখার বিশ্বাস দৃঢ় হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صَوْم -এর সংজ্ঞা ঃ

এটা বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর অর্থ হল, اَلْاِمْسَاكُ বা বিরত থাকা।

পরিভাষায় صَوْم বলা হয়, সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খানা-পিনা, স্ত্রী-সম্ভোগ ও অশ্লীলতা থেকে বিরত থাকা।

সাওমের ফরযকাল ঃ

পেয়ারা নবী (সাঃ) ও সাহাবায়ে কিরামগণ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনার্থে পবিত্র নগরী মক্কায় বসবাসকালে নফল সাওম রাখতেন। হিজরতের দেড় বছর পর দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে রমযানের সাওম ফরয করা হয়। এমর্মে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে— يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

অর্থাৎ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর সাওম ফরয করা হয়েছে যেমনিভাবে তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপরও ফরয করা হয়েছিল। যাতে করে তোমরা খোদাভীতি অর্জন করতে পার।

সাওমকে যাকাতের পরে বর্ণনা করার কারণ ঃ

قَوْلُهُ كِتَابُ الصَّوْمِ ঃ সালাতের মতো সাওমও দৈহিক ইবাদত হবার কারণে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) সহ অধিকাংশ মুসান্নিফ সালাতের পরই সাওমের উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম কুদূরী (রহঃ) সালাতের পর যাকাতের উল্লেখ করেছেন, এরপর সাওমের বর্ণনা দিয়েছেন। কেননা পবিত্র কুরআনে সালাত ও যাকাতকে একসাথে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া সাওমের পূর্বে যাকাত ফরয হয়েছে।

রমযান, মানত ও নফল সাওমের নিয়তের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَيَجُوْزُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِّنَ اللَّيْلِ ঃ হানাফীদের মতে রমযানের সাওম, নির্দিষ্ট মানতের ও নফল সাওমের নিয়ত সূর্য ঠিক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত করলেও জায়েয হবে। এখানে সূর্য হেলে যাবার পূর্ব বলতে সূর্য ঠিক মাথার ওপর ওঠার সময়কে বোঝানো হয়েছে। কেননা তখন দিনের অর্ধেক শেষ হয়ে যাবে। এ জন্য ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) قَبْلَ نِصْفِ النَّهَارِ বলেছেন। ইমাম শাফিয়ী ও আহমদের মতে, উল্লিখিত তিন প্রকার সাওমের নিয়ত রাতের মধ্যে করা জরুরী। তাঁদের দলিল হল, রাসূল (সাঃ)-এর হাদীস— لَاصِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَنْوِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ হানাফীরা এর জবাবে বলেন, لَاصِيَامَ দ্বারা সাওমের পূর্ণ ফযীলত না হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

কাযা, মানত, যিহার ও কাফ্‌ফারার সাওমের নিয়তের বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَلَايَجُوْزُ صَوْمُهُ اِلَّابِنِيَّةٍ الخ ঃ শরীয়তে যে সকল সাওমের দায়িত্ব আবশ্যকীয় করেছে, যেমন— কাযা, মানত, কাফ্‌ফারা, যিহার এ সকল সাওম রাতে নিয়ত ব্যতীত জায়েয হবে না। কেননা এ জাতীয় সাওমের জন্য শরীয়ত সময় নির্ধারণ করেনি। এ জন্য সাওম আদায়কারীর নিয়ত দ্বারা দিনের প্রথমভাগ সাওমের জন্য নির্ধারিত হতে হবে। আর এ নির্ধারণ সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত পাওয়া যাওয়া ব্যতীত হবে না। কাজেই এ জাতীয় সাওমের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে নিয়ত করা আবশ্যক।

রমযানের চাঁদ দেখার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَنْبَغِىْ لِلنَّاسِ اَنْ يَّلْتَمِسُوا الْهِلَالَ الخ ঃ শাবান মাসের ঊনত্রিশ তারিখে সকল মানুষের ওপর আবশ্যক হল রমযানের চাঁদ অনুসন্ধান করা। যদি ঊনত্রিশ তারিখে রমযানের চাঁদ দেখা যায়, তবে সাওম রাখতে হবে। আর যদি উক্ত তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শাবানের ত্রিশদিন পূর্ণ করে পরের দিন চাঁদ না দেখা গেলেও সাওম রাখবে। ঊনত্রিশ তারিখে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্য কারণে অপরিষ্কার থাকলে চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। আর যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে অধিক সংখ্যক লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন যাদের সাক্ষ্যের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়।

وَوَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ الثَّانِى اِلٰى غُرُوْبِ الشَّمْسِ وَالصَّوْمُ هُوَ الْاِمْسَاكُ عَنِ الْاَكْلِ وَالشُّرْبِ وَالْجِمَاعِ نَهَارًا مَعَ النِّيَّةِ فَاِنْ اَكَلَ الصَّائِمُ اَوْ شَرِبَ اَوْ جَامَعَ نَاسِيًا لَمْ يُفْطِرْ فَاِنْ نَامَ فَاحْتَلَمَ اَوْ نَظَرَ اِلٰى اِمْرَأَتِهٖ فَاَنْزَلَ اَوْ اِدَّهَنَ اَوْ اِحْتَجَمَ اَوْ اِكْتَحَلَ اَوْ قَبَّلَ لَمْ يُفْطِرْ فَاِنْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَابَأْسَ بِالْقُبْلَةِ اِذَا اَمِنَ عَلٰى نَفْسِهٖ وَيَكْرَهُ اِنْ لَمْ يَأْمَنْ وَاِنْ ذَرَعَهُ الْقَيْئُ لَمْ يُفْطِرْ وَاِنْ اِسْتَقَاءَ عَامِدًا مَلْأَ فَمِهٖ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَمَنْ اِبْتَلَعَ الْحَصَاةَ اَوِ الْحَدِيْدَ اَوِ النَّوَاةَ اَفْطَرَ وَقَضٰى وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ اَوْ اَكَلَ اَوْ شَرِبَ مَا يَتَغَذّٰى بِهٖ اَوْ يَتَدَاوٰى بِهٖ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَمَنْ جَامَعَ فِيْمَا دُوْنَ الْفَرْجِ فَاَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ فِىْ اِفْسَادِ الصَّوْمِ فِىْ غَيْرِ رَمَضَانَ كَفَّارَةٌ وَمَنْ اِحْتَقَنَ اَوْ اِسْتَعَطَ اَوْ اَقْطَرَ فِىْ اُذُنِهٖ اَوْ دَاوٰى جَائِفَةً اَوْ اٰمَةً بِدَوَاءٍ رُطَبٍ فَوَصَلَ اِلٰى جَوْفِهٖ اَوْ دِمَاغِهٖ اَفْطَرَ وَاِنْ اَقْطَرَ فِىْ اِحْلِيْلِهٖ لَمْ يُفْطِرْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يُفْطِرُ-

---

সরল অনুবাদ ঃ সাওমের সময় হল সুবহে সাদিক হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর সাওম হল, পুরো দিন নিয়তসহ পানাহার ও সহবাস হতে বিরত থাকা। সাওম আদায়কারী যদি ভুলবশত পানাহার বা সঙ্গম করে তাহলে সাওম বিনষ্ট হবে না। যদি ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নদোষ হয়, অথবা স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে বীর্য নির্গত হয়, বা শরীরে তেল মালিশ করে, শিঙ্গা দেয় বা সুরমা লাগায় কিংবা চুম্বন করে, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয় না। আর যদি (স্ত্রীকে) চুম্বন বা স্পর্শ করার কারণে বীর্য নির্গত হয়, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে; এতে তার ওপর কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। (চুম্বন করলে বীর্যপাত হবে না বলে) নিজের ওপর আস্থা থাকলে চুম্বন করাতে কোন দোষ নেই, আর আস্থা না থাকলে চুমু দেয়া মাকরূহ। যদি আপনা-আপনি বমি হয়, তাহলে সাওম বিনষ্ট হবে না, কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং সে সাওমের কাযা করতে হবে। আর কেউ যদি পাথর, কণা, লোহার টুকরা অথবা খেজুর দানা (বা ফলের আঁটি) গিলে ফেলে, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তার কাযা করবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে সামনের বা পিছনের রাস্তা দিয়ে সঙ্গম করে অথবা খাদ্যজাতীয় ঔষধের জন্য ব্যবহৃত বস্তু পানাহার করে, তাহলে তাকে সে সাওমের কাযাও করতে হবে এবং কাফ্‌ফারাও আদায় করতে হবে। আর সাওমের কাফ্‌ফারা যিহারের কাফ্‌ফারার অনুরূপ। আর কেউ যদি যৌনাঙ্গ (বা পায়খানার রাস্তা) ব্যতীত সহবাস করে এবং তাতে বীর্যপাত হয়, তাহলে এতে কাযা ওয়াজিব হবে, কাফ্‌ফরা ওয়াজিব হবে না। রমযানের সাওম ব্যতীত অন্য সাওম ভঙ্গ করলে কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি ডুস গ্রহণ করে, অথবা নাকে বা কানের ভিতর ঔষধ দেয়, অথবা পেট বা মাথার ক্ষত স্থানে তরল ঔষধ ব্যবহারের পর যদি উহা পেটে বা মস্তিষ্কে ঢুকে যায়, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি পুরুষাঙ্গের ভিতরে ঔষধ দেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, সাওম বিনষ্ট হবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাওমের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ وَقْتُ الصَّوْمِ مِنْ حِيْنِ طُلُوْعِ الخ ঃ সাওমের শুরু হবে সুবহে সাদিক হতে, আর শেষ সূর্যাস্তের সাথে সাথে। এ সময়ের মধ্যে পানাহার ও যৌন সম্ভোগসহ এমন কাজ করা যাবে না, যার ফলে সাওম ভেঙ্গে যায়। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন—

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى اللَّيْلِ

ভুলবশত পানাহার করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ اَكَلَ الصَّائِمُ الخ ঃ সাওম আদায়কারী ভুলবশত যদি পানাহার অথবা সহবাস করে, তাহলে সাওম বিনষ্ট হবে না। এমনিভাবে যদি দিনের বেলায় ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দোষ হয়, স্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাতের কারণে বীর্যপাত হয়, শরীরে তৈল মালিশ করে, শিঙ্গা লাগায়, চোখে সুরমা দেয়, স্ত্রীকে চুম্বন করে এবং বিনা কারণে মুখভরে বমি হয়, তাহলে সাওম নষ্ট হবে না।

কখন কাযা আদায় করা ওয়াজিব হয় ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ الخ ঃ স্ত্রীকে চুম্বন বা স্পর্শ করণের কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তবে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং উহার কাযা আদায় করতে হবে, কিন্তু কাফ্ফারা আদায় করতে হবে না। এমনিভাবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ ভরে বমি করে, অথবা পাথরের কণা, লোহার টুকরা বা ফলের বিচি গিলে ফেলে, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে। এমনি ভাবে ডুস গ্রহণ করলে, নাকে বা কানে ঔষধ দিলে, পেট বা মাথার ক্ষতস্থানে তরল ঔষধ দেয়ার পর উহা পেটে বা মস্তিষ্কে পৌঁছে গেলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে। গুহ্যদ্বার বা যৌনপথ ব্যতীত অন্য কোনভাবে সহবাস করার ফলে বীর্য নির্গত হলে, এবং স্ত্রী লোকের যৌনীপথে ঔষধ দিলে সর্ব সম্মতিক্রমে সাওম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ সব অবস্থায় সাওমের কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না।

কখন কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا الخ ঃ যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে পায়খানা অথবা পেশাবের রাস্তা দ্বারা সহবাস করে অথবা এমন বস্তু পানাহার করে যা খাবার বা ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তাহলে সাওম বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর উহার কাযা ও কাফ্ফারা উভয়ই আদায় করতে হবে।

সাওমের কাফ্ফারার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَالْكَفَّارَةُ مِثْلُ كَفَّارَةِ الظِّهَارِ ঃ রমযানের সাওমের কাফ্ফারা যিহারের কাফ্ফারার ন্যায় তথা একটি দাস আযাদ করা, অথবা একাধারে দু' মাস সাওম রাখা, অথবা ষাটজন মিসকিনকে দুই বেলা আহার করানো।

উল্লেখ্য যে, রমযানের সাওম ছাড়া অন্য কোন সাওমের কাফ্ফারা দিতে হয় না।

وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهٖ لَمْ يُفْطِرْ وَيُكْرَهُ لَهٗ ذٰلِكَ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْضَغَ لِصَبِيِّهَا الطَّعَامَ اِذَا كَانَ لَهَا مِنْهُ بُدٌّ وَ مَضْغُ الْعِلْكِ لَايُفْطِرُ الصَّائِمَ وَيُكْرَهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا فِىْ رَمَضَانَ فَخَافَ اِنْ صَامَ اِزْدَادَ مَرَضُهٗ اَفْطَرَ وَقَضٰى وَاِنْ كَانَ مُسَافِرًا لَايَسْتَضِرُّ بِالصَّوْمِ فَصَوْمُهٗ اَفْضَلُ وَاِنْ اَفْطَرَ وَقَضٰى جَازَ وَاِنْ مَاتَ الْمَرِيْضُ اَوِ الْمُسَافِرُ وَهُمَا عَلٰى حَالِهِمَا لَمْ يَلْزَمْهُمَا الْقَضَاءُ وَاِنْ صَحَّ الْمَرِيْضُ اَوْ اَقَامَ الْمُسَافِرُ ثُمَّ مَاتَا لَزِمَهُمَا الْقَضَاءُ بِقَدْرِ الصِّحَّةِ وَالْاِقَامَةِ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ اِنْ شَاءَ فَرَّقَهٗ وَاِنْ شَاءَ تَابَعَهٗ وَاِنْ اَخَّرَهٗ حَتّٰى دَخَلَ رَمَضَانُ اٰخَرُ صَامَ رَمَضَانَ الثَّانِىْ وَقَضَى الْاَوَّلَ بَعْدَهٗ وَلَافِدْيَةَ عَلَيْهِ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ اِذَا خَافَتَا عَلٰى اَنْفُسِهِمَا اَوْ وَلَدَيْهِمَا اَفْطَرَتَا وَقَضَتَا وَلَافِدْيَةَ عَلَيْهِمَا وَالشَّيْخُ الْفَانِىْ الَّذِىْ لَايَقْدِرُ عَلَى الصِّيَامِ يُفْطِرُ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا كَمَا يُطْعِمُ فِى الْكَفَّارَاتِ -

সরল অনুবাদ ঃ কোন ব্যক্তি মুখের দ্বারা কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করলে তার সাওম বিনষ্ট হবে না, তবে এটা তার জন্য মাকরূহ হবে। মেয়েলোকের জন্য তার শিশুর খাদ্য চিবিয়ে দেয়া মাকরূহ, যদি অন্য কোন উপায় থাকে। আটা চিবানোর কারণে সাওম বিনষ্ট হবে না, তবে মাকরূহ হবে। রমযান মাসে কোন ব্যক্তি রুগ্ণ হবার ফলে আশঙ্কা করে যে, যদি সে সাওম রাখে তবে তার রোগ বৃদ্ধি পাবে, তাহলে সে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে এবং পরে কাযা করবে। আর যদি মুসাফির ব্যক্তির সাওমের দ্বারা ক্ষতি বা কষ্ট না হয়, তবে তার সাওম রাখাই উত্তম। যদি সে (এ অবস্থায়) সাওম ভেঙ্গে ফেলে পরে কাযা করে, তাহলেও জায়েয হবে। যদি রোগী, রুগ্ণ অবস্থায় আর মুসাফির সফরের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদের ওপর কাযা ওয়াজিব হবে না। আর যদি রোগী সুস্থ হয়ে এবং মুসাফির মুকীম হয়ে মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তাদের ওপর সুস্থতা ও ইকামত পরিমাণ সময়ের সাওমের কাযা করা আবশ্যক হবে। রমযানের কাযা ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথক ভাবে রাখতে পারে, ইচ্ছা করলে লাগাতারও রাখতে পারে। যদি রমযানের কাযা সাওম এত বিলম্ব করে যে, দ্বিতীয় রমযান এসে যায়, তাহলে দ্বিতীয় রমযানের সাওম রাখবে, আর পূর্ববর্তী কাযা এরপরে আদায় করবে। এর জন্য কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। গর্ভবতী এবং দুধদানকারিণী নিজের অথবা সন্তানের ক্ষতির আশঙ্কা করলে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে এবং কাযা আদায় করবে। এতে তাদের কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। অতিবৃদ্ধ যে সাওম রাখতে অক্ষম সে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে এবং প্রত্যেক সাওমের জন্য একজন মিসকিনকে খাওয়াবে যেমনি কাফ্ফারার বেলায় খাওয়ানো হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাওম অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهٖ الخ ঃ সাওম রাখা অবস্থায় কোন বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করা মাকরূহ। এখানে স্বাদ গ্রহণ করা দ্বারা উদ্দেশ্য হল, কোন বস্তুকে জিহবার ওপর দিয়ে লবণ, মরিচ ইত্যাদি পরীক্ষা করা; গলাধঃকরণ নয়। এর কিছু অংশ গলাধঃকরণ করলে সাওম নষ্ট হয়ে যাবে।

ছোট বাচ্চার খাবার ও আটা চিবানোর হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ اَنْ تَمْضَغَ الخ ঃ কোন সাওমবিহীন লোক থাকা অবস্থায় সাওম আদায়কারিণী মহিলা তার বাচ্চার খাবার চিবিয়ে দেয়া মাকরূহ। তবে কোন সাওমবিহীন লোক না থাকলে চিবিয়ে দেয়া মাকরূহ নয়। তবে খুব সতর্কভাবে চিবাতে হবে, যাতে কোন অংশ যেন গলায় চলে না যায়।

আর আটা জাতীয় বস্তু চিবালে সাওম বিনষ্ট হবে না। কেননা উহা দাঁতের সাথে জড়িয়ে থাকে, কণ্ঠনালীর ভিতর প্রবেশ করে না। তারপরও সতর্কভাবে চিবানো আবশ্যক।

মুসাফির ও রুগ্ণ ব্যক্তি মুকীম ও সুস্থ হয়ে মৃত্যুবরণ করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ صَحَّ الْمَرِيْضُ اَوْ (اَقَامَ) الْمُسَافِرُ الخ ঃ রুগ্ণ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে কিছুদিন বেঁচে থাকার পর যদি মৃত্যুবরণ করে, অথবা মুসাফির ব্যক্তি ইকামত করার পর যদি মৃত্যুবরণ করে থাকে আর সে কয়দিন সে কাযা আদায় করেনি, তাহলে যে কয়দিন সুস্থ বা একামত অবস্থায় ছিল সে কয়দিনের কাযা ওয়াজিব হবে। সুতরাং তার মৃত্যুকালে উক্ত দিনসমূহের ফিদিয়া আদায় করার জন্য অসিয়ত করে গেলে তার মাল হতে ফিদিয়া আদায় করা ওয়ারিশদের জন্য ওয়াজিব হবে। আর অসিয়ত না করলে ওয়াজিব হবে না; বরং মুস্তাহাব হবে।

রমযানের কাযা আদায়ের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَقَضَاءُ رَمَضَانَ اِنْ شَاءَ فَرَّقَهُ الخ ঃ রমযানের কাযা সাওম আদায়ের কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সে ইচ্ছা করলে পৃথক পৃথকভাবেও আদায় করতে পারে, আর ইচ্ছা করলে লাগাতারও আদায় করতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন- فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ "অন্যান্য দিনে তা আদায় করবে।" এতে কোন নির্দিষ্ট সময়ের উল্লেখ নেই। তবে একাধারে রাখা মুস্তাহাব।

উল্লেখ্য যে, যদি কারো রমযানের সাওম কাযা আদায়ের পূর্বেই পরবর্তী রমযান এসে যায়, তাহলে দ্বিতীয় রমযানের সাওম আদায় করে নেবে, কাযা পরে আদায় করবে। এ বিলম্বের কারণে হানাফীদের মতে, কোন ফিদিয়া দিতে হবে না। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, ওজর ব্যতীত বিলম্ব করলে ফিদিয়া দিতে হবে।

গর্ভবতী ও দুধদানকারিণীর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَالْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ الخ ঃ গর্ভবতী ও দুধদায়িণী যদি ভয় করে যে সাওম রাখলে তাদের সন্তানদের ক্ষতি হবে, তাহলে তারা সাওম ভঙ্গ করতে পারবে, পরে কাযা আদায় করবে। এতে তাদের ফিদিয়া বা কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন—

اِنَّ اللّٰهَ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلٰوةِ وَعَنِ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ

কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, দুধদানকারিণী সাওম ভাঙলে ফিদিয়া দিতে হবে।

অতি বৃদ্ধের সাওমের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَالشَّيْخُ الْفَانِى الَّذِى لَايَقْدِرُ الخ ঃ অতি বয়োবৃদ্ধ যিনি সাওম রাখতে অক্ষম, এরূপ ব্যক্তি সাওম ভেঙ্গে ফেলবে এবং প্রত্যেক সাওমের জন্য একজন মিসকিন খাওয়াবে, যেমনিভাবে কাফ্ফারায় খাওয়ানো হয়।

وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ فَاوْصَى بِهِ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ شَعِيْرٍ وَمَنْ دَخَلَ فِيْ صَوْمِ التَّطَوُّعِ ثُمَّ اَفْسَدَهُ قَضَاهُ وَاِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ فِيْ رَمَضَانَ اَمْسَكَا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَصَامَا بَعْدَهُ وَلَمْ يَقْضِيَا مَامَضَى وَمَنْ اُغْمِيَ عَلَيْهِ فِيْ رَمَضَانَ لَمْ يَقْضِ الْيَوْمَ الَّذِيْ حَدَثَ فِيْهِ الْاِغْمَاءُ وَقَضَى مَابَعْدَهُ وَاِذَا اَفَاقَ الْمَجْنُوْنُ فِيْ بَعْضِ رَمَضَانَ قَضَى مَامَضَى مِنْهُ وَصَامَ مَابَقِيَ مِنْهُ وَاِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اَوْ نَفِسَتْ اَفْطَرَتْ وَقَضَتْ اِذَا طَهُرَتْ وَاِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ فِيْ بَعْضِ النَّهَارِ اَمْسَكَا عَنِ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِمَا وَمَنْ تَسَحَّرَ وَهُوَ يَظُنُّ اَنَّ الْفَجْرَ لَمْ يَطْلُعْ اَوْ اَفْطَرَ وَهُوَ يَرٰى اَنَّ الشَّمْسَ قَدْ غَرَبَتْ ثُمَّ تَبَيَّنَ اَنَّ الْفَجْرَ كَانَ قَدْ طَلَعَ اَوْ اَنَّ الشَّمْسَ لَمْ تَغْرُبْ قَضَى ذٰلِكَ الْيَوْمَ وَلَاكَفَّارَةَ عَلَيْهِ وَمَنْ رَأَى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهُ لَمْ يُفْطِرْ وَاِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يَقْبَلِ الْاِمَامُ فِيْ هِلَالِ الْفِطْرِ اِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ اَوْ رَجُلٍ وَاِمْرَأَتَيْنِ وَاِنْ لَمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ لَمْ يُقْبَلْ اِلَّا شَهَادَةُ جَمَاعَةٍ يَقَعُ الْعِلْمُ بِخَبَرِهِمْ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ আর যে এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে, তার ওপর রমযানের কাযা সাওম রয়েছে, আর সে স্বীয় সাওমের ব্যাপারে অসিয়ত করে গেল, তাহলে তার অভিভাবক তার পক্ষ হতে প্রত্যেক দিনের জন্য একজন মিসকিনকে অর্ধ 'সা' গম অথবা এক 'সা' খেজুর বা যব খাওয়াবে। কোন ব্যক্তি নফল সাওম শুরু করে ভঙ্গ করলে কাযা করতে হবে। রমযানের দিনের বেলায় নাবালেগ বালেগ হলে অথবা কাফির মুসলমান হলে অবশিষ্ট দিন পানাহার হতে বিরত থাকবে, এর পরের দিন হতে উভয়েই সাওম রাখা শুরু করবে. আর যা অতিবাহিত হয়ে গেছে তার কাযা করতে হবে না। যে ব্যক্তি রমযানের দিনে বেহুঁশ হয়ে পড়ে. তার সে দিনের কাযা করতে হবে না যে দিন তার বেহুঁশী ঘটেছে; এর পরের দিনসমূহের কাযা করবে। রমযানের দিনে কোন পাগল সুস্থ হয়ে গেলে রমযানের যতদিন অতিবাহিত হয়ে গেছে তার কাযা করতে হবে, আর অবশিষ্ট দিনগুলোর সাওম আদায় করতে হবে। (রমযানের মধ্যে) মহিলার হায়েয ও নিফাস হলে সাওম ভেঙ্গে ফেলবে এবং পবিত্র হবার পর কাযা করবে। রমযানের দিবসের কিছু অংশে মুসাফির প্রত্যাবর্তন করলে এবং হায়েয ওয়ালী হায়েয হতে পবিত্র হলে দিনের অবশিষ্ট সময় পানাহার হতে বিরত থাকবে। যে ব্যক্তি সুবহে সাদিক হয়নি ভেবে সাহরী খেয়েছে অথবা সূর্য অস্ত গিয়েছে মনে করে ইফতার করেছে, এরপর প্রকাশ পেল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে অথবা সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাকে সে দিনের সাওমের কাযা করতে হবে, তবে কাফ্ফারা দিতে হবে না। কোন ব্যক্তি একা ঈদের চাঁদ দেখলে সাওম ভাঙবে না। আকাশ যদি (মেঘ বা অন্য কোন কারণে) অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকে, তাহলে ইমাম ঈদের চাঁদের বেলায় দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর যদি আকাশে অস্পষ্টতা না থাকে, তাহলে এমন এক বড় দল লোকের সাক্ষ্য ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না, যাদের সংবাদে দৃঢ় জ্ঞান অর্জিত হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ফিদিয়া দানের অসিয়ত করলে তার হুকুম ঃ

فَاَوْصٰى بِهٖ اَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيُّهٗ ঃ যদি কারো ওপর সাওমের কাযা থেকে যায়, আর এ অবস্থায় মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসে, এভাবে মৃত্যু মুখে যদি সে সাওমের ফিদিয়া দানের জন্য অসিয়ত করে যায়, তাহলে তার সম্পদ হতে ফিদিয়া আদায় করা ওয়ারিশগণের ওপর ওয়াজিব। আর যদি অসিয়ত না করে তবে আদায় করলে আদায় হয়ে যাবে। অসিয়ত বাস্তবায়নের জন্য ওয়ারিশদের সম্মতি আবশ্যক। যদি সকলে সম্মত না হয় তাহলে অসিয়ত বাস্তবায়ন আবশ্যক নয়। তবে বন্টনের পর যদি কোন ওয়ারিশ নিজের অংশ হতে ফিদিয়া আদায় করে, তাহলে করতে পারে।

উল্লেখ্য যে, ওয়াশিদের মধ্যে নাবালেগ থাকলে তার অংশ বাদ দিয়ে প্রাপ্ত বয়স্কদের সম্পদ হতে অসিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে।

রমযানের দিনে নাবালেগ বালেগ হলে এবং কাফির মুসলমান হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَاِذَا بَلَغَ الصَّبِىُّ اَوْ اَسْلَمَ الْكَافِرُ الخ ঃ রমযানের দিনের বেলায় কোন নাবালেগ বালেগ হলে কিংবা কোন কাফির মুসলমান হলে তার অবশিষ্ট দিন পানাহার হতে বিরত থাকতে হবে এবং এর পরের দিন হতে সাওম রাখতে হবে। আর সে দিনসহ পূর্ববর্তী দিবসের কোন কাযা দিতে হবে না। কেননা ইতিপূর্বে তাদের ওপর সাওম ফরয হবার উপযোগিতা ছিল না, তাই উক্ত দিবসগুলোর কাযাও ওয়াজিব হবে না। আর সে দিনের অবশিষ্টাংশ ও পরবর্তী দিনগুলোর সাওম এ জন্য রাখতে হবে যে, মুসলমান ও বালেগ হবার কারণে তাদের মধ্যে সাওম রাখার উপযোগিতা এসে গেছে।

কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ اُغْمِىَ عَلَيْهِ فِىْ رَمَضَانَ الخ ঃ রমযানের দিবাভাগে কেউ বেহুঁশ হয়ে পড়লে সে দিনের সাওম কাযা করতে হবে না, তবে শর্ত হল বেহুঁশী হালাতে তাকে যে দিন কিছু খাওয়ানো না হয়নি সে দিনের সাওম হয়ে যাবে। কেননা বেহুঁশী অবস্থায় নিয়ত ও উপবাস উভয়ই পাওয়া গেছে। আর এরপর যতদিন বেহুঁশ থাকবে ততদিনের কাযা করতে হবে। কেননা এতে উপবাস পাওয়া গেলেও নিয়ত পাওয়া যায়নি।

রমযানের দিনে মুসাফির মুকীম হলে অথবা মহিলা হায়েয হতে পবিত্র হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَاِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اَوْ طَهُرَتِ الْحَائِضُ الخ ঃ রমযানের দিবাভাগে মুসাফির মুকীম হলে এবং হায়েয হতে রমণী পবিত্রা হলে অবশিষ্টাংশ পানাহার হতে বিরত থাকবে। সুবহে সাদিকের পূর্ব হতে কিছু না খেলে সাওম হয়ে যাবে, আর কিছু খেয়ে থাকলে মুসাফিরের জন্য কাযা করতে হবে, আর হায়েয ওয়ালীর জন্য কাযা করতে হবে না।

ইফতার ও সাহরীতে ভুলবশত আগে-পরে হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ تَسَحَّرَ وَ هُوَ يَظُنُّ الخ ঃ যদি কোন ব্যক্তি সুবহে সাদিক হয়নি মনে করে সাহরী খায়, এরপর জানতে পারল যে, সুবহে সাদিক হয়ে গেছে অথবা সূর্যাস্ত গেছে ভেবে পানাহার করবার পর দেখা গেল যে, সূর্য অস্ত যায়নি, তাহলে তাদের ওপর সে দিনকার কাযা ওয়াজিব হবে, কিন্তু কাফ্ফারা ওয়াজিব হবে না। কেননা এটা তাদের ভুলবশত হয়েছে— ইচ্ছাকৃতভাবে হয়নি।

ঈদুল ফিতরের চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ رَاٰى هِلَالَ الْفِطْرِ وَحْدَهٗ الخ ঃ কোন ব্যক্তি একাকী ঈদের চাঁদ দেখলে সাওম ভাঙবে না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন বা অন্য কোন কারণে অন্ধকারাচ্ছন্ন থাকলে ঈদের চাঁদ দেখার ব্যাপারে ইমাম দু'জন পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন নারীর সাক্ষ্য ব্যতীত সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। আর আকাশ পরিষ্কার থাকলে এমন এক বিরাট দলের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে, যাদের সাক্ষ্যের ওপর দৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়।

রমযান ও ঈদের চাঁদ দেখার হুকুম ঃ

১. পশ্চিম গগন মেঘাচ্ছন্ন হলে এবং সাধারণভাবে লোকজনের নিকট চন্দ্র উদয় দৃষ্টি গোচর না হলে— খোদাভীরু সত্যবাদী মুসলমান, চাই সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী যদি চাঁদ দেখার সাক্ষ্য দেয়; তবে তার সাক্ষ্য গ্রহণ করে পরের দিন হতে সাওম আরম্ভ করতে হবে। কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে যদি ঈদের চাঁদ দেখা না যায়, তখন কোন একক ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণ করা

হবে না, সে যতই খোদাভীরু হোক না কেন। এক্ষেত্রে দু'জন খোদাভীরু পুরুষ অথবা একজন মুত্তাকী পুরুষ ও দু'জন মুত্তাকিয়া মহিলার যৌথ সাক্ষ্যের প্রয়োজন হবে।

২. আর আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে তবে দু' চার জনের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না; বরং তখন বিরাট এক দলের চাঁদ দেখার প্রয়োজন হবে। যে দলের সকলকে মিথ্যার ওপর ঐকমত্য পোষণ করা অসম্ভব মনে হবে।

৩. চাঁদ দ্রষ্টাগণ ইসলামী সরকার বা তার প্রতিনিধির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। বর্তমান বাংলাদেশে মাননীয় ধর্ম মন্ত্রী কর্তৃক মনোনীত ওলামাদের সমন্বয়ে গঠিত হেলাল কমিটির নিকট সাক্ষ্য প্রদান করবে। চাঁদ দ্রষ্টার সংখ্যা দু' চারজন হলে হেলাল কমিটি চিঠি, টেলিফোন বা ওয়ারলেসের মাধ্যমে তাদের থেকে সংবাদ পেয়ে চাঁদ উদয়ের সিদ্ধান্ত দিতে পারবে না; বরং চাঁদ দ্রষ্টাদের সরাসরি কমিটির সম্মুখে উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য দানের নিয়ম মুতাবিক সাক্ষ্য প্রদান করতে হবে, অথবা কমিটি কোন যোগ্য প্রতিনিধি বিজ্ঞ আলিম চাঁদ দ্রষ্টাদের নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক নিয়ম মুতাবিক সিদ্ধান্ত করবে। অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্ত অত্যন্ত সতর্কতার সাথে স্বয়ং কমিটির কোন আলিম অথবা রেডিও টেলিভিশনের সংশ্লিষ্ট নির্ভরযোগ্য কর্মকর্তার মাধ্যমে কিভাবে চাঁদ দেখা প্রমাণিত হল তার ব্যাখ্যাসহ চাঁদ উদয়ের সংবাদ প্রচার করবে। তবে সরকার যদি কেন্দ্রীয় হেলাল কমিটির অধীনে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যদি সাব কমিটি গঠন করে রাখে এবং কমিটিতে পরহেজগার ফিকাহবিদ আলিম থাকেন এবং উক্ত কমিটিকে চাঁদ দেখার ওপর সাক্ষ্য গ্রহণপূর্বক মীমাংসা করার পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করা হয়, তবে এ কমিটির সিদ্ধান্ত নির্ভরযোগ্য চিঠি বা পরিচিত কণ্ঠের টেলিফোন বা ওয়ারলেসের মাধ্যমে কেন্দ্রিয় কমিটিকে জানালে তারা উক্ত সিদ্ধান্তের কথা আনুপূর্বিক ব্যাখ্যাসহ রেডিও-টিভিতে প্রচার করতে পারবে।

৪. বহু সংখ্যক লোক যদি চাঁদ দেখে থাকে, আর তারা সকলে পৃথক পৃথকভাবে হেলাল কমিটির নিকট টেলিফোন বা হাতে লেখে সংবাদ অবহিত করে এবং কমিটি গলার কণ্ঠস্বর বা হস্তলিপি দেখে টেলিফোন কারক বা চিঠির প্রেরকদের চিনতে পারে এবং সর্বোপরি এদের সংবাদ দ্বারা কমিটি আস্থা অর্জন হয়, তবে কমিটি চন্দ্র উদয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দিতে পারবে। আর এ সিদ্ধান্ত পূর্বোক্ত নিয়মে রেডিও বা টেলিভিশনে প্রচার করবে।

৫. উড়োজাহাজের মাধ্যমে চাঁদ দেখা বৃথা এবং শরয়ী উদ্দেশ্যের পরিপন্থী।

৬. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় হেলাল কমিটি কর্তৃক যথানিয়মে প্রচারিত চাঁদ উঠার সংবাদের প্রতি দেশের সকল মুসলমানের আমল করা ওয়াজিব। প্রতিবেশী রাষ্ট্রের জন্য আমল করা ওয়াজিব নয়।

৭. বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে সর্বদা আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে চন্দ্রোদয় দেখা অসম্ভব, যেমন— ইংল্যাণ্ড তথায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রেডিওর সংবাদের ওপর ভিত্তি করে রমযানের সাওম রাখবে। যদি একথা নিশ্চিতে জানা থাকে যে, সেদেশে শরয়ী বিধান মুতাবিক চাঁদ দেখার সংবাদ প্রচার করা হয়। অথবা অপর কোন দেশের পরিচিত কণ্ঠের একজন নির্ভরযোগ্য আলিম হতে টেলিফোনে জেনে নেবে। আর ঈদ উদ্‌যাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বহু সংখ্যক লোকের মাধ্যমে যদি চাঁদ দেখার সংবাদ আসে, তবে ঈদ উদ্‌যাপন করবে, অন্যথায় চান্দ্র মাস ৩০ দিন পূর্ণ করে ঈদ উদ্‌যাপন করবে।

বিঃ দ্রঃ বিশ্বের যে সকল অঞ্চলে বছরে ছয় মাস প্রতি ২৪ ঘন্টায় মাত্র অর্ধ ঘন্টা রাত এবং বাকি ২৩ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা দিন থাকে (যেমন— ইউরোপ ও আমেরিকার কোন কোন এলাকা) এবং পরবর্তী ছয় মাস প্রতি ২৪ ঘন্টার অর্ধ ঘন্টা দিন আর বাকি ২৩ $\frac{১}{২}$ ঘন্টা রাত থাকে তথায় সাহরী ও ইফতারের নিয়ম হল নিম্নরূপ—

(ক) প্রতি ২৪ ঘন্টায় সূর্য অস্তমিত থাকার সময়কাল যদি এ পরিমাণ হয়, যাতে প্রয়োজনীয় পানাহার সেরে নেয়া সম্ভব, তবে সূর্যাস্ত পর্যন্ত দীর্ঘ সাড়ে তেইশ ঘন্টা (বা কম-বেশি) সময় ব্যাপী সাওম রাখবে। আর যদি এত দীর্ঘ সময় সাওম রাখা সম্ভব না হয়, তবে বছরের ছোট দিন গুলোতে তার কাযা করবে।

(খ) সূর্যাস্তের পর প্রয়োজন মতো পানাহার করারও যদি অবকাশ না থাকে; বরং সূর্যাস্তের সাথে সাথেই পুনরায় উদিত হয়, বা যদি এমন হয় যে, ২৪ ঘন্টার মধ্যে সূর্যই উদিত হয় না, তবে পার্শ্ববর্তী এলাকার সূর্যাস্তের হিসাব অনুপাতে পানাহার করবে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী এলাকায় ২৪ ঘন্টার মধ্যে কখন সূর্য অস্তমিত হয় আর তা কত সময়কাল বহাল থাকে, তা জেনে নিয়ে ঠিক সে সময় টুকুতে পানাহার সেরে নেবে। অথবা বৎসরের যে দিন গুলোতে তথায় সূর্য অস্তমিত হয়, তার সর্বশেষ দিন মুতাবিক আসরের প্রথম ওয়াক্ত থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত সময়ের পরিমাণ নির্ণয় করবে, অতঃপর হিসাবে মুতাবিক প্রতি ২৪ ঘন্টা সময়ের যে অংশে আসরের সালাত আদায় করবে তখন থেকে উক্ত নির্ণীত পরিমাণ সময় অতিক্রম হওয়ার পর ইফতার করে নেবে।

(গ) ঠিক এ বিধানই প্রযোজ্য হবে যখন বিমানে ভ্রমণের কারণে দিন ছোট-বড় হয়ে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। صَوْم -এর لُغْوِى ও شَرْعِى অর্থ লিখ।
২। সাওম কাকে বলে? উহা কত প্রকার ও কি কি?
৩। সাওমের وُجُوْب কখন سَاقِط হয়?
৪। কি কি কারণে সাওম ভঙ্গ হলে শুধু কাযা করলে চলে।
৫। কোন্ কোন্ কারণে সাওম ভঙ্গ হলে قَضَاء ও كَفَّارَه উভয়ই ওয়াজিব হয়?
৬। কি কি কারণে সাওম মাকরূহ হয়? বর্ণনা কর।
৭। কোন্ কোন্ কারণে সাওম ভঙ্গ হয় না? লিখ।
৮। شَيْخ فَانِى، حَامِل، مُرْضِع، مَرِيْض، حَائِض ও مُسَافِر -এর সাওমের হুকুম বর্ণনা কর।
৯। صَوْم -এর কাফ্ফারা কি?
১০। يَوْمُ الشَّكِّ -এর সাওমের হুকুম লিখ।
১১। কোন্ প্রকার সাওমের জন্য নিয়ত নির্দিষ্ট করা ওয়াজিব এবং কোন্ প্রকার সাওমের জন্য নিয়ত করা ওয়াজিব নয়।
১২। কোন্ কোন্ অবস্থায় সাওম ভঙ্গ করা জায়েয আছে? বর্ণনা কর।
১৩। রমযানের সাওম ও অন্যান্য সাওমের জন্য কখন নিয়ত করতে হবে।
১৪। সাওমের মাকরূহাত কি কি?
১৫। রমযানের চাঁদ প্রমাণিত হওয়ার জন্য কয়জনের সাক্ষ্য প্রয়োজন।
১৬। রমযানের দিনে নাবালেগ বালেগ হলে এবং কাফির মুসলমান হলে তার হুকুম কি?

بَابُ الْاِعْتِكَافِ

اَلْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ وَهُوَ اللُّبْثُ فِى الْمَسْجِدِ مَعَ الصَّوْمِ وَنِيَّةِ الْاِعْتِكَافِ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ وَاللَّمْسُ وَالْقُبْلَةُ وَاِنْ اَنْزَلَ بِقُبْلَةٍ اَوْ لَمْسٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهٗ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَا يَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ اَوْ لِلْجُمُعَةِ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَّبِيْعَ وَيَبْتَاعَ فِى الْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّحْضُرَ السِّلْعَةَ وَلَا يَتَكَلَّمُ اِلَّا بِخَيْرٍ وَيُكْرَهُ لَهُ الصَّمْتُ فَاِنْ جَامَعَ الْمُعْتَكِفُ لَيْلًا اَوْ نَهَارًا نَاسِيًا اَوْ عَامِدًا بَطَلَ اِعْتِكَافُهٗ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً بِغَيْرِ عُذْرٍ فَسَدَ اِعْتِكَافُهٗ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَا يَفْسُدُ حَتّٰى يَكُوْنَ اَكْثَرَ مِنْ نِصْفِ يَوْمٍ وَمَنْ اَوْجَبَ عَلٰى نَفْسِهٖ اِعْتِكَافَ اَيَّامٍ لَزِمَهٗ اِعْتِكَافُهَا بِلَيَالِيْهَا وَكَانَتْ مُتَتَابِعَةً وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطِ التَّتَابُعَ فِيْهَا-

ই'তিকাফের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। আর তাহল সাওমের সাথে ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে অবস্থান করা। ই'তিকাফকারীর জন্য স্ত্রী সহবাস করা, স্পর্শ করা এবং চুম্বন দেয়া নিষিদ্ধ। যদি চুম্বন ও স্পর্শ করার দ্বারা বীর্য নির্গত হয়, তাহলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে এবং তার ওপর ই'তিকাফের কাযা ওয়াজিব হবে। ই'তিকাফকারী মানবীয় প্রয়োজন (যেমন- পেশাব, পায়খানা ইত্যাদি) অথবা জুমুআ পড়া ব্যতীত মসজিদ থেকে বের হতে পারবে না। ই'তিকাফকারী দ্রব্য সামগ্রী উপস্থিত করা ব্যতীত ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন ক্ষতি নেই। সে ভালো কথা ছাড়া কোন কথা বলবে না। একেবারে চুপ করে থাকা মাকরূহ। যদি ই'তিকাফকারী রাতে বা দিনে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় সহবাস করে, তাহলে তার ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে। আর বিনা কারণে (প্রয়োজনে) এক মুহূর্তও মসজিদের বাহিরে থাকলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট তার ই'তিকাফ বিনষ্ট হয়ে যাবে, আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, দিনের অর্ধাংশের বেশির ভাগ বাহিরে না থাকলে ই'তিকাফ নষ্ট হবে না। (অর্থাৎ দিনের বেশির ভাগ সময় বাহিরে থাকলে ই'তিকাফ নষ্ট হয়ে যাবে।) আর যে ব্যক্তি নিজের ওপর কয়েক দিনের ই'তিকাফ আবশ্যকীয় করে নেয়, তার ওপর সে দিনগুলোর রাতসহ ই'তিকাফ করা অপরিহার্য হয়ে যাবে। আর ই'তিকাফ সে দিনগুলোর একাধারে করতে হবে, যদিও সে একটানা করার শর্ত করেনি।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اِعْتِكَاف-এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهٗ بَابُ الْاِعْتِكَافِ ঃ اِعْتِكَاف শব্দটি বাবে اِفْتِعَال-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল অবস্থান করা বা নিজেকে আবদ্ধ রাখা। শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল, সাওম অবস্থায় ই'তিকাফের নিয়তে মসজিদে নিজেকে আবদ্ধ রাখা।

ই'তিকাফের প্রকারভেদ ঃ

قَوْلُهٗ اَلْاِعْتِكَافُ مُسْتَحَبٌّ الخ ঃ ই'তিকাফ মোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ

১. **ওয়াজিব** ঃ যদি কেউ ই'তিকাফ করার মানত করে তাহলে তা ওয়াজিব হয়ে যাবে।

২. **সুন্নাতে মুয়াক্কাদা** ঃ রমযানের শেষ দশ দিনে ই'তিকাফ করা সুন্নাতে মুয়াক্কাদায়ে কিফায়া অর্থাৎ দুই একজনে করলে মহল্লার বাকিরা দায়মুক্ত হয়ে যাবে।

৩. **মুস্তাহাব** ঃ উল্লিখিত ১০ দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময়ে ই'তিকাফ করা মুস্তাহাব। চাই তা রমযানে হোক বা রমযানের বাহিরে হোক। উল্লেখ যে, ই'তিকাফের জন্য সাওম রাখা শর্ত।

ই'তিকাফ মসজিদে হওয়া আবশ্যক ঃ

قَوْلُهُ وَهُوَ اللُّبْثُ فِي الْمَسْجِدِ الخ ঃ ই'তিকাফ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য মসজিদ শর্ত। সাহেবাইন (রহঃ)-এর মতে, প্রত্যেক মসজিদে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ, তবে কাযীখানে বর্ণিত আছে, যে মসজিদে নিয়মিত আযান, একামত ও জামাআত হয়, তাতে ই'তিকাফ বিশুদ্ধ। আর মহিলাদের জন্য গৃহের কোণকে পর্দা টানিয়ে নির্দিষ্ট করে নিয়ে তথায় ই'তিকাফ করতে হবে।

ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাসের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُعْتَكِفِ الْوَطْئُ الخ ঃ ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস করা হারাম। এমনিভাবে স্পর্শ করা এবং চুম্বন দেয়াও হারাম। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— وَلَاتُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُوْنَ فِي الْمَسَاجِدِ অর্থাৎ তোমরা মসজিদে ই'তিকাফরত অবস্থায় স্ত্রীদের সাথে মেলামেশা কর না।" এর দ্বারা বোঝা যায় যে, ই'তিকাফ অবস্থায় সহবাস করা হারাম। সুতরাং সহবাসের প্রতি বা দিকে ধাবিত করে এমন কার্যাবলীও হারাম। আর চুম্বন ও স্পর্শ করার কারণে যদি বীর্যপাত হয়, তাহলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে এবং উহার কাযা করা আবশ্যক হয়ে পড়বে।

কোন্ কোন্ কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারবে ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَخْرُجُ الْمُعْتَكِفُ مِنَ الْمَسْجِدِ الخ ঃ দুই কারণে ই'তিকাফকারী মসজিদ হতে বের হতে পারবে—

১. প্রাকৃতিক প্রয়োজনে, যেমন– পায়খানা-পেশাব, জানাবতের গোসল এবং খাবার আনয়নকারী না থাকলে খাবার আনা ইত্যাদি।

২. শরয়ী প্রয়োজনে, যেমন– যে মসজিদে সে ই'তিকাফ করেছে তাতে যদি জুমুআ পড়া না হয় তাহলে জুমুআ পড়ার উদ্দেশ্যে বাহিরে যেতে পারবে।

বিনা ওজরে মসজিদের বাহিরে থাকলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَوْ خَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ سَاعَةً الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, سَاعَةً তথা কয়েক মিনিট বা কিছু সময় বিনা প্রয়োজনে বাহিরে থাকলে ই'তিকাফ বাতিল হয়ে যাবে, কিন্তু সাহিবাইনের নিকট বাতিল হবে না। তবে অর্ধ দিনের বেশি সময়কাল বিনা প্রয়োজনে মসজিদের বাহিরে থাকলে তাঁদের নিকটও ই'তিকাফ ভঙ্গ হয়ে যাবে।

দিনের ই'তিকাফের মানত করলে রাতও শামিল হবে ঃ

قَوْلُهُ وَ مَنْ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ الخ ঃ কোন ব্যক্তি কয়েক দিনের ই'তিকাফের নিয়ত করলে ঐ দিনগুলোর রাতও অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কয়েক রাতের ই'তিকাফের মানত করলে সে রাতগুলোর দিনও অন্তর্ভুক্ত হবে। কেননা ই'তিকাফের জন্য সাওম শর্ত, আর সাওমের জন্য দিন শর্ত, আর দিন বললে তাতে রাতও শামিল হয়।

উল্লেখ্য যে, দিনগুলোর একসাথে ই'তিকাফ করার শর্ত না করলেও একাধারে ই'তিকাফ পালন করা ওয়াজিব।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْاِعْتِكَافُ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

২। اَلْاِعْتِكَافُ কাকে বলে? হুকুমসহ লিখ।

৩। اِعْتِكَاف কত প্রকার ও কি কি?

৪। اِعْتِكَاف এর সংজ্ঞা দাও? বিনা ওজরে কতক্ষণ সময় মসজিদের বাহিরে অবস্থান করলে اِعْتِكَاف ভেঙে যায়।

৫। اِعْتِكَاف অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় বৈধ কিনা?

৬। কি কি কারণে اِعْتِكَاف ভঙ্গ হয়ে যায়?

৭। ই'তিকাফের জন্য রাত-দিন উভয় শর্ত কিনা?

৮। ই'তিকাফের জন্য শর্ত কি কি?

৯। ইতি'কাফ কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

كِتَابُ الْحَجِّ

اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاَحْرَارِ الْمُسْلِمِيْنَ الْبَالِغِيْنَ الْعُقَلَاءِ الْاَصِحَّاءِ اِذَا قَدَرُوْا عَلَى الزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاضِلًا عَنِ الْمَسْكَنِ وَمَا لَابُدَّ مِنْهُ وَعَنْ نَفَقَةِ عِيَالِهِ اِلٰى حِيْنِ عَوْدِهِ وَكَانَ الطَّرِيْقُ اٰمِنًا وَيُعْتَبَرُ فِىْ حَقِّ الْمَرْأَةِ اَنْ يَّكُوْنَ لَهَا مَحْرَمٌ يَحُجُّ بِهَا اَوْ زَوْجٌ وَلَايَجُوْزُ لَهَا اَنْ تَحُجَّ بِغَيْرِهِمَا اِذَا كَانَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَكَّةَ مَسِيْرَةُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِىْ لَايَجُوْزُ اَنْ يَّتَجَاوَزَهَا الْاِنْسَانُ اِلَّا مُحْرِمًا لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذُوالْحُلَيْفَةِ وَلِاَ هْلِ الْعِرَاقِ ذَاتُ عِرْقٍ وَلِاَ هْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةُ وَلِاَهْلِ النَّجْدِ قَرْنٌ وَلِاَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ ، فَاِنْ قَدَّمَ الْاِحْرَامَ عَلٰى هٰذِهِ الْمَوَاقِيْتِ جَازَ وَمَنْ كَانَ بَعْدَ الْمَوَاقِيْتِ فَمِيْقَاتُهُ الْحِلُّ وَمَنْ كَانَ بِمَكَّةَ فَمِيْقَاتُهُ فِى الْحَجِّ الْحَرَمُ وَفِى الْعُمْرَةِ الْحِلُّ -

---

হজ্জের পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ স্বাধীন, বালেগ, জ্ঞান সম্পন্ন, সুস্থ মুসলমানের ওপর হজ্জ ফরয, যখন তারা পাথেয়, সম্বল ও বাহনের ক্ষমতা রাখবে, আর সে অর্থ তার বাসস্থান, নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তু এবং (হজ্জ হতে) ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবারের ভরণ-পোষণের অতিরিক্ত হতে হবে এবং পথও নিরাপদত হতে হবে। মেয়েলোকের জন্য তার সাথে কোন মাহরাম (যেমন– পিতা, ভাই, ছেলে ইত্যাদি) যে তাকে নিয়ে হজ্জ করবে অথবা স্বামী থাকা আবশ্যক। মেয়েলোকটি ও মক্কা শরীফের মাঝে তিনি দিন বা ততোধিক সময়ের দূরত্ব হলে উল্লিখিত দুই ব্যক্তি ছাড়া হজ্জ করা তার জন্য জায়েয নেই। আর মীকাতসমূহ যা ইহ্রাম বাঁধা ছাড়া কোন মানুষের পক্ষে অতিক্রম করা জায়েয নয় তাহল, মদীনা বাসীদের জন্য 'যুল হুলাইফা', ইরাক বাসীদের জন্য 'যাতু ইরক', শাম বাসীদের জন্য 'জুহফা', নজদ বাসীদের জন্য 'কারন', ইয়ামন বাসীদের জন্য 'ইয়ালামলাম'। যদি কোন ব্যক্তি এ সব মীকাতের পূর্বে ইহরাম বাঁধে, তাহলে জায়েয হবে। যে মীকাতের পরে তথা ভিতরে বাস করে তার মীকাত হল হিল্ল (حِلّ)। আর যে ব্যক্তি মক্কায় বসবাস করে, হজ্জের জন্য তার মীকাত হল হেরেম শরীফ এবং ওমরার জন্য হল হিল্ল তথা হেরেমের বাহির।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পটভূমি ঃ

ইবাদত সর্বমোট তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ঃ (১) শুধু শারীরিক ইবাদত, যেমন– সালাত, সাওম ইত্যাদি। (২) শুধু আর্থিক ইবাদত, যেমন– যাকাত, সদকা। (৩) শারীরিক ও আর্থিক উভয়ের সমন্বয়ে সংঘটিত ইবাদত, আর তাহল হজ্জ। সম্মানিত গ্রন্থকার প্রথমোক্ত দুই প্রকার ইবাদতের আলোচনা শেষ করে শেষোক্ত প্রকারের আলোচনা শুরু করেছেন।

হজ্জের তাৎপর্য ঃ

পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের শরীয়তে যেমনিভাবে সালাত, সাওম ও যাকাতের বিধান ছিল, তদ্রূপ হজ্জও ফরয ছিল। কিন্তু শেষ দিকে এসে তাতে কুসংস্কার ঢুকে পড়ে। কারণ হযরত ইসমাঈল (আঃ)-এর বংশধর আরববাসীগণ তাঁর আদর্শকে ভুলে গিয়ে আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল, পরকাল ও রিসালাতকে ভুলে বসেছিল, ঝগড়া-ফাসাদ, লুটতরাজ, ধর্ষণ,

লুণ্ঠন, হত্যা, কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধ করা ছিল তাদের নিত্য দিনের সঙ্গী। ইসমাঈলী চরিত্র বলতে তাদের মাঝে এতটুকুন বাকি ছিল যে, তারা হজ্জ মৌসুমে ঝগড়া-বিবাদ পরিত্যাগ করে মক্কায় গমন করত। হজ্জব্রত পালনের মাধ্যমে স্বীয় পাপ-পঙ্কিলতাকে মুছে ফেলার চেষ্টা করত।

পূর্ববর্তী শরীয়তের ন্যায় ইসলামী শরীয়তও হজ্জকে ফরয সাব্যস্ত করেছে। তবে ইসলামী হজ্জে জাহেলী বেহায়াপনাকে চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে পেয়ারা নবী (সাঃ)-এর বাণীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহর নিমিত্ত হজ্জ পালন করবে এবং এ সফরে কোন গর্হিত কাজে লিপ্ত হবে না, হজ্জ শেষে সে সদ্য প্রসূত শিশুর ন্যায় নিষ্পাপ হয়ে বাড়ি ফিরবে।

হজ্জ কখন ফরয হল ঃ

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে যে, وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا অর্থাৎ "যারা কা'বা ঘরে পৌঁছতে সক্ষম, তাদের ওপর বাইতুল্লাহ শরীফের হজ্জ ফরয করা হয়েছে।" মুফাসসিরীনে কিরামদের ভাষ্য মতে, হজ্জ ৯ম বা ৬ষ্ঠ হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। এরপর মহানবী (সাঃ) দশম হিজরীতে ফরয হজ্জ আদায় করেন, যা ইতিহাসে বিদায় হজ্জ নামে সর্বাধিক পরিচিত।

হজ্জের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اَلْحَجُّ وَاجِبٌ الخ ঃ حَجٌّ শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, ইচ্ছা করা বা সংকল্প করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল, নির্ধারিত সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্যাবলী পালনের মাধ্যমে ইহরামের সাথে বায়তুল্লাহ জেয়ারত করাকে হজ্জ বলা হয়।

হজ্জের শর্তসমূহ ঃ

قَوْلُهُ اَلْحَجُّ وَاجِبٌ عَلَى الْاَحْرَارِ الخ ঃ হজ্জ ফরয হবার জন্য নিচের শর্তসমূহ একান্ত আবশ্যক—

১. স্বাধীন হওয়া ঃ অতএব দাস-দাসীর ওপর হজ্জ কখনো ফরয নয়।

২. মুসলমান হওয়া ঃ তাই কাফির মুশরিকের ওপর হজ্জ আবশ্যক নয়। কেউ যদি কাফির অবস্থায় হজ্জ করে তবে মুসলমান হলে পুনরায় হজ্জ আদায় করতে হবে।

৩. প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়াঃ কাজেই নাবালেগ প্রচুর অর্থ-সম্পদের মালিক হলেও হজ্জ ফরয নয়।

৪. জ্ঞানবান হওয়া ঃ কাজেই পাগল, মাতাল ও নির্বোধ ব্যক্তির ওপর হজ্জ ফরয নয়।

৫. সুস্থ হওয়া ঃ অতএব অসুস্থ, ল্যাংড়া-খোঁড়া, অন্ধ ও চলাফেরা করতে অক্ষম ব্যক্তির ওপর হজ্জ আবশ্যক নয়।

৬. পথখরচ বহনে সক্ষম হওয়া ঃ অর্থাৎ এমন পরিমাণ সম্পদ থাকা যা দিয়ে আসা-যাওয়ার খরচ এবং ফিরে আসা পর্যন্ত পরিবার-পরিজনের খোরপোশের খরচ চলে। তবে এ সম্পদ আবাসস্থল ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রীর অতিরিক্ত হতে হবে।

৭. পথ নিরাপদ হওয়া ঃ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধসহ শত্রু ও হিংস্র জীব-জন্তুর ভয় হতে নিরাপদ হওয়া আবশ্যক।

মহিলাদের জন্য অতিরিক্ত শর্ত ঃ

قَوْلُهُ وَيُعْتَبَرُ فِيْ حَقِّ الْمَرْأَةِ الخ ঃ মহিলার বাড়ি ও মক্কা শরীফের মাঝে যদি তিন দিনের সফরের বা তদূর্ধ্ব দূরত্ব হয়, তাহলে তার সাথে স্বামী অথবা মাহরাম থাকা আবশ্যক। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে যে, যতক্ষণ পর্যন্ত রমণীর সাথে মাহরাম থাকবে না ততক্ষণ পর্যন্ত সে যেন হজ্জ পালন না করে। অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, মহিলাগণ যেন মাহরাম ব্যতীত সফর না করে। মাহরাম সেসব লোককে বোঝায় যাদের সাথে দেখা দেয়া শরীয়ত জায়েয রেখেছে। আর দূরত্ব যদি তিন দিনের সফরের কম হয়, তাহলে একাকী হজ্জ করা শরীয়ত জায়েয রেখেছে। তবে বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের যুগে ৪৮ মাইলে কম হলেও সাথে স্বামী মাহরাম থাকা আবশ্যক।

মীকাত সমূহের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَالْمَوَاقِيْتُ الَّتِيْ لَايَجُوْزُ الخ ঃ পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে হলে ইহরাম বাঁধা আবশ্যক। আর এ ইহরাম বাঁধতে হয় নির্দিষ্ট কিছু স্থান হতে, যাকে মীকাত বলা হয়। নিম্নে মীকাত সমূহের বর্ণনা প্রদত্ত হল—

১. যুল হুলাইফা ঃ এটা মদীনা বাসীদের মীকাত। মদীনা হতে পাঁচ মাইল দক্ষিণে এর অবস্থান।

২. যুহফা ঃ সিরিয়াবাসীদের মীকাত। এটি হেরেম শরীফের বাইরে তাবূকের দিকে তিন মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।

৩. যাতু ইরক ঃ ইরাক বাসীদের মীকাত। এটি মদীনা হতে পূর্ব দিকে এবং মক্কা হতে দুই মঞ্জিল দূরে অবস্থিত।

৪. কারনুল মানাযিল ঃ এটি নজদ বাসীদের মীকাত। মক্কা হতে পূর্ব-উত্তর দিকে এর অবস্থান।

৫. ইয়ালামলাম ঃ এটা ইয়ামন, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানীদের মীকাত। এটি একটি পাহাড়ের নাম, মক্কা হতে দুই মঞ্জিল দূরে এর অবস্থান।

৬. হিল্ল ঃ এটি হচ্ছে যারা মীকাতের ভিতরে ও হেরেম শরীফের বাহিরে বাস করে তাদের মীকাত।

৭. হেরেম শরীফ ও হিল্ল ঃ যারা মক্কা নগরীতে বাস করে তাদের হজ্জের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ, আর ওমরার মীকাত হল হিল্ল তথা হেরেমের বাহির।

وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اِغْتَسَلَ وَتَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيْدَيْنِ أَوْ غَسِيْلَيْنِ إِزَارًا وَ رِدَاءً وَمَسَّ طِيْبًا إِنْ كَانَ لَهُ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَالَ اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْحَجَّ فَيَسِّرْهُ لِيْ وَتَقَبَّلْهُ مِنِّيْ ثُمَّ يُلَبِّيْ عَقِيْبَ صَلٰوتِهٖ فَإِنْ كَانَ مُفْرِدًا بِالْحَجِّ نَوٰى بِتَلْبِيَتِهِ الْحَجَّ وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَّقُوْلَ لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ وَلَا يَنْبَغِيْ أَنْ يُّخِلَّ بِشَيْءٍ مِّنْ هٰذِهِ الْكَلِمَاتِ فَإِنْ زَادَ فِيْهَا جَازَ فَإِذَا لَبّٰى فَقَدْ أَحْرَمَ فَلْيَتَّقِ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ مِنَ الرَّفَثِ وَالْفُسُوْقِ وَالْجِدَالِ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যখন ইহরাম বাঁধার ইচ্ছা করবে তখন গোসল করবে অথবা ওযূ করবে, তবে গোসল করা উত্তম এবং দু'টি নতুন কাপড় অথবা ধৌত করা (পুরাতন) কাপড় পরিধান করবে, (সে দু'টি কাপড় হল) একটি ইজার (লুঙ্গি) অপরটি চাদর, আর সুগন্ধি থাকলে তা লাগাবে। এরপর দুই রাকআত সালাত পড়ে বলবে, হে আল্লাহ! আমি হজ্জের নিয়ত করেছি অতএব আপনি উহা আমার জন্য সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে কবুল করে নিন। তারপর সালাত শেষে তালবিয়া পাঠ করবে। যদি সে ইফরাদ হজ্জ পালনকারী হয়, তাহলে তালবিয়া দ্বারা হজ্জের নিয়ত করবে। আর তালবিয়া হল এটা বলা যে, লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইকা, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বাইকা, ইন্নাল হামদা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলকা লা শারীকা লাকা। উপরোক্ত কালিমাসমূহ হতে কম করা উচিত নয়। যদি উহাতে কিছু বৃদ্ধি করে, তবে জায়েয হবে। আর যখন সে তালবিয়া পাঠ করবে তখন সে মুহরিম হয়ে যাবে। তারপর আল্লাহ্ পাক যেসব কাজ নিষেধ করেছেন তা হতে বেঁচে থাকবে, যেমন– সহবাস করা, শরীয়তের সীমা লঙ্ঘন করা এবং ঝগড়া-বিবাদ করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইহরাম বাঁধার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ الخ ঃ ইহরাম বাঁধার পূর্বে গোসল করবে অথবা ওযূ করবে তবে গোসল করা উত্তম। কেননা উক্ত গোসল পবিত্রতার জন্য নয়; বরং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার জন্য। এরপর সেলাইবিহীন দুই টুকরা নতুন অথবা ধৌত করা পুরাতন কাপড় পরিধান করবে। এরপর সুগন্ধি থাকলে তা ব্যবহার করে দুই রাকআত সালাত পড়বে। তারপর হজ্জের নিয়ত করবে। হজ্জ ও ওমরা একসাথে করলে উভয়ের নিয়ত করবে। সালাতের পর পরই তালবিয়া পাঠ শুরু করবে। আর তালবিয়া পাঠের সাথে সাথে সে মুহরিম হয়ে যাবে।

তালবিয়া ও তার অর্থ ঃ

قَوْلُهُ وَالتَّلْبِيَةُ أَنْ يَّقُوْلَ الخ ঃ তালবিয়া হল এটা বলা–

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَاشَرِيْكَ لَكَ ٠

অর্থাৎ "হে আল্লাহ! আমি উপস্থিত হয়েছি। তোমার সমীপে হাজির হয়েছি। তোমার কোন অংশীদার নেই। নিশ্চয়ই সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই জন্য। সার্বভৌমত্ব তোমারই জন্য। তোমার কোন অংশীদার নেই।" তালবিয়াতে উপরোক্ত শব্দ হতে কমানো জায়েয হবে না। কেননা নবী কারীম (সাঃ) হতে এর কম বলার প্রমাণ নেই। তবে উল্লিখিত শব্দাবলী হতে বৃদ্ধি করা জায়েয আছে।

ইহরাম অবস্থায় সহবাস, ফাসিকী ও ঝগড়া করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَلْيَتَّقِ مَانَهَى اللّٰهُ عَنْهُ الخ ঃ ইহরাম বেঁধে তালবিয়া পাঠ করার পরপরই মুহরিম হয়ে যাবে এবং তার ওপর সহবাস, ফাসিকী এবং ঝগড়া করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন–

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَارَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَاجِدَالَ فِى الْحَجِّ

رَفَث ঃ এর অর্থ হল শুধু সহবাস। অতএব মুহরিম তার স্ত্রী বা দাসীর সাথে সহবাস করতে পারবে না এবং সহবাসের দিকে নিয়ে যায় এরূপ কোন কাজ করাও ঠিক নয়।

فِسْق ঃ 'ফিসক' সকল রকমের পাপাচারকে বলে। যদিও পাপাচার সব সময় নিষিদ্ধ কিন্তু ইহরাম অবস্থার পাপাচার অন্য সময়ের তুলনায় অধিক জঘন্য। এমনকি কখনো এর ফলে হজ্জও বিনষ্ট হয়ে যায়।

جِدَال ঃ জিদাল -এর অর্থ হল ঝগড়া-বিবাদ করা। কেউ কেউ এর দ্বারা কেবল মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করাকে উদ্দেশ্য নিয়েছেন। তবে সব রকমের ঝগড়া-ফাসাদই এর দ্বারা উদ্দেশ্য। ইহরাম অবস্থায় এ সব কাজ জঘন্য অপরাধ।

وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ وَلَا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَا سَرَاوِيْلَ وَلَا عِمَامَةً وَلَا قَلَنْسُوَةً وَلَا قَبَاءً وَلَا خُفَّيْنِ اِلَّا اَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَيَقْطَعُهُمَا مِنْ اَسْفَلِ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يُغَطِّيْ رَأْسَهُ وَلَا وَجْهَهُ وَلَا يَمَسُّ طِيْبًا وَلَا يَحْلِقُ رَأْسَهُ وَلَا شَعْرَ بَدَنِهٖ وَلَا يَقُصُّ مِنْ لِحْيَتِهٖ وَلَا مِنْ ظُفْرِهٖ وَلَا يَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ وَلَا بِزَعْفَرَانٍ وَلَا بِعُصْفُرٍ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ غَسِيْلًا وَلَا يَنْفُضُ الصَّبْغَ وَلَا بَأْسَ اَنْ يَّغْتَسِلَ وَيَدْخُلَ الْحَمَّامَ وَيَسْتَظِلَّ بِالْبَيْتِ وَالْمَحْمِلِ وَيَشُدُّ فِيْ وَسَطِهِ الْهِمْيَانَ وَلَا يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَلَا لِحْيَتَهُ بِالْخِطْمِيِّ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ عَقِيْبَ الصَّلَوَاتِ وَكُلَّمَا عَلَا شَرَفًا اَوْ هَبَطَ وَادِيًا اَوْ لَقِيَ رُكْبَانًا وَبِالْاَسْحَارِ فَاِذَا دَخَلَ بِمَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَاِذَا عَايَنَ الْبَيْتَ كَبَّرَ وَهَلَّلَ -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকারি প্রাণীকে হত্যা করবে না, উহার প্রতি ইশারা করবে না এবং অন্যকে তার দিকে পথ দেখাবে না। আর জামা, পায়জামা, পাগড়ি, টুপি, কাবা এবং মোজা পরিধান করবে না, তবে জুতা পাওয়া না গেলে মোজাদ্বয়কে পায়ের গোড়ালির নিচ দিয়ে কেটে পরিধান করবে, মাথা ও চেহারা ঢাকবে না এবং সুগন্ধি ব্যবহার করবে না। মাথা ও শরীরের পশম মুন্ডন করবে না, দাঁড়ি ও নখ কাটবে না। গোলাপী, জাফরানী ও হলুদ রংয়ে রঞ্জিত কাপড় পরিধান করবে না, কিন্তু যদি ধৌত করা হয় এবং রং ও সুগন্ধি না ছড়ায় তাহলে পরিধান করতে পারবে। গোসল করা, হাম্মাম খানায় প্রবেশ করা, ঘর বা উটের হাওদার ছায়া গ্রহণ করতে এবং কোমরে থলি বাঁধতে কোন আপত্তি বা দোষ নেই। খিতমী দ্বারা চুল ও দাড়ি ধৌত করবে না। সালাতের শেষে অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে। আর যখন উঁচু স্থানে আরোহণ করবে অথবা নিচের দিকে অবতরণ করবে অথবা আরোহীদের সাথে সাক্ষাৎ করবে এবং শেষ রাতে (এ সকল সময়) অধিক পরিমাণে তালবিয়া পাঠ করবে। যখন মক্কা শরীফে প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম মাসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। আর যখন বাইতুল্লাহ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ইহরাম অবস্থায় শিকার করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَقْتُلُ صَيْدًا وَلَا يُشِيْرُ اِلَيْهِ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় স্থল ভাগের প্রাণী শিকার করা নিষিদ্ধ। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,— وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا

তবে জলভাগের প্রাণী শিকার করা জায়েয। যেমনি কুরআনে এসেছে—

اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ

এমনিভাবে স্থলভাগের শিকারের প্রতি ইশারা করা তার দিকে পথ দেখিয়ে দেয়াও জায়েয নেই।

মুহরিমের পোশাক পরিধানের বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَلْبَسُ قَمِيْصًا وَلَاسَرَاوِيْلَ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় সেলাইবিহীন কাপড় পরিধান করতে হয়। এ কারণে জামা, পাজামা, পাগড়ি, টুপী ইত্যাদি পরিধান করা সিদ্ধ নয়। তবে মহিলারা যে কোন ধরনের পোশাক পরতে পারবে। কেননা তাদের সর্বাঙ্গ ঢেকে রাখা ফরয।

আর ইহরাম অবস্থায় মুখমন্ডল ও মাথা ঢেকে রাখা নিষিদ্ধ। কেননা হাদীস শরীফে মুহরিমের মাথা ও চেহারা আবৃত না রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। কেননা কিয়ামতের দিন মুহরিমকে তার ইহরামের পোশাক পরিহিত অবস্থায় ওঠানো হবে। তবে মহিলাদের মাথা আবৃত রাখতে হবে, শুধু চেহারা ও হাত ঢেকে রাখবে না।

উল্লেখ্য যে, জুতা না থাকলে পায়ের গিটের নিচ পর্যন্ত কেটে মোজা পরিধান করতে পারবে। ইমাম আহমদ ও আতার নিকট জুতা না থাকলে মোজা না কেটেও ব্যবহার করা যাবে।

ইহরাম অবস্থায় সাজ-সজ্জার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَمَسُّ طِيْبًا وَلَايَحْلِقُ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় সুগন্ধি ব্যবহার করা যাবে না, মাথার চুল, দাড়ি ও নখ কাটা যাবে না। কেননা মুহরিমের জন্য সাজ-সজ্জা করা নিষিদ্ধ। এ সবগুলো সাজ-সজ্জার অন্তর্ভুক্ত বিধায় নিষেধ করা হয়েছে। এমনিভাবে মাথার চুল ও দাড়িতে সুগন্ধি বা তেল ব্যবহার করতে পারবে না; বরং এলোমেলো রাখাই উত্তম।

ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা নিষেধ নয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَابَأْسَ بِاَنْ يَغْتَسِلَ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় গোসল করা, গোসল খানায় প্রবেশ করা, রৌদ্রের তাপ হতে বাঁচার জন্য ছায়ায় যাওয়া নিষেধ নয়। সাহাবায়ে কিরাম এরূপ করেছেন বলে প্রমাণিত আছে, যেমন— হযরত ওসমান (রাঃ)-এর জন্য ইহরাম অবস্থায় তাঁবু টানানো হত। এমনিভাবে কোমরে টাকার থলি বাঁধাও জায়েয, আর এটা সেলাই করা হওয়াতে কোন দোষ নেই। কেননা টাকা পয়সা হেফাজতের জন্য উহা একান্ত আবশ্যক।

কোন্ কোন্ সময়ে অধিক তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْثِرُ مِنَ التَّلْبِيَةِ الخ ঃ ফরয ও নফল সালাতে বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব। এছাড়া উঁচু স্থানে আরোহণ, নিম্ন দিকে গমন অথবা কোন আরোহী দলের সাথে সাক্ষাৎকালে এবং শেষ রাতে ঘুম হতে ওঠার পর বেশি বেশি তালবিয়া পাঠ করা মুস্তাহাব।

মক্কায় প্রবেশকালে প্রথম কাজ ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ الخ ঃ মক্কায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে। মহানবী (সাঃ) এরূপ করেছেন বলে হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। আর যখন বাইতুল্লাহ শরীফ দেখবে তখন আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলতে থাকবে।

ثُمَّ اِبْتَدأَ بِالْحَجَرِ الْاَسْوَدِ فَاسْتَقْبَلَهُ وَكَبَّرَ وَهَلَّلَ و رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ وَاسْتَلَمَهُ و قَبَّلَهُ اِنِ اسْتَطَاعَ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُّؤْذِى مُسْلِمًا ثُمَّ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهٖ مَايَلِى الْبَابَ وَقَدْ اِضْطَبَعَ رِدَاءَهٗ قَبْلَ ذٰلِكَ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ وَيَجْعَلُ طَوَافَهٗ مِنْ وَّرَاءِ الْحَطِيْمِ وَيَرْمَلُ فِى الْاَشْوَاطِ الثَّلٰثِ الْاَوَّلِ وَيَمْشِىْ فِيْمَا بَقِىَ عَلٰى هَيْئَتِهٖ وَيَسْتَلِمُ الْحَجَرَ كُلَّمَا مَرَّ بِهٖ اِنِ اسْتَطَاعَ وَيَخْتِمُ الطَّوَافَ بِالْاِسْتِلَامِ ثُمَّ يَأْتِى الْمَقَامَ فَيُصَلِّىْ عِنْدَهٗ رَكْعَتَيْنِ اَوْ حَيْثُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَهٰذَا الطَّوَافُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ وَلَيْسَ عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ طَوَافُ الْقُدُوْمِ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّفَا فَيَصْعَدُ عَلَيْهِ وَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ وَيُكَبِّرُ وَيُهَلِّلُ وَيُصَلِّىْ عَلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَدْعُو اللّٰهَ تَعَالٰى لِحَاجَتِهٖ -

সরল অনুবাদ ঃ এরপর হাজরে আসওয়াদ হতে কাজ শুরু করবে। হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে রেখে আল্লাহু আকবার ও লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে এবং তাকবীরের সাথে উভয় হাত উত্তোলন করে উহাকে স্পর্শ করবে, আর সম্ভব হলে কোন মুসলমানকে কষ্ট না দিয়ে উহাকে চুম্বন করবে। তারপর বাইতুল্লাহ্ শরীফের দরজার ডান দিক হতে শুরু করবে। এর পূর্বে চাদরকে বগলের নিচে দিয়ে বাম কাঁধের ওপর রাখবে। অতঃপর বাইতুল্লাহ শরীফ সাতবার তওয়াফ করবে, আর তওয়াফ হাতীমের পিছন দিয়ে করবে এবং প্রথম তিনবার (একটু হেলে দুলে, বুক উঁচু করে দ্রুত চলবে) রমল করবে, অবশিষ্ট তওয়াফে স্বাভাবিক ভাবে চলবে। আর হাজরে আসওয়াদের পার্শ্ব দিয়ে যখনই গমন করবে সম্ভব হলে উহাকে স্পর্শ করবে এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শের সাথে তওয়াফ শেষ করবে। এরপর মাকামে ইব্রাহীমে আগমন করে তার নিকট দুই রাকআত সালাত পড়বে, অথবা মাসজিদে হারামের যেখানেই সহজ হবে সেখানে দুই রাকআত সালাত পড়বে। আর এ তওয়াফকেই তওয়াফে কুদূম বলা হয়। এটা সুন্নত, ওয়াজিব নয়। মক্কাবাসীদের ওপর তাওয়াফে কুদূম নেই। তারপর সাফা পাহাড়ের দিকে চলে যাবে এবং উহার ওপর আরোহণ করে বাইতুল্লাহর দিকে মুখ করবে এবং তাকবীর ও তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ) পাঠ করবে। নবী কারীম (সাঃ)-এর ওপর দরূদ প্রেরণ করবে এবং নিজের প্রয়োজনের জন্য আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাত ওঠানোর স্থানসমূহ ঃ

قَوْلُهٗ و رَفَعَ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيْرِ ঃ মক্কায় প্রবেশ করে সর্বপ্রথম বাইতুল্লায় পৌঁছে হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে রেখে তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। আর তাকবীর ও তাহলীলের সময় সালাতের ন্যায় কানের লতি বা মতান্তরে কাঁধ পর্যন্ত হাত ওঠাতে হবে। ইমাম ইব্রাহীম নখয়ী (রহঃ) বলেন, সাত স্থানে হাত ওঠাতে হয়— (১) সালাত শুরু করবার সময়, (২) বিতিরের দোয়ায়ে কুনূতের তাকবীরের সময়, (৩) ঈদের অতিরিক্ত তাকবীর সমূহে (৪) হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার সময়, (৫) সাফা-মারওয়ায় পৌঁছার সময়, (৬) আরাফা এবং মুযদালিফায় এবং (৭) উভয় জমরার নিকটে পৌঁছে।

হাজরে আসওয়াদকে স্পর্শ ও চুমু দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاسْتَلَمَهُ وَقَبَّلَهُ الخ ঃ হাজরে আসওয়াদে পৌঁছে হাত উত্তোলন করে তাকবীর ও তাহলীলের পর হাজরে আসওয়াদকে সম্ভব হলে স্পর্শ করবে এবং চুমু দেবে মানুষকে কষ্ট দেয়া ব্যতীত; অন্যথা হাজরে আসওয়াদকে সম্মুখে রেখে কেবল তাকবীর ও তাহলীল পাঠ করবে। আর হাজরে আসওয়াদের নিকট যাওয়া সম্ভব না হলে কোন লাঠি হাজরে আসওয়াদের সাথে লাগাবে এবং উক্ত লাঠিকে স্পর্শ ও চুম্বন করবে। হুজুর (সাঃ) হতে এরূপ করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

তওয়াফ করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ اَخَذَ عَنْ يَمِيْنِهِ الخ ঃ হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর বাইতুল্লাহ শরীফের দরজার দিক হতে সে ব্যক্তির ডান পার্শ্ব দিয়ে তওয়াফ শুরু করবে। তওয়াফ করবার সময় চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে ঘুরিয়ে বাম কাঁধের ওপর ফেলবে এবং ডান দিক হতে শুরু করে হাতীমের বাহির দিয়ে ঘুরে তওয়াফ করবে। একবার ঘুরে আসলে এক চক্কর হবে, একে শাওত বলে। এভাবে সাত শাওত তওয়াফ করতে হবে।

হাতীমের পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ وَيَجْعَلُ طَوَافَهُ مِنْ وَرَاءِ الْحَطِيْمِ ঃ হাতীম অর্থ ভগ্নাংশ। এটি কা'বারই অংশ বলে অনেকে মত ব্যক্ত করেছেন। কুরাইশরা তাদের বৈধ অর্থে কা'বাকে পুনঃ নির্মাণ করতে গিয়ে অর্থের সংকুলান না হওয়ায় এ অংশটি বাদ দেয়। এটি মীযাবে রহমতের নিকট বাইতুল্লাহর সাথে জড়িত। এ অংশটি বর্তমানে বৃত্তাকারে দেয়াল বেষ্টিত অবস্থায় রয়েছে। সহীহ মুসলিমে এসেছে যে, এর দৈর্ঘ্য ছয়গজ। এ হাতীমকে বাদ দিয়ে কেউ তওয়াফ করলে তার তওয়াফ হবে না। কেননা রাসূল (সাঃ) হাতীমের বাহিরে তওয়াফ করেছেন। আবার শুধু হাতীমকে সামনে রেখে সালাত পড়লেও সালাত হবে না।

রমল করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيَرْمُلُ فِى الْاَشْوَاطِ الثَّلٰثِ الخ ঃ রমল অর্থ উভয় স্কন্ধকে হেলে দুলে বাহাদুরের ন্যায় চলা। সপ্তম হিজরীতে ওমরাতুল কাযার সময় মুসলমানগণ যখন ধীরে ধীরে তওয়াফ করতেছিলেন, তখন মুশরিকগণ বলতে লাগল যে, ইয়াসরিবের (মদীনার) জ্বর তাদিগকে দুর্বল করে দিয়েছে। এ কথা শুনে রাসূল (সাঃ) আদেশ করলেন যে, তোমরা হেলে দুলে বাহাদুরের ন্যায় তওয়াফ কর। আর তখন হতে রমল সুন্নত হয়ে গেছে। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, রমল সুন্নত নয়। কেননা যে কারণে উহা সুন্নত হয়েছিল সে কারণ এখন আর বিদ্যমান নেই।

মাকামে ইব্‌রাহীমে সালাত পড়ার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ يَأْتِى الْمَقَامَ فَيُصَلِّى عِنْدَهُ الخ ঃ তওয়াফ শেষে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করে মাকামে ইব্‌রাহীমে আগমন করবে। মাকামে ইব্‌রাহীম যমযমের পার্শ্বে একটি স্থান যেখানে হযরত ইব্‌রাহীম (আঃ)-এর স্মৃতি বিজড়িত পদাঙ্ক চিহ্নিত পাথরটি রয়েছে। যার ওপর দাঁড়িয়ে তিনি পবিত্র কা'বাঘর নির্মাণ করেছেন। এখানে এসে দুই রাকআত সালাত পড়বে। কেননা, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مُصَلًّى

সেখানে সালাত পড়া সম্ভব না হলে মাসজিদে হারামের যে কোন স্থানে পড়লেই চলবে।

তাওয়াফে কুদূমের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَهُوَ سُنَّةٌ لَيْسَ بِوَاجِبٍ الخ ঃ মক্কা শরীফে গিয়ে সর্বপ্রথম যে তওয়াফ করা হয়, তাকে তাওয়াফে কুদূম বলে। বহিরাগত হাজীদের জন্য এটা সুন্নত। মক্কা ও মীকাতের ভিতরে যারা বসবাস করে তাদের জন্য তাওয়াফে কুদূম সুন্নত নয়। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, মীকাতের বাহিরে যারা বসবাস করে তাদের জন্য এটা ওয়াজিব। তাছাড়া তাওয়াফে কুদূম ইফরাদ হজ্জকারীর জন্য, তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর জন্য নয়। কেননা প্রথমে ওমরার তওয়াফ করা তাদের ওপর আবশ্যক। তবে কিরানকারীর জন্য ওমরার তাওয়াফের পর তাওয়াফে কুদূম করবার অনুমতি রয়েছে।

ثُمَّ يَنْحَطُّ نَحْوَ الْمَرْوَةِ وَيَمْشِي عَلَى هَيْئَتِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي سَعَى بَيْنَ الْمِيلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ سَعْيًا حَتَّى يَأْتِيَ الْمَرْوَةَ فَيَصْعَدُ عَلَيْهَا وَيَفْعَلُ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا وَهٰذَا شَوْطٌ فَيَطُوفُ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَبْتَدِئُ بِالصَّفَا وَيَخْتِمُ بِالْمَرْوَةِ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ مُحْرِمًا فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ كُلَّمَا بَدَا لَهُ وَإِذَا كَانَ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ الْاِمَامُ خُطْبَةً يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيهَا الْخُرُوجَ اِلَى مِنًى وَالصَّلٰوةَ بِعَرَفَاتٍ وَالْوُقُوفَ وَالْاِفَاضَةَ فَإِذَا صَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ بِمَكَّةَ خَرَجَ اِلَى مِنًى وَاَقَامَ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ الْفَجْرَ يَوْمَ عَرَفَةَ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ اِلَى عَرَفَاتٍ فَيُقِيمُ بِهَا فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ صَلَّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ -

সরল অনুবাদ ঃ তারপর মারওয়ার দিকে অবতরণ করবে এবং নিজের স্বাভাবিক অবস্থায় চলবে। যখন বাতনে ওয়াদীতে পৌঁছবে, তখন মীলাইনে আখযারাইনের (সবুজ চিহ্নিত) মধ্যবর্তী স্থানে সজোরে দৌড়াবে, এমনকি অবশেষে মারওয়া পর্বতে পৌঁছে উহাতে আরোহণ করবে এবং সেসব কাজ করবে যা সাফা পর্বতে করেছে। এতে এক শাওত হল। এভাবে সাত শাওত (চক্কর) করবে। সাফা হতে শুরু করে মারওয়াতে শেষ করবে। তারপর ইহরাম অবস্থায় মক্কা শরীফে অবস্থান করবে এবং যতবার মন চায় বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে। আর তারবিয়া দিবসের পূর্ব দিন অর্থাৎ যিলহজ্জের সপ্তম তারিখে ইমাম সাহেব একটি ভাষণ দেবেন, এতে মানুষদিগকে মিনায় যাওয়া, আরাফায় সালাত পড়ার নিয়ম, আরাফায় অবস্থান এবং আরাফা হতে প্রত্যাবর্তনের নিয়ম-কানুন শিক্ষা দেবে। অতঃপর যখন তারবিয়ার দিবসে তথা ৮ তারিখে মক্কায় ফজরের সালাত পড়বে তখন মিনার দিকে রওয়ানা দেবে এবং আরাফার তথা নবম তারিখের ফজর পর্যন্ত তথায় অবস্থান করবে। অতঃপর আরাফার দিকে রওয়ানা দেবে এবং তথায় অবস্থান করবে। অতঃপর যখন সূর্য হেলে যাবে, তখন ইমাম সাহেব মানুষদেরকে নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত পড়বে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাফা ও মারওয়া সায়ী করার নিয়ম ঃ

قَوْلُهُ ثُمَّ يَخْرُجُ اِلَى الصَّفَاءِ الخ ঃ তাওয়াফে কুদূম হতে অবসর হয়ে প্রথমে সাফা পর্বতে আরোহণ করবে। পাহাড়ে আরোহণ করে তাকবীর, তাহলীল ও দরূদ শরীফ পাঠ করে বিনয়ের সাথে আল্লাহর নিকট প্রয়োজনীয় বিষয় প্রার্থনা করবে। কেননা এটা দোয়া কবুল হবার স্থান। অতঃপর সাফা হতে অবতরণ করে স্বাভাবিক গতিতে মারওয়া পর্বতের দিকে গমন করবে এবং اَلْمِيلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ (মীলাইনে আখযারাইন)-এর মধ্যবর্তী স্থানে দ্রুত চলবে, এরপর পুনঃ স্বাভাবিক গতিতে চলে মারওয়া পর্বতে আরোহণ করবে। এতে এক শাওত হবে। এরূপ সাত شَوْط (শাওত) করতে হবে। ইমাম ত্বাহাবী (রহঃ) সাফা হতে শুরু করে পুনঃ সাফাতে ফিরে আসাকে এক শাওত বলেন। আর সায়ী সাফা পাহাড় হতে শুরু করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা প্রথমে সাফা পাহাড়ের কথাই উল্লেখ করেছেন। যেমন—

اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا

মক্কায় অবস্থানের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ ثُمَّ يُقِيمُ بِمَكَّةَ الخ ঃ ইফরাদ হজ্জকারী তওয়াফ ও সায়ী করার পর মক্কায় অবস্থান করবে তথা ইহরাম অবস্থায় হজ্জের দিনের অপেক্ষায় থাকবে। হজ্জের দিনের পূর্বে যত ইচ্ছা নফল তওয়াফ করবে। কেননা মক্কা শরীফে তওয়াফই হল সর্বোত্তম ইবাদত।

'ইয়াউমুত্ তারবিয়া'-এর পরিচিতি ঃ

قَوْلُهُ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ الخ ঃ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ অর্থ হল পানি পান করানোর দিন। এটা হল ৮ তারিখ। পূর্বেকার যুগে এ দিনে হাজীগণ তাদের উটকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পানি পান করায়ে নিত, যাতে করে ৯ তারিখে মিনা ও আরাফায় গিয়ে ফিরে আসা পর্যন্ত পানি পান করানোর প্রয়োজন না পড়ে। পূর্বেকার যুগে ঐ সব স্থানে পানি পান করানোর কোন ব্যবস্থা ছিল না। বর্তমানে প্রচুর ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও পূর্বোক্ত নিয়ম বহাল থেকে গেছে।

খুতবার বিধান ঃ

قَوْلُهُ خَطَبَ الْإِمَامُ خُطْبَةً الخ ঃ হজ্জের মধ্যে সর্বমোট তিনটি খুতবা রয়েছে— (১) সাত তারিখে মক্কায়, (২) নয় তারিখে আরাফার ময়দানে, (৩) এগারো তারিখে মিনাতে। এর মধ্যে ৭ ও ১১ তারিখের খুতবাদ্বয় যোহরের পর দিতে হবে। আর ৯ তারিখের খুতবা সূর্য হেলে যাবার পর যোহরের পূর্বে দেবে। এ তিনটি খুতবা তাকবীর, তালবিয়া ও তাহমীদের সাথে শুরু করা ওয়াজিব। ৭ তারিখের খুতবায় মিনার দিকে যাত্রা, মিনায় একদিন একরাত অবস্থানের পর নয় তারিখে আরাফায় যাত্রা, তথায় সালাত আদায় করা ও অবস্থান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের নিয়মাবলী ইমাম সাহেব বর্ণনা করবেন।

فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ اَوَّلًا فَيَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ قَبْلَ الصَّلٰوةِ يُعَلِّمُ النَّاسَ فِيْهِمَا الصَّلٰوةَ وَالْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَ رَمْىَ الْجِمَارِ وَالنَّحْرَ وَالْحَلْقَ وَطَوَافَ الزِّيَارَةِ وَيُصَلِّىْ بِهِمُ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِىْ وَقْتِ الظُّهْرِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَتَيْنِ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ فِىْ رَحْلِهٖ وَحْدَهٗ صَلّٰى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا فِىْ وَقْتِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا الْمُنْفَرِدُ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ اِلَى الْمَوْقِفِ فَيَقِفُ بِقُرْبِ الْجَبَلِ وَعَرَفَاتٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطْنَ عُرَنَةَ وَيَنْبَغِىْ لِلْاِمَامِ اَنْ يَّقِفَ بِعَرَفَةَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ وَيَدْعُوْ وَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْمَنَاسِكَ وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَّغْتَسِلَ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَيَجْتَهِدُ فِى الدُّعَاءِ فَاِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ اَفَاضَ الْاِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهٗ عَلٰى هَيْئَتِهِمْ حَتّٰى يَاْتُوا الْمُزْدَلِفَةَ فَيَنْزِلُوْنَ بِهَا ـ وَالْمُسْتَحَبُّ اَنْ يَّنْزِلُوْا بِقُرْبِ الْجَبَلِ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْمِيْقَدَةُ يُقَالُ لَهُ الْقُزَحُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর প্রথমত খুতবা শুরু করবেন। সালাতের পূর্বে দুই খুতবা প্রদান করবেন। এতে মানুষদিগকে সালাত, আরাফায় ও মুযদালিফায় অবস্থান, পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী করা, মাথা মুন্ডানো এবং তাওয়াফে যিয়ারতের বিষয়াবলী শিক্ষা দেবেন; আর এক আযান ও দুই একামতের সাথে যোহরের ওয়াক্তে লোকদেরকে নিয়ে যোহর ও আসরের সালাত পড়বেন। আর যে ব্যক্তি তার তাঁবুতে একাকী যোহরের সালাত পড়বে সে যোহর ও আসর প্রত্যেকটি সালাত স্ব স্ব ওয়াক্তে পড়বে, এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, একাকী সালাত আদায়কারীও উভয় সালাতকে একসাথে পড়বে। এরপর অবস্থান করবার স্থানের দিকে রওয়ানা দেবেন এবং জাবালে রহমতের নিকট গিয়ে অবস্থান করবেন। বাতনে ওরানা ব্যতীত আরাফাতের সবটুকু স্থানই অবস্থানের স্থল। ইমামের জন্য আবশ্যক হল, আরাফার ময়দানে স্বীয় বাহনের ওপর অবস্থান করা। তিনি দোয়া করবেন এবং মানুষদিগকে হজ্জের আহকামসমূহ শিক্ষা দেবেন। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে গোসল করে নেয়া মুস্তাহাব। দোয়ার মধ্যে খুব চেষ্টা করবেন। আর যখন সূর্য অস্ত যাবে তখন ইমাম ও তাঁর সাথের লোকজন স্ব স্ব অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করে মুযদালিফায় গিয়ে পৌঁছবেন এবং তথা অবতরণ করবেন। আর ঐ পাহাড়ের নিকট গিয়ে অবতরণ করা মুস্তাহাব, যার নিকট আগুন জ্বালানো হয়, যাকে জাবালে কুযাহা বলা হয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দুই সালাতকে একত্র করণের মাসআলা ঃ

قَوْلُهٗ صَلَّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ الخ ঃ আরাফার ময়দানে অবস্থানকালে যোহরের ওয়াক্তে যোহর ও আসরকে এক আযানে দুই একামতে এক সাথে পড়বে। একে جَمْعِ تَقْدِيْم বলে। অনুরূপ একত্রকরণ নবী কারীম (সাঃ) হতে বর্ণিত আছে। আর ওলামায়ে কিরামও এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

আরাফায় অবস্থানকালীন কার্যাবলী ঃ

قَوْلُهُ فَيَبْتَدِئُ بِالْخُطْبَةِ الخ ঃ আরাফার দিন তথা ৯ তারিখ সূর্য উদয় হতে কুরবানীর দিনের ফজরের পূর্ব পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফার ময়দানে অল্প সময়ের জন্য হলেও অবস্থান করা ফরয। সেখানে পৌঁছে হাজীগণ তালবিয়া, যিকির, সালাত, সায়ী ইত্যাদি ইবাদতে মশগুল থাকবে। সূর্য পশ্চিমাকাশে হেলে যাবার পর জায়গা পেলে মাসজিদে নামিরায় প্রবেশ করবে। তারপর ইমাম বা তাঁর প্রতিনিধি মিম্বরে উপবেশন করবেন এবং মুয়ায্যিন তাঁর সম্মুখে আযান দেবেন। আযানের পর ইমাম সাহেব জুমুআর খুতবার ন্যায় দু'টি খুতবা প্রদান করবেন, তাতে হজ্জের বিভিন্ন আহকাম শিক্ষা দেবেন। এরপর যোহর ও আসর একসাথে পড়াবেন।

কেউ একাকী পড়লে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ صَلَّى الظُّهْرَ الخ ঃ আরাফার ময়দানে কেউ যদি সালাত জামাআতে না পড়ে একাকী পড়ে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, স্ব স্ব ওয়াক্তে পৃথক পৃথকভাবে পড়বে, একত্রে পড়তে পারবে না। তেমনিভাবে কোন ব্যক্তি যদি মুহরিম না হয়ে ইমামের সাথে যোহর পড়ে ইহরাম বাঁধে, তার জন্যও উভয় সালাত একত্রকরণ জায়েয নেই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট যোহরের ওয়াক্তে একসাথে পড়তে পারবে।

অবস্থান স্থলের বিবরণ ঃ

قَوْلُهُ ثُمَّ يَتَوَجَّهُ إِلَى الْمَوْقِفِ الخ ঃ সালাত শেষে সকল হাজী মাওকাফের দিকে রওয়ানা দেবে। মাওকাফ হল জাবালে রহমতের নিকটবর্তী স্থান। তবে বাতনে ওরানা ব্যতীত আরফার সব অংশই অবস্থানের স্থল, যে কোন স্থানে অবস্থান করলেই চলবে। কিন্তু ইমাম সাহেব মাওকাফে না গিয়ে আরাফার ময়দানে নিজ সওয়ারির ওপর অবস্থান করবেন, যাতে করে মানুষদিগকে হজ্জের বিভিন্ন হুকুম আহকাম শিক্ষা দিতে পারেন।

আরাফায় দোয়া করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيَجْتَهِدُ فِي الدُّعَاءِ ঃ আরাফার ময়দানে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে দোয়া করবেন। কেননা হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম (সাঃ) আরাফার ময়দানে একান্ত কাকুতি-মিনতি সহকারে আল্লাহর দরবারে উম্মতের জন্য দোয়া করেছেন, যা আল্লাহর নিকট কবুল হয়েছে। (ইবনে মাজা) হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেন, আমি আরাফার ময়দানে নবী কারীম (সাঃ)-কে এভাবে দোয়া করতে দেখেছি যে, তাঁর হস্তদ্বয় খাদ্য প্রার্থনাকারী মিসকিনদের ন্যায় বুক পর্যন্ত উত্তোলন করেছেন। (বায়হাকী)

আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন ও মুযদালিফায় অবস্থান প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ فَإِذَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَفَاضَ الخ ঃ আরাফার ময়দানে সূর্য অস্তের পর পরই হাজীগণ মুযদালিফায় চলে যাবে, কিন্তু সূর্যাস্তের পূর্বে রওয়ানা দেয়া সুন্নতের বিরোধী। কেননা মহানবী (সাঃ) সূর্যাস্তের পর মুযদালিফার দিকে রওয়ানা দিয়েছেন বলে প্রমাণিত। আর মুযদালিফায় পৌঁছে 'কুযাহা' নামক পাহাড়ের নিকট অবস্থান করবে, যেহেতু নবী (সাঃ) তথায় অবস্থান করেছেন। তবে 'বাতনে মুহাস্‌সারে' অবস্থান করবে না।

মীকাদার পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمِيقَدَةُ الخ ঃ 'মীকাদাহ' কুযাহা পাহাড়ের একটি স্থানের নাম। এর অর্থ হল অগ্নি প্রজ্বলনের স্থান। কেননা এ স্থানে জাহেলী যুগে আগুন জ্বালানো হত। আব্বাসীয় খালীফা হারুনুর রাশীদ উক্ত স্থানে বাতি জ্বালিয়ে সম্পূর্ণ মুযদালিফা এলাকা আলোকিত করতেন। এ কারণে এ স্থানেক মীকাদাহ বলা হয়।

وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِىْ وَقْتِ الْعِشَاءِ بِاَذَانٍ وَاِقَامَةٍ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الطَّرِيْقِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ صَلَّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الْفَجْرَ بِغَلَسٍ ثُمَّ وَقَفَ الْاِمَامُ وَ وَقَفَ النَّاسُ مَعَهُ فَدَعَا وَالْمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ اِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ثُمَّ اَفَاضَ الْاِمَامُ وَالنَّاسُ مَعَهُ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ حَتّٰى يَأْتُوا مِنٰى فَيَبْتَدِئُ بِجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَيَاتِ الْقَذْفِ وَيُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ مَعَ اَوَّلِ حَصَاةٍ ثُمَّ يَذْبَحُ اِنْ اَحَبَّ ثُمَّ يَحْلِقُ اَوْ يَقْصُرُ وَالْحَلْقُ اَفْضَلُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ اِلَّا النِّسَاءَ ثُمَّ يَاْتِىْ مَكَّةَ مِنْ يَوْمِهٖ ذٰلِكَ اَوْ مِنَ الْغَدِ اَوْ مِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَيَطُوْفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الزِّيَارَةِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ -

---

সরল অনুবাদ ঃ অতঃপর ইমাম সাহেব (মুযদালিফায়) লোকদেরকে নিয়ে ইশার ওয়াক্তে এক আযান ও এক একামতে মাগরিব ও ইশার সালাত পড়বেন। আর যে ব্যক্তি পথিমধ্যে মাগরিবের সালাত পড়বে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, তার সালাত জায়েয হবে না। অতঃপর যখন দশ তারিখের সুবহে সাদিক উদয় হবে, তখন ইমাম মানুষদেরকে নিয়ে অন্ধকারে ফজরের সালাত পড়বেন। এরপর ইমাম সাহেব অবস্থান করবেন এবং তাঁর সাথে লোকজনও অবস্থান করবে, তারপর দোয়া করবেন। বাতনে মুহাস্‌সার ব্যতীত মুযদালিফার সবটুকুই অবস্থানের স্থান। তারপর ইমাম সাহেব লোকদেরকে নিয়ে সূর্য উদয়ের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করবেন, এমনকি মিনায় চলে আসবেন। প্রথমে জামরায়ে আকাবা হতে শুরু করবে, অতঃপর বাতনে ওয়াদী হতে পাকা মাটির কঙ্করের ন্যায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে আল্লাহু আকবার বলবে এবং সে জামরার নিকট অবস্থান করবে না। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। এরপর ভালো মনে করলে কুরবানী করবে। তারপর মাথা মুন্ডাবে অথবা চুল ছোট করবে, তবে মাথা মুন্ডানো উত্তম। এসব কাজের পর স্ত্রী সহবাস ব্যতীত তার জন্য সবকিছু হালাল হয়ে যাবে। এরপর সে দিন অথবা তার পরের (একাদশ) দিন কিংবা তার পরের (দ্বাদশ) দিন মক্কায় চলে আসবে। অতঃপর সাত চক্করে বাইতুল্লাহ -এর তাওয়াফে যিয়ারত করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুযদালিফায় মাগরিব ও ইশা একসাথে পড়ার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَيُصَلِّى الْاِمَامُ بِالنَّاسِ الخ ঃ সূর্য অস্ত যাবার পর আরাফা হতে রওয়ানা দিয়ে মুযদালিফায় পৌঁছবেন। মুযদালিফায় পৌঁছে মাগরিব ও ইশার সালাত এক আযান ও এক একামতে ইশার ওয়াক্তে পড়বেন। কেননা রাসূল (সাঃ) এভাবে পড়েছেন। একে جَمْعِ تَاخِيْر বলে। কেউ যদি ইশার পূর্বে এসে পৌঁছে, তবে সে ইশার ওয়াক্ত আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। হানাফীদের মতে, جَمْع بَيْنَ الصَّلٰوتَيْن হজ্জের আহকামের শামিল, কাজেই কেউ যদি হজ্জ করতে আসে, সে মুসাফির না হলেও তার ওপর উভয় সালাত একত্রকরণ আবশ্যক।

মাগরিবের সালাত পথে পড়লে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ وَمَنْ صَلَّى الْمَغْرِبَ فِى الطَّرِيْقِ الخ ঃ সূর্যাস্তের পর আরাফা হতে মুযদালিফায় রওয়ানা দিয়ে সেখানে গিয়ে মাগরিব ও ইশার সালাত ইশার ওয়াক্তে পড়া নিয়ম। কিন্তু কেউ যদি পথিমধ্যে বা আরাফায় মাগরিবের সালাত পড়ে নেয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, সালাত সিদ্ধ হয়নি; বরং তাকে মুযদালিফায় ইশার সাথে পুনঃ পড়তে হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট সালাত জায়েয হবে।

বাতনে মুহাস্সারে অবস্থানের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ اِلَّا بَطْنَ مُحَسِّرٍ ঃ অন্ধকারে ফজরের সালাত পড়ার পর মুযদালিফায় অবস্থান করবে। মুযদালিফায় অবস্থান করা ওয়াজিব। মুযদালিফার 'বাতনে মুহাস্সার' ব্যতীত সবটুকু স্থান অবস্থানের স্থল। এ স্থান হল আযাবের স্থান। কেননা, আল্লাহ তা'আলা এ স্থানে আবরাহার হস্তী বাহিনীকে ধ্বংস করেছিলেন। কারো মতে, শয়তান এ স্থানে বান্দাদের আমল দেখে ক্ষোভ ও অনুতাপের সাথে দণ্ডায়মান হয়ে থাকে, তাই এ স্থানে অবস্থান নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهٗ فَيَرْمِيْهَا مِنْ بَطْنِ الْوَادِىْ الخ ঃ সূর্য উদয়ের পূর্বে মুযদালিফা হতে রওয়ানা দিয়ে মিনায় পৌছবে। সেখানে পৌছে ১০ তারিখে বাতনে ওয়াদী গিয়ে জামরায় সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রথম কঙ্কর নিক্ষেপের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে এবং প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় তাকবীর বলবে। পরের দুই দিনও তিন জামরায় সাতটি করে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ কঙ্কর বাতনে ওয়াদীর দিক হতে নিক্ষেপ করতে হবে, অন্য কোন দিক হতে নিক্ষেপ করলেও জায়েয হবে। সাতটি কঙ্করকে এক এক করে নিক্ষেপ করতে হবে। এক সাথে নিক্ষেপ করলে এক কঙ্কর নিক্ষেপ হিসেবে গণ্য হবে। নবী কারীম (সাঃ) হতে অনুরূপ পদ্ধতিই বর্ণিত আছে।

উল্লেখ্য যে, নিক্ষেপকারী ও নিক্ষেপিত স্থানের মধ্যে কমপক্ষে পাঁচ হাতের ব্যবধানে থাকতে হবে। এটাই আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত। আর কঙ্কর নিক্ষেপের সে স্থানে অবস্থান করবে না; বরং দ্রুত স্থান ত্যাগ করবে।

জবাই করার বিধান ঃ

ثُمَّ يَذْبَحُ اِنْ اَحَبَّ ঃ কঙ্কর নিক্ষেপের পর কুরবানী করতে হয়। এখানে কুরবানীকে ইচ্ছাধীন বলে ইফরাদ হজ্জকারীর কথা বলা হয়েছে। কেননা ইফরাদ হজ্জকারীর ওপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তবে তামাত্তু ও কিরান হজ্জকারীর ওপর কুরবানী ওয়াজিব। তবে মুসাফির হলে ওয়াজিব নয়; কিন্তু কুরবানী করা উত্তম।

হালাল হবার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ وَقَدْ حَلَّ لَهٗ كُلُّ شَيْءٍ الخ ঃ কুরবানীর পর মাথা মুণ্ডানোর সাথে সাথে তার ইহরাম ভঙ্গ হয়ে যায়। এর সাথে সাথে স্ত্রী সহবাস ছাড়া ইতঃপূর্বে যেসব বিষয় হারাম ছিল সব হালাল হয়ে যাবে। স্ত্রী সহবাস ও সে সম্পর্কীয় সব কাজ নিষিদ্ধ থাকবে, তাওয়াফে যিয়ারতের পরই তা হালাল হবে।

فَاِنْ كَانَ سَعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَقِيْبَ طَوَافِ الْقُدُوْمِ لَمْ يَرْمُلْ فِىْ هٰذَا الطَّوَافِ وَلَاسَعْىَ عَلَيْهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ قَدَّمَ السَّعْىَ رَمَلَ فِىْ هٰذَا الطَّوَافِ وَيَسْعٰى بَعْدَهٗ عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ وَقَدْ حَلَّ لَهُ النِّسَاءُ وَهٰذَا الطَّوَافُ هُوَ الْمَفْرُوْضُ فِى الْحَجِّ وَيُكْرَهُ تَاخِيْرُهٗ عَنْ هٰذِهِ الْاَيَّامِ فَاِنْ اَخَّرَهٗ عَنْهَا لَزِمَهٗ دَمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَاشَىْءَ عَلَيْهِ ثُمَّ يَعُوْدُ اِلٰى مِنٰى فَيُقِيْمُ بِهَا فَاِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِىْ مِنْ اَيَّامِ النَّحْرِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ يَبْتَدِئُ بِالَّتِىْ تَلِى الْمَسْجِدَ فَيَرْمِيْهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ يَقِفُ عِنْدَهَا فَيَدْعُوْ ثُمَّ يَرْمِى الَّتِىْ تَلِيْهَا مِثْلَ ذٰلِكَ وَيَقِفُ عِنْدَهَا ثُمَّ يَرْمِىْ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ كَذٰلِكَ وَلَايَقِفُ عِنْدَهَا فَاِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ كَذٰلِكَ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَعَجَّلَ النَّفَرَ نَفَرًا اِلٰى مَكَّةَ وَاِنْ اَرَادَ اَنْ يُّقِيْمَ رَمَى الْجِمَارَ الثَّلٰثَ فِى الْيَوْمِ الرَّابِعِ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ আর যদি ইতঃপূর্বে তাওয়াফে কুদূমের পর সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করে থাকে, তাহলে এ তওয়াফের মধ্যে রমল এবং সায়ী করতে হবে না। পক্ষান্তরে পূর্বে যদি সায়ী না করে থাকে তাহলে এ তওয়াফে রমল করতে হবে। এবং এরপর পূর্বে যেভাবে বর্ণনা করেছি সে অনুযায়ী সায়ী করবে। এখন তার জন্য স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে। আর এ তওয়াফই হল হজ্জের মধ্যে ফরয। এ দিনগুলো হতে দেরি করা মাকরূহ। যদি এ দিনগুলোর পরে তওয়াফ করে তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, দম তথা একটি কুরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে; আর সাহিবাইন (রহঃ) বলেন, তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। এরপর মিনায় ফিরে এসে তথায় অবস্থান করবে। তারপর কুরবানীর দ্বিতীয় দিন (তথা একাদশ তারিখে) সূর্য হেলে যাওয়ার পর তিনটি জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। আর মসজিদের (খায়ফের) সংলগ্ন জামরা হতে শুরু করবে এবং উহাতে সাতটি কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। প্রত্যেক কঙ্কর নিক্ষেপের সময় আল্লাহু আকবার বলবে এবং তথায় অবস্থান করে দোয়া করবে। তারপর তৎসংলগ্ন জামরায় অনুরূপভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে এবং উহার নিকট অবস্থান করবে। এরপর অনুরূপ জামরায়ে আকাবায় পাথর কণা নিক্ষেপ করবে, তবে এর নিকট অবস্থান করবে না। এর পরের দিন সূর্য হেলে যাবার পর অনুরূপভাবে জামরাত্রয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। আর যদি কেউ তাড়াতাড়ি চলে যাবার ইচ্ছা করে তাহলে সে রওয়ানা দেবে। আর যদি মিনায় অবস্থান করতে চায়, তাহলে চতুর্থ দিন সূর্য হেলে যাবার পর জামরাত্রয়ে অনুরূপভাবে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

<u>**কুরবানীর দিনসমূহে তাওয়াফ না করলে তার হুকুম ঃ**</u>

قَوْلُهٗ فَاِنْ اَخَّرَهٗ عَنْهَا الخ ঃ তাওয়াফে যিয়ারতের বিধান হল কুরবানীর দিন সমূহের মধ্যে করা। কেউ যদি উক্ত দিন সমূহের মধ্যে না করে পরে করে, তাহলে মাকরূহে তাহরীমী হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট এর ফলে

তাকে একটি দম দেয়া ওয়াজিব বলেন, তবে কোন ওজরে দেরি করলে মাকরূহ হবে না, যেমন— হায়েযের কারণে। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে, মহানবী (সাঃ)-এর এক স্ত্রী বিদায় হজ্জের সময় ঋতুবতী হয়ে পড়েন, তখন তিনি বলেন যে, সম্ভবত হায়েয আমাদেরকে তাওয়াফে যিরারত হতে বিরত রেখেছেন, এরপর তিনি হায়েয বন্ধ হবার পর তওয়াফ করেছেন।

মিনায় অবস্থান করলে কঙ্কর নিক্ষেপ করা আবশ্যক ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ الخ ঃ তাওয়াফে যিয়ারত সমাপন করে পুনরায় মিনায় গমন করবে। কুরবানীর দ্বিতীয় দিন সূর্য হেলে যাবার পর জামরাত্রয়ে পাথর কণা নিক্ষেপ করবে। এরপর কুরবানীর তৃতীয় দিন তথা দ্বাদশ তারিখেও জামরাত্রয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করবে। এ তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপ শেষে মক্কায় চলে গেলেও হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। আর যদি তাশরীকের পুরো দিনসমূহ মিনায় থেকে যায় তথা তের তারিখও তাহলে সে দিনও জামরাত্রয়ে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হবে। আর তের তারিখে সূর্যোদয়ের পর জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করলে জায়েয হবে। আর তের তারিখ পর্যন্ত মিনায় অবস্থান করা মুস্‌তাহাব।

বারো তারিখে মিনা ত্যাগ করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَّتَعَجَّلَ النَّفَرَ الخ ঃ মিনায় বারো তারিখে কঙ্কর নিক্ষেপের পর ইচ্ছা করলে মক্কায় চলে যেতে পারে। কেননা আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন— فَمَنْ تَعَجَّلَ فِىْ يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তাড়াতাড়ি করে বারো তারিখেই মিনা হতে প্রত্যাবর্তন করতে চায় তাতে সে গুনাহগার হবে না। আর কোন ব্যক্তি যদি বারো তারিখেও মিনায় অবস্থান করে, তার জন্য তেরো তারিখের সুবহে সাদিক উদয় হবার পূর্ব পর্যন্ত মক্কায় চলে আসার সুযোগ থাকবে, তবে তের তারিখের সুবহে সাদিক উদয় হলে কঙ্কর নিক্ষেপ ব্যতীত মিনা ত্যাগ করা জায়েয হবে না।

كَذٰلِكَ فَاِنْ قَدَّمَ الرَّمْيَ فِيْ هٰذَا الْيَوْمِ قَبْلَ الزَّوَالِ بَعْدَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ وَيُكْرَهُ اَنْ يُّقَدِّمَ الْاِنْسَانُ ثَقَلَهُ اِلٰى مَكَّةَ وَيُقِيْمَ بِهَا حَتّٰى يَرْمِيَ فَاِذَا نَفَرَ اِلٰى مَكَّةَ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ لَايَرْمُلُ فِيْهَا وَهٰذَا طَوَافُ الصَّدْرِ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ثُمَّ يَعُوْدُ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلٰى عَرَفَاتٍ وَ وَقَفَ بِهَا عَلٰى مَاقَدَّمْنَاهُ سَقَطَ عَنْهُ طَوَافُ الْقُدُوْمِ وَ لَاشَيْءَ عَلَيْهِ لِتَرْكِهٖ وَمَنْ اَدْرَكَ الْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ مَا بَيْنَ زَوَالِ الشَّمْسِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ اَدْرَكَ الْحَجَّ وَمَنْ اِجْتَازَ بِعَرَفَةَ وَهُوَ نَائِمٌ اَوْ مُغْمًى عَلَيْهِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ اَنَّهَا عَرَفَاتٌ اَجْزَاهُ ذٰلِكَ عَنِ الْوُقُوْفِ وَالْمَرْأَةُ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ غَيْرَ اَنَّهَا لَاتَكْشِفُ رَأْسَهَا وَتَكْشِفُ وَجْهَهَا وَلَا تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالتَّلْبِيَةِ وَلَاتَرْمُلُ فِي الطَّوَافِ وَلَا تَسْعٰى بَيْنَ الْمِيْلَيْنِ الْاَخْضَرَيْنِ وَلَا تَحْلِقُ وَلٰكِنْ تُقَصِّرُ -

সরল অনুবাদ ঃ এমনিভাবে যদি এ দিনে (তের তারিখে) সুবহে সাদিকের পর সূর্য হেলে যাবার পূর্বে কঙ্কর নিক্ষেপ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট জায়েয হবে, আর সাহেবাইনের নিকট জায়েয হবে না। কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে মিনাতে অবস্থান করা অবস্থায় আসবাবপত্র মক্কায় প্রেরণ করা মাকরূহ। আর যখন মক্কায় গমন করবে তখন "মুহাস্‌সাব" নামক স্থানে অবতরণ করবে। তারপর বাইতুল্লাহ সাতবার তওয়াফ করবে, এতে রমল করবে না। একে 'তাওয়াফে সদর' বলা হয়। এটা মক্কাবাসী ব্যতীত অন্যান্যদের জন্য ওয়াজিব। এরপর নিজ পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরে আসবে। আর মুহরিম ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ না করে যদি সোজা আরাফার ময়দানে চলে যায় এবং আমাদের পূর্ব বর্ণিত নিয়মানুযায়ী আরাফায় অবস্থান করে, তাহলে তার থেকে তাওয়াফে কুদূম বাদ হয়ে যাবে। আর এ তওয়াফ ছেড়ে দেয়ার কারণে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি আরাফার দিন সূর্য হেলে যাবার পর হতে কুরবানীর দিনের ফজর পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরাফায় অবস্থান করবে, সে হজ্জ পেয়েছে বলে বিবেচিত হবে। আর যে ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় অথবা অজ্ঞান অবস্থায় আরাফার ময়দান অতিক্রম করবে অথবা এমন অবস্থায় অতিক্রম করবে যে, সে উহা আরাফা বলে জানে না। তাহলেও এসব আরাফা ময়দান অবস্থানের জন্য যথেষ্ট হবে। এ সব বিধানে মহিলা পুরুষের ন্যায় অর্থাৎ পুরুষের যে হুকুম নারীরও অনুরূপ হুকুম, তবে এটা ব্যতীত যে, মহিলা মাথা খোলা রাখতে পারবে না, উচ্চৈঃস্বরে তালবিয়া পাঠ করবে না, তওয়াফের মধ্যে রমল করবে না, মীলাইনে আখযারাইনের মধ্যে দৌড়াবে না এবং মাথা মুণ্ডন করবে না, তবে সামান্য চুল কাটবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহাস্‌সাবে অবতরণ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ نَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ ঃ মিনা হতে মক্কায় যাওয়ার সময় পথিমধ্যে ওয়াদিয়ে মুহাস্‌সাব নামক স্থানে যাত্রা বিরতি করবে। এটি মিনা ও মক্কার মাঝখানে 'জান্নাতুল মু'আল্লা' নামক কবরস্থানের সংলগ্ন একটি মাঠের নাম, একে اَبْطَح ও বলা

হয়। হানাফীদের নিকট এখানে কিছুক্ষণ থাকা সুন্নত। কেননা রাসূল (সাঃ) তের তারিখ মিনা হতে যাত্রা করে মুহাস্‌সাবে অবতরণ করেন। এ স্থানে তিনি যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার সালাত আদায় করেন। তথায় তিনি কিছু সময় বিশ্রামও করেন। তারপর মক্কায় গমন করে 'তওয়াফে বিদা' আদায় করেন। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর নিকট মুহাস্‌সাবে অবতরণ করা সুন্নত নয়।

তাওয়াফে সদর বা বিদার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَهُوَ وَاجِبٌ اِلَّا عَلٰى اَهْلِ مَكَّةَ ঃ তের তারিখে মিনায় পাথর নিক্ষেপ শেষে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করবে। মক্কায় এসে বিদায়ী তওয়াফ করবে, একে তাওয়াফে সদর বলা হয়। এটা মক্কার অধিবাসী ছাড়া অন্যান্যদের ওপর ওয়াজিব। কেননা বহিরাগতগণ মক্কা ত্যাগ করে চিরতরে চলে যাবে, এখানে আসা তাদের জন্য আর সম্ভব নাও হতে পারে, তাই তাদের ওপর তাওয়াফে বিদা ওয়াজিব। পক্ষান্তরে মক্কাবাসীরা নিকটে থাকার সুবাদে যে কোন সময় তওয়াফ করতে পারে, তাই তাদেরকে বিদায়ী তওয়াফ করতে হয় না। মহানবী (সাঃ) বিদায়ী হজ্জে এ তওয়াফ করছেন বলে প্রমাণিত। ইমাম আবূ হানীফা ও আহমদ (রহঃ)-এর নিকট এটা ওয়াজিব, আর শাফিয়ী ও মালিকের নিকট সুন্নত।

তাওয়াফে কুদূম ব্যতীত আরাফায় অবস্থান করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَتَوَجَّهَ اِلٰى عَرَفَاتٍ الخ ঃ যে ব্যক্তি মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফায় গিয়ে উপস্থিত হয় এবং সেখানে নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ের ভিতর অবস্থান করে, তার ওপর হতে তাওয়াফে কুদূম রহিত হয়ে যাবে এবং এর জন্য তাকে কোন দম দিতে হবে না আর তার হজ্জও পরিপূর্ণ হয়ে যাবে।

আরাফায় অবস্থানের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَدْرَكَ الْوُقُوْفَ بِعَرَفَةَ الخ ঃ আরাফায় অবস্থান করা হাজ্জের অন্যতম রুকন। সেখানে অবস্থানের সুন্নত সময় হল আরাফার তথা নয় তারিখের সূর্য হেলে যাবার পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত। আর জায়েয সময় হল নয় তারিখের সূর্য হেলে যাবার পর হতে কুরবানীর দিনের সুবহে সাদিক হওয়া পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে যে কোন অবস্থায় সামান্য সময়ের জন্য হলেও অবস্থান পাওয়া গেলে তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। সে ঘুমন্ত অবস্থায় বা অচেতন অবস্থায় বা কাউকে ধরতে গিয়ে দৌড়ানো অবস্থায় আরাফা অতিক্রম করলেও আরাফায় অবস্থান হিসেবে ধর্তব্য হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। حَجّ ও عُمْرَة -এর অর্থ লিখ।
২। حَجّ ও عُمْرَة কাকে বলে?
৩। حَجّ -এর ফরয ও ওয়াজিব কয়টি ও কি কি?
৪। حَجّ ফরয হবার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে?
৫। حَجّ ও عُمْرَة -এর মধ্যকার পার্থক্য কি? লিখ।
৬। حَجّ ও عُمْرَة -এর مِيْقَات সমূহ বর্ণনা কর।
৭। حَجّ -এর সুন্নত কয়টি ও কি কি? লিখ।
৮। حَجّ -এর মাকরূহ কাজসমূহ বর্ণনা কর।
৯। اِحْرَام কাকে বলে? اِحْرَام বাঁধার নিয়ম উল্লেখ কর।
১০। اِحْرَام অবস্থায় কি কি কাজ নিষিদ্ধ? বর্ণনা কর।
১১। مُحْرِم -এর জন্য কি কি কাজ নিষিদ্ধ? বর্ণনা কর।
১২। اِحْرَام অবস্থায় রমণীর হায়েয এলে তার হুকুম কি?
১৩। اَشْهُرُ الْحَجِّ কাকে বলে? হজ্জের মাসের পূর্বে ইহরাম বাঁধা জায়েয আছে কি?
১৪। جَمْعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ কখন এবং কিভাবে আদায় করতে হয়?

১৫। جَمْعُ بَيْنَ الْعِشَائَيْنِ -এর পদ্ধতি ও শর্তাবলী লিখ।
১৬। مُحْرِم -এর জন্য ইহরাম অবস্থায় কি কি কাজ করা মুস্তাহাব? আলোচনা কর।
১৭। হাজীগণের কুরবানীর দিনসমূহে কি কি কাজ সম্পাদন করতে হয়?
১৮। رَمْىُ الْجِمَارِ বা কঙ্কর নিক্ষেপের নিয়ম ও সংখ্যা বর্ণনা কর।
১৯। حَجّ কত প্রকার ও কি কি? প্রত্যেক প্রকারের পরিচয় দাও।
২০। طَوَاف قُدُوم কাকে বলে? এইরূপ তওয়াফ কার জন্য ওয়াজিব এবং কার জন্য ওয়াজিব নয়।
২১। لَبَّيْكَ শব্দের বিশ্লেষণ কর? এবং تَلْبِيَة -এর শব্দগুলো মুখস্ত লিখ।
২২। طَوَاف صَدر কাকে বলে? এটা কার জন্য ওয়াজিব এবং কার জন্য ওয়াজিব নয়।
২৩। কুরবানীর দিনের কাজগুলো পর্যায়ক্রমে করার হুকুম বর্ণনা কর।
২৪। বাইতুল্লাহ শরীফ তওয়াফ করার নিয়ম-পদ্ধতি আলোচনা কর।
২৫। পাথর চুম্বন ও মাকামে ইব্রাহীমে নামায পড়ার হুকুমসহ নিয়ম বর্ণনা কর।
২৬। সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করার নিয়ম উল্লেখ কর।
২৭। আরাফায় অবস্থানের সময় ও নিয়ম উল্লেখ কর।
২৮। পুরুষ ও নারীর মধ্যে হজ্জের আহকাম আদায়ের ক্ষেত্রে কি কি পার্থক্য রয়েছে? বর্ণনা কর।
২৯। রমল কাকে বলে, এটা করার কারণ কি? নিয়মসহ বিস্তারিত লিখ।
৩০। হজ্জ তাৎক্ষণিক না বিলম্বের অবকাশসহ ফরয? আলোচনা কর।
৩১। ভুলক্রমে যদি কেউ হজ্জের কোন ওয়াজিব ছেড়ে দেয়, তবে তার হুকুম কি? বিস্তারিত আলোচনা কর।

بَابُ الْقِرَانِ

اَلْقِرَانُ اَفْضَلُ عِنْدَنَا مِنَ التَّمَتُّعِ وَالْاِفْرَادِ وَصِفَةُ الْقِرَانِ اَنْ يُّهِلَّ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ مَعًا مِنَ الْمِيْقَاتِ وَيَقُوْلُ عَقِيْبَ الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اُرِيْدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَيَسِّرْهُمَا لِىْ وَتَقَبَّلْهُمَا مِنِّىْ فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ اِبْتَدَأَ بِالطَّوَافِ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعَةَ اَشْوَاطٍ يَرْمُلُ فِى الثَّلٰثَةِ الْاُوَلِ مِنْهَا وَيَمْشِىْ فِىْ مَابَقِىَ عَلٰى هَيْئَتِهٖ وَسَعٰى بَعْدَهَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهٰذِهٖ اَفْعَالُ الْعُمْرَةِ ثُمَّ يَطُوْفُ بَعْدَ السَّعْىِ طَوَافَ الْقُدُوْمِ وَيَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِلْحَجِّ كَمَا بَيَّنَّاهُ فِىْ حَقِّ الْمُفْرِدِ فَاِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ذَبَحَ شَاةً اَوْ بَقَرَةً اَوْ بَدَنَةً اَوْ سُبْعَ بَدْنَةٍ اَوْ سُبْعَ بَقَرَةٍ فَهٰذَا دَمُ الْقِرَانِ -

হজ্জে কিরানের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ হজ্জে কিরান আমাদের (হানাফী) নিকট তামাত্তু' ও ইফরাদ হজ্জ হতে উত্তম। আর কিরানের নিয়ম হল, মীকাত হতে একই সাথে হজ্জ ও ওমরার ইহরাম বাঁধবে। (ইহরামের) সালাতের পর বলবে, " হে আল্লাহ! আমি হজ্জ ও ওমরার ইচ্ছা করেছি সুতরাং আপনি আমার জন্য উভয়কে সহজ করে দিন এবং আমার পক্ষ হতে এগুলোর উভয়টি কবুল করে নিন।" অতঃপর যখন কিরান হজ্জকারী মক্কায় প্রবেশ করবে, তখন সর্বপ্রথম তওয়াফ করবে, অতঃপর সাত চক্কর বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে। প্রথম তিনবারে রমল করবে, আর অবশিষ্ট চক্কর গুলোতে স্বাভাবিক গতিতে চলবে। এরপর সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করবে। এগুলো হল ওমরার কার্যাবলী। সায়ী করার পর তাওয়াফে কুদূম করবে এবং হজ্জের জন্য সাফা ও মারওয়ার মধ্যে সায়ী করবে, যেমনিভাবে আমি মুফরিদ হাজীর বেলায় বর্ণনা করেছি। অতঃপর যখন সে কুরবানীর দিনে (১০ তারিখে) জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করবে, তখন একটি বকরি অথবা গাভি কিংবা একটি উট অথবা একটি উটের এক সপ্তমাংশ বা একটি গাভির এক সপ্তমাংশ জবাই করবে, আর এটাই হল কিরান হজ্জের দম।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিরান হজ্জের পরিচিতি ঃ

قَوْلُهُ بَابُ الْقِرَانِ ঃ শব্দটি قِرَانٌ শব্দটি قَرْنٌ মূলধাতু হতে নির্গত। শাব্দিক অর্থ হল, দু'টি বস্তুকে একত্র করা বা মিলানো বা সংযোগ করা। শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল, মীকাত হতে একই সাথে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে উভয়কে সম্পাদন করা।

হজ্জের প্রকারভেদ ঃ

হজ্জ সর্বমোট তিন ভাগে বিভক্ত ঃ

১. اَلْاِفْرَادُ ঃ افراد অর্থ- একাটি বা পৃথক পরিভাষায় এর পরিচয় হল, মীকাত হতে শুধু হজ্জের নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে শুধুমাত্র হজ্জ সমাপন করা।

২. تَمَتُّعٌ ঃ এর শাব্দিক অর্থ হল, উপকারিতা অর্জন করা, উপভোগ করা। শরীয়তের ভাষায় এর পরিচয় হল, মীকাত হতে প্রথমে ওমরার ইহরাম বেঁধে তার কার্যাবলী সমাপন করে হালাল হয়ে যাওয়া, এরপর হজ্জের সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে তার আহকামসমূহ সম্পাদন করা।

৩. قِرَان এর অর্থ হল মিলানো। পরিভাষায় এর পরিচয় হল, মীকাত হতে এক সাথে হজ্জ ও ওমরার নিয়ত করে ইহরাম বেঁধে উভয়কে একই ইহরামে সমাপ্ত করাকে কিরান বলে।

সর্বোত্তম হজ্জ কোন্‌টি ঃ

قَوْلُهُ الْقِرَانُ اَفْضَلُ الخ ঃ হজ্জের প্রকারভেদ সমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্বোত্তম এ বিষয়ে ওলামাদের মাঝে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়। হানাফীদের নিকট কিরান হজ্জ হচ্ছে সর্বোত্তম, এরপর তামাত্তু', তারপর ইফরাদ। কেননা নবী কারীম (সাঃ) বিদায় হজ্জে কিরান করেছেন এবং তাঁর পরিবারবর্গকেও কিরান করবার জন্য আদেশ করেছেন। এছাড়া হজ্জে কিরান পালন করা অতি কষ্টকর। কেননা এতে একই সফরে দু'টি ইবাদত করা হয়। এজন্য বলা হয়— اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَشَقُّهَا অপরদিকে হুজুর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— اَجْرُكُمْ عَلٰى قَدْرِ نَصَبِكُمْ ইমাম শাফিয়ী ও মালিক (রহঃ)-এর মতে, ইফরাদ হচ্ছে সর্বোত্তম, এরপর তামাত্তু', সর্বশেষ হল কিরান। ইমাম আহমদ (রহঃ)-এর মতে, সর্বোত্তম হজ্জ হলো তামাত্তু', তারপর ইফরাদ, এরপর হলো কিরান।

কিরান হজ্জের প্রথম কাজ ঃ

قَوْلُهُ اِبْتَدَأَ بِالطَّوَافِ الخ ঃ কিরানের মধ্যে সর্বপ্রথম ওমরার কাজ সম্পন্ন করে নিতে হবে, তারপর হজ্জের কাজ শুরু করবে। এ কারণে কোন ব্যক্তি প্রথমে হজ্জের নিয়তে তওয়াফ করলেও উহা ওমরার তওয়াফই হবে।

কিরান কারীর কুরবানীর বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَهٰذَا دَمُ الْقِرَانِ ঃ কিরানকারী কুরবানীর দিবসে হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য কুরবানী করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা তাকে একই সময়ে একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা দু'টি আদায় করার সুযোগ দান করেছেন। তাই আল্লাহর শুকরিয়া হিসেবে তার ওপর একটি কুরবানী ওয়াজিব হয়েছে। আর যদি কুরবানী করতে অক্ষম হয় তাহলে দশটি সাওম রাখতে হবে। এগুলোর মধ্যে তিনটি হজ্জের দিনসমূহে তথা সাত, আট ও নয় তারিখে রাখবে, আর হজ্জ হতে অবসর হয়ে সাতটি সাওম রাখতে হবে। যেমনি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে—

فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি হজ্জের সাথে ওমরাকে একত্রিত করে উপকৃত হবে, সে তার সাধ্যানুযায়ী কুরবানী দেবে। আর যে কুরবানী দিতে সক্ষম হবে না, সে হজ্জের সময় তিন দিন সাওম রাখবে, আর যখন তোমরা হজ্জ হতে প্রত্যাবর্তন করবে তখন আরো সাতটি সাওম রাখবে, এতে পূর্ণ দশটি হবে।

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَا يَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ اٰخِرُهَا يَوْمُ عَرَفَةَ فَاِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ حَتّٰى يَدْخُلَ يَوْمُ النَّحْرِ لَمْ يَجْزِهِ اِلَّا الدَّمُ ثُمَّ يَصُوْمُ سَبْعَةَ اَيَّامٍ اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ فَاِنْ صَامَهَا بِمَكَّةَ بَعْدَ فَرَاغِهٖ مِنَ الْحَجِّ جَازَ فَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ وَتَوَجَّهَ اِلٰى عَرَفَاتٍ فَقَدْ صَارَ رَافِضًا لِعُمْرَتِهٖ بِالْوُقُوْفِ وَسَقَطَ عَنْهُ دَمُ الْقِرَانِ وَعَلَيْهِ دَمٌ لِرَفْضِ الْعُمْرَةِ وَعَلَيْهِ قَضَاؤُهَا -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি তার নিকট কুরবানী করার মতো এমন কোন (পশু) সামর্থ্য না থাকে, তাহলে সে হজ্জের দিনসমূহে তিনটি সাওম রাখবে। সে তিনটির শেষটি হবে আরাফার দিন। আর যদি সাওম ছুটে যায়, এমনকি সে কুরবানীর দিবসে পৌঁছে গেছে অর্থাৎ কুরবানীর দিন পর্যন্ত সাওম রাখতে পারেনি, তাহলে কুরবানী (দম) দেয়া ছাড়া কোন কিছু জায়েয বা যথেষ্ট হবে না। এরপর নিজ পরিবারের নিকট প্রত্যাবর্তনের পর সাতটি সাওম রাখবে। আর হজ্জের কাজ সমাপনের পর যদি মক্কায় উক্ত সাওম রাখে, তাহলেও জায়েয হবে। কিরান হজ্জকারী যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সোজা আরাফায় চলে যায়, তাহলে আরাফায় অবস্থানের কারণে সে ওমরা বর্জনকারী হিসেবে পরিণত হবে। ফলে তার থেকে কিরানের দম রহিত হয়ে যাবে। তবে ওমরা বর্জন করার কারণে তার ওপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং ওমরা কাযা করাও ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কিরানকারীর সাওম ছুটে গেলে তার হুকুম ঃ

فَاِنْ فَاتَهُ الصَّوْمُ الخ ঃ কিরান হজ্জকারী কুরবানী করতে অসমর্থ হলে ১০টি সাওম রাখতে হয়। এর মধ্যে তিনটি রাখতে হয় হজ্জের দিনসমূহে। এ তিনটি সাওম সমাপন করার পূর্বে যদি কুরবানীর দিন এসে পড়ে, তাহলে সাওম রাখার আর সুযোগ নেই; বরং এর জন্য একটি কুরবানী দেয়া ওয়াজিব হবে, এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। কেননা কোরবানীর বিকল্প ছিল সাওম, আর সাওম যখন হাতছাড়া হয়ে গেল তখন পুনরায় কুরবানী ওয়াজিব হয়ে পড়বে, কাজেই তাকে কুরবানী দিতেই হবে।

কিরানের নিয়তকারী ওমরা পরিত্যাগ করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَاِنْ لَمْ يَدْخُلِ الْقَارِنُ بِمَكَّةَ الخ ঃ কিরান হজ্জ পালনকারী যদি মক্কায় প্রবেশ না করে সোজা আরাফায় চলে যায়, তবে তার ওমরা বাতিল বলে গণ্য হয়ে যাবে এবং মুফরিদ হিসেবে পরিগণিত হয়ে যাবে। এ ওমরা ছেড়ে দেয়ার কারণে তার ওপর একটি দম ওয়াজিব হবে এবং পুনরায় কাযা করা ওয়াজিব হবে। কেননা সে নিয়তের মাধ্যমে তা নিজের ওপর ওয়াজিব করে নিয়েছিল, তাই ওয়াজিব ছাড়ার কারণে কাযা ওয়াজিব হবে। আর যদি মক্কায় প্রবেশ করে ওমরার অধিকাংশ কাজ করার পূর্বেই আরাফায় চলে আসে, তাহলে উপরোক্ত হুকুম প্রযোজ্য হবে; তবে ওমরার তওয়াফের অধিকাংশ যেমন- সাত চক্করের স্থলে চার চক্করের পর আরাফায়ে চলে গেলে তার ওমরা বাতিল হবে না; বরং কুরবানীর দিবসে তা পূর্ণ করে দেবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। কিরান "قِرَان" হজ্জের সংজ্ঞা দাও এবং উহা আদায় করার নিয়ম উল্লেখ কর।
২। কোন প্রকার হজ্জ উত্তম? মতভেদ সহ লিখ।
৩। কিরান আদায়কারীর নিকট কুরবানীর প্রাণী না থাকলে উহার হুকুম কি?
৪। কিরান হজ্জ আদায়কারী মক্কায় প্রবেশ না করে সরাসরি আরাফাতে গমন করলে তার হুকুম কি?

بَابُ التَّمَتُّعِ

اَلتَّمَتُّعُ اَفْضَلُ مِنَ الْاِفْرَادِ عِنْدَنَا وَالْمُتَمَتِّعُ عَلٰى وَجْهَيْنِ مُتَمَتِّعٌ يَسُوْقُ الْهَدْىَ وَمُتَمَتِّعٌ لَايَسُوْقُ الْهَدْىَ وَصِفَةُ التَّمَتُّعِ اَنْ يَّبْتَدِئَ مِنَ الْمِيْقَاتِ فَيُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَيَدْخُلُ مَكَّةَ فَيَطُوْفُ لَهَا وَيَسْعٰى وَيَحْلِقُ اَوْ يُقَصِّرُ وَقَدْ حَلَّ مِنْ عُمْرَتِهٖ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ اِذَا ابْتَدَأَ بِالطَّوَافِ وَيُقِيْمُ بِمَكَّةَ حَلَالًا فَاِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَفَعَلَ مَايَفْعَلُهُ الْحَاجُّ الْمُفْرِدُ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ مَايَذْبَحُ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فِى الْحَجِّ وَسَبْعَةً اِذَا رَجَعَ اِلٰى اَهْلِهٖ وَاِنْ اَرَادَ الْمُتَمَتِّعُ اَنْ يَّسُوْقَ الْهَدْىَ اَحْرَمَ وَسَاقَ هَدْيَهٗ فَاِنْ كَانَتْ بُدْنَةً قَلَّدَهَا بِمُزَادَةٍ اَوْ نَعْلٍ وَ اَشْعَرَ الْبُدْنَةَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَهُوَ اَنْ يُّشَقَّ سِنَامُهَا مِنَ الْجَانِبِ الْاَيْمَنِ وَلَايُشْعِرُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِذَا دَخَلَ مَكَّةَ طَافَ وَسَعٰى وَلَمْ يَحْلِلْ حَتّٰى يُحْرِمَ بِالْحَجِّ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ فَاِنْ قَدَّمَ الْاِحْرَامَ قَبْلَهٗ جَازَ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ -

হজ্জে তামাত্তু'র অধ্যায়

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ আমাদের (হানাফীদের) মতে, ইফরাদ হতে তামাত্তু' হজ্জ উত্তম। তামাত্তু' পালনকারী দুই শ্রেণীতে বিভক্তঃ প্রথমত এমন তামাত্তু'কারী যে হাদীর পশু প্রেরণ করবে, আর দ্বিতীয়ত এমন মুতামাত্তি' যে হাদীর পশু প্রেরণ করবে না। তামাত্তু'র নিয়ম হল, মীকাত হতে কাজ শুরু করে ওমরার জন্য ইহরাম বাঁধবে এবং মক্কায় প্রবেশ করে ওমরার জন্য তওয়াফ করবে, সায়ী করবে, মাথা মুন্ডন করবে অথবা চুল ছোট করবে। এর ফলে সে ওমরা হতে হালাল হয়ে যাবে। তওয়াফ শুরু করার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। আর মক্কায় হালাল অবস্থায় অবস্থান করবে। অতঃপর তারবিয়ার দিন তথা যিলহজ্জের ৮ তারিখে মাসজিদে হারাম হতে হজ্জের ইহরাম বাঁধবে। আর ইফরাদ হজ্জকারীর ন্যায় হজ্জের কার্যাবলী পালন করবে এবং তার ওপর তামাত্তু'র দম ওয়াজিব হবে। আর যদি সে জবাই করার মতো কোন পশু না পায়, (তথা সামর্থ্যবান না হয়) তাহলে হজ্জের দিনসমূহে তিনটি সাওম রাখবে এবং স্বীয় পরিবারের নিকট ফিরে আসার পর সাতটি সাওম রাখবে। আর তামাত্তু'কারী হাদী প্রেরণ করার ইচ্ছা করলে ইহরাম বাঁধবে এবং হাদী প্রেরণ করবে। আর হাদী যদি উট হয় তবে তার গলায় পুরাতন চামড়া অথবা জুতার হার পরিয়ে দেবে। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, উহাকে ইশ'আর (إشعار) করে দেবে। ইশ'আর বলে উটের কুঁজের ডান পার্শ্বে একটু আঘাত করে দেয়া। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ইশ'আর করবে না। অতঃপর যখন মক্কায় প্রবেশ করবে তখন তওয়াফ করবে, সায়ী করবে এবং আট তারিখে হজ্জের ইহরাম বাঁধা পর্যন্ত হালাল হবে না। আর যদি এর পূর্বে ইহরাম বাঁধে, তাহলেও জায়েয হবে এবং তার ওপরে তামাত্তু'র দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

তামাত্তু'র পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ بَابُ التَّمَتُّعِ ঃ تَمَتُّعٌ শব্দটি বাবে تَفَعُّلٌ -এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল, উপকৃত হওয়া বা লাভবান হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল, হজ্জের মাসসমূহে তথা শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জ মাসে মীকাত হতে শুধু ওমরার ইহরাম বেঁধে ওমরার কার্যাবলী সম্পাদন করে হালাল হয়ে যাওয়া, এরপর যিলহজ্জ মাসের আট তারিখে পুনঃ ইহরাম বেঁধে হজ্জ সমাপন করা। তবে হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে ওমরা না করে অন্য মাসে করলে সে তামাত্তু'কারী হবে না।

তামাত্তু'কারী তওয়াফের সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে ঃ

قَوْلُهُ وَيَقْطَعُ التَّلْبِيَةَ الخ ঃ তামাত্তু' আদায়কারী হাজরে আসওয়াদ চুম্বনের পর ওমরার তওয়াফ শুরু করার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে। মহানবী (সাঃ) হতে অনুরূপ হাদীস বর্ণিত আছে। ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন, বাইতুল্লাহ শরীফের প্রতি দৃষ্টি পড়ার সাথে সাথে তালবিয়া পাঠ বন্ধ করে দেবে।

দমের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَعَلَيْهِ دَمُ التَّمَتُّعِ ঃ হজ্জে তামাত্তু' আদায়কারীর ওপর শুকরিয়া স্বরূপ কিরান আদায়কারীর ন্যায় একটি কুরবানী করা ওয়াজিব। যদি সে কুরবানী করতে সক্ষম না হয়, তাহলে কুরবানীর দিনের পূর্বে তিনটি সাওম রাখতে হবে এবং বাকি সাতটি পরে রাখবে। যদি হজ্জের দিনসমূহে সে তিনটি রাখতে না পারে, তাহলে তাকে কুরবানীই দিতে হবে।

হাদীর জন্তুকে মালা পড়ানোর হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَتْ بَدَنَةً قَلَّدَهَا الخ ঃ হাদীর জন্তুকে অন্যান্য জন্তু হতে পৃথক করার জন্য কিংবা হারিয়ে গেলে খুঁজে বের করার জন্য হাদীর জানোয়ারকে দু'ভাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে—

প্রথমতঃ হার পরিয়ে অর্থাৎ পুরাতন চামড়া বা জুতাকে চুলের রশি পাকিয়ে গলায় পরিয়ে দিতে হবে, যাতে অন্য পশুদের থেকে পৃথক হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ ঝুল বানিয়ে উটের পিঠে ঝুলিয়ে দেয়া। উহা দ্বারাও কুরবানীর জন্তু হিসেবে পরিচয় পাওয়া যাবে, তবে এর চেয়ে হার পরানোই উত্তম।

ইশ'আর বা চিহ্ন দেয়ার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَأَشْعَرَ الْبَدَنَةَ الخ ঃ إِشْعَار -এর শাব্দিক অর্থ হল إِعْلَام তথা জানিয়ে দেয়া বা অবহিত করা। শরীয়তের পরিভাষায়, হাদীর জন্তু নির্ণয় করার জন্য উটের কুঁজের ডান পার্শ্বে বর্শা দ্বারা আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা। ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, ইশ'আর করা জায়েয আছে। কেননা নবী কারীম (সাঃ) এরূপ করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, এটা করা মাকরূহ। তবে অনেকে বলেন, ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) হাদীর জন্তুকে মারাত্মকভাবে যখম করে দেয়াকে মাকরূহ বলেছেন, সামান্য আঘাত করা তাঁর মতেও মাকরূহ নয়; বরং সুন্নত।

হজ্জের বিভিন্ন দিবসের বিভিন্ন নাম ঃ

قَوْلُهُ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ ঃ হজ্জের দিবস সমূহের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়— (১) আট তারিখকে يَوْمُ التَّرْوِيَةِ বলে, (২) নয় তারিখকে يَوْمُ الْعَرَفَةِ বলে, (৩) দশ তারিখকে يَوْمُ النَّحْرِ বলে, (৪) এগারো তারিখকে يَوْمُ الْوُقُوْفِ বলে, (৫) বারো তারিখকে يَوْمُ النَّفْرِ الْاَوَّلِ বলে, আর (৬) তের তারিখকে يَوْمُ النَّفْرِ الثَّانِىْ বলে।

فَاِذَا حَلَقَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَدْ حَلَّ مِنَ الْاِحْرَامَيْنِ وَلَيْسَ لِاَهْلِ مَكَّةَ تَمَتُّعٌ وَلَا قِرَانٌ وَاِنَّمَا لَهُمُ الْاِفْرَادُ خَاصَّةً وَاِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ اِلَى بَلَدِهِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنَ الْعُمْرَةِ وَلَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهَدْىَ بَطَلَ تَمَتُّعُهُ وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ فَطَافَ لَهَا اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَشْوَاطٍ ثُمَّ دَخَلَتْ اَشْهُرُ الْحَجِّ فَتَمَّمَهَا وَاَحْرَمَ بِالْحَجِّ كَانَ مُتَمَتِّعًا فَاِنْ طَافَ لِعُمْرَتِهِ قَبْلَ اَشْهُرِ الْحَجِّ اَرْبَعَةَ اَشْوَاطٍ فَصَاعِدًا ثُمَّ حَجَّ مِنْ عَامِهِ ذٰلِكَ لَمْ يَكُنْ مُتَمَتِّعًا وَاَشْهُرُ الْحَجِّ شَوَّالٌ وَ ذُوالْقَعْدَةِ وَعَشْرٌ مِنْ ذِى الْحَجَّةِ فَاِنْ قَدَّمَ الْاِحْرَامَ بِالْحَجِّ عَلَيْهَا جَازَ اِحْرَامُهُ وَانْعَقَدَ حَجُّهُ وَاِذَا حَاضَتِ الْمَرْاَةُ عِنْدَ الْاِحْرَامِ اِغْتَسَلَتْ وَاَحْرَمَتْ وَصَنَعَتْ كَمَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ اَنَّهَا لَا تَطُوْفُ بِالْبَيْتِ حَتّٰى تَطْهُرَ وَاِذَا حَاضَتْ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ وَبَعْدَ طَوَافِ الزِّيَارَةِ اِنْصَرَفَتْ مِنْ مَكَّةَ وَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِتَرْكِ طَوَافِ الصَّدْرِ -

সরল অনুবাদ ঃ এরপর যখন সে কুরবানীর (১০ তারিখ) দিন মাথা মুন্ডাবে, তখন উভয় ইহরাম হতে হালাল হয়ে যাবে। মক্কাবাসীদের জন্য তামাত্তু' ও কিরান হজ্জ নেই; বরং তাদের জন্য শুধু ইফরাদ হজ্জের সুযোগ রয়েছে। আর তামাত্তু' হজ্জ পালনকারী ওমরা হতে অবসর হবার পর যখন নিজ শহরে প্রত্যাবর্তন করে এবং হাদীর জন্তু প্রেরণ না করে, তখন তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে ওমরার ইহরাম বেঁধে উহার জন্য চার চক্করের কম তওয়াফ করল, অতঃপর হজ্জের মাসসমূহ এসে পড়ল এবং সে ওমরার অবশিষ্ট কাজ করে হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধল, তখন সে তামাত্তু' হজ্জ পালনকারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে যদি সে হজ্জের মাসসমূহের আগমনের পূর্বে ওমরার জন্য চার বা ততোধিক চক্কর তওয়াফ করে, অতঃপর সেই বৎসরই হজ্জ পালন করে, তাহলে সে তামাত্তু' হজ্জ পালনকারী হিসেবে গণ্য হবে না। হজ্জের মাসগুলো হল, শাওয়াল, যিলকদ এবং যিলহজ্জের দশদিন। যদি কোন ব্যক্তি হজ্জের মাস গুলোর পূর্বে হজ্জের ইহরাম বাঁধে তবে তার ইহরাম (জায়েয) বিশুদ্ধ হবে এবং হজ্জ পূর্ণ হয়ে যাবে। আর ইহরামের সময় যদি মহিলা ঋতুবতী হয়ে পড়ে, তাহলে গোসল করে ইহরাম বাঁধবে এবং সে অন্যান্য হাজীদের ন্যায় হজ্জের কার্যাবলী পালন করবে, তবে পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত বাইতুল্লাহ তওয়াফ করবে না। আর যদি আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারতের পর ঋতুবতী হয়ে পড়ে, তাহলে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাওয়াফে সদরকে পরিত্যাগ করবার কারণে তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মক্কার অধিবাসীগণের কিরান ও তামাত্তু' হজ্জ করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ لِاَهْلِ مَكَّةَ الخ ঃ হানাফী মাযহাব অনুসারে মক্কাবাসীদের জন্য কিরান বা তামাত্তু' মাকরূহ। কেননা হাদীস শরীফে তাদের জন্য এ দু'টি না করবার আদেশ রয়েছে। তবে যদি কেউ করে ফেলে তবে জায়েয হবে, কিন্তু একটি দম ওয়াজিব হবে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, মক্কাবাসীদের জন্য উভয়টি জায়েয মাকরূহ নয়।

উল্লেখ্য যে, মক্কাবাসী বলতে মীকাতের ভিতরের সকলকে বোঝায়।

হজ্জে তামাত্তু' বাতিল হবার কারণ ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا عَادَ الْمُتَمَتِّعُ الخ ঃ তামাত্তু'কারী হাদী না প্রেরণ করে হজ্জের মাসে ওমরার কাজ সমাপন করে নিজ দেশে ফিরে গেলে তার তামাত্তু' বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি হাদীর জানোয়ার প্রেরণ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, তার তামাত্তু' বাতিল হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর নিকট বাতিল হয়ে যাবে।

হজ্জের মাসের পূর্বে ওমরার কাজ আংশিক করলে তামাত্তু' হজ্জ হবে কিনা ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ الخ ঃ কোন ব্যক্তি যদি হজ্জের মাসসমূহের পূর্বে ওমরার ইহরাম করে চার চক্করের কম তাওয়াফ করে, এরপর বাকি তাওয়াফ হাজ্জের মাসে করে, তাহলে তার তামাত্তু' বাতিল হবে না; বরং সে তামাত্তু'কারী হিসেবে পরিগণিত হবে। তবে চার চক্কর বা তার বেশি হজ্জের মাসের পূর্বে করলে সে তামাত্তু'কারী হিসেবে গণ্য হবে না।

হজ্জের মাসসমূহের বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ وَأَشْهُرُ الْحَجِّ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতানুসারে হজ্জের মাস হলো, শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্জের (১০) দশ তারিখ পর্যন্ত। ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, সম্পূর্ণ যিলহজ্জ মাস হজ্জের মাসসমূহের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যিলহজ্জের দশ তারিখের সুবহে সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত হজ্জে মাস, দশম তারিখ হজ্জের মাসের অন্তর্ভুক্ত নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। তামাত্তু' (تَمَتُّعٌ) হজ্জের পরিচয় দাও।
২। حَجِّ تَمَتُّعٌ আদায় করার নিয়ম ও হুকুম বর্ণনা কর।
৩। তামাত্তু' পালনকারী দম না দিতে পারলে কি করবে? বিস্তারিত লিখ।
৪। তাম্যাত্তু' পালন কারীর হাদী প্রেরণ করার নিয়ম লিখ এবং إِشْعَار করার বিধান ইমামদের মতভেদসহ লিখ।

بَابُ الْجِنَايَاتِ

إِذَا تَطَيَّبَ الْمُحْرِمُ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَإِنْ تَطَيَّبَ عُضْوًا كَامِلًا فَمَا زَادَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ تَطَيَّبَ أَقَلَّ مِنْ عُضْوٍ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُخِيطًا أَوْ غَطَّى رَأْسَهُ يَوْمًا كَامِلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ فَصَاعِدًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ حَلَقَ أَقَلَّ مِنَ الرُّبُعِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ حَلَقَ مَوْضَعَ الْمَحَاجِمِ مِنَ الرَّقَبَةِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى صَدَقَةٌ وَإِنْ قَصَّ أَظَافِيرَ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ قَصَّ يَدًا أَوْ رِجْلًا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرَ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ قَصَّ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ أَظَافِيرَ مُتَفَرِّقَةً مِنْ يَدَيْهِ وَ رِجْلَيْهِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ دَمٌ -

---

ত্রুটি বিচ্যুতির অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ মুহরিম ব্যক্তি সুগন্ধি ব্যবহার করলে তার ওপর কাফ্‌ফারা ওয়াজিব হবে। অতএব যদি সে পূর্ণ একটি অঙ্গ অথবা উহার অতিরিক্ত অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করে, তবে তার ওপর দম (কুরবানী) ওয়াজিব হবে। আর যদি এক অঙ্গের কমে ব্যবহার করে, তাহলে সদকা ওয়াজিব হবে। যদি সেলাই করা কাপড় পরিধান করে অথবা একদিন মাথা ঢেকে রাখে, তবে দম ওয়াজিব হবে। এর চেয়ে (একদিনের) কম সময় আবৃত রাখলে সদকা ওয়াজিব হবে। মাথার চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি মুন্ডন করলে দম ওয়াজিব হবে, আর এক চতুর্থাংশের কম মুন্ডালে সদকা আবশ্যক হবে। যদি ঘাড়ের শিঙ্গা লাগানোর স্থানের চুল মুন্ডায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, দম ওয়াজিব হবে, আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, সদকা আবশ্যক হবে। উভয় হাত ও উভয় পায়ের নখ কাটলে দম ওয়াজিব হবে। এক হাত এবং এক পায়ের নখ কাটলেও দম ওয়াজিব হবে। পাঁচটি নখের কম কাটলে সদকা আবশ্যক হবে। যদি উভয় হাত ও উভয় পায়ের পৃথক পৃথক পাঁচটি নখ কাটে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সদকা ওয়াজিব হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, দম ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মুহরিমের সুগন্ধি ব্যবহারের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ تَطَيَّبَ عُضْوًا الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় পূর্ণ এক অঙ্গ যেমন— মাথা বা হাত ইত্যাদি সুগন্ধি ব্যবহার করলে একটি দম ওয়াজিব হবে। এক অঙ্গের কম হলে সদকা ওয়াজিব হবে। আর বিভিন্ন অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করলে সব মিলে যদি একটি পূর্ণ অঙ্গের সমান হয়, তাহলে দম ওয়াজিব হবে। আর কয়েকটি পূর্ণ অঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করলে শায়খাইনের

মতে প্রত্যেকটির জন্য পৃথক পৃথক দম দিতে হবে, আর মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, একটি দম দিলেই চলবে, ইমাম মাযনীর মতে, সর্বাঙ্গে সুগন্ধি ব্যবহার করলে সমস্ত দেহকে এক জাতীয় হবার দরুন একটি দমই ওয়াজিব হবে।

সেলাই করা কাপড় পড়লে এবং মাথা আবৃত রাখলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ لَبِسَ ثَوْبًا مُخِيطًا الخ ঃ মুহরিম ব্যক্তি সেলাই করা পোশাক পরিধান করলে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তবে সেলাই করা জামা কাঁধে রাখলে বা আস্তিনে হাত প্রবেশ না করালে কিংবা ব্যতিক্রম পরলে যেমন- জামাকে পাজামা হিসেবে পরেছে এতে কিছু ওয়াজিব হবে না, তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা মাকরূহ। এমনিভাবে যদি কোন মুহরিম পূর্ণ একদিন মাথা ঢেকে রাখে, চাই তা টুপি, গামছা, সেলাই করা বা সেলাইহীন যে কোন কাপড় দিয়ে হোক, তাতে একটি দম ওয়াজিব হবে। এর থেকে কম সময় আবৃত করে রাখলে সদকা ওয়াজিব হবে।

মাথা মুন্ডানো প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ حَلَقَ رُبُعَ رَأْسِهِ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় যদি মাথার চতুর্থাংশ বা তার চেয়ে বেশি অংশ মুন্ডায়, তাহলে দম ওয়াজি হবে। এতে পুরো মুন্ডানো হিসেবে ধরা হবে। কেননা অনেকে এক চতুর্থাংশ ফ্যাশনের জন্য কাটে বা মুন্ডায়।

ইহরাম অবস্থায় নখ কাটার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَّ اَظَافِيرَ الخ ঃ মুহরিম ব্যক্তি দুই হাত বা দুই পায়ের অথবা এক হাত বা এক পায়ের নখ কাটলে দম ওয়াজিব। আর এক হাত বা এক পায়ের কিংবা হাত পায়ের বিভিন্ন স্থান হতে পাঁচটির কম নখ কর্তন করলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, সদকা ওয়াজিব হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, দম আবশ্যক হবে। আর পাঁচটি কাটা হলে এক মজলিসে হোক বা ভিন্ন ভিন্ন মজলিসে হোক দম ওয়াজিব হবে।

وَإِنْ تَطَيَّبَ أَوْ حَلَقَ أَوْ لَبِسَ مِنْ عُذْرٍ فَهُوَ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ ذَبَحَ شَاةً وَإِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِيْنَ بِثَلٰثَةِ اَصْوُعٍ مِنَ الطَّعَامِ وَإِنْ شَاءَ صَامَ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ وَإِنْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ فَعَلَيْهِ دَمٌ اَنْزَلَ اَوْ لَمْ يُنْزِلْ وَمَنْ جَامَعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ قَبْلَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَسَدَ حَجُّهُ وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَيَمْضِىْ فِى الْحَجِّ كَمَا يَمْضِىْ مَنْ لَمْ يُفْسِدْ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ اَنْ يُّفَارِقَ اِمْرَأَتَهُ اِذَا حَجَّ بِهَا فِى الْقَضَاءِ عِنْدَنَا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ لَمْ يُفْسِدْ حَجَّهُ وَعَلَيْهِ بُدْنَةٌ وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْحَلْقِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ -

---

সরল অনুবাদ ঃ কোন ওজরবশত যদি সুগন্ধি লাগায় অথবা মাথা মুন্ডন করে কিংবা সেলাইকৃত কাপড় পরিধান করে তাহলে সে ইচ্ছা করলে বকরি জবাই করবে অথবা ছয়জন মিসকিনকে তিন 'সা' খাবার সদকা করবে, আর ইচ্ছা করলে তিনটি সাওম রাখবে। আর স্ত্রীকে কামভাবের সাথে চুম্বন করলে অথবা স্পর্শ করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে উভয় পথের যে কোন একটি দিয়ে সহবাস করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়ে যাবে, ফলে তার ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে এবং সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় হজ্জের কার্যাবলী পালন করে যাবে যার হজ্জ বিনষ্ট হয়নি। আর আমাদের মতে, তার ওপর আবশ্যক নয় হজ্জের কাযার সময় স্বীয় স্ত্রীকে পৃথক রাখা। আর যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পর সঙ্গম করবে তার হজ্জ ভঙ্গ হবে না, তবে তার ওপর একটি উট জবাই করা আবশ্যক হবে। আর যে ব্যক্তি মাথা মুন্ডানোর পর স্ত্রী সহবাস করবে, তার ওপর একটি বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওজরের কারণে সুগন্ধি ও মাথা মুন্ডালে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ تَطَيَّبَ اَوْ حَلَقَ الخ ঃ কোন ওজরের কারণে পুরো এক অঙ্গে সুগন্ধি লাগায় কিংবা কোন ওজরে যেমন— মাথায় উকুন, মাথা ব্যথা ইত্যাদি কারণে এক চতুর্থাংশ মুন্ডায়, তাহলে তিনটি কাজের মধ্য হতে যে কোন একটি করতে হবে তথা তিনদিন সাওম রাখা, তিন 'সা' পরিমাণ ছয়জন মিসকিনকে খাবার দান করা অথবা কুরবানী করা। যেমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ رَّأْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْنُسُكٍ

অর্থাৎ তোমাদের মধ্য হতে কোন ব্যক্তি রোগগ্রস্ত হলে অথবা মাথায় কোন কষ্টদায়ক থাকলে তাকে ফিদিয়া হিসেবে সাওম রাখতে হবে অথবা সদকা দিতে হবে কিংবা কুরবানী করতে হবে।

ইহরাম অবস্থায় স্পর্শ ও চুম্বন করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ قَبَّلَ اَوْ لَمَسَ بِشَهْوَةٍ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় স্বীয় স্ত্রীকে কাম ও বাসনার সাথে চুম্বন ও স্পর্শ করলে বীর্যপাত হোক বা না হোক তার ওপর দম দেয়া ওয়াজিব, তবে জামে সাগীর কিতাবে দম ওয়াজিব হবার জন্য বীর্যপাত হবার শর্তারোপ করেছেন।

আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَ مَنْ جَامَعَ فِىْ اَحَدِ السَّبِيْلَيْنِ الخ ঃ ইহরাম অবস্থায় আরাফায় অবস্থানের পূর্বে যে কোন এক রাস্তায় সহবাস করলে সকল ইমাম এ কথার ওপর একমত যে, তার হজ্জ বিনষ্ট হয়ে যাবে, ইচ্ছায় করুক বা অনিচ্ছায় করুক। এ

জন্য তাকে হানাফীদের নিকট একটি ছাগল এবং অন্যান্য ইমামদের নিকট একটি উট কুরবানী করতে হবে, আর হজ্জের বাকি কাজ যথারীতি করে যেতে হবে এবং পরবর্তী বৎসর তার এ হজ্জের কাযা আদায় করতে হবে। পরবর্তী বছর কাযা সম্পাদনের সময় স্বীয় স্ত্রীকে পৃথক রাখা আবশ্যক নয়, এটা হানাফীদের অভিমত।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, কাযা আদায়ের জন্য বের হবার পরপরই স্ত্রী হতে পৃথক হয়ে যাবে। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, পূর্বের বৎসর তারা যে স্থানে সহবাসে লিপ্ত হয়েছিল সেখান হতে পৃথক হয়ে যাবে। অবশ্য পরবর্তীতে ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) এ মত পরিত্যাগ করে হানাফীদের মতকে গ্রহণ করেছেন।

<u>আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করলে তার হুকুম ঃ</u>

قَوْلُهُ وَ مَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ الخ ঃ আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করলে সকল ইমামের ঐকমত্যে হজ্জ বিনষ্ট হবে না। কেননা হজ্জের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম কাজ হল আরাফায় অবস্থান করা। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন- مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ অর্থাৎ "যে আরাফায় অবস্থান করল তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।" কাজেই কোন ব্যক্তি যদি আরাফায় অবস্থানের পর মুযদালিফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করে, তাহলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে একটি উট কুরবানী করতে হবে। আর যদি হলকের পর তাওয়াফে যিয়ারতের পূর্বে সহসাব করে, তাহলে একটি বকরি জবাই করা ওয়াজিব, আর তাওয়াফে যিয়ারতের পর করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা তখন তার জন্য সব হালাল হয়ে যায়।

وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَفْسَدَهَا وَمَضَى فِيهَا وَقَضَاهَا وَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ وَطِئَ بَعْدَمَا طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَلَا تَفْسُدُ عُمْرَتُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ قَضَاؤُهَا وَمَنْ جَامَعَ نَاسِيًا كَمَنْ جَامَعَ عَامِدًا فِي الْحُكْمِ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُومِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُعِيدَ الطَّوَافَ مَادَامَ بِمَكَّةَ وَلَا ذَبْحَ عَلَيْهِ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الصَّدْرِ مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ كَانَ جُنُبًا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ ثَلٰثَةَ أَشْوَاطٍ فَمَا دُونَهَا فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَإِنْ تَرَكَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ بَقِيَ مُحْرِمًا أَبَدًا حَتّٰى يَطُوفَهَا وَمَنْ تَرَكَ ثَلٰثَةَ أَشْوَاطٍ مِنْ طَوَافِ الصَّدْرِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَإِنْ تَرَكَ طَوَافَ الصَّدْرِ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ شَاةٌ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি ওমরার মধ্যে চার চক্কর তওয়াফ করবার পূর্বে স্ত্রী সহবাস করবে তার ওমরা বিনষ্ট হয়ে যাবে, তবে সে ওমরার কাজ যথারীতি পালন করে যাবে এবং উহার কাযা করবে, আর তার ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে। আর যদি চার চক্কর তওয়াফের পর সহবাস করে, তাহলে তার ওপর একটি বকরি ওয়াজিব হবে, কিন্তু ওমরা বিনষ্ট হবে না এবং উহার কাযা করাও আবশ্যক হবে না। যে ব্যক্তি ভুলবশত সহবাস করবে, হুকুমের বেলায় সে ইচ্ছাকৃতভাবে সহবাস কারীর ন্যায়ই হবে। আর যে ব্যক্তি ওযূবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম করবে, তার ওপর সদকা ওয়াজিব হবে, আর জুনূবী অবস্থায় করলে একটি বকরি ওয়াজিব হবে। ওযূবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে, আর জুনূবী অবস্থায় করলে উট জবাই করা আবশ্যক হবে। তবে মক্কায় অবস্থানকালে (এ ব্যক্তির) পুনরায় তাওয়াফে যিয়ারত করে নেয়া উত্তম, (তখন) তার ওপর কোন প্রাণী জবাই করা ওয়াজিব হবে না। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফে সদর বিনা ওযূতে করে, তার ওপর সদকা ওয়াজিব হবে, আর যদি জুনূবী অবস্থায় করে, তাহলে বকরি দেয়া ওয়াজিব হবে। যদি তাওয়াফে যিয়ারতের তিন চক্কর বা তার কম ছেড়ে দেয়, তাহলে তার ওপর বকরি কুরবানী করা ওয়াজিব হবে, আর যদি চার চক্কর ছেড়ে দেয়, তাহলে যে পর্যন্ত সম্পূর্ণ তাওয়াফ না করবে সেই পর্যন্ত সে মুহরিম থেকে যাবে। যে ব্যক্তি তাওয়াফে সদরের তিন চক্কর ছেড়ে দেবে, তার ওপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর যদি তাওয়াফে সদর ছেড়ে দেয় অথবা চার চক্কর ছেড়ে দেয় তাহলে বকরি ওয়াজিব হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

চার চক্করের কম তাওয়াফের পর সঙ্গম করলে ওমরা বিনষ্ট হয়ে যাবে ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ جَامَعَ فِي الْعُمْرَةِ الخ ঃ ওমরার মধ্যে চার চক্কর তাওয়াফের পূর্বে সহবাস করলে ওমরা বিনষ্ট হয়ে যাবে। এ ওমরার কার্য করতে হবে এবং যথারীতি ওমরার বাকি কাজ সম্পাদন করে যাবে এবং একটি দম ওয়াজিব হবে। আর যদি চার চক্করের পর সহবাস করে, তাহলে ওমরা বিনষ্ট হবে না, তবে তাকে একটি বকরি জবাই করতে হবে।

আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, উভয় অবস্থায় ওমরা বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং এর জন্য উট ওয়াজিব হবে। তিনি ওমরাকে হজ্জের ওপর কিয়াস করেন। আর হানাফীরা বলেন, ওমরা হল সুন্নত, কাজেই চার চক্করকেই পূর্ণ তওয়াফ হিসেবে গণ্য করা হবে এবং ওমরা নষ্টের জন্য বকরিই ওয়াজিব হবে– উট নয়।

ওযূবিহীন অবস্থায় তাওয়াফে কুদূম করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ طَافَ طَوَافَ الْقُدُوْمِ الخ ঃ ওযূবিহীন অবস্থায় কেউ তাওয়াফে কুদূম করলে হানাফীদের নিকট দম ওয়াজিব হবে না; বরং সদকা ওয়াজিব হবে। কেননা তওয়াফের জন্য ওযূ শর্ত নয়। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, দম ওয়াজিব। কেননা রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন– اَلطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلٰوةٌ অর্থাৎ "বাইতুল্লার তওয়াফ সালাতের ন্যায়।" কাজেই সালাতের ন্যায় যখন তখন ওযূ শর্ত।

আর হানাফীগণ বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন– وَلْيَطَّوَّفُوْا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ অত্র আয়াতে ওযূর কোন শর্তারোপ করা হয়নি, ফলে ইমাম শাফিয়ীর খবরে ওয়াহিদ কিতাবুল্লার দ্বারা পরিত্যাজ্য হবে। এ ছাড়া তওয়াফে যিয়ারতে ওযূ ছাড়ার কারণে দম ওয়াজিব হয়, তওয়াফে কুদূমেও যদি দম সাব্যস্ত করা হয় তাহলে ফরয ও সুন্নত এক বরাবর হয়ে যাবে। তাই তওয়াফে কুদূম বিনা ওযূতে করলে সদকা ওয়াজিব হবে, আর জানাবত অবস্থায় করলে দম ওয়াজিব হবে।

জানাবত অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ جُنُبًا الخ ঃ বিনা ওযূতে তওয়াফে যিয়ারত করলে একটি বকরি দম হিসেবে দিলে চলবে। কিন্তু জানাবত (গোসল ফরয) অবস্থায় তওয়াফে যিয়ারত করলে পুনারায় আদায় করা ওয়াজিব। যদি পুনরায় না করে বাড়ি ফিরে আসে, তবে পুনঃ ইহরাম বেঁধে তওয়াফ করার জন্য আসা ওয়াজিব। আর ফিরে না আসলে বা তাওয়াফ পুনরায় না করলে একটি উট কুরবানী করে দিতে হবে। আর তওয়াফ পুনঃ করলে কুরবানী করতে হবে না।

জানাবত অবস্থায় তাওয়াফে সদর করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ جُنُبًا الخ ঃ ওযূবিহীন অবস্থায় তওয়াফে সদর বা বিদায়ী তওয়াফ করলে সদকা আদায় করতে হবে। কিন্তু জানাবত অবস্থায় করলে একটি বকরি জবাই করতে হবে। কেননা তওয়াফে সদর ওয়াজিব– ফরয নয়।

তাওয়াফে তিন বা চার চক্কর পরিত্যাগ করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ تَرَكَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ الخ ঃ **তাওয়াফে যিয়ারত সম্পর্কে ঃ** তাওয়াফে যিয়ারত হতে তিন চক্কর বা তার চেয়ে কম পরিত্যাগ করলে তার ওপর বকরি জবাই করা ওয়াজিব হবে। কেননা যে ব্যক্তি চার চক্কর তওয়াফ করল সে যেন সম্পূর্ণ তওয়াফই করল। আর চার চক্কর পরিত্যাগ করলে সে তওয়াফ করেনি বলে ধর্তব্য হবে। তওয়াফে যিয়ারত না করা পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থেকে যাবে।

তাওয়াফে সদর বা বিদায়ী তাওয়াফ প্রসঙ্গে ঃ যে ব্যক্তি তওয়াফে সদরের তিন তাওয়াফ ছেড়ে দেয় তার ওপর সদকা করা আবশ্যক হবে। আর যদি একেবারে পরিত্যাগ করে কিংবা চার চক্কর ছেড়ে দেয়, তবে তার ওপর একটি বকরি কুরবানী করা আবশ্যক হবে।

وَمَنْ تَرَكَ السَّعْىَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَحَجُّهُ تَامٌّ وَمَنْ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ الْاِمَامِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ بِمُزْدَلِفَةَ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْىَ الْجِمَارِ فِى الْاَيَّامِ كُلِّهَا فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ تَرَكَ رَمْىَ اِحْدَى الْجِمَارِ الثَّلٰثِ فَعَلَيْهِ صَدَقَةٌ وَاِنْ تَرَكَ رَمْىَ جَمْرَةِ الْعَقَبَى فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ وَمَنْ اَخَّرَ الْحَلْقَ حَتّٰى مَضَتْ اَيَّامُ النَّحْرِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ اِنْ اَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اَوْ دَلَّ عَلَيْهِ مَنْ قَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ سَوَاءٌ فِىْ ذٰلِكَ الْعَامِدُ وَالنَّاسِىْ وَالْمُبْتَدِئُ وَالْعَائِدُ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যে ব্যক্তি সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে দৌড়ানো ছেড়ে দেয় তার ওপর বকরি ওয়াজিব হবে এবং তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। যে ব্যক্তি ইমামের পূর্বে আরাফা হতে (ত্যাগ করে) প্রত্যাবর্তন করে, তার ওপর একটি দম ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি মুযদালিফায় অবস্থান ছেড়ে দেয় তার ওপর একটি কুরবানী আবশ্যক হবে। আর যে তিনটি জামরাতে সকল দিনের কঙ্কর নিক্ষেপ পরিত্যাগ করবে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। তবে যদি তিনটি হতে একটি জামরার কঙ্কর নিক্ষেপ পরিত্যাগ করে তার ওপর সদকা ওয়াজিব হবে। আর যদি ১০ তারিখে জামরায়ে আকাবাতে কঙ্কর নিক্ষেপ বর্জন করে, তবে তার ওপর দম ওয়াজিব হবে। যে ব্যক্তি মাথা মুণ্ডানো বিলম্ব করে কুরবানীর দিন (দশ, এগারো ও বারো) সমূহের পরে মুণ্ডায়, তবে তার ওপর দম আবশ্যক হবে। এটা ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর অভিমত। এমনিভাবে তাওয়াফে যিয়ারতও যদি কুরবানীর দিন সমূহের পরে করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট দম ওয়াজিব হবে। যদি মুহরিম ব্যক্তি শিকার প্রাণী হত্যা করে অথবা শিকার প্রাণীর দিকে যে কতল করে তাকে পথ দেখিয়ে দেয়, তাহলে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বা প্রতিদান ওয়াজিব হবে। আর এতে স্বেচ্ছায় করুক বা ভুলে করুক, প্রথমবার করুক বা পুনরায় করুক উভয়েই এক সমান তথা একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

সাফা মারওয়ার সায়ী ত্যাগ করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ السَّعْىَ الخ ঃ সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সায়ী করা পরিত্যাগ করলে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী বকরি জবাই করা ওয়াজিব এবং তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা হানাফীদের মতে এই সায়ী ওয়াজিব— ফরয নয়, তাই ক্ষতিপূরণ দিলে সিদ্ধ হয়ে যাবে। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, সায়ী ফরয, তাই তাওয়াফে যিয়ারতের যে হুকুম সায়ীরও সে হুকুম।

আরাফা হতে ইমামের পূর্বে প্রত্যাবর্তন করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَفَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ الخ ঃ ইমামের পূর্বে আরাফা হতে প্রত্যাবর্তন করলে দম ওয়াজিব হবে, তবে সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ত্যাগ করলে এ হুকুম বর্তাবে; সূর্যাস্তের পর ত্যাগ করলে দম আবশ্যক হবে না।

ইমাম যদি সূর্যাস্তের পূর্বে অন্যান্য লোকদেরকে নিয়ে আরাফা ত্যাগ করে মুযদালিফায় যাত্রা করে, তাহলে প্রত্যেকের ওপর দম আবশ্যক হবে। আর ইমাম সূর্যাস্তের পূর্বে ত্যাগ করলে অন্যান্যরা যদি তার অনুসরণ না করে, তাহলে তাদের ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা অন্যায়ের ব্যাপারে ইমামের অনুসরণ না করা অপরাধ নয়। যেমন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন— لَاطَاعَةَ فِى الْمَعْصِيَةِ তথা অন্যায়ের ব্যাপারে কারো আনুগত্য জায়েয নেই।

ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, সূর্যাস্তের পূর্বে আরাফা ত্যাগ করে মুযদালিফায় যাত্রা করলে তাতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা শুধু আরাফায় অবস্থান করা হল হজ্জের রুকন। এখানে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করা আবশ্যক নয়।

আমরা হানাফীরা এর জবাবে বলি যে, নস-এর মধ্যে সূর্য অস্ত যাবার পর আরাফা ত্যাগের নির্দেশ এসেছে সেই নির্দেশের কারণে উহা ওয়াজিব হয়েছে, তাই ওয়াজিব পরিহারের কারণে দম ওয়াজিব হবে।

মুযদালিফায় অবস্থান ও কঙ্কর নিক্ষেপ না করলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ تَرَكَ الْوُقُوْفَ الخ ঃ দুই সালাতকে একত্রকরণ সহ মুযদালিফায় অবস্থান না করলে দম ওয়াজিব হবে। তিন জামরায় পাথর নিক্ষেপ পরিত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে, কিন্তু একটি ছেড়ে দিলে দম আবশ্যক হবে না; বরং সদকা ওয়াজিব হবে। তবে কুরবানীর দিবসে জামরায়ে আকাবায় কঙ্কর নিক্ষেপ পরিত্যাগ করলে দম ওয়াজিব হবে।

হলক ও তাওয়াফে যিয়ারত পরে করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَخَّرَ الْحَلْقَ الخ ঃ কুরবানীর দিনসমূহের পরে হলক করলে এবং তাওয়াফে যিয়ারত করলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, দম ওয়াজিব হবে।

কুরবানীর দিনের কাজসমূহ ধারাবাহিকভাবে না করলে দম ওয়াজিব হয় ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ اَخَّرَ الْحَلْقَ الخ ঃ কুরবানীর দিবসে তথা ১০ তারিখে চারটি কাজ ধারাবাহিক নিয়মে করা ওয়াজিব। প্রথমে (১) জামরায়ে আকাবায় প্রস্তর নিক্ষেপ করা, তারপর (২) কুরবানী করা, তারপর (৩) মাথা মুণ্ডানো, সর্বশেষ হল (৪) তাওয়াফে যিয়ারত করা। সংক্ষেপে জানার জন্য "رذحط" শব্দটি মুখস্ত রাখলে সহজ হয়। এ চারটি কাজের মধ্যে আগ-পর করলে তথা ধারাবাহিক নিয়ম ভঙ্গ করলে ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, আহমদ ও ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর এক রিওয়ায়াত অনুযায়ী দম ওয়াজিব হবে। আর সাহিবাইনের মতে, এ চারটি কাজ অগ্রপশ্চাৎ করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কেননা বিদায়ী হজ্জে রাসূল (সাঃ)-কে এরূপ অগ্রপশ্চাতের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে জবাবে বলেন, اِفْعَلْ وَلَاحَرَجَ অর্থাৎ করে যাও এতে কোন ক্ষতি নেই।

আর আবূ হানীফা (রহঃ) ও অন্যান্যদের দলিল হল, ইবনে আব্বাস ও ইবনে মাসঊদ (রাঃ)-এর হাদীস, যাতে এরূপ করার কারণে দম ওয়াজিব হবার বিষয় উল্লেখ রয়েছে।

আর সাহিবাইনের দলিলের জবাবে বলা যায় যে, তাদের হাদীসের না দ্বারা উদ্দেশ্য হলো نَفْى فَسَاد حَجّ তথা হজ্জ বিনষ্ট না হওয়া, জাযা ও ফিদিয়ার ওয়াজিব না হওয়া নয়।

মুহরিমের শিকার করা প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا قَتَلَ الْمُحْرِمُ الخ ঃ মুহরিম যদি শিকার করে কোন জন্তুকে হত্যা করে অথবা কাউকে শিকারির দিকে পথ দেখিয়ে দেয় আর সে উহাকে হত্যা করে, তাহলে উক্ত জন্তুটির জাযা বা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা আবশ্যক। আর যদি শিকারিকে শিকার দেখিয়ে দিয়েছে, কিন্তু সে জন্তুটিকে হত্যা করেনি, তাহলে জাযা ওয়াজিব হবে না। জাযার ব্যাপারে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রথমবার বা দ্বিতীয়বার কতল করুক বা পথ দেখাক উভয়ই সমান।

উল্লেখ্য যে, এখানে শিকার দ্বারা স্থলজ প্রাণী শিকার উদ্দেশ্য, জলজ প্রাণী উদ্দেশ্য নয়। কেননা জলজ প্রাণী মুহরিমের জন্য শিকার করা জায়েয। তেমনিভাবে কোন প্রাণী জলে জন্মগ্রহণ করে স্থলে বসবাস করলে তাকে কতল করাও জায়েয।

وَالْجَزَاءُ عِنْدَ اَبِیْ حَنِیْفَةَ وَاَبِیْ یُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰی اَنْ یُّقَوَّمَ الصَّیْدُ فِی الْمَكَانِ الَّذِیْ قَتَلَهُ فِیْهِ اَوْ فِیْ اَقْرَبِ الْمَوَاضِعِ مِنْهُ اِنْ كَانَ فِیْ بَرِّیَّةٍ یُقَوِّمُهُ ذَوَا عَدْلٍ ثُمَّ هُوَ مُخَیَّرٌ فِی الْقِیْمَةِ اِنْ شَاءَ اِبْتَاعَ بِهَا هَدْیًا فَذَبَحَهُ اِنْ بَلَغَتْ قِیْمَتُهُ هَدْیًا وَاِنْ شَاءَ اِشْتَرٰی بِهَا طَعَامًا فَتَصَدَّقَ بِهٖ عَلٰی كُلِّ مِسْكِیْنٍ نِصْفَ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ اَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ اَوْ صَاعًا مِنْ شَعِیْرٍ وَاِنْ شَاءَ صَامَ عَنْ كُلِّ نِصْفِ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ یَوْمًا وَعَنْ كُلِّ صَاعٍ مِنْ شَعِیْرٍ یَوْمًا فَاِنْ فَضَلَ مِنَ الطَّعَامِ اَقَلُّ مِنْ نِصْفِ صَاعٍ فَهُوَ مُخَیَّرٌ اِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهٖ وَاِنْ شَاءَ صَامَ عَنْهُ یَوْمًا كَامِلًا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰی یَجِبُ فِی الصَّیْدِ النَّظِیْرُ فِیْمَا لَهٗ نَظِیْرٌ فَفِی الظَّبْیِ شَاةٌ وَفِی الضَّبُعِ شَاةٌ وَفِی الْاَرْنَبِ عِنَاقٌ وَفِی النَّعَامَةِ بَدَنَةٌ وَفِی الْیَرْبُوْعِ جَفْرَةٌ –

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, উহার প্রতিদান সে স্থানের হিসেবে নির্ধারণ করা হবে যেখানে শিকারকে কতল করা হয়েছে, অথবা তার নিকটবর্তী স্থানের মূল্য হিসেবে। আর যদি হত্যাকাণ্ড (স্থলভাগে) জঙ্গলে সংঘটিত হয়ে থাকে, তবে দুইজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উহার মূল্য নির্ধারণ করবেন। এরপর উহার মূল্যের ব্যাপারে মুহরিমের এখতিয়ার থাকবে, ইচ্ছা করলে তার মূল্য দ্বারা হাদীর জানোয়ার ক্রয় করে জবাই করে দেবে যদি উহার মূল্য হাদীর মূল্যে পরিমাণ পৌঁছে, আর ইচ্ছা করলে তা দ্বারা খাবার ক্রয় করে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ 'সা' যব সদকা করে দেবে, আর ইচ্ছা করলে অর্ধ 'সা' গম বা এক 'সা' যবের পরিবর্তে এক দিনের সাওম রাখবে। আর যদি (খাবার) গম অর্ধ 'সা' এর কম অতিরিক্ত হয়ে যায়, তাহলে তার ইচ্ছা থাকবে– যদি চায় তবে উহা সদকা করে দেবে, ইচ্ছা করলে উহার পরিবর্তে পূর্ণ একদিন সাওম রাখবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেছেন, যে শিকারের সাদৃশ্য রয়েছে তার সাদৃশ্য দেয়া ওয়াজিব। সুতরাং হরিণের পরিবর্তে একটি বকরি, হায়েনার জন্য একটি ছাগল এবং খরগোশের জন্য বকরির ছয় মাসের বাচ্চা ওয়াজিব হবে। আর উট পাখির জন্য উট এবং বন্য ইঁদুরের জন্য বকরির চার মাসের বাচ্চা দিতে হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

<u>পশুর মূল্য নির্ধারণ প্রসঙ্গে ঃ</u>

قَوْلُهٗ وَالْجَزَاءُ عِنْدَ اَبِیْ حَنِیْفَةَ الخ ঃ ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, যে পশু কতল করা হয়েছে উহার মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। আর এটা নির্ধারণ করা হবে সে স্থানের যেখানে কতল করা হয়েছে অথবা তার নিকটবর্তী স্থানের মূল্য হিসেবে। ইমাম মুহাম্মদ ও শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, যেসব পশুর আকৃতি তুল্য পশু রয়েছে সেগুলো কতল করলে আকৃতি তুল্য দিতে হবে, যেমন— হরিণের তুল্য বকরি। আর যেগুলোর সাদৃশ্য নেই সেগুলোর মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেছেন— فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ النَّعَمِ এতে مِثْل দ্বারা সাদৃশ্য বোঝানো হয়েছে।

হানাফীরা বলেন, সকল পশুর মূল্যমান নির্ধারণ করতে হবে। কেননা ক্ষতিপূরণ দুই ভাবে— (১) ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ তথা যেসব বস্তুর তুল্য পাওয়া যায় তার সমতুল্য বস্তু দ্বারা ক্ষতি পূরণ দেয়া। (২) ذَوَاتُ الْقِیَمِ তথা যার তুল্য নেই তার ক্ষতিপূরণ মূল্য দ্বারা দিতে হয়। আর ওলামায়ে কিরাম এ কথার ওপর সর্বসম্মত যে, প্রাণী সাদৃশ্যহীন কাজেই তার মূল্যই নির্ধারিত হবে।

মূল্য নির্ধারণের বিধান ঃ

قَوْلُهٗ اَنْ يُّقَوِّمَ الصَّيْدَ فِى الْمَكَانِ الخ ঃ মুহরিম কোন পশুকে হত্যা করলে দুই ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি উহার মূল্য নির্ধারণ করবেন। যে স্থানে মারা হয়েছে সে স্থানের মূল্যই নির্ধারণ করবে, অথবা পার্শ্ববর্তী স্থানের মূল্য অনুযায়ী মূল্য নির্ধারণ করবে।

হাদী দেয়া, সদকা করা বা সাওম রাখার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ ثُمَّ هُوَ مُخَيَّرٌ فِى الْقِيْمَةِ الخ ঃ কতলকৃত পশুর মূল্যকে মুহরিম ব্যক্তি তিনভাবে আদায় করতে পারে--

১. পশু কুরবানী ঃ কতলকৃত পশুর মূল্যমান দিয়ে যদি কুরবানীর পশু ক্রয় করা যায় তথা কমপক্ষে এক বছরের ছাগল কিংবা ছয় মাসের দুম্বা ক্রয় করা যায়, তাহলে কুরবানী করা জায়েয আছে; অন্যথা সদকা করে দেবে।

২. সদকা করা ঃ নিহত জন্তুর মূল্য ইচ্ছা করলে ফকির মিসকিনকে দিয়ে দিতে পারে। তবে প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ 'সা' পরিমাণ গম অথবা এক 'সা' খেজুর বা যব দিতে হবে।

৩. সাওম রাখা ঃ মুহরিম ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাওম রাখতে পারে। সাওম রাখতে হলে প্রত্যেক অর্ধ 'সা' গমের পরিবর্তে একটি করে সাওম রাখবে। আর অতিরিক্ত গম যদি অর্ধ 'সা -এর কম হয়, তাহলে ইচ্ছা করলে পূর্ণ একদিন সাওম রাখবে, অন্যথা সদকা করে দেবে।

উল্লেখ্য যে, কুরবানী করতে হলে হেরেমেই করতে হবে, আর সাওম ও সদকা হেরেমেও করতে পারে আবার হেরেমের বাইরে ও করতে পারে। অর্থাৎ হাদী জবাই হেরেমের ভিতর আবশ্যক; কিন্তু সদকা ও সাওম হেরেমে আবশ্যক নয়।

وَمَنْ جَرَحَ صَيْدًا اَوْ نَتَفَ شَعْرَهٗ اَوْ قَطَعَ عُضْوًا مِّنْهُ ضَمِنَ مَانَقَصَ مِنْ قِيْمَتِهٖ وَاِنْ نَتَفَ رِيْشَ طَائِرٍ اَوْ قَطَعَ قَوَائِمَ صَيْدٍ فَخَرَجَ بِهٖ مِنْ حَيِّزِ الْاِمْتِنَاعِ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهٗ كَامِلَةً وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ صَيْدٍ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهٗ فَاِنْ خَرَجَ مِنَ الْبَيْضَةِ فَرْخٌ مَيِّتٌ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهٗ حَيًّا وَلَيْسَ فِىْ قَتْلِ الْغُرَابِ وَالْحِدَاةِ وَالذِّئْبِ وَالْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْفَارَةِ وَالْكَلْبِ الْعَقُوْرِ جَزَاءٌ وَلَيْسَ فِىْ قَتْلِ الْبَعُوْضِ وَالْبَرَاغِيْثِ وَالْقُرَادِ شَيْئٌ وَمَنْ قَتَلَ قَمْلَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَمَنْ قَتَلَ جَرَادَةً تَصَدَّقَ بِمَا شَاءَ وَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ وَمَنْ قَتَلَ مَا لَايُؤْكَلُ لَحْمُهٗ مِنَ السِّبَاعِ وَنَحْوِهَا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا يَتَجَاوَزُ بِقِيْمَتِهَا شَاةً وَاِنْ صَالَ السَّبُعُ عَلٰى مُحْرِمٍ فَقَتَلَهٗ فَلَا شَيْئَ عَلَيْهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর যে মুহরিম কোন শিকারকে আঘাত করে অথবা তার পশম উপড়িয়ে ফেলে অথবা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে, তাহলে সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে যে পরিমাণ তার মূল্য কমে গেছে। আর যদি কোন পাখির পালক উপড়িয়ে ফেলে অথবা কোন শিকারের পা কেটে ফেলে যার ফলে সে নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতার বাইরে চলে যায়, তাহলে উহার পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। আর যে ব্যক্তি কোন শিকারের ডিম ভেঙ্গে ফেলে তার ওপর উহার মূল্য ওয়াজিব হবে। যদি ডিম হতে মৃত বাচ্চা বের হয়ে পড়ে, তাহলে উহার জীবিতের মূল্য দিতে হবে। আর কাক, চিল, চিতাবাঘ, সাপ, বিচ্ছু, ইঁদুর এবং পাগলা কুকুর হত্যা করলে কোন ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে না। আর মশা, বিচ্ছু ও আঠালি (চিচড়ী) হত্যা করলে কিছুই ওয়াজিব হবে না। কোন ব্যক্তি উকুন মারলে যা ইচ্ছা সদকা করে দেবে। আর কোন ব্যক্তি টিড্ডি ফড়িং মারলে যতটুকু ইচ্ছা সদকা করে দেবে। আর একটি খোরমা টিড্ডি (ফড়িং) হতে উত্তম। আর যে মুহরিম এমন হিংস্র প্রাণী এবং অনুরূপ প্রাণী হত্যা করে যার গোশত খাওয়া জায়েয নেই, তাহলে তার ওপর উহার প্রতিদান ওয়াজিব হবে, তবে উহার মূল্য একটি বকরির অধিক হতে পারবে না। যদি কোন হিংস্র প্রাণী কোন মুহরিমের ওপর হামলা করার ফলে সে উহাকে হত্যা করে ফেলে, তাহলে তার ওপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ডিম ভাঙলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ كَسَرَ بَيْضَ الخ ঃ শিকারের ডিম ভেঙ্গে ফেলুক বা (ভাজি অথবা রান্না করে) খেয়ে ফেলুক উহার মূল্য সদকা করে দেবে। আর ডিম ভাঙার ফলে যদি তার মৃত বাচ্চা বেরিয়ে পড়ে, তাহলে উহার জীবিতের মূল্য দেয়া আবশ্যক হবে।

মশা, উকুন, ফড়িং ইত্যাদি মারলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَيْسَ فِي قَتْلِ الْبَعُوضِ الخ ঃ কোন মুহরিম যদি মশা, বিচ্ছু ও আঠালি ইত্যাদি মেরে ফেলে, তবে তার ওপর কিছুই আবশ্যক হবে না।

আর উকুন ও টিড্ডি (ফড়িং) হত্যা করলে যা ইচ্ছা সদকা করলে চলবে, যেমন– এক মুষ্ঠি খাবার, একটি খেজুর ইত্যাদি। তবে উকুন যদি শরীর বা মাথা হতে ধরে হত্যা করে, তাহলে কেবল সদকা দিতে হবে। অন্যথা যদি মাটিতে পড়ে যায় আর সেখান হতে ধরে মেরে ফেলে, তাহলে তাতে কিছুই আবশ্যক হবে না।

تَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ -এর ব্যাখ্যা ঃ

قَوْلُهُ تَمْرَةٌ خَيْرٌ الخ ঃ একটি টিড্ডি (ফড়িং) হতে একটি খোরমা উত্তম। এটি মূলত হযরত ফারূকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর বাণী। ইমাম মালিক (রহঃ) তার 'মুয়াত্তা' নামক হাদীস গ্রন্থে অনুরূপ উল্লেখ করেছেন। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, ফড়িং মেরে ফেললে অতি সামান্য পরিমাণ সদকা দিলেই চলবে। কেননা একটি খোরমা একটি ফড়িং হতে উত্তম। তবে তিন বা ততোধিক উকুন বা ফড়িং মেরে ফেললে অর্ধ 'সা' ওয়াজিব হবে।

হিংস্র প্রাণী হত্যা করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ قَتَلَ مَالَا يُوْكَلُ لَحْمُهُ الخ ঃ যেসব হিংস্র প্রাণীর গোশত খাওয়া শরীয়তে নিষিদ্ধ, যেমন– বাঘ, ভল্লুক ইত্যাদি এগুলো হত্যা করলে মুহরিমের ওপর উহার প্রতিদান দেয়া ওয়াজিব, তবে উক্ত মূল্য একটি বকরির মূল্য হতে অতিরিক্ত হতে পারবে না, তবে কম হলে সে পরিমাণই সদকা করবে।

ইমাম যুফার (রহঃ)-এর মতে, যদি একটি বকরির মূল্য হতে অধিক হয়, তাহলে সম্পূর্ণ মূল্য ওয়াজিব হবে। জমহুর হানাফীদের নিকট হিংস্র প্রাণীর মূল্য কখনো হালাল প্রাণীর মূল্যের অধিক হতে পারে না।

উল্লেখ্য যে, যদি হিংস্র প্রাণী মুহরিম ব্যক্তির ওপর আক্রমণ করে আর সে প্রতিহত করতে গিয়ে কতল করে ফেলে, তখন তার ওপর কিছুই ওয়াজিব হবে না।

وَاِنِ اضْطَرَّ الْمُحْرِمُ اِلَى اَكْلِ لَحْمِ الصَّيْدِ فَقَتَلَهُ فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَذْبَحَ الْمُحْرِمُ الشَّاةَ وَالْبَقَرَةَ وَالْبَعِيْرَ وَالدَّجَاجَ وَالْبَطَّ الْكَسْكَرِيَّ وَاِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا اَوْ ظَبْيًا مُسْتَأْنِسًا فَعَلَيْهِ الْجَزَاءُ وَاِنْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا فَذَبِيْحَتُهُ مَيْتَةٌ لَا يَحِلُّ اَكْلُهَا وَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَأْكُلَ الْمُحْرِمُ لَحْمَ صَيْدٍ اِصْطَادَهُ حَلَالٌ وَ ذَبَحَهُ اِذَا لَمْ يَدُلَّهُ الْمُحْرِمُ عَلَيْهِ وَلَا اَمَرَهُ بِصَيْدِهِ وَفِى صَيْدِ الْحَرَمِ اِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ الْجَزَاءُ وَاِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ اَوْ شَجَرَةَ الَّذِى لَيْسَ بِمَمْلُوْكٍ وَلَا هُوَ مِمَّا يُنْبِتُهُ النَّاسُ فَعَلَيْهِ قِيْمَتُهُ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلَهُ الْقَارِنُ مِمَّا ذَكَرْنَا اَنَّ فِيْهِ عَلَى الْمُفْرِدِ دَمًا فَعَلَيْهِ دَمَانِ دَمٌ لِحَجَّتِهِ وَدَمٌ لِعُمْرَتِهِ اِلَّا اَنْ يَتَجَاوَزَ الْمِيْقَاتَ مِنْ غَيْرِ اِحْرَامٍ ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ فَيَلْزَمُهُ دَمٌ وَاحِدٌ وَاِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ فِى قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْجَزَاءُ كَامِلًا وَاِذَا اِشْتَرَكَ حَلَالَانِ فِى قَتْلِ صَيْدِ الْحَرَمِ فَعَلَيْهِمَا جَزَاءٌ وَاحِدٌ وَاِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا اَوْ اِبْتَاعَهُ فَالْبَيْعُ بَاطِلٌ -

সরল অনুবাদ ঃ যদি কোন মুহরিম ব্যক্তি শিকারের গোশত খেতে বাধ্য হয়ে শিকারকে হত্যা করে, তখন তার ওপর প্রতিদান ওয়াজিব হবে। আর মুহরিম ব্যক্তির ছাগল, গরু, উট, মুরগি ও কসকরী হাঁস জবাই করতে কোন দোষ নেই। তবে যদি পা পালকে আবৃত কবুতর (পামুজ কবুতর) অথবা গৃহপালিত হরিণ হত্যা করে, তাহলে তার ওপর প্রতিদান ওয়াজিব হবে। আর মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকারকে জবাই করলে তার জবাইকৃত পশু মৃত বলে গণ্য হবে; উহা ভক্ষণ করা হালাল হবে না। আর হালাল ব্যক্তি যে পশু শিকার করেছে এবং জবাই করেছে তার গোশত মুহরিম ব্যক্তির খেতে কোন ক্ষতি নেই, যদি মুহরিম উহা দেখিয়ে না দেয় এবং তা শিকার করার জন্য নির্দেশও না দেয়। আর হেরেম শরীফের কোন শিকার হালাল ব্যক্তি জবাই করলে উহার প্রতিদান দিতে হবে। যদি হেরেম শরীফের ঘাস কাটে এবং মালিকানাধীন নয় এমন বৃক্ষ কাটে, আর উহা এমনও নয় যে যা মানুষ উৎপন্ন করে, তাহলে উহার মূল্য ওয়াজিব হবে। উল্লিখিত কার্যাবলী হতে যা আমি উল্লেখ করেছি তার মধ্য হতে যা করলে ইফরাদ হজ্জ পালনকারীর ওপর একটি দম ওয়াজিব হয় তা কিরান আদায়কারী করলে দু'টি দম ওয়াজিব হবে, একটি তার হজ্জের জন্য আর অপরটি তার ওমরার জন্য। কিন্তু যদি সে ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে এবং তারপর ওমরা ও হজ্জের (তথা কিরানের) ইহরাম বাঁধে, তখন তার ওপর একটি দম ওয়াজিব হবে। আর হেরেম শরীফের কোন শিকার হত্যার ব্যাপারে দু'জন মুহরিম যৌথভাবে অংশীদার হলে, (তথা দু'জন মিলে হত্যা করলে) প্রত্যেকের ওপর পূর্ণ একটি করে প্রতিদান দেয়া ওয়াজিব হবে। কিন্তু দু'জন হালাল ব্যক্তি হেরেম শরীফের শিকার হত্যার কাজে অংশীদার হলে উভয়ের ওপর কেবল একটি প্রতিদান ওয়াজিব হবে। যদি মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকারকে বিক্রয় অথবা ক্রয় করে, তাহলে তার ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

পামুজ কবুতর ও পালিত হরিণ হত্যার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ قَتَلَ حَمَامًا مُسَرْوَلًا الخ ঃ পামুজ কবুতর বলতে ঐ জাতীয় কবুতরকে বলে, যার পদদ্বয় পালক দ্বারা আবৃত। এগুলো সাধারণত মানুষের পোষ মানে না। আর হরিণ যা বন্য প্রাণী। এ কবুতর ও হারিণ গৃহপালিত হওয়া একটি ব্যতিক্রম ব্যাপার। তাই মুহরিম ব্যক্তি এগুলো হত্যা করলে প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে গৃহপালিত প্রাণীর হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হবে না।

ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, পামুজ কবুতর পরিচিত ও গৃহপালিত হবার কারণে বন্য প্রাণী হিসেবে গণ্য হবে না, তাই তা হত্যা করলে প্রতিদান দিতে হবে না।

মুহরিমের জবাইকৃত শিকারের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَإِنْ ذَبَحَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا الخ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার জবাই করলে তা হারাম হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা তার জন্য শিকার ধরা, তার দিকে পথ দেখানো কোনটাই জায়েয নেই, তাই তার জবাইকৃত শিকার মুহরিম গায়রে মুহরিম সবার জন্য হারাম হিসেবে সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, গায়রে মুহরিমের জন্য তা হারাম হবে না।

মুহরিম ব্যক্তির জন্য গায়রে মুহরিমের শিকার করা পশু ভক্ষণ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلَا بَأْسَ بِأَنْ يَأْكُلَ الخ ঃ হালাল ব্যক্তি তথা গায়রে মুহরিম যদি কোন শিকার ধরে জবাই করে তা মুহরিম ব্যক্তির খাওয়া জায়েয হবে; যদি সে শিকার ধরবার জন্য নির্দেশ না দেয় এবং শিকারের দিকে শিকারীকে পথ না দেখায় বা কোনরূপ সাহায্য-সহযোগিতা না করে। এটা হানাফীদের অভিমত।

ইমাম শাফিয়ী ও মালিক (রহঃ)-এর মতে, গায়রে মুহরিম যদি মুহরিমের উদ্দেশ্যে শিকার করে, তাহলে মুহরিমের জন্য উহার গোশত খাওয়া জায়েয হবে না, অন্যথা জায়েয হবে। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন— اَلصَّيْدُ حَلَالٌ لَكُمْ مَالَمْ تَصِيْدُوْا اَوْ يُصَادُ لَكُمْ অর্থাৎ তোমরা যদি শিকার না কর বা তোমাদের উদ্দেশ্য শিকার করা না হয়, তবে উক্ত শিকারের গোশত খাওয়া তোমাদের জন্য হালাল। (আবূ দাউদ)

হানাফীরা তার জবাবে হযরত আবূ কাতাদাহ (রাঃ)-এর হাদীস পেশ করেন যে, আবূ কাতাদাহ (রাঃ) গায়রে মুহরিম অবস্থায় তার মুহরিম সাথীগণের জন্য বন্য পশু শিকার করেছেন, আর রাসূল (সাঃ) উহা মুহরিমদেরকে খাওয়ার অনুমতি দান করেছেন।

আবূ দাউদের হাদীসটিতে يُصَادُ لَكُمْ -এর অর্থ হল, মুহরিমকে অবগত করানো বা তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যদি শিকার করা হয় তা হারাম।

হালাল ব্যক্তি হেরেম শরীফের শিকার হত্যা করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ اِذَا ذَبَحَهُ الْحَلَالُ الْجَزَاءُ ঃ হেরেম শরীফের শিকার যদি কোন হালাল ব্যক্তি জবাই করে, তাহলে উহার প্রতিদান দিতে হবে। কেননা হেরেমের সম্মানার্থে কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা উহার অভ্যন্তরে শিকার করা হারাম করে দিয়েছেন। হেরেমের শিকারকে তাড়ানোও নিষিদ্ধ। এমনকি হানাফীদের নিকট কোন খুনী বা কোন অপরাধী হেরেমে আশ্রয় নিলে তাকে পাকড়াও করা যাবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, এমন কৌশল অবলম্বন করবে যাতে সে বের হয়ে আসতে বাধ্য হয়। ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) সহ অন্যান্যদের মতে, তাকে সেখানে পাকড়াও করা যাবে।

এখানে বিশেষভাবে গায়রে মুহরিমের কথা বলার কারণ হল যে, মুহরিমের জন্য তো হেরেমের বাহির ও ভিতর কোথাও শিকার করা জায়েয নেই, পক্ষান্তরে গায়রে মুহরিমের জন্য হেরেমের বাহিরে শিকার করা জায়েয হলেও হেরমের ভিতরে কখনো জায়েয হবে না।

হেরেম শরীফের ঘাস বা গাছ কাটলে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ قَطَعَ حَشِيْشَ الْحَرَمِ الخ ঃ হেরেমের বৃক্ষ ও ঘাস সর্বাবস্থায় উপড়ানো ও কাটা নিষিদ্ধ, এ জন্য এগুলোর মূল্য পরিশোধ করতে হবে। তবে শুকনো ও ইযখার ঘাস (যা মানুষ চাষ করে) উপড়ালে বিনিময় দিতে হবে না। আর বৃক্ষের বিশদ বিবরণ হিসেবে বলা যায় যে হেরেমের বৃক্ষ চার ভাগে বিভক্ত ঃ

১. যা কেউ উৎপাদন করেছে বা সাধারণত উৎপন্ন করে থাকে।

২. উৎপাদন করা হয় এমন নয়, তবে কেউ উহা উৎপাদন করেছে।

৩. যা সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে থাকে, তবে উহা এমনিতেই উৎপাদিত হয়েছে।

এ তিন শ্রেণীর বৃক্ষ উপড়িয়ে ফেললে বা কর্তন করলে কোন কিছু ওয়াজিব হবে না।

৪. এমন বৃক্ষ যা সাধারণত মানুষ উৎপাদন করে না, তা আপনা আপনি গজিয়েছে এরূপ বৃক্ষ কর্তন করলে প্রতিদান ওয়াজিব হবে। এরূপ বৃক্ষ বা ঘাস কারো মালিকানাধীন থাকলে কর্তনকারীর ওপর দু'টি মূল্য ওয়াজিব হবে। একটি মূল্য মালিককে দিতে হবে, আর অপর মূল্য সদকা করে দিতে হবে।

কিরান পালনকারীর ওপর দম দ্বিগুণ হবার বর্ণনা ঃ

قَوْلُهُ فَعَلَيْهِ دَمَانِ الخ ঃ মুফরিদ হজ্জকারীর ওপর যে অপরাধ করলে একটি দম ওয়াজিব হবে, অনুরূপ অপরাধ করলে কিরান হজ্জ পালনকারীর ওপর দু'টি দম ওয়াজিব হবে। কেননা সে ব্যক্তি একই সফরে এবং একই ইহরামে হজ্জ ও ওমরা (একসাথে) পালন করছে। কাজেই তার ওমরার জন্য একটি দম এবং হজ্জের জন্য আরেকটি দম ওয়াজিব হবে।

দুই মুহরিম ও দুই হালাল ব্যক্তি যৌথভাবে হেরেমের পশু কতল করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ إِذَا اشْتَرَكَ مُحْرِمَانِ الخ ঃ যদি দু'জন মুহরিম ব্যক্তি হেরেম শরীফের একটি শিকার হত্যা করে, তাহলে দু'জনের দু'টি দম দেয়া ওয়াজিব হবে। আর দু'জন হালাল ব্যক্তি হেরেম শরীফের শিকার হত্যা করলে একটি দম ওয়াজিব হবে।

মুহরিম হত্যা করলে দু'টি দিতে হবে- ব্যক্তি হিসেবে শিকার হিসেবে নয়। গায়রে মুহরিম হত্যা করলে একটি দিতে হবে- পশু হিসেবে ব্যক্তি হিসেবে নয়।

মুহরিমের শিকার ক্রয়-বিক্রয়ের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ إِذَا بَاعَ الْمُحْرِمُ صَيْدًا الخ ঃ মুহরিম ব্যক্তি কোন শিকার ক্রয়-বিক্রয় করলে তা বিশুদ্ধ হবে না, চাই তা কোন মুহরিমের সাথে করুক বা গায়রে মুহরিমের সাথে করুক। এমনিভাবে হালাল অবস্থায় শিকার করে হারাম অবস্থায় বিক্রয় করলেও জায়েয হবে না। আর হারাম অবস্থায় শিকার করে হালাল অবস্থায় বিক্রয় করলেও বিশুদ্ধ হবে না।

টীকা ঃ

ضَبُعٌ ঃ কিফতার। এটা এক প্রকার বন্য জন্তু, একে হিগারও বলা হয়।

عَنَاقٌ ঃ ছয় মাস বয়সের ছাগলের বাচ্চাকে বলে।

يَرْبُوعٌ ঃ বন্য ইঁদুর।

جَفْرَةٌ ঃ চার মাসের ছাগলের বাচ্চা।

اَلْعَقْرَبُ ঃ বিচ্ছু।

اَلْكَلْبُ الْعَقُوْرُ ঃ পাগলা কুকুর।

اَلْبَرَاغِيْثُ ঃ বিচ্ছু।

اَلْقِرَادُ ঃ আঁঠালি।

قَمْلَةٌ ঃ উকুন।

جَرَادَةٌ ঃ টিডিড বা পঙ্গপাল (ফড়িং)।

اَلْبَطُّ الْكَسْكَرِيُّ ঃ কসকরী হাঁস। কসকর বাগদাদের অন্তর্গত একটি শহরেরর নাম, সেখানে এ হাঁস বেশি পাওয়া যায় বলে কসকরী হাঁস বলা হয়। এটা আকারে খুব বড়, উড়তে পারে কম, এটা সহসা পোষ মানে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْجِنَايَاتُ কাকে বলে?
২। مُحْرِمٌ-এর ওপর কোন্ কোন্ অবস্থায় দম ওয়াজিব হবে।
৩। حَجٌّ কখন কাযা করা ওয়াজিব হয়।
৪। مُحْرِمٌ-এর ওপর কোন্ কোন্ অবস্থায় সদকা ওয়াজিব হয়।
৫। مُحْرِمٌ যদি শিকার করে বা অন্যকে শিকার দেখিয়ে দেয় তবে তার বিধান কি?
৬। দুই মুহরিম ব্যক্তি একটি শিকার হত্যা করলে কি হুকুম এবং দুই হালাল ব্যক্তি হত্যা করলে কি হুকুম? বর্ণনা কর।
৭। ইহরাম অবস্থায় শরীরে সুগন্ধি মাখলে তার হুকুম কি?
৮। আরাফায় অবস্থানের পূর্বে সহবাস করলে কি হুকুম?
৯। বিনা ওযূতে এবং জানাবত অবস্থায় তওয়াফ করলে তার বিধান কি?
১০। তাওয়াফে সদর ও সায়ী পরিত্যাগ করলে কি হুকুম?
১১। হেরেম শরীফের ঘাস ও গাছ কর্তন করলে তার হুকুম কি?

بَابُ الْاِحْصَارِ

اِذَا اُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ اَوْ اَصَابَهُ مَرَضٌ يَمْنَعُهُ مِنَ الْمُضِيِّ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ وَقِيلَ لَهُ اِبْعَثْ شَاةً تُذْبَحُ فِي الْحَرَمِ وَ وَاعِدْ مَنْ يَحْمِلُهَا يَوْمًا بِعَيْنِهِ يَذْبَحُهَا فِيهِ ثُمَّ تَحَلَّلْ فَاِنْ كَانَ قَارِنًا بَعَثَ دَمَيْنِ وَلَايَجُوْزُ ذَبْحُ دَمِ الْاِحْصَارِ اِلَّا فِي الْحَرَمِ وَيَجُوْزُ ذَبْحُهُ قَبْلَ يَوْمِ النَّحْرِ عِنْدَ اَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ الذَّبْحُ لِلْمُحْصَرِ بِالْحَجِّ اِلَّا فِي يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوْزُ لِلْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ اَنْ يَذْبَحَ مَتٰى شَاءَ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ اِذَا تَحَلَّلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ وَعُمْرَةٌ وَعَلَى الْمُحْصَرِ بِالْعُمْرَةِ الْقَضَاءُ وَعَلَى الْقَارِنِ حَجَّةٌ وَعُمْرَتَانِ وَاِذَا بَعَثَ الْمُحْصَرُ هَدْيًا وَ وَاعَدَهُمْ اَنْ يَذْبَحُوْهُ فِي يَوْمٍ بِعَيْنِهِ ثُمَّ زَالَ الْاِحْصَارُ فَاِنْ قَدَرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْهَدْيِ وَالْحَجِّ لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّحَلُّلُ وَلَزِمَهُ الْمُضِيُّ وَاِنْ قَدَرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْهَدْيِ دُوْنَ الْحَجِّ تَحَلَّلَ وَاِنْ قَدَرَ عَلٰى اِدْرَاكِ الْحَجِّ دُوْنَ الْهَدْيِ جَازَ لَهُ التَّحَلُّلُ اِسْتِحْسَانًا وَمَنْ اُحْصِرَ بِمَكَّةَ وَهُوَ مَمْنُوْعٌ عَنِ الْوُقُوْفِ وَالطَّوَافِ كَانَ مُحْصَرًا وَاِنْ قَدَرَ عَلٰى اِدْرَاكِ اَحَدِهِمَا فَلَيْسَ بِمُحْصَرٍ ـ

অবরুদ্ধ করার অধ্যায়

সরল অনুবাদ : মুহরিম যখন বাধাগ্রস্ত হবে এমন শত্রু দ্বারা অথবা এমন রোগ আক্রমণ করে, যা তাকে (মক্কা) গমনে বাঁধা দান করে, তখন তার জন্য (ইহরাম ভঙ্গ করে) হালাল হয়ে যাওয়া বৈধ। আর তাকে বলা হবে যে, তুমি একটি বকরি পাঠাও যা হেরেম শরীফে জবাই করা হবে। আর তুমি এমন ব্যক্তি হতে ওয়াদা গ্রহণ কর যে উহা বহন করে নিয়ে হেরেম শরীফে নির্দিষ্ট দিনে জবাই করে দেবে। এরপর হালাল হয়ে যাবে। আর যদি সে কিরান হজ্জ পালনকারী হয়, তাহলে দু'টি দম প্রেরণ করবে। বাধাপ্রাপ্ত হবার কারণে যে প্রাণী জবাই করতে হয়, তা হেরেম শরীফ ছাড়া অন্য কোথাও জবাই করা জায়েয হবে না। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, কুরবানীর দিনের পূর্বে এ পশু জবাই করা জায়েয। আর সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, হজ্জের বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির কুরবানীর (১০ তারিখ) দিন ব্যতীত জবাই করা জায়েয নেই। আর ওমরার বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন ইচ্ছা জবাই করতে পারবে। আর হজ্জ পালনে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি যখন হালাল হয়ে যাবে, তখন (পরবর্তী বৎসর) একটি হজ্জ ও একটি ওমরা পালন করা তার ওপর ওয়াজিব হবে। ওমরা পালনে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি শুধু উহা কাযা করা আবশ্যক হবে। আর কিরান হজ্জে বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির ওপর একটি হজ্জ ও দু'টি ওমরা ওয়াজিব হবে। আর যদি অবরুদ্ধ ব্যক্তি হাদী পাঠিয়ে দেয় এবং তাদের থেকে এ ওয়াদা নেয় যে, তারা একটি নির্দিষ্ট দিনে উহা জবাই দেবে, এরপর তার অবরোধ দূরীভূত হয়ে যায় এমতাবস্থায় যদি সে হাদী ও হজ্জ উভয়টা পাবার ক্ষমতা রাখে, তাহলে তার জন্য হালাল হওয়া জায়েয হবে না; বরং (হজ্জের দিকে) রওয়ানা হওয়া আবশ্যক হবে। আর যদি হাদী পাবার ক্ষমতা রাখে, কিন্তু হজ্জ পাবার ক্ষমতা রাখে না, তাহলে হালাল হয়ে যাবে। আর যদি হজ্জ পেতে সক্ষম হয়, কিন্তু হাদী পেতে সক্ষম হয় না, তাহলে (দলিলে) ইস্তিহসানের ভিত্তিতে হালাল হওয়া জায়েয হবে। আর যে ব্যক্তি মক্কায় অবরুদ্ধ হয়ে আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, সে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তি এ দু'য়ের যে কোন একটি করতে সক্ষম হয়, সে বাধাপ্রাপ্ত বলে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِحْصَار-এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ بَابُ الْإِحْصَارِ الخ ঃ إِحْصَار শব্দটি বাবে إِفْعَال-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ– বাধাদান করা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল, মুহরিম ব্যক্তিকে আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারত করতে বাধা প্রদান করাকে إِحْصَار বলা হয়। তাই যে ব্যক্তি এ দুইয়ের যে কোন একটি করতে সক্ষম হবে, তাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহসার বলা যাবে না।

কি কি কারণে মুহরিম অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে ঃ

قَوْلُهُ إِذَا أُحْصِرَ الْمُحْرِمُ بِعَدُوٍّ الخ ঃ ইমাম শাফিয়ী (রহঃ)-এর মতে, إِحْصَار বা বাধাপ্রাপ্ত হবার হুকুম শুধু কাফিরগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ হওয়ার সাথে নির্দিষ্ট। কেননা মহানবী (সাঃ) তাঁর সাথীবর্গসহ ষষ্ঠ হিজরী ওমরার ইহরাম বেঁধে কাফিরদের দ্বারা হুদাইবিয়া নামক স্থানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন এবং সেখান হতে মদীনায় ফিরে আসেন।

হানাফীদের নিকট إِحْصَار কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবার সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং এর অর্থ ব্যাপক, চাই মুসলিম শত্রু কিংবা অমুসলিম শত্রুর কারণে হোক অথবা রোগের কারণে হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ অথবা আর্থিক সংকটের কারণে হোক, সর্বাবস্থায় অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেনন সুনানের কিতাবসমূহে বর্ণিত আছে যে, যার শরীরের কোন অঙ্গ বিনষ্ট হয়ে গেছে সে যেন হালাল হয়ে যায় এবং পরে উহার কাযা করবে। আর আল্লাহর বাণী—

فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ الخ

আয়াতটি কাফিরদের দ্বারা অবরুদ্ধ হবার বিশেষ প্রেক্ষাপটে অবতীর্ণ হলেও এর হুকুম ব্যাপক।

অবরুদ্ধ ব্যক্তির করণীয় কাজ ঃ

قَوْلُهُ وَقِيلَ لَهُ ابْعَثْ شَاةً الخ ঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তি যদি ইফরাদ হজ্জ পালনকারী হয়, তাহলে যে স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছে সে স্থান হতে একটি দম মক্কায় পাঠিয়ে দেবে এবং যার মাধ্যমে পাঠাবে তার থেকে নির্দিষ্ট দিনে জবাই করার ওয়াদা নিয়ে নেবে। ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, উক্ত দিনটি কুরবানীর পূর্ব দিনও হতে পারে। আর মুহরিম ব্যক্তি সেই নির্দিষ্ট দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে (উক্ত দিন) হালাল হয়ে যাবে। আর কিরান পালনকারী হলে দু'টি দম প্রেরণ করবে। শুধু ওমরা পালনকারী হলে একটি দম প্রেরণ করবে। হাদী প্রেরণ করার হুকুম ঐ ব্যক্তির জন্য যে হেরেম শরীফের বাইরে অবরুদ্ধ হয়েছে। আর হেরেম শরীফের অভ্যন্তরে বাধাপ্রাপ্ত হলে যে স্থানে অবরুদ্ধ হয়েছে সে স্থানে হাদীর পশু জবাই করে হালাল হয়ে যাবে।

হাদী জবাইয়ের ব্যাপারে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ وَقَالَا لَايَجُوزُ الذَّبْحُ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, হজ্জের অবরুদ্ধ মুহরিমের হাদী কুরবানীর দিনের পূর্বে জবাই করা জায়েয নেই। কেননা এ দম হজ্জের ইহরাম হতে হালাল হবার জন্য প্রচলিত। আর যে হলকের দ্বারা মুহরিম ইহরাম হতে হালাল হয়ে থাকে তা দশ তারিখের পূর্বে জায়েয নেই। কাজেই যে জবাইয়ের দ্বারা হালাল হবে তাও দশ তারিখের পূর্বে জায়েয হবে না। তবে ওমরার হাদী দশ তারিখের পূর্বে জবাই করা জায়েয।

আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, হজ্জের হাদীও কুরবানীর দিনের পূর্বে জবাই করা জায়েয আছে। কেননা আল্লাহর বাণী— فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ আয়াতটি মুতলাক, কাজেই কোন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উহাকে সীমিত করা জায়েয হবে না। এছাড়া এটা হল কাফ্ফারার দম, তাই অন্যান্য কাফ্ফারার দমের ন্যায় কোন নির্দিষ্ট তারিখের সাথে নির্দিষ্ট করা ঠিক হবে না।

অবরুদ্ধ ব্যক্তি কিভাবে কাযা করবে ঃ

قَوْلُهُ وَالْمُحْصَرُ بِالْحَجِّ إِذَا تَحَلَّلَ الخ ঃ বাধাপ্রাপ্ত ব্যক্তি অবরুদ্ধ হবার পর হাদী প্রেরণ করে নির্দিষ্ট দিন হালাল হয়ে যাবে, তারপর পরবর্তী বৎসর উহার কাযা করবে। কাজেই সে যদি ইফরাদ হজ্জকারী হয়, তাহলে একটি হজ্জ ও একটি ওমরা পালন করবে। আর যদি কিরান হজ্জ পালনকারী হয়, তাহলে আগামী বৎসর একটি হজ্জ ও দু'টি ওমরা কাযা করা ওয়াজিব। আর শুধু ওমরা পালনকারী হলে ওমরা কাযা করবে।

হাদী প্রেরণের পর প্রতিবন্ধক দূর হয়ে গেলে মুহরিম কি করবে ঃ

قَوْلُهُ ثُمَّ زَالَ الْإِحْصَارُ الخ ঃ অবরুদ্ধ ব্যক্তি হাদী প্রেরণ করার পর যদি বাধা অপসারিত হয়ে যায়, তাহলে এ মুহরিমের চার অবস্থার যে কোন এক অবস্থা হতে পারে— (১) সে রওয়ানা দিলে হজ্জ ও হাদী উভয়টি পাবার ক্ষমতা রাখে, (২) দু'টির কোনটিই পাবার ক্ষমতা রাখে না, (৩) শুধু হজ্জ পাবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু হাদী পাবে না এবং (৪) শুধু হাদী পাবার ক্ষমতা রাখে; কিন্তু হজ্জ পাবে না।

প্রথম অবস্থায় ইহরাম ভঙ্গ করা জায়েয হবে না; বরং হজ্জের জন্য মক্কার দিকে রওয়ানা দেয়া ওয়াজিব। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অবস্থায় ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাবে। কেননা তখন তার মক্কাভিমুখে রওয়ানা দেয়া নিষ্ফল। আর চতুর্থ অবস্থায় ইস্তিহসানের ভিত্তিতে ইহরাম ভঙ্গ করে হালাল হয়ে যাওয়া জায়েয। কেননা সাহেবাইনের মতে, যেহেতু কুরবানীর দিনের পূর্বে হাদী জবাই করা জায়েয নেই, সেহেতু সে যখন হজ্জ পাবে তখন হাদীও পাবে। আর ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, কুরবানীর দিনের পূর্বে হাদী জবাই করা জায়েয। তাই মুহাস্রিমের পক্ষে হাদী না পেয়ে হজ্জ পাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

মক্কায় আবরুদ্ধ হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ أُحْصِرَ بِمَكَّةَ الخ ঃ কোন মুহরিম যদি মক্কায় আবরুদ্ধ হয়ে আরাফায় অবস্থান ও তাওয়াফে যিয়ারত করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তাহলে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে। কেননা ইহরামের পর হজ্জের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে আরাফায় অবস্থান করা ও তাওয়াফে যিয়ারত। আর যদি উপরোক্ত দু'টি রুকনের যে কোন একটি হতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তবে সে শরীয়তের দৃষ্টিতে অবরুদ্ধ বলে গণ্য হবে না। কেননা, সে হারালে তাওয়াফে যিয়ারতই হারাবে, আর তা হবে আরাফার পর, আর আরাফায় অবস্থানের ফলে হজ্জ মূলত পূর্ণ হয়ে যায়। যেহেতু আরাফায় অবস্থান ছাড়া আর সব রুকনের ত্রুটি দম দ্বারা প্রতিকার করা যায়, এ জন্য মহানবী (সাঃ) বলেছেন— مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ الْحَجُّ অর্থাৎ যে আরাফায় অবস্থান করেছে তার হজ্জ পরিপূর্ণ হয়ে গেল।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। إِحْصَار কাকে বলে? مُحْصَر -এর বিধান ইমামগণের মতভেদসহ উল্লেখ কর।
২। মুহসার ব্যক্তি পরবর্তী বৎসর কিভাবে কাযা করবে।
৩। মক্কায় আবদ্ধ হলে তার বিধান বর্ণনা কর।
৪। হাদী প্রেরণের পর অবরুদ্ধ মুহরিমের অবরোধ দূর হয়ে গেলে উহার হুকুম কি? লিখ।

بَابُ الْفَوَاتِ

وَمَنْ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ فَفَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ حَتّٰى طَلَعَ الْفَجْرُ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ فَقَدْ فَاتَهُ الْحَجُّ وَعَلَيْهِ اَنْ يَّطُوْفَ وَيَسْعٰى وَيَتَحَلَّلَ وَيَقْضِىَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَلَادَمَ عَلَيْهِ وَالْعُمْرَةُ لَاتَفُوْتُ وَهِىَ جَائِزَةٌ فِىْ جَمِيْعِ السَّنَةِ اِلَّا خَمْسَةَ اَيَّامٍ يَكْرَهُ فِعْلُهَا فِيْهَا يَوْمَ عَرَفَةَ وَيَوْمَ النَّحْرِ وَاَيَّامَ التَّشْرِيْقِ وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ وَهِىَ الْاِحْرَامُ وَالطَّوَافُ وَالسَّعْىُ -

হজ্জ না পাওয়ার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার পর আরাফায় অবস্থান হারান, এমনকি কুরবানীর দিনের সুবহে সাদিক উদিত হয়ে গেল তথা কুরবানীর দিনের সুবহে সাদিক পর্যন্ত আরাফায় অবস্থান করতে পারেনি, তাহলে তার হজ্জ ফাওত হল তথা হাত ছাড়া হয়ে গেল। তার ওপর কর্তব্য হল তওয়াফ ও সায়ী করে হালাল হয়ে যাওয়া এবং পরবর্তী বৎসর হজ্জের কাযা আদায় করা। আর তার ওপর কোন দম আবশ্যক হবে না। আর ওমরা (কখনো) ফাওত হয় না। উহা পাঁচ দিন ব্যতীত সারা বৎসরই জায়েয। এ পাঁচ দিনে ওমরা পালন করা মাকরূহ। সে পাঁচ দিন হল, আরাফার দিন, (যিলহজ্জের নয় তারিখ) কুরবানীর দিন (দশ তারিখ) এবং তাকবীরে তাশরীক বলার দিনসমূহ। (তথা এগারো, বারো ও তের তারিখ পর্যন্ত।) ওমরা হল সুন্নত। আর ওমরা হল ইহরাম, তওয়াফ ও সায়ী করা।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

আরাফায় অবস্থান করতে না পারলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ فَفَاتَهُ الْوُقُوْفُ بِعَرَفَةَ الخ ঃ হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর যদি কেউ আরাফায় অবস্থান করতে না পারে তথা ১০ তারিখের সুবহে সাদিক পর্যন্ত অল্প সময়ের জন্যও যদি আরাফায় অবস্থান করতে না পারে, তাহলে তার হজ্জ বাতিল বলে গণ্য হবে; তখন সে তাওয়াফ ও সায়ী করে হালাল হয়ে যাবে এবং আগামী বৎসর এই হজ্জের কাযা আদায় করে নেবে। তবে এ জন্য তাকে কোন দম দিতে হবে না। এ প্রসঙ্গে রাসূল (সাঃ) বলেন—

مَنْ فَاتَهُ عَرَفَةُ بِلَيْلٍ فَقَدْ فَاتَ الْحَجُّ فَلْيَتَحَلَّلْ بِعُمْرَةٍ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ بِقَابِلٍ

অর্থাৎ যার আরাফায় অবস্থান ফাওত হবে তার হজ্জও ফাওত হয়ে গেছে। কাজেই সে যেন উহাকে ওমরায় পরিবর্তন করে এবং পরবর্তী বৎসর সে হজ্জ কাযা করে নেয়।

ইমাম মালিক (রহঃ) বলেন যে, আগামী বৎসর হজ্জ করা পর্যন্ত মুহরিম থাকতে হবে। আর ইমাম শাফিয়ী (রহঃ) বলেন তার ওপর দম আবশ্যক হবে।

ওমরা কখনো ফাওত হয় না ঃ

قَوْلُهُ وَالْعُمْرَةُ لَاتَفُوْتُ الخ ঃ ওমরা বছরের যে-কোন সময় করা যায়। যিলহজ্জের ৫দিন ব্যতীত বছরের যে কোন সময় তা জায়েয। এজন্য ওমরার কোন কাজ ফাওত হলে তা পুনঃ করা যায় বিধায় ওমরা ফাওত হয় না।

বছরের পাঁচ দিন ওমরা করা মাকরূহ ঃ

قَوْلُهُ وَيُكْرَهُ فِعْلُهَا فِيْهَا الخ ঃ ওমরা কখনো কাযা হয় না। কেননা বছরের পাঁচ দিন ছাড়া সব সময় ওমরা করা যায়। যে পাঁচ দিন ওমরা করা মাকরূহ তাহল (১) আরাফার দিন, (৯ই যিলহজ্জ) (২) কুরবানীর দিন (১০ তারিখ) এবং তাশরীকের তিনটি দিন তথা যিলহজ্জের ১১, ১২ ও ১৩ তারিখ। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন– তোমরা আরাফার দিন হতে আরম্ভ করে তাশরীকের শেষ দিনসহ পাঁচটি দিন ওমরা কর না; বরং ঐ দিন সমূহের পূর্বে বা পরে ওমরা করে নাও।

ওমরার হুকুম কি ঃ

قَوْلُهُ وَالْعُمْرَةُ سُنَّةٌ الخ ঃ ওমরার হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়—

ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (রহঃ)-এর মতে, ওমরা হলো সুন্নতে মুয়াক্কাদা।

ইমাম শাফিয়ী ও আহমদ (রহঃ) ওমরাকে ফরয বলেন। তাঁরা ঐ সমস্ত হাদীস দলিল হিসেবে পেশ করেন, যাতে ওমরাকে ফরয বলা হয়েছে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মালিক (রহঃ) ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত হাদীস পেশ করেন, যাতে হজ্জকে ফরয এবং ওমরাকে নফল বলা হয়েছে।

আর তাঁদের হাদীসগুলোর জবাবে বলেন যে, উক্ত হাদীসগুলো দুর্বল হবার কারণে পরিত্যাজ্য হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। হজ্জের ইহরাম বাঁধার পর আরাফায় অবস্থান ফাওত হলে উহার হুকুম কি?

২। عُمْرَة -এর পরিচয় ও উহার হুকুম বর্ণনা কর।

৩। عُمْرَة ফাওত হয় না কেন? বৎসরের কোন্ কোন্ দিন ওমরা পালন করা মাকরূহ।

بَابُ الْهَدْيِ

اَلْهَدْىُ اَدْنَاهُ شَاةٌ وَهُوَ مِنْ ثَلٰثَةِ اَنْوَاعٍ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ يَجْزِئُ فِى ذٰلِكَ كُلِّهِ الثَّنِىُّ فَصَاعِدًا اِلَّا مِنَ الضَّانِ فَاِنَّ الْجَذَعَ مِنْهُ يَجْزِئُ فِيْهِ وَلَايَجُوْزُ فِى الْهَدْيِ مَقْطُوْعُ الْاُذُنِ وَلَا اَكْثَرُهَا وَلَا مَقْطُوْعُ الذَّنَبِ وَلَا مَقْطُوْعُ الْيَدِ وَلَا الرِّجْلِ وَلَاذَاهِبَةُ الْعَيْنِ وَلَا الْعَجْفَاءُ وَلَا الْعَرْجَاءُ الَّتِىْ لَاتَمْشِىْ اِلَى الْمَنْسَكِ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ فِىْ كُلِّ شَئٍ اِلَّا فِىْ مَوْضَعَيْنِ مَنْ طَافَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ جُنُبًا وَمَنْ جَامَعَ بَعْدَ الْوُقُوْفِ بِعَرَفَةَ فَاِنَّهُ لَايَجُوْزُ فِيْهِمَا اِلَّا بُدْنَةٌ وَالْبُدْنَةُ وَالْبَقَرَةُ يَجْزِئُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا عَنْ سَبْعَةِ اَنْفُسٍ اِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنَ الشُّرَكَاءِ يُرِيْدُ الْقُرْبَةَ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُهُمْ بِنَصِيْبِهِ اللَّحْمَ لَمْ يَجْزِ لِلْبَاقِيْنَ عَنِ الْقُرْبَةِ وَيَجُوْزُ الْاَكْلُ مِنْ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَلَايَجُوْزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ اِلَّا فِىْ يَوْمِ النَّحْرِ وَيَجُوْزُ ذَبْحُ بَقِيَّةِ الْهَدَايَا فِىْ اَيِّ وَقْتٍ شَاءَ -

হাদী প্রেরণ অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ সর্বাপেক্ষা নিম্নস্তরের হাদী হল একটি বকরি। আর হাদী তিন প্রকারঃ উট, (গাভি) গরু ও ছাগল। এগুলোর প্রত্যেকটিতে ছানী বা ততোধিক বয়সের প্রাণী কুরবানী দেয়া জায়েয। তবে দুম্বা ছয় মাসের হলেও জায়েয আছে। আর এমন হাদী যার পুরো কান অথবা অধিকাংশ কাটা, লেজ এবং হাত পা কাটা, অন্ধ, দুর্বল ও এমন খোঁড়া জানোয়ার যে জবাইয়ের স্থানে হেটে যেতে পারে না, এসব প্রাণী দ্বারা কুরবানী দেয়া জায়েয নেই। দুই বিষয় ব্যতীত সকল বিষয়ে বকরি দেয়া জায়েয, প্রথমত যে ব্যক্তি জানাবত অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করেছে, দ্বিতীয়ত যে ব্যক্তি আরাফায় অবস্থানের পরে স্ত্রী সহবাস করেছে। কেননা এ দুই অবস্থায় উট ছাড়া দম দেয়া জায়েয নেই। আর উট ও গরুর প্রত্যেকটি সাত ব্যক্তির পক্ষ হতে যথেষ্ট হবে; যদি প্রত্যেকের আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়ত থাকে। সুতরাং যদি তাদের কোন এক শরিক গোশত খাওয়ার নিয়ত করে, তাহলে অবশিষ্টদের কুরবানী বিশুদ্ধ হবে না। নফল, তামাত্তু' এবং কিরানের হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয, আর অন্যান্য হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয নেই। কুরবানীর দিন ব্যতীত নফল, তামাত্তু' এবং কিরানের হাদী জবাই করা জায়েয নেই, আর অন্যান্য বা অবশিষ্ট হাদী যখন ইচ্ছা জবাই করতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাদীর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ اَلْهَدْىُ اَدْنَاهُ شَاةٌ ঃ هَدْى শব্দের আভিধানিক অর্থ হল, উপঢৌকন, উপহার। এখানে কুরবানীর জানোয়ারকে هَدْى বলা হয়েছে। কেননা তা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হয়।

আর শরীয়তের পরিভাষায় হাদী ঐ জন্তুকে বলে, যাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিমিত্ত জবাই করার উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় প্রেরণ করা হয়। আর যেসব জন্তু কুরবানীর যোগ্য তাই হাদীর যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

(ছানী) ثَنِى -এর পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ يَجْزِئُ فِى ذٰلِكَ كُلِّهِ الثَّنِىُّ الخ ঃ ছানী হল হাদী জন্তুর বয়সের পরিমাপ উট, গরু ও ছাগল। কমপক্ষে ছানী হলে কুরবানী দেয়া জায়েয, অন্যথা জায়েয হবে না। উটের বাচ্চা যখন পাঁচ বৎসর পূর্ণ হয়ে ছয় বৎসরে পড়ে, তখন তাকে ছানী বলা হয়। গরুর বাছুর যখন দুই বৎসর পূর্ণ হয়ে তৃতীয় বছরে পা রাখে এবং ছাগল যখন এক বৎসর পূর্ণ হয়ে দুই বৎসরে পদাপর্ণ করে তখন ছানী বলা হয়। কিন্তু দুম্বা ছয় মাসের হলে জায়েয আছে; তাকে তখন বলা হয় جَزَع (জাযা')।

অতএব উট পাঁচ বৎসর, গরু দুই বৎসর, এবং ছাগল এক বৎসরের কমে কুরবানী দেয়া জায়েয নেই।

কিরূপ জন্তু হাদীর যোগ্য নয় ঃ

قَوْلُهُ وَلَا يَجُوزُ فِى الْهَدْيِ الخ ঃ নিম্নলিখিত জন্তুগুলো দ্বারা হাদী প্রেরণ করা জায়েয নেই।

১. সম্পূর্ণ বা অর্ধেকের বেশি কান কাটা।

২. পরিপূর্ণ লেজ কাটা।

৩. হাত-পা কাটা।

৪. দৃষ্টিহীন বা যার দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

৫. অত্যধিক দুর্বল, যার হাড়ে মজা আছে বলে মনে হয় না।

৬. এমন ল্যাংড়া যে, জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে সক্ষম নয়।

কোন্ কোন্ স্থানে বকরি দ্বারা দম দেয়া জায়েয নেই ঃ

قَوْلُهُ وَالشَّاةُ جَائِزَةٌ الخ ঃ বকরি দ্বারা সকল স্থানে দম দেয়া জায়েয। তবে দু'টি স্থানে বকরি দ্বারা দম দেয়া জায়েয নেই।

১. প্রথমত জানাবত অবস্থায় তাওয়াফে যিয়ারত করার ফলে যে অন্যায় হয় তার ক্ষতিপূরণ বকরি দ্বারা হয় না।

২. দ্বিতীয়ত আরাফায় অবস্থানের পর সহবাস করলে যে দম ওয়াজিব হয় তা বকরি দ্বারা আদায় হয় না।

উল্লিখিত দুই প্রকার অন্যায়ের প্রতিদান উট দ্বারা দিতে হবে, বকরি দ্বারা দিলে হবে না।

অংশীদারদের মধ্যে কারো গোশত্ খাওয়ার নিয়ত থাকলে কারো কুরবানী বৈধ হবে না ঃ

قَوْلُهُ فَاِذَا اَرَادَ اَحَدُهُمْ بِنَصِيْبِهِ اللَّحْمَ الخ ঃ উট, গরু বা মহিষ সর্বোচ্চ সাত জনে মিলে হাদী বা কুরবানী দিতে পারে। তবে সকলের নিয়ত থাকতে হবে আল্লাহর নৈকট্য লাভ, কারো গোশত খাওয়ার নিয়ত থাকতে পারবে না। যদি এদের মধ্যে কোন এক অংশীদারের গোশ্‌ত খাওয়ার নিয়ত থাকে, তাহলে অবশিষ্ট কারো কুরবানী সে ব্যক্তিসহ হবে না। কেননা একই পশুর কিছু অংশ ইবাদত না হওয়া আর কিছু অংশ ইবাদত হওয়া সম্ভব নয়।

হাদীর গোশ্‌তের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَجُوزُ الْاَكْلُ الخ ঃ নফল হাদী, তামাত্তু' হজ্জের হাদী এবং কিরান হজ্জের হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয। কেননা মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী কারীম (সাঃ) নিজে হাদীর গোশত খেয়েছেন। তবে অন্যায়ের কাফ্‌ফারা হিসেবে যেসব হাদী জবাই করা হয় এবং উল্লিখিত তিন প্রকারের হাদী ব্যতীত অপরাপর হাদীর গোশত খাওয়া জায়েয নেই। সেগুলোর গোশত সদকা করে দিতে হবে।

হাদী জবাইয়ের স্থান ও সময় ঃ

قَوْلُهُ وَلَايَجُوزُ ذَبْحُ هَدْيِ التَّطَوُّعِ الخ ঃ নফল, তামাত্তু' এবং কিরান হজ্জ পালনকারীর হাদী কুরবানীর দিনসমূহে জবাই করা আবশ্যক, এর পূর্বে জবাই করা জায়েয নেই। কেননা এটা নুসুক তথা হজ্জের কুরবানী, তাই কুরবানীর অনুরূপই হবে। এ তিন শ্রেণীর হাদী ছাড়া অন্য সবগুলো যখন খুশি জবাই করা জায়েয। আর হাদীর জানোয়ারসমূহ হেরেম শরীফের মধ্যে জবাই করতে হবে এর বাইরে জবাই করলে জায়েয হবে না। তবে হাদীর গোশত বন্টন করার জন্য হেরেম শরীফের মিসকিন হওয়া আবশ্যক নয়; বরং হেরেম ও গায়েরে হেরেম নির্বিশেষে সকল মিসকিনকে দেয়া যেতে পারে।

وَلَايَجُوْزُ ذَبْحُ الْهَدَايَا اِلَّا فِى الْحَرَمِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِهَا عَلٰى مَسَاكِيْنِ الْحَرَمِ وَغَيْرِهِمْ وَلَايَجِبُ التَّعْرِيْفُ بِالْهَدَايَا وَالْاَفْضَلُ بِالْبُدْنِ النَّحْرُ وَ فِى الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الذَّبْحُ وَالْاَوْلٰى اَنْ يَّتَوَلَّى الْاِنْسَانُ ذَبْحَهَا بِنَفْسِهٖ اِذَا كَانَ يُحْسِنُ ذٰلِكَ وَيَتَصَدَّقُ بِجَلَالِهَا وَخِطَامِهَا وَلَايُعْطٰى اُجْرَةُ الْجَزَّارِ مِنْهَا وَمَنْ سَاقَ بَدَنَةً فَاضْطُرَّ اِلٰى رُكُوْبِهَا رَكِبَهَا وَاِنِ اسْتَغْنٰى عَنْ ذَالِكَ لَمْ يَرْكَبْهَا وَاِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ لَمْ يَحْلَبْهَا وَلٰكِنْ يَنْضَحُ ضَرْعَهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ حَتّٰى يَنْقَطِعَ اللَّبَنُ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطَبَ فَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهٗ وَاِنْ كَانَ عَنْ وَاجِبٍ فَعَلَيْهِ اَنْ يُّقِيْمَ غَيْرَهٗ مَقَامَهٗ وَاِنْ اَصَابَهٗ عَيْبٌ كَثِيْرٌ اَقَامَ غَيْرَهٗ مَقَامَهٗ وَصَنَعَ بِالْمَعِيْبِ مَاشَاءَ وَاِذَا عَطَبَتِ الْبَدَنَةُ فِى الطَّرِيْقِ فَاِنْ كَانَ تَطَوُّعًا نَحَرَهَا وَصَبَغَ نَعْلَهَا بِدَمِهَا وَضَرَبَ بِهَا صَفْحَتَهَا وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا هُوَ وَلَا غَيْرُهٗ مِنَ الْاَغْنِيَاءِ وَاِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً اَقَامَ غَيْرَهَا مَقَامَهَا وَصَنَعَ بِهَا مَاشَاءَ وَيُقَلِّدُ هَدْىَ التَّطَوُّعِ وَالْمُتْعَةِ وَالْقِرَانِ وَلَايُقَلِّدُ دَمَ الْاِحْصَارِ وَلَادَمَ الْجِنَايَاتِ –

সরল অনুবাদ ঃ হেরেম শরীফ ব্যতীত অন্য স্থানে হাদীর জানোয়ার জবাই করা জায়েয নেই। আর হেরেম শরীফ ও উহার বাহিরের মিসকিনদের মাঝে উহা সদকা করা জায়েয। হাদীকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব নয়। আর উটকে নহর করা তথা বক্ষ বিদীর্ণ করা এবং গরু ও বকরিকে জবাই করা উত্তম। জবাইয়ের পদ্ধতি ভালোভাবে জানলে স্বীয় জানোয়ার নিজেই জবাই করবে। উহার গদি ও রশি সদকা করে দেবে। গোশত কর্তনকারীর পারিশ্রমিক সে জন্তু হতে দেবে না। কোন ব্যক্তি উট চালিয়ে নিতে আরোহণে বাধ্য হলে সওয়ার হবে। আর প্রয়োজন না হলে আরোহণ করবে না। আর যদি উহাতে দুধ থাকে তাহলে উহা দোহন করবে না; বরং তার স্তনের মধ্যে ঠাণ্ডা পানি ছিটিয়ে দেবে, যাতে দুধ বন্ধ হয়ে যায়। আর মুহরিম যে হাদী প্রেরণ করে তা যদি ধ্বংস হয়ে যায়, তবে উহা নফল হয়ে থাকলে তার ওপর অন্য কোন হাদী ওয়াজিব হবে না। আর যদি উহা ওয়াজিব হাদী হয় তাহলে অন্য একটি হাদীকে উহার স্থলাভিষিক্ত করা ওয়াজিব হবে। আর যদি হাদীর মধ্যে বহু দোষ-ত্রুটি দেখা দেয়, তাহলে উহার স্থলে একটি সুস্থ হাদী দেবে এবং দোষযুক্ত হাদীকে যা ইচ্ছা তাই করবে। আর যদি কুরবানীর উট পথিমধ্যে ধ্বংস হবার উপক্রম হয়, তাহলে নফলের হলে উহাকে নহর করবে এবং উহার ক্ষুরকে তার রক্ত দ্বারা রঞ্জিত করে তা দ্বারা তার কুঁজে আঘাত করে দেবে, আর সে নিজে উহার গোশত খাবে না এবং অন্য কোন ধনী লোককে ভক্ষণ করাতে পারবে না। আর যদি সে হাদী ওয়াজিবের হয় তাহলে অন্য উটকে উহার স্থলাভিষিক্ত করবে এবং প্রথমটিকে যা ইচ্ছা তা করবে। নফল তামাত্তু' এবং কিরান হজ্জের হাদীর গলায় মালা পরাবে। তবে প্রতিবন্ধকের দম এবং ত্রুটি-বিচ্যুতির দমকে মালা পরাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

হাদীর تَعْرِيْف প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهٗ لَايَجِبُ التَّعْرِيْفُ الخ ঃ এ কথাটির দু'টি ব্যাখ্যা হতে পারে।

প্রথমত ঃ এর অর্থ হল, পরিচয় করিয়ে দেয়া বা অবগত করিয়ে দেয়া অর্থাৎ হাদীর জানোয়ারকে পরিচয় করে দেয়া আবশ্যক নয়।

দ্বিতীয়ত ঃ এর অর্থ হল, আরাফায় নিয়ে যাওয়া অর্থাৎ হাদীর পশুকে আরাফায় নিয়ে যাওয়া ওয়াজিব নয়, তবে কেউ নিয়ে গেলে তা উত্তম হবে। কেননা ইমাম মালিক (রহঃ) আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হতে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন। কাজেই এখানে এ অর্থটিই গ্রহণযোগ্য।

হাদীর গদি রশি দান করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَيَتَصَدَّقُ بِجَلَالِهَا وَخِطَامِهَا الخ ঃ হাদীর পিঠে বসার গদি বা ঝুল এবং উহার লাগামের রশি এমনকি তার সাথের যাবতীয় বিষয় সদকা করে দিতে হবে। কেননা নবী কারীম (সাঃ) বলেছেন যে, উহার গদি ও রশি দান করে দেবে এবং উহার গোশত দ্বারা গোশত কর্তনকারীর পারিশ্রমিক দেবে না।

হাদীর পিঠে আরোহণ করার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فَاضْطُرَّ اِلَى رُكُوْبِهَا الخ ঃ কোন মুহরিম হাদীর উট সাথে নিয়ে রওয়ানা হলে পথিমধ্যে যদি উহার পিঠে আরোহণে বাধ্য হয়, তাহলে উহার ওপর সওয়ার হওয়া জায়েয আছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে যে, একবার নবী কারীম (সাঃ) এক ব্যক্তিকে হাদীর উট নিয়ে যেতে দেখলেন, নবী কারীম (সাঃ) তাকে উহার ওপর আরোহণ করতে বললেন, সে উত্তরে বলল যে, উহা হাদীর উট, রাসূল (সাঃ) তাকে উহার ওপর আরোহণ করতে বললেন। এতে বোঝা যায় যে, প্রয়োজনে হাদীর ওপর সওয়ার হওয়া জায়েয।

হাদীর দুধ দোহন করা প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ كَانَ لَهَا لَبَنٌ الخ ঃ হাদীর পশু যদি দুধালো হয়, তবে উহা দুধ দোহন করা জায়েয নেই। আর যদি দোহন করে, তাহলে নিজে খাওয়া জায়েয নেই; বরং উক্ত দুধ সদকা করে দেবে। আর দুধ যদি বেশি কষ্ট দেয়, তাহলে ঠাণ্ডা পানি দিয়ে উহা বন্ধ করে দেবে, নতুবা দোহন করে সদকা করে দেবে। আর একান্তই যদি নিজে খেয়ে ফেলে, তাহলে উহার মূল্য সদকা করে দেবে।

হাদীর উট মৃত্যুবরণ করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ سَاقَ هَدْيًا فَعَطِبَ الخ ঃ হাদীর জানোয়ার যদি পথিমধ্যে মৃত্যুবরণ করে– যদি তা নফলের হয়, তাহলে তার ওপর অন্য হাদী দেয়া ওয়াজিব হবে না; আর যদি ওয়াজিবের হয়, তাহলে উহার পরিবর্তে আরেকটি দেয়া আবশ্যক হবে।

হাদীর উট অধিক রুগ্ণ হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِنْ اَصَابَهُ عَيْبٌ كَثِيْرٌ الخ ঃ আর হাদী যদি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়, তাহলে অন্য একটি পশু উহার স্থলাভিষিক্ত করবে এবং দোষযুক্ত পশুটিকে মালিক যা ইচ্ছা তা করতে পারবে তথা নিজ প্রয়োজনে বিক্রি করা, দান করা, জবাই করে খেয়ে ফেলা ইত্যাদি করতে পারবে। কেননা, অন্য একটিকে উহার স্থলাভিষিক্ত করার ফলে দোষযুক্ত পশুটি তার মালিকানাধীন বস্তু হিসেবে পরিগণিত হয়ে গেছে, তাই উহাকে সে যে কোন কাজে ব্যবহার করবার অধিকার পাবে।

হাদীর উট ধ্বংসের নিকটবর্তী হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاِذَا عَطِبَتِ الْبَدَنَةُ فِى الطَّرِيْقِ الخ ঃ হাদীর উট যদি পথিমধ্যে মৃত্যু মুখে পতিত হয়, তাহলে নফলের হলে উহা নহর (জবাই) করবে এবং উহার পায়ে তার রক্ত লাগিয়ে পা দ্বারা কুঁজে আঘাত করবে, যাতে বুঝা যায় যে উহা হাদীর জানোয়ার। উহা হতে নিজে এবং অন্যান্য ধনীরা খেতে পারবে না, তবে দরিদ্ররা খেতে পারবে। আর যদি তা ওয়াজিবের হয়, তাহলে উহার পরিবর্তে আরেকটি জানোয়ার দিতে হবে এবং উহাকে যা ইচ্ছা করতে পারবে।

হাদীকে মালা পরানোর বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَيُقَلِّدُ هَدْىَ التَّطَوُّعِ الخ ঃ নফল, তামাত্তু' এবং কিরান হজ্জের হাদীকে কালাদাহ বা মালা পরাবে, যাতে জনগণ বুঝতে পারে যে, উহা কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট জানোয়ার, ফলে উহার ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করবে না। আর যদি অবরুদ্ধ ও অন্যায়ের হাদী হয়, তাহলে মালা পরাবে না। কেননা গুনাহ গোপন রাখা সমীচীন, কালাদাহ পরালে তা প্রকাশ পেয়ে যাবে। তাই মালা পড়ানো হতে বিরত থাকা আবশ্যক।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। হাদী কাকে বলে? উহার হুকুম বর্ণনা কর।
২। হাদীর মধ্যে কিরূপ পশু জায়েয নয়? বর্ণনা কর।
৩। কোন্ কোন্ অবস্থায় ছাগল হাদী জায়েয নেই।
৪। হাদীর জন্তু পথিমধ্যে মারা গেলে তার হুকুম কি?
৫। কুরবানীর শরিকদের মধ্যে কারো গোশ্ত খাওয়ার নিয়ত থাকলে তার বিধান কি?
৬। হাদীর জানোয়ার পথিমধ্যে খুব অসুস্থ এবং মৃত্যু মুখে পতিত হলে কি হুকুম? বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْبُيُوْعِ

اَلْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقُبُوْلِ اِذَا كَانَا بِلَفْظِ الْمَاضِىْ وَاِذَا اَوْجَبَ اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْبَيْعَ فَالْاٰخَرُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ قَبِلَ فِى الْمَجْلِسِ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهُ فَاَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ قَبْلَ الْقُبُوْلِ بَطَلَ الْاِيْجَابُ فَاِذَا حَصَلَ الْاِيْجَابُ وَالْقُبُوْلُ لَزِمَ الْبَيْعُ وَلَاخِيَارَ لِوَاحِدٍ مِّنْهُمَا اِلَّا مِنْ عَيْبٍ اَوْ عَدَمِ رُؤْيَةٍ -

وَالْاَعْوَاضُ الْمُشَارُ اِلَيْهَا لَايَحْتَاجُ اِلٰى مَعْرِفَةِ مِقْدَارِهَا فِىْ جَوَازِ الْبَيْعِ وَالْاَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ لَاتَصِحُّ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ مَعْرُوْفَةَ الْقَدْرِ وَالصِّفَةِ وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِثَمَنٍ حَالٍّ وَمُؤَجَّلٍ اِذَا كَانَ الْاَجَلُ مَعْلُوْمًا وَمَنْ اَطْلَقَ الثَّمَنَ فِى الْبَيْعِ كَانَ عَلٰى غَالِبِ نَقْدِ الْبَلَدِ فَاِنْ كَانَتِ النُّقُوْدُ مُخْتَلِفَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ اِلَّا اَنْ يُّبَيِّنَ اَحَدَهَا -

---

বেচাকেনার পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ ক্রয়-বিক্রয় (চুক্তি) ইজাব (প্রস্তাব) ও কবুল (সমর্থন) দ্বারা নিষ্পন্ন হয়। যখন এ দু'টি অতীতকালীন শব্দ দ্বারা যখন দুই কারবারির একজন বিক্রয় বা ক্রয়ের প্রস্তাব করে তখন অপরজনের জন্য মজলিসে থাকা পর্যন্ত এখতিয়ার থাকে। ইচ্ছা করলে সে তা গ্রহণ করবে নতুবা প্রত্যাখ্যান করবে। সে মতে কবুলের পূর্বে তাদের যে কেউ মজলিস থেকে ওঠে গেলে প্রস্তাব বাতিল (অকার্যকর) হয়ে যাবে। যখন ইজাব ও কবুল সমাধা হয়ে যাবে তখন বিক্রয়-চুক্তি অনিবার্য হয়ে যাবে; কারো জন্যই (তা অমান্য করার) এখতিয়ার থাকবে না। অবশ্য পণ্যের কোন দোষ-ত্রুটি কিংবা না দেখে কিনার কারণে (আপত্তি তোলার এখতিয়ার থাকবে)।

যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হয় তাতে বিক্রয় শুদ্ধ হওয়ার জন্য তার পরিমাণ জানানো (উল্লেখ করা) জরুরি নয়। কিন্তু সাধারণ মুদ্রায় (ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত নেই, যদি তার পরিমাণ ও গুণাগুণ জ্ঞাত না থাকে। নগদ দামে এবং পরিশোধের মেয়াদ নির্দিষ্ট হলে বাকি দামেও কেনা-বেচা করা জায়েয। (বাজারে বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন থাকা অবস্থায়) কেউ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সাধারণভাবে মুদ্রার কথা উল্লেখ করলে তা সে দেশে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার ওপর প্রযোজ্য হবে। কিন্তু যদি মুদ্রা বিভিন্ন মূল্যমানের হয় (এবং সবগুলোর ব্যবহার সমান থাকে) তখন তা থেকে নির্দিষ্ট এক প্রকার বর্ণনা করে না দিলে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الْبُيُوْعِ -এর মাধ্যমে সম্মানিত গ্রন্থকার ইবাদতের বর্ণনা শেষ করে مُعَامَلَات -এর বর্ণনা আরম্ভ করছেন এবং نِكَاح -এর বিধি-বিধানকে بَيْع -এর পরে আলোচনা করেছেন। এর কারণ হল مُعَامَلَات তথা বেচাকেনার প্রয়োজন সকলের সাথেই সম্পৃক্ত। চাই সে ছোট হোক বা বড় হোক, ছেলে হোক বা মেয়ে হোক।

আর অধিক প্রয়োজনীয় বিষয়টিকে সর্বাগ্রে উল্লেখ করা অধিক যুক্তিযুক্ত। অবশ্য হেদায়া প্রণেতা مُعَامَلَات -এর ওপর বিবাহকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন। কেননা বিবাহও হল একটি ইবাদত। এমনকি আমাদের নিকট নফল ইবাদত করার চেয়েও বিবাহ করা উত্তম।

اَلْبُيُوْعُ -এর আলোচনা ঃ اَلْبُيُوْعُ শব্দটি বহুবচন, একবচন بَيْعٌ এটা বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। অর্থ– বিনিময় করা, বিক্রয় করা। আবার এটা কখনো ক্রয় অর্থেও আসে। যেমন– شِرَاءٌ এ শব্দটির আসল অর্থ হল ক্রয় করা। কিন্তু কখনো বিক্রয় অর্থও প্রদান করে থাকে। শরীয়তের পরিভাষায়, দু'পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসায়িক উপায়ে মাল দ্বারা মালের আদান-প্রদান করাকে بَيْع বলে।

اَلْبَيْعُ বা اَقْسَامُ الْبَيْعِ -এর প্রকারভেদ ঃ উল্লেখ্য যে, اَلْبَيْعُ-কে প্রথমে তিনভাগে ভাগ করা যায় এবং তিন ভাগের প্রত্যেকটি আবার চার ভাগে বিভক্ত।

প্রথম প্রকার ঃ نَفْس بَيْع-এর হিসেবে بَيْع টা চার প্রকার ঃ ১. بَيْع نَافِذ ২. بَيْع مَوْقُوْف ৩. بَيْع فَاسِد ৪. بَيْع بَاطِل

এর تَقْسِيْم এভাবেও করা যেতে পারে যে, কার্যকারিতার বিচারে বেচাকেনা প্রথমত দু' প্রকার ঃ مُنْعَقِد ও غَيْر مُنْعَقِد ; গায়রে মুন্‌আকিদের অপর নাম بَيْع بَاطِل । মুনআকিদ আবার চার প্রকার ঃ সহীহ, ফাসিদ, নাফিয ও মওকুফ।

بَيْع صَحِيْح -এর সংজ্ঞা ঃ اَلْبَيْعُ الَّذِىْ صَحَّ اَصْلًا وَّ وَصْفًا অর্থাৎ "যে ক্রয়-বিক্রয় মৌলিক ও আনুষঙ্গিক উভয় বিচারে শুদ্ধ।" মৌলিক বলতে চুক্তির রোকন বোঝানো হয়েছে। ইজাব-কবুলের মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মতি প্রকাশ এবং পণ্য হালাল ও উপস্থিতি থাকাই এক্ষেত্রে রোকন। আর আনুষঙ্গিক বলতে এখানে রোকনের পরিপূরক বিষয়াবলী উদ্দেশ্য। যেমন– ইজাব-কবুলের সময় দ্রব্য কিংবা মুদ্রার পরিমাণ উহ্য না রাখা এবং বিনিময়-চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত কোন শর্তারোপ না করা ইত্যাদি। এ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের বিধান হল, দু' পক্ষের কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যাবে।

بَيْع فَاسِد -এর সংজ্ঞা ঃ اَلْبَيْعُ الْمَشْرُوْعُ اَصْلًا لَا وَصْفًا অর্থাৎ "যে বেচাকেনা মৌলিকত্বের বিচারে শুদ্ধ; কিন্তু আনুষঙ্গিক দৃষ্টিতে অশুদ্ধ।" যেমন– বিক্রিত দ্রব্যে অসংশ্লিষ্ট কোন শর্ত জুড়ে দেয়া। বলা হল, বিক্রিত দ্রব্য কিছু দিনের জন্য বিক্রেতার ভোগ-ব্যবহারে থাকবে। এর হুকুম হল, কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর ক্রেতা যদি পণ্য করায়ত্ত করে নেয় তবে সে তার মালিক হয়ে যাবে। তবে এক্ষেত্রে বিক্রয় পণ্য ফেরত দিয়ে বিক্রয়-চুক্তি ভেঙে ফেলা ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের কর্তব্য। নতুবা তা সুদী কারবারে পরিগণিত হবে। — (ইমদাদুল ফত্ওয়া)

بَيْع مَوْقُوْف -এর সংজ্ঞা ঃ যে বেচাকেনার কার্যকারিতা অন্য কারো অনুমতির ওপর স্থগিত থাকে, তাকে بَيْع مَوْقُوْف বলে। যেমন– কোন বুঝমান নাবাগেল শিশু তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত কোন জিনিস বিক্রি করল, তখন এর কার্যকারিতা উক্ত মুরব্বীর সম্মতি দানের ওপর মওকুফ থাকবে।

بَيْع نَافِذ -এর সংজ্ঞা ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ঐ চুক্তি যার কার্যকারিতা অন্য কারো আদেশ-নিষেধের অপেক্ষা রাখে না। এটা আবার দু' প্রকার ঃ লাযেম ও গায়রে লাযেম।

لَازِم -এর সংজ্ঞা ঃ هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الْعَارِىْ مِنَ الْخِيَارَاتِ অর্থাৎ কেনাবেচায় ক্রেতা-বিক্রেতা কারো জন্য ব্যবসা সামগ্রী ফেরত দেয়া বা নেয়ার কোনরূপ এখতিয়ার বাকি নেই।

غَيْر لَازِم -এর সংজ্ঞা ঃ هُوَ الْبَيْعُ النَّافِذُ الَّذِىْ فِيْهِ الْخِيَارَاتُ অথাৎ ঐ বেচাকেনা যাতে অনুরূপ এখতিয়ার বাকি আছে।

بَيْع بَاطِل -এর সংজ্ঞা ঃ مَا لَايَصِحُّ اَصْلًا অর্থাৎ যে বিক্রয়-চুক্তি মৌলিক দৃষ্টিতে অশুদ্ধ। হয়তো চুক্তির পন্থা হারাম। যেমন– জুয়া, সুদী কারবার, মজুদদারী ও কালোবাজারী। অথবা বিক্রিত পণ্য হারাম। যথা– মদ, হিরোইন, গাজা, শূকর ও মরা প্রভৃতি। এরূপ বেচাকেনায় কোন অবস্থায়ই ক্রয়কৃত পণ্যে ক্রেতার মালিকানা অর্জিত হয় না।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ

مَبِيْع বা ব্যবসা সামগ্রী হিসেবে بَيْع টা চার প্রকার ঃ ১. بَيْع مُطْلَق ২. بَيْع صَرَف ৩. بَيْع مُقَايَضَة ৪. بَيْع سَلَم

بَيْع مطلق -এর সংজ্ঞা ঃ যে ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে (নগদ হোক কিংবা বাকি হোক) মুদ্রা দ্বারা পণ্যের আদান-প্রদান করা হয়, তাকে بَيْع مُطْلَق বলে।

بَيْع صرف -এর সংজ্ঞা ঃ মুদ্রার বিনিময়ে মুদ্রার ক্রয়-বিক্রয় করাকে بَيْع صَرَف বলা হয়।

بَيْع مُقَايَضَة-এর সংজ্ঞা ঃ দ্রব্যের দ্বারা দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয় করাকে بَيْع مُقَايَضَة বলা হয়।

بَيْع سَلَم-এর সংজ্ঞা ঃ দ্রব্য বাকি রেখে মূল্য অগ্রীম প্রদান করে ক্রয়-বিক্রয় করাকে بَيْع سَلَم বলা হয়।

তৃতীয় প্রকার ঃ ثَمَن বা মূল্যের হিসেবে بَيْع চার প্রকার ঃ

১. بَيْع مُرَابَحَة ২. بَيْع تَوْلِيَة ৩. بَيْع وَضِيْعَة ৪. بَيْع مُسَاوَمَة

بَيْع مُرَابَحَة-এর সংজ্ঞা ঃ ক্রয়কৃত মূল্যের অতিরিক্ত তথা লাভসহ বিক্রয় করাকে بَيْع مُرَابَحَة বলে।

بَيْع تَوْلِيَة-এর সংজ্ঞা ঃ ক্রয়কৃত মূল্যের সমমূল্যে বিক্রি করাকে بَيْع تَوْلِيَة বলা হয়।

بَيْع وَضِيْعَة-এর সংজ্ঞা ঃ ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে কম দামে বিক্রি করাকে بَيْع وَضِيْعَة বলা হয়।

بَيْع مُسَاوَمَة-এর সংজ্ঞা ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতার সম্মতিতে নির্ধারিত মূল্যে বিক্রি করাকে بَيْع مُسَاوَمَة বলা হয়।

بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ الخ এর আলাচনা ঃ কোন চুক্তি সম্পাদনকালে যে পক্ষ থেকে প্রথম মত ব্যক্ত হয়, সে মতকে ইজাব বা প্রস্তাব বলে এবং এরই প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি জ্ঞাপনকে কবুল বা সমর্থন বলে।

ইজাব ও কবুল তিনভাবে হতে পারে- (১) মৌখিক, যেমন- একজন বলল, আমি এ কিতাবটি দশ টাকায় বিক্রি করলাম। আর দ্বিতীয়জন বলল আমি তা ক্রয় করলাম। (২) লৈখিক, যেমন- এক ব্যক্তি দোকানদারকে লেখে পাঠাল, আমার জন্য ভালো জাতের এক হালি ডিম পাঠিয়ে দিন এবং দোকানি তা পাঠিয়ে দিল। তবে এ ক্ষেত্রে ক্রেতার জন্য খেয়ারে রুইয়াত থাকবে। (৩) কার্যত, যেমন- আপনি দোকানিকে বললেন একটা চকলেট দিন, অতঃপর চকলেটটা হাতে নিয়ে তাকে একটি টাকা দিলেন আর সে টাকাটা বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করল। এখানে বেচাকেনার কিংবা দরদস্তুরের কোন শব্দ কোন পক্ষ উচ্চারণ না করলেও কার্যত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়েছে। এ রকম ক্রয়-বিক্রয়কে بَيْع تَعَاطِى বলে।

فَالْاٰخَرُ بِالْخِيَارِ الخ-এর আলোচনা ঃ এখানে বেচাকেনার ক্ষেত্রে একপক্ষ প্রস্তাব করার পর উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে দ্বিতীয় পক্ষের স্বাধীনতা থাকবে এবং এ অধিকার মজলিসের শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। একইভাবে প্রস্তাবক যদি অন্য কারো মাধ্যমে কিংবা পত্র মারফত প্রস্তাব পাঠায়, তবে যে মজলিসে বার্তা বা চিঠি পৌঁছবে সে মজলিসের সমাপ্তি পর্যন্ত দ্বিতীয় পক্ষের মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকবে। কারণ শরীয়ত দ্বিতীয় পক্ষকে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করার অধিকার প্রস্তাবককে দেয়নি। অনুরূপভাবে দ্বিতীয় পক্ষ ক্রয়ের স্বীকৃতি দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রথম পক্ষ নিজের প্রস্তাব ফিরিয়ে নিতে পারবে। কিন্তু কারবার সিদ্ধান্ত হয়ে গেলে কারো জন্য তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার থাকবে না।

فَاَيُّهُمَا قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ الخ-এর আলোচনা ঃ আলাপ-আলোচনা চলাকালে সিদ্ধান্ত হওয়ার পূর্বেই যদি কোন পক্ষ স্থান ত্যাগ করে অথবা অন্য কোন কাজে রত হয়, যাতে সে দ্রব্যটি বিক্রি বা ক্রয় করতে চাচ্ছে না বলে অনুমিত হয়; তবে ইজাব বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এরূপ আচরণ পেশকৃত প্রস্তাবের প্রতি অসম্মতি বা প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেয়ার কথাই প্রমাণ করে। সুতরাং পরবর্তী সময়ে উক্ত প্রস্তাবকে ভিত্তি করে চুক্তির কাজ সমাধা করা যাবে না; বরং নতুনভাবে প্রস্তাব করত কারবার সংঘটিত করতে হবে।

وَلَا خِيَارَ لِاَحَدِهِمَا-এর আলোচনা ঃ কারণ ইজাব ও কবুল এ দু'টি কাজ সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথেই ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। চাই সে পণ্য করায়ত্ত করুক বা না করুক। সুতরাং এ অবস্থায় ক্রেতা বা বিক্রেতার জন্য পণ্য না নেয়া কিংবা না দেয়ার অধিকার বাকি থাকে কিরূপে? অদুপরি যদি বিক্রেতা পণ্য দিতে না চায় কিংবা ক্রেতা পণ্য নিতে অস্বীকার করে, তবে দ্বিতীয় পক্ষ এ দাবি মেনে নিতে আইনত বাধ্য নয়। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, যতক্ষণ তারা স্থান ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের গ্রহণ ও প্রত্যাখানের অধিকার থেকে যাবে, কথাবার্তার ধারা চালু থাক বা বন্ধ হোক তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁর মতে এটা হল خِيَار مَجْلِس।

اِلَّا مِنْ عَيْب-এর আলোচনা ঃ যদি ক্রয়কৃত সামগ্রীর মধ্যে এমন কোন দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যা ক্রয় বা করায়ত্ত করার পূর্বেই তাতে উপস্থিত ছিল অথবা না দেখে ক্রয় করা কোন দ্রব্য পরবর্তীতে দেখে মনঃপূত না হয়, তবে ক্রেতার তা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার রয়েছে। এ শ্রেণীর অধিকারকে যথাক্রমে خِيَار عَيْب ও خِيَار رُؤْيَت বলে।

وَالْاَعْوَاضُ الْمُشَارُ اِلَيْهَا الخ-এর আলোচনা ঃ اَلْاَعْوَاض শব্দটি عِوَضٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ- বিনিময়, চাই তা পণ্যসামগ্রী হোক বা মুদ্রা জাতীয় কোন কিছু। বেচাকেনার সময় দ্রব্য ও মুদ্রা ইশারার মাধ্যমে দেখিয়ে দেয়া হলে তার

পরিমাণ ও গুণাগুণ সম্বন্ধে ক্রেতার মোটামুটি একটা ধারণা এসে যায়। ফলে সে তা সম্পর্কে বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। বেচাকেনা শুদ্ধ হওয়ার জন্য এ সক্ষমতাই যথেষ্ট। যেমন– মেঝেতে রাখা একটা চেয়ার কিংবা একটি থালাতে রাখা কিছু টাকার প্রতি ইশারা করে বলা হল, এ চেয়ারটা দশ টাকায় বিক্রি করলাম অথবা এ টাকাগুলো দিয়ে ছাতাটা ক্রয় করলাম। দ্বিতীয় পক্ষ সম্মত হলে এ ক্ষেত্রে বেচাকেনা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সুদী সামগ্রী হলে এ ধরনের লেনদেন দুরস্ত হবে না। কারণ সেখানে উভয় দিকের পণ্য কড়ায় ক্রান্তিতে সমান হওয়া জরুরি।

وَالْأَثْمَانُ الْمُطْلَقَةُ الخ-এর আলোচনা ঃ اَلْاَثْمَانُ শব্দটা ثَمَنٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ– মুদ্রা। প্রকৃত প্রস্তাবে স্বর্ণ-রূপা এবং এগুলোর তৈরি কয়েনকে মুদ্রা বলা হয়। পরবর্তীকালে স্বর্ণ-রূপার স্থলবর্তী কাগজটি নোট ও মুদ্রা নামে অভিহিত হতে থাকে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যদি মুদ্রার পরিমাণ উল্লেখ করা না হয় এবং ইশারা করেও দেখিয়ে দেয়া না হয়, তবে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ এতে বিক্রেতার নিকট মুদ্রার মূল্যমান (VALUE) ও পরিমাণ উভয়ই অজ্ঞাত থেকে যায়, যা পরিণামে কলহ সৃষ্টি করবে।

وَمَنْ اَطْلَقَ الثَّمَنَ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়ের সময় কোন ব্যক্তি মুদ্রার শ্রেণী বা মান উহ্য রেখে শুধুমাত্র পরিমাণ উল্লেখ করলে তা সে দেশের সার্বাধিক প্রচলিত মুদ্রার ওপর প্রযোজ্য হবে। উল্লেখ্য যে, পূর্বযুগে কোন কোন দেশে একাধিক শ্রেণীর মুদ্রার প্রচলন ছিল। দেশের অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ থেকে মুদ্রাগুলো বাজারজাত হত। প্রত্যেক প্রদেশের বাজারজাতকৃত মুদ্রা এক একটা ভিন্ন শ্রেণী হিসেবে বিবেচিত হত। আর মুদ্রাগুলোর মৌল উপাদান ও নাম অভিন্ন হত বিধায় বাহ্যিক পার্থক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্য এগুলোকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশের দিকে সম্বোধন করা হত। যেমন, বলা হত– বুখারী দিরহাম, সামারকান্দী দিরহাম ইত্যাদি। এমতাবস্থায় কেউ যদি বলে আমি এ খাতাটি এক দিরহামে ক্রয় করলাম, তখন এ দিরহাম বলতে সে এলাকার অধিক প্রচলিত দিরহামকেই বুঝাবে। সুতরাং এস্থলে ক্রেতা অন্য দিরহাম দিলে বিক্রেতা আইনত তা অগ্রাহ্য করতে পারবে। আর যদি সবকটি মুদ্রার প্রচলন সমান হয়, তবে যে কোন এক প্রকার মুদ্রা দিলেই চলবে। অনেক সময় অভিন্ন নাম হওয়া সত্ত্বেও মুদ্রার পারস্পরিক মূল্যমান বেশ-কম হয়, যেমন– সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের ডলারের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সে মতে কোন দেশে যদি এ তিন প্রকার মুদ্রার প্রচলন থাকে, তখন ক্রয়-বিক্রয়ের সময় পরিষ্কারভাবে কোন দেশের ডলার তা উল্লেখ করতে হবে। নতুবা বিক্রয় জায়েয হবে না।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الطَّعَامِ وَالْحُبُوبِ كُلِّهَا مُكَايَلَةً وَمُجَازَفَةً وَبِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ لَايَعْرِفُ مِقْدَارَهُ أَوْ بِوَزْنِ حَجَرٍ بِعَيْنِهِ لَايَعْرِفُ مِقْدَارَهُ وَمَنْ بَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ كُلَّ قَفِيزٍ بِدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي قَفِيزٍ وَاحِدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَبَطَلَ فِي الْبَاقِي إِلَّا أَنْ يُسَمِّي جُمْلَةَ قُفْزَانِهَا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَصِحُّ فِي الْوَجْهَيْنِ - وَمَنْ بَاعَ قَطِيعَ غَنَمٍ كُلَّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ فِي جَمِيعِهَا وَكَذٰلِكَ مَنْ بَاعَ ثَوْبًا مُذَارَعَةً كُلَّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَلَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الذُّرْعَانِ وَمَنِ ابْتَاعَ صُبْرَةَ طَعَامٍ عَلٰى أَنَّهَا مِائَةُ قَفِيزٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْمَوْجُودَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَإِنْ وَجَدَهَا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَالزِّيَادَةُ لِلْبَائِعِ -

সরল অনুবাদ ঃ সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্য ও শস্য-ফসল (কৌটা, টুকরি প্রভৃতি) মাপক দ্বারা বা অনুমান করে বিক্রি করা জায়েয আছে। এবং জায়েয আছে এমন সুনির্দিষ্ট পাত্র বাটখারা দ্বারা (ওজন করে) বিক্রয় করা যার পরিমাণ জানা নেই। যে ব্যক্তি খাদ্যশস্যের স্তূপ প্রতি কফিয এক দিরহাম হারে বিক্রি করল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে তার এ বিক্রয় শুধুমাত্র এক কফিযের মধ্যে দুরস্ত হবে এবং অবশিষ্ট দ্রব্যে তা ফাসিদ গণ্য হবে। তবে স্তূপের সর্বমোট কাফিয উল্লেখ করে থাকলে (সমস্ত খাবারেই বিক্রয় সহীহ হয়ে যাবে)। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, উভয় অবস্থায়ই (স্তূপের সমুদয় পণ্যে) বেচাকেনা শুদ্ধ। যদি কেউ একপাল ছাগল প্রতিটি এক দিরহাম দরে বিক্রি করে (এবং ছাগল সংখ্যা কত তা অজ্ঞাত রাখে) তবে সমস্ত ছাগলের বিক্রয় অশুদ্ধ হবে। একইভাবে যে মোট কত গজ তা উল্লেখ না করে (এক থান) কাপড় প্রতি গজ এক টাকা দরে বিক্রি করল (তার এক গজ কাপড়েও বিক্রয় বৈধ হবে না)। যে ব্যক্তি কোন শস্যস্তূপ একশ' কফিয হবে শর্তে একশত দিরহামে ক্রয় করল, (অতঃপর শস্যের পরিমাণ তার চেয়ে কম পেল) তবে তার এখতিয়ার রয়েছে- ইচ্ছা করলে যা আছে তাই তদনুপাতে দাম দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা ইচ্ছা করলে বিক্রয়-চুক্তি রহিত করে দেবে। আর যদি শস্যের পরিমাণ বেশি পায়, তবে (ক্রেতা-বিক্রেতা কারোই কোন এখতিয়ার থাকবে না)। বেশিটুকু বিক্রেতার (ক্রেতা তা নিতে পারবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُجَازَفَةً الخ -এর ব্যাখ্যা ঃ শব্দটি مُفَاعَلَةٌ -এর মাসদার। অর্থ- পরস্পরে অনুমান করে আদান-প্রদান করা। আদান-প্রদানের এ পন্থা শরীয়ত জায়েয রেখেছে। কিন্তু সুদ সৃষ্টি হয় এমন দ্রব্যসামগ্রীর পারস্পরিক আদান-প্রদানে এ পন্থা অবলম্বন করা জায়েয নেই। সে মতে এক স্তূপ চাল দ্বারা অন্য এক স্তূপ চালের আদান-প্রদান করা জায়েয হবে না।

بِإِنَاءٍ بِعَيْنِهِ الخ -এর আলোচনা ঃ এমন সুনির্দিষ্ট ব্যবহার্য পাত্র যা কঠিন পদার্থ দ্বারা তৈরি এবং যা সাধারণত চাপের মুখে প্রশস্ত হয় না। যেমন- এলুমিনিয়াম, কাঠ, বাঁশ প্রভৃতি উপাদানে তৈরি পাত্র। সে মতে পাট, তুলা ও পলিথিনজাত পাত্রাদি দ্বারা বিক্রি জায়েয হবে না। কারণ এগুলোর অভ্যন্তর ভাগ ব্যবহারভেদে সম্প্রসারিত ও সংকুচিত হয়; কিন্তু পরিমাণ বা ধারণক্ষমতা জানা নেই। এমন পাত্রে 'বাইয়ে সলম' করা বৈধ হবে না। কারণ সলম কারবারের মেয়াদ যে দিন পূর্ণ হবে সে দিন পরিমাপের এ সমস্ত মাধ্যম হুবহু উপস্থিত থাকার কোন নিশ্চয়তা নেই। ফলে তখন লেনদেন ব্যাঘাত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

بَطَلَ فِى الْبَاقِىْ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সর্বমোট কত কফিয তা ইজাব-কবুলের সময় উল্লেখ করা না হলে পণ্যের সঠিক পরিমাণ অজানা থেকে যায়। আর যেহেতু পণ্যের পরিমাণের ওপর ভিত্তি করেই টাকা বা দামের অংক নির্ধারিত হয়, সে কারণে এ ক্ষেত্রে দামের পরিমাণও অজানা থেকে যায়। মোট কথা, দাম ও পণ্য কোনটাই এখানে জানা ও সুস্পষ্ট হয় না। আর অজানা (مَجْهُوْل) জিনিসের ক্রয়-বিক্রয় কখনো বৈধ নয়। কিন্তু স্তূপের মধ্যে ন্যূনতম এক কফিয পরিমাণ শস্য মওজুদ থাকা যেহেতু নিশ্চিত সে কারণে এক কফিযের মধ্যে বিক্রয় সহীহ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু তাতে কৃতচুক্তির ধরন পাল্টে যাচ্ছে বিধায় ক্রেতার তা গ্রহণ করা না করার স্বাধীনতা থাকবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রে মোট কত কফিয শস্য তা বলে দিলে কিংবা উপস্থিত মেপে দেখিয়ে দিলে সব গুলোতেই ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে।

কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, শস্যের মোট পরিমাণ উল্লেখ করা হোক বা না হোক সম্পূর্ণ শস্যের বিক্রি শুদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ এখানে দ্রব্য ও মূল্যের পরিমাপে যেটুকু অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা (جَهَالَت) রয়েছে তা দূরীকরণের ক্ষমতা ক্রেতা বিক্রেতার আয়ত্তের ভিতরে। কাজেই তা অনায়াসে দূরীভূত হয়ে মনোমালিন্যের পথ রুদ্ধ হবে। ফতোয়া সাহেবাইন (রঃ)-এর মতের ওপর।

فَاسِدٌ فِىْ جَمِيْعِهَا -এর আলোচনা ঃ ন্যূনতম সংখ্যা তথা একটি বকরির মধ্যেও বিক্রি সহীহ হবে না। কারণ একটি পালের সবগুলো ছাগল এক সমান নয়। এ গুলের মধ্যে পারস্পরিক পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় পালের একটি ছাগলের মধ্যে যদি বিক্রি সহীহ করা হয়, তাহলে সে একটি নির্বাচন নিয়ে শুরু হবে মতবিরোধ। ক্রেতা চাবে দেখে-শুনে বড় মাপের একটি নিতে, আর বিক্রেতা চেষ্টা করবে ছোটখাটো একটা দিতে এবং এভাবে তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটবে। একই অবস্থা হাস-মুরগিসহ বিভিন্ন জাতের পশু-পাখি এবং তরমুজ, কলা ও আনারসসহ বিভিন্ন প্রকার ফলমূলের যেগুলো সাধারণত গণনার ভিত্তিতে বিক্রি হয়। উক্ত নিয়মে বিক্রি করা হলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে কোন একটি পশু বা ফলের মধ্যেও বেচাকেনা শুদ্ধ হবে না।

كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ الخ -এর আলোচনা ঃ পণ্যসামগ্রী যদি বিক্রেতার বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কারণ সে হয়তো একাধিক দোকানি থেকে পৃথক পৃথক চুক্তিতে অল্প অল্প না কিনে একই দোকান থেকে একসাথে একশত কফিয পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছা করে থাকবে। অথচ এ স্থলে পণ্য-ঘাটতি তার সে ইচ্ছা পূরণে বাধা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই তাতে যুক্তিসঙ্গত কারণেই উক্ত পণ্য গ্রহণ করা বা না করার সুযোগ দিতে হবে। অবশ্য নিতে সম্মত হলে আনুপাতিক দাম দিলেই চলবে। কারণ খাদ্যশস্য সমমানী সামগ্রীর (ذَوَاتُ الْاَمْثَالِ) অন্তর্ভুক্ত, বিধায় এর এক কফিযের সাথে অন্য কফিযের তারতম্য হয় না। সুতরাং যে পরিমাণ শস্য মওজুদ আছে (ধরুন ৯০ কফিয) তা (৯০ টাকায়) গ্রহণ করা হলে কোনরূপ বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার কথা নয়। কিন্তু যদি শস্যের পরিমাণ ১০০ কফিযের বেশি হয়, তবে ক্রেতা অতিরিক্ত অংশটুকু নিতে পারে না। কেননা তা তার ক্রয়কৃত পণ্য নয়।

وَمَنْ اِشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى اَنَّهٗ عَشَرَةُ اَذْرُعٍ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ اَوْ اَرْضًا عَلٰى اَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا اَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِجُمْلَةِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاِنْ وَجَدَهَا اَكْثَرَ مِنَ الذِّرَاعِ الَّذِىْ سَمَّاهُ فَهِىَ لِلْمُشْتَرِىْ وَلَا خِيَارَ لِلْبَائِعِ وَاِنْ قَالَ بِعْتُكَهَا عَلٰى اَنَّهَا مِائَةُ ذِرَاعٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ فَوَجَدَهَا نَاقِصَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهَا بِحِصَّتِهَا مِنَ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَاِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً كَانَ الْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَ الْجَمِيْعَ كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَمٍ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ وَلَوْ قَالَ بِعْتُ مِنْكَ هٰذِهِ الرِّزْمَةَ عَلٰى اَنَّهَا عَشَرَةُ اَثْوَابٍ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ كُلُّ ثَوْبٍ بِعَشَرَةٍ فَاِنْ وَجَدَهَا نَاقِصَةً جَازَ الْبَيْعُ بِحِصَّتِهٖ وَاِنْ وَجَدَهَا زَائِدَةً فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ -

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি (পাঞ্জাবি, শাড়ি, লুঙ্গি বা এ জাতীয় অন্য) কোন কাপড় দশ হাত হবে শর্তে দশ টাকায় ক্রয় করল অথবা কোন জমি একশত হাত হবে শর্তে একশত দিরহামে ক্রয় করল। অতঃপর তা এ পরিমাণের চেয়ে কম পেল, তবে ক্রেতার স্বাধীনতা রয়েছে– ইচ্ছা করলে তা (ধার্যকৃত) পুরো দাম দিয়ে গ্রহণ করবে অথবা ইচ্ছা করলে পরিত্যাগ করবে। আর যদি তা প্রস্তাবিত পরিমাণের চেয়ে বেশি পায়, তবে বেশিটুকু ক্রেতার প্রাপ্য হবে; বিক্রেতার কোনরূপ স্বাধীনতা থাকবে না। যদি মালিক বলে এ জমিটা একশ হাত, প্রতি হাত এক টাকা দরে একশত টাকায় তোমার নিকট বিক্রি করলাম। অতঃপর ক্রেতা তা কম পায় তবে তার জন্য এখতিয়ার রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে পরিমাণ মতো দাম দিয়ে তা নিয়ে নেবে অথবা ইচ্ছা করলে ছেড়ে দেবে। আর যদি তা বেশি পায় তবে ক্রেতার জন্য স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে (অতিরিক্ত অংশসহ) সবটুকু প্রতি হাত এক টাকা হিসেবে (দাম দিয়ে) গ্রহণ করবে, নতুবা বিক্রয় চুক্তি ভেঙে ফেলবে। যদি (বিক্রেতা) বলে তোমার নিকট এই পুটলি তাতে দশটি কাপড় আছে বিধায় প্রতিটি দশ টাকা দরে একশত টাকা বিক্রয় করলাম। অতঃপর সে ক্রেতা তা কম পায় তবে তার সংখ্যানুপাতে বিক্রয় জায়েয হবে, কিন্তু যদি বেশি পায় তবে বিক্রয় ফাসিদ সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ اِشْتَرٰى ثَوْبًا الخ -এর আলোচনা ঃ স্মরণ রাখতে হবে এখানে কাপড় বলতে থান কাপড় বুঝানো হয়নি; বরং পায়জামা, পাঞ্জাবি, শাড়ি ও লুঙ্গি প্রভৃতি প্রস্তুতকৃত পোশাক বুঝানো হয়েছে। এ জাতীয় কাপড় সাধারণত পিস হিসেবে বিক্রি করা হয়; হাত বা গজ হিসেবে নয়। ফলে এ শ্রেণীর বিভিন্ন মাপের কাপড় একই দামে কেনাবেচা হতে দেখা যায়। যেমন– শিশুদের জন্য তৈরি ১৬, ১৮, ২০ ও ২২ ইঞ্চি মাপের পায়জামা পাঞ্জাবি সমান দরে বিক্রি হয়ে থাকে। সে কারণে ইজাব-কবুলের সময় রেডিমেট কোন কাপড়ের ফুট, ইঞ্চি উল্লেখপূর্বক দাম নির্ধারণ করে থাকলেও সাকুল্য দামটা বিভাজ্য হয়ে প্রতি ফিট বা ইঞ্চির বিপরীতে আরোপিত হয় না। অর্থাৎ ২০ ইঞ্চি মাপ পাঞ্জাবির মূল্য ২০ টাকা নির্ধারিত হওয়ার মানে এই নয় যে, প্রতি ইঞ্চির দাম ১ টাকা। জায়গা-জমির বেলায়ও ঠিক একই কথা প্রযোজ্য। একটি সাধারণ মাপের প্লটের মধ্যে যদি এক

আধ ফিট কমবেশি হয় তবে তা ধর্তব্য নয়। অবশ্য শতাংশ বা অর্ধ শতাংশের বেশকমকে আমাদের দেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে বেশকম হিসেবেই গণ্য করতে হবে। সুতরাং পোশাক কিংবা খন্ড ভূমি বিক্রয় করার পর যদি দেখা যায় তা বর্ণিত পরিমাপ বা পরিমাণের চেয়ে সামান্য বেশি, তবে বিক্রেতার দাম নিয়ে আপত্তি তোলার এখতিয়ার থাকবে না। পক্ষান্তরে কম হলে ক্রেতার জন্য তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকবে। কেননা এ সব ক্ষেত্রে পরিমাপটা বস্তুর গুণ বা অবস্থা (وَصْف) রূপে গণ্য: সত্তার (ذَات) মধ্যে গণ্য হয় না। আর ক্রেতা মূলত পণ্যের এ গুণের প্রতি লক্ষ্য করেই তা ক্রয় করতে সম্মত হয়েছিল অথচ সেটা এখন অনুপস্থিত, কাজেই তার খেয়ার অর্জিত হবে। তবে হাঁ গুণের বিপরীতে যেহেতু কোন মূল্য আরোপিত হয় না সে কারণে গ্রহণ করলে সিদ্ধান্তকৃত দামেই তা গ্রহণ করতে হবে।

إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْجَمِيْعَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এখানে একটা মূলনীতি মনে রাখা প্রয়োজন। তাহল বাটখারা বা মাপকের (كَيْل) সাহায্যে মেপে যে সমস্ত পণ্য সামগ্রী বিক্রি করা হয় সেগুলোর ক্ষেত্রে 'পরিমাণ' বস্তুর (পারিপার্শ্বিক) 'অবস্থা' (وَصْف) নয়; বরং তার সত্তার (ذَات) মধ্যে পরিগণিত। এ স্থলে সত্তার ন্যায় পরিমাণের বিপরীতে দাম নির্ধারিত হয়। উদাহরণস্বরূপ এক কেজি চিনির দাম যদি ৩০ টাকা ধরা হয় তাহলে বুঝতে হবে এ ৩০ টাকা শুধু চিনির দাম নয় বা শুধু কেজির দামও নয়; বরং উভয়টার সম্মিলিত দাম। ফলে অনিবার্য কারণেই তখন একশ' গ্রাম চিনির দাম তিন টাকা এবং পঞ্চাশ গ্রামের দাম দেড় টাকা হবে। কিন্তু শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতি পোশাক এবং প্লট জমি যেহেতু সাধারণত গজ ফিট হিসেবে বিক্রি হয় না; বরং গোটা বস্তু ধরে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়। সে কারণে সব ক্ষেত্রে ইঞ্চি-ফিটের এই পরিমাপটা (ذِرَاع) বস্তুর সত্তার মধ্যে পরিগণিত নয়; বরং পারিপার্শ্বিক একটা অবস্থা মাত্র। এতদসত্ত্বেও এ প্রকারের পোশাক বা জায়গা-জমি যদি হাত বা ফিট হিসেবে বিক্রয় করা হয় এবং স্বতন্ত্রভাবে প্রতি হাত বা ফিটের বিপরীতে মূল্য নির্ধারণ করা হয় তখন পরিমাণটা বস্তুর সত্তার (ذَات) মর্যদায় উন্নীত হয় এবং সে কারণে পরিমাণ হ্রাস-বৃদ্ধি হলে দামের মধ্যেও তারতম্য হতে থাকে। উল্লেখ্য যে, প্রস্তাবিত পরিমাণের চেয়ে যখন পণ্য (مَبِيْع) কম বা বেশি হয় তখন মানগতভাবে সেটা বদলে যায়। কেমন যেন এ আর পূর্বে দেখা সেই পণ্য নয়। সে কারণেই তখন ক্রেতার তা গ্রহণ করা বা না করার এখতিয়ার থাকে এবং নিতে চাইলে পরিমাণ হারে মূল্য দিয়ে নিতে হয়।

جَازَ الْبَيْعُ بِحِصَّتِه **-এর আলোচনা ঃ** কারণ প্রতিটি কাপড়ের মূল্য নির্ধারিত থাকায় ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দাম নিয়ে কোনরূপ মনোমালিন্য সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা নেই। সে মতে ক্রেতা দশটির পরিবর্তে যদি নয়টি কাপড় পেয়ে থাকে, তবে এগুলোর সাকুল্য দাম হবে ৯০ টাকা। তথাপি কথার সাথে যেহেতু বাস্তবতার গরমিল দেখা দিয়েছে, সে কারণে উক্ত পণ্য প্রত্যাখ্যান করার এখতিয়ারও ক্রেতার থাকবে। কিন্তু সংখ্যায় বেশি পেলে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা ধরুন যদি এগারোটি হয় তাহলে এ একাদশতম কাপড়টি প্রস্তাবিত পণ্য নয় বিধায় নিশ্চয়ই তা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়নি। সুতরাং এটা বিক্রেতার প্রাপ্য। কিন্তু সে একাদশতম কাপড় কোনটি তা যখন কাপড়ের গায়ে লেখা নেই তথা চিহ্নিত নয়, তখন ক্রেতা স্বভাবতই তন্মধ্যে নিম্নমানের কাপড়টি ফেরত দিতে চাইবে, আর বিক্রেতা চেষ্টা করবে সবচেয়ে ভালোটি বেছে নিতে এবং এভাবে সৃষ্টি হবে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ। এ জন্য ইসলামী শরীয়ত বিরোধ সৃষ্টির পথ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে শুরুতেই বিক্রি ফাসিদ বলে মত দিয়েছে।

وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَمَنْ بَاعَ أَرْضًا دَخَلَ مَا فِيهَا مِنَ النَّخْلِ وَالشَّجَرِ فِي الْبَيْعِ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهِ وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ فِي بَيْعِ الْأَرْضِ إِلَّا بِالتَّسْمِيَةِ- وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا أَوْ شَجَرًا فِيهِ ثَمَرَةٌ فَثَمَرَتُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهَا الْمُبْتَاعُ وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ اِقْطَعْهَا وَسَلِّمِ الْمَبِيْعَ - وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا أَوْ قَدْ بَدَا جَازَ الْبَيْعُ وَ وَجَبَ عَلَى الْمُشْتَرِيْ قَطْعُهَا فِي الْحَالِ فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا عَلَى النَّخْلِ فَسَدَ الْبَيْعُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةً وَيَسْتَثْنِيَ مِنْهَا أَرْطَالًا مَعْلُومَةً -

---

সরল অনুবাদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি বাড়ি বিক্রি করে তবে বাড়িস্থ পাকা ঘর-দুয়ার পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। এবং কেউ ভূমি বিক্রি করলে তাতে বিদ্যমান খেজুর বৃক্ষ ও অন্যান্য গাছপালা বিক্রির মধ্যে শামিল হয়ে যাবে- যদিও তা উল্লেখ না করে। অবশ্য ভূমি বিক্রির ক্ষেত্রে তার ফসলগুলো আলাদাভাবে উল্লেখ করা ব্যতীত বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। যদি কোন ব্যক্তি খেজুর বা অন্য কোন গাছ তাতে ফল থাকা অবস্থায় বিক্রি করে তাহলে ফলগুলো বিক্রেতার থেকে যাবে, তবে ক্রেতা ফলের শর্তারোপ করে থাকলে তা তার প্রাপ্য হবে। (ফল বিক্রেতার জন্য থাকা অবস্থায়) তাকে বলা হবে তুমি ফল পেরে নিয়ে مَبِيْع (অর্থাৎ গাছ) হস্তান্তর কর। বৃক্ষস্থিত ফল খাওয়ার উপযোগী হোক বা না হোক কেউ তা বিক্রি করলে শুদ্ধ হবে এবং ক্রেতার ওপর তখনই সেগুলো পেরে নেয়া আবশ্যক হবে। এ স্থলে সে যদি (কিছু দিনের জন্য) তা গাছে রেখে দেয়ার শর্ত লাগায়, তবে বিক্রয় ফাসিদ হয়ে যাবে। ফল (গাছে থাকা অবস্থায় তা) থেকে নির্দিষ্ট কয়েক পাউন্ড বাদ রেখে বিক্রি করা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ بِنَاؤُهَا الخ -এর আলোচনা ঃ এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, যে সমস্ত সামগ্রী বিক্রিত মালের সাথে অবিচ্ছেদ্য বা স্থায়ীভাবে সংযুক্ত যেমন- দরজায় লাগানো আলতালা, কড়া এবং বাড়িতে নির্মিত পাকা ঘর-দুয়ার; অথবা বিক্রিত পণ্যের পরিপূরক যেমন- তালার জন্য চাবি ও বোতলের জন্য ছিপি ইত্যাদি বিক্রির সময় পৃথকভাবে আলোচনা না করলেও মূল পণ্যের অধীনে হয়ে সেগুলো আপনা-আপনি বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে পরিপূরক বা স্থায়ীরূপে সংযুক্ত না হলে যেমন গৃহস্থিত খাট-পালং ও অন্যান্য আসবাবপত্র এবং ক্ষেতে থাকা ফসলাদি যা সাধারণত বছরে একাধিকবার কাটা পড়ে, তাহলে আলাদাভাবে উল্লেখ করা ছাড়া তা বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হবে না। বিক্রি বা ক্রয়ের ইচ্ছা থাকলে পৃথকভাবে সে কথা উত্থাপন করতে হবে। যেমন বলবে, ধানসহ জমিটা বিক্রি করলাম, আমসহ গাছটা বিক্রি করলাম ইত্যাদি।

وَلَا يَدْخُلُ الزَّرْعُ الخ -এর আলোচনা ঃ ভূমি বিক্রিতে ফসল উহার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ার কারণ হল, বৃক্ষের সাথে ফলের সংযুক্তি দীর্ঘস্থায়ী নয়। সুতরাং বৃক্ষের অধীনে হয়ে এগুলো বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে না। গর্ভবতী পশু বিক্রি করলে পরোক্ষভাবে গর্ভের সন্তানও বিক্রি হয়ে যায় বলে এখানেও সে রকম হতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। কারণ গর্ভে সন্তানের অবস্থান অবিচ্ছেদ্য না হলেও তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার পিছনে মানুষের কোন দখলদারিত্ব থাকে না; বরং নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে আল্লাহ পাকের অপার কুদরতে তা ভূমিষ্ঠ হয়। কিন্তু ফল-ফলাদি পারার পিছনে মানুষের নিয়মিত শ্রম ব্যয় করতে হয়।

وَيُقَالُ لِلْبَائِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ বিক্রেতাকে গাছ খালি করে দেয়ার জন্য নির্দেশ দেয়া হবে। কারণ যিনি ফলের মালিক তিনি তো বৃক্ষের মালিক নন; বৃক্ষ অন্যজনের। সুতরাং ফলের মালিক নিজের মাল (ফল) দ্বারা অপর ব্যক্তির মালিকানাভুক্ত স্থান (বৃক্ষ) আবদ্ধ করে রাখবে কোন যুক্তির বলে? কেননা কারো গুদাম থেকে মাল ক্রয় করার অর্থ এই নয় যে, তা সে গুদামেই রেখে দেয়া যাবে।

وَمَنْ بَاعَ ثَمَرَةً لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا الخ -এর আলোচনা ঃ বৃক্ষস্থিত এমন ফল যা এখনও মানুষ বা পশুর আহার উপযোগী হয়নি। ফলের উপযোগিতা নিরূপণের মানদন্ড কি হবে তা নিয়ে ওলামাদের মাঝে কিছুটা মতানৈক্য রয়েছে। হানাফী আলিমদের মতে, ফল 'নষ্টমুক্ত' হলেই তা 'উপযুক্ত' বলে গণ্য হবে। কিন্তু শাফেয়ী আলিমদের মত হল ফলের মধ্যে 'মিষ্টতা' না আসা পর্যন্ত তাকে 'উপযোগী' বলা যাবে না। সে যাই হোক; অনোপযোগী ফল বিক্রি করা জায়েয। কারণ যে সমস্ত ফলমূল বর্তমান ব্যবহার উপযোগী বা পরে ব্যবহারযোগ্য হবে, তা সবই মালে মুতাকাব্বিম (مَالٌ مُتَقَوَّمٌ) বা অর্থকরী সম্পদের মধ্যে পরিগণিত । কিন্তু ইমামত্রয়ের মতে, উপযুক্ত হওয়ার পূর্বে বিক্রি করা জায়েয নেই।

فَإِنْ شَرَطَ تَرْكَهَا الخ -এর আলোচনা ঃ চুক্তির সময় ক্রেতা যদি কিছু দিনের জন্য ফলগুলো উক্ত গাছে রেখে দেয়ার শর্তারোপ করে, তবে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ এ ধরনের শর্তারোপে এক চুক্তির মধ্যে আরেক নতুন চুক্তির প্রবর্তন ঘটে। কেননা ক্রেতা কর্তৃক আরোপিত এ শর্তের দু'টি অর্থ হতে পারে- (১) ভাড়ার ভিত্তিতে ফলগুলো গাছে থাকবে। ক্রেতা মালিককে ফলগুলো উপযুক্ত হওয়া পর্যন্ত গাছের ভাড়া প্রদান করবে। বস্তুত এটা হল ইজারা চুক্তি। (২) অথবা ধারের ভিত্তিতে থাকতে দেবে। অর্থাৎ গাছগুলো কিছু দিনের জন্য ধারস্বরূপ ক্রেতার অধিকারে থাকবে। উপযুক্ত সময় ফল পারা হয়ে গেলে মালিককে গাছ ফেরত দিয়ে দেবে। বস্তুত এ ধরনের চুক্তিকে إِسْتِعَارَةٌ বলা হয়। ইজারা হোক আর ইস্তি'আরাই হোক প্রত্যেকটিই একটা স্বতন্ত্র চুক্তি। আর কোন চুক্তি পূর্ণাঙ্গ না হতেই তার লেজুড় স্বরূপ অন্য কোন চুক্তি উত্থাপিত ও গৃহীত হলে প্রথম চুক্তিটি ফাসিদ হয়ে যায়। আলোচ্য মাসআলায় যেহেতু ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে তারই লেজুড় আকারে ইজারা বা ইস্তি'আরা-চুক্তি পাকা-পাকি করা হয়েছে, সে কারণে তা ফাসিদ হয়ে গিয়েছে।

তবে হাঁ, ক্রয়-বিক্রয়ের কথা পাকা-পাকি করার পর যদি উভয়ে মিলে ফলের কথা বিবেচনা করে ইজারা কিংবা ইস্তি'আরা চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তবে তা জায়েয হবে।

أَرْطَالًا مَعْلُومَةً الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন বিক্রেতা বলল, এ গাছে যতগুলো বরই আছে তা থেকে দশ কেজি বাদ রেখে অবশিষ্টগুলো একশ' টাকায় বিক্রি করলাম, তবে তা বৈধ হবে না। কারণ এখানে মোট পরিমাণ থেকে দশ কেজি বাদ দিলে অবশিষ্ট কি পরিমাণ থাকে তা নির্ণয় করা কঠিন। তাছাড়া এও তো হতে পারে যে, ফল পারার পর ফলের সর্বসাকুল্য পরিমাণই দাঁড়াবে দশ কেজি! তখন ক্রেতাকে খালি হাতে ফিরে যেতে হবে। অবশ্য ফলগুলো গাছ থেকে পারার পর যদি তা থেকে নির্দিষ্ট কিছু পরিমাণ রেখে বাকি অংশ বিক্রি করে, তবে জায়েয হবে।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ فِي سُنْبُلِهَا وَالْبَاقِلَّى فِي قِشْرِهَا وَمَنْ بَاعَ دَارًا دَخَلَ فِي الْبَيْعِ مَفَاتِيحُ اَغْلَاقِهَا وَأُجْرَةُ الْكَيَّالِ وَنَاقِدُ الثَّمَنِ عَلَى الْبَائِعِ وَأُجْرَةُ وَازِنِ الثَّمَنِ عَلَى الْمُشْتَرِي وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ قِيلَ لِلْمُشْتَرِي اِدْفَعِ الثَّمَنَ اَوَّلًا فَاِذَا دَفَعَ قِيلَ لِلْبَائِعِ سَلِّمِ الْمَبِيعَ وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِسِلْعَةٍ اَوْ ثَمَنًا بِثَمَنٍ قِيلَ لَهُمَا سَلِّمَا مَعًا -

সরল অনুবাদ ঃ ছড়ায় থাকা গম এবং খোসার ভিতর সবজি বিক্রয় করা জায়েয আছে। যদি কেউ ঘর বিক্রি করে তবে ঘরের (দরজায় সংযুক্ত) তালার চাবিগুলোও বিক্রির মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। পণ্য মাপক ও মুদ্রা নিরিক্ষকের মজুরি বিক্রেতার দায়িত্বে; কিন্তু মুদ্রা ওজনকারীর পারিশ্রমিক ক্রেতার ওপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য বিক্রি করলে ক্রেতাকে আগে দাম প্রদান করতে বলা হবে। যখন সে দাম প্রদান করবে তখন বিক্রেতাকে বলা হবে পণ্য হস্তান্তর কর। যদি পণ্যের বিনিময়ে পণ্য অথবা মুদ্রা (যেমন টাকা, পয়সা, স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি) দ্বারা মুদ্রা বিনিময় করে তাহলে (ক্রেতা-বিক্রেতা) উভয়কে বলা হবে তোমরা একই সাথে (সওদা) আদান-প্রদান কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** মোট কথা সুপারি, নারিকেল, বাদাম, বেল, আম ও কাঠাল প্রভৃতি খোসা জাতীয় সামগ্রী খোসায় আবৃত থাকা অবস্থায় বিক্রি করা জায়েয; যদিও খোসা আহার্য নয়। আহার করা হয় কেবলমাত্র ভিতরের শাঁসটুকু। আর এ আলোচ্য অংশটুকুই থেকে যাচ্ছে অজানা। বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার কারণ হল, এ সকল পণ্যসামগ্রী খোসায় থাকা অবস্থায়ও مَال مُتَقَوَّم বা অর্থকরী ফসল হিসেবে পরিগণিত। সে মতে নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাজারজাতকৃত ষ্টিকার বা বোতলে ভরা ঔষধাদি এবং পেকেট, কৌটা ও টিনজাত বিভিন্ন পণ্য ও খাদ্যসামগ্রী হুবহু অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

مَفَاتِيحُ اَغْلَاقِهَا **-এর আলোচনা ঃ** اَغْلَاقٌ শব্দটি غَلَقٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ- তালা। যেহেতু চাবি তালার পরিপূরক অংশ, আর তালা দরজার কাঠে সংযুক্ত এবং দরজা ঘরের অবিচ্ছেদ্য অংশ, সে কারণে ঘর বিক্রি করলে মূলের অধীন হয়ে এসব সামগ্রীও বিক্রির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। গরু বিক্রি করলে তার লেজ বিক্রি না হয়ে কি পারে? তবে দরজা থেকে তালা পৃথক হলে ভিন্নভাবে উল্লেখ করা ছাড়া তালা-চাবি কিছুই বিক্রি হবে না।

اُجْرَةُ الْكَيَّالِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ কায়েল, ওজন, কেজি বা লিটার হিসেবে অথবা গজ, ফিতা বা সংখ্যা অনুযায়ী যদি জিনিসপত্র ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তবে যথার্থ কারণেই মেপে দেয়ার দায়িত্ব বিক্রেতার এবং মাপার জন্য মজুরির ভিত্তিতে কোন লোক নিয়োগ করা হলে কিংবা পরিমাপণ বাবদ অন্য কোন ব্যয় হলে তা বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। কারণ ক্রেতাকে পণ্য বুঝিয়ে দেয়া বিক্রেতার দায়িত্ব। আর নিখুঁত পরিমাপ ব্যতীত বুঝিয়ে দেয়ার সুযোগ কোথায়? একইভাবে মুদ্রা বা টাকা পয়সার আসল-নকল যাচাই (Mony Trial) সংক্রান্ত ব্যয় বিক্রেতাকে বহন করতে হবে। কারণ ক্রেতা তো বিক্রেতার হাতে কোন রকম দাম গুঁজিয়ে বিদায় নিতে পারলেই বাঁচে। মুদ্রার খাঁটি-অখাঁটি অনুসন্ধান করার তাগিদ তার কোথায়? অবশ্য ওজন করে দেয়ার প্রশ্ন দেখা দিলে ওজনের ব্যয় তখন ক্রেতার ওপর বর্তাবে।

وَمَنْ بَاعَ سِلْعَةً بِثَمَنٍ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ক্রেতার ওপর মূল্য হস্তান্তরের দায়িত্ব আগে বর্তায় এবং এর যথেষ্ট যৌক্তিক কারণও রয়েছে। কেননা কোন কিছু নির্দিষ্ট করার যে সকল পন্থা-পদ্ধতি রয়েছে, যেমন-

ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া, মেপে পেকেটজাত করা কিংবা পৃথক করে রাখা ইত্যাদি। এর কোন এক পন্থায় যখন পণ্য বা বিক্রিত মাল নির্দিষ্ট করা হয় তখন তা নির্দিষ্ট হয়ে যায় এবং ক্রেতা কব্জা না করলেও তাতে তার মালিকানা নিশ্চিত ও স্বীকৃত হয়ে পড়ে। কিন্তু টাকা-পয়সার অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন; যতভাবেই তা নির্দিষ্ট করা হোক না কেন পাওনাদারের হাতে না পৌঁছা পর্যন্ত তাতে তার অধিকার নিশ্চিত ও স্বীকৃত হয় না। যেমন- আপনি দোকানে গিয়ে দেখে শুনে এক কপি কুদূরী কিতাব ৬০ টাকায় ক্রয় করলেন। এ স্থলে কপি হাতে না এলেও তাতে আপনার মালিকানা নিশ্চিত ও স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। এখন দোকানদার সেটা অন্য কাউকে দিতে বা বিক্রি করতে পারবে না। পক্ষান্তরে কিতাবের মূল্য আপনার হাতে সে একশত টাকার মধ্যে দোকানির অধিকার এখনো স্বীকৃত বা নিশ্চিত হয়নি। নিশ্চিত তখনই হবে যখন সে তা নিজ আয়ত্তে নেবে। ততক্ষণে ঐ টাকা অন্য কাউকে দিয়ে ভিন্নভাবে টাকার ব্যবস্থা করলেও আপনি দোষী সাব্যস্ত হবেন না। কারণ হাতের মুঠোয় রাখা ৫০ টাকার নোটটি প্রদান করা আর পকেট থেকে বের করে পাঁচটি ১০ টাকার নোট দেয়া একই কথা। এক নোটের পরিবর্তে অন্য নোট দিলে তাতে পাওনাদারের কোনরূপ আপত্তি থাকে না, অথচ কিতাবের দেখানো কপিটির পরিবর্তে অন্য একটি কপি দিলে আপত্তির ঝড় ওঠে। সুতরাং পণ্যের মধ্যে ক্রেতার অধিকার যেমন নিশ্চিত হয়ে আছে, মূল্যের মধ্যে বিক্রেতার অধিকার তেমনি নিশ্চিত ও উভয়ের প্রাপ্তি সমান করতে চাইলে পণ্য করায়ত্ত করার আগে বিক্রেতাকে মূল্য দিয়ে দিতে হবে।

بَابُ خِيَارِ الشَّرْطِ

خِيَارُ الشَّرْطِ جَائِزٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى وَلَهُمَا الْخِيَارُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ فَمَا دُوْنَهَا وَلَايَجُوزُ اَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ اِذَا سُمِّىَ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً - وَخِيَارُ الْبَائِعِ يَمْنَعُ خُرُوْجَ الْمَبِيْعِ مِنْ مِلْكِهٖ فَاِنْ قَبَضَهُ الْمُشْتَرِىْ فَهَلَكَ بِيَدِهٖ فِىْ مُدَّةِ الْخِيَارِ ضَمِنَهُ بِالْقِيْمَةِ وَخِيَارُ الْمُشْتَرِىْ لَايَمْنَعُ خُرُوْجَ الْمَبِيْعِ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ اِلَّا اَنَّ الْمُشْتَرِىْ لَايَمْلِكُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُهُ فَاِنْ هَلَكَ بِيَدِهٖ هَلَكَ بِالثَّمَنِ وَكَذٰلِكَ اِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ وَمَنْ شُرِطَ لَهُ الْخِيَارُ فَلَهُ اَنْ يَّفْسَخَ فِىْ مُدَّةِ الْخِيَارِ وَلَهُ اَنْ يُّجِيْزَهُ فَاِنْ اَجَازَهُ بِغَيْرِ حَضْرَةِ صَاحِبِهٖ جَازَ وَاِنْ فَسَخَ لَمْ يَجُزْ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ الْاٰخَرُ حَاضِرًا وَاِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ بَطَلَ خِيَارُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ اِلٰى وَرَثَتِهٖ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنَّهُ خَبَّازٌ اَوْ كَاتِبٌ فَوَجَدَهُ بِخِلَافِ ذٰلِكَ فَالْمُشْتَرِىْ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ تَرَكَهُ -

খেয়ারে শর্ত-এর অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে শর্তারোপ করে খেয়ার (অর্থাৎ মত প্রত্যাহারের সুযোগ) রাখা ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ের জন্যই জায়েয। তাদের মধ্যে খেয়ারের মেয়াদ হবে তিন দিন বা তার চেয়ে কম। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তারচে' অধিক দুরস্ত নেই। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, দুরস্ত হবে যদি নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ করে নেয়। বিক্রেতার খেয়ার বিক্রিত পণ্যকে তার মালিকানা থেকে বের হতে বিরত রাখে (অর্থাৎ বিক্রেতা তখনও পণ্যটির মালিক থেকে যায়)। সুতরাং যদি ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করে নেয় এবং খেয়ারের সময়কালের মধ্যে তার কাছে সেটা বিনাশ হয়ে যায়, তবে তাকে পণ্যের বাজারমূল্য পরিশোধ করতে হবে। ক্রেতার খেয়ার পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বের হতে বারণ করে না। কিন্তু ক্রেতাও সে পণ্যের মালিক হয় না; (বরং পণ্য উভয় মালিকানার মধ্যবর্তী অবস্থায় থাকে)। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর মত। কিন্তু ইমাম সাহেবাইন (রঃ) বলেন, ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। অতএব যদি (মুদ্দতে খেয়ারের ভিতর) ক্রেতার হেফাজতে তা বিনাশ হয়, তবে দামের বিপরীতে বিনাশ হবে (অর্থাৎ তাকে এর ধার্যকৃত দাম পরিশোধ করতে হবে)। অনুরূপ বিধান যদি তাতে দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হয়। (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে) যার জন্য খেয়ারে শর্ত রাখা হল সে মেয়াদের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি রহিত করতে পারে অথবা বহালও রাখতে পারে। যদি সে দ্বিতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে (কিংবা অজ্ঞাতে) চুক্তি বহাল রাখে তবে তা জায়েয আছে। কিন্তু অপর পক্ষের অজ্ঞাতসারে রহিত করলে দুরস্ত (গ্রাহ্য) হবে না। যার জন্য খেয়ারে শর্ত রয়েছে সে যদি মারা যায়, তবে খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। খেয়ারের এ ক্ষমতা তার ওয়ারিশগণের নিকট (উত্তরাধিকার সূত্রে) স্থানান্তরিত হবে না। যদি কেউ এই বলে গোলাম বিক্রি করে যে, সে রুটি প্রস্তুতকারক কিংবা লেখাপড়ার কাজ জানে। অতঃপর তাকে এর বিপরীত পায়, তবে ক্রেতা ইচ্ছাধীন। চাইলে পূর্ণ দাম দিয়ে গোলাম নিয়ে নেবে অথবা ইচ্ছা করলে ত্যাগ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارُ الشَّرْطِ -এর আলোচনা ঃ خِيَار শব্দের অর্থ– পছন্দ করার অধিকার, স্বাধীনতা, অবকাশ। শব্দটি তার পরবর্তী শব্দের প্রতি ইযাফত হয়েছে। মূলত এ ইযাফত হচ্ছে সববের দিকে হুকুমের ইযাফত। সে মতে পুরো বাক্যের অর্থ দাঁড়াবে– শর্তভিত্তিক স্বাধীনতা বা অবকাশ। অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয় কালে এ মর্মে শর্ত উত্থাপন করা যে, প্রয়োজনবোধে ক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারবে অথবা বিক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে নিতে পারবে। ক্রেতা বা দোকানি কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয় সে জন্য ইসলামী শরীয়ত এ খেয়ারের ব্যবস্থা রেখেছে। ঠক প্রতিকারের সুযোগ থাকায় দোকানদার যেমন ক্রেতাকে ঠকাবার চেষ্টা করবে না, ক্রেতাও তেমনি শঠতার আশ্রয় নিতে যাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, শর্তভিত্তিক খেয়ারের সময়সীমা অনূর্ধ্ব তিনদিন। কেননা সাহাবী হযরত হাব্বান ইবনে মুনকিয (রাঃ) রাসূলে পাক (সাঃ) -এর নিকট যখন অভিযোগ করলেন– "হে আল্লাহর নবী! আমি প্রায়শই ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতারণার শিকার হই।" তখন নবী করীম (সাঃ) তাকে বলে দিলেন– তুমি বেচাকেনার সময় এরূপ বলে নেবে যে, "لَاخِلَابَةَ وَلِى الْخِيَارُ ثَلٰثَةَ اَيَّامٍ" অর্থাৎ "ধোঁকাবাজির অবকাশ নেই, তিন দিন পর্যন্ত আমার খেয়ার থাকবে।" এ হাদীস দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয় যে, খেয়ারের মেয়াদ হল তিনদিন।

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, খেয়ারের সময়কাল সর্বোচ্চ দুই মাস পর্যন্ত হতে পারে। তবে তা উভয়ে মিলে কারবারের সময় নির্দিষ্ট করে নিতে হবে। তাঁরা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ)-এর ফতোয়া সম্বলিত হাদীস দ্বারা দলিল পেশ করেন।

জরুরি জ্ঞাতব্য ঃ খেয়ারে শর্ত সম্বন্ধে মৌলিক কয়েকটি কথা জেনে রাখা প্রয়োজন ঃ (ক) খেয়ারের সময়সীমা নির্ধারিত হতে হবে। (খ) তৃতীয় কাউকে উক্ত খেয়ার প্রদান করা হলে ক্রেতা-বিক্রেতার খেয়ার তাতে শেষ হয়ে যাবে না। (গ) ধার্যকৃত মেয়াদের মধ্যে যদি জবাব না মিলে, তবে ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত ও খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় মাল ফেরত দিতে বা নিতে হলে দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি জরুরি। (ঘ) যার খেয়ার রাখা হল সে আপন মতামত মৌখিকভাবে প্রকাশ না করে যদি এমন কোন আচরণ দ্বারা প্রকাশ করে, যাতে হাঁ-বোধক সাড়া বুঝে আসে, তবে তাও দুরস্ত আছে। যেমন– ক্রয়কৃত পণ্য ছিল কোর্তা, তা গায়ে পরিধান করতে আরম্ভ করল। (ঙ) খেয়ারে শর্তের ভিত্তিতে ক্রয়কৃত পণ্য ক্রেতা ব্যবহার করতে শুরু করলে তা আর ফেরত দিতে পারবে না। কিন্তু যদি এ ব্যবহার পরীক্ষামূলক ও খুব সীমিত সময় হয় এবং এতে মালের মধ্যে কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি না হয়, তবে ফেরত দিতে পারবে। যেমন– ঘড়ি কিনে দু'এক দিন হাতে দিয়ে অথবা টুপি কিনে মাথায় দিয়ে দেখে নিল। (চ) খেয়ারে শর্তের সময়সীমার মধ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা যে কেউ মারা গেলে খেয়ার বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ যদি বিক্রেতা মৃত্যুবরণ করে তবে ক্রেতা নিজ এখতিয়ার বলে দ্রব্য ফেরত দিতে পারবে না এবং একইভাবে ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে বিক্রেতা আপন এখতিয়ার বলে তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। তেমনিভাবে মৃতের ওয়ারিশগণও তখন দ্রব্য ফেরত নিতে বা দিতে পারবে না।

দশ প্রকার মু'আমালায় খেয়ারে শর্ত অচল। যথা– ১. বিবাহ, ২. তালাক, ৩. কসম, (يَمِيْن) ৪. নযর-মানত, ৫. সরফ বেচাকেনা, ৬. বাইয়ে সলম, ৭. ইক্বরার, ৮. উকিল নিয়োগ, ৯. অসিয়ত এবং ১০. হিবা।

يَجُوْزُ اِذَا سَمّٰى الخ -এর আলোচনা ঃ আলোচনার ভিত্তিতে তিন দিনের অধিকও খেয়ার রাখা যেতে পারে। কারণ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) খেয়ারের সময়সীমা দু'মাস পর্যন্ত অনুমোদন করেছেন। খেয়ারে শর্তের মেয়াদের ব্যাপারে ইমাম সাহেব ও সাহেবাইন (রঃ) -এর মতপার্থক্য খুব সম্ভব স্থান-কাল অথবা পণ্যের গুরুত্বভেদে হয়ে থাকবে। অর্থাৎ সাধারণ পণ্যের বেলায় তিন দিনের বেশি সময়ের দরকার নেই। কিন্তু কোন বিশেষ পণ্যের ক্ষেত্রে তিন দিন পর্যাপ্ত নয়।

وَخِيَارُ الْبَائِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ বিক্রেতার জন্য খেয়ার থাকা অবস্থায় ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করলেও তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং তখনো বিক্রেতার মালিকানায় থেকে যায়। কারণ পণ্য বিক্রেতার মালিকানামুক্ত হওয়ার পূর্বশর্ত হল বিক্রি চূড়ান্ত হওয়া। আর বিক্রি চূড়ান্ত হয় ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের পূর্ণ সম্মতিক্রমে। অথচ এখানে বিক্রেতার জন্য খেয়ার থাকায় তার দিকের সম্মতি এখনো পূর্ণাঙ্গ হয়নি। সুতরাং পণ্যের মালিক সেই থেকে যাবে। এমতাবস্থায় ক্রেতা যদি পণ্য নিজ হেফাজতে নিয়ে আসে এবং খেয়ার চলাকালীন সময়ের মধ্যে সেটা ধ্বংস কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়, তবে মালিককে পণ্যের বাজারমূল্য প্রদান করতে হবে; নিজেদের স্থিরকৃত দাম দিলে চলবে না। কারণ পণ্য ধ্বংস হয়ে গেলে বিক্রয়-চুক্তি ভেঙে যায়। কেননা পণ্যই হল ক্রয়-বিক্রয়ের মূলভিত্তি। মূলেরই যখন অস্তিত্ব নেই, তখন বিক্রেতা বিক্রির পক্ষে চূড়ান্ত মত ব্যক্ত

করে কিরূপে বিক্রয় কার্য সমাধা করতে পারে? আর বিক্রয়-চুক্তি বর্জিত হলে নিয়ম হল বিক্রেতাকে পণ্য ফিরিয়ে দেয়া। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পণ্য বিনষ্ট হয়ে গেছে বিধায় তা সম্ভব নয়। কাজেই বিক্রেতাকে এর বাজারমূল্য প্রদান করাই ন্যায়সঙ্গত সমাধান।

وَخِيَارُ الْمُشْتَرِي الخ **-এর আলোচনা ঃ** ক্রেতার জন্য খেয়ার থাকা অবস্থায় পণ্য বিক্রেতার মালিকানা থেকে বেরিয়ে চলে আসলেও ক্রেতার মালিকানায় তা প্রবেশ করে না। কারণ ক্রেতার জন্য খেয়ার রাখার অর্থই হচ্ছে পণ্যটির সে মালিক হবে কি না এ ব্যাপারে তার ঢের বুঝা-পড়া রয়েছে। তদুপরি যদি বলা হয় সে পণ্যের সে মালিক হয়ে গিয়েছে, তবে তার খেয়ার রাখার স্বার্থকতা কোথায়? এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যাবে। কেননা এ স্থলে যদি ক্রেতার মালিকানা (স্বত্ব) স্বীকার করা না হয়, তবে অনিবার্য কারণেই পণ্যটা মালিকানাবিহীন হয়ে পড়ে। অথচ পণ্য মালিকানাবিহীন পড়ে থাকার কোন রীতি নেই। মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলাফল এই দাঁড়াবে যে, মেয়াদকালীন সময়ে ক্রেতার নিকট পণ্য ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে খেয়ার বাতিল হয়ে চুক্তি পূর্ণাঙ্গ সাব্যস্ত হবে এবং বিক্রেতাকে এর নির্ধারিত দাম প্রদান করতে হবে।

وَكَذَالِكَ اِنْ دَخَلَهُ عَيْبٌ الخ **-এর আলোচনা ঃ** পণ্য ক্রেতার কব্জায় আসার পর তা দোষমুক্ত হওয়া আর ধ্বংস হওয়া একই কথা। অর্থাৎ উভয় ক্ষেত্রেই তা আর ফেরতযোগ্য থাকে না। এমতাবস্থায় খেয়ার বহাল থাকার মধ্যে কোন স্বার্থকতা নেই বিধায় খেয়ার বাতিল হয়ে আপনা-আপনি বিক্রি চূড়ান্তরূপ ধারণ করে এবং ক্রেতা পণ্যের মালিক হয়ে যায়। উল্লেখ থাকে যে, ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মিলে পণ্যের যে মূল্য স্থির করে তাকে ثَمَن (দাম) বলে, আর বাজারে যে দর থাকে তাকে قِيْمَة (মূল্য) নামে অভিহিত করা হয়।

فَاِنْ اَجَازَهُ بِغَيْرِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এ মত মূলত তরফাইন (রঃ)-এর। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও শাফেয়ী (রঃ) বলেন, বহাল রাখা ও বর্জিত করার মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অর্থাৎ দ্বিতীয় পক্ষকে না জানিয়ে চুক্তি বহাল রাখা যেমন জায়েয, তেমনি বর্জিত করাও জায়েয। তরফাইনের যুক্তি হল, খেয়ার গ্রহীতা বিক্রয় চুক্তি বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নিলে তাতে দ্বিতীয় পক্ষের লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই। এ জন্য বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত তাকে না জানালেও চলবে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় পক্ষের অজ্ঞাতসারে চুক্তি বাতিল করা হলে তাতে তার ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যেমন– জানতে পারলে সে হয়তো পণ্যটা অন্য গ্রাহকের নিকট লাভজনক মূল্যে বিক্রি করতে পারত অথবা অন্য কারো কাছ থেকে সুলভ মূল্যে কিনে নিতে পারত। কিন্তু চুক্তি বাতিল করার সংবাদ না জানায় সে সুযোগ কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। সুতরাং চুক্তি বাতিল করলে অবশ্যই সে কথা দ্বিতীয় জনকে জানাতে হবে, নতুবা তা গ্রাহ্য হবে না। মূলত এরই ওপর ফতোয়া।

وَاِذَا مَاتَ مَنْ لَهُ الْخِيَارُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে যার পক্ষে খেয়ার রয়েছে সে মারা গেলে খেয়ার বাতিল হয়ে বিক্রি চূড়ান্তরূপ লাভ করে। কেননা মৃত্যুর কারণে সে নিজে যেমন খেয়ার প্রয়োগ করে বিক্রি বাতিল করতে পারে না, তেমনি তার ওয়ারিশগণও উত্তাধিকার সূত্রে খেয়ার লাভ করে না। বিধায় চুক্তি বাতিল রহিত করার ক্ষমতা রাখে না। কাজেই এ পরিস্থিতিতে মৃতের দিক থেকে বিক্রি চূড়ান্ত ও আবশ্যকীয় বলা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

بَابُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ

وَمَنِ اشْتَرٰى مَالَمْ يَرَهُ فَالْبَيْعُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَأٰهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَمَنْ بَاعَ مَالَمْ يَرَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ - وَإِنْ نَظَرَ إِلٰى وَجْهِ الصُّبْرَةِ أَوْ إِلٰى ظَاهِرِ الثَّوْبِ مَطْوِيًّا أَوْ إِلٰى وَجْهِ الْجَارِيَةِ أَوْ إِلٰى وَجْهِ الدَّابَّةِ وَكَفَلِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ - وَإِنْ رَأٰى صَحْنَ الدَّارِ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يُشَاهِدْ بُيُوتَهَا - وَبَيْعُ الْأَعْمٰى وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ وَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا اشْتَرٰى وَيَسْقُطُ خِيَارُهُ بِأَنْ يَجُسَّ الْمَبِيْعَ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالْجَسِّ أَوْ يَشُمَّهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالشَّمِّ أَوْ يَذُوقَهُ إِذَا كَانَ يُعْرَفُ بِالذَّوْقِ وَلَا يَسْقُطُ خِيَارُهُ فِي الْعِقَارِ حَتّٰى يُوْصَفَ لَهُ - وَمَنْ بَاعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَجَازَ الْبَيْعَ وَإِنْ شَاءَ فَسَخَ وَلَهُ الْإِجَازَةُ إِذَا كَانَ الْمَعْقُوْدُ عَلَيْهِ بَاقِيًا وَالْمُتَعَاقِدَانِ بِحَالِهِمَا - وَمَنْ رَأٰى أَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَاشْتَرَاهُمَا ثُمَّ رَأَى الْآخَرَ جَازَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُمَا - وَمَنْ مَاتَ وَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ بَطَلَ خِيَارُهُ وَمَنْ رَأٰى شَيْئًا ثُمَّ اشْتَرَاهُ بَعْدَ مُدَّةٍ فَإِنْ كَانَ عَلَى الصِّفَةِ الَّتِيْ رَأٰهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ -

খেয়ারে রুইয়াত-এর অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এমন জিনিস ক্রয় করল যা সে দেখেনি, তবে তা জায়েয আছে এবং দেখার পর তার স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে (ধার্যকৃত পূর্ণ দাম দিয়ে) উহা গ্রহণ করবে অথবা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু যে না দেখা জিনিস বিক্রি করল তার স্বাধীনতা নেই। আর যদি (ক্রয় করার সময়) স্তূপের উপরিভাগ কিংবা থান কাপড়রের বহির্ভাগ অথবা দাসীর মুখমন্ডল অথবা সওয়ারির সম্মুখাংশ ও পাছা দেখে নেয়, তবে তার খেয়ারে রুইয়াত বাকি থাকবে না। (এভাবে) যদি কক্ষসমূহ না দেখে শুধুমাত্র ঘরের বারান্দা দেখে নেয়, তবে তার খেয়ারে রুইয়াত থাকবে না। অন্ধ লোকের ক্রয়-বিক্রয় উভয়ই জায়েয। যখন সে ক্রয় করবে তার খেয়ার হাসিল হবে। (কিন্তু বিক্রি করলে খেয়ার হাসিল হবে না।) অন্ধের খেয়ার লুপ্ত হয়ে যাবে পণ্য স্পর্শ দ্বারা যদি তা (ভালো-মন্দ) স্পর্শ দ্বারা উপলব্ধি করা যায়, অথবা তার ঘ্রাণ নিলে যখন তা ঘ্রাণের সাহায্যে অনুধাবন করা যায়, অথবা আস্বাধন করলে যখন তা আস্বাদন দ্বারা অনুমান করা যায়। স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে অন্ধের খেয়ারে রুইয়াত বিলুপ্ত হবে না যতক্ষণ না তার নিকট সম্পত্তির বিশদ বিবরণ দেয়া হবে। যদি কেউ অন্যের জিনিস তার অনুমতি ছাড়া বিক্রি করে, তবে মালিকের স্বাধীনতা রয়েছে, ইচ্ছা করলে সে (সম্মতি দানের মাধ্যমে) বিক্রয় বলবৎ রাখবে অথবা ইচ্ছা করলে রহিত করে দেবে। তবে সে তখনই বিক্রি বলবৎ রাখার সুযোগ পাবে যখন পণ্য অক্ষত এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে বহাল তবিয়তে থাকে। যে ব্যক্তি এক জোড়া কাপড়ের একটি দেখেই উভয়টি (একসাথে) ক্রয় করে নিল অতঃপর দ্বিতীয়টি দেখল, তবে (মনঃপূত না হলে) সে দু'টোই ফেরত দিতে পারবে। যে নিজের খেয়ারে রুইয়াত থাকা অবস্থায় মারা গেল, তার খেয়ার বাতিল হয়ে যাবে (এবং বিক্রয় চূড়ান্ত ও আবশ্যকীয় সাব্যস্ত হবে)। যদি কোন ব্যক্তি কোন দ্রব্য দেখার কিছুকাল পর তা ক্রয় করে, তবে যদি তা ঐ গুণাগুণের ওপর (অপরিবর্তিত) থাকে, যা সে দেখেছিল; তাহলে তার জন্য স্বাধীনতা থাকবে না। কিন্তু যদি পরিবর্তিত পায়, তবে তার স্বাধীনতা থাকবে (অর্থাৎ তখন ইচ্ছা করলে খেয়ারে রুইয়াতের ক্ষমতাবলে দ্রব্যটি ফিরিয়ে দিতে পারবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارُ الرُّؤْيَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ উল্লেখ্য যে, بَيْع কখনো লাযেম হয় আবার কখনো লাযেম হয় না। লাযেম হল, যাতে بَيْع -এর শর্তসমূহ বিদ্যমান থাকে এবং তাতে কোন প্রকারের খেয়ার থাকে না। আর غَيْر لَازِم হল, যাতে خِيَار বিদ্যমান থাকে। তবে بَيْع غَيْر لَازِم হতে بَيْع لَازِم অধিক শক্তিশালী।

خِيَار الرُّؤْيَة চার জায়গায় হতে পারে। ১. اَعْيَان -এর ذَوَات -এর ক্রয়ের সময়, ২. اِجَارَة -এর মধ্যে, ৩. قِسْمَت -এর মধ্যে, ৪. এমন সন্ধিতে যে, সম্পদ دَعْوٰى -এর দ্বারা কোন নির্দিষ্ট জিনিসের ওপর হয়ে থাকে। কাজেই دُيُوْن এবং نُقُوْد ও যে সকল عَقْد ভঙ্গ করার দ্বারা ভঙ্গ হয় না, তাতে خِيَار رُؤْيَة সাব্যস্ত হবে না। যথা- মোহর, بَدَل خَلْع ইত্যাদি।

খেয়ার রুইয়াত প্রসঙ্গে কয়েকটি মৌলিক কথা ঃ (ক) খেয়ারে রুইয়াতের সুবিধা শুধুমাত্র ক্রেতার জন্য; বিক্রেতার জন্য নয়। (খ) নমুনা (Sample) দেখে কোন বস্তু ক্রয় করে থাকলে পরে তা আর ফেরত দেয়া যাবে না। নমুনার সাথে অমিল পরিলক্ষিত হলে অবশ্য ফেরত দিতে পারবে। (গ) যে সমস্ত পণ্যসামগ্রী নমুনা দেখে অনুমান করা যায় না, সেগুলো নমুনা দেখে ক্রয় করলেও 'খেয়ারে রুইয়াত' থেকে বঞ্চিত হবে না। যেমন- একটি ছাগল দেখে এক পাল ছাগল ক্রয় করা। কারণ ছাগল পরস্পরে পূর্ণ সাদৃশ্য নয়; বিধায় একটি দেখে বাকিগুলো অনুমান করা যায় না। (ঘ) পানাহার সামগ্রী শুধু চোখে দেখাই যথেষ্ট হবে না; বরং আস্বাদনের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়ারও এখতিয়ার রয়েছে। তবে স্বাদ গ্রহণ অবশ্যই বিক্রেতার অনুমতিক্রমে হতে হবে। (ঙ) দেখা এবং ক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে যদি দ্রব্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন স্টেশনে রাখা মাল বৃষ্টিতে ভিজে গেল, তাহলে এখতিয়ার বহাল থাকবে।

وَمَنْ بَاعَ مَا لَمْ يَرَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ বিক্রেতার জন্য খেয়ারে রুইয়াতের সুবিধা স্বীকৃত নয়। কারণ হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত ওসমান (রাঃ) তাঁর বসরায় অবস্থিত এক খন্ড জমি ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রাঃ) -এর নিকট বিক্রি করেন। জনৈক ব্যক্তি ত্বালহাকে "সে জমি কিনে ঠকেছ" বলে মন্তব্য করলে তিনি জওয়াব দিলেন "তাতে কি? আমার তো খেয়ারে রুইয়াত রয়েছে"। এদিকে হযরত ওসমান (রাঃ) -কেও যখন বলা হল আপনি জমি বিক্রি করে ঠকেছেন, তখন তিনিও ঠিক একই উত্তর করলেন। অবশেষে এ ঘটনা মীমাংসার দায়িত্ব হযরত যুবায়ের ইবনে মুত্বইম (রাঃ)-এর ওপর বর্তালে তিনি ত্বালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহর জন্য খেয়ারে রুইয়াতের ফয়সালা করেন। এতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, খেয়ার রুইয়াত কেবলমাত্র ক্রেতার প্রাপ্য।

وَاِنْ نَظَرَ اِلٰى وَجْهِ الصُّبْرَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ খেয়ারে রুইয়াত রহিত হওয়ার জন্য পণ্যের আগাগোড়া নিখুঁত ভাবে দেখে নেয়া শর্ত নয়, আর এটা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবও নয়। সুতরাং এ স্থলে মূলনীতি হল, পণ্যের সেসব গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেখে নেয়াই যথেষ্ট যদ্দারা তার অভীষ্ট দিক সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা অর্জিত হয়। সুতরাং এদিক থেকে পণ্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

প্রথমতঃ এমন পণ্য যার একক সমূহের পরস্পরের তেমন কোন পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য নেই যেমন- ধান, চাল, গম প্রভৃতি কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্যসামগ্রী। এ শ্রেণীর পণ্য ক্রয় করার সময় তার কিছু অংশ বা যে কোন দু'একটি দেখে নিলেই খেয়ার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তবে বাকি পণ্যগুলো যদি তদপেক্ষা নিম্ন মানের হয়, তবে খেয়ার বাকি থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ এমন পণ্য যার একক সমূহের পরস্পরে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বা অসামঞ্জস্য বিদ্যমান রয়েছে। যেমন- জীব-জন্তু, হাঁস-মোরগ, বাঙ্গি, তরমুজ, আম, কাঠাল ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি। এ শ্রেণীর পণ্য ক্রয় করার সময় এর যে কোন দু' এক ফর্দ (Piece) দেখে নিলে খেয়ার শেষ হবে না।

সে মতে শস্যস্তূপের উপরিভাগ দর্শনই অবিশিষ্ট শস্যের মান নির্ণয়ের জন্য যথেষ্ট। এভাবে থান কাপড়ের বহির্ভাগ অর্থাৎ সীল-মোহর দেখলেই বাকি কাপড় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা জন্মে। ভিতরের অংশে সীল-মোহর থাকলে সেটাও দেখে নেয়া যেতে পারে। এভাবে দাস-দাসীর ক্ষেত্রে তাদের মুখমন্ডল এবং জীব-জন্তুর ক্ষেত্রে সেগুলোর সম্মুখভাগ ও নিতম্ব হচ্ছে উদ্দিষ্ট ও দর্শনীয় বিষয়। পশু দিয়ে জমি কর্ষণ বা গাড়ি চালানোর ইচ্ছা থাকলে তাও দেখে নেয়া প্রয়োজন। দেখে না থাকলে খেয়ার বলবৎ থাকবে।

وَاِنْ رَاٰى صَحْنَ الدَّارِ الخ -এর আলোচনা ঃ এটা মূলত তৎকালীন অবস্থা অনুযায়ী বলা হয়েছে। কারণ তখন গৃহের বহিরভাগ ও অভ্যন্তরভাগ একই মানের হত। বর্তমান পরিস্থিতিতে ভিতরের অংশ এমনকি রান্নাঘর ও গোসলখানাসহ দেখে না নিলে খেয়ার অবশিষ্ট থেকে যাবে।

وَلَهُ الْخِيَارُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ যেসব উপায়ে পণ্যের ভালো-মন্দ অনুমান করা যায় কোন অন্ধ যদি সেসব উপায় অবলম্বন ছাড়া দ্রব্য ক্রয় করে, তবে তার خِيَار رُؤْيَة থেকে যাবে। অন্ধের যদিওবা দৃষ্টিশক্তি নেই কিন্তু কোন

কিছু যাচাই করার জন্য চক্ষুই তো কেবল একমাত্র মাধ্যম নয়। অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেও সে উদ্দেশ্য পূরণ হতে পারে। যেমন- হাত দ্বারা স্পর্শ করা, নাক দ্বারা ঘ্রাণ নেয়া ইত্যাদি।

حَتّٰى يُوْصَفَ لَهُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এখানে বিশদ বিবরণ বলতে জমির দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অবকাঠামো, অবস্থান, সেচ ও অন্যান্য সুবিধাদির কথা সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দেয়া উদ্দেশ্য। গাছ-পালা ও গাছে থাকা ফল-ফলাদির বেলায়ও একই নিয়ম প্রযোজ্য। তবে অন্ধ লোকের পক্ষে বিশ্বস্ত উকিল বা প্রতিনিধির মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করাই সর্বাধিক উত্তম।

বিঃ দ্রঃ অন্ধ ব্যক্তি বারোটি মাসআলা ব্যতীত বাকি সকল ক্ষেত্রে চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সমান। অন্ধের ওপর (১) জিহাদ, (২) জুমুআ, (৩) জামাআত (৪) ও হজ্জ ফরয নয়। (৫) সাক্ষী, (৬) বিচারক ও (৭) রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে না। (৮) তার চোখের দিয়ত নেই, (৯) আযান (১০) ও একামত মাকরূহ (বড় আলিম হলে তা ভিন্ন কথা)। (১১) তার জবাইকৃত পশু মাকরূহ (১২) এবং অন্ধ গোলাম কাফ্ফারা স্বরূপ মুক্ত করা যায় না।

وَلَهُ الْإِجَازَةُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এ ইবারতে মূলত মওকুফ ক্রয়-বিক্রয়ের একটি মাসআলা বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ যদি কেউ অন্যের জিনিস তার বিনা অনুমতি বিক্রি করে দেয়, তবে তার কার্যকারিতা মালিকের অনুমতির ওপর স্থগিত থাকবে। ইচ্ছা করলে সে বিক্রি বহাল রাখতে পারে এবং ইচ্ছা করলে ভেঙ্গেও দিতে পারে। তবে তার অনুমতি তখনই যথার্থ ও গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হবে, যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে জীবিত থাকে এবং ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে তারা নিজেদের মতের ওপর ঠিক থাকে এবং সর্বোপরি পণ্যটাও মওজুদ থাকে। এর ব্যতিক্রম হলে বিক্রয় অনুমোদন করতে পারবে না; বরং তখন পণ্য ফেরত নিয়ে নেবে কিংবা ভর্তুকি গ্রহণ করবে। উল্লেখ্য যে, মওকূফ বিক্রির ক্ষেত্রে মালিক পণ্যের দাম গ্রহণ করা তার মৌখিক অনুমতেরই সমতুল্য।

خِيَارُ الرُّؤْيَةِ **-এর ব্যাপারে মতবিরোধ ঃ** যদি কোন ব্যক্তি না দেখে কোন কিছু ক্রয় করে, তাহলে এ ক্রয়-বিক্রয় আহনাফের মতে বৈধ হবে। তাবে ক্রেতা তা দেখার পর তার জন্য তাতে اِخْتِيَار থাকবে। যদি সে ইচ্ছে করে তবে পূর্ণ টাকা প্রদান করে তা নিয়ে নেবে অথবা ফেরত দেবে।

ইমাম শাফেয়ী (রঃ) বলেন, এমতাবস্থায় বেচাকেনা বৈধ নয়। কেননা ক্রেতা যখন তা দেখল না, তখন مَبِيْع টা ক্রেতার নিকট অজ্ঞাত রইল। আর অজ্ঞাত জিনিসের বেচাকেনা অবৈধ, বিধায় না দেখে ক্রয়-বিক্রয় করাও অবৈধ।

আহনাফ স্বীয় সমর্থনে হাদীসে নববীর (সাঃ) দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন। হাদীসে রয়েছে- مَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَلَهُ الْخِيَارُ إِذَا رَآهُ . অর্থাৎ "যে ব্যক্তি কোন কিছু না দেখে ক্রয় করল তখন তা দেখার পর ক্রেতার জন্য خِيَار থাকবে।" এ হাদীস না দেখে ক্রয়-বিক্রয় করাকে বৈধ বলে ঘোষণা দিয়েছে।

আহনাফের عَقْلِي দলিল হল, না দেখে ক্রয় করলে যেহেতু ক্রেতার জন্য خِيَار সাব্যস্ত হয়, আর خِيَار সাব্যস্ত হওয়ার ফলে তা مُفْضِيْ إِلَى الْمُنَازَعَةِ বা ঝগড়ার দিকে নিয়ে যায় না। আর যে বস্তু ঝগড়ার দিকে নিয়ে যায় না, তা অজ্ঞাত হলেও বেচাকেনাতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, না দেখে কোন কিছু ক্রয়-বিক্রয় করলে তা বৈধ হবে এবং ক্রেতার জন্য خِيَار থাকবে, অর্থাৎ ক্রেতা তা দেখার পর ইচ্ছা করলে ফিরিয়ে দিতে পারবে এবং ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ মূল্য দিয়ে তা নিজের মালিকানায়ও নিয়ে নিতে পারবে।

وَإِنْ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا فَلَهُ الْخِيَارُ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন- স্টেশনে রাখা খাদ্যসামগ্রী প্রথম যখন দেখে ছিল তখন শুকনো ছিল, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়ের কথা চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বেই তা বৃষ্টিতে ভিজে গেল। ক্রেতা যদিওবা দেখেই কিনেছে কিন্তু মধ্যখানে এগুলো ভিজে নষ্ট হওয়ায় হুবহু সে পণ্য আর নেই; কেমন যেন না দেখা সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। সুতরাং খেয়ারে রুইয়াত থেকে যাবে। উল্লেখ্য যে, পণ্য পরিবর্তিত হয়েছে কিনা তা নিয়ে যদি ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহলে বিক্রেতা শপথ করে যা বলবে তাই অগ্রাধিকার পাবে। কিন্তু পণ্য দেখা ও ক্রয়-চুক্তির মাঝে দীর্ঘ সময়ের ব্যবধান হলে তখন ক্রেতার দাবিকে তার কসমের ভিত্তিতে প্রাধান্য দেয়া হবে।

بَابُ خِيَارِ الْعَيْبِ

إِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِىْ عَلٰى عَيْبٍ فِى الْمَبِيْعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُمْسِكَهُ وَيَأْخُذَ النُّقْصَانَ وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ نُقْصَانَ الثَّمَنِ فِىْ عَادَةِ التُّجَّارِ فَهُوَ عَيْبٌ وَالْإِبَاقُ وَالْبَوْلُ فِى الْفِرَاشِ وَالسَّرِقَةُ عَيْبٌ فِى الصَّغِيْرِ مَالَمْ يَبْلُغْ فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعَيْبٍ حَتّٰى يُعَاوِدَهُ بَعْدَ الْبُلُوْغِ وَالْبَخَرُ وَالذَّفَرُ عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ وَلَيْسَ بِعَيْبٍ فِى الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ مِنْ دَاءٍ وَالزِّنَا وَ وَلَدُ الزِّنَا عَيْبٌ فِى الْجَارِيَةِ دُوْنَ الْغُلَامِ -

খেয়ারে আয়েব-এর অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ যখন ক্রেতা ক্রয়কৃত পণ্যের কোন দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবগত হবে তখন তার ইচ্ছা, যদি চায় পূর্ণ দামে পণ্য নিয়ে নেবে, নতুবা তা ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু তার জন্য পণ্য রেখে দিয়ে (বিক্রেতা থেকে) ক্ষতিপূরণ আদায় করা দুরস্ত নেই। (দ্রব্যস্থিত) ঐ সকল খুঁত যা ব্যবসায়ীদের রীতি মোতাবেক তার মূল্যহ্রাস ঘটায়, তাকে আয়েব বা দোষ বলা হয়। (সে মতে) পলায়ন করা, বিছানায় পেশাব করা এবং চুরি করা বাচ্চার ক্ষেত্রে দোষ যতক্ষণ না সে বালেগ হয়; কিন্তু বালেগ হওয়ার পর (প্রকাশ পেলে) তা দোষ হিসেবে পরিগণিত হবে না যতক্ষণ না তা পুনরায় করে। ক্রীতদাসীর ক্ষেত্রে তার মুখ কিংবা বগলের দুর্গন্ধ দোষ; কিন্তু গোলামের ক্ষেত্রে তা যদি কোন রোগ-ব্যধির কারণ না হয় তবে দোষ নয়। (এভাবে) ব্যভিচারিণী কিংবা জারজ হওয়া বাঁদির বেলায় দোষ গোলামের ক্ষেত্রে নয়। (অর্থাৎ এরূপ দুর্গন্ধ বা কুকর্মের দরুন বাঁদি ফেরত দেয়া গেলেও গোলাম ফেরত দেয়া যাবে না।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خِيَارُ الْعَيْبِ الخ -এর আলোচনা ঃ ক্রয়কৃত পণ্যে বা টাকায় কোন দোষ-ত্রুটি থাকলে ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য তা ফেরত দেয়ার এখতিয়ার রয়েছে। ফিক্‌হের পরিভাষায় একে 'খেয়ারে আয়েব' বা দোষজনিত সুবিধা বলে। এক্ষেত্রে বিক্রেতার নৈতিক দায়িত্ব হল, পণ্যের দোষ-গুণ পূর্ব থেকেই সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেয়া। ধোঁকা দিয়ে খারাপ মাল বিক্রি করা কিংবা মূল্য হিসেবে অচল বা জাল নোট প্রদান করাও পরিষ্কার হারাম এবং জঘন্য অন্যায়। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এতে শক্ত গুনাহগার হবে। মহানবী (সাঃ) একদিন খাদ্যশস্যের দোকানে গিয়ে স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দেখতে পেলেন যে, অভ্যন্তর ভাগের শস্যে কিছুটা আদ্রতা রয়েছে। তখন তিনি দোকানিকে জিজ্ঞাসা করলেন, "কি ব্যাপার?" সে বলল, "বৃষ্টিতে ভিজে গেছে।" তিনি বললেন, "ভিজা শস্য ওপরে রাখলে না কেন তাহলে তা লোকজন সহজে অনুমান করতে পারত এবং ধোঁকা থেকে বাঁচতে পারত।" অতঃপর তিনি ঘোষণা দিলেন– مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا অর্থাৎ যারা প্রতারণার আশ্রয় নেয় তারা আমার উম্মত নয়। — (মুসলিম শরীফ)।

إِذَا اطَّلَعَ الْمُشْتَرِىْ الخ -এর আলোচনা ঃ ক্রয়কৃত বস্তুতে দোষ-ক্রটি দেখা দেয়ার পর তা ফিরিয়ে দেয়া বা পূর্ণ মূল্য নেয়ার ক্ষেত্রে إِخْتِيَار থাকার কারণ হল, মতলক আক্বদের চাহিদা হল, তা ক্রটিমুক্ত হওয়া। তবে এ خِيَار টা কয়েকটি শর্তের সাথে সম্পৃক্ত। (১) সে ক্রটি বিক্রেতার নিকট থাকতেই ছিল, ক্রেতার হস্তক্ষেপের পর সৃষ্টি হয়নি। (২) ক্রেতার ক্রয় করার সময় ক্রটি সম্পর্কে অনবগত হওয়া (৩) এবং হস্তগত করার সময়ও সে ক্রটি সম্পর্কে অজ্ঞাত থাকা। (৪) ক্রেতা কষ্ট ব্যতীত ক্রটি বিদূরীত করতে সক্ষম না হওয়া। (৫) এ ক্রটি এবং সকল ক্রটিমুক্ত হওয়ার শর্ত যদি না করা হয় এবং আক্বদ ভঙ্গ হওয়ার পূর্বে তা দূর হওয়া যদি সম্ভব না হয়।

وَكُلُّ مَا أَوْجَبَ الخ -এর আলোচনা ঃ পণ্য দ্রব্যের যে কোন দোষ-ক্রটিকে মনগড়া ভাবে 'দোষ' বলে অভিহিত করা যাবে না; বরং ব্যবসায়ীদের রীতি-রেওয়াজে যেটা 'দোষ' বলে স্বীকৃত তাই কেবল 'দোষ' হিসেবে গণ্য হবে। কেননা 'দোষ' থাকলে দ্রব্যের মান ও মূল্যে কমতি দেখা দেয়। আর কোন দ্রব্যের মূল্য কমতি হল কিনা তার বিচার করার ভার ব্যবসায়ীদের ওপর। মনে রাখতে হবে আয়েব বা দোষ সম্পর্কিত এ ব্যাখ্যা বস্তুত একটি মূল সূত্র। এ সূত্র ধরে আরো অনেক মাসায়েল সংকলন করা সম্ভব। স্বয়ং গ্রন্থকারও এ সূত্রে সংকলনকৃত কয়েকটি মাসআলা পেশ করেছেন।

فَإِذَا بَلَغَ فَلَيْسَ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন ক্রীতদাসের মধ্যে পলায়ন প্রভৃতি বদ অভ্যাসগুলো শৈশবে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি বালেগ হওয়ার পর মালিকের নিকট পুনরায় তা প্রকাশ পেয়ে না থাকে, তবে ক্রেতার অধিকারে এসে এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে তা দোষ হবে না। অর্থাৎ এটা দোষ তো বটেই, কিন্তু বিক্রেতার নিকট হতে উদ্ভূত দোষ বলে দাবি করা যাবে না এবং গোলামও ফেরত দেয়া যাবে না; বরং ধরে নিতে হবে এগুলো নব সৃষ্ট দোষ। অপর দিকে শৈশবকালীন এ কু-অভ্যাস গুলো যদি ক্রেতার নিকট নাবালেগ অবস্থায়ই প্রকাশ পায় কিংবা বালেগ অবস্থায় বিক্রেতার নিকট প্রকাশ পাওয়ার পর ক্রেতার নিকট এসে তার পুনরাবৃত্তি ঘটে, তবে তা ফেরতযোগ্য দোষ বলে গণ্য হবে। কারণ এ সমস্ত দোষের শৈশবকালীন উৎস এবং বালেগ অবস্থার উৎস এক নয়; বরং সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা শৈশবে পলায়ন করে থাকে খেলাধুলার মোহে, পক্ষান্তরে বালেগ হওয়ার পর তা করে চুরি বা বেপরোয়া মনোভাবের বশবর্তী হয়ে। উৎসের ভিন্নতার কারণে দোষও ভিন্ন হয়ে যায়। সুতরাং ক্রেতার নিকট প্রকাশিত দোষ তখন পূর্বের দোষ বলে দাবি করা চলে না।

وَالْبَخَرُ وَالذَّفَرُ عَيْبٌ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কোন দাসী ক্রয় করার পর যদি তার মুখে বা বগলে দুর্গন্ধ অনুভূত হয় অথবা সে ব্যভিচারিণী বা জারজ বলে প্রমাণিত হয়; তবে তাকে ফেরত দেয়া যাবে। কারণ অনেক সময় দাসী যৌন সম্ভোগের উদ্দেশ্যেও ক্রয় করা হয়। আর শারীরিক ও চারিত্রিক এ সব দোষ-ক্রটি ও দুর্বলতা তখন মিলনের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং দাসীর ক্ষেত্রে এগুলো দোষ। পক্ষান্তরে গোলাম দ্বারা উদ্দেশ্য থাকে গৃহস্থালীর কাজকর্ম সম্পন্ন করা। আর এ সকল ক্রটি সাধারণত গৃহস্থালীর কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে না। তদুপরি দুর্গন্ধ যদি অতিশয় হয় অথবা ব্যভিচার তার অভ্যাসে পরিণত হয়ে থাকে, তবে তা দোষের মধ্যে গণ্য হবে। এতে পরিষ্কার প্রতীয়মান হয় যে, দ্রব্যের মধ্যকার ক্রটি যদি এমন হয় যা থেকে দ্রব্য সাধারণত মুক্ত হতে পারে না, যেমন এক মণ সরিষার মধ্যে পোয়া, দেড় পোয়া ধান বা কলাই থাকা– দূষণীয় নয়। কিন্তু ধুলাবালি বা কলাইর পরিমাণ যদি এক-দুই কেজি হয়, তবে অবশ্যই তা দোষের মধ্যে পরিগণিত হবে।

وَإِذَا حَدَثَ عِنْدَ الْمُشْتَرِي عَيْبٌ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ كَانَ عِنْدَ الْبَائِعِ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ وَلَا يَرُدُّ الْمَبِيعَ إِلَّا أَنْ يَرْضَى الْبَائِعُ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْبِهِ - وَإِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِي الثَّوْبَ وَخَاطَهُ أَوْ صَبَغَهُ أَوْ لَتَّ السَّوِيقَ بِسَمْنٍ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ وَلَيْسَ لِلْبَائِعِ أَنْ يَأْخُذَهُ بِعَيْنِهِ - وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ أَوْ مَاتَ عِنْدَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ رَجَعَ بِنُقْصَانِهِ - فَإِنْ قَتَلَ الْمُشْتَرِي الْعَبْدَ أَوْ كَانَ طَعَامًا فَأَكَلَهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبِهِ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى وَقَالَا يَرْجِعُ بِنُقْصَانِ الْعَيْبِ - وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا فَبَاعَهُ الْمُشْتَرِي ثُمَّ رُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ فَإِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ وَإِنْ قَبِلَهُ بِغَيْرِ قَضَاءِ الْقَاضِي فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِ - وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا وَشَرَطَ الْبَائِعُ الْبَرَاءَةَ مِنْ كُلِّ عَيْبٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِعَيْبٍ وَإِنْ لَمْ يُسَمِّ جُمْلَةَ الْعُيُوبِ وَلَمْ يَعُدَّهَا -

---

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যখন ক্রেতার হাতে পণ্যে কোন ক্রটি সৃষ্টি হয়, অতঃপর সে বিক্রেতার নিকট থাকা কোন ক্রটির কথা জানতে পারে তখন সে বিক্রেতা থেকে এর ক্ষতিপূরণ নিতে পারে বটে কিন্তু পণ্য ফিরিয়ে দিতে পারে না, তবে বিক্রেতা যদি (নব সৃষ্ট) আয়েবসহ ফেরত নিতে সম্মত হয় (সেটা ভিন্ন কথা)। যদি ক্রেতা কাপড় (খরিদ করার পর তা) কেটে সেলাই করে নেয় কিংবা তাতে রং করে নেয় অথবা ছাতুর মধ্যে ঘি মিশিয়ে নেয় এবং তার পর কোন ক্রটি আছে বলে জানতে পারে, তবে সে (বিক্রেতা থেকে) ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে; কিন্তু বিক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে নিতে পারবে না। যে ব্যক্তি গোলাম ক্রয় করার পর তাকে আযাদ করে দিল কিংবা তার নিকট সেটা মরে গেল, অতঃপর সে তার কোন দোষ সম্পর্কে জানতে পারল তাহলে সে ক্ষতিপূরণ উসুল করতে পারবে। পক্ষান্তরে যদি ক্রেতা উক্ত গোলাম হত্যা করে দেয় কিংবা (ক্রয়কৃত সামগ্রী) খাবার ছিল তা খেয়ে নেয়, অতঃপর কোন খুঁত সম্বন্ধে অবগত হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর মতানুসারে সে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ নিতে পারবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, সে ক্রটিজনিত ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারবে। কোন লোক গোলাম বিক্রি করল, অতঃপর ক্রেতা নিয়ে সেটা (অন্যত্র) বিক্রি করে দিল এবং তারপর কোন দোষের কারণে গোলামটি ক্রেতার নিকট ফেরত পাঠানো হল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় বিক্রেতা যদি তাকে আদালতের সিদ্ধান্তক্রমে ফেরত গ্রহণ করে থাকে, তবে প্রথম বিক্রেতাকে সে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যদি আদালতের মধ্যস্থতা ছাড়া গ্রহণ করে, তাহলে ফেরত দিতে পারবে না। কোন ব্যক্তি গোলাম (বা অন্য কিছু) ক্রয় করল আর বিক্রেতা পণ্যের সকল দোষ-ক্রটি থেকে নিজে দায়মুক্ত বলে শর্তারোপ করল, তবে ক্রেতা কোন দোষের কারণে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। যদিওবা সে গুণে গুণে সমুদয় দোষ উল্লেখ না করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَايَرُدُّ الْمَبِيْعَ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি ক্রেতার নিকট বিক্রিত বস্তু হস্তান্তর করার পর ক্রেতার পক্ষ হতে তাতে কোন ত্রুটি যুক্ত হওয়ার পর বিক্রিত বস্তুতে বিক্রেতার নিকট থাকা কালীন দোষ ধরা পড়লে সে বস্তুকে ফেরত দেয়া যাবে না; বরং বিক্রেতার থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করে নেবে। কেননা নবসৃষ্ট দোষসহ পণ্য ফেরত দেয়া হলে বিক্রেতা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সুতরাং এমতাবস্থায় ক্রেতার ঘাটতিপূরণ নিয়ে নেয়াই অধিকতর যুক্তিযুক্ত। তবে বিক্রেতা যদি স্বেচ্ছায় নিজের লোকসান স্বীকার করে নিয়ে নতুন ত্রুটিসহ পণ্য ফেরত নিতে সম্মত হয়, তবে শরীয়তের দিক থেকে তাতে কোন আপত্তি নেই।

وَاِنْ قَطَعَ الْمُشْتَرِى الثَّوْبَ الخ -এর আলোচনা ঃ ক্রয়কৃত পণ্যে নতুন কিছু সংযোগ করার পর ক্রেতা যদি বিক্রেতার নিকট উদ্ভূত কোন দোষের কথা জানতে পারে, তবে এর দু'অবস্থা হতে পারে— (এক) ক্রেতা এমন কিছু মিশিয়েছে যা পণ্য থেকে পৃথক করা মোটেই সম্ভবপর নয়। যেমন চিনি ছিল তা শরবত বানিয়ে নিয়েছে, তাহলে তা ফেরত দেয়া যাবে না। এমনকি বিক্রেতা চাইলেও তা ফিরিয়ে নিতে পারবে না। কেননা ফেরত দেয়া হলে পণ্যের সাথে মিশানো সেই দ্রব্য তখন কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই বিক্রেতার অধিকারে চলে আসে, অথচ উক্ত দ্রব্যের মালিক হল ক্রেতা। সুতরাং এমতাবস্থায় ক্রেতাকে ত্রুটির ক্ষতিপূরণ দিয়ে দেয়াই ন্যায়সঙ্গত সমাধান। (দুই) মিশানো জিনিসটি এমন যা অনায়াসেই পণ্য থেকে পৃথক করা সম্ভব। যেমন– কলম ছিল তাতে কালি ভরে নিল। তাহলে তা খুলে রেখে বিক্রেতাকে পণ্য ফিরিয়ে দেবে।

لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন কারণ বশত দোষী পণ্য ফেরত দেয়া অসম্ভব হলে ক্রেতা উক্ত দোষের ক্ষতিপূরণ পাবে কিনা সে সম্পর্কে শরীয়তের মতামত নিম্নরূপ ঃ

যে সমস্ত কারণে মাবী' (ক্রীতপণ্য) ফেরতের অযোগ্য বিবেচিত হয়, তা চার রকম— (এক) মাবী'র মধ্যে ক্রেতার এমন কোন তাসাররুফ করা যার কারণে তাকে দায়ী সাব্যস্ত করা যায়। যেমন– মাবী' গোলাম ছিল তাকে হত্যা করে ফেলল। (দুই) এমন তাসাররুফ করা যাতে তাকে দায়ী করা যায় না। যেমন– গোলাম ক্রয় করে তাকে মুক্ত করে দিল। (তিন) দৈব দুর্ঘটনায় মাবী' ফেরতের অযোগ্য হয়ে পড়া। যেমন– মাবী' গরু ছিল তা মারা গেল। (চার) অথবা মাবী'র সাথে গায়রে মাবী' এমনভাবে মিশে যাওয়া যাতে একটি অপরটি থেকে পৃথক করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। উল্লিখিত চার অবস্থার মধ্যে শেষোক্ত তিন অবস্থায় খেয়ারে-আয়েবের ভিত্তিতে যদিওবা ক্রেতা মাবী' ফেরত দিতে পারবে না; কিন্তু ক্ষতিপূরণ আদায় করে নিতে পারবে। পক্ষান্তরে প্রথম অবস্থায় মাবী' ফেরত দেয়াতো দূরের কথা ক্ষতিপূরণও দাবি করতে পারবে না।

فَاِنْ قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِىْ الخ -এর আলোচনা ঃ পণ্য ফেরত দিয়ে দাম নিয়ে আসা ক্রেতা ও বিক্রেতার বিবেচনায় চুক্তি 'রহিত করণ' (فَسْخ) হলেও তৃতীয় ব্যক্তির দৃষ্টিতে এটা নতুন বেচাকেনা বৈ কিছু নয়। অর্থাৎ তৃতীয় কোন লোক যদি সেখানে উপস্থিত থাকে তবে সে দিব্যি মনে করবে যে, এটা একটা নতুন ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি। এমতাবস্থায় প্রথম বিক্রেতা তাদের দু'জনের (২য় বিক্রেতা ও ২য় ক্রেতার) তুলনায় তৃতীয় ব্যক্তিই বটে। ফলে উক্ত রহিতকরণ চুক্তি আদালতের মধ্যস্থতায় না হয়ে থাকলে প্রথম বিক্রেতার জন্য তা অস্বীকার করার সুযোগ থেকে যায় এবং মাবী' ফেরত নিতে তাকে বাধ্য করা যায় না।

ফায়দা ঃ

مَبِيْع -এর মধ্যে দু' ধরনের অতিরিক্ততা হতে পারে— (১) مُتَّصِلَه (২) مُنْفَصِلَه

مُتَّصِلَه আবার দু' ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথমত— যা আসল থেকে সৃষ্টি হয়েছে, যথা– ঘি, সৌন্দর্য, খুবী ইত্যাদি। এ জাতীয় অতিরিক্ততার কারণে مَبِيْع-কে ফেরত দিতে কোন রূপ সমস্যা নেই।

দ্বিতীয়ত— যা আসল হতে সৃষ্টি হয়নি। যথা– কাপড়ে রং দেয়া বা সেলাই করা বা ছাতুর সাথে ঘৃত মিলিয়ে দেয়া ইত্যাদি। এ জাতীয় অতিরিক্ততার ফলে مَبِيْع (ক্রয়কৃত বস্তু)-কে সর্ব সম্মতিক্রমে ফেরত দেয়া যাবে না।

তদ্রূপ مُنْفَصِلَه ও দু' ভাগে বিভক্ত ঃ

প্রথমত— যা আসল হতে সৃষ্টি হয়, যথা– সন্তান, ফল ইত্যাদি। এ জাতীয় অতিরিক্ততাকে ফেরত দেয়া হতে বারণ করে। অর্থাৎ এ সমস্যা হলে مَبِيْع -কে ফেরত দেয়া যাবে না।

দ্বিতীয়ত— যা আসল হতে সৃষ্টি হয়নি। যথা– উপার্জন বা كَسْب ; এ জাতীয় অতিরিক্ততার কারণে مَبِيْع -কে ফেরত দেয়াতে কোন রূপ সমস্যা নেই। কেননা كَسْب টা কোন অবস্থাতেই মাল নয়। কেননা এটা مَنَافِع হতে অর্জিত হয়।

بَابُ الْبَيْعِ الْفَاسِدِ

إِذَا كَانَ اَحَدُ الْعِوَضَيْنِ اَوْ كِلَاهُمَا مُحَرَّمًا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ كَالْبَيْعِ بِالْمَيْتَةِ اَوْ بِالدَّمِ اَوْ بِالْخَمْرِ اَوْ بِالْخِنْزِيْرِ وَكَذٰلِكَ اِذَا كَانَ الْمَبِيْعُ غَيْرَ مَمْلُوْكٍ كَالْحُرِّ وَبَيْعُ اُمِّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ فَاسِدٌ - وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ السَّمَكِ فِى الْمَاءِ قَبْلَ اَنْ يَّصْطَادَهُ وَلَا بَيْعُ الطَّائِرِ فِى الْهَوَاءِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحَمْلِ فِى الْبَطْنِ وَلَا النَّتَاجُ وَلَا الصُّوْفُ عَلٰى ظَهْرِ الْغَنَمِ وَلَا بَيْعُ اللَّبَنِ فِى الضَّرْعِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ذِرَاعٍ مِنْ ثَوْبٍ وَلَا بَيْعُ جِذْعٍ مِنْ سَقْفٍ وَضَرْبَةِ الْقَانِصِ وَلَا بَيْعُ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ بَيْعُ الثَّمْرِ عَلَى النَّخْلِ بِخَرْصِهٖ تَمْرًا وَلَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ بِاِلْقَاءِ الْحَجَرِ وَالْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ ثَوْبٍ مِنْ ثَوْبَيْنِ ۔

ফাসিদ বেচাকেনার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ (ক্রয়-বিক্রয়) যখন দুই বিনিময়ের একটি কিংবা উভয়টি হারাম মাল হয় তখন বিক্রয় বাতিল পরিগণিত হয়। যেমন– মরা পশু, রক্ত, মদ এবং শূকর প্রভৃতির বিনিময়ে বিক্রি করা। এমনি হুকুম যখন পণ্য অধিকারভুক্ত হয়। যেমন– মুক্ত স্বাধীন মানুষ, উম্মে ওয়ালাদ, মুদাব্বার এবং মুকাতাব ক্রয়-বিক্রয় করা বতিল। পানিতে থাকা মাছ এবং শূন্যে অবস্থিত পাখি শিকারের পূর্বে বিক্রি করা দুরস্ত নেই। গর্ভ এবং গর্ভের গর্ভ বিক্রি করা দুরস্ত নেই। ছাগলের পিঠে রেখে পশম এবং ওলানে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রি করা দুরস্ত নেই। কোন পোশাক থেকে এক গজ পরিমাণ বিক্রি করা এবং ছাদে সংযুক্ত কড়ি কাঠ বিক্রি করাও জায়েয নেই। জেলের ক্ষেপ বিক্রি করা দুরস্ত নেই। মুযাবানা বিক্রি জায়েয নেই। মুযাবানা হল বৃক্ষস্থিত ফল পেড়ে রাখা ফলের বিনিময়ে অনুমানে বিক্রি করা। পাথর কনা ছুড়ে দিয়ে কিংবা মুলামাসা বা মুনাবাযা আকারে ক্রয়-বিক্রয় করাও দুরস্ত নেই। দু'টি কাপড়ের মধ্যে (অনির্দিষ্টভাবে কোন) একটি বিক্রি করা বৈধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ الخ -এর আলোচনা ঃ গ্রন্থকার "বাইয়ে ফাসিদ" নামে শিরোনাম পেশ করলেও এ পরিচ্ছেদের অধীনে তিনি বাতিল, মাকরূহ ও মওকূফ প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয়ের কথাও আলোচনা করেছেন। কাজেই বলা যায় "ফাসিদ" শব্দটি এখানে পারিভাষিক অর্থে নয়; বরং আভিধানিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে অর্থাৎ নিষিদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়। বলা বাহুল্য, এতদার্থে সকল অশুদ্ধ ক্রয়-বিক্রয়কেই ফাসিদ নামে অভিহিত করা যায়।

اَلْبَيْعُ টা প্রথমত দু'প্রকার ঃ (১) جَائِز (২) مَنْهِى عَنْهُ

مَنْهِى عَنْه টা আবার তিন ভাগে বিভক্ত ঃ (১) اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ (২) اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ (৩) اَلْبَيْعُ الْمَكْرُوْهُ

اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ -এর সংজ্ঞা ঃ যে বেচাকেনা اَصْل -এর হিসেবে শরীয়ত সম্মত কিন্তু وَصْف -এর ভিত্তিতে তা শরীয়ত সম্মত নয়। اَصْل -এর হিসেবে শরীয়ত সম্মত হওয়ার অর্থ– مَبِيْع টা مَال مُتَقَوِّم হওয়া।

اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ-**এর হুকুম ঃ** এর হুকুম হল, ক্রেতা দ্রব্য করায়ত্ত করে নিলে তার মালিক হয়ে যাবে; কিন্তু ক্রেতার জন্য তা ভোগ-ব্যবহারের অনুমতি নেই; বরং মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে ক্রয়চুক্তি ভেঙ্গে ফেলা কর্তব্য। ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব না হলে দরিদ্রদের মাঝে তা সদকা করে দিতে হবে। এতে কোনরূপ ছওয়াবের নিয়ত করা যাবে না।

اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ-**এর সংজ্ঞা ঃ** কোন ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে তার রোকন অবর্তমান থাকলে তাকে বাতিল বলে। রোকন হল- مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِالْمَالِ بِالتَّرَاضِيْ অর্থাৎ দু'পক্ষ পারস্পরিক সম্মতিক্রমে মাল দ্বারা মালের আদান-প্রদান করা। ক্রয়-বিক্রয় চুক্তিতে 'রোকন' অবর্তমান থাকার কয়েকটি ধরন হতে পারে। যথা—

(ক) প্রথম পক্ষের সম্মতি রয়েছে কিন্তু দ্বিতীয় পক্ষের সম্মতি নেই। যেমন- সুদ, ঘুষ, জুয়া, লটারী ও বীমার মধ্যে মুনাফাখোরের সম্মতি বিদ্যমান থাকলেও সুদদাতা, ঘুষদাতা এবং মুনাফাদাতাদের মধ্যে কোনরূপ আন্তরিক সদিচ্ছা থাকে না; বরং তারা পরিস্থিতির শিকার হয়ে বাধ্যতামূলকভাবে দিয়ে থাকে। (খ) কারবারির মধ্যে সম্মতিদানের যোগ্যতাই নেই। যেমন- নির্বোধ শিশু কিংবা পাগল ব্যক্তির লেনদেন। (গ) এক দিকের বিনিময় মাল বটে কিন্তু অপরদিকেরটা মাল নয়। যেমন- টাকার বিনিময়ে পজিশন বিক্রি অথবা টাকার বিনিময়ে মদ, রক্ত, শূকর, মরা, মূর্তি, বাদ্যযন্ত্র ও দেহ প্রভৃতি ক্রয়-বিক্রয় করা। (ঘ) বিনিময়ের উভয় প্রান্তেই গায়রে মাল। যেমন- রক্ত দ্বারা রক্ত বিনিময় করা। (ঙ) এক প্রান্তে মাল আছে কিন্তু অপর প্রান্তে শূন্য। যেমন- সুদী কারবারে পাঁচ টাকার বদলে দশ টাকা গ্রহণ করা। পাঁচ টাকার সাথে পাঁচ টাকার কাটাকাটি হয়ে অতিরিক্ত পাঁচ টাকা বিনিময়হীন পড়ে থাকে। উক্ত পাঁচ প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ের সবক'টি বাতিল ও হারাম। এভাবে ক্রয়-বিক্রয় করলে কারবার সংঘটিতই হয় না।

উল্লেখ্য যে, বিক্রয় চুক্তির উপরোক্ত সংজ্ঞায় মাল বলতে মালে মুতাকাব্বেম (অর্থকরি সম্পদ) বুঝানো হয়েছে। মালে মুতাকাব্বেম (مَالْ مُتَقَوَّم) হল- مَا يَمِيْلُ اِلَيْهِ طَبْعُ الْاِنْسَانِ وَيُمْكِنُ اِدِّخَارُهُ اِلٰى وَقْتِ الْحَاجَةِ وَيُبَاحُ الْاِنْتِفَاعُ بِهٖ شَرْعًا অর্থাৎ "এমন জিনিস যা রুচিপূর্ণ, প্রয়োজনে আগাম সঞ্চয় করা যায় এবং শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত।" সে মতে মল-মূত্র, কোন বস্তুর ভোগ-ব্যবহার (مَنْفَعَة) ও মদ প্রভৃতি মালে-মুতাকাব্বেম নয়। কেননা তন্মধ্যে প্রথমটি রুচিসম্মত নয়, দ্বিতীয়টি সঞ্চয়যোগ্য নয় এবং শেষোক্তটি শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত নয়। এভাবে নদ-নদীর মাছ ও পানি এবং বন-জঙ্গলের গাছপালা ও জীব-জন্তু যা সর্বসাধারণের যৌথ সম্পদ বলে স্বীকৃত। মালে মুতাকাব্বেম হওয়ার জন্য তার ওপর কব্জা প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। কব্জা করা ছাড়া বিক্রি করলে বিক্রি বাতিল বলে গণ্য হবে। মাছ শিকার করা কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে বেড়ী দেয়া এবং বন জঙ্গল থেকে কাঠ কেটে আনা প্রভৃতি উপায়ে এ সকল মালের ওপর কব্জা প্রতিষ্ঠিত হয়।

(اَلْفِقْهُ عَلٰى مَذْهَبِ الْاَرْبَعَة)

اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ-**এর হুকুম ঃ** এর হুকুম হল— اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ-এর মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় করলে তা তো বৈধ হবেই না; বরং তা বাতিল বলে গণ্য হবে। কাজেই ক্রয়-বিক্রয় বাতিল হলে পণ্য করায়ত্ত করা সত্ত্বেও ক্রেতা এর মালিক হয় না। ফলে মৃত পশুর বিনিময়ে গোলাম ক্রয় করে যদি কেউ কব্জায় এনে তা মুক্ত করে দেয় তবে তা মুক্ত হবে না। (সুদ, জুয়া, ঠগবাজী প্রভৃতি) বাতিল পন্থায় উপার্জিত সম্পদ ভোগ করা পরিষ্কার হারাম।

بَيْعُ السَّمَكِ الخ-**এর আলোচনা ঃ** খাল-বিল-নদী-সমুদ্রের মাছের মালিক সর্ব সাধারণ; ব্যক্তিগতভাবে কেউ এর মালিক নয়। কাজেই শিকার করার পূর্বে তা বিক্রি করলে বাতিল বলে গণ্য হবে। তবে কেউ যদি বাঁধ বা বেষ্টনী তৈরির মাধ্যমে মাছ শিকারের বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহলে উক্ত বেষ্টনীবদ্ধ মাছের মধ্যে সে ব্যক্তির মালিকানা স্বীকৃত হবে বটে, কিন্তু তথাপি তা বিক্রি করা যাবে না- করলে ফাসিদ হিসেবে গণ্য হবে। নিজস্ব পুকুর ও জলাশয়েরও ঠিক এ হুকুম। কারণ শিকার না করা পর্যন্ত মাছের পরিমাণ অনির্দিষ্ট ও অজানা থেকে যায়। তাছাড়া এক্ষেত্রে মাবী' عَدَمُ الْقُدْرَةِ عَلَى التَّسْلِيْمِ তথা হস্তান্তরে অক্ষমতাও বিধ্যমান রয়েছে।

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحَمْلِ الخ-**এর আলোচনা ঃ** গর্ভ বা গর্ভের বিক্রি করা জায়েয নেই। কারণ একে তো নবী করীম (সাঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় থেকে নিষেধ করেছেন তাছাড়া গর্ভ, গর্ভের গর্ভ ও ওলানে থাকা দুধ ইত্যাদি এমন পণ্য যার ন্যূনতম গুণাগুণ পর্যন্ত ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের নিকট অজানা। এমতাবস্থায় কোন এক পক্ষ প্রতারণার শিকার হওয়া অনিবার্য। তদুপরি দুধ দোহন ও পশম কাটার পন্থা-প্রক্রিয়া নিয়ে ঝগড়া বাঁধারও সম্ভাবনা রয়েছে। আর কলহ-বিবাদের দিকে উদ্বুদ্ধকারী সকল কারবার শরীয়তে নিষিদ্ধ।

উক্ত মাসআলা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, উৎপাদনপূর্ব বা ভবিষ্যতের সওদা বিক্রি করা জায়েয হবে না। দু'তিন বছরের ক্ষেতের ফসল বা বাগানের ফল-মূল অগ্রিম বিক্রি করে দেয়াকে 'উৎপানদপূর্ব ক্রয়-বিক্রয়' বলে। যেমন– এক বছর কোন জমিতে ১০ (দশ) মণ খাদ্য-শস্য উৎপন্ন হল অথবা একটা বাগানের এক মৌসুমের ফল ১০০ (একশত) টাকা বিক্রি হল। এখন এর ওপর অনুমান করে আগামী দু'তিন বছরের লেনদেন চুক্তিতে আবদ্ধ হলে তা বৈধ হবে না। মহানবী (সাঃ) এ ধরনের লেনদেন নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ এটাও মাইসিরের (জুয়ার) অন্তর্ভুক্ত। কেননা এ জাতীয় ব্যবসায় পণ্যসামগ্রী বর্তমানে মওজুদ নয় বিধায় এ গুলোর উপযোগীতা দৈবচক্রের ওপর নির্ভরশীল। যে কারবারে এক পক্ষের পাওনা সম্পূর্ণ নিশ্চিত এবং দ্বিতীয় পক্ষের পাওনা ভাগ্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল তাকেই বলে 'জুয়া'। এ শ্রেণীর ব্যবসায় ক্ষুদে ব্যবসায়ীদের সর্বনাশ হলেও বৃহদায়তন ব্যবসায়ীদের সুযোগ বৃদ্ধি পায় প্রচুর পরিমাণে। তারা মওজুদ (Stok) ও কৃত্রিম দুর্মূল্য সৃষ্টির মাধ্যমে অতিরিক্ত মুনাফা লুটে নেয়।

بَيْعُ ذِرَاعٍ الخ **-এর আলোচনা ঃ** যে সমস্ত কাপড় সাধারণত অবিভক্ত আকারে বিক্রি করা হয় যেমন– পশমি চাদর, শাড়ি, লুঙ্গি প্রভৃতি তা থেকে যদি কেউ এক গজ বা অর্ধ গজ বিক্রি করে কিংবা চালে সংযুক্ত কড়িকাঠ বিক্রি করে, তবে তা ফাসিদ গণ্য হবে। কেননা এ ক্ষেত্রে 'দ্রব্য হস্তান্তরে অক্ষমতা' বিদ্যমান।

ضَرْبَةِ الْقَانِصِ **-এর আলোচনা ঃ** এখানে পণ্য অজানা বিধায় ক্রেতা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কেননা উক্ত ক্ষেপ মাছশূন্যও তো হতে পারে। আর যে লেনদেনে এক পক্ষের প্রাপ্তি নিশ্চিত এবং দ্বিতীয় পক্ষের অনিশ্চিত তাকে বলা হয় بَيْعُ الْغَرَرِ (প্রতারণামূলক ব্যবসা) তথা জুয়া।

وَلَابَيْعُ الْمُزَابَنَةِ **-এর আলোচনা ঃ** শব্দটি মাসদার (ক্রিয়ামূল), অর্থ–অন্যকে দমন করা, প্রতিহত করা। পরিভাষায় মুযাবানা হল, পাড়া ফলের বিনিময়ে বৃক্ষে থাকা ফল আনুমানিকভাবে বিক্রি করা। এ পদ্ধতিতে ক্ষেতের ফসল বিক্রি করা হলেও তাকে মুযাবানা বলা হবে। এ ধরনের বিক্রি জায়েয নেই। কারণ সমজাতীয় বস্তুর পারস্পরিক বিনিময় আনুমানিকভাবে করলে তা সুদী কারবারে পরিণত হয়। সে মতে যে কারবারে এক পক্ষের অর্থ বা দ্রব্য নির্দিষ্ট এবং দ্বিতীয় পক্ষের অর্থ বা দ্রব্য অনির্দিষ্ট তা-ই বাইয়ে মুযাবানা। যেমন কেউ বলল, আমি এই বাগানের কলা এ শর্তে বিক্রি করলাম যে, তাতে পাঁচ হাজার থেকে যা অতিরিক্ত হবে তা সম্পূর্ণ তোমার। কম হলে তার দায়-দায়িত্বও তোমার ওপর। অথবা বলল, অমুক ট্রাকে যে পরিমাণ শস্য আছে তা সমস্তই এত টাকায় বিক্রি করব।

وَلَايَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** জাহেলী যুগে এরূপ বেচাকেনার রেওয়াজ ছিল; দ্রব্যের দরদাম নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার কথোপকথনের এক পর্যায়ে ক্রেতা দ্রব্যের ওপর কঙ্কর ছুঁড়ে মারত বা দ্রব্যটি ছুঁয়ে নিত অথবা বিক্রেতা দ্রব্যটি ক্রেতার দিকে ছুঁড়ে মারত এবং এতেই ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত অবধারিত হয়ে যেত, অপর পক্ষের মতামতের প্রতি মোটেই তোয়াক্কা করা হত না। এ গুলো যথাক্রমে الْبَيْعُ بِالْقَاءِ الْحَجَرِ , اَلْمُلَامَسَةُ এবং اَلْمُزَابَنَةُ নামে অভিহিত হত।

বর্তমান হাট-বাজারে ও মেলায় লটারী খেলার আকারে যে ক্রয়-বিক্রয় হয় তা মুলামাসা, না হয় মুনাবাযা অথবা ইলক্বায়ে হাজারের নিয়মেই হয়ে থাকে। কেননা উক্ত খেলায় দোকানি বিভিন্ন মানের অনেক গুলো পণ্য কোন বোর্ড বা পাত্রে নিজ ইচ্ছামত সাজিয়ে নেয়। অতঃপর ঘোষণা করে, যার হাত পণ্যের ওপর পড়বে বা যে পণ্যে মারবেল বা পাথর কণা পতিত হবে, গ্রাহক সে পণ্যেরই অধিকার লাভ করবে। এতে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্য কেবল চাতুরি ও ধাপ্পাবাজির মাধ্যমে হস্তান্তর হয়। লটারীতে দু'জনের লাভ থাকে সুনির্দিষ্ট। একজন লটারী চালুকারী, দ্বিতীয় যে ব্যক্তি লটারীতে জিতে। কিন্তু বাকি হাজার হাজার মানুষের পকেটের টাকা-পয়সা বিনা কারণে হারাতে হয়। এভাবে সম্পদ বীমা ও জীবন বীমার (Life Insurance) মধ্যে সুদ ও জুয়া উভয়ই বিদ্যমান থাকে বিধায় তা না জায়েয ও হারাম।

وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يَّعْتِقَهُ الْمُشْتَرِىْ اَوْ يُدَبِّرَهُ اَوْ يُكَاتِبَهُ اَوْ بَاعَ اَمَةً عَلٰى اَنْ يَسْتَوْلِدَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ - وَكَذٰلِكَ لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يَّسْتَخْدِمَهُ الْبَائِعُ شَهْرًا اَوْ دَارًا عَلٰى اَنْ يَّسْكُنَهَا الْبَائِعُ مُدَّةً مَعْلُوْمَةً اَوْ عَلٰى اَنْ يُّقْرِضَهُ الْمُشْتَرِىْ دِرْهَمًا اَوْ عَلٰى اَنْ يُّهْدِىَ لَهُ وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلٰى اَنْ يُّسَلِّمَهَا اِلٰى رَأْسِ الشَّهْرِ فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ - وَمَنْ بَاعَ جَارِيَةً اَوْ دَابَّةً اِلَّا حَمْلَهَا فَسَدَ الْبَيْعُ - وَمَنِ اشْتَرٰى ثَوْبًا عَلٰى اَنْ يَّقْطَعَهُ الْبَائِعُ وَيُخِيْطَهُ قَمِيْصًا اَوْقُبَاءً اَوْ نَعْلًا عَلٰى اَنْ يَّحْذُوَهَا اَوْ يُشْرِكَهَا فَالْبَيْعُ فَاسِدٌ - وَالْبَيْعُ اِلَى النَّيْرُوْزِ وَالْمِهْرَجَانِ وَصَوْمِ النَّصَارٰى وَفِطْرِ الْيَهُوْدِ اِذَا لَمْ يَعْرِفِ الْمُتَبَائِعَانِ ذٰلِكَ فَاسِدٌ وَلَايَجُوْزُ الْبَيْعُ اِلَى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالْقِطَافِ وَقُدُوْمِ الْحَاجِّ فَاِنْ تَرَاضَيَا بِاِسْقَاطِ الْاَجَلِ قَبْلَ اَنْ يَّأْخُذَ النَّاسُ فِى الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَقَبْلَ قُدُوْمِ الْحَاجِّ جَازَ الْبَيْعُ -

---

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যদি কোন ব্যক্তি এ শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, ক্রেতা নিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবে অথবা মুদাব্বার বা মুকাতাব বানাবে; অথবা দাসী বিক্রি করল উম্মে ওয়ালাদ করার শর্তে তাহলে বিক্রি ফাসিদ হবে। অনুরূপ বিধান যদি এ শর্তে গোলাম বিক্রি করে যে, বিক্রেতা এক মাস তার দ্বারা কাজ নেবে অথবা এ শর্তে বাড়ি বিক্রি করে যে, মালিক তাতে নির্দিষ্ট কিছু দিন বসবাস করবে বা ক্রেতা তাকে কিছু টাকা ধার বা উপহার দেবে। কোন ব্যক্তি উপস্থিত কোন পণ্য মাসের শেষ দিকে হস্তান্তর করার শর্তে বিক্রি করলে তাও ফাসিদ সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি দাসী বা চতুষ্পদ জন্তু তাদের গর্ভ বাদ রেখে বিক্রি করল তার বিক্রয় ফাসিদ হয়ে গেছে। (এভাবে) কেউ কাপড় ক্রয়ের সময় বিক্রেতার ওপর তা কেটে পাঞ্জাবি বা জোব্বা তৈরি করে দেয়ার শর্তারোপ করলে অথবা পায়ের সাথে খাপ খাইয়ে দেয়া বা ফিতা সংযোগ করে দেয়ার শর্তে সেন্ডেল ক্রয় করলে তা ফাসিদ সাব্যস্ত হবে। গ্রীষ্ম বা শীত মৌসুমের প্রথম দিন অথবা খ্রিস্টানদের পহেলা রোযায় বা ইহুদীদের শেষ রোযায় (দাম পরিশোধ করার শর্তে) ক্রয়-বিক্রয় করলে তা ফাসিদ হবে; যদি ক্রেতা-বিক্রেতা এসব দিনের হিসাব-কিতাব সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে। আর জায়েয নেই ফসল কাটা, ফসল মাড়াই বা আঙ্গুর (প্রভৃতি) ফল পাড়া অথবা হজ্জ যাত্রীদের ফিরে আসা পর্যন্ত (বাকির মেয়াদে) ক্রয়-বিক্রয় করা। অবশ্য এ ক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা যদি লোকজনের ফসল কাটা বা ফসল মাড়াই শুরু করা অথবা হজ্জ যাত্রীদের ফিরে আসার পূর্বেই ঐ মেয়াদ রহিত করতে সম্মত হয়ে যায় তবে বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَوْ بَاعَ عَبْدًا عَلٰى اَنْ يَّسْتَخْدِمَهُ الخ **-এর আলোচনা** ঃ এ সকল শর্তারোপের মূলকথা হল, বিক্রিত দ্রব্য বিক্রয়-পরবর্তী কিছু দিনের জন্য বিক্রেতার ভোগ-দখলে থাকবে। এ শ্রেণীর শর্ত নিঃসন্দেহে عَقْد بَيْع -এর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে ক্রেতা পণ্যের এবং বিক্রেতা মূল্যের মালিক হয়ে তা ভোগ দখলের স্বাধীন অধিকার লাভ করা হল عَقْد بَيْع -এর সহজ ও স্বাভাবিক দাবি। অথচ এসব শর্ত সে অধিকার লাভের পথে বিরাট বাধা সৃষ্টি করে। সর্বোপরি এ জাতীয় শর্তে ক্রেতা বা বিক্রেতা তথা কোন এক পক্ষের জন্য উপরি লাভ রয়েছে, যা কিছুতেই সমর্থনযোগ্য নয়।

وَمَنْ بَاعَ عَيْنًا عَلٰى الخ **-এর আলোচনা ঃ** যদি কোন ব্যক্তি এমন শর্তের ভিত্তিতে কোন কিছু ক্রয় করল যে, সে তা এক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে হস্তান্তর করবে না। তাহলে সে জাতীয় বেচাকেনা بَيْع فَاسِد বলে পরিগণিত হবে। কেননা উপস্থিত পণ্যের ক্ষেত্রে এ ধরনের শর্তারোপের কোন যৌক্তিকতা নেই। কেবলমাত্র بَيْع سَلَم -এর ক্ষেত্রেই এ জাতীয় শর্ত শুদ্ধ ও প্রযোজ্য হতে পারে।

اَوْ دَابَّةً اِلَّا حَمْلَهَا الخ **-এর আলোচনা ঃ** বিক্রির সময় বিক্রেয় পণ্য থেকে কিছু অংশ বাদ রাখা জায়েয বা না জায়েয হওয়ার ব্যাপারে মূলনীতি হল, যে জিনিস পৃথক করে স্বতন্ত্রভাবে বিক্রি করা যায় না; বিক্রি কালে তা مَبِيْع থেকে বাদ (اِسْتِثْنَاء) ও রাখা চলে না। গর্ভস্থিত সন্তান প্রাকৃতিক নিয়মেই তার মায়ের দেহের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পৃক্ত। কাজেই তা 'বাদ রাখার' শর্ত শর্তে ফাসিদ বলে গণ্য হবে। উল্লেখ্য যে, ইজারা এবং বন্ধক-চুক্তিও এ শ্রেণীর শর্তারোপে ফাসিদ হয়ে যায়। কিন্তু হিবা, সদকা, নিকাহ ও খোলা প্রভৃতি চুক্তি তাতে ফাসিদ হয় না। এসব ক্ষেত্রে বরং শর্তটি নিজেই বাতিল ও অসার হয়ে পড়ে।

اَنْ يَقْطَعَهَا الْبَائِعُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ দোকান থেকে কাপড়, চামড়া বা অন্য কোন দ্রব্য এ শর্তে ক্রয় করা যে, দোকানদার ক্রেতার বর্ণিত মাপ মোতাবেক পোশাক, সেন্ডেল বা অন্য কোন জিনিস তৈরি করে দেবে; তা না জায়েয। কেউ করলে তা ফাসিদ সাব্যস্ত হবে এবং এটাই কেয়াসের দাবি। কারণ এ শ্রেণীর শর্তারোপ বিক্রয় চুক্তির স্বাভাবিক চাহিদার বিপরীত। কিন্তু জনগণের মাঝে এরূপ লেনদেন ব্যাপক রেওয়াজ পেয়ে গেছে বিধায় ইস্তিহ্‌সানের দাবি হচ্ছে তা জায়েয হওয়া। — (হিদায়া)

وَالْبَيْعُ اِلَى النَّيْرُوْزِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** গ্রীষ্ম ঋতুর প্রথম দিনকে نَيْرُوْز এবং শীত ঋতুর প্রথম দিনকে مِهْرجَان বলে। এসব দিনের হিসাব-কিতাব অনেকটা সৌরমন্ডলীয় জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল বিধায় সাধারণ মানুষ সুনির্দিষ্টভাবে তা নির্ণয় করতে পারে না। একইভাবে খ্রিস্টানদের রোযা আরম্ভ এবং ইহুদীদের রোযা সমাপ্ত করার সুনির্দিষ্ট কোন তারিখ নেই। অবশ্য খ্রিস্টান সম্প্রদায় রোযা শুরু করলে একাধারে ৫০ দিন রেখে রোযার সমাপ্তি টানে। এখন কেউ যদি ধারে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এসব দিনকে মূল্য পরিশোধের তারিখ নির্ধারিত করে এবং ক্রেতা-বিক্রেতার নিকট উক্ত তারিখের হিসাব অজানা ও অস্পষ্ট থাকে; তবে বিক্রি ফাসিদ হয়ে যাবে। কারণ বাকির মেয়াদ সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট না হলে পরবর্তীকালে দাম পরিশোধ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ (مُنَازَعَة) সৃষ্টি হওয়া নিতান্তই স্বাভাবিক যা একেবারেই অবাঞ্ছিত।

وَلَا يَجُوْزُ الْبَيْعُ اِلَى الْحَصَادِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এখানে ধারে বিক্রি জায়েয না হওয়ার কারণ হল ফসল কাটা ও ফসল মাড়াই প্রভৃতি কাজের জন্য নির্ধারিত বা স্থিরকৃত কোন সময় নেই। আবহওয়ার ও ঋতুর পরিবর্তনের সাথে সাথে এ সমস্ত কাজের সময়ও পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলে দাম লেনদেন নিয়ে ঝগড়া-ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থেকে যায়।

فَاِنْ تَرَاضَيَا بِاِسْقَاطِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার আগেই যদি ক্রেতা ও বিক্রেতা একমত হয়ে স্থিরকৃত মেয়াদ বাতিল করে নতুন ভাবে মেয়াদ নির্দিষ্ট করে নেয় কিংবা দাম লেনদেন করে ফেলে, তবে ফাসাদ বিদূরীত হয়ে বিক্রি জায়েযে পরিণত হবে। কারণ মূল্য পরিশোধ নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার পারস্পরিক বাদানুবাদের যে আশঙ্কা ছিল, তা আর বর্তমানে অবশিষ্ট নেই। অথচ উক্ত আশঙ্কাই ছিল কারবার ফাসিদ হওয়ার মূল কারণ। অবশ্য কোন ফাসাদ যদি কারবারে রোকন অর্থাৎ দ্রব্য বা মুদ্রার কোন একটির মধ্যে অনুপ্রবেশ করে, তবে চুক্তি বাতিল করা ছাড়া তা দূর করা যায় না। যেমন ধরুন এক টাকা দিয়ে দু'টাকা বিনিময় করা হল, তাহলে চুক্তি ভেঙে দিয়ে সুদের আবর্জনা বিদূরীত করতে হবে।

وَإِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ فِي الْبَيْعِ الْفَاسِدِ بِأَمْرِ الْبَائِعِ وَفِي الْعَقْدِ عِوَضَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مَالٌ مَلَكَ الْمَبِيعَ وَلَزِمَتْهُ قِيمَتُهُ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ فَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي نَفَذَ بَيْعُهُ - وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ حُرٍّ وَعَبْدٍ أَوْ شَاةٍ زَكِيَّةٍ وَمَيْتَةٍ بَطَلَ الْبَيْعُ فِيهِمَا وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَ عَبْدٍ وَمُدَبَّرٍ أَوْ بَيْنَ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غَيْرِهِ صَحَّ الْبَيْعُ فِي الْعَبْدِ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ ۔ وَنَهَى رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ وَعَنِ السَّوْمِ عَلَى سَوْمِ غَيْرِهِ وَعَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي وَالْبَيْعِ عِنْدَ أَذَانِ الْجُمُعَةِ وَكُلُّ ذٰلِكَ يُكْرَهُ وَلَا يَفْسُدُ بِهِ الْبَيْعُ - وَمَنْ مَلَكَ مَمْلُوكَيْنِ صَغِيرَيْنِ أَحَدُهُمَا ذُوْ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنَ الْآخَرِ لَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا - وَكَذٰلِكَ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا كَبِيرًا وَالْآخَرُ صَغِيرًا فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا كُرِهَ ذٰلِكَ وَجَازَ الْبَيْعُ وَإِنْ كَانَا كَبِيرَيْنِ فَلَا بَأْسَ بِالتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا -

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ ফাসিদ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যদি বিক্রেতার অনুমতিক্রমে পণ্য করায়ত্ত করে নেয়; আর উভয় দিকের বিনিময় (তথা পণ্য ও দাম) মাল হয়, তবে সে পণ্যের মালিক হয়ে যাবে এবং এর মূল্য পরিশোধ করা তার কর্তব্য হবে এবং (ফাসাদ দূর করার লক্ষ্যে) তাদের প্রত্যেকের বিক্রয়-চুক্তি ভেঙ্গে ফেলার অধিকার থাকবে (এবং ভেঙ্গে ফেলাই কর্তব্য)। সুতরাং যদি ক্রেতা উক্ত পণ্য (অন্য কারো নিকট) বিক্রি করে দেয়, তবে তার এ বিক্রি কার্যকরী হবে (এবং পূর্ব চুক্তি ভঙ্গ করার সুযোগ রহিত হয়ে যাবে)। যদি কেউ গোলাম এবং স্বাধীন লোক অথবা জবাইকৃত মেষ এবং মৃত মেষ একত্রে বিক্রি করে দেয়, তাহলে উভয়টির মধ্যে বিক্রি বাতিল হবে। পক্ষান্তরে যে গোলাম এবং মুদাব্বার কিংবা নিজস্ব গোলাম এবং অপরের গোলাম একসঙ্গে বিক্রি করল, তার বিক্রি হারানুপাতিক দামের বিপরীতে গোলামের মধ্যে জায়েয হয়ে যাবে (কিন্তু মুদাব্বার ও অপরের গোলামে কার্যকরী হবে না)। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দালালি এবং একজনের দরদাম কালে দ্বিতীয় কারো দরদাম করতে নিষেধ করেছেন। এবং নিষেধ করেছেন শহরগামী বণিকদল থেকে পথিমধ্যে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করতে এবং (চড়ামূল্য লাভের উদ্দেশ্যে) গ্রামীণ জনসাধারণের (নিয়ে আসা পণ্যসামগ্রী আড়তে জমা রেখে নির্দিষ্ট সময়ান্তে তারই) পক্ষ থেকে বিক্রি করতে। এবং জুমুআর আযানের সময় ক্রয়-বিক্রয় করতে। বস্তুত এ সবই মাকরূহ; এতে বিক্রয় ফাসিদ হবে না। যে ব্যক্তি এমন দুই নাবালেগ গোলামের মালিক হল, যাদের একজন অপর জনের মাহরাম, তাহলে তাদের একজনকে দ্বিতীয় জন থেকে পৃথক করবে না। অনুরূপ বিধান যদি একজন বালেগ ও অন্যজন নাবালেগ হয়। অবশ্য যদি পৃথকভাবে বিক্রি করে তবে মাকরূহ হবে; কিন্তু বিক্রয় জায়েয হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে দু'জনই যদি বালেগ হয় তাহলে পৃথক করে বিক্রি করার মধ্যে কোনরূপ আপত্তি নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا قَبَضَ الْمُشْتَرِيْ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ক্রয়-বিক্রয় ফাসিদ হওয়া সত্ত্বেও দু'টি শর্ত অনুযায়ী পণ্যের মধ্যে ক্রেতার মালিকানা সৃষ্টি হতে পারে- (এক) দাম এবং পণ্য উভয়টাই মাল হতে হবে (দুই) এবং ক্রেতা মালিকের অনুমতিক্রমে পণ্য করায়ত্ত করতে হবে। কারণ খরিদ্দারের মধ্যে খরিদ করার যোগ্যতা যেমন বিদ্যমান, তেমনি পণ্যের মধ্যেও মাল হওয়ার উপযোগিতা মওজুদ রয়েছে। সুতরাং উপযুক্ত পাত্র কর্তৃক উপযুক্ত ক্ষেত্রে কারবার অস্তিত্ব হলে এর হুকুম (মিলকিয়ত) সাবেত হওয়াই ইনসাফের দাবি।

بَطَلَ الْبَيْعُ فِيْهِمَا الخ **-এর আলোচনা ঃ** মনে রাখতে হবে স্বাধীন মানুষ ও মৃত পশু কোন ধর্মেই মাল বলে স্বীকৃত নয়। আর মাল নয় এমন কোন বস্তুকে যদি মালের সাথে একত্রিত করে বিক্রি করা হয়; তাহলে উভয় বস্তুর মধ্যেই বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। কারণ কোন বস্তু একত্রিত করে বিক্রি করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে প্রকারান্তরে এ কথা দাবি করা হয় যে, তন্মধ্যে কোন একটা পৃথক করে বিক্রি করা হবে না ; বরং একটি নিতে হলে অপরটিও নিতে হবে। একটি নেয়ার জন্য অপরটিও নেয়া শর্ত। উভয় বস্তু মাল হলে এরূপ শর্ত নির্ধারণে কোন সমস্যা নেই; কিন্তু কোন একটি যদি গায়রে-মাল হয়, তখনই হল আপত্তি অর্থাৎ বিক্রি শুদ্ধ হয় না। কেননা মালের সাথে 'গায়রে মাল' গ্রহণের শর্তারোপ একটি বাতিল শর্ত। এতে কৃতচুক্তিও বাতিল হয়ে যায়।

ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট উভয়ের মূল্য পৃথক পৃথক বর্ণনা করে দেয়া বা মূল্য নির্ধারণ না করে দেয়া উভয় অবস্থাতেই بَيْع বাতিল বলে পরিগণিত হবে। আর সাহেবাইন (রঃ) -এর নিকট যদি প্রতিটির মূল্য আলদাভাবে বর্ণনা করে দেয়, তবে কৃতদাস ও জবাইকৃত বকরির ক্ষেত্রে বেচাকেনা বৈধ হবে।

পক্ষান্তরে ক্রীতদাসের সাথে মুদাব্বার বিক্রয় নাজায়েয হলেও এ দু'টোই মূলত মাল। 'মালের সাথে গায়রে-মালকে শর্তরূপে জুড়ে দেয়া হয়েছে' এমন ধরনের কোন অভিযোগ এখানে নেই; সুতরাং গোলামের মধ্যে বিক্রি সহীহ্ হয়ে যাবে এবং মোট মূল্যের যে অংশ গোলামের ভাগে পড়ে তা পরিশোধ করা ক্রেতার আবশ্যক হবে। তদ্রূপ অন্য কারো মাল নিজের মালের সাথে বিক্রি করে দিলে নিজের মালের মধ্যে আনুপাতিক দামে বিক্রি শুদ্ধ হবে এবং বাকি মালের বিক্রি মওকুফ থাকবে।

نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ (ص) عَنِ النَّجْشِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** 'নাজাশ' অর্থ- দালালি করা। যেমন- কোন ক্রেতা একটা দ্রব্যের দাম বলল এবং বিক্রেতাও তা দিতে তৈরি হয়ে গেল; ঠিক সে মুহূর্তে অপর এক ব্যক্তি এসে দ্রব্যের দাম বাড়িয়ে দিল, যেন ক্রেতা ক্রয় করতে না পারে, অথবা সে যেন নিজে ক্রয় করে নিতে পারে, অথবা প্রথম ব্যক্তি যেন অধিক দামে ক্রয় করতে বাধ্য হয়। অনুরূপভাবে একজন দোকানদার কোন দ্রব্যের দাম চাওয়ার পর ক্রেতা সে দামে নিতে প্রস্তুত হল ; ঠিক তখন অপর একজন বিক্রেতা সে দ্রব্যের নমুনা দেখিয়ে বলল যে, সে উক্ত দ্রব্য আরো কম দামে দিতে পারে। উপরোক্ত সকল অবস্থা মাকরূহ। ইমাম মালিক (রঃ)-এর মতে, এরূপ ক্রয়-বিক্রয় বাতিল গণ্য হবে। অন্যান্য ইমামদের মতে, বিক্রি হয়ে যাবে ; কিন্তু মাকরূহ হবে। এভাবে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) بَيْعُ الْغَرَرِ থেকেও নিষেধ করেছেন। কোন নিকৃষ্ট পণ্য মিথ্যা প্রচারণা বা প্রদর্শনীর প্রভাবে উৎকৃষ্ট পণ্যের দামে বিক্রি করাই হল গারার বা প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয়।

وَعَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** কারবারে এমন কিছু লোক মধ্যস্থ হয়ে কাজ করে যারা বিক্রেতা ও ক্রেতার দ্বি-পাক্ষিক লাভে ভাগ বসায়। যেমন- দালাল, যারা পথিমধ্যে হতেই বাজারে আসার পূর্বে মাল ক্রয় করে মওজুদ করে এবং স্বাভাবিকভাবে ঐসব দ্রব্য বাজারে আসলে ক্রেতা সাধারণের যে সুবিধা হত তা ছিনিয়ে নেয়। এ শ্রেণীর মধ্যস্থতাভোগীদের ইসলাম চরম ঘৃণার পাত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে। কারণ কোন পণ্য বাজারে আসার পূর্বে যত মধ্যস্থতার শিকার হবে ততই তার বাজারমূল্য বাড়তে থাকবে। কেননা যতজনের হাত হয়ে পণ্য আসবে তারা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লাভ ধরে রাখার জন্য সচেষ্ট হবে। এভাবে বাজারে পৌছার পূর্বেই তা যথেষ্ট মহার্ঘতার স্তরে পৌছে থাকে। ফলে যে দ্রব্যটি এক টাকায় ক্রয় করা সম্ভব ছিল ভোক্তাগণ তা এক টাকা পঞ্চাশ পয়সায় কিনতে বাধ্য হয়। এ একই কারণে মহানবী (সাঃ) শহুরে দালালদের গ্রামবাসীর পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ الْاِقَالَةِ

اَلْاِقَالَةُ جَائِزَةٌ فِى الْبَيْعِ لِلْبَائِعِ وَالْمُشْتَرِى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ فَاِنْ شَرَطَ اَكْثَرَ مِنْهُ اَوْ اَقَلَّ مِنْهُ فَالشَّرْطُ بَاطِلٌ وَيُرَدُّ بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْاَوَّلِ وَهِىَ فَسْخٌ فِىْ حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَبَيْعٌ جَدِيْدٌ فِىْ حَقِّ غَيْرِهِمَا فِىْ قَوْلِ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَهَلَاكُ الثَّمَنِ لَايَمْنَعُ صِحَّةَ الْاِقَالَةِ وَهَلَاكُ الْمَبِيْعِ يَمْنَعُ صِحَّتَهَا وَاِنْ هَلَكَ بَعْضُ الْمَبِيْعِ جَازَتِ الْاِقَالَةُ فِىْ بَاقِيْهِ -

এক্বালার অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ে মিলে পূর্ব দামের বিপরীতে বিক্রয়-চুক্তি ভেঙে ফেলা জায়েয। সুতরাং (এক্বালার সময় তাদের কেউ) যদি পূর্ব দাম অপেক্ষা বেশি কিংবা কমের শর্তারোপ করে, তবে শর্ত বাতিল হবে এবং পূর্ব দামের সমান দামেই পণ্য ফেরত দেয়া হবে। ক্রেতা ও বিক্রেতার বিবেচনায় এক্বালা হল (পূর্ব ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি) রহিতকরণ। আর তৃতীয় কারো বেলায় তাহল নতুন ক্রয়-বিক্রয়। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত। পণ্যের দাম বিনাশ হওয়া এক্বালা শুদ্ধ হওয়ার পথে অন্তরায় নয়; অন্তরায় হল পণ্য বিনাশ হওয়া। তবে যদি পণ্যের কিয়দাংশ নষ্ট হয়, তবে বাকি অংশে এক্বালা করা জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْاِقَالَةُ جَائِزَةٌ الخ -এর আলোচনা ঃ اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ -এর সাথে اِقَالَة -এর সম্পর্ক হল- اَلْبَيْعُ ও اِقَالَة اَلْفَاسِدُ উভয়ের মধ্যেই বেচাকেনার চুক্তি ভঙ্গের মাধ্যমে বিক্রিত বস্তু বিক্রেতার নিকট ফিরে আসে।

اِقَالَة -এর শাব্দিকার্থ ঃ اِقَالَة শব্দটি اَجْوَف يَائِي হতে بَاب اِفْعَال -এর মাসদার। এর অর্থ হল উপড়ে ফেলা, ভঙ্গ করা ইত্যাদি। বলা হয়- قِلْتُهُ الْبَيْعَ و اَقَلْتُهُ অর্থাৎ আমি بَيْع -কে ভঙ্গ করেছি। এবং اَقَالَ اللّٰهُ عَثْرَتَهُ অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা তার পদস্খলনকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। এবং কোন কোন আরবী সাহিত্যিকগণ একে اَجْوَف وَاوِى বলেছেন। এখানে اِفْعَال -এর هَمْزَة টি سَلْب -এর জন্য। তবে এ মতটি সঠিক নয়। কেননা আরবী ভাষাবিদগণ قِلْتُ الْبَيْعَ (قَاف -কে যের দিয়ে) ব্যবহার করে থাকেন। আর এটা اَجْوَف يَائِي হওয়াকে বুঝায়। যদি اَجْوَف وَاوِى হত, তবে قُلْتُ الْبَيْعَ (قَاف -কে পেশ দিয়ে) ব্যবহৃত হত। অথচ এরূপ ব্যবহার হয় না।

صِحَاح ও قَامُوس -এর গ্রন্থকারও اِقَالَة -এর মূল অক্ষরের বর্ণনা দিতে গিয়ে ق - ى - ل বলেছেন, যা اَجْوَف يَائِي হওয়াকে বুঝায়, কাজেই বুঝা গেল যে, اِقَالَة শব্দটি اَجْوَف وَاوِى নয়।

اِقَالَة -এর পারিভাষিকার্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় পারস্পরিক সম্মতিতে বিক্রয়-চুক্তি বাতিল করাকে এক্বালা বলা হয়। বিক্রয়-চুক্তি সম্পন্ন করার পর কোন কোন সময় তা ভেঙে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়- হয়তো বা পণ্যের মালিক নিজেই সে পণ্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে অথবা ক্রেতা বিশেষ প্রয়োজনে নগদ টাকার মুখাপেক্ষী হয়ে যায় বা আপাতত তার পণ্যের প্রয়োজনে আর বাকি নেই। মোট কথা, কোন না কোন প্রয়োজনে তারা কৃতচুক্তি ভঙ্গ (এক্বালা) করতে চায়। এমতাবস্থায় ইসলামী শরীয়ত তাদের এক্বালা করার অনুমতি প্রদান করে। রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- কারবারে জড়িয়ে অনুতপ্ত কোন মুসলমান ভাই এর এক্বালা প্রস্তাবে যে ব্যক্তি সাড়া দেবে আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করে দেবেন। উল্লেখ্য যে, দাম ও পণ্যে ক্রেতা-বিক্রেতা নিজেদের দখল বুঝে নেয়ার পূর্বে যেমন এক্বালা হতে পারে; তেমনি দখল লাভের পরও হতে পারে।

এক্বালা শুদ্ধ হওয়ার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে– (ক) উভয়পক্ষ এ ব্যাপারে সম্মত হওয়া, (খ) পূর্ব দামের সমপরিমাণ দামের বিপরীতে এক্বালা হওয়া এবং (গ) গোটা পণ্য বা তার কিছু অংশ পূর্ব অবস্থায় বিদ্যমান থাকা।

وَهِىَ فَسْخٌ فِى حَقِّ الْمُتَعَاقِدَيْنِ -এর আলোচনা ঃ এক্বালার মাধ্যমে ক্রেতা ও বিক্রেতা নিজেদের পণ্য-দ্রব্য ও দাম ফেরত দেয়া-নেয়া করে বিধায় তাদের বিবেচনায় এটা পূর্ব চুক্তি 'রহিতকরণ' ব্যতীত অন্য কিছু নয়। কিন্তু অন্য সকলের নজরে এক্বালা হল একটা নতুন চুক্তি ও নতুন ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং শুফ্'আ সহ ক্রয়-বিক্রয়ের সকল বিধান তাতে জারি হবে। সে মতে পণ্য যদি স্থাবর সম্পত্তি হয় এবং বিক্রয়-চুক্তির সময় শফী' তাতে শুফ্'আ দাবি ছেড়ে দিয়ে থাকে আর এখন উক্ত দাবি নিয়ে হাজির হয়, তবে সে শুফ্'আ লাভের ন্যায্য অধিকারী সাব্যস্ত হবে।

إِقَالَة যদি হস্তগত করার পর صَرِيْح لَفْظ -এর মাধ্যমে إِقَالَة হয়, তখন مُتَعَاقِدَيْن ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তির ব্যাপারে তা নতুন বেচাকেনার হুকুমে হবে। তবে مُتَعَاقِدَيْن -এর ক্ষেত্রে এটা بَيْع না فَسْخ এ ব্যাপারে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, إِقَالَة টা مُوْجِبَات عَقْد তথা যে সকল বিষয় نَفْس عَقْد -এর মাধ্যমে প্রমাণিত বা সাব্যস্ত হয়, সে ক্ষেত্রে তা فَسْخ -এর হুকুমে হবে। আর যদি কোন কারণ বশত এটা না হয়, যথা– مَبِيْع টা বকরি ছিল হস্তগত হওয়ার পরে তার বাচ্চা হয়ে গেল বা غَيْر مُقَابَضَة -এর মধ্যে مَبِيْع টা ধ্বংস হয়ে গেল, তাহলে إِقَالَة বাতিল হয়ে যাবে। কেননা সে সকল অবস্থায় فَسْخ করা অসম্ভব। আর যদি إِقَالَة টা হস্তগত হওয়ার পূর্বে হয়, তবে مُتَعَاقِدَيْن এবং غَيْر مُتَعَاقِدَيْن সকলের ক্ষেত্রেই তা فَسْخ-এর হুকুমে হবে। তবে শর্ত হল– مَبِيْع টা জমিন হতে পারবে না।

এবং ইমাম আবূ ইউসুফ, ইমাম মালিক এবং ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর قَوْل قَدِيْم হিসেবে مُتَعَاقِدَيْن -এর ব্যাপারে إِقَالَة টা بَيْع হয়ে থাকে। আর যদি بَيْع হওয়া অসম্ভব হয়– এভাবে যে, أَشْيَاء مَنْقُوْلَة তথা স্থানান্তরযোগ্য বস্তুর মধ্যে হস্তগত হওয়ার পূর্বেই إِقَالَة করা হয় অথবা بَيْع مُقَابَضَة -এর ক্ষেত্রে عِوَضَيْن -এর কোন একটি ধ্বংস হওয়ার পরে হয়, তবে إِقَالَة টা فَسْخ -এর হুকুমে হবে। আর যদি এটাও অসম্ভব হয় যে, أَشْيَاء مَنْقُوْلَة -এর মধ্যে হস্তগত হওয়ার পূর্বেই প্রথমোক্ত মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত বা কমের বিনিময়ে হয় বা অন্য কোন جِنْس -এর বিনিময়ে হয় বা غَيْر مُقَابَضَة -এর ক্ষেত্রে أَسْبَاب ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পরে হয়, তখন إِقَالَة বাতিল হয়ে যাবে।

ইমাম মুহাম্মদ, যুফার ও শাফেয়ী (রঃ)-এর قَوْل جَدِيْد মতে إِقَالَة টা فَسْخ হয়ে থাকে যদি প্রথমোক্ত মূল্য বা তার চেয়ে কম মূল্যে হয়। আর যদি فَسْخ হওয়া অসম্ভব হয়, তবে بَيْع হয়। আর যদি এটাও হতে না পারে, তবে إِقَالَة বাতিল বলে গণ্য হবে।

بَابُ الْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ

اَلْمُرَابَحَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مَعَ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَالتَّوْلِيَةُ نَقْلُ مَا مَلَكَهُ بِالْعَقْدِ الْاَوَّلِ بِالثَّمَنِ الْاَوَّلِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةِ رِبْحٍ وَلَا تَصِحُّ الْمُرَابَحَةُ وَالتَّوْلِيَةُ حَتّٰى يَكُوْنَ الْعِوَضُ مِمَّا لَهُ مِثْلٌ وَيَجُوْزُ اَنْ يُّضِيْفَ اِلٰى رَأْسِ الْمَالِ اُجْرَةَ الْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ وَالطَّرَّازِ وَالْفَتْلِ وَاُجْرَةَ حَمْلِ الطَّعَامِ وَيَقُوْلُ قَامَ عَلَيَّ بِكَذَا وَلَا يَقُوْلُ اِشْتَرَيْتُهُ بِكَذَا - فَاِنِ اطَّلَعَ الْمُشْتَرِيْ عَلٰى خِيَانَةٍ فِي الْمُرَابَحَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ شَاءَ اَخَذَهُ بِجَمِيْعِ الثَّمَنِ وَاِنْ شَاءَ رَدَّهُ - وَاِنِ اطَّلَعَ عَلٰى خِيَانَةٍ فِي التَّوْلِيَةِ اَسْقَطَهَا مِنَ الثَّمَنِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَحُطُّ فِيْهِمَا وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَحُطُّ فِيْهِمَا وَلٰكِنْ يُخَيَّرُ فِيْهِمَا - وَمَنِ اشْتَرٰى شَيْئًا مِمَّا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَمْ يَجُزْ لَهُ بَيْعُهُ حَتّٰى يَقْبِضَهُ -

মুরাবাহা ও তাওলিয়া-এর অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ক্রয়সূত্রে কোন দ্রব্যের মালিক হওয়ার পর ক্রয়কৃত দামের ওপর কিছু মুনাফা নিয়ে তা অন্যত্র বিক্রয় করাকে 'মুরাবাহা' বলে। আর তাওলিয়া হল ক্রয়সূত্রে কোন দ্রব্যের মালিক হওয়ার পর বিনা মুনাফায় আগের দামেই তা বিক্রি করে দেয়া। (খরিদকৃত পণ্যের) বিনিময় অনুরূপীয় (অর্থাৎ এমন যার অনুরূপ সচরাচর পাওয়া যায়) না হলে তাতে মুরাবাহা বা তাওলিয়া বিক্রয় সহীহ্ হবে না। ধোপা, রংকারক এবং নকশাকারকের মজুরি, ঝালর বা ঘুন্টি সংযুক্তির খরচ এবং খাদ্যশস্য আনয়ন (প্রভৃতি) ব্যয় মূল দামের সাথে যোগ করা জায়েয আছে; তখন (বিক্রয়ের সময়) বলবে "দ্রব্যটি ক্রয়ে আমার এত টাকা পড়েছে।" আমি এত টাকায় ক্রয় করেছি তা বলবে না। মুরাবাহা বিক্রিতে ক্রেতা যদি বিক্রেতার কোন জালিয়াতি সম্পর্কে অবগত হয় তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার খেয়ার (অবকাশ) রয়েছে– ইচ্ছা করলে পুরাদামে দ্রব্য গ্রহণ করবে অথবা প্রত্যাখ্যান করবে। পক্ষান্তরে যদি তাওলিয়া বিক্রিতে বিক্রেতার বিশ্বাস ভঙ্গ সম্পর্কে অবগত হয়, তবে দাম থেকে উক্ত পরিমাণ বিয়োগ করে দেবে (এবং অবশিষ্ট ন্যায্য দামে দ্রব্যটি নিয়ে নেবে)। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, উভয় ক্ষেত্রে (খেয়ানত পরিমাণ দাম) কমিয়ে দেবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, কোন ক্ষেত্রেই দাম কমাবে না। তবে উভয় অবস্থায়ই ক্রেতাকে (ধার্য করা দামে দ্রব্য গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে) স্বাধীনতা দেয়া হবে।

যে ব্যক্তি স্থানান্তর ও রূপান্তরযোগ্য জিনিস ক্রয় করল; তার জন্য তা নিজ দখলে আনার আগে অন্যত্র বিক্রয় করা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمُرَابَحَةِ وَالتَّوْلِيَةِ-এর আলোচনা ঃ مَبِيْع -এর সাথে সম্পৃক্ত বেচাকেনার আলোচনা শেষে মুসান্নিফ (রঃ) মূল্যের সাথে সম্পৃক্ত বেচাকেনার আলোচনা শুরু করেছেন। আর এটা চার ভাগে বিভক্ত। যে সম্পর্কে كِتَابُ الْبُيُوْعِ -এর শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে।

مُرَابَحَة টি مُفَاعَلَة -এর মাসদার, অর্থ– লাভ প্রদান করা। আর تَوْلِيَة হল تَفْعِيْل -এর মাসদার। অর্থ– কার্য সমাধাকারী বানানো। মুরাবাহা ও তাওলিয়া মূলত একদামে বিক্রি করার পৃথক পৃথক দু'টি পন্থা। প্রথমটিতে দোকানি তার ক্রয়কৃত দামে বিক্রি করে। আর দ্বিতীয়টিতে বিক্রি করে নির্দিষ্ট মুনাফা নিয়ে। এখানে দর কষাকষির কোন সুযোগ থাকে না। উল্লেখ থাকে যে, মুরাবাহা এবং তাওলিয়া উভয় কারবারেই বিক্রেতাকে নিজের পণ্যের ক্রয়কৃত মূল্য উল্লেখ করতে হবে, নতুবা মুরাবাহা বা তাওলিয়া কিছুই হবে না। যারা বাজারের হালচাল ও বস্তুর উচিত মূল্য সম্পর্কে অনভিজ্ঞ তাদের জন্য এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় খুবই সুবিধাজনক ও ফলদায়ক; তখন তারা নিশ্চিত হয়ে ক্রয় করতে পারে।

بَيْعُ التَّوْلِيَةِ-এর বৈধতার প্রমাণ ঃ বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) যখন হিজরতের বাসনা ব্যক্ত করলেন, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাঃ) দু'টি উট ক্রয় করলে প্রিয় নবী (সাঃ) বললেন, এ দু'টি উট হতে একটি আমায় بَيْع تَوْلِيَة হিসেবে প্রদান কর। অর্থাৎ তুমি যত টাকায় ক্রয় করেছ তত টাকার বিনিময় আমায় প্রদান কর। হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আপনার জন্য এটা বিনা মূল্যেই প্রদান করা হল। মহানবী (সাঃ) বললেন, বিনা মূল্যে তো আমি নিচ্ছি না।

মুসান্নাফায়ে আব্দুর রায্যাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রঃ) হতে বর্ণিত, মহানবী (সাঃ) বলেছেন– اَلتَّوْلِيَةُ وَالْإِقَالَةُ وَالشِّرْكَةُ لَا بَأْسَ بِهِ অর্থাৎ تَوْلِيَة, اِقَالَة ও شِرْكَت বেচাকেনার ক্ষেত্রে বৈধ। এতে কোন ক্ষতি নেই।

বুখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত– اِنَّ اَبَا بَكْرٍ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ بِاَبِىْ اَنْتَ وَ اُمِّىْ اِحْدٰى رَاحِلَتَىَّ هَاتَيْنِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالثَّمَنِ অর্থাৎ "হযরত আবূ বকর (রাঃ) বললেন, আপনার প্রতি আমার বাবা-মা উৎসর্গিত হোক, এ দু'টি বাহন হতে কোন একটি আপনি গ্রহণ করুন। মহানবী (সাঃ) বললেন, মূল্যের বিনিময়ে আমি তা গ্রহণ করব।" মহানবী (সাঃ) যে উটটি গ্রহণ করেছিলেন তার নাম হল কসওয়া।

مِمَّالَهُ مِثْلٌ الخ-এর আলোচনা ঃ টাকা-পয়সা, কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্য এবং স্বল্প ব্যবধানবিশিষ্ট গণনীয় দ্রব্যসমূহকে বলা হয় 'মিছলী (অনুরূপীয়) সামগ্রী'। এসবের কোন একটির বিপরীতে পণ্য ক্রয় করা হলে তা মুরাবাহা বা তাওলিয়া আকারে বিক্রি করা যাবে। এ ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা ক্রয় করা হলে তা মুরাবাহা বা তাওলিয়া কোনভাবেই বিক্রি করতে পারবে না। যেমন কেউ মোরগের বিনিময়ে একটি লুঙ্গি ক্রয় করল; এখন তার জন্য লুঙ্গিটি মুরাবাহা কিংবা তাওয়িলা কোন ভাবেই বিক্রি করা জায়েয হবে না। কারণ মোরগ 'মিছলী সামগ্রী' নয় বিধায় লুঙ্গিটির দ্বিতীয় ক্রেতা এ ক্রয়কৃত দাম 'মোরগ' দিতে অসামর্থ্য হবে। এমতাবস্থায় সঙ্গত কারণেই সে মোরগটির বাজার দাম হিসাব করে টাকা-পয়সা বা অন্য কোন দ্রব্য দ্বারা লুঙ্গির দাম পরিশোধ করতে সচেষ্ট হবে; অথচ মোরগটির বাজার দাম পূর্বে যেমন তার নিকট অজানা ছিল এখনও অজানাই রয়েছে। সুতরাং শেষ পর্যন্ত লুঙ্গির দাম পরিশোধ করা ক্রেতার জন্য কঠিন হয়ে পড়বে।

وَاِنْ اِطَّلَعَ عَلٰى خِيَانَةٍ الخ-এর আলোচনা ঃ সিদ্ধান্তকৃত দাম থেকে ক্রেতা গরমিল পরিমাণ বিয়োগ করে দেবে। যেমন ধরুন মাহমূদ বলল, এ আমার ঘড়িটি একশত টাকায় কেনা, এখন টাকা পেলেই তা বিক্রি করে দেব। মাসরূর একশত টাকায় তা নিতে সম্মত হল। কিন্তু কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পর সে জানতে পরল ঘড়িটি মাহ্মূদের নব্বই টাকায় কেনা। সে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ক্রয়কৃত মূল্য একশ' টাকা দাবি করেছে। এমতাবস্থায় দশ টাকা বিয়োগ করত নব্বই টাকার বিপরীতে ঘড়িটি নিয়ে নেয়ার অধিকার মাসরূরের রয়েছে।

وَمَنْ اِشْتَرٰى شَيْئًا الخ-এর আলোচনা ঃ গম, চাল, ইট, সুরকি ও কাঠ প্রভৃতি অস্থাবর পণ্যসামগ্রী ক্রয় করার পর কব্জা না করে বিক্রি করা জায়েয নেই। এতে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। কেননা এ শ্রেণীর দ্রব্য অনায়াসেই বিকৃতি ও নষ্টের শিকার হয়। ফলে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কেননা বিক্রেতার কব্জায় থাকা কালে পণ্য বিনষ্ট হলে এর পূর্ণ দায়ভার তারই ওপর পড়ে, ক্রেতাকে পণ্য বা অনুরূপ কিছু দিতে সে বাধ্য থাকে না। ফলে ক্রেতা স্বভাবতই তার ক্রেতাকে পণ্য দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে এবং এভাবে দ্বিতীয় ক্রেতা প্রতারণার শিকার হয়। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি সহজে বিনষ্ট হয় না বিধায় ক্রেতা প্রতারিত হবার সম্ভাবনা থাকে না। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) স্থাবর সম্পত্তি কব্জা করার পূর্বে বিক্রি না জায়েয বললেও তা হিবা ও সদকা করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْعِقَارِ قَبْلَ الْقَبْضِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ وَمَنْ اِشْتَرٰى مَكِيْلًا مُكَايَلَةً اَوْ مَوْزُوْنًا مُوَازَنَةً فَاكْتَالَهُ اَوِ اتَّزَنَهُ ثُمَّ بَاعَهُ مُكَايَلَةً اَوْ مُوَازَنَةً لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِىْ مِنْهُ اَنْ يَّبِيْعَهُ وَلَا اَنْ يَّأْكُلَهُ حَتّٰى يُعِيْدَ الْكَيْلَ وَالْوَزْنَ وَالتَّصَرُّفُ فِى الثَّمَنِ قَبْلَ الْقَبْضِ جَائِزٌ ـ وَيَجُوزُ لِلْمُشْتَرِىْ اَنْ يَّزِيْدَ لِلْبَائِعِ فِى الثَّمَنِ وَيَجُوزُ لِلْبَائِعِ اَنْ يَّزِيْدَ لِلْمُشْتَرِىْ فِى الْمَبِيْعِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّحُطَّ مِنَ الثَّمَنِ وَيَتَعَلَّقُ الْاِسْتِحْقَاقُ بِجَمِيْعِ ذٰلِكَ وَمَنْ بَاعَ بِثَمَنٍ حَالٍ ثُمَّ اَجَّلَهُ اَجَلًا مَعْلُوْمًا صَارَ مُؤَجَّلًا وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ اِذَا اَجَّلَهُ صَاحِبُهُ صَارَ مُؤَجَّلًا اِلَّا الْقَرْضَ فَاِنَّ تَاجِيْلَهُ لَايَصِحُّ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম শায়খাইন (রঃ)-এর মতে, স্থাবর সম্পত্তি দখলে আনার পূর্বে বিক্রি করা দুরস্ত আছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, জায়েয নেই। যে ব্যক্তি কায়লী বস্তু কায়ল হিসেবে বা ওজনভুক্ত দ্রব্য ওজনের ভিত্তিতে (কিংবা সামান্য ব্যবধানবিশিষ্ট গণনীয় দ্রব্য সংখ্যার ভিত্তিতে) ক্রয় করার পর তা মেপে বা ওজন করে নিল; তারপর উক্ত নিয়মেই তা (অন্য কারো নিকট) বিক্রি করল, তবে এ (দ্বিতীয়) ক্রেতার জন্য পুনরায় কায়ল বা ওযন (অথবা গুণে নেয়া) ব্যতীত তা বিক্রি কিংবা ভোগ-ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (বিক্রেতার জন্য) দাম করায়ত্ত করার পূর্বে তাতে হস্তক্ষেপ করা জায়েয আছে। (কিন্তু ক্রেতা পণ্য করায়ত্ত করার পূর্বে তা বিক্রি করতে পারবে না)। ক্রেতার জন্য বিক্রেতাকে সিদ্ধান্তকৃত দামের চেয়ে কিছু অতিরিক্ত দেয়া জায়েয আছে। এবং বিক্রেতার জন্য ক্রেতাকে (নির্ধারিত) দ্রব্যের চেয়ে অতিরিক্ত দেয়া জায়েয আছে এবং স্থিরকৃত দাম থেকে কিছু হ্রাস করে দেয়া। তখন বর্ধিত অংশসহ সবটুকুর সাথে অধিকার সম্পৃক্ত হবে। (অর্থাৎ সবটুকুই গ্রাহকের ন্যায্য পাওনারূপে বিবেচিত হবে)। যদি কোন ব্যক্তি নগদ দামে বিক্রি করার পর নির্দিষ্ট কিছু দিনের জন্য দাম গ্রহণ বিলম্বিত করে দেয়, তবে তা 'ধারে বিক্রি' হিসেবে পরিগণিত হবে। ব্যতিক্রম হল কর্জ। কেননা তাতে বিলম্ব করণের এ নীতি গ্রাহ্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَمْ يَجُزْ لِلْمُشْتَرِىْ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এ মাসআলার উদাহরণ হল, যেমন করীম (বাজারে প্রচলিত পরিমাপক পাত্রের) এক পাত্র দুধ ও এক কেজি চিনি ক্রয় করল এবং তা কব্জা করার সময় যথাক্রমে মাপক ও পাল্লার পরিমাণ নির্ণয় করে গ্রহণ করল। অথবা কব্জা করার পর উক্ত নিয়মে মেপে নিল। এখন যদি সে একই নিয়মে (অর্থাৎ কায়ল ও ওজনের ভিত্তিতে) এ দুধ ও চিনি খালিদের নিকট বিক্রি করে, তবে খালিদের কর্তব্য হবে এগুলো ভোগ-ব্যবহার কিংবা অন্যত্র বিক্রি করার পূর্বে যথা নিয়মে মেপে নেয়া। যদিও বা করীম বিক্রয়ের পূর্বে স্বহস্তে মেপে নিয়েই বিক্রি করেছিল। এ ক্ষেত্রে খালিদের জন্য বিনা মাপে বিক্রি কিংবা ভোগ করা মাকরূহে তাহরীমী। কারণ হুযূর (সাঃ) কোন পণ্যের মধ্যে দু'বার মাপ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তা ভোগ-ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। তন্মধ্যে প্রথম মাপ বিক্রেতা ও দ্বিতীয় মাপ ক্রেতা দ্বারা সম্পন্ন হতে হবে। তবে

বিশুদ্ধতম কওল মতে বিক্রেতা মাপার সময় ক্রেতা যদি তা মনযোগ সহকারে লক্ষ্য করে কিংবা ক্রেতার নির্দেশক্রমে সে মেপে থাকে, তবে ক্রেতাকে পুনরায় মাপতে হবে না। কিন্তু কায়ল, ওজন বা গণনার ভিত্তিতে না করে যদি অনুমানের ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করা হয়, তবে আগে-পরে কখনোই ক্রেতার জন্য পণ্যের যাচাই করা আবশ্যক হবে না।

وَالتَّصَرُّفُ فِى الثَّمَنِ الخ-এর আলোচনা ঃ "اَلتَّصَرُّفُ" শব্দের অর্থ- হস্তক্ষেপ, ভোগ-ব্যবহার অধিকার চর্চা। এ মাসআলার উদাহরণ হল যেমন- যায়েদ বকরের নিকট তিন টাকায় একটি কলম বিক্রি করল, অতঃপর টাকা বুঝে পাওয়ার পূর্বেই এর বিনিময়ে বকর থেকে কয়েকটি বোতাম ক্রয় করে নিল। অথবা অন্য কারো থেকে এ টাকায় কোন জিনিস খরিদ করে বিক্রেতাকে বকরের নিকট হাওয়ালা করে দিল। তাহলে এটা জায়েয আছে।

اَنْ يَّزِيْدَ لِلْبَائِعِ الخ-এর আলোচনা ঃ ক্রেতা বা বিক্রেতাকে তার নির্ধারিত প্রাপ্য থেকে অতিরিক্ত প্রদান করা জায়েয আছে। যেমন- মাসূম কোন জেলে থেকে পাঁচ টাকায় এক ভাগ মাছ ক্রয় করল এবং খুশি হয়ে জেলেকে ৫ টাকার স্থলে ৬ টাকা দিল। অথবা জেলে অতিরিক্ত আরও কিছু মাছ মাসূমকে দিয়ে দিল। তাহলে এটা জায়েয আছে। এসব ক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত বর্ধিত অংশটুকুও গ্রাহকের ন্যায্য পাওনায় গণ্য হয়, বিধায় মাছের দাম পূর্ণ ৬ টাকাই ধর্তব্য হবে। সুতরাং কোন কারণ বশত মাসূম যদি জেলেকে মাছ ফেরত দিয়ে দেয়, তবে জেলে তাকে পূর্ণ ৬ টাকাই ফিরিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। এক টাকা উপহার মনে করে নিজের কাছে রেখে দিয়ে বাকি ৬ টাকা ফেরত দিলে চলবে না। একইভাবে জেলে যদি টাকা ফেরত দিয়ে মাছ নিয়ে নিতে চায়, তাহলে তাকে অতিরিক্ত অংশসহ সমুদয় মাছ ফেরত দিতে হবে। কারণ অতিরিক্ত অংশসহ সম্পূর্ণ মাছই এ ক্ষেত্রে ৫ টাকার বিপরীতে পণ্য সাব্যস্ত হয়েছে।

وَكُلُّ دَيْنٍ حَالٍ الخ-এর আলোচনা ঃ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, কর্জ ও বিয়ে প্রভৃতি কারবারের পরিপ্রেক্ষিতে কারো ওপর যে দেনা বর্তায় এবং এভাবে অন্য কারো বৈষয়িক বা দৈহিক ক্ষতি করার কারণে যে আর্থিক জরিমানা আরোপিত হয়, তাকে দাইন (دَيْن) বলে। সে মতে কোন স্ত্রী যদি তার স্বামীকে মোহরের অর্থ আদায়ের ব্যাপারে অথবা কোন যানবাহনের মালিক তার ইজারাদারকে ভাড়ার টাকা পরিশোধের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কিছু দিনের সুযোগ প্রদান করে, তবে স্ত্রী ও মালিকের জন্য তা পালন করা আবশ্যক হয়ে পড়বে। সুতরাং তারা মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বে টাকার জন্য তাকাদা করতে পারবে না।

টাকা-পয়সা অথবা ধান-চাল, আটা, লবণ প্রভৃতি মিছলী তথা সাদৃশ্যপূর্ণ সামগ্রী ধার দেয়াকে কর্জ বলে। কর্জের ক্ষেত্রে গ্রহীতা সর্বদাই কর্জরূপে গৃহীত বস্তু ব্যবহার করে নিঃশেষ করে ফেলে এবং মেয়াদান্তে দাতাকে ঠিক সে পরিমাণ সমজাতীয় বস্তু পরিশোধ করে। কর্জ যেহেতু নিছক একটা অনুগ্রহমূলক লেনদেন, সে কারণে কর্জদাতা যদি গ্রহীতাকে কর্জ আদায়ের ব্যাপারে আরো কিছু দিনের সুযোগ দেয় তাহলে দাতার জন্য তা পালন করে চলা বাধ্যতামূলক হবে না; বরং যখন ইচ্ছা সে কর্জ আদায়ের জন্য তাগাদা করতে পারবে। বলা বাহুল্য 'দাইন' শব্দটি হল আম (عَام) আর 'করজ' শব্দটি খাস, ফলে সকল প্রকার 'করজ'-কে 'দাইন' নামে অভিহিত করা গেলেও দাইনের সকল শ্রেণীকে করজ নামে আখ্যায়িত করা যায় না।

بَابُ الرِّبٰوا

اَلرِّبٰوا مُحَرَّمٌ فِى كُلِّ مَكِيْلٍ اَوْ مَوْزُوْنٍ اِذَا بِيْعَ بِجِنْسِهٖ مُتَفَاضِلًا فَالْعِلَّةُ فِيْهِ الْكَيْلُ مَعَ الْجِنْسِ اَوِ الْوَزْنُ مَعَ الْجِنْسِ فَاِذَا بِيْعَ الْمَكِيْلُ بِجِنْسِهٖ اَوِ الْمَوْزُوْنُ بِجِنْسِهٖ مِثْلًا بِمِثْلٍ جَازَ الْبَيْعُ وَاِنْ تَفَاضَلَا لَمْ يَجُزْ -

সুদী কারবারের অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ রিবা হারাম; সকল প্রকার কায়লী ও ওজনী দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যখন তা তার সমজাতীয় দ্রব্যের সাথে বেশকম করে বিনিময় করা হয় (তখন তাকে রিবা বলে)। সুতরাং উভয় দিকের দ্রব্য সমজাতীয় হওয়ার পাশাপাশি কায়লী হওয়া কিংবা সমজাতীয় হওয়ার পাশাপাশি ওজনভুক্ত হওয়া রিবা তথা বেশকম হারাম হওয়ার মূল কারণ। সে মতে যখন কায়লভুক্ত দ্রব্য তার সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে কিংবা ওজনভুক্ত দ্রব্য তার সমজাতীয় দ্রব্যের বিনিময়ে সমান সমান করে বিক্রি করা হবে; তা জায়েয হবে। কিন্তু যদি (কোন এক দিকের দ্রব্য) কম বা বেশি হয়, তবে বিক্রি জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَابُ الرِّبٰوا-এর আলোচনা ঃ শরীয়ত কর্তৃক অনুমোদিত বেচাকেনার প্রসঙ্গ শেষে সম্মানিত গ্রন্থকার এমন কিছু بَيْع সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, যেগুলোর ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। যথা, আল্লাহর বাণী- اَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা বেচাকেনা বৈধ করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন।

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন- يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوا الرِّبٰوا অর্থাৎ হে মু'মিন সম্প্রদায় তোমরা সুদ গ্রহণ কর না।

رِبٰوا ও مُرَابَحَة-এর সম্পর্ক ঃ رِبٰوا ও مُرَابَحَة-এর মধ্যে সম্পর্ক হল উভয়ের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধি রয়েছে। আর مُرَابَحَة-এর বৃদ্ধি হওয়া হল বৈধ ও হালাল। পক্ষান্তরে رِبٰوا-এর বৃদ্ধি পাওয়া হল হারাম ও অবৈধ।

مُرَابَحَة-কে পূর্বে আনয়নের কারণ ঃ বস্তুর মূল বা اَصْل হচ্ছে- হালাল ও বৈধ হওয়া। যেহেতু مُرَابَحَة-এর বৃদ্ধিটা হালাল ও বৈধ এবং رِبٰوا-এর বৃদ্ধিটা হারাম তাই مُرَابَحَة-এর আলোচনাকে رِبٰوا-এর পূর্বে আনয়ন করেছেন।

رِبٰوا-এর শাব্দিক অর্থ ঃ رِبٰوا-এর শাব্দিক অর্থ হল- স্ফীত হওয়া, বৃদ্ধি পাওয়া। যথা, বলা হয়- رَبَى الشَّئُ يَرْبُوْا অর্থাৎ বেড়ে গেল।

رِبٰوا-এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরয়ী পরিভাষায় আর্থিক লেনদেনের ঐ অতিরিক্ত অংশকে রিবা বলে, যার বিপরীতে কোন সম্পদ নেই— আছে শুধু মেয়াদ, অথবা তাও নেই। বর্তমান অর্থ ব্যবস্থায় ঋণের বিপরীতে গৃহীত আর্থিক মুনাফা যা মেয়াদ কমবেশির সাথে সাথে ঘাটতি-বৃদ্ধি হয় তাকেই রিবা বা সুদ বলা হয়। ইসলামের পূর্বে আরবের জাহেলী সমাজেও 'রিবার' এই অর্থই প্রচলিত ছিল। ইসলাম এ মহাজনী সুদের পাশাপাশি ক্রয়-বিক্রয়ের কিছু অংশকেও এ রিবার অন্তর্ভুক্ত করে দিয়েছে। মহাজনী তথা প্রচলিত সুদ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ভাষ্য হল- كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا অর্থাৎ যে ঋণ কোন মুনাফা টানে তাই রিবা। (জামে' সগীর)। ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কিত রিবা (যাকে তৎকালীন আরবদের মতো বর্তমান সমাজও রিবা মনে করে না) সম্বন্ধে উদাহরণস্বরূপ এক হাদীস তিনি ইরশাদ করেন— اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَالْفَضْلُ رِبٰوا অর্থাৎ গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা ও রূপা এ ছয়টি বস্তুকে এদের সমজাতীয় বস্তুর সাথে অদল-বদল করতে হলে সমান

সমান এবং হাতে হাতে করতে হবে। কমবেশি করলে কিংবা ধারে করলে তা রিবা হবে। মুসান্নিফ (রঃ) এ পর্বে মূলত শেষোক্ত রিবা সম্পর্কেই সবিস্তারে আলোচনা করেছেন।

সামাজিক অবক্ষয়ে সুদের প্রভাব ঃ রিবা শব্দের অর্থ– সুদ। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থায় সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 'সুদ' একটি মারাত্মক অভিশাপ। এতে মানবতা ধ্বংস হয়, বিদায় নেয় বনী-আদমের মূল্যবান বৈশিষ্ট্য, পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা, জন্ম নেয় সীমাহীন অর্থ–লিপসা ও স্বার্থপরতা। অস্বাভাবিক অর্থ-লিপ্সার দরুন এ সুদী কারবারিরা তখন মানুষের জান, মাল ও ইজ্জত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে দ্বিধা করে না। এমনকি কোন লাওয়ারিশ লাশের কাফন-দাফনে অর্থ ব্যয় করেও দ্বিগুণ তৃগুণে তা উসুল করার ধান্দায় মত্ত হতে পারে। সুদী কারবারে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ জনগণ, বিশেষত দরিদ্র জনগোষ্ঠী। দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির সুযোগে অসাধু ব্যবসায়ীরা প্রচুর ব্যাংক লোনের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য গুদামজাত করে ফেলে। ব্যাংকগুলো তখন অধিক সুদপ্রাপ্তির আশায় অভাবনীয় রকম লোন দিতে এগিয়ে আসে। অল্প সময়ের মধ্যেই খাদ্যশস্যের বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। যথার্থ কারণেই তখন জনসাধারণ প্রাণ রক্ষার দায়ে তৃগুণ-চতুঃগুণ এমনকি দশগুণ-বিশগুণ মূল্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে বাধ্য হয়। প্রতিদিন তিন বেলার স্থানে এক বেলা-আধাবেলা এবং এক পোয়ার স্থানে এক ছটাক খাদ্য গ্রহণ করে জীবন-মৃত্যুর মাঝপথে লড়তে থাকে। এতে গুটি কয়েক লোক রাতারাতি বিপুল অর্থ-সম্পদে স্ফীত হয়ে উঠলেও বৃহত্তর জনগোষ্ঠী হয় বর্ণনাতীত প্রতারণা ও নিষ্পেষণের শিকার। কোথাওবা গৃহ-নির্মাণ লোন ও কৃষি লোনের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণ তাদের জীবন যাপনের সর্বশেষ সম্বলটুকুও হারিয়ে বসে। সে কারণে ইসলাম সুদের ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে এবং একে হারাম ঘোষণা করেছে। আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত বলেন– فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ অর্থাৎ "তোমরা যদি সুদী কারবার থেকে বিরত না হও তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হও।" অর্থাৎ সুদের ব্যবসা করা প্রকারান্তরে আল্লাহ্র সাথে যুদ্ধ করার শামিল। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ)-সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূলে কারীম (সাঃ) সুদদাতা ও গ্রহীতা এবং সুদী কারবারের লেখক ও সাক্ষী সকলের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন এরা সকলেই পাপের দিক থেকে সমান।

রিবার বিচারে সমুদয় দ্রব্যসামগ্রীকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায় ঃ (১) সোনারূপা (২) (এ ছাড়া অন্যান্য) ওজনভুক্ত দ্রব্য। যেমন– ধান, চাল, তরি-তরকারি, চিনি, লবণ, দুধ, গোশ্ত, লোহা, তামা, এলুমিনিয়াম প্রভৃতি। (৩) কায়ল (মাপক) দ্বারা বিক্রি হয় যে সকল বস্তু। যেমন– সিমেন্ট, বালি, কঙ্কর, মাটি প্রভৃতি। (৪) সংখ্যায় কিংবা গজ ফিতায় বিক্রি হয় যে সকল জিনিস যেমন– গরু, ছাগল, হাস, মুরগি, কাঠ, কাপড়, চট, কার্পেট, কাগজ, কলম, বইপুস্তক প্রভৃতি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকার দ্রব্যসামগ্রীর লেনদেনে দুইভাবে 'রিবা' সৃষ্টি হতে পারে। (এক) একই জাতীয় বস্তুর অদল-বদলে কমবেশি করা, যেমন– এক কেজি গমের বিনিময়ে সোয়া কেজি গম এবং দেড় কেজি পুরাতন এলুমিনিয়ামের বিনিময়ে এক কেজি নতুন এলুমিনিয়াম গ্রহণ করা। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের জিনিসে সমান বেশকম হলেও ওজন বা পরিমাপে কমবেশি করা যাবে না, আর এ ধরনের রিবাকে رِبَا الْفَضْلِ বলা হয়। (দুই) একই জাতীয় দ্রব্যের অদল-বদল হাতে হাতে না করে ধারে করা, যেমন– এক গাড়ি মিহীন বালির বিনিময়ে এক গাড়ি মোটা বালি ক্রয় করে মোটা বালিগুলো তৎক্ষণাৎ বুঝে নিয়ে মিহীন বালিগুলো এক সপ্তাহ পরে হস্তান্তর করার ওয়াদা করা। ফিক্হের পরিভাষায় একে رِبَا النَّسِيْئَةِ বলে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে একটি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, রিবা-নাসীআ এবং 'আরিয়ত (ধার প্রদান) এক জিনিস নয়; ১ম টি হারাম হলেও ২য় টি হারাম তো নয়ই; বরং মুস্তাহাব। যেমন– কেউ এক পেয়ালা চাউল নিল এ শর্তে যে, এক সপ্তাহ পর তা দিয়ে দেবে। এটা জায়েয। কারণ এটা বিক্রয়মূলক চুক্তি নয়; বরং নিছক মানবিক কারবার যা 'আরিয়ত (ধার) নামে পরিচিত। এতদ সম্পর্কিত বিস্তারিত আলোচনা 'আরিয়ত' অধ্যায়ে করা হবে ইনশাআল্লাহ।

চতুর্থ প্রকার দ্রব্য সামগ্রীর ক্ষেত্রে একই জাতীয় বস্তুর অদল-বদলে কমবেশি করলে রিবা হবে না, তবে আদান-প্রদান নগদ না করে বাকি করলে রিবা হবে। যেমন– এক গজ চটের বিনিময় দুই গজ চট এবং এক জোড়া সেন্ডেলের বিনিময়ে দুই জোড়া সেন্ডেল গ্রহণ করা দূষণীয় নয়। কিন্তু এক গজ চট নগদ বুঝে নিয়ে বিনিময়ে দুই গজ চট তিন দিন পরে দেয়ার ওয়াদা করা দূষণীয়। অনুরূপভাবে প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্বর্ণ ও রূপার মধ্যে যদি একটি অপরটির সাথে বদল করা হয় (যেমন– চাল দিয়ে গম বা গম দিয়ে বুট ক্রয় করল) কিংবা তৃতীয় প্রকার দ্রব্যসমূহের পারস্পরিক বিনিময় করা হয়, (যেমন– বালি দিয়ে সুরকি ক্রয় করল) তাহলে উভয় দিকের বিনিময় পরিমাণে সমান হওয়া জরুরি হবে না। কিন্তু লেনদেন অবশ্যই হাতে হাতে হতে হবে। সে মতে এক তোলা স্বর্ণের বিনিময়ে দশ তোলা রূপা, এক কেজি চিনির বিনিময়ে তিন কেজি বাদাম এবং এক ব্যাগ বালির বিনিময়ে দুই ব্যাগ সুরকি গ্রহণ করলে রিবা হবে না। পক্ষান্তরে স্বর্ণ নগদ গ্রহণপূর্বক রূপা পরে দেয়ার ওয়াদা করলে কিংবা এখন চাল নিয়ে পরে গম দেয়ার চুক্তি করলে তা 'রিবা' এর মধ্যে পরিগণিত হবে। চিনি, বাদাম, বালি ও সুরকির বিধানও অনুরূপ।

আর যদি ১ম প্রকারের সাথে ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ প্রকার বা ২য় প্রকারের সাথে ১ম, ৩য় ও ৪র্থ প্রকার এক কথায় উপরোক্ত চার প্রকারের যে কোন এক প্রকারের সাথে অন্য প্রকারের বিনিময় করা হয় তাহলে বিনিময়ের যে কোন অংশে কমবেশি করলে যেমন রিবা হবে না, তদ্রূপ একাংশ নগদ নিয়ে বিপরীতাংশ বাকি রাখলেও রিবা হবে না। যেমন– রূপা দিয়ে চিনি বা চিনি দিয়ে বালি অথবা বালি দিয়ে চট বা চট দিয়ে ডিম কিংবা ডিম দিয়ে রূপা প্রভৃতি যদি ক্রয় করা হয়, তাহলে যে কোন এক দিকে কমবেশি করা বা বাকি করা দূষণীয় নয়।

فَالْعِلَّةُ فِيْهِ الْكَيْلُ الخ -এর আলোচনা ঃ কুরআন মাজীদের বিভিন্ন আয়াতে রিবাকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। কিন্তু মহাজনী সুদের ন্যায় অন্য কোন কারবার নিষিদ্ধতার আওতাভুক্ত হবে কিনা? তা নিয়ে সাহাবায়ে কেরাম দ্বিধায় পড়ে যান। হুযূর (সাঃ) তখন দ্বিধা দূর করে দিয়ে বললেন– اَلْحِنْطَةُ بِالْحِنْطَةِ الخ অর্থাৎ গম, যব, খেজুর, লবণ, সোনা ও রূপা এ সকল দ্রব্যের লেনদেন উভয় দিকে পণ্য যদি একই জাতীয় হয়, তবে উভয় পণ্যের পরিমাণ সমান ও আদান-প্রদান নগদ হতে হবে। কোন এক দিকের পণ্য বেশি হলে বা বাকি থাকলে তা হবে রিবা। হাদীসটি অসংখ্য রাবী-সূত্রে বর্ণিত বিধায় এটি হাদীসে-মুতাওয়াতিরের স্তরে উন্নীত। তবে মুজতাহিদ আলিমগণ সকলেই এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীসে বর্ণিত উপরোক্ত ছয়টি দ্রব্যের সাথেই রিবার হুকুম খাস নয়; বরং অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীতেও এ হুকুম প্রযোজ্য হতে পারে এবং তা হবে কিয়াসের মাধ্যমে। এবং এ ব্যাপারে ঐকমত্য রয়েছে যে, عِلَّت -এর مَاخَذ এ হাদীসই। তবে حُرْمَت -এর مِعْيَار বা মাপকাঠি এবং مُمَانَعَت -এর عِلَّت -এর ক্ষেত্রে বিভিন্ন মতামত রয়েছে। যখন কোন জিনিসকে অন্য জিনিসের ওপর কিয়াস করে, তখন উভয়ের মধ্যে একটি مُشْتَرَك গুণের প্রতি লক্ষ্য করা হয়, যাকে ফিক্‌হের পরিভাষায় عِلَّت বলা হয়। উল্লিখিত জিনিসগুলোর মধ্যে وَصْف مُشْتَرَك তথা হারাম হওয়ার عِلَّت কি? এ ব্যাপারে ওলামাগণের থেকে বিভিন্ন মতামত রয়েছে–

ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, (পুরাতন মত) قَوْل বা كَيْل -এর সাথে وَزْن তথা খাবার মধ্যে আসা। আর তার طَعْم তথা নতুন মত হল প্রথম চারটির মধ্যে طَعْم এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের ক্ষেত্রে ثَمَنِيَت এবং দ্বিতীয় গুণটিতে جِنْس -এর جَدِيْد একত্রিত হওয়াকে عِلَّت স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। যেহেতু চুনা ও نُوْرَة -এর মধ্যে এ দু'টি عِلَّت পাওয়া যায় না। এ জন্য শাফেয়ীদের নিকট তাতে কমবেশি বৈধ হবে। এমনিভাবে স্বর্ণ-রৌপ্য ব্যতীত অন্যান্য জিনিস, যা مُبَادَلَة -এর ক্ষেত্রে দেয়া যায়। যথা– লোহা, তামা, পিতল, কাপড় ইত্যাদি। এর মধ্যে অতিরিক্ততাকে সুদ বলা হবে না।

ইমাম মালিক (রঃ) প্রথম চারটি জিনিসের মধ্যে اِقْتِيَات বা غَذَائِيَت ও শেষের দু'টির মধ্যে اِدِّخَار -কে ইল্লত বলেছেন। তখন তাঁর নিকট খারাপ মাছ ও খরাপ গোশতের বেচাকেনা قُوَّت ও ذَخِيْرَه না হওয়ার কারণে তা বৈধ হবে। তেমনিভাবে সোনা-রোপা ব্যতীত যে সকল জিনিস খাওয়া যায় না এবং ذَخِيْرَه ও হয় না, যথা– সবুজ তরকারি, লৌহ, তাম্র ইত্যাদি এতেও সুদ হবে না।

ইমাম আযম (রঃ) এ জিনিস সমূহে মোকাবেলায় اِتِّحَاد جِنْس ও مُمَاثَلَت হতে قَدْر مَعْهُوْد তথা كَيْلِى বা وزنى হওয়াকে حُرْمَت رِبٰوا -এর عِلَّت নির্ণয় করেছেন। কেননা উল্লিখিত হাদীসে ৬টি জিনিসকে দৃষ্টান্ত স্বরূপ বর্ণনা করে একটি তথা পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার দিকে ইশারা করেছেন। এ কারণেই স্বর্ণ-রৌপ্য হল ওজনী। আর গম, যব, লবণ ইত্যাদি হল كَيْلِى তাহলে যেন এদিকেই ইশারা করেছেন যে, প্রতিটি كَيْلِى ও وَزْنِى জিনিসের মধ্যে مُمَاثَلَت প্রয়োজন। এবং দু'টি জিনিসের মাঝে দু'হিসেবে পূর্ণ مُمَاثَلَت হতে পরে। একটি সুরতের হিসেবে আর অপরটি مَعْنٰى -এর হিসেবে। কাজেই كَيْل ও وَزْنِى -এর দ্বারা مُمَاثَلَت صُوْرِى অর্জন হবে। আর مُتَّحِدُ الْجِنْس হওয়ার ক্ষেত্রে مُمَاثَلَت مَعْنَوِى অর্জন হবে। এ কারণেই ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) সুদ হারাম হওয়ার عِلَّت , اِتِّحَاد جِنْس -এর সাথে كَيْل বা وَزْن হওয়াকে বলেছেন। কাজেই ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট ফুল ও যে সকল বস্তু ওজন বা মেপে বিক্রি করা হয় না তাতে সুদ হবে না। ইমাম আহমদ (রঃ) ও এরূপ মন্তব্য করেছেন।

بَيْعُ الْمَكِيْلِ الخ -এর আলোচনা ঃ বাটখারা ব্যতীত ঝুড়ি, বস্তু বা অন্য কোন পাত্রের সাহায্যে মাপাকে কায়ল বলে এবং এ মাপের সামগ্রীকে মাকীল বা কায়লভুক্ত বলা হয়। যেমন– বালি, সুরকি ও মাটি প্রভৃতি। সুতরাং কেউ যদি বালি দ্বারা বালি বিনিময় করে, তবে পরিমাণে সমান এবং লেনদেন নগদ হতে হবে।

وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ مِمَّا فِيهِ الرِّبٰوا اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَاِذَا عَدِمَ الْوَصْفَانِ الْجِنْسُ وَالْمَعْنَى الْمَضْمُومُ اِلَيْهِ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَاِذَا وُجِدَا حَرُمَ التَّفَاضُلُ وَالنَّسَاءُ وَاِذَا وُجِدَ اَحَدُهُمَا وَعَدِمَ الْاٰخَرُ حَلَّ التَّفَاضُلُ وَحَرُمَ النَّسَاءُ - وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ كَيْلًا فَهُوَ مَكِيلٌ اَبَدًا وَاِنْ تَرَكَ النَّاسُ فِيهِ الْكَيْلَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى تَحْرِيمِ التَّفَاضُلِ فِيهِ وَزْنًا فَهُوَ مَوْزُونٌ اَبَدًا وَاِنْ تَرَكَ النَّاسُ الْوَزْنَ فِيهِ مِثْلُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَمَالَمْ يَنُصَّ عَلَيْهِ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلٰى عَادَاتِ النَّاسِ وَعَقْدُ الصَّرْفِ مَاوَقَعَ عَلٰى جِنْسِ الْاَثْمَانِ يُعْتَبَرُ فِيهِ قَبْضُ عِوَضَيْهِ فِي الْمَجْلِسِ وَمَا سِوَاهُ مِمَّا فِيهِ الرِّبٰوا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ وَلَا يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّقَابُضُ-

সরল অনুবাদ ঃ রিবা-সামগ্রীর উৎকৃষ্টকে নিকৃষ্টের সাথে সমান সমান না করে বিনিময় করা জায়েয নেই। যখন (পণ্যের মধ্যে) রিবাসূচক এ দুই কারণ অর্থাৎ সমজাতীয়তা ও তার সাথে মিশ্রিত বিষয় (অর্থাৎ পরিমাপ বা পরিমাণ পদ্ধতির অভিন্নতা) অনুপস্থিত থাকে, তখন পরস্পরে কমবেশি করে বা ধারে লেনদেন করা জায়েয। আর যখন উভয় কারণ বিদ্যমান থাকে তখন কমবেশি করে এবং ধারে উভয় রকম লেনদেনই হারাম। পক্ষান্তরে যখন দু'টি কারণের একটি বিদ্যমান ও অপরটি অবর্তমান থাকে, তখন কমবেশি করা হালাল কিন্তু ধারে বিনিময় হারাম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যে সকল দ্রব্য কায়ল বা পরিমাপের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম বলে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সর্বদা কায়লভুক্ত দ্রব্য পরিগণিত হবে; যদিওবা জনসাধারণ তাতে কায়লের ব্যবহার ছেড়ে দেয়, যেমন– গম, যব, খেজুর ও লবণ। আর যেগুলো ওজনের ভিত্তিতে কমবেশি করা হারাম বলে বর্ণনা করেছেন সেগুলো সর্বদা ওজনভুক্ত দ্রব্য রূপেই গণ্য হবে, যদিও জনসাধারণ তাতে ওজনের ব্যবহার ছেড়ে দেয়। যেমন– সোনা ও রূপা। আর যে সকল দ্রব্যের ওযন বা কায়লভুক্তি সম্পর্কে তিনি সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি সেগুলো সর্বসাধারণের ব্যবহার-রীতি দ্বারা নির্ণীত হবে। 'সরফ চুক্তি' যা মুদ্রাজাতীয় জিনিসপত্রের ওপর সংঘটিত হয় তাতে উভয় বিনিময় মজলিসে (উপস্থিত ক্ষেত্রে) করায়ত্ত করা ধর্তব্য। আর সোনা-রূপা ব্যতীত অপরাপর রিবা-সমাগ্রীর ক্ষেত্রে (বিনিময়কৃত দ্রব্য মজলিসে) নির্দিষ্ট করণ ধর্তব্য; উভয় পক্ষ পণ্য করায়ত্ত করা ধর্তব্য নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْجَيِّدِ بِالرَّدِيِّ الخ-এর আলোচনা ঃ যেমন উন্নত জাতের গম দ্বারা নিম্ন জাতের গম এবং উৎকৃষ্ট মানের চালের সাথে নিকৃষ্ট মানের চাল ও এলুমিনিয়ামের পুরাতন ডেগ-ডেগচি দ্বারা নতুন এলুমিনিয়াম-সামগ্রী বিনিময় করা হলে উভয় দিকের মালের পরিমাণ সমান হওয়া অবশ্যই জরুরি। এ সকল ক্ষেত্রে রিবা থেকে আত্মরক্ষার উপায় হল নিম্নমানের দ্রব্যগুলো

প্রথম টাকা-পয়সা বিনিময়ে ব্যাপারীর নিকট বিক্রি করে দেবে। অতঃপর বিক্রয়লব্ধ অর্থের বিনিময়ে ব্যাপারীর কাছ থেকে নতুন সামগ্রী ক্রয় করে নেবে। এ নিয়ম কাসা, পিতল, লৌহ, দস্তা, স্বর্ণ, রূপা অন্য সকল প্রকার কায়লী ও ওজনী ধাতুর ক্ষেত্রে অনুসরণ করা যেতে পারে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ উল্লেখ্য যে, সমজাতভুক্ত দ্রব্যের উত্তমকে অধমের সাথে বেশকম করে বিনিময় করার মধ্যে রিবার অর্থ বোধগম্য নয়। শরীয়ত প্রণেতা খুব সম্ভব রিবার সহায়ক পথ বিবেচনায় একে রিবার অন্তর্ভুক্ত করে হারাম ঘোষণা করেছেন, যাতে প্রকৃত রিবার মানসিকতা পরিপুষ্ট হতে না পারে। এটা অনেকটা বহুদূর ঘিরে নিষিদ্ধ এলাকা বেড়া দেয়ার মতো।

وَإِذَا وُجِدَ أَحَدُهُمَا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– আনারস দ্বারা আনারস বিনিময় করা হলে 'সমজাতীয়তা' পাওয়া যায় বটে কিন্তু 'ক্বদর' তথা পরিমাপ বা পরিমাণভুক্তি অবর্তমান থাকে। কারণ আনারস কায়লী বা ওজনী কোনটাই নয়। কাজেই রিবা সৃষ্টির আরেকটি মাত্র কারণ এখানে বিদ্যমান থাকে, তাহল জাতিগত অভিন্নতা। সে কারণে একটি আনারসের বিনিময়ে দু'টি বা ততোধিক আনারস লওয়া দুরস্ত হলেও ধারে বিনিময় করা দুরস্ত হবে না। একইভাবে কেউ যদি পেঁয়াজ দিয়ে আলু ক্রয় করে তাহলে এক কেজি পেঁয়াজের বিপরীতে দুই কেজি বা তারচেয়ে বেশি আলু গ্রহণ করলে রিবা হবে না। কিন্তু আলু বা পেঁয়াজ এর কোন একটি বাকি রাখলে রিবা হবে। কারণ উভয় দিকের পণ্য অভিন্ন জাতের না হলেও ওজনভুক্ত তো বটেই। অর্থাৎ উভয় পণ্যই ওজনে বিক্রি হয়।

وَكُلُّ شَيْءٍ نَصَّ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা হুযূর (সাঃ)-এর বর্ণনা (نَص) সামাজিক রীতি-রেওয়াজ (عُرْف) অপেক্ষা অধিকতর শক্তিশালী। অবশ্য সামাজিক রীতিও এক প্রকার দলিল; কিন্তু তা নিতান্তই দুর্বল। আর দুর্বল দলিলের অজুহাতে শক্তিশালী দলিল বর্জন করা যায় না। সে কারণে ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, গম দ্বারা গমের বিনিময় করার সময় কায়লের মাধ্যমে তা সমান করে নিতে হবে। ওজনের ভিত্তিতে সমান করা হলে বিক্রি জায়েয হবে না। কারণ এমতবস্থায় কমবেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তবে হাঁ, কায়লের মতো ওজনের মাধ্যমে যদি উভয় দিকের পণ্য সমান হবে বলে নিশ্চিত হওয়া যায়, তাহলে বিক্রি জায়েয হবে। জায়েয হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। –(শামী) কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় দূষণীয় নয়। কারণ তাঁর মতে, মাপজোখের ব্যাপারে যখনকার যে রীতি তাই প্রযোজ্য।

عَلَى جِنْسِ الْأَثْمَانِ الخ -এর আলোচনা ঃ أَثْمَانٌ শব্দটি ثَمَنٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ– স্বর্ণ-রূপার তৈরি মুদ্রা; অনেক সময় সাধারণ মুদ্রা অর্থেও ব্যবহৃত হয়। কাজেই স্বর্ণ দিয়ে স্বর্ণ বা স্বর্ণ রূপা গ্রহণ করাই হল 'আকদে সরফ'। পুরাতন নোট দিয়ে নতুন নোট বা বড় নোট দিয়ে ছোট নোট অথবা নোট দিয়ে খুচরা পয়সা গ্রহণ করাও 'আকদে সরফে'র মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।

মুদ্রা দ্বারা মুদ্রা আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে উভয় দিকের মুদ্রা যদি একই পদার্থের হয়, যেমন– দিনার দিয়ে দিনার লেনদেন করা হল, তখন কোন এক দিকের মুদ্রা বেশি হওয়া যেমন নিষিদ্ধ তেমনি বাকি রাখাও নিষিদ্ধ। আর যদি ভিন্ন পদার্থের হয়, যেমন– রূপার পরিবর্তে স্বর্ণ নেয়া হল, তাহলে উভয় দিকের মুদ্রা পরিমাণে সমান হওয়া জরুরি নয় বটে; কিন্তু লেনদেন নগদ হতে হবে নতুবা 'রিবান নাসীআ' সৃষ্টি হবে। কিন্তু এখানে নগদ মানে শুধুমাত্র ইশারায় নির্দিষ্ট করে নেয়া (যেমন এ দশ দিরহামের বিনিময়ে ঐ পাঁচটি দিনার নিলাম বলে উভয় পক্ষ নিজ নিজ মুদ্রা পৃথক করে রাখল) নয়; বরং সাথে সাথে কব্জা করে নেয়া। অর্থাৎ প্রত্যেকেই নিজের প্রাপ্য দ্বিতীয় জনের হেফাজত থেকে নিজ হেফাজতে নিয়ে আসবে। কারণ টাকা-পয়সা করায়ত্ত না করা পর্যন্ত নির্দিষ্ট হয় না।

يُعْتَبَرُ فِيهِ التَّعْيِينُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ টাকা-পয়সা ছাড়া অন্যান্য সকল দ্রব্য পৃথক করে নিলে বা ইঙ্গিত করে দেখিয়ে দিলেই নির্দিষ্ট হয়ে যায়; এজন্য মুঠায় বা হেফাজতে নেয়ার দারকার পড়ে না। সে মতে কেউ যদি পৃথক করে রাখা এক মণ চিনি পৃথক করে রাখা এক মণ ডালের সাথে বিনিময় করে এবং প্রত্যেকেই বিনিময়কালে ইঙ্গিত করে নিজ নিজ পণ্য দেখিয়ে দেয়, তবে সাথে সাথে পণ্য দখলে না নিলেও দোষের কিছু নেই।

وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيْقِ وَلَا بِالسَّوِيْقِ وَكَذٰلِكَ الدَّقِيْقُ بِالسَّوِيْقِ - وَيَجُوْزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَاَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ حَتّٰى يَكُوْنَ اللَّحْمُ اَكْثَرَ مِمَّا فِى الْحَيَوَانِ فَيَكُوْنَ اللَّحْمُ بِمِثْلِهٖ وَالزِّيَادَةُ بِالسَّقْطِ وَيَجُوْزُ بَيْعُ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَكَذٰلِكَ الْعِنَبُ بِالزَّبِيْبِ وَلَايَجُوْزُ بَيْعُ الزَّيْتُوْنِ بِالزَّيْتِ وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ حَتّٰى يَكُوْنَ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ اَكْثَرَ مِمَّا فِى الزَّيْتُوْنِ وَالسِّمْسِمِ فَيَكُوْنَ الدُّهْنُ بِمِثْلِهٖ وَالزِّيَادَةُ بِالثَّجِيْرَةِ وَيَجُوْزُ بَيْعُ اللُّحْمَانِ الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَكَذٰلِكَ اَلْبَانُ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَخَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ مُتَفَاضِلًا وَلَا رِبٰوا بَيْعُ الْخُبْزِ بِالْحِنْطَةِ وَالدَّقِيْقِ مُتَفَاضِلًا وَلَارِبٰوا بَيْنَ الْمَوْلٰى وَعَبْدِهٖ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِىِّ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ -

সরল অনুবাদ ঃ আটা বা ছাতুর বিনিময়ে (কায়লের) গম বিক্রি করা জায়েয নেই; তদ্রূপ ছাতুর বিনিময়ে আটা বিক্রি করাও দুরস্ত নেই। ইমাম আবূ হানীফা ও আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, পশুর বিনিময়ে গোশ্ত বিক্রি করা জায়েয। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, বিনিময়কৃত গোশ্ত পশুর দেহস্থিত গোশ্তের চেয়ে বেশি না হলে বিক্রি জায়েয হবে না। তখন তার সমপরিমাণ গোশ্তের বিনিময় হয়ে বাকি গোশ্ত পশুর হাড়-গোড় ও অন্যান্য অংশের বিনিময় সাব্যস্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, পরিপক্ক শুকনা খেজুরের বিনিময়ে পরিপক্ক তাজা খেজুর বিক্রি করা জায়েয আছে সমান করে। এভাবে কিসমিসের বিনিময়ে আঙ্গুর বিক্রি করাও জায়েয। কিন্তু যায়তুন তৈলের বিনিময়ে যায়তুন ফল এবং তিলের তৈলের বিনিময়ে তিল বিক্রি করা জায়েয নেই। তবে বিনিময়কৃত তৈলের পরিমাণ যায়তুন বা তিলের মধ্যস্থিত তৈলের চেয়ে অধিক হলে বিক্রি জায়েয হবে। তখন যায়তুন বা তিলস্থিত তৈল তার সমপরিমাণ তৈলের বিনিময় হবে আর অবশিষ্ট তৈল হবে খৈল বা গাদের বিনিময়। বিভিন্ন শ্রেণীর পশুর গোশ্ত পরস্পরে কমবেশি করে বিনিময় করা জায়েয। এভাবে উট, গাভী ও বকরির দুধের পারস্পরিক বিনিময়ে কমবেশি করা জায়েয। এবং জায়েয আছে আঙ্গুরের সিরকার সাথে খেজুরের সিরকার বেশকম করে বিনিময় করা। গম ও আটার বিপরীতে রুটি বেশকম করে বিক্রি করাও দুরস্ত আছে। কোন মনিব তার ক্রীতদাসের সাথে এবং দারুল হরবে অবস্থানরত কোন মুসলমানের জন্য সেখানের কাফির নাগরিকের সাথে রিবামূলক কারবার করা নিষিদ্ধ নয়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَايَجُوْزُ بَيْعُ الْحِنْطَةِ بِالدَّقِيْقِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ছাতুর পরিবর্তে গম বিক্রি করা জায়েয। কারণ আটা গমেরই মিহীন চূর্ণরূপ এবং ছাতু হল ভাজা গমের গুড়া। এ মতে আটা, ছাতু এবং গম এই তিনটি মূল উপাদানের বিচারে অভিন্ন বস্তু; বিধায় কায়লের মাধ্যমে এদের পারস্পরিক বিনিময় করলে কমবেশি হওয়াই স্বাভাবিক। কাজেই তা জায়েয হবে না। তবে ওজনের ভিত্তিতে বিনিময় করলে বেশকম হওয়ার সম্ভাবনা নেই বিধায় তা জায়েয হওয়া উচিত।

وَيَجُوْزُ بَيْعُ اللَّحْمِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** গোশত দ্বারা পশু ক্রয় করা জায়েয। এতে দৃশ্যত পশুর মধ্যে গোশ্তের পরিমাণ বেশি হওয়ার সম্ভবনা থাকলেও কোন অসুবিধা নেই। কারণ গোশ্ত হল ওজনভুক্ত দ্রব্য আর পশু ওজনভুক্ত নয়; বরং গণনীয়, কাজেই উভয় দিকের বিনিময় সমজাতভুক্ত হলেও 'ক্বদর' এর দিক থেকে অভিন্ন নয়। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, গোশতের পরিমাণ অধিক হলেই তবে বিনিময় শুদ্ধ হবে। যেমন– একটি পশুর মধ্যে যদি কলিজা, গুরদা,

অস্থি-মজ্জা ইত্যাদি বাদ দিয়ে দশ কেজি গোশত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে বারো কেজি গোশতের সাথে উক্ত পশুটি বদল করা জায়েয হবে। তখন দশ কেজি গোশতের বিপরীতে দশ কেজি এবং অবশিষ্ট দুই কেজি কলিজা, গুরদা প্রভৃতির বিনিময় ধর্তব্য হয়। পশুর দেহস্থিত গোশতের চেয়ে পৃথক গোশতের পরিমাণ বেশি না হলে তা রিবায় পরিণত হবে। শায়খাইন (রঃ)-এর বক্তব্য হল, রিবা হওয়ার জন্য শুধু সমজাতীয়তাই যথেষ্ট নয়; বরং পণ্যদ্বয় 'কৃদর' ভুক্ত হওয়াও জরুরি। এখানে বিনিময়কৃত গোশত 'কৃদর' ভুক্ত হলেও পশু কৃদরভুক্ত নয়।

وَكَذٰلِكَ الْبَانُ الْاِبِلِ الخ-এর আলোচনা ঃ اَلْبَانٌ শব্দটি لَبَنٌ শব্দের বহুবচন, অর্থ– দুধ। বিভিন্ন পশুর দুধ পরস্পরে কমবেশি করে বিনিময় করা জায়েয। কারণ প্রত্যেক পশুর দুধের গুণাগুণ ভিন্ন হওয়ায় এখানে জাতের অনৈক্য বিদ্যমান রয়েছে।

وَيَجُوزُ بَيْعُ الْخُبْزِ الخ-এর আলোচনা ঃ কেননা গম কায়লী দ্রব্য হলেও রুটি কায়লী নয়; বরং গণনীয় দ্রব্য। অপর দিকে উভয়টির জাতও ভিন্ন। অতএব আটা দ্বারা রুটির বিনিময় নিঃসন্দেহে কমবেশি করে করা যায়।

وَلَا رِبٰوا بَيْنَ الْمَوْلٰى وَعَبْدِهٖ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কোন ব্যক্তি যদি তার অধিকারভুক্ত ক্রীতদাসের সাথে লেনদেন করতে গিয়ে রিবামূলক কারবার করে, তবে তা বাহ্যত রিবা মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে রিবা নয়। কারণ গোলামের মাল মূলত মাওলারই মাল। তবে এজন্য উক্ত ক্রীতদাসকে অবশ্যই এমন হতে হবে, মালিকের পক্ষ থেকে যার ব্যবসা করার অনুমতি রয়েছে এবং যে ঋণগ্রস্তও নয়। এভাবে কোন মুসলমানের জন্য জায়েয আছে, দারুল হরবে গিয়ে সেখানের কোন কাফির নাগরিকের সাথে রিবামূলক কারবার করা। কেননা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন—

لَا رِبٰوا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْحَرْبِىِّ فِىْ دَارِ الْحَرْبِ অর্থাৎ কোন মুসলিম ও হরবী দারুল হরবে রিবামূলক লেনদেন করলে তাতে রিবার হুরমত প্রযোজ্য হবে না। তাছাড়া হরবী রাষ্ট্রে কাফিরদের সহায়-সম্পত্তি মুসলমানের জন্য ভোগ করা হালাল। তবে তা নিতে হবে তাদের সম্মতি তথা কায়-কারবারের মাধ্যমে, হোক সে কারবার শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয, যেমন বাইয়ে ফাসিদ, জুয়া, রিবা প্রভৃতি। অবশ্য প্রতারণার আশ্রয়ে গ্রহণ করা হলে কখনোই সে মাল হালাল হবে না।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ এখানে একটা জরুরি ও জটিল বিষয়ে আলোকপাত করতে চাই। যদিও এটা বিস্তারিত আলোচনার স্থান নয় তথাপি বিষয়টা ঘিরে যেহেতু অনেক অনভিপ্রেত ধারণার জন্ম নেয় সে কারণে সংক্ষেপে কিছু বলে রাখা সঙ্গত মনে করছি। এতে বড় বড় কিতাব থেকে মাসআলাটি বুঝায় যথেষ্ট সহায়তা হবে। মাসআলাটি হল বিদেশ-ভূমিতে মুসলমানদের কারবারের ধরন কেমন হবে?

শাসনতান্ত্রিক আইনের দৃষ্টিতে ইসলাম গোটা বিষয়কে দু'ভাগে ভাগ করে। একটি দারুল–ইসলাম অন্যটি দারুল-কুফর। দারুল–ইসলাম ঐ অঞ্চলকে বলে যেখানে মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত, ইসলামের আধিপত্য বিস্তৃত এবং কার্যত ইসলামের আইন প্রবর্তিত। অথবা সেখানে শাসকদের মধ্যে এতটা শক্তি-সামর্থ্য থাকবে, যাতে করে তারা এ আইন বাস্তবায়িত করতে পারে। বলা বাহুল্য যে, মুসলিম রাষ্ট্রের শাসন ইসলামী আইনে পরিচালিত হয় না শুধু শাসকদের মধ্যে ইসলামের শাসন বাস্তবায়ন করার ক্ষমতা আছে মাত্র তাকে 'দারুল-ইসলাম' অভিহিত করা অনেকটা দরুল-কুফর আখ্যা দেয়া থেকে বেঁচে থাকার মতো। কার্যত সে রাষ্ট্র দারুল-ইসলাম নয়।

দারুল-ইসলামের মর্যাদা ঃ দারুল-ইসলামে মুসলমান, জিম্মি ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (مُسْتَأْمَن) হরবী সকল নাগরিকের জান-মাল আবরু নিরাপাদ ও সংরক্ষিত। এখানে রাষ্ট্রীয় আইন সকলের ওপর সমানভাবে প্রযোজ্য হবে। এ ভৌগলিক গণ্ডিতে ব্যাবাস-বাণিজ্য ও অন্যান্য সমুদয় কায়-কারবার ইসলামের বিধিমালা অনুসারে করা দীন ও দুনিয়া উভয় দিক থেকে প্রতিটি সদস্যের কর্তব্য হবে। চাই সে মুসলমান বা করদাতা অমুসলিম (জিম্মি) হোক অথবা নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (মুস্তা'মান) হরবী হোক। সুতরাং এ রক্ষিত অঞ্চলে তাদের কেউ চুরি, লুণ্ঠন, হত্যা ইত্যাদি অপরাধমূলক কাজ সংঘটন করলে অথবা সুদ, জুয়া, ঘুষ, লটারী, মৃতজীব বিক্রি বা অন্য কোন অবৈধ উপায়ে কারবার করলে পার্থিব আইনে দন্ডনীয় অপরাধ গণ্য হবে। ইমাম (ইসলামী সরকার) সে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। সে ব্যক্তি মুসলমান হলে দীনের বিচারে (বিশ্বাসমূলক আইনে) গুনাহগারও সাব্যস্ত হবে। অবশ্য করদাতা অমুসলিম ও নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবীর বেলায় তিনটি বিষয়ে ব্যতিক্রম রয়েছে– (১) আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উপাসনার অধিকার নিষিদ্ধ, (২) (মাহরাম) ব্যক্তিদের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ও (৩) মদ ও শূকরের কারবার।

দারুল-কুফর ঃ পক্ষান্তরে যে আবাসভূমিতে মুসলমানদের শাসন নেই এবং ইসলামী আইনও চালু নেই, তাহল দারুল-কুফর। একে সাধারণ অর্থে দারুল-হরবও বলা হয়। ইসলামের আন্তর্জাতিক আইনের দৃষ্টিতে এর কয়েকটি অবস্থা হতে পারে– (ক) ইসলামী রাষ্ট্রকে করদাতা দারুল-কুফর, (খ) চুক্তিবদ্ধ দারুল-কুফর, (গ) চুক্তিবদ্ধ বিশ্বাস ঘাতক কাফির-অঞ্চল, (ঘ) অচুক্তিবদ্ধ কাফির অঞ্চল, (ঙ) যুদ্ধরত কাফির গোষ্ঠী। প্রথমোক্ত দুই শ্রেণীর কাফিরদের জান-মাল নিরাপদ। কোন মুসলমান তাদের হত্যা করলে কিংবা মাল লুণ্ঠন করলে রক্তপণ ও ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। (সূরা নিসা, ৯২ নং আয়াত) তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কাফিরদের জান-মাল নিরাপদ নয়। সুতরাং হত্যা করা ও মাল লুণ্ঠন করা দীন ও দুনিয়া (বিশ্বাসমূলক ও ইসলামের রাষ্টীয় আইন) কোন দিক থেকেই অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য নয়। তবে আক্রমণের পূর্বে তাদের চরমপত্র দেয়া উচিত। চরমপত্র (দাওয়াত) ব্যতীত আক্রমণ ও লুটতরাজ চালালে ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইনে (কাযাআন)

যদিওবা সে পাকড়াও হবে না; কিন্তু বিশ্বাসমূলক আইনে (দিয়ানাতান্) অর্থাৎ আল্লাহ্র দরবারে গুনাহ্গার সাব্যস্ত হবে। ইমাম সরখসীর ভাষায়– وَلَوْ قَاتَلُوهُمْ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ كَانُوا اٰثِمِيْنَ فِيْ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّهُمْ لَا يَضْمَنُوْنَ شَيْئًا مِمَّا اَتْلَفُوْا مِنَ الدِّمَاءِ وَالْاَمْوَالِ عِنْدَنَا - (المبسوط ج ١ ص ٣٠)

পঞ্চম শ্রেণীও এ দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাদের চরমপত্র দেয়ার কোন প্রশ্ন নেই। এতো গেল জান-মালের কথা। বাকি তাদের দেশে মুসলমানদের কায়-কারবারের ধরন কি হবে তা সামনে আলোচনা করা হচ্ছে।

বলে রাখা ভালো যে, যথার্থ অর্থে শেষোক্ত তিন শ্রেণীর অঞ্চলই হল দারুল হরব। তাদের প্রচলিত দেশীয় আইন অনুসারে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত (মুস্তা'মান) মুসলমানগণ তাদের সাথে অবৈধ পন্থায় লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারে। যেমন, লটারী ও সুদী কারবার, মদ, শূকর ও মৃত জীব বিক্রি ইত্যাদি। অবশ্য ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) তা করার অনুমতি দেন না। তাঁর কারণ সম্ভবত এই হবে যে, মুসলমানদের আদর্শই স্বতন্ত্র। দুশমনের সামনে তার আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য তখনই ফুটে ওঠবে যখন সে তার শরয়ী বিধান মোতাবেক স্বদেশের ন্যায় সেখানেও কারবার সংঘটন করবে। বিশেষত কাফির ও শত্রু পক্ষের বিরুদ্ধে তো তাদের জাতীয় চরিত্রের মহত্ত্ব অধিকতর শান-শওকতের সাথে প্রকাশ করা উচিত। কারণ মুসলমানদের যুদ্ধ মূলত তীর-ধনুকের যুদ্ধ নয়; আদর্শ ও চরিত্রের যুদ্ধ। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পদ ও ভূখণ্ড অর্জন করা নয়; বরঞ্চ সে চায় দুনিয়ায় তার আদর্শের প্রচার ও প্রসার করতে। হিদায়া গ্রন্থের কিতাবুস্-সিয়ারের এক বর্ণনা থেকে বুঝা যায়, কোন নিরাপত্তাপ্রাপ্ত মুসলমান অবৈধ পন্থায় কারবার করলে ইসলামের রাষ্ট্রীয় আইনে (قَضَاء) যদিওবা তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হবে না কিন্তু সে আল্লাহ্র গ্রেফতারী এড়াতে পারবে না। বর্ণনাটি এই— اَلْعِصْمَةُ الثَّابِتَةُ بِالْاِحْرَازِ بِدَارِ الْاِسْلَامِ لَاتَبْطُلُ بِعَارِضِ الدُّخُوْلِ بِالْاَمَانِ

যাই হোক, বিষয়টি আরো সুস্পষ্ট করার জন্য নিম্নে ইমাম তরফাইন ও আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য ইমাম সারখ্সীর মাবসূত কিতাব থেকে উদ্ধৃত করা হল।

"নিরাপত্তাপ্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য দারুল-হরবে সুদের ওপর নগদ অথবা ধারে কারবার করা, মদ, শূকরের মাংস ও মৃতজীব তাদের কাছে বিক্রি করা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে জায়েয। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) না জায়েয বলেছেন। তাঁর যুক্তি এই যে, মুসলমান যেখানেই থাকুক ইসলামের বিধান মেনে চলতে বাধ্য, আর ইসলামী বিধানই এ ধরনের কাজ হারাম করেছে। লক্ষ্য করার বিষয় যে, নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবী যদি আমাদের রাষ্ট্রে এমন কাজ করে তা জায়েয হবে না। অতএব এখানে যখন না জায়েয তখন দারুল হরবেও না জায়েয হওয়া উচিত। কিন্তু তরফাইন (রঃ) বলেন যে, এতো শত্রুর মাল তার সম্মতিতে নেয়া হচ্ছে। আর মূলে এই রয়েছে যে, তাদের সম্পদ আমাদের জন্য মুবাহ্ (বৈধ)। নিরাপত্তাপ্রাপ্ত এতটুকু দায়িত্ব নিয়ে ছিল যে, সে কোন আত্মসাৎ করবে না। কিন্তু যখন সে চুক্তির মাধ্যমে তার সম্মতিতে এ মাল লাভ করেছে তখন সে বিশ্বাস ভঙ্গের অপরাধ থেকে বেঁচে গেল এবং অবৈধতা থেকে এমনভাবে রক্ষা পেল যে, এ মাল চুক্তি হিসেবে নয়, বরঞ্চ বৈধতার ভিত্তিতে নিয়েছে। এখন রইল দারুল-ইসলামে নিরাপত্তাপ্রাপ্ত হরবীর ব্যাপার। এ হল সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, কারণ নিরাপত্তার কারণে তার মাল রক্ষিত হয়ে গেছে। এজন্য তা নিলে বৈধতার ভিত্তিতে নেয়া হবে না।" –(১ম খণ্ড ৯৫ পৃঃ)

"ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, দারুল-হরববাসীদের মাল লুণ্ঠন করা বা কেড়ে নেয়া যখন মুসলমানদের জন্য হালাল তখন তাদের সম্মতিক্রমে তা নেয়া অধিকতর জায়েয হওয়া উচিত। অর্থাৎ ইসলামী সেনাবাহিনীর আওতার বাইরে অবস্থানকারীদের জন্য কোন নিরাপত্তাই নেই। অতএব মুসলমানদের জন্য সকল সম্ভাব্য উপায়ে তাদের সম্পদ হস্তগত করা জায়েয।" –(১ম খন্ড ১৩৮ পৃঃ)।

কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, মুসলমান যেহেতু দারুল-ইসলামের অধিবাসী এ জন্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী সকল স্থানেই তাদের জন্য সুদ গ্রহণ করা নিষিদ্ধ। তার কাজের এ ব্যাখ্যা ঠিক নয় যে, সে কাফিরের মাল তার সম্মতিক্রমে নিচ্ছে। বরঞ্চ সে প্রকৃতপক্ষে সে মাল ঐ বিশেষ ধরনের কারবারের ভিত্তিতে নিচ্ছে। কারণ সেই বিশেষ ধরনের কারবার (অর্থাৎ অবৈধ চুক্তি) যদি না হয় তাহলে কাফির অন্য কোন পদ্ধতিতে তার মাল দিতে রাজি হবে। যদি দারুল-হরবে এরূপ করা জায়েয হয় তাহলে মুসলমানদের মধ্যে দারুল-ইসলামেও এ ধরনের কারবার জায়েয হবে যে, একজন এক দিরহামের বিনিময়ে দুই দিরহাম দেবে এবং দ্বিতীয় দিরহামটিকে হিবা বলে অভিহিত করবে। –(আল মাবসূত ১৪ নং খন্ড ৫৮ পৃঃ)

বিঃ দ্রঃ حُرْمَتْ رِبٰوا হতে পাঁচটি সুরতকে اِسْتِثْنَاء করা হয়েছে—

১. কৃতদাস ও মনিবের মাঝে সুদ নেই। কেননা গোলামের নিকট যে সম্পদ রয়েছে বাস্তবিক পক্ষে তাতো তার মনিবেরই সম্পদ। কাজেই এখানে কমবেশিতে আদান-প্রদান করলে তাতে সূদ হবে না।

২. شِرْكَتْ مُعَاوَضَه -এর দু' শরিকের মধ্যেও কমবেশিতে লেনদেন করা কোন রূপ সুদ হবে না।

৩. شِرْكَتْ عِنَان -এর দু' শরিকের মাঝেও কমবেশির আদান-প্রদানে সুদ হবে না।

৪. দারুল হরবে মুসলিম ও কাফিরের মাঝে কমবেশিতে লেনদেন করলে তাতে সুদ হবে না।

৫. মুসলমান ও দারুল হরবে ইসলাম গ্রহণকারী ব্যক্তির মধ্যেও সুদ হবে না।

بَابُ السَّلَمِ

اَلسَّلَمُ جَائِزٌ فِي الْمَكِيلَاتِ وَالْمَوْزُونَاتِ وَالْمَعْدُودَاتِ الَّتِي لَا تَتَفَاوَتُ كَالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَالْمَذْرُوعَاتِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَيَوَانِ وَلَا فِي اَطْرَافِهِ وَلَا فِي الْجُلُودِ عَدَدًا وَلَا فِي الْحَطَبِ حُزَمًا وَلَا فِي الرَّطْبَةِ جُرَزًا وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ حَتّٰى يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مَوْجُودًا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ اِلٰى حِينِ الْمَحَلِّ وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ اِلَّا مُؤَجَّلًا وَلَا يَجُوزُ اِلَّا بِاَجَلٍ مَعْلُومٍ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ بِمِكْيَالِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا بِذِرَاعِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ وَلَا فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا فِي ثَمَرَةِ نَخْلَةٍ بِعَيْنِهَا وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ اِلَّا بِسَبْعِ شَرَائِطَ تُذْكَرُ فِي الْعَقْدِ جِنْسٌ مَعْلُومٌ وَنَوْعٌ مَعْلُومٌ وَصِفَةٌ مَعْلُومَةٌ وَمِقْدَارٌ مَعْلُومٌ وَاَجَلٌ مَعْلُومٌ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ اِذَا كَانَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ الْعَقْدُ عَلٰى مِقْدَارِهِ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْمَعْدُودِ وَتَسْمِيَةُ الْمَكَانِ الَّذِي يُوَفِّيهِ فِيهِ اِذَا كَانَ لَهُ حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَحْتَاجُ اِلٰى تَسْمِيَةِ رَأْسِ الْمَالِ اِذَا كَانَ مُعَيَّنًا وَلَا اِلٰى مَكَانِ التَّسْلِيمِ وَيُسَلِّمُهُ فِي مَوْضِعِ الْعَقْدِ ـ

সলম বিক্রির অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্য এবং ঐ সকল গণনীয় দ্রব্য যেগুলো পরস্পরে ব্যবধান হয় না (বা হলেও যৎকিঞ্চিৎ) যেমন আখরোট ও ডিম এবং গজ ফিতায় পরিমেয় দ্রব্যসামগ্রীর মধ্যে সলম কারবার জায়েয আছে। জীব-জন্তু এবং এদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে সলম জায়েয নেই এবং জায়েয নেই চামড়ার মধ্যে গণনার ভিত্তিতে এবং কাঠ-খড়িতে আঁটি হিসেবে এবং তৃণলতায় মুঠি হিসেবে। চুক্তিলগ্ন থেকে মেয়াদ পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত মুসলামফীহ্ (চুক্তিকৃত পণ্য) বাজারে বিদ্যমান না থাকলে সলম জায়েয হবে না। (সলম কারবারে) পণ্য বাকি রাখা না হলে এবং নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে না হলে কারবার শুদ্ধ হবে না। কোন ব্যক্তি বিশেষের মাপক কিংবা গজের ভিত্তিতে সলম করা জায়েয নেই এবং জায়েয নেই কোন বিশেষ এলাকার খাদ্য শস্য এবং সুনির্দিষ্ট বৃক্ষের ফলের ওপর। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, সাতটি শর্ত সাপেক্ষেই কেবল বাইয়ে সলম শুদ্ধ হবে। শর্তগুলো চুক্তির সময় আলোচনা করে নেয়া হবে– (১) (প্রতিশ্রুত দ্রব্যের) জাত নির্ধারিত হওয়া, (২) শ্রেণী নির্দিষ্ট হওয়া, (৩) গুণাগুণ নির্ধারিত হওয়া, (৪) পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া, (৫) চুক্তির সময়সীমা নির্ধারিত হওয়া, (৬) রা'সুলমাল যদি এমন হয় যার পরিমাণের সাথে চুক্তি সম্পৃক্ত যেমন– কায়ল, ওজন বা (স্বল্প ব্যবধান বিশিষ্ট) গণনীয় দ্রব্য হয় তবে এর পরিমাণ জেনে নেয়া (৭) এবং মুসলামফীহ্ বহন-ব্যয় বিশিষ্ট হলে তা কোন জায়গায় রব্বুস্-সালামের নিকট হস্তান্তর করবে তা উল্লেখ করে নেয়া। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, রা'সুলমাল যদি ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া হয় তবে এর নাম নেয়ার প্রয়োজন নেই। এবং প্রয়োজন নেই মুসলামফীহ্ হস্তান্তরের স্থান নির্ধারণ করা; বরং (স্বভাবতই) তা চুক্তি স্থানে হস্তান্তর করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় শব্দার্থ ঃ جَوْزٌ – আখরোট। بَيْضٌ – একবচন بَيْضَةٌ অর্থ– ডিম। جُلُوْدٌ – বহুবচন, একবচনে جِلْدٌ অর্থ– চামড়া। حُزَمٌ – বহুবচন, একবচনে حُزْمَةٌ – গাট্টি। رَطْبٌ – সবজি। جُرَزٌ একবচন جُرْزَةٌ – মুঠি।

بَابُ السَّلَمِ-এর আলোচনা ঃ সম্মানিত গ্রন্থকার যে সকল বেচাকেনার عِوَضَيْنِ বা اَحَدُ الْعِوَضَيْنِ-এর ওপর قَبْضَةٌ করা শর্ত নয়, সে গুলোর বর্ণনা শেষে এমন بُيُوْع সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছেন, যাতে اَحَدُবা عِوَضَيْنِ قَبْضَةٌ হস্তগত করা শর্ত। যেমন– بَيْعُ السَّلَمِ-এর মধ্যে رَأْسُ الْمَالِ হস্তগত করা শর্ত এবং بَيْعُ الصَّرْفِ-এর মধ্যে الْعِوَضَيْنِ উভয় عِوَض-এর ওপর قَبْضَةٌ করা শর্ত।

بَيْعُ السَّلَمِ-কে পূর্বে বর্ণনা করার কারণ ঃ উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যাচ্ছে যে, بَيْعُ السَّلَمِ হল مُفْرَد-এর পর্যায়ে আর بَيْعُ الصَّرْفِ হল مُرَكَّب-এর ন্যায়। আর যেহেতু مُفْرَد টা সর্বদা مُرَكَّب-এর পূর্বেই আলোচিত হয়, বিধায় بَيْعُ السَّلَمِ-এর বিধানসমূহকে بَيْعُ الصَّرْفِ-এর বিধানের পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلسَّلَمُ-এর বিশ্লেষণ ঃ আল্লামা আইনী (রঃ) আল্লামা বাকী (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন যে, سَلَم শব্দটি اَسْلَمَ হতে নেয়া হয়েছে এবং এর هَمْزَه টি سَلْب-এর জন্য। কেননা رَبُّ السَّلَمِ মূলধন (رَأْسُ الْمَالِ) অর্থাৎ দিরহাম বা টাকা مُسْلَمٌ اِلَيْهِ দিয়ে দিলে তা رَبُّ السَّلَمِ-এর নিকট নিরাপদ রইল না।

অথবা, سَلَم শব্দটি تَسْلِيْم হতে নেয়া হয়েছে। কেননা بَيْعُ السَّلَمِ-এর মধ্যে رَأْسُ الْمَالِ-কে মজলিসেই অর্পণ করা লাযেম ও আবশ্যক।

سَلَم ও سَلَف শব্দ দু'টি সমার্থবোধক শব্দ। তদ্রূপ اَسْلَمَ ও اَسْلَفَ ও সমার্থবোধক শব্দ। سَلَم-এর শাব্দিকার্থ হল– এমন বেচাকেনা যাতে মূল্য তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা হয়। আর বিক্রিত বস্তু পরে প্রদান করা হয়।

শরীয়তের পরিভাষায় سَلَم বলা হয়, مُؤَجَّل (বিলম্বে পরিশোধিত বস্তু) -এর মাধ্যমে লেনদেন করা। যেমন– কেউ কারো থেকে দশটি টাকা নিল একটি কলমের বিনিময় যা সে দশ দিন পর আদায় করবে, আর অপর জন তা মেনে নিল। এটাই হল بَيْعُ السَّلَمِ

بَيْعُ السَّلَمِ বৈধতার প্রমাণ ঃ এর বৈধতা কুরআনে কারীম, সুন্নত-ই রাসূল (সাঃ) ও ইজমায়ে উম্মত দ্বারা সাব্যস্ত। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ অর্থাৎ হে মু'মিন সম্প্রদায়! যখন তোমরা পরস্পর ঋণের লেনদেন কর নির্দিষ্ট সময়ের, তখন তা লেখে নাও।

রঈসুল মুফাস্সিরীন ইবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াত দ্বারা بَيْعُ السَّلَمِ-এর বৈধতার ওপর প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন– اَشْهَدُ اَنَّ اللّٰهَ اَحَلَّ السَّلَفَ اَيِ السَّلَمَ অর্থাৎ "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ তা'আলা 'সলফ' তথা 'সলম'-কে হালাল করেছেন।" তাঁর এ বাক্য প্রমাণ করে যে, এ আয়াতটি بَيْعُ السَّلَمِ-এর ব্যাপারে স্পষ্ট আয়াত।

হাদীসে বর্ণিত আছে যে, اِنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ نَهٰى عَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَ الْاِنْسَانِ وَ رَخَّصَ فِى السَّلَمِ অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) যে বস্তু মানুষের মালিকানায় নেই তা বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন এবং بَيْعُ السَّلَمِ-এর ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করেছেন।

বুখারী শরীফে আব্দুল্লাহ ইবনে আবী আউফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, قَالَ كُنَّا لَنُسْلِفُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَبِىْ بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا فِى الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيْبِ অর্থাৎ তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সাঃ), হযরত আবূ বকর ও ওমর (রাঃ)-এর যুগে গম, যব, খেজুর, কিশমিশ-এর মধ্যে بَيْعُ السَّلَمِ করতে ছিলাম।

ইজমা ঃ নবুওয়াতের যুগ হতে অধ্যবধি بَيْعُ السَّلَمِ-এর বৈধতার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য বিরাজমান রয়েছে। রাসূলে মকবুল (সাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন তখন সেখানে এরূপ বেচাকেনার রেওয়াজ ছিল। তিনি তা দেখে বললেন– مَنْ اَسْلَفَ فِىْ شَىْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِىْ كَيْلٍ وَ وَزْنٍ مَعْلُوْمٍ অর্থাৎ সলম বিক্রয় করতে হলে ওয়াদাকৃত পণ্যের পরিমাণ বা

পরিমাপ এবং হস্তান্তরের মেয়াদ সুনির্দিষ্ট হওয়া বাঞ্ছনীয়। -(বুখারী) বৃহত্তর মানব কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখেই শরীয়ত এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় অনুমোদন করেছে। নতুবা কিয়াসের দাবি ছিল তা জায়েয না হওয়া, কারণ এখানে অবর্তমান পণ্যের ওপর কারবার সংঘটিত হয় যা মূলত নিষিদ্ধ।

بَيْعُ السَّلَمِ **-এর শর্তসমূহ ঃ** সলম বিক্রয় সহীহ হওয়ার জন্য নিম্নোক্ত শর্তাবলী পালন করা জরুরি- (১) কথাবার্তা পাকা-পোক্ত হতে হবে; খেয়ারে শর্ত থাকতে পারবে না, (২) ওয়াদাকৃত দ্রব্যের গুণ, মান, পরিমাণ তথা সকল দিক অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বলে বা লেখে নিতে হবে। (৩) প্রতিশ্রুত দ্রব্যের মূল্যহার নির্দিষ্ট হতে হবে। যেমন- যদি গম হয় তাহলে প্রতি কেজি বা মণের দাম কত হবে তা বলে দেবে। তখনকার বাজার দর অনুযায়ী হবে এ রকম বললে চলবে না। (৪) দ্রব্য হস্তান্তরের দিন তারিখ নির্দিষ্ট করতে হবে। (৫) দ্রব্য বহন খরচা বিশিষ্ট হলে তা হস্তান্তরের স্থান নির্দিষ্ট করতে হবে। (৬) কথাবার্তা চূড়ান্ত করার সাথে সাথেই পূর্ণ মূল্য পরিশোধ করতে হবে। (৭) চুক্তিকৃত মেয়াদের পুরো সময়েই উক্ত দ্রব্য বাজারে মওজুদ থাকতে হবে।

বিশেষ জ্ঞাতব্য ঃ ফিক্হের পরিভাষায় বাইয়ে-সলমের মধ্যে দামের অংশকে রা'সুলমাল, দ্রব্যকে মুসলামফীহ্, ক্রেতাকে রব্বুস্-সলম এবং বিক্রেতাকে মুসলাম-ইলাইহ্ নামে অভিহিত করা হয়।

جَائِزٌ فِى الْمَكِيْلَاتِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** পরিমাপ, পরিমাণ ও গণনাভুক্ত জিনিসপত্রের মধ্যে সলম বিক্রয় জায়েয। কারণ এ শ্রেণীর দ্রব্যসমূহ গুণ, মান ও পরিমাণ উল্লেখপূর্বক এমনভাবে নির্দিষ্ট করা সম্ভব, যাতে পরবর্তী কালে আর ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সামগ্রী যেমন- জীব-জন্তু, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং কাঠ, বাস ও তৃণলতার মুঠি প্রভৃতি সম্পদে যতই বর্ণনা-বিশ্লেষণ করা হোক না কেন হস্তান্তরকালে কথার সাথে এসবের গড়মিল প্রকাশ পাওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুতরাং এ শ্রেণীর দ্রব্যে সলম-চুক্তি করলে অবশেষে তা কলহ-বিবাদের দিকে ধাবিত করে।

بِمِكْيَالِ رَجُلٍ الخ **-এর আলোচনা ঃ** কারণ ঘটনাক্রমে সে মাপক যদি হারিয়ে কিংবা অকেজো হয়ে যায় অথবা উক্ত বৃক্ষে বা অঞ্চলে ফসল উৎপন্ন না হয়, তখন চুক্তি বাস্তবায়ন করা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

جِنْسٌ مَعْلُوْمٌ الخ **-এর আলোচনা ঃ** মুসলামফীহ তথা প্রতিশ্রুত দ্রব্যের জাত নির্ধারণের ধরন হল, যেমন ধান না গম, কাপড় না অন্য কিছু তা বলে দেয়া। نَوْعٌ অর্থ- শ্রেণী। শ্রেণী নির্ধারণ বলতে গম হলে তা লাল হবে না সাদা হবে, স্থির করে নেয়া বুঝানো হয়েছে। আর দ্রব্যের গুণাগুণ নির্ধারণ করার মানে হল- সে গম গোড়ালে না আগালে না মাঝারী ধরনের হবে তা বলে দেয়া।

مِقْدَارِ رَأْسِ الْمَالِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, সলম কারবারে রা'সুলমাল তথা বিনিয়োগকৃত পুঁজি দু'ধরনের হতে পারে— (এক) এমন জিনিস যার পরিমাণের ওপর চুক্তি নির্ভরশীল। অর্থাৎ পরিমাণ কমবেশি হলে বিপরীত দিকের পণ্যও কমবেশি হওয়া দাবি করে। যেমন- টাকা-পয়সা, কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্য ইত্যাদি। (দুই) এমন দ্রব্য যার পরিমাণ কমবেশি হওয়ার সাথে বিপরীত দিকের পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে না। যেমন- পাঞ্জাবি, শাড়ি, গাড়ি, পালংক ইত্যাদি। ধরুন আপনি এক কেজি গম বা দশ টাকা দিয়ে এক কেজি চাল ক্রয়ের কথাবার্তা পাকাপাকি করে তা হস্তান্তর করতে গিয়ে দেখলেন সেখানে এক টাকা বা একশ' গ্রাম গম কম, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই বিপীরত দিকের পণ্যের পরিমাণ কমে আসবে এবং আপনি নয়শ' গ্রাম চাল পাবেন। অপরদিকে একটি পাঞ্জাবি দেখিয়ে তার বিনিময়ে যদি এক কেজি চাল ক্রয় করা হয় আর পাঞ্জাবিটি বর্ণিত পরিমাণের চেয়ে দু'চার ইঞ্চি ছোট-বড় হয়ে, তাহলে চালের পরিমাণ কমে আসবে না। অবশ্য দোকানি এ কারণে চাল না দেয়ার এখতিয়ারও রাখে। কিন্তু বিক্রিতে সম্মত থাকলে কম দিতে পারবে না। কারণ পাঞ্জাবি প্রভৃতির লেনদেন পিস হিসেবে হয়; গজী কাপড়ের ন্যায় দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাতে হয় না। এখন সকল কারবারের মধ্যে যদি প্রথম শ্রেণীর দ্রব্য পুঁজি (রা'সুলমান) নির্ধারিত করা হয়, তবে শুধু ইশারা করে দেখিয়ে দিলেই চলবে না, বরঞ্চ কত কেজি, কত সংখ্যা তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্ষেত্রে শুধু ইশারা করে দেখিয়ে দেয়াই যথেষ্ট; দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বর্ণনা করতে হবে না। এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমাম সাহেবাইন উভয় অবস্থায়ই ইশারা করে দেখিয়ে দেয়া যথেষ্ট মনে করেন।

وَلَا يَصِحُّ السَّلَمُ حَتّٰى يَقْبِضَ رَأْسَ الْمَالِ قَبْلَ اَنْ يُّفَارِقَهٗ وَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ فِىْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ قَبْلَ الْقَبْضِ وَلَا يَجُوْزُ الشِّرْكَةُ وَلَا التَّوْلِيَةُ فِى الْمُسْلَمِ فِيْهِ قَبْلَ قَبْضِهٖ وَيَصِحُّ السَّلَمُ فِى الثِّيَابِ اِذَا سُمِّىَ طُوْلًا وَعَرْضًا وَ رَقْعَةً وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْجَوَاهِرِ وَلَا فِى الْخَرْزِ وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِى اللَّبِنِ وَالْاٰجُرِّ اِذَا سُمِّىَ مِلْبَنًا مَعْلُوْمًا وَكُلُّ مَا اَمْكَنَ ضَبْطُ صِفَتِهٖ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهٖ جَازَ السَّلَمُ فِيْهِ وَمَا لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ صِفَتِهٖ وَمَعْرِفَةُ مِقْدَارِهٖ لَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِيْهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ সলম চুক্তি শুদ্ধ হবে না যদি না (বিক্রেতা (مُسْلَمِ اِلَيْهِ) থেকে ক্রেতা) পৃথক হওয়ার পূর্বে রা'সুলমাল (দাম) কব্জা করে নেয়। রা'সুলমাল ও মুসলামফীহ্ করায়ত্ত করার পূর্বে তাতে (ব্যয়, হিবা ও সদকা প্রভৃতি কোন প্রকার) হস্তক্ষেপ দুরস্ত নেই এবং দুরস্ত নেই মুসলামফীহ্ (প্রতিশ্রুতিপণ্য) হস্তগত করার পূর্বে তাতে কাউকে শরিক করা অথবা তাওলিয়া আকারে বিক্রি করা। কাপড়ের মধ্যে সলম চুক্তি সহীহ্ হবে যখন তার দৈর্ঘ্য, প্রস্থ এবং মোটা না মিহীন তা বর্ণনা করে দেয়া হবে। হীরক খন্ড এবং মুক্তার মধ্যে সলম জায়েয নেই। নির্দিষ্ট ফর্মা উল্লেখ করে দেয়া হলে কাঁচা এবং পাকা ইটের মধ্যে সলম করাতে আপত্তি নেই। যে সকল দ্রব্যের গুণাগুণ আয়ত্ত করা ও পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব সেসব দ্রব্যে সলম কারবার জায়েয। আর যে সমস্ত জিনিসের গুণাগুণ আয়ত্ত করা ও পরিমাণ নিরূপণ করা অসম্ভব তাতে সলম জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَجُوْزُ التَّصَرُّفُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন– রহীম করীম থেকে নগদ দশ টাকা নিয়ে একমাস পর তাকে নির্দিষ্ট মানের একটি কলম দেয়ার ওয়াদা করল। করীমও তাতে একমত হল। এখন এ দশ টাকা বুঝে পাওয়ার পূর্বেই তা কাউকে দান স্বরূপ দেয়া বা তার বিনিময়ে কিছু ক্রয় করা করীমের জন্য বৈধ হবে না। ঠিক করীমও কলম কব্জা করার পূর্বে তা বিক্রি বা হিবা করার অধিকার রাখে না।

وَلَا يَجُوْزُ الشِّرْكَةُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন– রহীম ও করীমের উদাহরণে করীম তার অপর বন্ধুকে বলল, তুমি এখন আমাকে পাঁচ টাকা দাও, বিনিময়ে আমি যে কলম পেতে যাচ্ছি তাতে অর্ধেকের ভাগীদার হবে। আর তাওলিয়া হল যেমন– করীম কারো নিকট হতে দশ টাকা নিয়ে বলল, আমার দশ টাকায় কেনা ওয়াদাকৃত কলমটি মেয়াদান্তে তুমি নিয়ে নিও। শিরকত ও তাওলিয়া জায়েয না হওয়ার কারণ, এতে নতুন ক্রেতা বা ভাগীদার নিজ পণ্য প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়।

وَلَا يَجُوْزُ السَّلَمُ فِى الْجَوَاهِرِ **-এর আলোচনা ঃ** কারণ হীরক ও মুক্তাখন্ড বিভিন্ন মাপের ও ধরনের হয় বিধায় পরবর্তীতে এর পরিমাণ নিয়ে বিবাদ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তবে ওজনের ভিত্তিতে হলে তাতে সলম সহীহ্ হবে। রাজা-বাদশাহগণ তাঁদের রাজ্য শাসনের সময়সীমা খুদিত যে মুক্তাপাত মুকুটে লাগাতেন, খচিতমুক্ত বলতে সেগুলই বুঝানো হয়েছে। এগুলো আকারে ও কারুকার্যে ছোট-বড় ও বেশকম হয় বিধায় তাতে সলম বিক্রয় জায়েয নেই।

كُلُّ مَا اَمْكَنَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এ ইবারতে মূলত একটা সামগ্রিক নীতি আলোকপাত করা হয়েছে। ওপরে উল্লিখিত মাসআলাগুলো এ সূত্র থেকেই সংগৃহীত। পরিমাণ ও গুণাগুণ যথার্থভাবে নিরূপণ অসম্ভব, যেমন– হাঁস-মোরগ, গরু, ছাগল, তরমুজ ও বাঙ্গি প্রভৃতি।

وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْكَلْبِ وَالْفَهْدِ وَالسِّبَاعِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْعُ دُوْدِ الْقَزِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مَعَ الْقَزِّ وَلَا النَّحْلِ اِلَّا مَعَ الْكُوَارَاتِ وَاَهْلُ الذِّمَّةِ فِى الْبِيَاعَاتِ كَالْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا فِى الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ خَاصَّةً فَاِنَّ عَقْدَهُمْ عَلَى الْخَمْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْعَصِيْرِ وَعَقْدُهُمْ عَلَى الْخِنْزِيْرِ كَعَقْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الشَّاةِ -

সরল অনুবাদ ঃ কুকুর, বাঘ ও হিংস্র জীব-জন্তু ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয আছে। মদ ও শূকর ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয নেই। এবং জায়েয নেই রেশম ছাড়া শুধু গুটি-পোকা এবং চাক ছাড়া শুধু মৌ-পোকা ক্রয়-বিক্রয় করা। সকল প্রকার ক্রয়-বিক্রয়ে জিম্মিগণ মুসলমানদের ন্যায় (নিয়ম-নীতি মেনে চলতে হবে)। ব্যতিক্রম শুধুমাত্র মদ ও শূকরের বেলায়। কেননা মুসলমানদের জন্য রস, শরবত ও ছাগলের কারবার যেমন বৈধ জিম্মিদের জন্য মদ ও শূকরের কারবারও তেমনি বৈধ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَجُوْزُ بَيْعُ الْكَلْبِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** কুকুরের ন্যায় শিকারি পাখ-পাখালী যেমন- কাক, চিল, শকুন ইত্যাদিও ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত আছে। কোন কোন আলিম এ শ্রেণীর প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা মাকরূহ বলে মত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে মূলনীতি হল, শরীয়ত যে সকল প্রাণীর গোশত হারাম করেছে সেগুলো অন্য কোন দিক থেকে যদি মানুষের জন্য উপকারজনক হয়, সাংসারিক কাজে মানুষ তাদের সেবা নিতে পারে, যেমন-গাধা, খচ্চর ও ঘোড়া পরিবহনের কাজে এবং কুকুর পাহারাদারীর কাজে ব্যবহার করা কিংবা তাদের হাড়, গোশত ও তৈল দ্বারা কোন ঔষধ প্রস্তুত করা ইত্যাদি তাহলে বিশেষ জরুরত বশত এসব প্রাণী ক্রয়-বিক্রয় করা দুরস্ত হবে। এ বৈধতা গোশ্ত খাওয়ার হিসেবে নয়; বরং অন্যান্য জরুরতের দিকে লক্ষ্য করে।

بَيْعُ الْخَمْرِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** নেশা জাতীয় সকল প্রকার খাদ্য ও পানীয় ভোগ-ব্যবহার যেমন হারাম তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়, বিজ্ঞাপন, প্রচার, উৎপাদন কারখানা স্থাপন ও সেখানে চাকরি গ্রহণ ইত্যাদি সব হারাম। যে সমস্ত দ্রব্যের ভোগ-ব্যবহার দেশ, জাতি ও সমাজের জন্য ধ্বংস বয়ে আনে; ইসলাম সেগুলো প্রস্তুতের অনুমতি তো দেয়-ই না; বরং তা সমূলে উৎপাটন করার ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে। এভাবে সর্বপ্রকার মাদকদ্রব্য যেমন- মদ, তাড়ী, স্পিরিট, আফিম, গাঁজা, ভাঙ্গ, এলকোহল, চরস, কোকেন এবং হিরোয়িন প্রভৃতি সবই নিষিদ্ধ। ফুকাহায়ে কেরাম এগুলোকে হারাম না হয় মাকরূহ বলে ফতোয়া প্রদান করেছেন।

وَاَهْلُ الذِّمَّةِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ইসলামী রাষ্ট্রে যে সমস্ত অমুসলমান সরকারের বশ্যতা স্বীকার করত কর প্রদানের মাধ্যমে বসবাস করে তাদেরকে জিম্মি বলে। মুসলিম নাগরিকদের মতো সকল কায়-কারবারে তাদেরকে ইসলামের আইন-কানুন মান্য করে চলতে হবে। অনৈসলামী রীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে পারবে না। অবশ্য শূকর ও মদের ব্যাপারে তাদের জন্য ব্যতিক্রম রয়েছে। তারা এ দু'য়ের লেনদেন করতে পারবে।

بَابُ الصَّرْفِ

اَلصَّرْفُ هُوَ الْبَيْعُ اِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْ عِوَضَيْهِ مِنْ جِنْسِ الْاَثْمَانِ فَاِنْ بَاعَ فِضَّةً بِفِضَّةٍ اَوْ ذَهَبًا بِذَهَبٍ لَمْ يَجُزْ اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَاِنِ اخْتَلَفَا فِى الْجُوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَلَابُدَّ مِنْ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ قَبْلَ الْاِفْتِرَاقِ -

সরফ বিক্রির অধ্যায়

সরল অনুবাদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ে যখন উভয় বিনিময় মুদ্রা জাতীয় হয় তখন তাকে সরফ বিক্রি বলে। সুতরাং যদি কেউ রূপা দ্বারা রূপা কিংবা সোনা দ্বারা সোনা বিনিময় করে তবে পরিমাণ সমান সমান না হলে তা শুদ্ধ হবে না। যদিও উভয় বিনিময় গুণগত মান এবং কারিগরি শৈলীতে বেশকম হয়। এবং জরুরি হল পৃথক হওয়ার পূর্বে উভয় বিনিময় করায়ত্ত করে নেয়া।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

১ اَلصَّرْفُ-এর আলোচনা ঃ রিবা অধ্যায়ে সরফ বিক্রয় সম্পর্কে কিছুটা সংক্ষেপে বর্ণনা করা হয়েছে। তদুপরি সতর্কতার অভাবে অনেক সময় সরফ বিক্রয়ও সুদী কারবারের রূপ নেয় বিধায় এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা দানের উদ্দেশ্যে গ্রন্থকার একটি স্বতন্ত্র পরিচ্ছেদের অধীনে এর নিয়ম-নীতিগুলো আলোচনা করেছেন। صَرْفٌ শব্দটি বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার, অর্থ-ফিরিয়ে দেয়া, স্থানান্তরিত করা। খলিল ইবনে আহমদের উক্তি মতে আভিধানিক অর্থে বাড়তি অংশকেও সরফ বলা হয়। যেমন, এক হাদীসে উল্লেখ আছে- مَنْ نَسَبَ اِلٰى غَيْرِ اَبِيْهِ لَمْ يَقْبَلِ اللّٰهُ مِنْهُ صَرْفًا وَّ لَاعَدْلًا অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পিতা ব্যতীত অন্য কাউকে পিতৃ পরিচয়ে ভূষিত করবে আল্লাহ তা'আলা তার ফরয-নফল (বাড়তি) কোন আমলই গ্রহণ করবেন না।" এ হাদীসে সরফ শব্দটি নফল তথা বাড়তি অর্থে প্রচলিত হয়েছে। সরফ কারবারে যেহেতু উপস্থিত ক্ষেত্রেই ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই নিজ নিজ পাওনা হস্তগত করা শর্ত যা অন্যান্য কারবারের তুলনায় একটি অতিরিক্ত শর্তই বটে; সে কারণে এ কারবারকে সরফ নামে আখ্যা দেয়া হয়েছে। শরীয়তের পরিভাষায় সোনা-রূপা ও সোনা-রূপার তৈরি অলঙ্কার ও ব্যবহারিক সামগ্রী এবং তদুভয়ের স্থলবর্তী কাগজি নোটের পারস্পরিক বিনিময় করাকে 'বাইয়ে সরফ' বলা হয়। উল্লেখ্য যে, অর্থ ব্যবস্থায় স্বর্ণ-রূপা ও এদের স্থলাভিষিক্ত নোটকে সাধারণত মুদ্রা বলে। সরফ কারবারে উভয় দিকের বিনিময় যদি একই জাতীয় হয়, যেমন- সোনার বিনিময়ে সোনা বা রূপার বিনিময়ে রূপা অথবা টাকার বিনিময়ে টাকা, তাহলে কারবার শুদ্ধ হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে- (১) উভয় দিকের বিনিময়কৃত দ্রব্য পরিমাণে সমান হওয়া (২) এবং লেনদেন হাতে হাতে হওয়া। নতুবা তা রিবায় পরিণত হয়। পক্ষান্তরে যদি ভিন্ন পদার্থের হয়, যেমন- স্বর্ণ দিয়ে রূপা বা রূপা দিয়ে টাকা গ্রহণ করা হল। তাহলে দু'দিকের বিনিময় সমান হওয়া জরুরি নয় বটে; কিন্তু আদান-প্রদান নগদ হওয়া জরুরি। তা না হলে সুদী কারবারের রূপ নেবে। বড় নোট দিয়ে খুচরা নোট নেয়ার ধারাটিও সরফ বিক্রয়ের মধ্যে গণ্য। কাজেই এখানেও লেনদেন নগদ হওয়া যেমন জরুরি তেমনি কমবেশি না হওয়াও জরুরি।

কোন এক পক্ষের নোট ছিঁড়া বা পুরাতন হলেও বাকি বা কমবেশি করা যাবে না। একান্তই যদি কোথাও বেশকম করে নিতে হয় তাহলে নোটের সাথে কিছু রেজগি পয়সা নিয়ে নিলেই সুদ থেকে বাঁচা যাবে। যেমন- ১০ টাকার ছিঁড়া নোট দিয়ে যদি আপনি ৯ টাকা নিতে বাধ্য হন তাহলে ৮ টাকার নোট এবং বাকি দুই টাকার পরিবর্তে কিছু খুচরা পয়সা নিলেই সুদের গুনাহ থেকে বাঁচতে পারবেন।

وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَ وَجَبَ التَّقَابُضُ وَإِنِ افْتَرَقَا فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي ثَمَنِ الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَيَجُوزُ بَيْعُ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً وَمَنْ بَاعَ سَيْفًا مُحَلًّى بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَحِلْيَتُهُ خَمْسُونَ دِرْهَمًا فَدَفَعَ مِنْ ثَمَنِهِ خَمْسِينَ دِرْهَمًا جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ الْمَقْبُوضُ مِنْ حِصَّةِ الْفِضَّةِ وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذٰلِكَ - وَكَذٰلِكَ إِنْ قَالَ خُذْ هٰذِهِ الْخَمْسِينَ مِنْ ثَمَنِهِمَا فَإِنْ لَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى افْتَرَقَا بَطَلَ الْعَقْدُ فِي الْحِلْيَةِ وَإِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ جَازَ الْبَيْعُ فِي السَّيْفِ وَبَطَلَ فِي الْحِلْيَةِ - وَمَنْ بَاعَ إِنَاءَ فِضَّةٍ ثُمَّ افْتَرَقَا وَقَدْ قَبَضَ بَعْضَ ثَمَنِهِ بَطَلَ الْعَقْدُ فِيمَا لَمْ يَقْبِضْ وَصَحَّ فِيمَا قَبَضَ وَكَانَ الْإِنَاءُ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا وَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الْإِنَاءِ كَانَ الْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَ الْبَاقِيَ بِحِصَّتِهِ مِنَ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهُ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি রূপা দ্বারা স্বর্ণ (বা স্বর্ণ দিয়ে রূপা বিনিময়) করে তবে পারস্পরিক কমবেশি করা জায়েয হবে এবং উভয়ই (নিজ নিজ প্রাপ্য) কব্জা করে নেয়া আবশ্যক হবে। যদি সরফ বিক্রিতে উভয় বিনিময় বা কোন এক দিকের বিনিময় হস্তগত করার পূর্বে তারা পৃথক হয়ে যায়, তবে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। সরফের দামের অংশে তা করায়ত্ত করার পূর্বে তাসাররুফ করা জায়েয নেই। রূপার বিনিময়ে স্বর্ণ অনুমান করে বিক্রি করা জায়েয। যদি কেউ একশ' দিরহামে রৌপ্যালঙ্কার খচিত এমন একটি তরবারি বিক্রি করে যার অলঙ্কারের পরিমাণ পঞ্চাশ দিরহাম, আর ক্রেতা উহার দাম থেকে পঞ্চাশ দিরহাম (নগদ) প্রদান করে, (বাকি টাকা পরে দেয়ার ওয়াদা করে) তবে বিক্রয় জায়েয হবে এবং প্রাপ্ত পঞ্চাশ দিরহাম খচিত রূপার দাম গণ্য হবে; যদিও ক্রেতা সে কথা উল্লেখ করে দেয়নি। এমনকি যদি বলে উভয়টির দাম বাবত "এ পঞ্চাশ দিরহাম নিন" (তথাপি তা খচিত অলঙ্কারের দাম বলেই গণ্য হবে)। এখানে তারা উভয়ে যদি (দেনা-পাওনা) কারায়ত্ত না করেই পৃথক হয়ে যায়, (অর্থাৎ মজলিস ত্যাগ করে চলে যায়) তবে অলঙ্কারে বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে। যদি অলঙ্কার তরবারি থেকে অনায়াসে পৃথক হতে পারে, তবে তরবারির মধ্যে বিক্রয় জায়েয ও অলঙ্কারে বাতিল গণ্য হবে। (নতুবা তরবারির মধ্যেও বিক্রি বাতিল হবে)। কোন ব্যক্তি রূপার বাসন বিক্রি করার পর তার আংশিক দাম করায়ত্ত করেই যদি ক্রেতা থেকে বিদায় নেয়, তাহলে বাসনের যে অংশের দাম কব্জা করেনি, সে অংশে বিক্রয় বাতিল এবং কব্জাকৃত অংশে শুদ্ধ বিবেচিত হবে এবং বাসনটি উভয়ের মধ্যে শরিকি হবে। (ক্রেতা ও বিক্রেতার জন্য কোনরূপ এখতিয়ার থাকবে না)। (কোন বর্তন ক্রয় করার পর) যদি তার কিছু অংশে অন্য কারো মালিকানা প্রমাণিত হয়, তবে ক্রেতার জন্য খেয়ার রয়েছে– ইচ্ছা করলে সে বাকি অংশ হারানুপাতে দাম দিয়ে নেবে, তা না হয় প্রত্যাখ্যান করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন কেউ আপনার নিকট ১০ টাকার নোটের ভাঙতি চাওয়ায় আপনি সেটা হাতে না নিয়েই তাকে ভাঙতি দিয়ে দিলেন। এখন তার হাতে রেখেই যদি আপনি উক্ত টাকা কাউকে দান করে দেন অথবা এ নোটে তার থেকে বা অন্য কারো থেকে কোন কিছু ক্রয় করে নেন, তাহলে এ দানকরণ বা ক্রয়করণ কোনটাই জায়েয হবে না। কিন্তু টাকাটা হাতে নিয়ে করলে সবই জায়েয হবে। বলা বাহুল্য, বাইয়ে-সরফের মধ্যে উভয় দিক থেকে যেহেতু মুদ্রাজাতীয় দ্রব্য বিদ্যমান, সে কারণে কোন অংশকেই সুনির্দিষ্টভাবে পণ্য বা মুদ্রা নামে অভিহিত করা যায় না। এ দিক থেকে উভয় অংশকেই যেমন দাম বলে দাবি করা যায়, তদ্রূপ পণ্য বলেও দাবি করা চলে। যদি পণ্য মেনে নেয়া হয়, তবে তো করায়ত্ত করার পূর্বে কোন অবস্থায়ই তাসাররুফ করা জায়েয হয় না।

بِالْفِضَّةِ مُجَازَفَةً الخ -এর আলোচনা ঃ স্বর্ণ দ্বারা রূপার বিনিময় অনুমান করে করা যায়। কেননা এ দু'টো পরস্পর ভিন্ন দ্রব্য। একজাত অন্য জাতের সাথে বেশকম করে বিনিময় করা যেমন জায়েয, তেমনি বেশকমের সম্ভাবনামূলক কোন পথ অবলম্বনে বিনিময় করাও জায়েয।

وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ الخ -এর আলোচনা ঃ নগদ পঞ্চাশ দিরহাম পরিশোধের সময় যদিওবা ক্রেতা একথা ব্যাখ্যা করে বলেনি যে, এ টাকা খচিত রূপার দাম বাবদ দিলাম এবং তরবারির ভাগের টাকা বাকি রাখলাম। কারণ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ে ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিক হওয়ায় না জায়েয পন্থায় কারবার করতে পারে না। নিশ্চয়ই তারা বৈধ নিয়মেই করেছে। আর এ কারবার তখনই বৈধ বলে গণ্য হবে যখন নগদপ্রদত্ত পঞ্চাশ দিরহাম রৌপ্যালঙ্কারের দাম ধরে নেয়া হবে।

بَطَلَ الْعَقْدُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা এ কারবার তরবারি অংশে সাধারণ ক্রয়-বিক্রয় হলেও রূপার অংশে বাইয়ে-সরফ। আর বাইয়ে-সরফের মধ্যে লেনদেন বাকির ভিত্তিতে করলে তা শুদ্ধ হয় না। পক্ষান্তরে তরবারি অংশে এটা সরফ কারবার নয় বিধায় তাতে নগদ-বাকি উভয় রকম লেনদেনই জায়েয।

إِنْ كَانَ يَتَخَلَّصُ الخ -এর আলোচনা ঃ তরবারির সাথে সংযুক্ত অলঙ্কার যদি অটুট ও অক্ষত অবস্থায় তরবারি থেকে পৃথক করার মতো হয়, যেমন কোন স্ক্রুপের মাধ্যমে জড়ানো ছিল তা খুলে ফেলা হল, তাহলে তরবারির মধ্যে বিক্রয় শুদ্ধ হবে। কারণ তখন অনায়াসেই ক্রেতাকে মাবী' হস্তান্তর করা সম্ভব। আর যদি পৃথক করতে গেলে অলঙ্কার বা তরবারি ভেঙ্গে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়, তাহলে অলঙ্কারের পাশাপাশি তরবারিতেও বিক্রি শুদ্ধ হবে না। কারণ এ স্থলে বিক্রেতা মাবী' তথা তরবারি পৃথক করে ক্রেতার হাতে তুলে দিতে সক্ষম নয়, অথচ বিক্রেতার মধ্যে সমর্পণের সক্ষমতা থাকা (اَلْقُدْرَةُ عَلَى التَّسْلِيْمِ) বিক্রি শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত।

এখানে একটি প্রশ্ন জাগ্রত হয়, তাহল আলোচ্য মাসআলায় তরবারি এবং তাতে জড়ানো রৌপ্যালঙ্কার দু'টো মিলিয়েই মূলত বিক্রিত পণ্য। আর বিক্রিত পণ্যের একাংশে বিক্রয় শুদ্ধ বলে তা গ্রহণ করা এবং অপরাংশে শুদ্ধ হয়নি বলে তা বর্জন করা কারবার বিভক্ত করণেরই (تَفْرِيقُ صَفْقَة) নামান্তর, যা মূলত নাজায়েয। উত্তর এই যে, এরূপ বিভক্তি আপত্তিকর নয়। কেননা এ বিভক্তি ক্রেতা বা বিক্রেতার পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় সৃষ্টি করা হয়নি; বরং শরীয়ত কর্তৃক আরোপিত বিশেষ শর্ত 'নগদ আদান-প্রদান' -এর অবর্তমানজনিত কারণে আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়েছে।

كَانَ الْمُشْتَرِي الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ নিরঙ্কুশ মালিকানা লাভের উদ্দেশ্যে যে বর্তন ক্রয় করা হল, তাতে যদি অন্য কারো অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হয় তবে তা এক প্রকার ত্রুটি। আর ক্রয়কৃত পণ্যে ত্রুটি থাকলে ক্রেতা তা ফেরত দিতে পারে। কিন্তু রৌপ্যখন্ডের ব্যাপার ভিন্ন; সেখানে এ ধরনের অংশীদারিত্ব প্রমাণিত হওয়া ত্রুটির মধ্যে গণ্য নয়। সে কারণে ক্রেতা ওখানে খেয়ারে আয়েবের সুযোগ নিতে পারবে না।

وَمَنْ بَاعَ قِطْعَةَ نُقْرَةٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُهَا اَخَذَ مَا بَقِيَ بِحِصَّتِهٖ وَلَاخِيَارَ لَهٗ وَمَنْ بَاعَ دِرْهَمَيْنِ وَدِيْنَارًا بِدِيْنَارَيْنِ وَدِرْهَمٍ جَازَ الْبَيْعُ وَجُعِلَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْجِنْسَيْنِ بَدَلًا مِنَ الْجِنْسِ الْاٰخَرِ وَمَنْ بَاعَ اَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَدِيْنَارٍ جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَتِ الْعَشَرَةُ بِمِثْلِهَا وَالدِّيْنَارُ بِدِرْهَمٍ وَيَجُوْزُ بَيْعُ دِرْهَمَيْنِ صَحِيْحَيْنِ وَ دِرْهَمٍ غَلَّةٍ بِدِرْهَمٍ صَحِيْحٍ وَ دِرْهَمَيْنِ غَلَّةٍ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّرَاهِمِ الْفِضَّةُ فَهِيَ فِيْ حُكْمِ الْفِضَّةِ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَى الدَّنَانِيْرِ الذَّهَبُ فَهِيَ فِيْ حُكْمِ الذَّهَبِ فَيُعْتَبَرُ فِيْهِمَا مِنْ تَحْرِيْمِ التَّفَاضُلِ مَا يُعْتَبَرُ فِي الْجِيَادِ وَاِنْ كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهِمَا الْغِشُّ فَلَيْسَا فِيْ حُكْمِ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ فَهُمَا فِيْ حُكْمِ الْعُرُوْضِ - فَاِذَا بِيْعَتْ بِجِنْسِهَا مُتَفَاضِلًا جَازَ الْبَيْعُ وَاِنْ اِشْتَرٰى بِهَا سِلْعَةً ثُمَّ كَسَدَتْ فَتَرَكَ النَّاسُ الْمُعَامَلَةَ بِهَا قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قِيْمَتُهَا يَوْمَ الْبَيْعِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى قِيْمَتُهَا اٰخِرَ مَا يَتَعَامَلُ النَّاسُ بِهَا -

সরল অনুবাদ ঃ (পক্ষান্তরে) কেউ রৌপ্য খন্ড বিক্রি করার পর তার কিছু অংশে অপর কারো অধিকার প্রমাণিত হলে ক্রেতা বাকিটুকু তার আনুপাতিক মূল্যে গ্রহণ করবে; প্রত্যাখ্যানের এখতিয়ার থাকবে না। যে ব্যক্তি দুই দিনার ও এক দিরহাম দুই দিরহাম ও এক দিনারে বিক্রি করল, তার বিক্রি জায়েয হবে। এমতাবস্থায় প্রত্যেক জাতের মুদ্রা তার বিপরীত জাতীয় মুদ্রার বিনিময় ধর্তব্য হবে। এভাবে কেউ যদি এগারো দিরহাম দিয়ে দশ দিরহাম ও একটি দিনার গ্রহণ করে, তবে জায়েয হবে। এ স্থলে দশ দিরহাম তার সম পরিমাণ দিরহামের এবং দিনারটি বাকি এক দিরহামের বিনিময় (ধর্তব্য) হবে। দু'টি ভেজাল ও একটি খাঁটি দিরহামের সাথে একটি ভেজাল ও দু'টি খাঁটি দিরহাম বিনিময় করা জায়েয। যদি দিরহামের মধ্যে (মিশ্রণের চেয়ে) রূপা বেশি হয়, তবে তা রূপার হুকুমভুক্ত হবে এবং যদি দিনারের মধ্যে (মিশ্রণ অপেক্ষা) স্বর্ণ বেশি হয়, তবে তা স্বর্ণের হুকুমভুক্ত হবে। সুতরাং (লেনদেনে) কমবেশি হারাম হওয়ার ব্যাপরে মিশ্রণবিহীন খাঁটি সোনা বা রূপার যে হুকুম এগুলোর ক্ষেত্রেও সে হুকুম প্রযোজ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি তাতে মিশ্রণ অধিক হয় তবে তা দিরহাম ও দিনার (তথা সোনা ও রূপা)-এর হুকুমভুক্ত হবে না; বরং আসবাবপত্রের হুকুমে হবে। সুতরাং এ শ্রেণীর দিরহাম বা দিনারের পারস্পরিক বিনিময় যদি কমবেশি করে করা হয়, তবে তা জায়েয হবে। যদি তা দ্বারা কোন পণ্য খরিদ করে অতঃপর বিক্রেতা দাম কব্জা করার পূর্বেই এর মুদ্রামান রহিত হয়ে যায় এবং জনসাধারণ এর মাধ্যমে লেনদেন করা ছেড়ে দেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, (বিক্রি শুদ্ধ ও বহাল থাকবে, এবং) ক্রেতার ওপর উক্ত মুদ্রার বিক্রয় দিবসের বাজার-মূল্য আবশ্যক হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, জনসাধারণ সর্বশেষে যেদিন (এই মুদ্রা) লেনদেন করে সে দিনের বাজার-মূল্য (হিসাবে দাম পরিশোধ করা) আবশ্যক হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَ دِرْهَمٍ غَلَّةٍ الخ-এর আলোচনা ঃ জমি-জমা ও ঘর-বাড়ির আয়-আমদানীকে غَلَّةٌ বলে, বহুবচন اَغْلَالٌ। এখানে শব্দটি ভেজাল অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এ শ্রেণীর মুদ্রা নির্ভেজাল মানের মুদ্রার সাথে বিনিময় করা হলে রিবায়ে-তাফাযুল হয় না বিধায় তা জায়েয আছে।

وَاِذَا كَانَ الْغَالِبُ الخ-এর আলোচনা ঃ স্বর্ণ-রূপার তৈরি মুদ্রা ও অলঙ্কারাদিতে মিশানো তামা, পিতল, দস্তা প্রভৃতি ধাতুকে গশ্ বা মিশ্রণ বলে। মুদ্রা, অলঙ্কার বা তা দ্বারা প্রস্তুতকৃত কোন সামগ্রীতে যদি সোনা বা রূপার চেয়ে এ মিশ্রণের পরিমাণ বেশি হয়, তবে তা হুকুমের দিক থেকে সোনা-রূপা গণ্য না হয়ে সাধারণ পণ্যে গণ্য হবে। সাধারণ পণ্যের ন্যায় এসবের পারস্পরিক বিনিময়ও বেশকম করে করা যাবে। এবং একারণেই এ শ্রেণীর মুদ্রায় কোন দ্রব্য ক্রয় করার পর বিক্রেতাকে দাম বুঝিয়ে দেয়ার আগেই যদি তার মুদ্রামান রহিত হয়ে যায় এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে মুদ্রা হিসেবে এর ব্যবহার বন্ধ করে দেয়া হয় তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) -এর মতে, বিক্রয় বাতিল হয়ে যায়। কারণ কাগজি নোটের মতো মৌলিকত্বের বিবেচনায় এগুলোও মুদ্রা নয়। সরকারের ঘোষণাবলে ক্ষণকালের জন্য মুদ্রার কাজে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। এখন মুদ্রামান তুলে নেয়ার সাথে সাথেই পূর্বের মতো সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর পণ্যকে মুদ্রা বা টাকা সাজিয়ে কোন কিছু ক্রয় করা টাকাবিহীন ক্রয় করারই নামান্তর।

وَاِنْ اِشْتَرٰى بِهَا الخ-এর আলোচনা ঃ কোন ব্যক্তি অধিক মিশ্রণবিশিষ্ট মুদ্রা (যার মুদ্রামান রহিত হলে সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়) দ্বারা কোন কিছু ক্রয় করার পর দান পরিশোধের পূর্বেই যদি এর মুদ্রামান খতম হয়ে যায়, তাহলে বিক্রয়-চুক্তি বলবৎ থাকবে কি থাকবে না তা নিয়ে ইমামদের মতবিরোধ আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বিক্রি বাতিল হয়ে যাবে এবং ক্রেতার হাতে পণ্য বহাল থেকে থাকলে বিক্রেতা তা ফিরিয়ে দেবে। আর খেয়ে ফেললে বা ধ্বংস হয়ে গেলে অথবা কারো নিকট বিক্রি বা দান করে থাকলে তার বাজার-মূল্য হিসাব করে বিক্রেতাকে সে মূল্য আদায় করবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ)-এর মত হল, বিক্রি বাতিল হবে না; বরং বলবৎ থাকবে। এমতাবস্থায় রহিতমানের মুদ্রার বিগত দিনের যে বাজার-মূল্য বা বিনিময় হার ছিল সে অনুযায়ী সাধারণ মুদ্রায় পণ্যের দাম পরিশোধ করা ক্রেতার কর্তব্য হবে। তবে বিগত দিন বলতে কোন দিন তা নির্ধারণ নিয়ে ইমামদ্বয়ের মধ্যে কিছুটা দ্বিমত রয়েছে। ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, বিক্রয়-চুক্তির দিনের বাজার-মূল্য তথা বিনিময় হার অনুযায়ী পণ্যের দাম পরিশোধ করবে। যেমন ধরুন! আপনি রহিম থেকে সপ্তাহখানেক পর দাম দেবেন বলে পাঁচ টাকা মূল্যের একটি কলম ক্রয় করলেন। সেদিন মার্কেটে টাকার বিনিময় হার ছিল ৫ টাকা = ৪ দিরহাম এখন টাকার মুদ্রামান বিলোপ হয়ে যাওয়ায় আপনি রহিমকে কলমের দাম চার দিরহাম দিলেই চলবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) -এর মতে, টাকা লেনদেনের সর্বশেষ দিন তার যে বিনিময় হার ছিল সে হিসাবে দাম পরিশোধ করতে হবে। ধরুন যদি সেদিন বিনিময় হার থাকে ৫ টাকা= ৩ দিরহাম, তবে তিন দিরহামই দেবে। ফতোয়া ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) -এর বক্তব্যের ওপর।

وَيَجُوزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَإِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا حَتّٰى يُعَيِّنَهَا وَإِذَا بَاعَ بِالْفُلُوسِ النَّافِقَةِ ثُمَّ كَسَدَتْ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْبَيْعُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ اِشْتَرٰى شَيْئًا بِنِصْفِ دِرْهَمٍ فُلُوْسٍ جَازَ الْبَيْعُ وَعَلَيْهِ مَا يُبَاعُ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ مِنْ فُلُوْسٍ وَمَنْ اَعْطٰى صَيْرَفِيًّا دِرْهَمًا فَقَالَ اَعْطِنِىْ بِنِصْفِهٖ فُلُوسًا وَبِنِصْفِهٖ نِصْفًا اِلَّا حَبَّةً فَسَدَ الْبَيْعُ فِى الْجَمِيْعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا جَازَ الْبَيْعُ فِى الْفُلُوْسِ وَبَطَلَ فِيْمَا بَقِىَ - وَلَوْ قَالَ اَعْطِنِىْ نِصْفَ دِرْهَمٍ فُلُوسًا وَنِصْفًا اِلَّا حَبَّةً جَازَ الْبَيْعُ - وَلَوْ قَالَ اَعْطِنِىْ دِرْهَمًا صَغِيْرًا وَزْنُهٗ نِصْفُ دِرْهَمٍ اِلَّا حَبَّةً وَالْبَاقِىْ فُلُوْسًا جَازَ الْبَيْعُ وَكَانَ النِّصْفُ اِلَّا حَبَّةً بِإِزَاءِ الدِّرْهَمِ الصَّغِيْرِ وَالْبَاقِىْ بِإِزَاءِ الْفُلُوْسِ -

সরল অনুবাদ ঃ সচল পয়সায় ক্রয়-বিক্রয় করার সময় তা (হাতে বা ইশারায়) নির্দিষ্ট না করলেও কারবার জায়েয হবে। কিন্তু যদি অচল হয় তবে তা নির্দিষ্ট না করা পর্যন্ত তা দ্বারা ক্রয়-বিক্রয় দুরস্ত হবে না। যদি সচল পয়সায় বিক্রি করে অতঃপর দাম বুঝে পাওয়ার পূর্বে তা অচল হয়ে পড়ে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বিক্রয় বাতিল হয়ে যাবে। যদি কেউ অর্ধ দিরহাম পয়সায় কোন দ্রব্য ক্রয় করে, তবে (পয়সার অংক উল্লেখ না করলেও) বিক্রয় জায়েয হবে। এমতাবস্থায় ক্রেতার ওপর অর্ধ দিরহামের সাথে যে পরিমাণ পয়সার বিনিময় হয় তা (দ্বারা দাম পরিশোধ করা) আবশ্যক হবে। যে ব্যক্তি পোদ্দারকে একটি দিরহাম দিয়ে বলল আমাকে অর্ধ দিরহামের বিনিময়ে পয়সা এবং বাকি অর্ধেকের বিপরীতে এক রতি কম একটি রূপার আধুলি দাও, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, দিরহামের গোটা অংশেই বিক্রি ফাসিদ হবে। কিন্তু ইমাম সাহেবাইন (রঃ) বলেন, পয়সার অংশে বিক্রয় শুদ্ধ ও অবশিষ্ট অংশে বাতিল হবে। পক্ষান্তরে গ্রাহক যদি বলে আমাকে আধা দিরহাম পয়সা এবং এক রতি কম একটি রূপার আধুলি দাও, তাহলে (পূর্ণ দিরহামেই) বিক্রি জায়েয হয়ে যাবে। আর যদি বলে আমাকে আধা দিরহাম থেকে এক রতি কম ওজনের একটি ছোট দিরহাম এবং বাকি অংশের পয়সা দাও তাতেও বিক্রি জায়েয হবে। তখন এক রতি কম আধা দিরহাম ছোট দিরহামের সাথে বিনিময় হয়ে বাকি অংশ পয়সার বিনিময় বলে ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় শব্দার্থ ঃ فُلُوْسٌ-এর একবচন فَلْسٌ – পয়সা। نَافِقَةٌ - সচল। كَسَدَتْ - كَسَادًا (ن) থেকে অর্থ- আগ্রহী কম থাকায় অচল হয়ে পড়া। حَبَّةٌ – দুই যব সমপরিমাণ ওজন। اِزَاءٌ – বিপরীতে, পরিবর্তে।

وَيَجُوْزُ بِالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, মৌলিকত্বের বিবেচনায় একমাত্র স্বর্ণ-রূপাই মুদ্রা। কোন মুদ্রার মধ্যে যদি ৬০% বা ততোধিক পরিমাণ স্বর্ণ বা রূপা থাকে, তবে এ প্রকারের মুদ্রার মান কোন কালে কোন অবস্থায়ই বিলোপ হয় না ও হবে না। কিন্তু এছাড়া অন্যান্য সকল মুদ্রা যেমন ধাতব পয়সা, কাগজি নোট ইত্যাদি মৌলিকত্বের বিবেচনায় মুদ্রা নয়; বরং সরকারের ঘোষণা বা জনগণের প্রচলন বলে মুদ্রার মর্যাদা অর্জন করেছে। সুতরাং সরকার যখন তার ঘোষণা প্রত্যাহার করে নেয় কিংবা জনসাধারণ নিজেদের প্রচলন রদ করে নেয়, তখন এসব আর মুদ্রা থাকে না; বরং পূর্বের ন্যায় সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়। যেমন– কাগজি নোটের মুদ্রামান বাতিল করা হলে শুধু কাগজটুকু এবং পিতলের পয়সার মুদ্রামান বিলোপ করা হলে পয়সা বাদ গিয়ে শুধু পিতলটুকু বাকি থাকে। এসকল প্রচলিত মুদ্রা বা পয়সার ওপর যতদিন প্রচলন বহাল থাকে ততদিন লেনদেন কালে হাতে– ইঙ্গিতে তা নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হয় না। শুধু মুখে

পরিমাণ উল্লেখ করলেই চলে। কিন্তু প্রচলন তুলে নেয়ার পর আদান-প্রদান করা হলে শুধু অংশ উল্লেখ করা যথেষ্ট নয়, হাতের ইঙ্গিতে নির্দিষ্ট করে নেয়া জরুরি। কেননা এগুলো তখন সাধারণ পণ্যের কাতারবন্দী হয়ে যায়। আর সাধারণ পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কালে হাতে ধরে না হোক অন্তত ইঙ্গিত দ্বারা তা নির্দিষ্ট করে নেয়া জরুরি।

وَمَنْ اِشْتَرٰى شَيْئًا الخ-এর আলোচনা ঃ বিক্রেতা যদি পণ্যের দাম আধা দিরহাম পয়সা ঘোষণা করে তাতে ক্রেতা সম্মত হয়ে তা গ্রহণ করে এবং পয়সার পরিমাণ কত তা অংকে উল্লেখ না করা হয়, তবে ক্রয়-বিক্রয় শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম যুফার (রঃ) বলেন, বিক্রি শুদ্ধ হবে না। কারণ পয়সা হল গণনীয় জিনিস। সংখ্যা উল্লেখ করা না হলে তার পরিমাণ অজ্ঞাত থেকে যায় । কিন্তু আমরা বলি, এখানে পরিমাণ অজ্ঞাত নেই, কারণ 'আধা দিরহাম পরিমাণ' কথা দ্বারাই পয়সার অংক নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

وَمَنْ اَعْطٰى صَيْرَفِيًّا الخ-এর আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি টাকা ভাঙ্গিয়ে দেয়, সোনা-রূপা যাচাই করে এবং টাকা-পয়সা ও সোনা-রূপা গচ্ছিত রাখে তাকে সয়রাফী বা পোদ্দার বলে। আগের দিনে স্বর্ণকাররা এ কাজ আঞ্জাম দিত। বর্তমানে যে ব্যক্তি বা ব্যাংকের যে শাখা ডলার, পাউন্ড, রিয়াল প্রভৃতি বৈদেশিক মুদ্রা দেশীয় মুদ্রায় বা দেশীয় মুদ্রা বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তর ব্যবসায় কর্তব্যরত তাদেরকেই সয়রাফী বলা হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْبَيْعُ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা দাও।
২। اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ ও اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ -এর পার্থক্য বর্ণনা কর।
৩। اَلْبَيْعُ-এর شَرْط ও رُكْن কি লিখ এবং اَلْبَيْعُ -এর পদ্ধতি বিশদভাবে আলোচনা কর।
৪। اَلْخِيَارُ কাকে বলে? তা কত প্রকার ও কি কি? আলোচনা কর।
৫। اَلْخِيَارُ থাকা কালীন সময়ে দ্রব্যের মালিক কে হবে? বিশদভাবে আলোচনা কর।
৬। خِيَارِشَرْط কখন বাতিল বলে গণ্য হয়? লিখ।
৭। خِيَار رُؤْيَة কাকে বলে? তা কত জায়গায় হতে পারে? এবং خِيَار رُؤْيَة সম্পর্কিত মৌলিক কথাগুলো কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।
৮। خِيَار عَيْب -এর পরিচয় দাও এবং তার হুকুম উদাহরণসহ বিশদভাবে আলোচনা কর।
৯। কোন্ কোন্ অবস্থায় পণ্য ফেরত দেয়া যায় না, তার একটি ফিহ্‌রিস্ত তৈরি কর।
১০। اَلْبَيْعُ الْبَاطِلُ ও اَلْبَيْعُ الْفَاسِدُ -এর পরিচয় দিয়ে উহার ধরন সম্পর্কে একটি টিকা লিখ।
১১। মাকরূহ ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে যা জান তা গুছিয়ে লিখ এবং بَيْع فَاسِد ও بَيْع بَاطِل ও بَيْع مَكْرُوه -এর হুকুম উদাহরণসহ আলোচনা কর।
১২। اِقَالَة -এর সংজ্ঞা দাও। اِقَالَه -এর হুকুম কি? উদাহরণসহ আলোচনা কর।
১৩। تَوْلِيَة ও بَيْعُ الْمُرَابَحَة -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার হুকুম বর্ণনা কর।
১৪। প্রামাণ্যের নিরিখে مُرَابَحَة ও تَوْلِيَة -এর আলোচনা কর।
১৫। اَلرِّبٰوا -এর সংজ্ঞা দাও। তার হুকুম কি? বুঝিয়ে দাও।
১৬। اَلرِّبٰوا ও المرابحة -এর মধ্যকার সম্পর্ক কি ? এবং مُرَابَحَة-কে اَلرِّبٰوا -এর পূর্বে বর্ণনার কারণ কি? লিখ।
১৭। اَلرِّبٰوا -এর উপকারিতা ও অপকারিতার আলোকে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।
১৮। সামাজিক অবক্ষয়ে সুদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।
১৯। اَلسَّلَمُ -এর সংজ্ঞা ও তার শর্তাবলী আলোচনা কর।
২০। اَلسَّلَمُ -এর বৈধতার প্রমাণ দাও।
২১। بَيْعُ الصَّرْفِ কাকে বলে? এর হুকুম কি? বর্ণনা কর।
২২। صَرف, رِبٰوا , اَلسَّلَم -এর পার্থক্য আলোচনা কর।
২৩। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَيَجُوْزُ الْبَيْعُ بِالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ وَاِنْ لَمْ يُعَيِّنْ وَاِنْ كَانَتْ كَاسِدَةً لَمْ يَجُزِ الْبَيْعُ بِهَا حَتّٰى يُعَيِّنَهَا الخ

كِتَابُ الرَّهْنِ

اَلرَّهْنُ يَنْعَقِدُ بِالْاِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ وَيَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَاِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ مُحَوَّزًا مُفَرَّغًا مُمَيَّزًا تَمَّ الْعَقْدُ فِيْهِ وَمَالَمْ يَقْبِضْهُ فَالرَّاهِنُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ سَلَّمَهُ اِلَيْهِ وَاِنْ شَاءَ رَجَعَ عَنِ الرَّهْنِ - فَاِذَا سَلَّمَ اِلَيْهِ فَقَبَضَهُ دَخَلَ فِىْ ضِمَانِهِ وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ اِلَّا بِدَيْنٍ مَضْمُوْنٍ وَهُوَ مَضْمُوْنٌ بِالْاَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ -

বন্ধক পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ বন্ধক-চুক্তি ইজাব ও কবুল দ্বারা সংঘটিত হয় এবং পূর্ণতা লাভ করে (অর্থাৎ আবশ্যকীয় হয় বন্ধকগ্রহীতার দ্রব্য) করায়ত্ত দ্বারা। অতএব মুরতাহিন (বন্ধকগ্রহীতা) যখন বন্ধকী দ্রব্যটি রাহিনের একক মালিকানাভুক্ত এবং তার ব্যবহার ও দখলমুক্ত অবস্থায় করায়ত্ত করে নেবে, তখন চুক্তি সম্পন্ন (তথা আবশ্যকীয়) হবে। এবং যে পর্যন্ত তা কব্জা না করে রাহিনের (বন্ধকদাতার) এখতিয়ার থাকে– ইচ্ছে করলে তা মুরতাহিনকে হাওয়ালা করবে অথবা ইচ্ছা করলে বন্ধক দানের মতো প্রত্যাহার করে নেবে। যখন বন্ধকী দ্রব্য মুরতাহিনের নিকট হস্তান্তর করে দেয় আর সে তা করায়ত্ত করে নেয়, তখন সেটা তার দায়িত্বে চলে যায়। দায়বদ্ধ ঋণ ব্যতীত অন্য কোন ঋণের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয নেই। বন্ধকী দ্রব্য তার মূল্য ও ঋণের মধ্যে যা (পরিমাণে) কম তার দায় বহন করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كِتَابُ الرَّهْنِ-এর আলোচনা ঃ অন্যান্য লেখকগণ كِتَابُ الرَّهْنِ-কে كِتَابُ الصَّيْدِ-এর পরে উল্লেখ করেছেন। কেননা যেভাবে শিকার করা মাল উপার্জনের মাধ্যম, তদ্রূপ رَهْن ও উহার কারণ। কিন্তু قُدُوْرِى কিতাবের লেখক رَهْن-কে بُيُوْع-এর পরে উল্লেখ করেছেন। কেননা عَقْد بَيْع-এর পর এর বেশি প্রয়োজন পড়ে এবং যেমনিভাবে عَقْد بَيْع টা ইজাব ও কবুলের মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে, তদ্রূপ رَهْن ও اِيْجَاب এবং قَبُوْل-এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়ে থাকে। এবং কখনো কখনো عَقْد بَيْع-এর ক্ষেত্রে ثَمَن বা মূল্য না থাকার কারণে رَهْن-এর প্রয়োজন হয়ে থাকে।

رَهْن-এর সংজ্ঞা ঃ رَهْن শব্দের আভিধানিক অর্থ– আবদ্ধ রাখা বা আটক করা। শরীয়তের পরিভাষায়, প্রদত্ত ঋণ বা অন্য কোন দাবির বিপরীতে জামিন স্বরূপ কোন জিনিস আবদ্ধ রাখাকে রিহন বলে, যার দ্বারা পূর্ণ প্রাপ্য বা প্রাপ্যের কিয়দাংশ আদায় করা সম্ভব হয়, যথা– مَرْهُوْن-এর থেকে ঋণ আদায় করে নেয়া, চাই তা حَقِيْقِى হোক বা حُكْمِى হোক। اِمْكَان اَخْذ-এর মাধ্যমে যে সকল বস্তু দীর্ঘস্থায়ী নয়, যথা– বরফ, তা বের হয়ে গেছে। حَق দ্বারা উদ্দেশ্য হল ঋণ। কেননা مَرْهُوْن দ্বারা عَيْن-কে অর্জন করা সম্ভব নয়, তবে যখন عَيْن টা دَيْن-এর হুকুমে হয়ে যাবে তখন আদায় করা সম্ভব।

دَيْن حَقِيْقِى-এর পরিচয় ঃ যা ظَاهِر (প্রকাশ্য) ও بَاطِن (অপ্রকাশ্য) উভয় দিক দিয়ে অথবা শুধুমাত্র জাহেরী দিক দিয়ে জিম্মায় ওয়াজিব হবে। যথা– এমন কৃতদাসের মূল্য যা স্বাধীন প্রমাণিত হয়েছে বা এমন সিরকার মূল্য যা মদ সাব্যস্ত হয়েছে।

دَيْن حُكْمِى-এর পরিচয় ঃ এমন জিনিস বা اَعْيَان যার ক্ষতিপূরণ مِثْل বা قِيْمَت দ্বারা হয়ে থাকে।

رَهْن বৈধ হওয়ার প্রমাণ ঃ رَهْن বৈধ হওয়ার প্রমাণ اَدِلَّة اَرْبَعَة তথা কুরআন, হাদীস, ইজমা, কিয়াস সবগুলো দ্বারাই প্রমাণিত। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوْضَةٌ - فَاِنْ اَمِنَ

بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهٗ. অর্থাৎ তোমরা যদি (ঋণ লেনদেনের সময়) বিদেশে থাক আর কোন লেখক না পাও, তবে এরূপ ক্ষেত্রে (নিশ্চিত থাকার উপায় হল) প্রাপককে প্রদত্ত বন্ধক ব্যবস্থা, অবশ্য একজন অপর জনকে বিশ্বাস করলে (এবং বন্ধকী দ্রব্য না নিলে) ঋণ গ্রহীতার উচিত ঋণদাতার প্রাপ্য পরিশোধ করা এবং এ ব্যাপারে সে যেন তার রবকে ভয় করে চলে।

হযরত আয়শা (রাঃ) হতে বর্ণিত- اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْتَرٰى مِنْ يَهُوْدِيٍّ طَعَامًا وَ رَهَنَهٗ دِرْعَهٗ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) অর্থাৎ মহানবী (সাঃ) জনৈক ইহুদী হতে স্বীয় লৌহ বর্ম বন্ধক রেখে কিছু খাদ্য ক্রয় করলেন।- (বুখারী ও মুসলিম)

অনুরূপভাবে ইজমা ও কিয়াস দ্বারা ও رَهْن বৈধ হওয়ার প্রমাণ বিদ্যমান ।

বন্ধক একটা নৈতিক দায়িত্ব ঃ কোন ব্যক্তি বিদেশ ভ্রমণে থাকা অবস্থায় তার টাকার প্রয়োজন দেখা দিল অথচ সেখানে সে সকলেরই অপরিচিত, অথবা স্বদেশেই তার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু ফেরতপ্রাপ্তির অনিশ্চয়তা হেতু কেউ তাকে ঋণ দিতে সম্মত হচ্ছে না, এমতাবস্থায় সে ব্যক্তির কর্জ প্রাপ্তির একটা ব্যবস্থা শরীয়ত এভাবে করেছে যে, সে কারো কাছে কোন সামগ্রী বন্ধক রেখে টাকা নিয়ে নেবে। এতে কর্জদাতা তার টাকা মারা না যাওয়ার আশঙ্কামুক্ত হতে পারে; অন্যদিকে ঋণগ্রহীতাও নিজস্ব প্রয়োজন পূরণে সক্ষম হতে পারে। অবশ্য বন্ধক রেখে টাকা দেয়ার জন্য কাউকে বাধ্য করা যায় না। তবে ইসলামী সমাজের সামর্থ্যবান ব্যক্তির নৈতিক দায়িত্ব হল তার এক অভাবগ্রস্ত ভাইয়ের প্রয়োজনে জামানত ছাড়া সাহায্য করতে না পারলেও অন্তত তার কোন জিনিস বন্ধক (রিহন) রেখে তাকে সাহায্য করা।

রোকন ও শর্তসমূহ ঃ (১) রিহন এক ধরনের চুক্তি বিশেষ, সে কারণে তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য জরুরি হল ইজাব ও কবুল তথা প্রস্তাব ও সমর্থনের মাধ্যমে রাহিন ও মুরতাহিন নিজেদের সম্মতি প্রকাশ করা। যেমন- রাহিন বলবে আমি অমুক ঋণের পরিবর্তে এ জিনিস বন্ধক রাখলাম, উত্তরে মুরতাহিন বলবে আমি সম্মতি জ্ঞাপন করলাম। (২) দখলীস্বত্ব। অর্থাৎ রাহিন মুরতাহিনকে যে জিনিসটি দিল তাতে তার দখলীস্বত্ব প্রদান করবে। যেমন- সে যদি রিহনস্বরূপ কোন ভূখন্ড দেয় আর তাতে অন্য কারো দখল বিদ্যমান থাকে, তাহলে এ রিহন সহীহ হবে না। (৩) রাহিন ও মুরতাহিন উভয়ে জ্ঞানবান হওয়া। বালেগ (প্রাপ্তবয়স্ক) হওয়া শর্ত নয়। সচেতন বালকও বন্ধক রাখতে পারে। (৪) বন্ধকস্বরূপ প্রদত্ত জিনিস ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য হতে হবে অর্থাৎ ঐ জিনিসটা ক্ষয়িষ্ণু না হয়ে স্থায়িত্বশীল হতে হবে, যেন বন্ধকের সময় তাতে দখলীস্বত্ব কায়েম করা যায়। সর্বোপরি এমন জিনিস হওয়া জরুরি যাকে শরীয়ত মাল বলে স্বীকার করে । যেমন- কেউ জলাধারে থাকা মাছ অথবা ফল আসার পূর্বে বাগানের ফল বন্ধক দিল অথবা বিদেশের এমন কোন পণ্য দিল যা দেশে পৌছতে বেশ অসুবিধাজনক ও ব্যয়বহুল তবে বন্ধক শুদ্ধ হবে না।

কতিপয় পরিভাষা ঃ রহিন (رَاهِن) বন্ধকদাতা অর্থাৎ ঋণগ্রহীতা; মুরতাহিন (مُرْتَهِن) বন্ধকগ্রহীতা অর্থাৎ কর্জদাতা বা প্রাপক; মারহুন (مَرْهُوْن) যে জিনিস বন্ধকস্বরূপ রাখা হয়, বন্ধকী দ্রব্য।

فَاِذَا قَبَضَ الْمُرْتَهِنُ الخ -এর আলোচনা ঃ مُحَوَّز বলতে এমন জিনিস বুঝানো হয়েছে, যা ইজমালি নয়; বরং রাহিনের একক মালিকানাভুক্ত। সে মতে এমন কোন ভূখন্ড থেকে বন্দক দেয়া শুদ্ধ হবে না যাতে একাধিক ব্যক্তি অংশীদার, অথচ একের অংশ অপর থেকে এখনো বন্টন করে পৃথক করা হয়নি।

আর مُفَرَّغ (মুফাররাগ) অর্থ- খালি, অবসর। অর্থাৎ রিহনের দ্রব্য এমন হতে হবে যা বন্ধকদাতার ব্যবহার থেকে আপাতত খালি। যেমন- যদি এমন ঘর হয় যাতে আসবাবপত্র রাখা আছে, তবে তা বের করে ঘর অবসর করে দিতে হবে। এভাবে কোন পাঞ্জাবি গায়ে পরার অধিকার রাহিন নিজের জন্য রেখে সেটা রিহন দিলে তা শুদ্ধ হবে না।

আর مُمَيَّز (মুমাইয়ায্) অর্থ- পৃথককৃত, স্বতন্ত্র। অর্থাৎ বন্ধকী দ্রব্যের সাথে প্রাকৃতিকভাবে গ্রথিত কোন জিনিস রাহিনের অধিকারভুক্ত থাকলে তা থেকে সেটা পৃথক করে দেয়া জরুরি। যেমন- একটি বৃক্ষের ফলের ওপর রাহিন নিজের অধিকার বহাল রেখে শুধু বৃক্ষটি বন্ধক দিলে ফল পেরে তাকে গাছ খালি করে দিতে হবে।

دَخَلَ فِىْ ضَمَانِهٖ -এর আলোচনা ঃ যামান অর্থ- জামানত, দায়িত্ব। অর্থাৎ এখন থেকে বন্ধকী দ্রব্যের সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতির দায়দায়িত্ব মুরতাহিনের ওপর বর্তাবে। স্মরণ রাখতে হবে, যে দ্রব্যটি বন্ধকস্বরূপ প্রদত্ত হয় তা মুরতাহিনের হাতে 'জামানতমূলক আমানত' থাকে। অর্থাৎ আমানতী দ্রব্য যেমন ব্যবহার করা যায় না; বরং সযত্নে হেফাজত করতে হয়,

তদ্রূপ সেও এ দ্রব্য হেফাজত করবে। তবে বেশকম এই যে, আমানত হারিয়ে গেলে আমানত গ্রহীতা সে জন্য দায়ী হয় না; কিন্তু বন্ধকীদ্রব্য হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে গেল মুরতাহিন দায়ী হবে। 'জামানতমূলক' কথার মর্মার্থ মূলত তা-ই। বাকি কি পরিমাণ দায়ী হবে তার আলোচনা সামনে আসছে।

لَا يَصِحُّ الرَّهْنُ اِلَّا بِدَيْنٍ الخ -এর আলোচনা ঃ মায়মূন শব্দের অর্থ– ক্ষতিপূরণীয়। অর্থাৎ যে কোন ঋণের বিপরীতে বন্ধক দাবি করা যাবে না; একমাত্র এমন ঋণ যা ক্ষতিপূরণীয় তার জন্য বন্ধক রাখা ও দাবি করা যাবে। উল্লেখ থাকে যে, দেনা দু' ধরনের– (১) এমন দেনা যা কোন অবস্থায়ই মওকুফ হয় না; বরং দেনাদারকে তা পরিশোধ করতে হয়। যেমন– কর্জরূপে গৃহীত অর্থ, ক্রয়কৃত পণ্যের বিপরীতে বাকি থাকা দাম, মোহরের টাকা ইত্যাদি। এ প্রকার ঋণকে 'মায়মূন বা ক্ষতিপূরণীয়' ঋণ বলা হয়। এগুলোর বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয। (২) দ্বিতীয় প্রকার দেনা এমন যা কোন কোন অবস্থায় মওকুফ হয়ে যায়; দেনাদারকে তা বা তার পরিবর্তে অন্য কিছু আদায় করতে হয় না। যেমন– আমানতদারের নিকট গচ্ছিত টাকা বা কোন দ্রব্য, আরিয়তস্বরূপ গৃহীত জিনিসপত্র এবং উদ্যোক্তার হাতে মুযারাবার পুঁজি প্রভৃতি। এগুলো সবই এক রকম দেনা যা তার মালিককে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু উপযুক্ত সতর্কতা সত্ত্বেও যদি তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। সুতরাং এগুলো দায়বদ্ধ দেনা নয়; ফলে এদের বিপরীতে বন্ধক রাখা জায়েয হবে না।

وَهُوَ مَضْمُوْنٌ بِالْاَقَلِّ الخ -এর আলোচনা ঃ সর্বোচ্চ সতর্কতার পরও যদি মুরতাহিনের হাতে বন্ধকী দ্রব্য ক্ষতি বা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাকে দ্রব্যের মূল্য ও ঋণের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণের দায় বা ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে। এখানে দায় বহনের মোট তিনটি অবস্থা হতে পারে– (১) ক্ষতিগ্রস্ত দ্রব্যটির মূল্য প্রদত্ত ঋণের সমান। এক্ষেত্রে মুরতাহিন রাহিন থেকে নিজের টাকা দাবি করতে পারবে না। উভয়ের হিসাব সমন্বিত হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। (২) বিনষ্ট বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য প্রদত্ত ঋণের আসল টাকা হতে কম, তাহলে বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য বাদ দেয়ার পর বাকি টাকার জন্য মুরতাহিন রাহিনের নিকট দাবি করতে পারবে। (৩) বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য আসল টাকার চেয়ে বেশি। এ ক্ষেত্রে ঋণের টাকা হিসাব করার পর অবশিষ্ট টাকার লোকসান রাহিনের ঘাড়ে বর্তাবে। কেননা বন্ধকী দ্রব্যের সম মূল্যের জামিন ছিল মুরতাহিন, আর অবশিষ্ট অর্থ ছিল তার নিকট জামানতবিহীন আমানত। আর আমানতদার হতে জামানতবিহীন আমানতের ক্ষতিপূরণ নেয়া যায় না। যেমন– এক ব্যক্তি ১০০ (একশ') টাকা ঋণ নিয়ে বন্ধকস্বরূপ এক প্রস্ত অলঙ্কার মুরতাহিনের নিকট রেখে দিল। অতঃপর যদি অলঙ্কার চুরি হয়ে যায়, তাহলে অলঙ্কারের মূল্য একশ' টাকা হয়ে থাকলে উভয়ের হিসাব সমন্বিত হয়ে যাবে, কেউ কারো কাছে কোন কিছু দাবি করতে পারবে না। আর যদি অলঙ্কারের মূল্য ৯০ টাকা হয়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে ৯০ টাকা মুরতাহিন পেয়ে গেছে। অতএব আর মাত্র ১০ টাকা রাহিন থেকে দাবি করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি অলঙ্কার ১২৫ টাকা মূল্যের হয়ে থাকে, তবে ১০০ টাকা কাটাকাটি গিয়ে সমন্বিত হল। বাকি ২৫ টাকা রাহিনেরই লোকসান হল; সে মুরতাহিন থেকে দাবি করতে পারবে না। কেননা ১০০ টাকা ছিল তার দায়িত্বে। বাকি ২৫ টাকা ছিল তার নিকট আমানতস্বরূপ। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, বন্ধকী দ্রব্য মুরতাহিনের নিকট জামানত হিসাবে নয়; বরং আমানতস্বরূপ থাকে। সুতরাং দ্রব্য নষ্ট হলে মুরতাহিনকে দায়ী করা যাবে না।

فَإِذَا هَلَكَ الرَّهْنُ فِىْ يَدِ الْمُرْتَهِنِ وَقِيْمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَاءٌ صَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِدَيْنِهِ حُكْمًا وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَكْثَرَ مِنَ الدَّيْنِ فَالْفَضْلُ أَمَانَةٌ وَإِنْ كَانَتْ قِيْمَةُ الرَّهْنِ أَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهَا وَ رَجَعَ الْمُرْتَهِنُ بِالْفَضْلِ۔

وَلَا يَجُوْزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ وَهُوَ رَهْنُ ثَمَرَةٍ عَلٰى رُؤُسِ النَّخْلِ دُوْنَ النَّخْلِ وَلَا زَرْعٍ فِى الْأَرْضِ دُوْنَ الْأَرْضِ وَلَا يَجُوْزُ رَهْنُ النَّخْلِ وَالْأَرْضِ دُوْنَهُمَا وَلَا يَصِحُّ الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ كَالْوَدَائِعِ وَالْعَوَارِىْ وَالْمُضَارَبَاتِ وَمَالِ الشَّرِكَةِ وَيَصِحُّ الرَّهْنُ بِرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ وَثَمَنِ الصَّرْفِ وَالْمُسْلَمِ فِيْهِ فَإِنْ هَلَكَ فِىْ مَجْلِسِ الْعَقْدِ تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ وَصَارَ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِحَقِّهِ حُكْمًا۔

সরল অনুবাদ ঃ সে মতে যদি মুরতাহিনের হাতে বন্ধকী দ্রব্য বিনাশ হয়ে যায় আর দ্রব্যের মার্কেট মূল্য ও দেনার পরিমাণ সমান হয় তবে মুরতাহিন (আইনত) তার ঋণ আদায় করে নিয়েছে। আর যদি বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য দেনার চেয়ে বেশি হয়, তাহলে বেশিটুকু মুরতাহিনের হাতে আমানতস্বরূপ(ছিল বিধায় তা রাহিনের লোকসানের খাতায় হিসাব হবে)। পক্ষান্তরে যদি বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য প্রদত্ত ঋণ থেকে কম হয়, তাহলে মূল্যের সমপরিমাণ টাকা ঋণ থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে এবং ঋণের উদ্বৃত্ত অংশ মুরতাহিন রাহিন থেকে উসুল করে নেবে।

যৌথ সম্পদ রিহন (বন্ধক) রাখা জায়েয নেই এবং জায়েয নেই গাছে থাকা ফল গাছ ছাড়া এবং জমিতে থাকা ফসল জমিবিহীন বন্ধক রাখা। (একইভাবে) ফল ও ফসল বাদ রেখে গাছ এবং জমি বন্ধক রাখাও দুরস্ত নেই। আমানতী মালের বিপরীতে রিহন রাখা জায়েয নেই। যেমন– অদিয়ত, আরিয়ত, মুযারাবা ও শিরকত (প্রভৃতির) মাল। সলমের 'পুঁজি' সরফের 'মুদ্রা' এবং সলমের 'পণ্যে'র মোকাবেলায় রিহন রাখা দুরস্ত আছে। সুতরাং (এ সকল ক্ষেত্রে গৃহীত বন্ধকী দ্রব্য) যদি চুক্তি স্থলে বিনষ্ট হয়ে যায়, তবে সরফ ও সলম চুক্তি পূর্ণাঙ্গ হয়ে যাবে এবং মুরতাহিন তার পাওনা আদায় করে নিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يَجُوْزُ رَهْنُ الْمُشَاعِ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ রিহন রাখার উদ্দেশ্য হল মুরতাহিনের প্রদত্ত ঋণ যাতে মারা না পড়ে এবং প্রয়োজনে সে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে নিজের প্রাপ্য উসুল করতে পারে। আর এ জন্য দরকার বন্ধকী দ্রব্যে মুরতাহিনের পূর্ণ দখলীস্বত্ব প্রতিষ্ঠা হওয়া। কিন্তু দ্রব্য যৌথ হলে বা অন্যের মালামাল দ্বারা আবদ্ধ থাকলে পূর্ণাঙ্গ দখল লাভ করা সম্ভব নয়। মনে রাখতে হবে, রিহন তিন প্রকার– (এক) সহীহ ঃ যেমন– প্রদত্ত ঋণের টাকা বা জিনিসের বিপরীতে রিহন রাখা। (দুই) ফাসিদ ঃ যেমন– মদ ও শূকরের পরিবর্তে রিহন রাখা। (তিন) আমানতের টাকা বা জিনিসপত্র এবং দরক (অর্থাৎ পরবর্তী কালের কোন হকদার বেরিয়ে আসার আশঙ্কা) এর বিপরীতে বন্ধক রাখা। ১ম ও ২য় প্রকার রিহন বন্ধকী দ্রব্য দায়বদ্ধ হবে। কিন্তু ৩য় প্রকারে তা দায়বদ্ধ হবে না।

الرَّهْنُ بِالْأَمَانَاتِ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সকল প্রকার আমানতি দ্রব্যের বিধান হল আমানতদারের বিনা অবহেলায় তা নষ্ট হয়ে গেলে আমানতদারকে তার খেসারত বহন করতে হয় না; আমানতকারী বরং তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয়। পক্ষান্তরে রিহন ব্যবস্থা হচ্ছে সে সমস্ত পাওনা নিশ্চিত করার জন্য যার ক্ষতিপূরণ দিতে দেনাদার সর্বদা বাধ্য থাকে।

تَمَّ الصَّرْفُ وَالسَّلَمُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সরফ ও সলম বিক্রয়ে উপস্থিত ক্ষেত্রেই 'দাম' করায়ত্ত করা জরুরি, তা নাহলে বিক্রি শুদ্ধ হয় না। আলোচ্য মাসআলায় মুসলাম-ইলাইহ্ (বিক্রেতা) মূল্যে পরিবর্তে যে 'রিহন' নিয়ে ছিল তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় কেমন যেন সে মূল্য উসুল করে নিয়েছে। আর উপস্থিত ক্ষেত্রে দাম করায়ত্ত করলে কারবার চূড়ান্তরূপ লাভ করে। সুতরাং বিক্রয়চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে বুঝে নিতে হবে।

وَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى وَضْعِ الرَّهْنِ عَلَى يَدِيْ عَدْلٍ جَازَ وَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَا لِلرَّاهِنِ أَخْذُهُ مِنْ يَدِهِ فَإِنْ هَلَكَ فِيْ يَدِهِ هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ وَيَجُوْزُ رَهْنُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ فَإِنْ رَهَنَتْ بِجِنْسِهَا وَهَلَكَتْ هَلَكَتْ بِمِثْلِهَا مِنَ الدَّيْنِ - وَإِنِ اخْتَلَفَا فِي الْجَوْدَةِ وَالصِّيَاغَةِ وَمَنْ كَانَ لَهُ دَيْنٌ عَلَى غَيْرِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ مِثْلَ دَيْنِهِ فَأَنْفَقَهُ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ زُيُوْفًا فَلَا شَيْءَ لَهُ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى يَرُدُّ مِثْلَ الزُّيُوْفِ وَ يَرْجِعُ مِثْلَ الْجِيَادِ وَمَنْ رَهَنَ عَبْدَيْنِ بِأَلْفٍ فَقَضَى حِصَّةَ أَحَدِهِمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَقْبِضَهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ بَاقِيَ الدَّيْنِ فَإِذَا وَكَّلَ الرَّاهِنُ الْمُرْتَهِنَ أَوِ الْعَدْلَ أَوْ غَيْرَهُمَا فِيْ بَيْعِ الرَّهْنِ عِنْدَ حُلُوْلِ الدَّيْنِ فَالْوَكَالَةُ جَائِزَةٌ فَإِنْ شُرِطَتِ الْوَكَالَةُ فِيْ عَقْدِ الرَّهْنِ فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ عَزْلُهُ عَنْهَا فَإِنْ عَزَلَهُ لَمْ يَنْعَزِلْ وَإِنْ مَاتَ الرَّاهِنُ لَمْ يَنْعَزِلْ أَيْضًا .

সরল অনুবাদ ঃ যদি রাহিন ও মুরতাহিন বন্ধকী দ্রব্য বিশ্বস্ত কোন তৃতীয় ব্যক্তির হেফাজতে রাখার ব্যাপারে একমত হয় তবে তা জায়েয আছে। এ স্থলে রাহিন বা মুরতাহিন কেউই এককভাবে সেটা তার হাত থেকে নিয়ে আসতে পারবে না। অবশ্য যদি তা সে ব্যক্তির হাতে বিনষ্ট হয়ে যায় তবে এর দায় মুরতাহিনকেই বহন করতে হবে (অর্থাৎ এতে মুরতাহিন তার প্রদত্ত ঋণ থেকে দ্রব্যের মূল্য পরিমাণ টাকা উসুল করে নিয়েছে বলে ধর্তব্য হবে)। স্বর্ণ-রূপা (টাকা-পয়সা) এবং কায়ল ও ওজনভুক্ত জিনিস বন্ধক রাখা জায়েয। কিন্তু এ সবের কোন একটি যদি তার সমজাতীয় জিনিসের বিপরীতে বন্ধক রাখা হয় আর (মুরতাহিনের নিকট) তা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে প্রদত্ত ঋণ থেকে সম পরিমাণ বিনষ্ট হবে (অর্থাৎ এখানে অপেক্ষাকৃত কমের প্রশ্ন বৃথা; মুরতাহিন বরং প্রদত্ত ঋণ থেকে দ্রব্যের সমপরিমাণ অংশ পেয়ে গেছে বুঝতে হবে)। যদিও বা গৃহীত ঋণ ও বন্ধকী দ্রব্য গুণগত মান ও কারিগরি শৈলীতে ভিন্ন হয়। কোন ব্যক্তির ঋণ পাওয়া ছিল অন্য কারো নিকট ফলে সে তার থেকে নিজের পাওনা পরিমাণ টাকা উসুল করে খরচ করে নিল অতঃপর জানতে পারল যে, সেগুলো ভেজাল মুদ্রা ছিল, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, সে সম পরিমাণ ভেজাল মুদ্রা (সংগ্রহ করে দেনাদারকে) ফেরত দিলে তার থেকে খাঁটি মুদ্রা আদায় করে নিতে পারবে। কোন ব্যক্তি দু'টি গোলাম বন্ধক রেখে এক হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করল, অতঃপর এক গোলামের অংশ (বরাবর ঋণ) পরিশোধ করে দিল। এমতাবস্থায় সে ঋণের বাকি অংশ আদায় না করা পর্যন্ত (পৃথকভাবে) ঐ গোলামটি ছাড়িয়ে নিতে পারবে না। ঋণের মেয়াদ শেষে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে দেয়ার ব্যাপারে রাহিন যদি মুরতাহিন বা আস্থাভাজন কোন ব্যক্তি বা অপর কাউকে উকিল বানিয়ে (দায়িত্ব দিয়ে) রাখে, তবে তা জায়েয আছে। আর যদি উকিল নিযুক্তির শর্তে রিহন চুক্তি সম্পাদিত হয়, তবে রাহিন উক্ত উকিলকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করতে পারবে না। যদি বরখাস্ত করে তবে সে বরখাস্ত হবে না। এমনকি রাহিন মৃত্যুবরণ করলেও সে বরখাস্ত হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ রাহিন তার বন্ধকী দ্রব্যের হেফাজতের জন্য উক্ত বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে নির্বাচিত করেছে। অপর দিকে মুরতাহিনও প্রদত্ত ঋণের টাকা উসুল করে দেয়ার জন্য তাকে দায়িত্ব দিয়েছে। এক কথায় এ লোকটির নিকট রক্ষিত বন্ধকী দ্রব্যের রাহিন ও মুরতাহিন উভয়ের স্বার্থ জড়িত আছে। এমতাবস্থায় এককভাবে কোন একজন উক্ত দ্রব্য আনতে যাওয়া অপরজনকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করার শামিল। আর ইসলামী শরীয়ত অপরকে বঞ্চিত করার অনুমতি দেয় না।

فَإِنْ رَهَنْتَ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, কোন ব্যক্তি এক মণ আমন চালের পরিবর্তে একমন পায়জম চাল বন্ধক রাখল। অতঃপর ঘটনাক্রমে বন্ধকী দ্রব্য পায়জম চালগুলো চুরি হয়ে গেল। এতে কেমন যেন ঋণদাতা (বন্ধকগ্রহীতা) এর প্রদত্ত ঋণ এক মণ আমন চালই চুরি হয়ে গেছে। অর্থাৎ উভয়ের হিসাব সমন্বিত হয়েছে বুঝতে হবে। এখানে আপেক্ষিকতার হিসাব অর্থাৎ বন্ধকী দ্রব্যের মূল্য ঋণের পরিমাণের চেয়ে কম ছিল কি বেশি ছিল তা দেখার সুযোগ নেই।

ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ كَانَ زُيُوفًا الخ -এর আলোচনা ঃ زُيُوفٌ শব্দটি زَائِفٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ–জাল মুদ্রা। একইভাবে যে মুদ্রা সরকার ব্যতিল করে দিয়েছে বটে কিন্তু জনগণ এখন তা ব্যবহার করে চলেছে তাকেও যুয়ূফ বলে অভিহিত করা হয়। এ মাসআলায় ইমাম সাহেবের মতের পক্ষে যুক্তি হল, প্রাপক জাল মুদ্রা দ্বারাই ভালো মুদ্রার সুবিধা ভোগ করে নিয়েছে। কাজেই সে ভেজাল ফেরত দিয়ে ভালো গ্রহণ করার অধিকার রাখে না। অবশ্য কব্জার সময় ভেজাল নজরে পড়ার পরও যদি সে কোনরূপ আপত্তি উত্থাপন না করে থাকে, তবে সর্বসম্মতভাবে তা ফেরত দিতে পারবে না।

فَلَيْسَ لِلرَّاهِنِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ উকিলকে তার দায়িত্ব থেকে সরাতে পারবে না এবং সরালেও তা কার্যকর হবে না। কারণ বন্ধক-চুক্তি যেমন ঋণের ফেরত প্রাপ্তিকে নিশ্চিত করে, তদ্রূপ বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি ও এর বিক্রয়লব্ধ অর্থে ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা দিয়ে কাউকে উকিল নিযুক্ত করা হলে তা ঋণ মারা না পড়ার নিশ্চয়তা বিধান করে। কাজেই এটা রিহন চুক্তিরই একটা সংশ্লিষ্ট অঙ্গ। একে প্রতিষ্ঠা করার পর তুলে নেয়ার অধিকার রাহিনের নেই।

وَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُطَالِبَ الرَّاهِنَ بِدَيْنِهِ وَيَحْبِسَهُ بِهِ وَإِنْ كَانَ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ بَيْعِهِ حَتّٰى يَقْبِضَ الدَّيْنَ مِنْ ثَمَنِهِ فَإِذَا قَضَاهُ الدَّيْنَ قِيلَ لَهُ سَلِّمِ الرَّهْنَ إِلَيْهِ ـ وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ فَالْبَيْعُ مَوْقُوفٌ فَإِنْ أَجَازَهُ الْمُرْتَهِنُ جَازَ وَإِنْ قَضَاهُ الرَّاهِنُ دَيْنَهُ جَازَ ـ وَإِنْ أَعْتَقَ الرَّاهِنُ عَبْدَ الرَّهْنِ بِغَيْرِ إِذْنِ الْمُرْتَهِنِ نَفَذَ عِتْقُهُ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ مُوسِرًا وَالدَّيْنُ حَالًّا طُولِبَ بِأَدَاءِ الدَّيْنِ وَإِنْ كَانَ مُؤَجَّلًا أُخِذَ مِنْهُ قِيمَةُ الْعَبْدِ فَجُعِلَتْ رَهْنًا مَكَانَهُ حَتّٰى يَحِلَّ الدَّيْنُ وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا اِسْتَسْعَى الْعَبْدُ فِي قِيمَتِهِ فَقَضٰى بِهِ الدَّيْنَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْعَبْدُ عَلَى الْمَوْلٰى وَكَذٰلِكَ إِنِ اسْتَهْلَكَ الرَّاهِنُ الرَّهْنَ وَإِنِ اسْتَهْلَكَهُ أَجْنَبِيٌّ فَالْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ فِي تَضْمِينِهِ فَيَأْخُذُ الْقِيمَةَ فَيَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا فِي يَدِهِ وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ وَعَلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَلٰى مَالِهِمَا هَدَرٌ وَأُجْرَةُ الْبَيْتِ الَّذِي يُحْفَظُ فِيهِ الرَّهْنُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَأُجْرَةُ الرَّاعِي عَلَى الرَّاهِنِ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ عَلَى الرَّاهِنِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ মুরতাহিন তার প্রদত্ত ঋণ রাহিনের নিকট দাবি করতে পারে এবং (ঋণ আদায়ে তালবাহানা করলে আদালতের মাধ্যমে) তাকে আটক করতে পারে। যদি বন্ধকী দ্রব্য মুরতাহিনের আয়ত্তে থাকে, তবে রাহিনকে তা বিক্রির সুযোগ দেয়া তার ওপর বাধ্যতামূলক নয়, (বরং দ্রব্য আগলে রাখার অধিকার তার রয়েছে) যাতে সময় মতো সে এর দাম থেকে ঋণ উসুল করে নিতে পারে। রাহিন যখন মুরতাহিনকে ঋণ পরিশোধ করে দেবে তখন তাকে বলা হবে বন্ধকী জিনিস ফিরিয়ে দাও। রাহিন যদি মুরতাহিনের অনুমতি ব্যতীত বন্ধকী জিনিস বিক্রি করে দেয়, তবে বিক্রি স্থগিত থাকবে। অতঃপর মুরতাহিন তা অনুমোদন করলে কার্যকরী হবে। আর যদি রাহিন তাকে ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাতেও কার্যকরী হবে। রাহিন যদি মুরতাহিনের অনুমতি ছাড়া বন্ধকী গোলাম মুক্ত করে দেয়, তবে তা কার্ষকর হবে। এমতাবস্থায় রাহিন সচ্ছল এবং ঋণ অমেয়াদী হলে তার নিকট ঋণ আদায়ের দাবি করা হবে। আর যদি মেয়াদী হয় তবে তার থেকে গোলামের মূল্য আদায় করা হবে এবং মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তদস্থলে তা বন্দকস্বরূপ রেখে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে যদি রাহিন অভাবী হয়, তবে স্বয়ং গোলাম নিজের মূল্য (পরিমাণ অর্থ) উপার্জন করবে এবং তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে এবং পরে মনিব থেকে সে টাকা আদায় করে নেবে। তদ্রূপ যদি রাহিন ইচ্ছাপূর্বক বন্ধকী জিনিস বিনষ্ট করে ফেলে (অর্থাৎ অমেয়াদী হলে ঋণ আদায় করে নেবে, নতুবা বন্ধকী জিনিসের মূল্য আদায় করে এনে তদস্থলে বন্ধকস্বরূপ রেখে দেবে)। যদি তৃতীয় কোন লোক বন্ধকী জিনিস বিনষ্ট করে, তবে সে লোককে দায়ী করার ক্ষেত্রে মুরতাহিনই বাদী হবে এবং তার থেকে (ভর্তুকি বাবদ) বন্ধকী জিনিসের মূল্য (বা তার মেছেল) আদায় করে নেবে এবং তা মুরতাহিনের নিকট বন্ধকস্বরূপ থাকবে। রাহিন বন্ধকী জিনিসের ক্ষতিসাধন করলে তাকে এর জরিমানা দিতে হবে। (এবং সে জরিমানার টাকা বন্ধকী জিনিসের সাথে বন্ধকস্বরূপ জমা থাকবে)। পক্ষান্তরে মুরতাহিন ক্ষতি করলে তা প্রদত্ত ঋণ থেকে ক্ষতির পরিমাণ অর্থ কর্তন করে দেবে। কিন্তু স্বয়ং বন্ধকী দ্রব্য রাহিন বা মুরাতাহিনের দৈহিক বা আর্থিক কোন ক্ষতি করলে তা বৃথা যাবে। বন্ধকী দ্রব্যের রক্ষণাগারের ভাড়া মুরতাহিনের দায়িত্বে। আর বন্ধকী পশুর রাখালের বেতন-ভাতা এবং সে পশুর খাদ্য-খাবারের ব্যয় বর্তাবে রাহিনের ওপর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَيْسَ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা ঃ রাহিন যদি ঋণ পরিশোধের উদ্দেশ্যে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করতে চায় তাহলে মুরতাহিনের তাতে সম্মতি দেয়া আবশ্যকীয় নয়। কারণ ঋণ উসুল না হওয়া পর্যন্ত বন্ধকী দ্রব্য আগলে রাখা মুরতাহিনের ন্যায্য অধিকার।

وَإِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি مُرْتَهِن-এর অনুমতি ব্যতীত مَرْهُوْن-কে বিক্রি করে ফেলে, তখন বেচাকেনা مَوْقُوْف থাকবে। কিন্তু যদি সে অনুমতি দিয়ে দেয় বা رَاهِن ، مُرْتَهِن-এর ঋণ পরিশোধ করে ফেলে, তবে তা বৈধ হয়ে যাবে। অন্যথা ক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে যে, رَاهِن ছুটা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে বা কাজির নিকট بَيْع-কে ভেঙ্গে দেয়ার জন্য মামলা দায়ের করবে। কাজি আবূ ইউসূফ (রঃ)-এর এক বর্ণনা মতে, بَيْع হয়ে যাবে। তবে ظَاهِر رِوَايَت হল যা প্রথমে বর্ণনা করা হয়েছে।

اَلْمُرْتَهِنُ هُوَ الْخَصْمُ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি شَئ مَرْهُوْن-কে কোন অপরিচিত ব্যক্তি ধ্বংস করে দেয় তবে তার ক্ষতিপূরণ গ্রহণের ব্যাপারে مُرْتَهِن ই مَدّ مُقَابِل হবে। কাজেই সে মূল্য আদায় করবে যা তার নিকট বন্ধক ছিল। এ জন্য যে, যদি عَيْن رَهْن বিদ্যমান থাকে, তবে مُرْتَهِن-ই অধিক হকদার, তদ্রূপ সে জিনিসের প্রার্থনার ক্ষেত্রেও সে অধিক হকদার হবে যে জিনিসকে তার স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ যদি عَيْن বাকি থাকে, তবে مُرْتَهِن তাকে স্বীয় আয়ত্তে নেয়ার ক্ষেত্রে خَصْم হয়। তদ্রূপ عين-এর স্থলাভিষিক্ত জিনিসকেও ফিরিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে সে প্রতিপক্ষ বা خصم হয়।

جِنَايَةُ الرَّاهِنِ الخ -এর আলোচনা ঃ জিনায়াত শব্দের আভিধানিক অর্থ– সীমালঙ্ঘন করা, অতিরঞ্জন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, কারো শারীরিক ক্ষতি করাকে জিনায়াত বলে, যেমন– আহত করা বা প্রাণে মেরে ফেলা ইত্যাদি। আর আর্থিক ক্ষতি সাধনকে ইত্‌লাফ বা গসব নামে অভিহিত করা হয়। এখানে জিনায়াত বলতে বন্ধকী দ্রব্যে রাহিন বা মুরতাহিন কর্তৃক সংঘটিত এমন আচরণকে বুঝানো হয়েছে, যদ্বারা দ্রব্যের মূল্য হ্রাস ঘটে। যেমন– বন্ধকী পশুর নাক, কান বা হাত কেটে দিল অথবা অন্য কোন অঙ্গহানি করা হল ইত্যাদি। যদি এ ধরনের ক্ষতি রাহিন দ্বারা সংঘটিত হয়, তবে এতে দ্রব্যের মূল্য যত টাকা হ্রাস পাবে রাহিন তত টাকা খেসারত দেবে এবং প্রদত্ত খেসারতের টাকা আপাতত আসল দ্রব্যের সাথে বন্ধক স্বরূপ জমা থাকবে। আর যদি মুরতাহিন দ্বারা হয়ে থাকে, তবে ঋণ পরিশোধ ও বন্ধকী জিনিস ছাড়িয়ে নেয়ার সময় রাহিন সে পরিমাণ টাকা কেটে রেখে বাকি টাকা আদায় করবে।

وَجِنَايَةُ الرَّهْنِ الخ -এর আলোচনা ঃ বন্ধকী দ্রব্য কোনরূপ ক্ষতিসাধন করলে তা বৃথা যাওয়ার কারণ হল হয়তো সে রাহিন না হয় মুরতাহিনের ক্ষতি করেছে। রাহিনের ক্ষতি করে থাকলে সে তার মালিকেরই ক্ষতি করেছে। আর কোন মালিক তার নিজস্ব পশু থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করা নিজেই নিজের কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ের শামিল, যা কিনা সম্পূর্ণ বোকামি। পক্ষান্তরে মুরতাহিনের রক্ষণাবেক্ষণে থাকাকালে বন্ধকী জিনিস দ্বারা সংঘটিত যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির সমুদয় দায়-দায়িত্ব মুরতাহিনের দায়িত্বেই বর্তায়। কাজেই আজ যখন সে স্বয়ং মুরতাহিনেরই ক্ষতি করে বসল তখন সে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করবে কার নিকট?

أُجْرَةُ الْبَيْتِ الخ -এর আলোচনা ঃ বন্ধকী দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ যে অর্থ ব্যয় হবে তার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার মুরতাহিনের বহন করতে হবে। কেননা সে এর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছে। যেমন– একশ' মণ শস্য সংরক্ষণের জন্য যে ঘরের দরকার তার দায়িত্ব বর্তাবে মুরতাহিনের ওপর। এভাবে অলঙ্কার, সোনা-রূপা অথবা কোন দামি জিনিস হেফাজতের কাজে ব্যয়িত অর্থ মুরতাহিনের প্রদান করতে হবে। অনুরূপভাবে বন্ধকী জন্তুর চিকিৎসা খরচও মুরতাহিনকেই বহন করতে হবে।

পক্ষান্তরে বন্ধকী দ্রব্য বা তার মুনাফার পরিপোষণ ও জীবন রক্ষামূলক ব্যয় যেমন– বন্ধকী জন্তুর খাদ্যে, জমির সেচকার্যে, ফলের রক্ষণাবেক্ষণ কার্যে, মুরগির ডিম নিখুঁত রাখা ইত্যাদি কাজে যে খরচ হবে তা রাহিনকে বহন করতে হবে। কেননা বন্ধকী দ্রব্য থেকে উৎপন্ন মুনাফা তো রাহিনেরই প্রাপ্য। সে কারণে এতদসংক্রান্ত খরচাদিও তারই কাঁধে চাপবে। অবশ্য মুরতাহিন এ খরচ আপাতত নিজের পকেট থেকে দিয়ে পরে তার আসল টাকার সাথে রাহিন থেকে তা আদায় করে নিতে পারে। বন্ধকী দ্রব্যের ব্যয়ভার সম্পর্কে মূলনীতি হল, দ্রব্যকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে ব্যয় জরুরি হয় তা রাহিনের ওপর বর্তাবে। যেমন– পশু হলে তার পানাহার, বাগান হলে তা সেচ দেয়া, খাল হলে তা খনন করা প্রভৃতি। আর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যা ব্যয় হবে তা মুরতাহিনের দায়িত্বে থাকবে। যেমন– ঘর ভাড়া ও রাখালি খরচ ইত্যাদি।

বিঃ দ্রঃ মুরতাহিন বন্ধকী দ্রব্য হতে কোনরূপ ফায়দা নিতে পারবে না। অবশ্য কোন বিশেষ প্রয়োজনের তাগিদে রাহিনের আন্তরিক সম্মতিক্রমে মুরতাহিন তা ব্যবহার করতে পারে।

وَنَمَاؤُهُ لِلرَّاهِنِ فَيَكُونُ النَّمَاءُ رِهْنًا مَعَ الْاَصْلِ فَاِنْ هَلَكَ النَّمَاءُ هَلَكَ بِغَيْرِ شَيْءٍ وَاِنْ هَلَكَ الْاَصْلُ وَبَقِيَ النَّمَاءُ اَفْتَكَهُ الرَّاهِنُ بِحِصَّتِهِ وَيَقْسِمُ الدَّيْنَ عَلٰى قِيْمَةِ الرَّهْنِ يَوْمَ الْقَبْضِ وَعَلٰى قِيْمَةِ النَّمَاءِ يَوْمَ الْفِكَاكِ فَمَا اَصَابَ الْاَصْلَ سَقَطَ مِنَ الدَّيْنِ بِقَدْرِهٖ وَمَا اَصَابَ النَّمَاءُ اَفْتَكَهُ الرَّاهِنُ بِهٖ وَيَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِي الرَّهْنِ وَلَا يَجُوْزُ الزِّيَادَةُ فِي الدَّيْنِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يَصِيْرُ الرَّهْنُ رِهْنًا بِهِمَا وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى هُوَ جَائِزٌ -

সরল অনুবাদ ঃ বন্ধকী মালের আয় রাহিনের প্রাপ্য। সুতরাং তা (আপাতত) আসল মালের সাথে বন্ধকরূপে থেকে যাবে। কিন্তু যদি (কোন কারণে) এ আয় বিনষ্ট হয়ে যায় তবে তা বৃথা যাবে (অর্থাৎ রহিন বা মুরতাহিন কেউই এর ক্ষতিপূরণ পাবে না)। আর যদি আয় বাকি থেকে আসল ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে রাহিন মুনাফার ভাগের ঋণ আদায় করে তা ছাড়িয়ে নেবে। অর্থাৎ বন্ধকী দ্রব্যের করায়ত্ত দিবসে যে বাজার মূল্য ছিল এবং ছাড়িয়ে নেবার দিন মুনাফার যে মার্কেট মূল্য রয়েছে এর মাঝে গৃহীত ঋণ হারাহারি মতো ভাগ করা হবে। এবার যে পরিমাণ ঋণ বন্ধকী দ্রব্যের ভাগে পড়বে তা ঋণ থেকে কাটা যাবে আর মুনাফা ভাগে যা পড়বে তা দিয়ে রাহিন মুরতাহিন থেকে মুনাফা ছাড়িয়ে নেবে (এবং এভাবে তাদের হিসাব সমন্বিত হবে)। ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, (রিহন-চুক্তি সম্পন্ন হওয়ার পর) বন্ধকী দ্রব্যের সাথে (বন্ধকস্বরূপ আরো কিছু) বর্ধিত করা জায়েয, কিন্তু গৃহীত ঋণের মধ্যে বর্ধিত করা জায়েয নেই। (কেউ এরূপ করলে) বন্ধকী দ্রব্য উভয় ঋণের মোকাবেলায় রিহন সাব্যস্ত হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, তা জায়েয আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ هَلَكَ الْاَصْلُ الخ -এর আলোচনা ঃ আসল দ্রব্য ধ্বংস হয়ে যদি শুধু আয়টুকু অবশিষ্ট থাকে, তবে গৃহীত ঋণের টাকা আসল ও আয়ের মধ্যে ভাগ করে দেখতে হবে আয়ের ভাগ কত পড়ে। অতঃপর সে পরিমাণ টাকা মুরতাহিনকে দিয়ে আয়ের অংশ ছাড়িয়ে আনবে। কেননা বন্ধকের ক্ষেত্রে আসল বিনাশ হয়ে গেলে মুনাফা তখন আসলের মর্যাদা লাভ করে। যেমন– কেউ ১টি মুরগি বন্ধক দিয়ে ১০০ (একশ') টাকা ঋণ গ্রহণের দিন মুরগিটির দাম ছিল ৮০ টাকা এবং বন্ধক যেদিন ছাড়িয়ে নিচ্ছে সেদিন ১০টি ডিমের দাম হল ২০ টাকা। এবার গৃহীত ১০০ (একশ') টাকা আশি ও বিশ টাকার মধ্যে হারানুপাতে ভাগ করলে আসল দ্রব্য অর্থাৎ মুরগির ভাগে ৮০ (আশি) টাকা এবং মুনাফা দ্রব্য অর্থাৎ ডিমের ভাগে পড়ে ২০ (বিশ) টাকা। অতএব রাহিন বর্তমানে গৃহীত ঋণের শুধুমাত্র বিশ টাকা পরিশোধ করে ১০টি ডিম ছাড়িয়ে নেবে। অবশিষ্ট ৮০ টাকা আসল বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হওয়ার মাধ্যমে সমন্বিত হয়েছে বলে বুঝতে হবে।

وَيَجُوْزُ الزِّيَادَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– কেউ যদি এক প্রস্ত অলঙ্কার বন্ধক দিয়ে ৫০০ (পাঁচশ') টাকা ঋণ গ্রহণ করে অতঃপর উক্ত ঋণের বিপরীতে ঐ অলঙ্কারের সাথে আরো এক প্রস্ত অলঙ্কার বন্ধক স্বরূপ রেখে দেয় তাহলে সকল ইমামের মতেই তা জায়েয। পক্ষান্তরে যদি প্রথম পর্বে দেয়া অলঙ্কারের বিপরীতে আরো ৫০০ (পাঁচশ') টাকা ঋণ গ্রহণ করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে তা জায়েয হলেও তরফাইন (রঃ)-এর মতে জায়েয হবে না। সুতরাং তাঁদের মতানুসারে উক্ত অলঙ্কার শুধুমাত্র প্রথমবার গৃহীত পাঁচশ' টাকার বিপরীতে বন্ধক বলে পরিগণিত হবে এবং শেষের বারে গৃহীত পাঁচশ' টাকার বিপরীতে কোন বন্ধক নেই বুঝতে হবে।

وَإِذَا رَهَنَ عَيْنًا وَاحِدَةً عِنْدَ رَجُلَيْنِ بِدَيْنٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ وَجَمِيْعُهَا رَهْنٌ عِنْدَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَالْمَضْمُوْنُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حِصَّةُ دَيْنِهِ مِنْهَا فَإِنْ قَضَى اَحَدُهُمَا دَيْنَهُ كَانَ كُلُّهَا رَهْنًا فِيْ يَدِ الْآخَرِ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا عَلَى اَنْ يَرْهَنَهُ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ فَامْتَنَعَ الْمُشْتَرِيْ مِنْ تَسْلِيْمِ الرَّهْنِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَكَانَ الْبَائِعُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ رَضِيَ بِتَرْكِ الرَّهْنِ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَ الْبَيْعَ اِلَّا اَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِيْ الثَّمَنَ حَالًا اَوْ يَدْفَعَ قِيْمَةَ الرَّهْنِ فَيَكُوْنَ رَهْنًا ـ

<u>সরল অনুবাদ</u> ঃ যদি কেউ দু' ব্যক্তি থেকে গৃহীত ঋণের পরিবর্তে একটি মাত্র জিনিস উভয়ের নিকট বন্ধক রাখে, তবে তা জায়েয আছে। এরূপ ক্ষেত্রে পুরো জিনিসটাই তাদের প্রত্যেকের নিকট (পৃথক পৃথকভাবে) রিহন বলে গণ্য হবে এবং তাদের প্রত্যেকের ওপর নিজ নিজ ঋণের পরিমাণ অনুপাতে দায়ভার বর্তাবে। সুতরাং রাহিন যদি তাদের একজনের ঋণ পরিশোধ করে দেয় তখন দ্বিতীয় জনের নিকট পুরো জিনিসটাই বন্ধকস্বরূপ থেকে যাবে যতক্ষণ না সে তার ঋণ উসুল করে নেবে। দামের পরিবর্তে নির্দিষ্ট কোন জিনিস বন্ধক রাখার শর্তে যদি কোন ব্যক্তি কোন জিনিস (ধারে) বিক্রি করে অতঃপর ক্রেতা বন্ধক রাখা থেকে বিরত থাকে, তবে তাকে এজন্য বাধ্য করা যাবে না। অবশ্য বিক্রেতার স্বাধীনতা থাকবে– ইচ্ছা করলে সে রিহনের দাবি ত্যাগ করবে, আর তা না হয় বিক্রির সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেবে। ক্রেতা গোলামের দাম নগদ দিয়ে দিলে অথবা বন্ধকী জিনিস (না দিয়ে তার) মূল্য প্রদান করে থাকলে এ মূল্যটাই তখন বন্ধক গণ্য হবে (ফলে বিক্রয়-চুক্তি রহিত করা যাবে না)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا رَهَنَ عَيْنًا الخ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন– রহীম কবীর থেকে ৬০ (ষাট) টাকা এবং খুরশীদ থেকে ৪০ (চল্লিশ) টাকা মোট ১০০ (একশ') টাকা ঋণ নিয়ে বন্ধকস্বরূপ তাদের নিকট একটি ঘড়ি রাখল, তবে তা জায়েয আছে। এ স্থলে উভয় ঋণদাতা তাদের নিজ নিজ ঋণের পরিমাণ অনুযায়ী বন্ধকী ঘড়ির ব্যাপারে জামিন হবে। সে মতে ঘড়িটা যদি হারিয়ে যায় এবং এর মূল্য একশ' টাকা হয়, তাহলে কবীর ষাট টাকা এবং খুরশীদ চল্লিশ টাকা পরিমাণ ভর্তুকি দেবে। অর্থাৎ তারা তাদের প্রদত্ত ঋণ আর ফেরত পাবে না। কাটাকাটি গিয়ে হিসাব সমান সমান হয়েছে বুঝতে হবে।

لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ বিক্রেতা যদি কাজির নিকট ক্রেতার বিরুদ্ধে এ মর্মে অভিযোগ দায়ের করে, তাহলে কাজি বন্ধক দেয়ার জন্য ক্রেতাকে আইনত বাধ্য করতে পারবে না। কারণ বন্ধক-চুক্তি একটা মানবিক চুক্তি মাত্র, এটা পালনে কাউকে জোর করা চলে না।

وَلِلْمُرْتَهِنِ اَنْ يَّحْفَظَ الرَّهْنَ بِنَفْسِهٖ و زَوْجَتِهٖ و وَلَدِهٖ وَخَادِمِهِ الَّذِىْ فِىْ عَيَالِهٖ وَاِنْ حَفِظَهٗ بِغَيْرِ مَنْ هُوَ فِىْ عَيَالِهٖ اَو اَودَعَهٗ ضَمِنَ وَاِذَا تَعَدَّى الْمُرْتَهِنُ فِى الرَّهْنِ ضَمِنَهٗ ضِمَانَ الْغَصَبِ بِجَمِيْعِ قِيْمَتِهٖ وَاِذَا اَعَادَ الْمُرْتَهِنُ الرَّهْنَ لِلرَّاهِنِ فَقَبَضَهٗ خَرَجَ مِنْ ضِمَانِ الْمُرْتَهِنِ فَاِنْ هَلَكَ فِىْ يَدِ الرَّاهِنِ هَلَكَ بِغَيْرِ شَىْءٍ وَلِلْمُرْتَهِنِ اَنْ يَّسْتَرْجِعَهٗ اِلٰى يَدِهٖ فَاِذَا اَخَذَهٗ عَادَ الضِّمَانُ عَلَيْهِ وَاِذَا مَاتَ الرَّاهِنُ بَاعَ وَصِيُّهُ الرَّهْنَ وَقَضَى الدَّيْنَ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهٗ وَصِيٌّ نَصَبَ الْقَاضِىْ لَهٗ وَصِيًّا وَاَمَرَهٗ بِبَيْعِهٖ ـ

সরল অনুবাদ ঃ বন্ধকী মালের তত্ত্বাবধান স্বয়ং মুরতাহিন করবে অথবা আপন স্ত্রী, সন্তান বা পোষ্যভুক্ত খাদিমের কারো দ্বারা করাবে। যদি সে এমন কারো দ্বারা তা হেফাজত করে যে পোষ্যভুক্ত নয় কিংবা কারো নিকট গচ্ছিত রাখে, (এবং সেটা নষ্ট হয়ে যায়) তবে সে দায়ী হবে। যদি মুরতাহিন বন্ধকী মালের মধ্যে অনধিকার চর্চা করে, তবে সে জবরদখলী জিনিসের ভর্তুকির ন্যায় এর পূর্ণ মূল্য ভর্তুকি দেবে। মুরতাহিন যখন রাহিনকে বন্ধকী দ্রব্য আরিয়তস্বরূপ প্রদান করে এবং রাহিন সেটা করায়ত্ত করে নেয়, তখন তা মুরতাহিনের জিম্মা থেকে বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং যদি রাহিনের হাতে তা বিনষ্ট হয়ে যায়, (যেমন– চুরি হয়ে গেল বা হারিয়ে গেল) তাহলে মুরতাহিন দায়ী হবে না। আর মুরতাহিনের জন্য জিনিসটা ফেরত আনার অধিকার রয়েছে। যখন সে ফেরত নিয়ে আসবে তখন পুনরায় তার ওপর দায়িত্ব ন্যস্ত হবে। যখন রাহিন মারা যাবে, তখন (বন্ধকী-চুক্তি আপনা-আপনি বাতিল হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় তার ওয়ারিশদের কর্তব্য পরিত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে ঋণ পরিশোধ করে বন্ধকী দ্রব্য ছাড়িয়ে আনা অথবা মুরতাহিনকে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে প্রদত্ত ঋণ উসুল করে নেয়ার অনুমতি দেয়া। কিন্তু যদি ওয়ারিশগণ নাবালেগ কিংবা বহু দূরে অবস্থানরত হয় তবে) তার ওসী (অর্থাৎ রাহিনের তারাকা তত্ত্বাবধানে নিয়োজিত ব্যক্তি) বন্ধকী দ্রব্য বিক্রি করে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে মুরতাহিনের ঋণ পরিশোধ করবে। আর যদি ওসী না থাকে, তবে (মুরতাহিন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করবে এবং তখন) কাজি মৃতের পক্ষে কাউকে ওসী নিযুক্ত করত তাকে বন্ধকী দ্রব্য বিক্রির নির্দেশ দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ حَفِظَهٗ بِغَيْرِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ এমতাবস্থায় বন্ধকী দ্রব্য বিনষ্ট হলে মুরতাহিনকে এর পূর্ণ মূল্যের দায়িত্ব নিতে হবে। উল্লেখ্য যে, বন্ধকী জিনিস মুরতাহিন বা আদিলের নিকট তাদের কোনরূপ অবহেলা বা বেআইনী আচরণ ছাড়াও যদি বিনষ্ট হয় তখনও ভর্তুকি দিতে হয়; কিন্তু সে ভর্তুকি আর অবহেলা বা বেআইনী আরচণজনিত বিনষ্টের ভর্তুকির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাহল সেখানে প্রদত্ত ঋণ ও বন্ধকী দ্রব্যের মূল্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত যেটা কম কেবল সেটুকুর ভর্তুকি বহন করতে হয়। পক্ষান্তরে এখানে দিতে হয় বন্ধকী জিনিসের সম্পূর্ণ মূল্য। যেমন ধরুন কেউ ৩০০ (তিনশ') টাকা ঋণ নিয়ে একটি ঘড়ি বন্ধক রাখল; ঘড়িটির দাম ৫০০ (পাঁচশ') টাকা। মুরতাহিন ঘড়িটি নিজে হেফাজত না করে বাইরের কারো নিকট গচ্ছিত রাখল এবং ঘটনাক্রমে ঘড়িটি সে ব্যক্তির হাত থেকে পড়ে ভেঙ্গে গেল। এ ক্ষেত্রে মুরতাহিন পাঁচশ' টাকা ভর্তুকি বহন করবে। তিনশত টাকা প্রদত্ত ঋণ থেকে কর্তন করে দেবে এবং সাথে আরো নগদ দু'শ টাকা দেবে। এই দু'শ টাকা পরিমাণ বন্ধকীদ্রব্য যদিও বা মুরতাহিনের নিকট আমানতস্বরূপ ছিল; কিন্তু তার বেআইনী আচরণের কারণে তা আর আমানতের পর্যায়ে থাকেনি– জামানতে পরিণত হয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلرَّهْنُ -এর পরিচয় দাও এবং উহার হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। কুরআন-হাদীসের নিরিখে اَلرَّهْنُ -এর বৈধতার প্রমাণ দাও।

৩। اَلرَّهْنُ -এর رُكْن ও শর্ত সমূহের বিবরণ দাও।

৪। اَلرَّاهِنُ - اَلْمُرْتَهِنُ - اَلْمَرْهُوْنُ -এর সংজ্ঞা দাও।

৫। اَلرَّهْنُ -এর নিয়ম ও বন্ধকী দ্রব্যের মর্যাদা বর্ণনা কর।

৬। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা যায় না এবং কি কি জিনিস বন্ধক রাখা যায় না? বর্ণনা কর।

৭। مُرْتَهِن -এর দায়িত্ব ও অধিকারাবলী লিখ।

৮। বন্ধকী দ্রব্য হতে প্রাপ্ত আয়ের বিধানের বিবরণ দাও।

كِتَابُ الْحَجْرِ

اَلْاَسْبَابُ الْمُوْجِبَةُ لِلْحَجْرِ ثَلٰثَةٌ اَلصِّغَرُ وَالرِّقُّ وَالْجُنُوْنُ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الصَّغِيْرِ اِلَّا بِاِذْنِ وَلِيِّهٖ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الْعَبْدِ اِلَّا بِاِذْنِ سَيِّدِهٖ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُ الْمَجْنُوْنِ الْمَغْلُوْبِ عَلٰى عَقْلِهٖ بِحَالٍ وَمَنْ بَاعَ مِنْ هٰؤُلَاءِ شَيْئًا اَوِ اشْتَرَاهُ وَهُوَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصُدُهٗ فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَجَازَهٗ اِذَا كَانَ فِيْهِ مَصْلِحَةٌ وَاِنْ شَاءَ فَسَخَهٗ فَهٰذِهِ الْمَعَانِيْ الثَّلٰثَةُ تُوْجِبُ الْحَجْرَ فِي الْاَقْوَالِ دُوْنَ الْاَفْعَالِ وَاَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ لَا تَصِحُّ عُقُوْدُهُمَا وَلَا اِقْرَارُهُمَا وَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُمَا وَلَا اِعْتَاقُهُمَا فَاِنْ اَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضَمَانُهٗ - وَاَمَّا الْعَبْدُ فَاَقْوَالُهٗ نَافِذَةٌ فِيْ حَقِّ نَفْسِهٖ غَيْرُ نَافِذَةٍ فِيْ حَقِّ مَوْلَاهُ فَاِنْ اَقَرَّ بِمَالٍ لَزِمَهٗ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الْحَالِ وَاِنْ اَقَرَّ بِحَدٍّ اَوْ قِصَاصٍ لَزِمَهٗ فِي الْحَالِ وَيَنْفُذُ طَلَاقُهٗ وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مَوْلَاهُ عَلٰى اِمْرَأَتِهٖ -

---

হাজর পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ মানুষের ওপর তিন কারণে হাজ্র (বারণ) আরোপিত হয়– অপরিণত বয়স (নাবালেগ হওয়া), দাসত্ব এবং মস্তিষ্ক বিকৃতি। সে মতে নাবালেগের (মৌখিক) তাসাররুফ তার ওলীর অনুমতি ছাড়া এবং ক্রীতদাসের তাসাররুফ তার মনিবের অনুমতি ব্যতীত সহীহ্ নয় এবং যে ব্যক্তি পূর্ণ পাগল তার তাসাররুফ কোন অবস্থায়ই শুদ্ধ নয়। (অর্থাৎ তারা মৌখিক কোন কারবার করলে তা কার্যকর হবে না।) সুতরাং এদের কেউ যদি কোন কিছু বিক্রি বা ক্রয় করে এবং সে ক্রয়-বিক্রয় কি তা বুঝে এবং তা (ছলনাচ্ছলে নয় বরং) আন্তরিকভাবে করে তাহলে তার ওলীর ইচ্ছা– যদি চায় তা বলবৎ রাখবে যদি তাতে মঙ্গল থাকে নতুবা রহিত করে দেবে। মোট কথা, এ তিনটি অবস্থা (সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের) কাজ-কর্ম নয়; বরং তাদের মৌখিক (ও লৈখিক) বক্তব্যের কার্যকারিতা বারণ করে। অতএব নাবালেগ এবং পাগলের কোনরূপ কারবার ও ইক্বরার (অন্য কারো প্রাপ্তি সম্পর্কিত স্বীকারোক্তি) শুদ্ধ নয়। এবং তাদের তালাক ও দাস মুক্তি কার্যকর হবে না। তবে তারা যদি কোন জিনিস নষ্ট করে, তাহলে তাদের ওপর এর জরিমানা বর্তাবে। পক্ষান্তরে গোলামের মৌখিক তাসাররুফ তার নিজের ক্ষেত্রে কার্যকর; মনিবের অধিকার সম্পর্কিত হলে কার্যকর নয়। সুতরাং সে যদি (তার নিকট কারো) অর্থ প্রাপ্তির ইক্বরার করে, তবে মুক্তি লাভের পর সে দেনা তার ওপর বর্তাবে; তৎক্ষণাৎ বর্তাবে না। আর হদ কিংবা ক্বিসাসের স্বীকার করলে উক্ত অবস্থায়ই তার ওপর সে হুকুম বর্তাবে। এভাবে স্ত্রীকে তালাক দিলে তা কার্যকর হবে; কিন্তু গোলামের স্ত্রীর ওপর মাওলার তালাক পড়বে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَجَر -এর পরিচিতি ঃ حَجَر -এর শাব্দিক অর্থ হল اَلْمَنْعُ বা বাধা দেয়া, বারণ করা, থামিয়ে দেয়া, সংকুচিত করা। পাথরকে আরবীতে حَجَر বলা হয়। কেননা পাথর তার মধ্যে অন্যের আছর করা হতে রক্ষা করে। এবং عَقْل (জ্ঞান)-কেও حَجَر বলা হয়। কেননা জ্ঞান মানুষকে মন্দ কর্ম হতে বাধা দেয়।

حَجَر -এর শরয়ী অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায়, কোন ব্যক্তিকে তার মালিকানাধীন সম্পদের ব্যবহার থেকে সাময়িকভাবে বিরত রাখাকে হাজ্র বলে। কুরআন ও হাদীসে এর অনুমোদন বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে সমাজতান্ত্রিক মতবাদে জোরপূর্বক মানুষের ব্যক্তিমালিকানা বিলোপ করা আর ইসলামের এ হাজরের মধ্যে যথেষ্ট তফাত রয়েছে। কারণ এখানে ক্ষেত্রবিশেষে সাময়িকভাবে সম্পদ ব্যবহারের অধিকার বিলোপ করা হয় মাত্র ; মালিকানা থেকে বঞ্চিত করা হয় না।

হাজর আরোপের কারণসমূহ ঃ প্রায় ছয়টি কারণে হাজর করা যায়, তন্মধ্যে প্রথমোক্ত তিনটি সর্বসম্মত এবং অবশিষ্ট তিনটি মতবিরোধপূর্ণ। (এক) বয়সের স্বল্পতার দরুন কারো মধ্যে সম্পদ ব্যয়ের যোগ্যতা না থাকা, যেমন– নাবালেগ অবুঝ বালক। (দুই) পূর্ণ মস্তিষ্কবিকৃতির দরুন কারো মধ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ক্ষমতা না থাকা, যেমন– পাগল। (তিন) দাসত্ব। (চার) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া সত্ত্বেও বোকামি ও নির্বুদ্ধিতার কারণে অনর্থক অকাতরে সম্পদ ব্যয় করা, যেমন– মানসিক প্রতিবন্ধী, নির্বোধ। (পাঁচ) পাপিষ্ট, দুরাচার ব্যক্তি যে অপকর্মে সম্পদ ব্যয় করে, এ শ্রেণীর লোকদেরকে মূলত ফাসিক-ফাজির বলা হয়। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, এদের মধ্যে অপব্যয়ের দোষ পরিলক্ষিত হলেই কেবল হাজর করা যাবে অন্যথা যাবে না। কিন্তু জমহুরের মত হল, দীনদারী সৃষ্টি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সর্বাবস্থায় তাদের ওপর হাজর করে রাখা যাবে। (ছয়) ঋণগ্রস্তের তালবাহানার দরুন তার ধন-সম্পদে হাজর। অর্থাৎ যদি কোন ঋণগ্রস্ত ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ঋণদাতাদের হয়রানি করতে থাকে তাহলে দাতাদের আবেদনক্রমে সরকার তার সম্পত্তি, তার ডাকঘর বা ব্যাংকের টাকা বা ঘরের আসবাবপত্রের ওপর হস্তক্ষেপ করত তাকে ঋণ পরিশোধে বাধ্য করবে। তাতেও যদি ফল না হয়, তাহলে সরকার নিজে তা বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করবে। এ ছয়টি কারণ ছাড়াও আরো একটি কারণে হাজর করা যায় তাহল, সর্বসাধারণের ক্ষতির কারণ বিধায় কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমের ওপর হাজর (নিষেধাজ্ঞা) আরোপ করা। যেমন– যে শিক্ষক ছাত্রদের সঠিক শিক্ষাদানের পরিবর্তে ক্রুটিপূর্ণ শিক্ষা দান করে, যে ব্যক্তি চরিত্রগঠনের বদলে তা বিনষ্ট করে, যে সংস্থা অশ্লীল ও নৈতিকতাবিরোধী বই প্রকাশ করে, যে মুফতী ভুল ফতোয়া প্রদান করতে থাকে, যে অজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসালয় খুলে মানুষের স্বাস্থ্য বিনষ্ট করতে থাকে, যে কারখানা-মালিক খাঁটি দ্রব্যের নামে ভেজাল পণ্য উৎপাদন করে এবং যে পেশাজীবি মানুষকে প্রতারণা করে ইত্যাদি। এদের সকলকেই হাজর আরোপের মাধ্যমে তাদের পেশা থেকে বিরত রাখা হবে। তবে এ অধিকার কেবল ইসলামী সরকারের ; জনসাধারণের নয়। তারা অভিযোগ সরকার পর্যন্ত উত্থাপন করতে পারে, নিজেদের হাতে আইন তুলে নিতে পারে না।

উল্লেখ থাকে যে, প্রথমোক্ত ছয় প্রকার হাজর এবং এ হাজরে পার্থক্য হল, সেখানে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সকল প্রকার মৌখিক ও লৈখিক কারবারের ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয়। সে মতে ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, ই'আরা, হিবা, সদকা, অসিয়ত ইত্যাদি কোন কারবারই সে করতে পারে না এবং করলেও তা কার্যকর হয় না। পক্ষান্তরে এখানে শুধু সংশ্লিষ্ট পেশা থেকে সেই ব্যক্তিকে নিষেধ করা হয় মাত্র। তাছাড়া অন্যান্য সকল কারবারের পথ তার জন্য খোলা থাকে।

হাজর করবে কে? প্রথমোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের হাজর করার অধিকার ওলী ও মাওলার। ওলীর অবর্তমানে হাজর করবে ওলী কর্তৃক নিযুক্ত অসী বা অভিভাবক। আর অসী না থাকলে এদের হাজর করার ক্ষমতা একমাত্র সরকারের। শেষোক্ত তিন শ্রেণীর লোকদের হাজর করার অধিকার সরকার ব্যতীত অন্য কারো নেই।

وَمَنْ بَاعَ هٰؤُلَاءِ الخ -এর আলোচনা ঃ উল্লিখিত مَحْجُوْرِيْنَ -এর মধ্য হতে যদি কেউ এমন عَقْد করে, যা লাভ ও ক্ষতির মাঝে ঘুরপাক খেতে থাকে এবং সে عَقْد -কে বুঝে, তখন তার وَلِى -এর জন্য স্বাধীনতা থাকবে যে, ইচ্ছে করলে সে عَقْد -কে রক্ষাও করতে পারে, আবার ভেঙ্গেও দিতে পারে। এবং ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য হল কাজি, বাবা, দাদা, وَصِى এবং মনিব।

يَعْقِلُ الْبَيْعَ الخ -এর আলোচনা ঃ মনে করুন কোন বালক দোকানিকে একটি টাকা দিয়ে কলা দিতে বলল। এবার সে কলা হাতে পেয়ে যদি টাকা ফেরত পাবার জন্য কান্না জুড়ে দেয়, তবে বুঝতে হবে সে কেনাবেচা কি জিনিস তা বুঝে না। আর কলা নিয়ে নির্বিবাদে চলে গেলে ক্রয়-বিক্রয়ের রূপ-রেখা সম্পর্কে সে জ্ঞাত বলে বুঝতে হবে। যে লোক কখনো পাগল হয় আবার কখনো সুস্থ হয় সে যদি সুস্থ অবস্থায় কারবার করে, তাহলে বুঝতে হবে সে জেনে-বুঝেই করেছে।

فَالْوَلِيُّ بِالْخِيَارِ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন অবুঝ শিশু, পাগল বা ক্রীতদাস যদি কোন কারবার করে বসে এবং সে কারবার এমন হয় যাতে লাভ-ক্ষতি উভয় রকম সম্ভাবনা বিদ্যমান, তবে ওলী তাতে অনুমতি দিতেও পারে এবং নাও পারে। কিন্তু ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী হলে অনুমতি দিতে পারবে না এবং দিলেও তা কার্যকরী হবে না; বরং কারবার বাতিল গণ্য হবে।

يُوْجِبُ الْحَجْرَ الخ -এর আলোচনা ঃ হাজার আরোপের কারণে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শুধুমাত্র মৌখিক তাসাররুফ (যথা– ওয়াদা-অঙ্গীকার, ক্রয়-বিক্রয়, বিয়ে, তালাক প্রভৃতি) অগ্রাহ্য হবে। ক্রিয়া-কর্মের কার্যকারিতা অগ্রাহ্য হবে না। সে মতে হিবা, সদকা প্রভৃতি কার্যকর হবে না, কিন্তু কারো আর্থিক বা শারীরিক ক্ষতিসাধন করলে তাকে এর খেসারত প্রদান করতে হবে; নাবালেগ বা পাগল হওয়ার কারণে রেহাই পাবে না। ওলী তাদের পক্ষ থেকে এ খেসারত বহন করবে।

মনে রাখতে হবে, মৌখিক কারবারের মোট তিনটি ধরন হতে পারে– (এক) এমন কারবার যাতে লাভ-লোকসান উভয় প্রকার সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন– ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ইত্যাদি। (দুই) যে কারবারে লোকসান নিশ্চিত, যেমন– তালাক প্রদান ও দাস মুক্তকরণ ইত্যাদি। (তিন) এমন কারবার বা কথা যা কেবলই লাভজনক, যেমন– হিবা ও হাদিয়া গ্রহণ ইত্যাদি। প্রথম ও দ্বিতীয় প্রকার কারবারে হাজর আরোপিত হয়, তবে বেশকম এই যে, প্রথম প্রকার অস্তিত্ব লাভ করে কিন্তু তার কার্যকারিতা ওলীর অনুমতির ওপর মওকুফ থাকে। আর দ্বিতীয় প্রকার গোড়াতেই তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। সুতরাং কোন মাহজুর ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দিলে কেমন যেন সে তালাক শব্দ উচ্চারণই করেনি। আর তৃতীয় প্রকার তাসাররুফ হাজরের আওতাভুক্তই নয়। কাজেই সে ক্ষেত্রে ওলীর আপত্তি অগ্রাহ্য হবে।

طَلَاقُ مَوْلَاهُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ মনিবের জন্য গোলামের স্ত্রী যখন হালাল নয় তখন সে তালাকের দ্বারা তাকে হারাম করতে পারে কিরূপে? হাঁ গোলাম হল স্বামী ; আর স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল বিধায় তালাকের দ্বারা তাকে হারাম করার অধিকারও তার রয়েছে।

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايُحْجَرُ عَلَى السَّفِيْهِ اِذَا كَانَ عَاقِلًا بَالِغًا حُرًّا وَتَصَرُّفُهُ فِىْ مَالِهِ جَائِزٌ وَاِنْ كَانَ مُبَذِّرًا مُفْسِدًا يَتْلَفُ مَالَهُ فِىْ مَالَا غَرَضَ لَهُ فِيْهِ وَلَا مُصْلِحَةَ مِثْلُ اَنْ يَّتْلَفَهُ فِى الْبَحْرِ اَوْ يُحْرِقَهُ فِى النَّارِ اِلَّا اَنَّهُ قَالَ اِذَا بَلَغَ الْغُلَامُ غَيْرَ رَشِيْدٍ لَمْ يُسَلَّمْ اِلَيْهِ مَالُهُ حَتّٰى يَبْلُغَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً وَاِنْ تَصَرَّفَ فِيْهِ قَبْلَ ذٰلِكَ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ فَاِذَا بَلَغَ خَمْسًا وَّعِشْرِيْنَ سَنَةً سُلِّمَ اِلَيْهِ مَالُهُ وَاِنْ لَمْ يُوْنَسْ مِنْهُ الرُّشْدُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُحْجَرُ عَلٰى سَفِيْهٍ وَيُمْنَعُ مِنَ التَّصَرُّفِ فِىْ مَالِهِ فَاِنْ بَاعَ لَمْ يَنْفُذْ بَيْعُهُ فِىْ مَالِهِ وَاِنْ كَانَ فِيْهِ مُصْلِحَةً اَجَازَهُ الْحَاكِمُ وَاِنْ اَعْتَقَ عَبْدًا نَفَذَ عِتْقُهُ وَكَانَ عَلَى الْعَبْدِ اَنْ يَّسْعٰى فِىْ قِيْمَتِهِ وَاِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً جَازَ نِكَاحُهُ فَاِنْ سَمّٰى لَهَا مَهْرًا جَازَ مِنْهُ مِقْدَارَ مَهْرِ مِثْلِهَا وَبَطَلَ الْفَضْلُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَنْ بَلَغَ غَيْرَ رَشِيْدٍ لَا يُدْفَعُ اِلَيْهِ مَالُهُ اَبَدًا حَتّٰى يُوْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ وَلَا يَجُوْزُ تَصَرُّفُهُ فِيْهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, সাফীহ যদি আকেল, বালেগ ও স্বাধীন হয়, তবে তার ওপর হাজর আরোপ করা হবে না। নিজস্ব অর্থ-সম্পদে তার তাসাররুফ কার্যকর হবে, যদিও সে অপচয়ী ও বিনাশক হয় এবং উদ্দেশ্য ও লাভহীন কাজে আপন সম্পদ নষ্ট করে, যেমন সম্পদ নদীতে ফেলে দেয় কিংবা আগুনে পুড়িয়ে ফেলে। তবে ইমাম সাহেব (রঃ) এ কথাও বলেছেন যে, যদি কোন বালক দায়িত্ব-বোধহীন অবস্থায় বালেগ হয়, (অর্থাৎ তখনও তার মধ্যে দায়িত্ব-জ্ঞান না আসে) তবে পঁচিশ বছর বয়সে পদার্পণ না করা পর্যন্ত তার অর্থ-সম্পদ তার হাতে সমর্পণ করা হবে না। অবশ্য ঐ বয়সে পৌঁছার পূর্বে যদি সম্পদে কোন তাসাররুফ করে, তবে তা কার্যকর হবে। যখন সে পঁচিশ বছর বয়সে পদাপর্ণ করবে তখন তার সম্পদ তার অধিকারে দিয়ে দেয়া হবে; যদিও তার মধ্যে দায়িত্ব-বোধের লক্ষণ অনুভূত না হয়। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, সফীহের ওপর হাজর আরোপ করা হবে এবং তাকে তার সম্পদে তাসাররুফ করা থেকে বিরত রাখা হবে। সুতরাং সে যদি তার সম্পদ বিক্রি করে তা কার্যকর হবে না। অবশ্য যদি তা লাভজনক হয়, তবে আদালত তা বহাল রেখে দেবে। যদি সে গোলাম আযাদ করে, তবে তার আযাদকরণ কার্যকর হবে। তবে গোলামের আবশ্যক হবে নিজের মূল্য পরিমাণ অর্থ উপার্জন করে মাওলাকে দিয়ে দেয়া। যদি সে কোন রমণী বিয়ে করে, তবে তার বিয়ে শুদ্ধ হবে। এবং স্ত্রীর জন্য মোহর ধার্য করে থাকলে মোহরে মিছিল পরিমাণ তা প্রযোজ্য হবে; অধিকটুকু গ্রাহ্য হবে না। যে ব্যক্তি নিবোর্ধ অবস্থায় প্রাপ্তবয়স্ক হল তার সম্পর্কে ইমাম সাহেবাইনের উক্তি হল, যতদিন পর্যন্ত তার মধ্যে দায়িত্ববোধের লক্ষণ পরিস্ফুট না হবে ততদিন সম্পদ তার দায়িত্বে দেয়া হবে না এবং তাতে তার কোন তাসাররুফ কার্যকর হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا يُحْجَرُ عَلَى السَّفِيْهِ الخ -এর আলোচনা ঃ সাফীহ শব্দটি سَفَهٌ থেকে উদগত। অর্থ– বোকামি, বুদ্ধিহীনতা, দায়িত্ববোধের ক্ষীণতা। শরীয়তের পরিভাষায়, উদ্দেশ্যহীন কাজে অর্থ-সম্পদ নষ্ট করাকে 'সাফাহ' এবং নষ্ট কারীকে 'সাফীহ' বলে। তাছাড়া অন্যান্য অসামাজিক কাজ যেমন– মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি যদিও বা অপচয়ের শামিল কিন্তু পারভাষিক অর্থে তা 'সাফাহ' নয়। দেশীয় পরিভাষায় সাফীহগণ 'মানসিক প্রতিবন্ধী' নামে পরিচিত। 'সাফীহ' -এর ওপর হাজর চাপিয়ে দেয়া যাবে কি-না তা নিয়ে কিছুটা মতপার্থক্য আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, আক্বেল, বালেগ ও স্বাধীন স্তরের সাফীহ ব্যক্তির ওপর হাজর করা যাবে না। কারণ কাউকে তার সম্পদে তাসাররুফ করা থেকে বিরত রাখা এবং তার সম্পদ ব্যবহারের অধিকার হরণ করা তাকে পশুর কাতারে দাঁড় করানোর শামিল। কাজেই তা করা যাবে না। তবে তিনি এ কথাও বলেন, যদি সর্ব সাধারণকে ক্ষতি থেকে রক্ষার নিমিত্ত কোন সাফীহের ওপর হাজর আরোপ করা হয়, তবে তা জায়েয। যেমন– অজ্ঞ চিকিৎসককে তার চিকিৎসাকার্যে হাজর করা হলে তা আইনসম্মত গণ্য হবে। কিন্তু সাহেবাইন ও ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মত হল, হাজর আরোপ করা যাবে। তাঁরা দলিলস্বরূপ কুরআন পাকের এ আয়াত فَإِنْ كَانَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَايَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ পেশ করেন। এস্থলে ফতোয়া মূলত সাহেবাইনের কওলের ওপর। –(দুররে মুখতার)

মনে রাখতে হবে সাফীহ এর মধ্যে সে সমস্ত লোকও শামিল, যারা নিজেদের আহমকী ও অবহেলার দরুন কাজ-কারবারে সর্বদাই ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

وَاِنْ اَعْتَقَ عَبْدًا الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সাফীহের কল্যাণ কামিতায়ই যখন তাকে সমুদয় কারবার থেকে নিবৃত্ত রাখা হল তখন যদিও বা এর অনিবার্য দাবি ছিল গোলামের মুক্তির কার্যকর না হওয়া কিন্তু 'মুক্তকরণ' যেহেতু একটি অপ্রত্যাহার যোগ্য ক্রিয়া; কাউকে মুক্ত করলে সে মুক্ত হয়ে যায়– তার মুক্তি ঠেকানো যায় না। সে কারণে গোলাম আযাদ তো হয়ে যাবে, তবে এ অপ্রত্যাশিত লোকসানের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। তাহল, গোলাম নিজের মূল্য পরিমাণ অর্থ কামাই করে তার নির্বোধ মনিবকে দিয়ে দেবে।

وَاِنْ تَزَوَّجَ اِمْرَأَةً الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ বিয়ে মানুষের মৌলিক প্রয়োজন সমূহের মধ্যে গণ্য। সে কারণে তা শুদ্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু মোহর যেহেতু সাফীহের আর্থিক লোকসান ঘটায় যা বিয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ সে কারণে তাসমিয়া (ধার্যকরণ) বাতিল হয়ে মোহরে মিছিল দায়িত্বে বর্তাবে। বলা বাহুল্য, নির্বোধ স্বামীর মোহর ধার্যকরণ গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় এক্ষেত্রে বিকল্প ব্যবস্থায় মোহরে মিছিল প্রদান করাই ন্যায়সম্মত বিধান।

وتخرج الزكوة من مال السفيه وينفق على اولاده و زوجته ومن يجب نفقته عليه من ذوى الارحام، فان اراد حجة الاسلام لم يمنع منها ولا يسلم القاضى النفقة اليه ولكن يسلمها الى ثقة من الحاج ينفقها عليه فى طريق الحج فان مرض فاوصى بوصايا فى القرب وابواب الخير جاز ذلك من ثلث ماله وبلوغ الغلام بالاحتلام والانزال والاحبال اذا وطئ فان لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثمانى عشرة سنة عند ابى حنيفة رحمه الله تعالى وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد فحتى يتم لها سبعة عشر سنة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى اذا تم للغلام والجارية خمسة عشر سنة فقد بلغ واذا راهق الغلام والجارية فاشكل امرهما فى البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما واحكامهما احكام البالغين.

সরল অনুবাদ ঃ সফীহের সম্পদের যাকাত আদায় করা হবে। এবং সন্তান-সন্ততি ও স্ত্রীসহ যে সকল আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার সফীহের ওপর ওয়াজিব তা তার সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হবে (এবং তা করবে সরকার)। যদি সে ফরয হজ্জ আদায় করতে চায়, তবে তাকে বাধা দেয়া হবে না। তবে খরচের টাকা-পয়সা কাজি তার হাতে দেবে না; বরং হজ্জযাত্রীদের মধ্যে কোন বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির হাতে দেবে। তিনি হজ্জ পালন খাতে তা ব্যয় করবেন। সফীহ তার অন্তিমকালে যদি জনকল্যাণ ও নেক কাজমূলক কিছু অসিয়ত করে যায়, তাহলে তা তার এক তৃতীয়াংশ সম্পদে কার্যকর হবে। ছেলে বালেগ হওয়ার লক্ষণ তার স্বপ্নদোষ কিংবা বীর্যপাত হওয়া অথবা স্ত্রীসঙ্গমে গর্ভ সঞ্চার করা। যদি এর কোন একটি লক্ষণ প্রকাশ না পায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার বয়স আঠার বছর পূর্ণ হলে সে বালেগ গণ্য হবে। পক্ষান্তরে হায়েয কিংবা স্বপ্নদোষ অথবা গর্ভধারণ হল মেয়ে বালেগ হওয়ার লক্ষণ। যদি তা পাওয়া না যায়, তবে তার বয়স সতের বছর পূর্ণ হলে সে বালেগ সাব্যস্ত হবে। কিন্তু ইমাম সাহেবাইন (রঃ) বলেন, (নির্দিষ্ট লক্ষণের অবর্তমানে) ছেলে বা মেয়ের বয়স যখন পনের বছর পূর্ণ হবে তারা বালেগ গণ্য হবে। যখন ছেলে-মেয়ে বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে উপনীত হয় এবং তাদের বালেগ হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে প্রশ্ন দেখা দেয় আর তারা নিজেদের বালেগ হওয়ার কথা দাবি করে, তখন তাদের কথা গ্রহণ করা হবে এবং বালেগদের ন্যায় তাদের ওপর হুকুম-আহকাম বর্তাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وتخرج الزكاة الخ -এর আলোচনা ঃ যাকাত প্রদান একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত ও আল্লাহ্‌র হক। কারো আহমকী অর্থাৎ সাফীহ হওয়া তার ওপর বর্তিত আল্লাহ্ ও বান্দার হকসমূহ বাতিল করে না। সুতরাং কাজি যাকাত পরিমাণ অর্থ পৃথক করে সাফীহের হাতে দিয়ে দেবে যেন সে স্বাধীনভাবে তা যাকাত খাতে ব্যয় করতে পারে। কারণ যাকাত ইবাদত বিধায় তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য যাকাত দাতার নিয়ত থাকা জরুরি। -(হিদায়া)

واذا تم للغلام الخ -এর আলোচনা ঃ বালেগ হওয়ার লক্ষণসমূহ অবর্তমান থাকা অবস্থায় সাহেবাইন ও ইমামত্রয়ের মত হল, ছেলে-মেয়ের বয়স পনের বছর পূর্ণ হলে তারা বালেগ গণ্য হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) থেকেও এ রকম উক্তি রয়েছে। এরই ওপর ফতোয়া। কারণ পনের বছর বয়সেই সাধারণত বালেগ হওয়ার লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেয়ে যায়।

واذا راهق الخ -এর আলোচনা ঃ সাবালক হওয়ার সর্বনিম্ন বয়সসীমা বালকের ক্ষেত্রে ১২ বছর আর বালিকার ক্ষেত্রে হল ৯ বছর। বয়সের এ পর্যায়ে পদার্পণ করার পর যদি তারা নিজেদের বালেগ হওয়ার কথা দাবি করে, তবে তাদের কথা গ্রহণযোগ্য হবে এবং তাদের ওপর বালেগদের হুকুম বর্তাবে। কেননা এটা তাদের একান্ত নিজস্ব বিষয় এবং বয়সেরও মিল আছে বিধায় এ ব্যাপারে তাদের মতের ওপর নির্ভর করার কোন বিকল্প নেই।

وَقَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَااَحْجُرُ فِى الدَّيْنِ عَلَى الْمُفْلِسِ وَاِذَا وَجَبَتِ الدُّيُوْنُ عَلٰى رَجُلٍ مُفْلِسٍ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَالْحَجْرَ عَلَيْهِ لَمْ اَحْجُرْ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيْهِ الْحَاكِمُ وَلٰكِنْ يَحْبِسُهُ اَبَدًا حَتّٰى يَبِيْعَهُ فِىْ دَيْنِهِ وَاِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ وَدَيْنُهُ دَرَاهِمُ اَوْ عَلٰى ضِدِّ ذٰلِكَ قَضَاهُ الْقَاضِىْ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ وَاِنْ كَانَ دَيْنُهُ دَرَاهِمَ وَلَهُ دَنَانِيْرُ بَاعَهَا الْقَاضِىْ فِىْ دَيْنِهٖ ـ

সরল অনুবাদ : ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, দেউলিয়ার ওপর তার ঋণভারের দরুন আমি হাজর করার পক্ষপাতী নই। কোন দেউলিয়া ব্যক্তি যদি অনেক ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে এবং পাওনাদাররা (সরকারের নিকট) তাকে গ্রেফতার ও লেনদেন থেকে বারণ রাখার আবেদন জানায়, তবে আমি তার ওপর হাজর করব না। যদি তার কিছু সহায়-সম্পত্তি থাকে তাহলে আদালত তাতে হস্তক্ষেপ করবে না; বরং তাকে একাধারে আটক করে রাখবে, যাতে শেষ পর্যন্ত সে ঋণের খাতে সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়। আর যদি তার নিকট কিছু টাকা-পয়সা থাকে এবং গৃহীত ঋণও টাকা-পয়সাই হয়, তাহলে কাজি (আদালত) তার অনুমতি ছাড়াই উক্ত অর্থ দ্বারা ঋণ পরিশোধ করে দেবে। কিন্তু দেনা দিরহাম অথচ তার নিকট রয়েছে কিছু দিনার অথবা এর বিপরীত অবস্থা হলে কাজি উক্ত দিনার বা দিরহামের বিনিময়ে দেনা জাতীয় অর্থ সংগ্রহ করে তা দিয়ে ঋণ পরিশোধ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَا اَحْجُرُ فِى الدَّيْنِ اِلَخ -এর আলোচনা : এখানে 'ফী' অব্যয়টি সবব বা কারণ অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। সে মতে فِى الدَّيْنِ -এর অর্থ হবে ঋণের দরুন। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, কোন দেউলিয়া লোকের ওপর তার ঋণগ্রস্ততার দরুন হাজর করা যাবে না। এমনকি পাওনাদাররা হাজরের দাবি করলেও না। কারণ হাজরের মাধ্যমে একটি লোকের ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করে দেয়া হয় যা কিনা পশুর পর্যায়ে নামিয়ে আনার শামিল। সুতরাং এহেন কঠোর আইনটি কতিপয় ব্যক্তি তথা পাওনাদারদের দাবির মুখে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। অবশ্য দাবিদারদের বঞ্চনা থেকে রক্ষা করার খাতিরে আদালত উক্ত ব্যক্তির ব্যাপারে আটকাদেশ জারির মাধ্যমে যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। কিন্তু ইমাম সাহেবাইনসহ ইমামত্রয়ের মত হল, পাওনাদাররা দরখাস্ত করলে হাজর চাপিয়ে দেয়া যাবে এবং আদালত দরিদ্র ঋণগ্রস্তের জায়গা-জমি ও অন্যান্য মালামাল ঋণ পরিশোধের তাগিদে বিক্রি করতে পারবে। এখানে ইমাম সাহেবাইনের কওলের ওপর ফতোয়া। -(শামী)

يَحْبِسُهُ اَبَدًا الخ -এর আলোচনা : কারণ ঋণ পরিশোধের শক্তি থাকা সত্ত্বেও তা পরিশোধ না করে পাওনাদারদের হয়রানি করা মারাত্মক অন্যায় ও জুলুম। এ জুলুম দমনের জন্য আদালত তাকে আটক করে রাখবে।

وَاِنْ كَانَ لَهُ دَرَاهِمُ الخ -এর আলোচনা : অর্থাৎ তখন দিরহামকে দিনার ও দিনারকে দিরহামে রূপান্তরিত করে নেবে। পক্ষান্তরে ঋণগ্রস্তের নিকট মওজুদ মালামাল আর দেনা যদি একই জাতীয় হয়, তাহলে কাজি ঋণগ্রস্তের অনুমতি ছাড়াই তা দিয়ে দেনা পরিশোধ করে দেবে। কারণ এহেন পরিস্থিতিতে পাওনাদারদের জন্য যখন দেনাদারের সম্মতি ছাড়াই নিজ পাওনা আদায় করে নেয়ার অনুমতি রয়েছে তখন কাজির জন্য সে অধিকার থাকাতো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত।

وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا طَلَبَ غُرَمَاءُ الْمُفْلِسِ الْحَجَرَ عَلَيْهِ حَجَرَ الْقَاضِىْ عَلَيْهِ وَمَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ وَالتَّصَرُّفِ وَالْاِقْرَارِ حَتّٰى لَا يَضُرَّ بِالْغُرَمَاءِ وَبَاعَ مَالَهُ اِنِ امْتَنَعَ الْمُفْلِسُ مِنْ بَيْعِهٖ وَقَسَّمَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهٖ بِالْحِصَصِ فَاِنْ اَقَرَّ فِىْ حَالِ الْحَجَرِ بِاِقْرَارِ مَالٍ لَزِمَهُ ذٰلِكَ بَعْدَ قَضَاءِ الدُّيُوْنِ وَيُنْفَقُ عَلَى الْمُفْلِسِ مِنْ مَالِهٖ وَعَلٰى زَوْجَتِهٖ وَاَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَ ذَوِى الْاَرْحَامِ.

সরল অনুবাদ ঃ কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রাঃ) বলেন, দরিদ্র ঋণগ্রস্তের পাওনাদাররা সরকারের নিকট হাজর আরোপের (অর্থাৎ তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করে তাকে কাজ কারবার থেকে বারণ রাখার) আবেদন জানালে সরকার তার ওপর হাজর জারি করবে এবং পাওনাদাররা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে জন্য তাকে সম্পদ বিক্রি ও অন্যান্য তাসাররুফ ও ইক্বরার থেকে বারণ রাখবে। এবং তার সম্পদ বিক্রি করে দেবে যদি সে তা বিক্রয় করতে অস্বীকৃতি জানায় এবং প্রাপ্ত অর্থ পাওনাদারদের মাঝে তাদের প্রাপ্তির হার অনুপাতে ভাগ করে দেবে। হাজরে থাকা অবস্থায় সে যদি (নতুন) কোন দেনার স্বীকারোক্তি করে, তবে (তালিকাভুক্ত) দেনাসমূহ পরিশোধ হওয়ার পর উক্ত দেনা আদায়ের দায়িত্ব তার ওপর বর্তাবে। দেউলিয়াগ্রস্তের নিজস্ব ব্যয়, তার স্ত্রী, নাবালেগ সন্তানাদি এবং নিকটতম আত্মীয়-স্বজনদের প্রয়োজনীয় ব্যয় তার অর্থ-সম্পদ থেকে নির্বাহ করা হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مَنَعَهُ مِنَ الْبَيْعِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ তাকে ক্রয়-বিক্রয়সহ সকল প্রকার তাসাররুফ থেকে নিষেধ করা হবে। অন্যথা সে বিক্রয়, ইক্বরার, হিবা ইত্যাদির মাধ্যমে আপন ঋণের বহর আরো লম্বা করার প্রয়াস পাবে এবং তাতে পূর্ব পাওনাদারগণের বঞ্চনা আরো প্রকট আকার ধারণ করবে।

وَ ذَوِى الْاَرْحَامِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ পিতামাতা ও অন্যান্য আত্মীয়গণ যদি নিজস্ব আয় দ্বারা চলতে অক্ষম হয়, তখন দরিদ্র ঋণগ্রস্তের মাল থেকে তাদের ব্যয় নির্বাহ করা জরুরি। পিতামাতা, স্ত্রী ও সন্তানাদির পাওনা অন্যান্য পাওনাদারের চেয়ে অগ্রগণ্য। সে কারণে ঋণগ্রস্তের ধন-সম্পদ থেকে তাদের মৌলিক প্রয়োজনসমূহ পূরণের ব্যবস্থা নেয়া হবে। অতঃপর অন্যান্য পাওনাদারদের প্রতি দৃষ্টি দেয়া হবে।

وَاِنْ لَمْ يُعْرَفْ لِلْمُفْلِسِ مَالٌ وَطَلَبَ غُرَمَاؤُهُ حَبْسَهُ وَهُوَ يَقُوْلُ لَا مَالَ لِيْ حَبَسَهُ الْحَاكِمُ فِيْ كُلِّ دَيْنٍ لَزِمَهُ بَدَلًا عَنْ مَالٍ حَصَلَ فِيْ يَدِهٖ كَثَمَنِ الْمَبِيْعِ وَبَدَلِ الْقَرْضِ وَفِيْ كُلِّ دَيْنٍ اِلْتَزَمَهُ بِعَقْدٍ كَالْمَهْرِ وَالْكَفَالَةِ وَلَمْ يَحْبِسْهُ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ كَعِوَضِ الْمَغْصُوْبِ وَاَرْشِ الْجِنَايَاتِ اِلَّا اَنْ تَقُوْمَ الْبَيِّنَةُ بِاَنَّ لَهٗ مَالًا وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ اَوْ ثَلٰثَةَ اَشْهُرٍ سَأَلَ عَنْ حَالِهٖ فَاِنْ لَمْ يَنْكَشِفْ لَهٗ مَالٌ خَلّٰى سَبِيْلَهٗ وَكَذٰلِكَ اِذَا قَامَ الْبَيِّنَةُ عَلٰى اَنَّهٗ لَا مَالَ لَهٗ وَلَا يَحُوْلُ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ غُرَمَائِهٖ بَعْدَ خُرُوْجِهٖ مِنَ الْحَبْسِ وَيُلَازِمُوْنَهٗ وَلَا يَمْنَعُوْنَهٗ مِنَ التَّصَرُّفِ وَالسَّفَرِ وَيَاْخُذُوْنَ فَضْلَ كَسْبِهٖ فَيُقَسَّمُ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا اَفْلَسَهُ الْحَاكِمُ حَالَ بَيْنَهٗ وَبَيْنَ غُرَمَائِهٖ اِلَّا اَنْ يُّقِيْمُوا الْبَيِّنَةَ اَنَّهٗ قَدْ حَصَلَ لَهٗ مَالٌ وَلَا يَحْجُرُ عَلَى الْفَاسِقِ اِذَا كَانَ مُصْلِحًا لِمَالِهٖ وَالْفِسْقُ الْاَصْلِيُّ وَالطَّارِئُ سَوَاءٌ وَمَنْ اَفْلَسَ وَعِنْدَهٗ مَتَاعٌ لِرَجُلٍ بِعَيْنِهٖ اِبْتَاعَهٗ مِنْهُ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِيْهِ۔

সরল অনুবাদ ঃ যদি দরিদ্র ঋণগ্রস্তের অর্থ-সম্পদ আছে কিনা তা জানা না যায় আর পাওনাদাররা তাকে গ্রেফতার করার আবেদন জানায় এবং সে বলে আমার অর্থ-সম্পদ বলতে কিছুই নেই, তাহলে আদালত তাকে (দু'ধরনের দেনার জন্য) আটক করবে। (প্রথমত) ঐ সকল দেনার জন্য যা তার নিকট বিদ্যমান কোন মালের বিনিময়স্বরূপ বর্তেছে, যেমন– ক্রীতদ্রব্যের মূল্য বাবদ দেনা এবং গৃহীত কর্জসূত্রে দেনা। (দ্বিতীয়ত) এমন সব দেনার জন্য যা কোন চুক্তির প্রেক্ষিতে বর্তিয়েছে, যেমন মোহর ও জামানতের অর্থ। এতদ্‌ব্যতীত অন্য কোন দেনার জন্য তাকে আটক করবে না। যেমন– লুণ্ঠিত মালের বিনিময় বা কারো ক্ষতি সাধনের ভর্তুকি (বাবদ আরোপিত দেনা)। অবশ্য সম্পদ থাকা প্রমাণিত হলে আটক করবে। দুই থেকে তিন মাস আদালত তাকে আটক করে রাখবে এবং (এ সময়) তার অবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করতে থাকবে। যদি তার মাল আছে বলে প্রমাণিত না হয়, তবে তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে। একইভাবে যখন তার মালামাল নেই বলে প্রমাণিত হবে (তখনও তাকে মুক্তি দিয়ে দেবে)। কারা-মুক্তির পর পাওনাদারদের ও তার মাঝে অন্তরায় হবে না; তারা বরং তার পিছু লেগে থাকবে, তবে তার কাজ-কারবার ও সফরে বাধা দেবে না। সে যা উপার্জন করবে তার উদ্বৃত্তাংশ গ্রহণ করবে এবং তারা নিজেদের মধ্যে আনুপাতিক হারে তা বন্টন করে নেবে। অবশ্য সাহেবাইন (রঃ) বলেন, আদালত যদি দেউলিয়াগ্রস্তের দেওলিয়াত্ব ঘোষণা করে দেয়, তবে সরকার তার ও পাওনাদারদের মাঝে অন্তরায় হবে (অর্থাৎ তাকে উত্যক্ত করা থেকে তাদের বারণ করা রাখা সরকারের কর্তব্য)। তবে পাওনাদাররা তার কিছু আয়-উপার্জন হয়েছে বলে প্রমাণ দিলে (তাদের ফিরাবে না)। ফাসিকের ওপর হাজর আরোপ করা যাবে না যদি সে আপন সম্পদ ব্যবহারে মিতাচারী হয়। (এ ক্ষেত্রে) আশৈশব ও নবসৃষ্ট উভয় পাপাচারই (ফিস্‌ক) সমান। যে ব্যক্তি দেওলিয়া হয়ে গেল অথচ তার হাতে তখনো কারো থেকে (বাকি মূল্যে) খরিদ করা কিছু পণ্য হুবহু বিদ্যমান রয়েছে, তাহলে উক্ত পণ্যের মধ্যে অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে স্বয়ং পণ্য মালিকও সমান হকদার গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فِى كُلِّ دَيْنٍ الخ -এর আলোচনা ঃ দেনা তিন প্রকারের- (এক) ক্রীত পণ্যের মূল্য বাবদ দেনা, (দুই) কোন চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার সূত্রে দেনা, যেমন- স্ত্রীর মোহর বা কারো মালের জামিন হওয়ার কারণে যে দেনা আরোপিত হয়, (তিন) অন্যান্য দেনা, যেমন- কারো ক্ষতিসাধনের কারণে আরোপিত খেসারত। দেনার পরিমাণ যত কমই হোক না কেন পাওনাদারদের দরখাস্তের প্রেক্ষিতে প্রথমোক্ত দুই প্রকার দেনার জন্য ঋণগ্রস্তকে গ্রেফতার করা হবে, যদিও বা সে তার কোন অর্থ-সম্পদ নেই বলে দাবি করে; কিন্তু তৃতীয় প্রকার দেনার জন্যে তাকে বন্দী করা যাবে না। অবশ্য তার নিকট সম্পদ থাকা সত্ত্বেও যদি সে অনর্থক পাওনাদারদের হয়রানি করে, তাহলে তাকে সর্বাবস্থায় বন্দী করা হবে।

وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ الخ -এর আলোচনা ঃ বন্দী রাখার মেয়াদ সম্পর্কে ফুকাহায়ে কেরামের বিভিন্ন উক্তি রয়েছে-দুই মাস, তিন মাস কোথাও বা ছয় মাসের কথাও বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু বিশুদ্ধ মত হল, আদালত যথাযথ বিচারে ব্যক্তি বিশেষের ক্ষেত্রে এ মেয়াদ কমবেশি করতে পারে। কেননা কেউ মামুলি শাসন দ্বারাই সতর্ক হয়ে যায় আবার কেউ এতটা বাঁকা হয় যে, দীর্ঘ কারাবরণের পরও সঠিক তথ্য প্রকাশ করে না। উল্লেখ্য যে, কারারুদ্ধ ব্যক্তি শরয়ী কিংবা অন্য কোন প্রয়োজনে বাইরে বেরুতে পারবে না। কোন কোন ফকীহের মতে পিতা-মাতা, দাদা-দাদী ও সন্তানদের কারো জানাযায় শরিক হওয়ার জন্য বাইরে আসতে পারবে। তবে আসতে হবে জামিনের মাধ্যমে। এটাই চূড়ান্ত কথা এবং এরই ওপর ফতোয়া।

فَيَقْسِمُ بَيْنَهُمْ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন যদি পাওনাদারদের একজন ২৫ আরেকজন ১৫ এবং অন্য একজন ১০ টাকা পায়, আর ঋণগ্রস্তের উপার্জনের উদ্বৃত্তাংশের পরিমাণ হয় ২৫ টাকা, তবে তা থেকে ১ম জনকে ১২.৫০, ২য় জনকে ৭.৫০ এবং তৃতীয় জনকে ৫ টাকা দিতে হবে।

اَلْفِسْقُ الْاَصْلِىُّ الخ -এর আলোচনা ঃ বালেগ হওয়ার সময় যে ফিস্‌ক বিদ্যমান থাকে তাকে আসলী (জন্মগত) এবং পরবর্তীকালে সৃষ্ট ফিস্‌ককে তারী (সাময়িক) ফিসক বলে।

اُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ فِيهِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন- রশিদ বশির থেকে ধারে এক থান কাপড় ক্রয় করার পর কোন কারণে দেওলিয়া হয়ে গেল। এমতাবস্থায় বশির সে কাপড় থানটি এনে বিক্রি করে এককভাবে নিজের প্রাপ্য উসুল করে নিতে পারবে না; বরং কাপড়ের বিক্রয়লব্ধ অর্থে অন্যান্য পাওনাদারদের সাথে সেও পাওনাদার বিবেচিত হবে মাত্র।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْحَجْرُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং হাজর আরোপের কারণসমূহ বর্ণনা কর।

২। اَلسَّفِيْهُ সম্পর্কে حَجَر -এর বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। দেউলিয়া লোকের ওপর তার ঋণগ্রস্ততার দরুন حَجَر করা যাবে কি না ? ইমামদের মতভেদসহ বর্ণনা কর।

৪। وَيَحْبِسُهُ الْحَاكِمُ شَهْرَيْنِ الخ -এর ব্যাখ্যা কর।

كِتَابُ الْاِقْرَارِ

اِذَا اَقَرَّ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ بِحَقٍّ لَزِمَهُ اِقْرَارُهُ مَجْهُوْلًا كَانَ مَا اَقَرَّ بِهِ اَوْ مَعْلُوْمًا وَيُقَالُ لَهُ بَيِّنِ الْمَجْهُوْلَ فَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ اَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْبَيَانِ فَاِنْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَىَّ شَيْءٌ لَزِمَهُ اَنْ يُّبَيِّنَ مَالَهُ قِيْمَةٌ وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ اِنِ ادَّعَى الْمُقَرُّ لَهُ اَكْثَرَ مِنْهُ وَاِذَا قَالَ لَهُ عَلَىَّ مَالٌ فَالْمَرْجِعُ فِىْ بَيَانِهِ اِلَيْهِ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِى الْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ فَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَىَّ مَالٌ عَظِيْمٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِىْ اَقَلِّ مِنْ مِائَتَىْ دِرْهَمٍ -

স্বীকারোক্তি পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যখন পরিণত বয়সের বোধ সম্পন্ন স্বাধীন ব্যক্তি নিজের ওপর কোন কিছু স্বীকার করে নেবে তা সুস্পষ্ট বিষয়ের হোক আর অস্পষ্ট বিষয়ের, তার ওপর সেটা আবশ্যকীয়রূপে বর্তাবে। অস্পষ্ট হলে তাকে বলা হবে, "তুমি বিষয়টি আরো খুলে বল"। যদি সে না বলে হাকিম তাকে খুলে বলার জন্য বাধ্য করবে। যদি (স্বীকারকারী) বলে, আমার দায়িত্বে অমুকের একটা জিনিস আছে, তবে ব্যাখ্যায় তার এমন জিনিসের কথা উল্লেখ করা অবশ্যক হবে যার মূল্য রয়েছে। এ স্থলে মুক্বারলাহু (বাদী) তার চেয়ে অধিক কিছু দাবি করলে স্বীকারকারী হলফ করে যা বলবে তাই অগ্রাধিকার পাবে। যদি স্বীকারকারী বলে, আমার দায়িত্বে অমুকের অর্থ রয়েছে। তবে এ 'অর্থ' এর ব্যাখ্যা স্বীকারকারীর নিকট শুনতে হবে এবং কমবেশি যাই বলুক মেনে নেয়া হবে। কিন্তু যদি বলে আমার দায়িত্বে মোটা অংকের অর্থ রয়েছে, তবে (ব্যাখ্যায়) দু'শ দিরহামের কম বললে তাকে বিশ্বাস করা হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَرَّ-এর সংজ্ঞা ঃ اِقْرَار-এর শাব্দিক অর্থ হল–সাব্যস্ত করা, স্বীকার করা, স্বীকারোক্তি প্রদান করা। যেমন বলা হয়– اِقْرَار الشَّيْءُ اِذَا ثَبَتَ। অর্থাৎ কোন জিনিসকে সাব্যস্ত করলে বলা হয়–قَرَّ الشَّيْءُ অর্থাৎ ব্যাপারটি সাব্যস্ত হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় ইক্বরার হল– اِخْبَارٌ عَنْ ثُبُوْتِ حَقِّ الْغَيْرِ عَلٰى نَفْسِهٖ অর্থাৎ "নিজের ওপর অন্যের কোন পাওনার কথা ব্যক্ত করে দেয়া।" নিজের কোন প্রাপ্যের কথা ব্যক্ত করা হলে তাকে বলে دَعْوٰى বা দাবি, আর 'ক' এর কাছে 'খ' এর কোন পাওনা থাকলে 'গ' যদি তা ব্যক্ত করে তবে সেটা সাক্ষ্য (اِشْهَاد) নামে অভিহিত করা হয়। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা এ কথা পরিষ্কার প্রমাণিত যে, ইক্বরার (স্বীকারোক্তি) স্বীকারকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে একটি যথার্থ দলিল। এ দলিলের ভিত্তিতে তার ওপর যেমন হদ্ এবং কিসাস কার্যকরী করা যায় তেমনি আর্থিক দায়-দায়িত্বও আরোপিত হতে পারে। সে মতে কোন ব্যক্তি যদি তার ওপর অন্য কারো অধিকারের কথা স্বীকার করে, তবে সেটা পালন করা অপরিহার্য হয়ে পড়বে। অধিকার আদায় না করে কেটে পড়তে চাইলে আদালত তাকে বাধ্য করবে। তবে শর্ত হল স্বীকারকারীকে অবশ্যই স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক ও সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হতে হবে।

পরিভাষা ঃ اِقْرَار–স্বীকৃতি, স্বীকারোক্তি; مُقِر–স্বীকারকারী; مُقَرّلَهٗ–যার জন্য প্রাপ্য স্বীকার করা হল; مُقَربِه–স্বীকারকৃত অধিকার।

عَلَىَّ مَالٌ عَظِيْمٌ الخ-এর আলোচনা ঃ এ সুরতে যাকাতের পরিমাণ হতে কম হলে تَصْدِيْق হবে না। কেননা সে মালকে صِفَت عَظِيْم-এর সাথে সম্পৃক্ত করেছে। তখন সে صِفَت টি অযথা ধরা হবে না। এবং শরীয়তে যাকাতের পরিমাণ হল مَال عَظِيْم বা অনেক সম্পদ। কেননা এটা শরীয়তের দৃষ্টিতে غَنِى (ধনী)-এর অন্তর্ভুক্ত এবং عُرْف ও এটাকে غَنِى (ধনী) বলে। কাজেই এর ধর্তব্য হবে।

ইমাম আযম (রঃ)-এর এক বর্ণনা মতে, চুরির ক্ষেত্রে হাত কাটার পরিমাণ তথা দশ দিরহামের কমে تَصْدِيْق হবে না। কেননা এটা مَال عَظِيْم-এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ কারণেই সম্মানিত অঙ্গ তথা হাত কাটা হয়।

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ
دَرَاهِمُ فَهِيَ ثَلٰثَةٌ إِلَّا أَنْ يُبَيِّنَ أَكْثَرَ مِنْهَا وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا دِرْهَمًا لَمْ يُصَدَّقْ
فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ دِرْهَمًا وَإِنْ قَالَ كَذَا وَكَذَا دِرْهَمًا لَمْ يُصَدَّقْ فِي أَقَلَّ مِنْ أَحَدٍ
وَّعِشْرِينَ دِرْهَمًا وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ أَوْ قِبَلِي فَقَدْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ وَإِنْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَوْ مَعِي
فَهُوَ إِقْرَارٌ بِأَمَانَةٍ فِي يَدِهِ وَإِنْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ لِي عَلَيْكَ أَلْفُ دِرْهَمٍ فَقَالَ اتَّزِنْهَا أَوْ
انْتَقِدْهَا أَوْ أَجِّلْنِي بِهَا أَوْ قَدْ قَضَيْتُكَهَا فَهُوَ إِقْرَارٌ وَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَصَدَّقَهُ الْمُقَرُّ لَهُ
فِي الدَّيْنِ وَكَذَّبَهُ فِي التَّاجِيلِ لَزِمَهُ الدَّيْنُ حَالًّا وَيُسْتَحْلَفُ الْمُقَرُّ لَهُ فِي الْأَجَلِ ۔

সরল অনুবাদ ঃ স্বীকারকারী যদি বলে, 'আমার দায়িত্বে অমুক ব্যক্তির প্রচুর দিরহাম রয়েছে', তবে ব্যাখ্যায় দশ দিরহামের কম বললে সমর্থন করা হবে না। আর যদি কয়েক দিরহাম পাবে বলে, তবে ব্যাখ্যায় অধিক কিছু না বললে ন্যূনতম তিন দিরহাম প্রাপ্তি সাব্যস্ত হবে। আর যদি (স্বীকারোক্তিতে) বলে, আমার জিম্মায় অমুকের এত এত দিরহাম, তবে ব্যাখ্যায় এগারো দিরহামের কম বললে গ্রাহ্য হবে না। আর যদি 'এত এবং এত দিরহাম' বলে, তবে একুশ দিরহামের নিচে (ব্যাখ্যা) বিশ্বাস করা হবে না। যদি স্বীকারকারী বলে, 'আমার ওপর অমুকের প্রাপ্য আছে' কিংবা 'আমার থেকে সে পাবে', তবে (প্রকারান্তরে) সে ঋণের কথাই স্বীকার করল। আর যদি বলে, 'আমার নিকট বা আমার সঙ্গে তার প্রাপ্য রয়েছে', তাহলে সেটা হবে তার হাতে অমুকের আমানতস্বরূপ কিছু থাকার স্বীকারোক্তি। যদি কোন ব্যক্তি দাবি করে বলে, 'তোমার দায়িত্বে আমার এক হাজার টাকা আছে' আর দ্বিতীয় ব্যক্তি (উত্তরে) বলে, তুমি তা মেপে বা গুণে-বেছে নিয়ে নাও। অথবা বলে, আমাকে কিছু সময় দাও; কিংবা বলে, আমি তা পরিশোধ করে দিয়েছি। তবে এটা (দেনার) স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে। যে ব্যক্তি মেয়াদি ঋণের স্বীকারোক্তি করল, অতঃপর মুক্বারলাহু 'আসল ঋণের' কথা সত্যায়নপূর্বক 'মেয়াদি' কথাটা ভিত্তিহীন বলে দাবি করল, তবে তার ওপর নগদ ঋণের দায়িত্ব বর্তাবে এবং মুক্বারলাহু থেকে মেয়াদ সম্পর্কে শপথ নেয়া হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَيَّ دَرَاهِمُ كَثِيرَةٌ -এর আলোচনা ঃ এ সুরতে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, দশ দিরহাম ওয়াজিব হবে। আর সাহেবাইনের নিকট দু'শত দিরহামের কমে তার تَصْدِيق করা হবে না। কেননা শরীয়তের দৃষ্টিতে مَال كَثِير নিসাব পরিমাণ সম্পদেরই নাম।

ইমাম আযম (রঃ) বলেন যে, দশ হল جَمْع كَثْرَت -এর সর্ব নিম্ন পরিমাণ এবং جَمْع قِلَّت -এর সর্বোচ্চ পরিমাণ। কাজেই শব্দের হিসেবে এটাই অধিক সাব্যস্ত হল।

وَإِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ كَذَا كَذَا الخ -এর আলোচনা ঃ স্মরণ রাখতে হবে। كَذَا (এত) হল একটি অস্পষ্ট সংখ্যাবাচক পদ। এর বিশ্লেষণ যে কোন সংখ্যা দ্বারা করা যেতে পারে। যদি বক্তা বিশ্লেষণ করে না দেয়, তবে তা সর্বাধিক ছোট সংখ্যা 'এক' অর্থে প্রয়োগযোগ্য হওয়াই নিশ্চিত ও ঝামেলামুক্ত। সে মতে كَذَا শব্দটি و (এবং) ব্যতীত দ্বিরুক্ত হলে এগারো নির্দেশ করবে। কারণ আরবী ভাষায় أَحَدَ عَشَرَ বা এগারো হল দুই সংখ্যার এমন ছোট যোগফল, যার মাঝে و বসে না। পক্ষান্তরে و যোগে كَذَا وَ كَذَا বলা হলে একুশ সংখ্যা নির্দেশ করবে। কেননা أَحَدٌ وَّعِشْرُوْنَ (একুশ) হল দশকের এমন কনিষ্ঠ সংখ্যা যেখানে و অব্যয়ের মাধ্যমে দু'টি সংখ্যা সংযুক্ত হয়।

وَمَنْ اَقَرَّ بِدَيْنٍ وَاسْتَثْنٰى شَيْئًا مُتَّصِلًا بِاِقْرَارِهٖ صَحَّ الْاِسْتِثْنَاءُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِيْ سَوَاءٌ اِسْتَثْنَى الْاَقَلَّ اَوِ الْاَكْثَرَ فَاِنْ اِسْتَثْنَى الْجَمِيْعَ لَزِمَهُ الْاِقْرَارُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ - وَاِنْ قَالَ لَهٗ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ اِلَّا دِيْنَارًا اَوْ اِلَّا قَفِيْزَ حِنْطَةٍ لَزِمَهٗ مِائَةُ دِرْهَمٍ اِلَّا قِيْمَةَ الدِّيْنَارِ اَوِ الْقَفِيْزِ وَاِنْ قَالَ لَهٗ عَلَيَّ مِائَةٌ وَدِرْهَمٌ فَالْمِائَةُ كُلُّهَا دَرَاهِمُ وَاِنْ قَالَ لَهٗ عَلَيَّ مِائَةٌ وَثَوْبٌ لَزِمَهٗ ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَالْمَرْجِعُ فِيْ تَفْسِيْرِ الْمِائَةِ اِلَيْهِ وَمَنْ اَقَرَّ بِحَقٍّ وَقَالَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰى مُتَّصِلًا بِاِقْرَارِهٖ لَمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْرَارُ وَمَنْ اَقَرَّ وَشَرَطَ الْخِيَارَ لِنَفْسِهٖ لَزِمَهُ الْاِقْرَارُ وَبَطَلَ الْخِيَارُ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَارٍ وَاسْتَثْنٰى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهٖ فَلِلْمُقَرِّ لَهُ الدَّارُ وَالْبِنَاءُ جَمِيْعًا وَاِنْ قَالَ بِنَاءُ هٰذِهِ الدَّارِ لِيْ وَالْعَرْصَةُ لِفُلَانٍ فَهُوَ كَمَا قَالَ وَمَنْ اَقَرَّ بِتَمْرٍ فِيْ قَوْصَرَةٍ لَزِمَهُ التَّمْرُ وَالْقَوْصَرَةُ وَمَنْ اَقَرَّ بِدَابَّةٍ فِيْ اِصْطَبْلٍ لَزِمَهُ الدَّابَّةُ خَاصَّةً وَاِنْ قَالَ غَصَبْتُ ثَوْبًا فِيْ مِنْدِيْلٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا .

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি ঋণ স্বীকার পূর্বক সাথে সাথে তা থেকে কিয়দাংশ ইস্তিছনা (বাদ) করে, তবে কমবেশি যাই ইস্তিছনা করুক তা (ইস্তিছনা) সঠিক বিবেচিত হবে এবং অবশিষ্ট তার ওপর বর্তাবে। কিন্তু যদি পুরোটাই ইস্তিছনা করে ফেলে, তবে ইস্তিছনা বাতিল হয়ে স্বীকৃত পুরো দ্রব্য তার ঘাড়ে বর্তাবে। যদি বলে, আমার জিম্মায় অমুকের একশ' দিরহাম রয়েছে, তবে তা থেকে এক দিনার বা এক কফিয গম বাদ, তাহলে একশ' দিরহাম থেকে এক দিনার বা এক কফিয গমের মূল্য বিয়োগ করার পর বাকি যা থাকে তা তার ওপর বর্তাবে। যদি বলে, 'আমার দায়িত্বে অমুকের একশ' এবং এক টাকা', তবে পুরোটাই টাকার সংখ্যা বুঝতে হবে। কিন্তু যদি বলে, 'একশ' এবং একটি কাপড়', তবে তার ওপর একটি কাপড় বর্তাবে আর 'একশ' বলতে কি উদ্দেশ্য তার (স্বীকারকারীর) নিকট শুনে নিতে হবে। যে ব্যক্তি কোন দেনার স্বীকারোক্তি পূর্বক সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বলল, তবে এ স্বীকারোক্তি তার ওপর আবশ্যকীয় হবে না। যে লোক (দেনা স্বীকারোক্তি পূর্বক নিজের জন্য খেয়ারে শর্ত আরোপ করল, তার খেয়ার বৃথা যাবে এবং স্বীকারোক্তি (তথা স্বীকৃত দেনা) অবশ্যকীয় হবে। যে ব্যক্তি (কারো জন্য) কোন বাড়ি স্বীকার পূর্বক তাতে নির্মিত দালান-কোঠা নিজের জন্য ইস্তিছনা করল, তবে বাড়ি এবং দালান-কোঠা উভয়ই মুক্বারলাহুর প্রাপ্য হবে। পক্ষান্তরে যদি বলে, এ বাড়ির দালান-কোঠা আমার আর আঙ্গিনা অমুকের, তবে সে যা বলেছে তাই হবে। যে ব্যক্তি ঝুড়িতে থাকা খেজুরের কথা স্বীকার করল তার ওপর খেজুর এবং ঝুড়ি উভয়ই বর্তাবে। কিন্তু যে আস্তাবলে থাকা সওয়ারির কথা স্বীকার করল তার ওপর শুধুমাত্র সওয়ারি আবশ্যক হবে। আর যদি বলে, আমি রুমালে করে কাপড় হরণ করেছি, তবে কাপড় ও রুমাল উভয়টি বর্তাবে।

وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِيْ ثَوْبٍ لَزِمَاهُ جَمِيْعًا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ ثَوْبٌ فِيْ عَشَرَةِ اَثْوَابٍ لَمْ يَلْزَمْهُ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ اَحَدَ عَشَرَ ثَوْبًا وَمَنْ اَقَرَّ بِغَصَبِ ثَوْبٍ وَجَاءَ بِثَوْبٍ مَعِيْبٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْهِ مَعَ يَمِيْنِهٖ وَكَذٰلِكَ لَوْ اَقَرَّ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ هِيَ زُيُوْفٌ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ خَمْسَةٌ فِيْ خَمْسَةٍ يُرِيْدُ بِهِ الضَّرْبَ وَالْحِسَابَ لَزِمَهُ خَمْسَةٌ وَاحِدَةٌ وَاِنْ قَالَ اَرَدْتُ خَمْسَةً مَعَ خَمْسَةٍ لَزِمَهُ عَشَرَةٌ وَاِذَا قَالَ لَهُ عَلَيَّ مِنْ دِرْهَمٍ اِلٰى عَشَرَةٍ لَزِمَهُ تِسْعَةٌ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ الْاِبْتِدَاءُ وَمَا بَعْدَهُ وَيَسْقُطُ الْغَايَةُ وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ كُلُّهَا وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ اِشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ وَلَمْ اَقْبِضْهُ فَاِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهٖ قِيْلَ لِلْمُقَرِّلَهُ اِنْ شِئْتَ فَسَلِّمِ الْعَبْدَ وَخُذِ الْاَلْفَ وَاِلَّا فَلَا شَيْءَ لَكَ عَلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি বলে, আমার জিম্মায় অমুকের কাপড়ের মধ্যে কাপড় আছে, তবে দু'টি কাপড়ই আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি বলে, আমার দায়িত্বে দশটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় অমুকের, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, শুধুমাত্র একটি কাপড় বর্তাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, কাপড় বর্তাবে মোট এগারোটি। যে ব্যক্তি কাপড় লুটের কথা স্বীকার পূর্বক ত্রুটিযুক্ত কাপড় এনে হাজির করল, তবে সে শপথ করে যা বলবে তাই ধর্তব্য হবে। একইভাবে কিছু দিরহামের কথা স্বীকার করে যদি সেগুলো দূষিত বলে দাবি করে (তবে তার কথাই ধর্তব্য হবে)। যদি স্বীকারকারী বলে, আমার দায়িত্বে অমুকের পাঁচের মধ্যে পাঁচ এবং এতে তার গুণ বুঝানো উদ্দেশ্য হয়, তবে তার ওপর কেবলমাত্র পাঁচটা বর্তাবে। আর যদি বলে, এতে আমি পাঁচের সাথে পাঁচ বুঝাতে চেয়েছি, তবে তার ওপর দশ আবশ্যক হবে। যদি বলে, আমার জিম্মায় অমুকের এক থেকে দশ টাকা পর্যন্ত রয়েছে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার ওপর নয় টাকা বর্তাবে অর্থাৎ প্রারম্ভিক সংখ্যা থেকে পরবর্তী সবক'টি সংখ্যা ধর্তব্য হবে আর প্রান্তিক সংখ্যাটি বাদ যাবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, পূর্ণ দশ টাকা বর্তাবে। যদি স্বীকারকারী বলে, আমার জিম্মায় রয়েছে অমুকের এক হাজার টাকা তার থেকে ক্রয়কৃত একটি গোলামের মূল্য বাবদ, তবে গোলামটি এখনো আমি কয়ায়ত্ত করিনি। এ স্থলে সে নির্দিষ্ট কোন গোলামের কথা উল্লেখ করে থাকলে মুক্বারলাহুকে বলা হবে ইচ্ছা করলে তুমি গোলাম দিয়ে হাজার টাকা নিয়ে আস, নতুবা তার নিকট কিছুই পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ثَوْبٌ فِيْ عَشَرَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি বলে, আমার জিম্মায় অমুকের দশটি কাপড়ের মধ্যে একটি কাপড় আছে, তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) -এর নিকট শুধু একটি কাপড়ই আবশ্যক হবে। ইমাম আযম (রঃ)-এরও এ অভিমত এবং এর ওপরই ফতোয়া। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন যে, এগারোটি কাপড়ই লাযেম হবে। কেননা এখানে فِيْ অক্ষরটিকে

ظَرْف বানানো সম্ভব। কাজি আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, "فِىْ" অক্ষরটি মধ্যবর্তী বুঝানোর জন্যও ব্যবহৃত হয়। যথা, আল্লাহর বাণী– فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ এখানে فِىْ টা মধ্যবর্তী অর্থে ব্যবহার হয়েছে। কাজেই একটির অতিরিক্তের ওপর সন্দেহ হয়ে গেছে। এজন্য একটিই লাযেম হবে।

خَمْسَةٌ فِىْ خَمْسَةٍ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ স্বীকারকারী 'পাঁচের মধ্যে পাঁচ' কথাটি পূরণ অর্থে ব্যবহার করলেও শুধুমাত্র পাঁচটি দ্রব্য তার দায়িত্বে বর্তাবে। কারণ পূরণের মাধ্যমে দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় না, অংশ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ৫×৫-এর অর্থ দাঁড়াবে পাঁচটি দ্রব্যের পঁচিশটি অংশ। কিন্তু ইমাম যুফার (রঃ)-এর মতে, এ ক্ষেত্রে ৫+৫ হিসাবে স্বীকারকারীর ওপর দশটি দ্রব্য বর্তাবে। অবশ্য فِىْ অব্যয়টি যদি مَعَ অর্থে ব্যবহার করে থাকে, তবে আমাদের ইমামত্রয়ের মতেও দ্রব্য দশটাই বর্তাবে।

يَلْزَمُهُ الْعَشَرَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ ইমাম যুফার (রঃ)-এর নিকট তার ওপর আট লাযেম হবে। কেননা তার নিকট غَايَةٌ টা مُغَايَةٌ -এর মধ্যে দাখেল নয়। যেমন, যদি কেউ বলে যে– بِعْتُكَ مِنْ هٰذَا الدَّارِ اِلٰى هٰذَا الدَّارِ অর্থাৎ আমি তোমার নিকট এ ঘর হতে এ ঘর পর্যন্ত বিক্রি করলাম। তখন শুরু ও শেষেরটি অন্তর্ভুক্ত হবে না। কাজেই এখানেও আটটি আবশ্যক হবে।

فَاِنْ ذَكَرَ عَبْدًا بِعَيْنِهِ الخ -এর আলোচনা ঃ এ সুরতে যদি مُقِر গোলামকে নির্ধারণ করে দেয়, তখন مُقَرلَهُ -কে বলা হবে যে, গোলাম তাকে অর্পণ করে স্বীয় এক হাজার দিরহাম নিয়ে নাও। আর যদি مُقِر গোলামকে নির্দিষ্ট না করে, তবে ইমাম আযম, যুফার ও হাসান ইবনে যিয়াদ (রঃ)-এর নিকট مُقِر -এর ওপর এক হাজার দিরহাম লাযেম হবে এবং আয়ত্ত না করা مَسْمُوْع হবে না। চাই সে সাথে সাথেই বলুক বা পৃথকভাবে বলুক। কেননা এ اِقْرَار হতে রুজু করা সাহেবাইন ও আইম্মায়ে ছালাছার নিকট مُتَّصِلًا বলার সুরতে তার تَصْدِيْق বা সমর্থন হবে এবং মাল লাযেম হবে না। আর যদি مُنْفَصِلًا বলে তবে تَصْدِيْق হবে না, কিন্তু مُقَرلَهُ ওয়াজিব করণের মধ্যে উহার تَصْدِيْق করবে। এবং এ সুরাতেও مُقِر -এর تَصْدِيْق করা যাবে।

وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ عَبْدٍ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ لَزِمَهُ الْاَلْفُ فِيْ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ للّٰهُ تَعَالٰى وَلَوْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ مِنْ ثَمَنِ خَمْرٍ اَوْ خِنْزِيْرٍ لَزِمَهُ الْاَلْفُ وَلَمْ يُقْبَلْ تَفْسِيْرُهُ وَاِنْ قَالَ لَهُ عَلَيَّ اَلْفٌ مِنْ ثَمَنِ مَتَاعٍ وَهِيَ زُيُوْفٌ فَقَالَ الْمُقَرُّ لَهُ جِيَادٌ لَزِمَهُ الْجِيَادُ فِيْ قَوْلِ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ قَالَ ذٰلِكَ مَوْصُوْلًا صُدِّقَ وَاِنْ قَالَهُ مَفْصُوْلًا لَايُصَدَّقُ وَمَنْ اَقَرَّ لِغَيْرِهٖ بِخَاتَمٍ فَلَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ وَاِنْ اَقَرَّ لَهُ بِسَيْفٍ فَلَهُ النَّصْلُ وَالْجَفْنُ وَالْحَمَائِلُ وَاِنْ اَقَرَّ لَهُ بِحَجْلَةٍ فَلَهُ الْعِيْدَانُ وَالْكِسْوَةُ وَاِنْ قَالَ لِحَمْلِ فُلَانَةٍ عَلَيَّ اَلْفُ دِرْهَمٍ فَاِنْ قَالَ اَوْصٰى لَهُ فُلَانٌ اَوْ مَاتَ اَبُوْهُ فَوَرِثَهُ فَالْاِقْرَارُ صَحِيْحٌ وَاِنْ اَبْهَمَ الْاِقْرَارَ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَ اَبِيْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَصِحُّ وَاِنْ اَقَرَّ بِحَمْلِ جَارِيَةٍ اَوْ حَمْلِ شَاةٍ لِرَجُلٍ صَحَّ الْاِقْرَارُ وَلَزِمَهُ۔

সরল অনুবাদ ঃ পক্ষান্তরে যদি বলে, একটি গোলামের মূল্য বাবদ আমার জিম্মায় রয়েছে এক হাজার টাকা আর গোলামটি চিহ্নিত না করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার ওপর এক হাজার টাকা বর্তাবে। যদি কেউ স্বীকার করে বলে, আমার দায়িত্বে অমুকের এক হাজার টাকা আর তাহল মদ বা শূকরের মূল্য বাবদ, তবে তাকে এক হাজার টাকা দিতে হবে; (মদ বা শূকরের মূল্য বাবদ বলে যে ব্যাখ্যা দিয়েছে) তার এ ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হবে না। আর যদি বলে, আসবাবপত্রের দামস্বরূপ আমার জিম্মায় অমুকের হাজার খানেক টাকা রয়েছে, তবে সেগুলো দূষিত আর মুক্বারলাহু তা নিখুঁত বলে দাবি করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তার ওপর নিখুঁত টাকাই বর্তাবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, দূষিতের কথা স্বীকারোক্তির সাথে সাথে উল্লেখ করে থাকলে স্বীকারকারী সত্যায়িত হবে, আর যদি তা বিলম্বে বলে তবে সত্যায়ন করা হবে না। যদি কোন ব্যক্তি কারো জন্য আংটি স্বীকার করে, তবে সে বৃত্ত (রিং) ও পাথর উভয়ই পাবে। আর তরবারির কথা স্বীকার করলে মুক্বারলাহু তরবারি, বাঁট এবং খাপ তিনটাই পাবে। (এভাবে) যদি 'বিয়ে-মঞ্চ' প্রাপ্তির স্বীকার করে, তবে কাঠের সাথে (পরদার) কাপড়ও প্রাপ্য হবে। যদি কেউ বলে, অমুক মহিলার গর্ভের জন্য আমার দায়িত্বে এক হাজার টাকা রয়েছে, তখন সে যদি এ কথাও বলে যে, অমুক ব্যক্তি তার জন্য এ টাকার অসিয়ত করে গিয়েছিল বা তার পিতা মারা গেছে সে ওয়ারিশ হিসেবে ঐ টাকা পেয়েছে, তবে স্বীকারোক্তি শুদ্ধ হবে। কিন্তু এ সূত্র গোপন রাখলে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, স্বীকৃতি বাতিল গণ্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, তা বাতিল হবে না। যদি কারো জন্য দাসী কিংবা ছাগীর গর্ভ স্বীকার করে, তবে তা শুদ্ধ ও আবশ্যকীয় হবে।

وَإِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بِدُيُونٍ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ فِي صِحَّتِهِ وَدُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَسْبَابٍ مَعْلُومَةٍ فَدَيْنُ الصِّحَّةِ وَالدَّيْنُ الْمَعْرُوفُ بِالْأَسْبَابِ مُقَدَّمٌ فَإِذَا قُضِيَتْ وَفَضَلَ شَيْءٌ مِنْهَا كَانَ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ فِي حَالِ الْمَرَضِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دُيُونٌ لَزِمَتْهُ فِي صِحَّتِهِ جَازَ إِقْرَارُهُ وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ أَوْلَى مِنَ الْوَرَثَةِ وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ فِيهِ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ وَمَنْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيٍّ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثُمَّ قَالَ هُوَ ابْنِي ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَبَطَلَ إِقْرَارُهُ لَهُ وَلَوْ أَقَرَّ لِأَجْنَبِيَّةٍ ثُمَّ تَزَوَّجَهَا لَمْ يَبْطُلْ إِقْرَارُهُ لَهَا وَمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ ثَلٰثًا ثُمَّ أَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ وَمَاتَ فَلَهَا الْأَقَلُّ مِنَ الدَّيْنِ وَمِنْ مِيرَاثِهَا مِنْهُ وَمَنْ أَقَرَّ بِغُلَامٍ يُولَدُ مِثْلُهُ لِمِثْلِهِ وَلَيْسَ لَهُ نَسَبٌ مَعْرُوفٌ أَنَّهُ ابْنُهُ وَصَدَّقَهُ الْغُلَامُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ مَرِيضًا وَيُشَارِكُ الْوَرَثَةَ فِي الْمِيرَاثِ۔

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন ব্যক্তি মুমূর্ষু অবস্থায় কিছু ঋণের কথা স্বীকার করে এবং তার জিম্মায় সুস্থকালীন কিছু ঋণ থাকে এবং আরো কিছু ঋণ এমন থাকে যা এ অসুস্থ অবস্থায় সুস্পষ্ট সূত্রে বর্তেছে, তাহলে শেষোক্ত দুই প্রকার ঋণ অগ্রগণ্য হবে। এগুলো পরিশোধের পর যখন কিছু উদ্বৃত্ত থাকবে, তখন তা ব্যয়িত হবে মুমূর্ষকালীন স্বীকৃত ঋণ খাতে। আর যদি সুস্থকালীন (বা অন্য) কোন ঋণ না থাকে, তবে তার স্বীকারোক্তি কার্যকরী হবে এবং তার ওয়ারিশগণ থেকে মুক্বারলাহু অগ্রাধিকার পাবে। মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তি তার ওয়ারিশের জন্য কার্যকরী নয়। কিন্তু অন্যান্য ওয়ারিশগণ তাকে এ বিষয়ে সত্যায়ন করলে তা কার্যকরী হবে। মৃত্যু-শয্যায় কোন ব্যক্তি যদি ওয়ারিশ নয় এমন কারো জন্য কোন কিছু স্বীকার করার পর তাকে নিজ পুত্র বলে দাবি করে, তবে তার পুত্রত্ব সাব্যস্ত হবে এবং স্বীকারোক্তি বাতিল হবে। পক্ষান্তরে যে অনাত্মীয়া কারো জন্য কিছু স্বীকার করার পর তাকে বিয়ে করে নিল তার স্বীকারোক্তি বাতিল হবে না। যদি মরণ-শয্যায় কোন ব্যক্তি স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করে অতঃপর তার জন্য কিছু ঋণ স্বীকার করে মারা যায়, তাহলে স্ত্রীর জন্য ঋণ ও মিরাসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্বল্প অংশ প্রাপ্য হবে। যে ব্যক্তি অজ্ঞাত বংশের এমন বালককে পুত্র বলে স্বীকার করে যার মতো বালক এ ধরনের ব্যক্তির ঘরে জন্ম নিতে পারে এবং বালকও তাকে সমর্থন করে, তবে স্বীকারকারী শয্যাশায়ী হলেও তার থেকে বালকের অংশ সাব্যস্ত হবে এবং সে অন্যান্য ওয়ারিশদের সাথে মিরাসে অংশীদার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَانَ الْمُقَرُّ لَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ এ জন্য হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন– যখন রোগী ঋণের স্বীকারোক্তি দেবে, তখন তা বৈধ হবে এবং এটা তার ছেড়ে যাওয়া সকল সম্পত্তি হতে পরিশোধ করা হবে।

প্রশ্ন ঃ যদি কেউ বলে ইসলামী শরীয়ত রুগ্ণ ব্যক্তিকে এক তৃতীয়ংশের ওপর تَصَرُّف করার ক্ষমতা প্রদান করেছে। কেননা মহানবী (সাঃ)-এর বাণী– اَلثُّلُثُ كَثِيْرٌ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ-ই অনেক। আর এটা হযরত ওমর (রাঃ)-এর বাণী হতে অধিক শক্তিশালী।

উত্তর ঃ মহানবী (সাঃ)-এর বাণী অসিয়ত ও তার ন্যায় বিষয়ের সাথে সম্পৃক্ত। আর অপরিচিত ব্যক্তির জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করা অসিয়তের অর্থে নয়। কাজেই অহেতুক প্রশ্ন করে বিভ্রান্তির চেষ্টা চালানো অযৌক্তিক।

إِقْرَارُ الْمَرِيْضِ الخ -এর আলোচনা ঃ রুগ্ণ ব্যক্তির পক্ষে তার ওয়ারিশগণের জন্য স্বীকারোক্তি প্রদান করা, অসিয়ত করা, দান করা সবই বাতিল বলে গণ্য হবে। ইমাম শাফেরী (রঃ)-এর মূল কথা হল, এটা বৈধ। কেননা إِقْرَار টা যে ভাবে অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে, তদ্রূপ ওয়ারিশের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

আমাদের দলিল হল, মহানবী (সাঃ) বলেছেন– ওয়ারিশের জন্য অসিয়তও নেই এবং ঋণের إِقْرَار ও নেই। এবং তার সম্পদে তো সকল ওয়ারিশদের হক বিদ্যমান। কাজেই অসিয়ত ও إِقْرَار -এর সুরতে অন্যান্যদের অধিকার খর্ব করা হয় বিধায় তা অবৈধ। হাঁ বাকি ওয়ারিশগণ যদি এটা ঋণ বা অসিয়তকে সমর্থন করেন তবে তা বৈধ হবে। কেননা সমর্থনের ফলে তাদের হক ছেড়ে দেয়ার বার্তা বহন করে। আর তাদের হক ছেড়ে দিলেতো তা এমনিতেই বৈধ হয়ে যাবে।

এবং অপরিচিতের ক্ষেত্রে إِقْرَار বৈধ হওয়ার কারণ হল, তার সাথে مُعَامَلَات -এর অধিক প্রয়োজন রয়েছে। এবং ওয়ারিশদের সাথে مُعَامَلَات -এর প্রয়োজন খুবই কম হয়ে থাকে। কাজেই যদি অপরিচিতের ব্যাপারে إِقْرَار -কে মেনে নেয়া না হয়, তবে তার প্রয়োজনীয় উন্মুক্ত দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে।

لَمْ يَبْطُلْ إِقْرَارُهُ الخ -এর আলোচনা ঃ এখানে দু'টি মাসআলা রয়েছে– (১) রুগ্ণ ব্যক্তি কোন অপরিচিত ব্যক্তির জন্য إِقْرَار করল, এরপর তার ছেলের দাবিদার হয়ে গেল, তখন তার نَسَبَت প্রমাণিত হয়ে যাবে এবং إِقْرَار বাতিল হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, সে অপরিচিত ব্যক্তির نَسَب অজ্ঞাত থাকতে হবে এবং مُقِر -কে সমর্থনও করবে এবং তার মধ্যে সমর্থন করার যোগ্যতাও থাকতে হবে। (২) রুগ্ণ ব্যক্তি যদি কোন অপরিচিতা মহিলার ব্যাপারে স্বীকারোক্তি প্রদান করে অতঃপর তাকে বিবাহ করে, তাহলে তার إِقْرَار বিশুদ্ধ হবে, তবে ইমাম যুফারের নিকট তা বিশুদ্ধ হবে না।

আমাদের নিকট এ উভয় সুরতের পার্থক্যের কারণ হল সন্তানের দাবি করা তার প্রাথমিক অস্তিত্বের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই তখন স্বীয় সন্তানের জন্য إِقْرَار হয়ে গেল আর এটা অবৈধ। এটা স্ত্রীর বিপরীত, কেননা এটা বিবাহের সময়ের সাথেই সম্পৃক্ত হয়, কাজেই এ إِقْرَار অপরিচিতার জন্যই হল।

وَيَجُوزُ اِقْرَارُ الرَّجُلِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجَةِ وَالْوَلَدِ وَالْمَوْلٰى وَيُقْبَلُ اِقْرَارُ الْمَرْأَةِ بِالْوَالِدَيْنِ وَالزَّوْجِ وَالْمَوْلٰى وَلَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهَا بِالْوَلَدِ اِلَّا اَنْ يُّصَدِّقَهَا الزَّوْجُ فِىْ ذٰلِكَ اَوْ تَشْهَدَ بِوِلَادَتِهَا قَابِلَةٌ وَمَنْ اَقَرَّ بِنَسَبٍ مِنْ غَيْرِ الْوَالِدَيْنِ وَالْوَلَدِ مِثْلُ الْاَخِ وَالْعَمِّ لَمْ يُقْبَلْ اِقْرَارُهُ بِالنَّسَبِ فَاِنْ كَانَ لَهُ وَارِثٌ مَعْرُوْفٌ قَرِيْبٌ اَوْ بَعِيْدٌ فَهُوَ اَوْلٰى بِالْمِيْرَاثِ مِنَ الْمُقَرِّلَهُ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ اِسْتَحَقَّ الْمُقَرُّلَهُ مِيْرَاثَهُ. وَمَنْ مَاتَ اَبُوْهُ فَاَقَرَّ بِاَخٍ لَمْ يَثْبُتْ نَسَبُ اَخِيْهِ مِنْهُ وَيُشَارِكُهُ فِى الْمِيْرَاثِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ কোন পুরুষের কাউকে নিজের পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান বা মনিব বলে স্বীকৃতি দেয়া জায়েয। (এভাবে) স্ত্রীলোক কাউকে পিতা, মাতা, স্বামী বা মনিব বলে স্বীকার করলে তা গ্রাহ্য হবে। কিন্তু কাউকে সন্তান স্বীকার করলে তা গ্রাহ্য হবে না স্বামীর সত্যায়ন কিংবা কোন ধাত্রী তার সন্তান প্রসবের ব্যাপারে সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত। যদি কোন ব্যক্তি কাউকে পিতা, মাতা ও সন্তান ব্যতীত অন্য কোনভাবে তার বংশজ স্বীকার করে, যেমন– (বলল, অমুকে আমার) ভাই বা চাচা তবে বংশ সম্পর্কে এ স্বীকারোক্তি গ্রাহ্য হবে না। (অর্থাৎ বংশ সাব্যস্ত হবে না।) এমতাবস্থায় যদি স্বীকারকারীর নিকটতম বা দূরতম সুপরিচিতি কোন ওয়ারিশ মওজুদ থাকে, তবে মুক্বারলাহু অপেক্ষা সেই মিরাসের অধিক হকদার হবে। আর যদি ওয়ারিশ না থাকে, তবে মুক্বারলাহু তার মিরাস পাবে। যে ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর কাউকে নিজের ভাই স্বীকার করল তার এ ভাইয়ের বংশ পিতা থেকে সাব্যস্ত হবে না; কিন্তু মিরাসে সে তার অংশীদার হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَا يُقْبَلُ اِقْرَارُهَا الخ-এর আলোচনা ঃ কোন স্ত্রীলোক যদি কাউকে নিজের সন্তান বলে স্বীকার করে, তবে তার স্বামীর সত্যায়ন এবং স্বীকৃত সন্তান তার ঘরে জন্মেছে বলে কোন ধাত্রী সাক্ষ্য প্রদান না করা পর্যন্ত তা গ্রহণযোগ্য হবে না। কারণ বংশক্রম ও বংশ-পরিচিতি মূলত পুরুষকুল থেকে ধর্তব্য হয়। সে হিসেবে মহিলা এক্ষেত্রে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে একজনের বংশ সম্বন্ধে অপর তথা স্বামীর সাথে যুক্ত করে দিয়েছে। আর কারো ওপর কিছু চাপাতে চাইলে সে ব্যাপারে তার সমর্থন থাকা জরুরি।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْاِقْرَارُ-এর সংজ্ঞা দাও এবং তার হুকুম উদাহরণসহ বর্ণনা কর।

২। অস্পষ্ট স্বীকারোক্তি কি? তার ব্যাখ্যার নমুনা প্রদান কর।

৩। মুমূর্ষ ব্যক্তির স্বীকারোক্তির বিধান বিস্তারিত বর্ণনা কর।

৪। اِقْرَار গৃহীত হওয়া ও না হওয়ার দিকগুলো বর্ণনা কর।

كِتَابُ الْاِجَارَةِ

اَلْاِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى الْمَنَافِعِ بِعِوَضٍ وَلَا تَصِحُّ حَتّٰى تَكُوْنَ الْمَنَافِعُ مَعْلُوْمَةً وَالْاُجْرَةُ مَعْلُوْمَةً وَمَا جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ ثَمَنًا فِى الْبَيْعِ جَازَ اَنْ يَّكُوْنَ اُجْرَةً فِى الْاِجَارَةِ وَالْمَنَافِعُ تَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِالْمُدَّةِ كَاسْتِيْجَارِ الدُّوْرِ لِلسُّكْنٰى وَالْاَرَضِيْنَ لِلزِّرَاعَةِ فَيَصِحُّ الْعَقْدُ عَلٰى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ اَىَّ مُدَّةٍ كَانَتْ وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِالْعَمَلِ وَالتَّسْمِيَةِ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلًا عَلٰى صَبْغِ ثَوْبٍ اَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ اَوْ اِسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مَعْلُوْمًا اِلٰى مَوْضِعٍ مَعْلُوْمٍ اَوْ يَرْكَبُهَا مَسَافَةً مَعْلُوْمَةً وَتَارَةً تَصِيْرُ مَعْلُوْمَةً بِالتَّعْيِيْنِ وَالْاِشَارَةِ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلًا لِيَنْقُلَ هٰذَا الطَّعَامَ اِلٰى مَوْضِعٍ مَعْلُوْمٍ۔

ইজারা পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ কোন কিছুর বিনিময়ে মুনাফা লাভের ওপর যে চুক্তি হয় তাকে ইজারা বলে। মুনাফা এবং মজুরি বা ভাড়া জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত ইজারা শুদ্ধ হবে না। ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে যে জিনিস মুদ্রার ভূমিকা পালন করতে পারে ইজারায় তা পারিশ্রমিক বা ভাড়া হতে পারে। কখনো (ভোগ-ব্যবহারের) সময়সীমা উল্লেখ করার মাধ্যমে মুনাফা জ্ঞাত হয়। যেমন বসবাসের জন্য বাড়ি বা চাষাবাদের জন্য জমি ভাড়া নেয়ার ক্ষেত্রে। সুতরাং নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে তা কমবেশি যাই হোক চুক্তি করলে তা শুদ্ধ হবে (পৃথকভাবে মুনাফার পরিমাণ উল্লেখ করতে হবে না)। আবার কখনো কাজের ধরন বর্ণনা দ্বারা মুনাফা জ্ঞাত হয়ে যায়। যেমন– কোন ব্যক্তি কাপড় রং করা কিংবা সেলাই করার জন্য কাউকে ভাড়া নিল অথবা সওয়ারি ভাড়া নিল নির্ধারিত পরিমাণ বুঝা নির্দিষ্ট কোথাও বয়ে নেয়ার জন্য কিংবা আরোহণ করে নির্দিষ্ট কোথাও গমনের জন্য। আবার কখনো বা (দায়িত্ব) নির্ধারণ ও (কাজের প্রতি) ইশারা করে দিলে মুনাফা জ্ঞাত হয়ে যায়। যেমন, এ খাবারগুলো অমুক খানে পৌঁছে দিতে হবে বলে কোন ব্যক্তি লেবার নিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْاِجَارَةِ-এর পরিচয় ঃ نَصَرَ ، ضَرَبَ ، اِفْعَال ও مُفَاعَلَة এ চার বাবের প্রত্যেকটি থেকেই ইজারা শব্দের ব্যবহার রয়েছে। তবে আল্লামা যিমাখশরী শব্দটি বাবে اِفْعَال ও مُفَاعَلَه থেকে ব্যবহৃত হওয়াই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলে মত ব্যক্ত করেছেন। এটা سَمَاعِى مَصْدَر অর্থ– প্রতিদান, বিনিময়, ঠিকানা। শরীয়তের পরিভাষায়, নির্দিষ্ট কিছুর বিনিময়ে কোন জিনিসের সুনির্দিষ্ট মুনাফা লাভের চুক্তিকে ইজারা বলে।

উল্লেখ্য যে, ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে মালের আদান-প্রদান মাল দ্বারা হয়ে থাকে, আর ইজারার মধ্যে হয় মালের সাথে মুনাফার আদান-প্রদান। মুনাফা প্রথমত দু' প্রকার ঃ (এক) বস্তু থেকে গৃহীত মুনাফা। এ মুনাফা আবার তিন প্রকারের হতে পারে–(১) জমি কিংবা ঘরবাড়ির মুনাফা। (২) বর্তন, শামিয়ানা ও ফার্নিচার প্রভৃতি আসবাবপত্রের মুনাফা। (৩) সওয়ারি, মোটর, রিকশা ইত্যাদি যানবাহনের মুনাফা। (দুই) শ্রমিক বা কর্মচারী থেকে গৃহীত সেবা বা মুনাফা। শ্রমিকদের মধ্যে আবার প্রকারভেদ

রয়েছে–(ক) বিশেষ শ্রমিক যেমন– শিক্ষক, কেরানি, গৃহভৃত্য ইত্যাদি (খ) পেশাজীবি বা সাধারণ শ্রমিক যেমন– স্বর্ণকার, কর্মকার, দর্জি ইত্যাদি। এক কথায়, মুনাফা হিসেবে ইজারা মোট পাঁচ প্রকার। প্রথমোক্ত তিন প্রকার ইজারাকে এক শব্দে "ভাড়ায় আদান-প্রদান কারবার" বলা যায় এবং শেষের দু' প্রকারকে "শ্রম-চুক্তি" নামে অভিহিত করা যেতে পারে। উভয় প্রকারেরই কিছু যৌথ এবং কিছু সতন্ত্র বিধি-বিধান রয়েছে। নিম্নে এ অধ্যায়ের কতিপয় পরিভাষাসহ বিধি-বিধান গুলো অতি সংক্ষেপে আলোচিত হল।

কতিপয় জ্ঞাতব্য ঃ أُجْرَةٌ – মজুরি বা ভাড়া, مُؤْجِر – ভাড়ায়দাতা বা যে আসবাবসামগ্রী ভাড়ায় খাটায়, مُسْتَأْجِر – ভাড়ায় গ্রহীতা বা নিয়োগকর্তা, أَجِيْر – শ্রমিক, কর্মচারী। أُجْرَة – প্রচলিত মজুরি বা রাষ্ট্রের নির্ধারিত মজুরি।

ভাড়ায় লেনদেন ঃ ১. কোন কিছু ভাড়া নিতে হলে জিনিসটির ভাড়া কত এবং তা কত দিনের জন্য বা কি কাজের জন্য তা নির্দিষ্ট করে নেয়া অবশ্যক।

২. এ চুক্তি উভয় পক্ষের উপস্থিতিতে যেমন সম্পন্ন হতে পারে তেমনি চিঠিপত্র মারফতও হতে পারে এবং হতে পারে কাজের গতিবিধি দ্বারা। যেমন– আপনি মটর গাড়িতে চড়ে বসলেন, আর চালক তাতে কোন আপত্তি করল না এবং আপনি ন্যায়সঙ্গত ভাড়া দিয়ে নেমে গেলেন।

৩. ভাড়াদাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই আকেল (দায়িত্ব-জ্ঞানের অধিকারী) হতে হবে ; বালেগ হওয়া জরুরি নয়।

৪. ভাড়ার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার পর সঙ্গত ওজর বা বাধ্যবাধকতা ছাড়া চুক্তি ভঙ্গ করা যাবে না।

৫. ভাড়াটিয়া বা মালিকের কেউ মৃত্যুবরণ করলে ভাড়া-চুক্তির সমাপ্তি ঘটবে এবং ওয়ারিশদের নতুনভাবে চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে।

৬. ভাড়াটিয়া শেষ পর্যন্ত ভাড়া না নিলে গৃহীত অগ্রিম টাকা মালিকের হবে এ শর্তে ভাড়ার অগ্রিম আদান-প্রদান জায়েয নেই।

৭. ভাড়ার জিনিস ফেরত দেয়ার ব্যয় বহন করবে মালিক। অবশ্য প্রথমে গ্রহণ করার খরচ ভাড়াটিয়া দেবে।

৮. নিজের ব্যবহারের জন্য ভাড়া নিয়ে অন্যকে ভাড়া অথবা ধার দেয়া যাবে না।

৯. কেউ কোন জিনিস ভাড়া এনে নিজ দখলে রেখে যদি ব্যবহার নাও করে তথাপি এর ভাড়া পরিশোধ করতে হবে।

১০. যানবাহন বা এ জাতীয় অন্য কোন জিনিস ভাড়ায় আনলে তাতে অঙ্গীকারকৃত পরিমাণের বেশি বা ধারণক্ষমতার বাইরে মাল-সামান বোঝাই করা না জায়েয।

আজীরে-খাস সংক্রান্ত নিয়মনীতি ঃ যে কর্মচারী ব্যক্তিবিশেষ বা কোম্পানীবিশেষের কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে আজীরে খাস বা বিশেষ শ্রমিক বলে। এ কারবারে মালিক এবং শ্রমিক উভয়ের মান সমান; বরং শ্রমিকের মান মালিকের চেয়েও বেশি বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। কারণ মালিকের পুঁজি, শ্রমিকের শ্রম ছাড়া বেকার। কিন্তু পুঁজি ছাড়া শ্রমিকের শ্রম কাজে লাগাতে পারে। এ জন্য দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক হবে ভ্রাতৃত্বের। তাছাড়া আরো কতিপয় পালনীয় বিষয় রয়েছে–

১. মালিক ও শ্রমিক উভয়কেই বালেগ তো বটেই হুঁশ-জ্ঞান সম্পন্নও হতে হবে। অবোধ ছেলের অভিভাবক ইচ্ছা করলে তাদেরকে নিজের কাজে অংশীদার করতে পারে; তারা সরাসরি নিয়োগকর্তা বা শ্রমিক হতে পারে না।

২. দৈনিক বা মাসিক মজুরি কত হবে তা নির্ধারিত করতে হবে। উপযুক্ত মজুরি দেয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত করা ঠিক নয়।

৩. মজুরির ন্যায় কাজের সময়, স্থান ও প্রকৃতি নির্ধারিত হওয়া চাই। এ সকল শর্তের কোন একটি অবর্তমান থাকলে চুক্তি ফাসিদ গণ্য হবে।

৪. শ্রমিকের জীবিকা সমস্যা, আর্থিক দীনতা ও আয়-শূন্যতার সুযোগে তাকে স্বল্প মজুরি দিয়ে তার থেকে অধিক শ্রম নেয়া যাবে না। এরূপ করলে আইনত দোষী সাব্যস্ত হবে এবং পরকালেও শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

৫. মাসিক বেতনের ভিত্তিতে কোন শ্রমিক নিয়োগ করে থাকলে ছুটির দিন অথবা যে দিন মালিক তার থেকে কাজ নেয়নি সে দিনেরও বেতন দিতে হবে।

৬. মজুরি পরিশোধের যে সময় নির্ধারিত হয়েছে সে সময়ই মজুরি প্রদান করা কর্তব্য; ঘটনাক্রমে ব্যতিক্রম হলে কোন দোষ নেই। হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেন– أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ অর্থাৎ শরীরের ঘাম শুকাবার পূর্বেই শ্রমিকের মজুরি পরিশোধ কর। মালিক শ্রমিকদের কাজের জন্য তাকিদ করতে পারে; কিন্তু গালাগালি বা মারধর করতে পারবে না, করলে সরকার এর শাস্তি বা জরিমানা বা উভয়ই কার্যকর করতে পারেন।

৭. শ্রমিকের চিকিৎসা-ব্যয়ও মালিকের বহন করা উচিত। -(ইসলামী ফিকাহ)

৮. শ্রমিক স্বীয় দায়িত্ব পালনে অবজ্ঞা প্রদর্শন করতে পারবে না। করলে আইনত ও নীতিগত দোষী সাব্যস্ত হবে।

৯. বিশেষ শ্রমিকের মর্যাদা হল জামানতবিহীন আমানতদারের মতো। অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রমিক বা কর্মচারী মালিকের পক্ষ থেকে দু'টি জিনিসের আমানতদার হয়ে থাকে- (ক) কাজ করার, (খ) যেসব দ্রব্য তার দায়িত্বে দেয়া হয় বা ব্যবহারের জন্য দেয়া হয় সেগুলোর। সে মতে যথাযথ সতর্কতার পরও যদি তা ভেঙ্গে কিংবা ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, অন্যথা জরিমানা দিতে হবে। কিন্তু মালিকের পরামর্শের বিপরীত কারবার করার ফলে কোন ক্ষতি হলে সেজন্য তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

১০. মালিক ও শ্রমিকের মৌলিক অধিকারসমূহ নির্ধারণ ও তা কার্যকর না হয়ে থাকলে তা কার্যকর করার ব্যবস্থা নেয়া সরকারের দায়িত্ব।

১২. চুক্তিকৃত মেয়াদের পূর্বে ন্যায়সঙ্গত ওজর ব্যতীত শ্রমিক কাজ ছেড়ে চলে যেতে পারবে না।

আজীরে-মুশ্‌তারিক সম্পর্কিত মাসায়েল ঃ

(১) আজীরে-মুশ্‌তারিক বা পেশাজীবি শ্রমিক হল মূলত একজন জামানত বিশিষ্ট আমানতদার। অর্থাৎ সে একাধারে আমীনও বটে এবং জামিনও। তার পজিশন হয় একজন বিনিময় গ্রহণকারী আমানতদারের মতো। সে কারণে যদি তার কাছ থেকে জিনিস হারিয়ে যায় বা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাকে এর খেসারত দিতে হবে। অবশ্য আকস্মিক দুর্ঘটনার দরুন যদি তা নষ্ট হয়ে যায়। যেমন- ধোপার ঘর পুড়ে গেল, তাহলে এর খেসারত দিতে হবে না। (২) উভয়ে আকেল ও জ্ঞানী হতে হবে। (৩) আজীরে-মুশ্‌তারিককে যে কাজ দেয়া হবে তা সম্পূর্ণরূপে বলে দিতে হবে। (৪) আজীর স্বীয় কাজ সম্পন্ন করার পর মজুরি লাভের অধিকারী হয়। (৫) আজীরে-মুশতারিকের বায়নাস্বরূপ কিছু টাকা এ শর্তে গ্রহণ করা যে, যদি গ্রাহক জিনিসটা না নেয় তাহলে তা ফেরত দেয়া হবে না, তা না জায়েয। অবশ্য ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে তা জায়েয। (৬) মজুরি না পাওয়া পর্যন্ত সে সংশ্লিষ্ট দ্রব্য আটক করে রাখতে পারে। (৭) খেল-তামাশার উপাদান তৈরি বা মেরামত করে বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নেই।

فَيَصِحُّ الْعَقْدُ الخ -এর আলোচনা ঃ চাষাবাদের জন্য জমিজমা বা বসবাসের জন্য ঘরদুয়ার ভাড়া নিলে মুস্তাজির তা থেকে কতটুকু মুনাফা লাভ করবে তা পৃথকভাবে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। কেননা চাষাবাদ বা বসবাসের মেয়াদ উল্লেখ করা হলেই সে কি পরিমাণ মুনাফা ভোগ করবে তা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে মেয়াদ কমবেশি হোক কোন আপত্তি নেই, তবে তা নির্দিষ্ট হওয়া জরুরি। কিন্তু ওয়াক্‌ফিয়া সম্পত্তি হলে লাগাতার তিন বছরের অধিক সময়ের জন্য ইজারা দেয়া জায়েয হবে না।

مَعْلُومَةً بِالْعَمَلِ الخ -এর আলোচনা ঃ কাজের নাম ও তা সম্পন্ন করার পদ্ধতি কি হবে তা বলে দিলেই মুনাফা নির্দিষ্ট হয়ে যায়। যেমন-রঞ্জকের নিকট কাপড়ের পরিমাণ, রং ও ছাপের ধরন অথবা দর্জির কাছে সেলাই এর ধরন কি হবে তা পরিষ্কারভাবে উল্লেখ করে দিলেই কাপড়ের মালিক তাদের থেকে কি পরিমাণ লাভবান হতে চায় তা জানা হয়ে যায়। কাজেই অতিরিক্ত কিছু বলার প্রয়োজন থাকে না।

وَيَجُوزُ اِسْتِيجَارُ الدُّوْرِ وَالْحَوَانِيتِ لِلسُّكْنٰى وَاِنْ لَمْ يُبَيِّنْ مَا يَعْمَلُ فِيهَا وَلَهُ اَنْ يَعْمَلَ كُلَّ شَيْءٍ اِلَّا الْحَدَّادَةَ وَالْقَصَّارَةَ وَالطَّحْنَ وَيَجُوزُ اِسْتِيجَارُ الْاَرَاضِي لِلزِّرَاعَةِ وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ وَالطَّرِيقُ وَاِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ وَلَا يَصِحُّ الْعَقْدُ حَتّٰى يُسَمِّيَ مَا يَزْرَعُ فِيهَا اَوْ يَقُولَ عَلٰى اَنْ يَّزْرَعَ فِيهَا مَاشَاءَ وَيَجُوزُ اَنْ يَّسْتَاجِرَ السَّاحَةَ لِيَبْنِيَ فِيهَا اَوْ يَغْرِسَ فِيهَا نَخْلًا اَوْ شَجَرًا فَاِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْاِجَارَةِ لَزِمَهُ اَنْ يَّقْلَعَ الْبِنَاءَ وَالْغَرْسَ وَيُسَلِّمَهَا فَارِغَةً اِلَّا اَنْ يَّخْتَارَ صَاحِبُ الْاَرْضِ اَنْ يَّغْرَمَ لَهُ قِيمَةَ ذٰلِكَ مَقْلُوعًا وَيَتَمَلَّكَهُ اَوْ يَرْضٰى بِتَرْكِهِ عَلٰى حَالِهِ فَيَكُونُ الْبِنَاءُ لِهٰذَا وَالْاَرْضُ لِهٰذَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ কাজের ধরন বর্ণনা না করেও বসবাসের জন্য ঘর-বাড়ি ও দোকান ভাড়া নেয়া জায়েয; এক্ষেত্রে মুস্তাজির তাতে কামার, ধোপা ও পেষাই কাজ ছাড়া বাকি সকল কাজ করার অধিকার রাখে। চাষাবাদের জন্য জমি ভাড়া নেয়া জায়েয। এক্ষেত্রে শর্ত না করলেও মুস্তাজির জমির সেচ ও যাতায়াত সুবিধাদি লাভ করবে। জমিতে কিসের চাষ করবে তা উল্লেখ করে না দিলে কিংবা চাষী নিজ ইচ্ছামাফিক চাষ করতে পারবে, এ ধরনের কিছু বলে না নিলে জমি ইজারা শুদ্ধ হবে না। গৃহ নির্মাণ অথবা বৃক্ষ রোপণের উদ্দেশ্যে খালি মাটি বা চত্বর ভাড়া নেয়া জায়েয। এ স্থলে যখন ইজারার মেয়াদ ফুরিয়ে যাবে, তখন মুস্তাজির গৃহ ভেঙ্গে ও বৃক্ষাদি কেটে খালি জমি মালিককে হস্তান্তর করতে (আইনত) বাধ্য থাকবে। তবে জমির মালিক যদি মনে করে ঘর ও বৃক্ষাদির উপড়ানো অবস্থার দাম দিয়ে সে নিজে এগুলোর মালিক হয়ে যাবে অথবা (মালিক না হয়ে ভাড়ায় কিংবা সৌজন্যমূলক ভাবে) তা জমিতে থাকতে দেবে (তাহলে সে অধিকার তার আছে)। তখন জমি হবে মালিকের এবং ঘর-দুয়ার হবে মুস্তাজিরের।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَيَجُوزُ اِسْتِيجَارُ الدُّوْرِ الخ -এর আলোচনা ঃ ঘর-বাড়ি বা মার্কেটের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থিত দোকান ভাড়া নেয়ার সময় তাতে কি করবে তা উল্লেখ না করলেও ইজারা কারবার শুদ্ধ হবে। এখানে মা'কূদ-আলাইহি তথা মুনাফা অজ্ঞাত রয়েছে বিধায় ইজারা শুদ্ধ না হওয়াই ছিল কিয়াসের দাবি। কিন্তু ঘর-দুয়ার বা দোকানপাট কি উদ্দেশ্যে ভাড়া নেয়া হয় তা যেহেতু সকলেরই জানা সে কারণে প্রচলিত রীতির ওপর ভিত্তি করে ইস্তিহসানের প্রেক্ষিতে একে শুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। এ জন্যই মুস্তাজির সাধারণ দোকানদারী বা বসবাস দ্বারা ঘরের যে পরিমাণ ক্ষতি হয় তারচে' বেশি ক্ষতিকারক কোন কাজ তাতে করতে পারবে না।

وَلِلْمُسْتَاجِرِ الشِّرْبُ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন ব্যক্তি জমি ইজারা নেয়ার সময় যাতায়াতের পথ ও সেচ-ব্যবস্থাদি ব্যবহারের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ না করলেও সেসব ব্যবহারের অধিকার সে লাভ করবে। কারণ রাস্তাঘাট ও সেচ-ব্যবস্থার সুযোগ-সুবিধা ছাড়া জমি চাষাবাদের কাজে ব্যবহার করা অসম্ভব, অথচ মুস্তাজির তো চাষাবাদের জন্যই তা ইজারা নিয়েছে। সুতরাং কৃষি-জমির পরিপূরক বিষয় হিসেবে এগুলো উল্লেখ ব্যতীত ইজারা-চুক্তির অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

উল্লেখ থাকে যে, কৃষিভূমির ইজারা বৈধতার প্রশ্নে উম্মতের ইজমা রয়েছে বলেও দাবি করা যায়। তবে তা শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হল কি ধরনের ফসল আবাদ করবে তা পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে অথবা কৃষকের পছন্দের ওপর সম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে হবে। তা না হলে পরে কলহ-বিবাদের সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ কতিপয় সামগ্রী এমনও আছে সেগুলো চাষ করার দরুন জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

اِلَّا اَنْ يَّخْتَارَ صَاحِبُ الخ -এর আলোচনা ঃ জমি-মালিক মুস্তাজিরকে ঘর-দুয়ার ভেঙ্গে বা গাছপালা কেটে নিতে বাধ্য না করে সেগুলো স্বীয় স্থানে অক্ষত থাকতে দিলে এর জন্য দু'টি পদ্ধতি রয়েছে– (১) কর্তিত বা উপড়ানো অবস্থায় এগুলোর মূল্য কত হতে পারে তা অনুমান করে মুস্তাজিরকে উক্ত মূল্য মিটিয়ে দেবে এবং ভাড়াদাতা নিজে এগুলোর মালিক হয়ে যাবে। আর এটা হবে ভাড়াদাতার পক্ষ থেকে ইহ্সান। (২) গাছপালার মালিক মুস্তাজিরই থেকে যাবে; এমতাবস্থায় জমির মালিক তাকে নির্ধারিত আরো কিছু দিনের জন্য জমি ব্যবহার করার সুযোগ করে দেবে। এ সুযোগ দান দু'ভাবে হতে পারে–(এক) ইজারার ভিত্তিতে অথবা (দুই) 'আরিয়তের ভিত্তিতে। ইজারার ভিত্তিতে হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য কি পরিমাণ ভাড়া দিতে হবে তা নির্ধারণ করে নিতে হবে। আর 'আরিয়ত বা ধারের ভিত্তিতে হলে তা হবে নিতান্তই সৌজন্যমূলক।

وَيَجُوزُ اِسْتِيجَارُ الدَّوَابِّ لِلرُّكُوبِ وَالْحَمْلِ فَإِنْ اَطْلَقَ الرُّكُوبَ جَازَ لَهُ اَنْ يَرْكَبَهَا مَنْ شَاءَ وَكَذٰلِكَ إِنِ اسْتَأْجَرَ ثَوْبًا لِلُّبْسِ وَاَطْلَقَ فَإِنْ قَالَ لَهُ عَلٰى اَنْ يَّرْكَبَهَا فُلَانٌ اَوْ يَلْبَسَ الثَّوْبَ فُلَانٌ فَاَرْكَبَهَا غَيْرَهُ اَوْ اَلْبَسَهُ غَيْرَهُ كَانَ ضَامِنًا إِنْ عَطِبَتِ الدَّابَّةُ وَتَلِفَ الثَّوْبُ وَكَذٰلِكَ كُلُّ مَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ فَاَمَّا الْعِقَارُ وَمَا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ فَإِنْ شَرَطَ سُكْنٰى وَاحِدٍ بِعَيْنِهِ فَلَهُ اَنْ يُّسْكِنَ غَيْرَهُ وَإِنْ سَمّٰى نَوْعًا وَقَدْرًا يَحْمِلُهُ عَلَى الدَّابَّةِ مِثْلُ اَنْ يَّقُولَ خَمْسَةَ اَقْفِزَةٍ حِنْطَةٍ فَلَهُ اَنْ يَّحْمِلَ مَا هُوَ مِثْلُ الْحِنْطَةِ فِي الضَّرَرِ اَوْ اَقَلُّ كَالشَّعِيرِ وَالسِّمْسِمِ وَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّحْمِلَ مَا هُوَ اَضَرُّ مِنَ الْحِنْطَةِ كَالْمِلْحِ وَالْحَدِيدِ وَالرُّصَاصِ فَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا قُطْنًا سَمَّاهُ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّحْمِلَ مِثْلَ وَزْنِهِ حَدِيدًا وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَرْكَبَهَا فَاَرْدَفَ مَعَهُ رَجُلًا اٰخَرَ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ نِصْفَ قِيمَتِهَا إِنْ كَانَتِ الدَّابَّةُ تُطِيقُهُمَا وَلَا يُعْتَبَرُ بِالثِّقْلِ وَإِنْ اسْتَأْجَرَهَا لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا مِقْدَارًا مِنَ الْحِنْطَةِ فَحَمَلَ عَلَيْهَا اَكْثَرَ مِنْهُ فَعَطِبَتْ ضَمِنَ مَا زَادَ مِنَ الثِّقْلِ وَإِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ بِلِجَامِهَا اَوْ ضَرَبَهَا فَعَطِبَتْ ضَمِنَ عِنْدَ اَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَضْمَنُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ আরোহণ ও বোঝা বহনের জন্য সওয়ারি ভাড়া নেয়া জায়েয। যদি কে বা কারা আরোহণ করবে তা উল্লেখ না করে, তাহলে মুস্তাজির যে কাউকে তাতে আরোহণ করাতে পারবে। একই বিধান প্রযোজ্য হবে যদি কে পরিধান করবে তা উল্লেখ না করে পোশাক ভাড়া নেয়। কিন্তু যদি অমুকে সওয়ার হবে কিংবা অমুকে কাপড়টি পরবে বলে কেরায়া নেয়, অতঃপর অন্য কাউকে সওয়ার কিংবা কাপড় পরায় এবং এতে সওয়ারি ধ্বংস হয়ে যায় বা কাপড়টি ছিঁড়ে যায়, তাহলে তাকে এর ভর্তুকি দিতে হবে। একই বিধান ঐ সমস্ত জিনিসের যাতে ব্যবহারকারীর পার্থক্যের দরুন পরিবর্তন সূচিত হয়। পক্ষান্তরে স্থাবর সম্পত্তিসহ যে সমস্ত জিনিস ব্যবহারকারীর ভিন্নতার কারণে তারতম্য হয় না সেখানে যদি নির্দিষ্ট কারো থাকার কথা শর্ত করে, তবে অন্য কাউকেও তাতে রাখতে পারে। যদি কোন্ ধরনের ও কি পরিমাণ বোঝা বহন করাবে তা উল্লেখ করে, (সওয়ারি ভাড়া নেয়) যেমন বলল পাঁচ কফিয গম, তাহলে মুস্তাজির তাতে এমন দ্রব্য যা ক্ষতির দিক থেকে গমের সমতুল্য বা তার চেয়ে কম যেমন– যব, তিল ইত্যাদিও বহন করাতে পারবে। কিন্তু গমের চেয়ে বেশি আয়াসসাধ্য কোন দ্রব্য যেমন– লবণ, লোহা ও সীসা ইত্যাদি বহন করাতে পারবে না। সে মতে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ তুলা বহন করানোর কথা বলে সওয়ারি ভাড়া নেয়, তাহলে তার জন্য সমপরিমাণ লোহা বহন করানো জায়েয হবে না। যদি কেউ নিজে আরোহণের কথা বলে সওয়ারি (যানবাহন) ভাড়া নেয়; অতঃপর নিজের সাথে অন্য কাউকেও তোলে নেয় এবং তাতে সওয়ারি মরে যায়, তাহলে সওয়ারিটি দু'জন বহনের ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকলে (ভাড়াসহ) তার অর্ধেক মূল্য (নতুবা পূর্ণ মূল্য) ভর্তুকি প্রধান করবে। এ ক্ষেত্রে আরোহীদ্বয়ের শারীরিক ওজন ধর্তব্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি নির্দিষ্ট পরিমাণ গম (বা অন্য কোন সামগ্রী) বহনের কথা বলে ভাড়া নেয়, অতঃপর তদপেক্ষা বেশি বহন করায় এবং (সে কারণে) সওয়ারি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তাহলে বোঝার অতিরিক্ত অংশ হিসাব করে ক্ষতিপূরণ দেবে। যদি মুস্তাজির সওয়ারিকে তার লাগাম টেনে (অস্বাভাবিক) গতিরোধ করে বা প্রহার করে আর সেটা মরে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে সে দায়ী হবে। কিন্তু ইমাম সাহেবাইন (রঃ) বলেন, দায়ী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَانَ ضَامِنًا الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ এক একজন এক এক পদ্ধতিতে কাপড় পরিধান ও সওয়ারি বা যানবাহন ব্যবহার করে, ফলে কারো ব্যবহারে অক্ষত আবার কারো ব্যবহারে তা বিনষ্ট হয়ে থাকে। এজন্য মুস্তাজির নির্দিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যতীত অন্য কাউকে তা ব্যবহার করতে দিতে পারে না, দিলে সেটা তা'আদ্দী তথা 'নীতি লজ্ঘন' এর মধ্যে পরিগণিত হবে এবং তাকে উপযুক্ত খেসারত দিতে হবে। অবশ্য অন্যদের ব্যবহারে দেয়ার কারণে যদি উক্ত কাপড় বা যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তাহলে নৈতিক বিচারে দোষী সাব্যস্ত হলেও আইনত সে দন্ডনীয় হবে না। নৈতিক বিচারে দোষী মানে এজন্য আল্লাহর দরবারে তার কৈফিয়ত দিতে হবে।

وَلَا يُعْتَبَرُ بِالثِّقْلِ الخ -এর আলোচনা ঃ সহযাত্রীর দৈহিক ওজনের কমবেশিতে ক্ষতিপূরণ কমবেশি হবে না। যেমন– সওয়ারির দাম যদি ৮০টাকা এবং মুস্তাজিরের দৈহিক ওজন ৩০ আর তার সঙ্গীর দৈহিক ওজন ৫০ কেজি হয়, তাহলে ৮০-কে সমান দুইভাগে ভাগ করে তার অর্ধেক অর্থাৎ ৪০ টাকা জরিমানা আদায় করতে হবে। সঙ্গীর দৈহিক ওজন হিসাবে ৫০ টাকা ভর্তুকি চাপানো যাবে না। অথচ দৈহিক ওজন হারে হিসাব করলে সঙ্গীর ভাগে ৫০ টাকাই বর্তায়। মোট কথা, সওয়ারির দাম আরোহীদের মাথাপিছু সমান হারে ভাগ করতে হবে, দৈহিক ওজন গড় করে ভাগ করলে চলবে না। এতো গেল যদি সওয়ারি একাধিক যাত্রী বহনের ক্ষমতা সম্পন্ন হয়ে থাকে। কিন্তু যদি একাধিক যাত্রী বহনের ক্ষমতা সম্পন্ন না হয়, তাহলে সওয়ারির পুরো দাম হিসাব করে খেসারত দিতে হবে।

مَا زَادَ مِنَ الثِّقْلِ الخ -এর আলোচনা ঃ চুক্তির বাইরে এমন অতিরিক্ত ভার যা বহনের ক্ষমতা উক্ত পরিবহনের আছে। তা না হলে পুরো দামই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। যেমন ধরুন কেউ ৫ টনী ট্রাক ৪ টন মাল বহন করাবার কথা বলে ভাড়া এনে যদি তাতে ৫ টন মাল বোঝাই করে এবং এতে ট্রাকটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে মোট ক্ষতির ৫ ভাগের একভাগ তাকে বহন করতে হবে। কিন্তু যদি ট্রাকটির বহন ক্ষমতাই থাকে ৪ টনের, তাহলে এর পূর্ণ ক্ষতিপূরণ মুস্তাজিরের ওপর চাপবে।

وَاِنْ كَبَحَ الدَّابَّةَ الخ -এর আলোচনা ঃ মনে রাখতে হবে সওয়ারির গতি বৃদ্ধি করার জন্য তাকে স্বাভাবিক প্রহার করা এবং তার গতিরোধ করার উদ্দেশ্যে লাগাম টেনে ধরার অনুমতি সওয়ারি-মালিকের পক্ষ থেকে সাধারণত থাকে। কিন্তু এমন প্রহার বা গতিরোধের অনুমতি নিশ্চয়ই থাকে না যাতে সওয়ারিটি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সে কারণে এক্ষেত্রে পূর্ণ খেসারত প্রদান করতে হবে এবং এরই ওপর ফতোয়া।

জরুরি জ্ঞাতব্য ঃ যে জন্তুকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তার থেকে সে কাজই নিতে হবে; অন্য কাজ নেয়া যাবে না। মানুষের ন্যায় জন্তুদেরও কাজ শেষে বিশ্রামের সুযোগ এবং উপযুক্ত খাবারের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। প্রয়োজনে জন্তুদের অল্প স্বল্প শাস্তি দেয়া যায়; কিন্তু তা সীমা অতিক্রম করা চলবে না। কেউ যদি এদের সাথে উক্ত আচরণ-বিধির বিপরীত আচরণ করে, তাহলে সে নৈতিক ও আইনের দৃষ্টিতে দোষী সাব্যস্ত হবে।

وَالْاِجْرَاءُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ اَجِيْرٌ مُشْتَرِكٌ وَاَجِيْرٌ خَاصٌّ فَالْمُشْتَرِكُ مَنْ لَا يَسْتَحِقُّ الْاُجْرَةَ حَتّٰى يَعْمَلَ كَالصَّبَّاغِ وَالْقَصَّارِ وَالْمَتَاعُ اَمَانَةٌ فِىْ يَدِهٖ اِنْ هَلَكَ لَمْ يَضْمَنْ شَيْئًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَضْمَنُهٗ وَمَا تَلَفَ بِعَمَلِهٖ كَتَخْرِيْقِ الثَّوْبِ مِنْ دَقِّهٖ وَ زَلْقِ الْحَمَّالِ وَاِنْقِطَاعِ الْحَبْلِ الَّذِىْ يُشَدُّ بِهِ الْمَكَارِى الْحَمْلِ وَغَرْقِ السَّفِيْنَةِ مِنْ مَدِّهَا مَضْمُوْنٌ اِلَّا اَنَّهٗ لَا يَضْمَنُ بِهٖ بَنِىْ اٰدَمَ فَمَنْ غَرَقَ فِى السَّفِيْنَةِ اَوْ سَقَطَ مِنَ الدَّابَّةِ لَمْ يَضْمَنْهُ وَاِذَا فَصَدَ الْفَصَّادُ اَوْ بَزَغَ الْبَزَّاغُ وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْمَوْضَعَ الْمُعْتَادَ فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا عَطَبَ مِنْ ذٰلِكَ وَاِنْ تَجَاوَزَهٗ ضَمِنَ وَالْاَجِيْرُ الْخَاصُّ هُوَ الَّذِىْ يَسْتَحِقُّ الْاُجْرَةَ بِتَسْلِيْمِ نَفْسِهٖ فِى الْمُدَّةِ وَاِنْ لَمْ يَعْمَلْ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلًا شَهْرًا لِلْخِدْمَةِ اَوْ لِرَعْىِ الْغَنَمِ وَلَا ضِمَانَ عَلَى الْاَجِيْرِ الْخَاصِّ فِيْمَا تَلَفَ فِىْ يَدِهٖ وَلَا فِيْمَا تَلَفَ مِنْ عَمَلِهٖ اِلَّا اَنْ يَّتَعَدّٰى فَيَضْمَنُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ শ্রমিক বা কর্মচারী দুই শ্রেণীর– (ক) আজীরে মুশ্‌তারিক বা সাধারণ কর্মচারী, (খ) আজীরে খাস বা বিশেষ কর্মচারী। যে সকল কর্মচারী কাজ শেষ করার পূর্বে মজুরি লাভের অধিকারী হয় না যেমন– রঞ্জক, ধোপা প্রভৃতি তাদেরকে আজীরে মুশ্‌তারিক বলে। তাদের হাতে অর্পিত দ্রব্য আমানত বলে গণ্য হয়। (কাজেই) যদি তাদের হতে সেটা বিনাশ হয়ে যায়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তারা মোটেই দায়ী হবে না (অর্থাৎ এজন্য তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না)। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, দায়ী হবে। যে জিনিসপত্র তার কাজ সমাধা করতে গিয়ে বিনিষ্ট হবে যেমন– ধোপা কাচতে গিয়ে তা ছিঁড়ে ফেলল, কুলির পিছলে পড়া বা কেরায়াদাতা যে রশি দিয়ে বোঝা বাঁধে তা ছিঁড়ে (দ্রব্য ছড়িয়ে-ছিটিয়ে) যাওয়া অথবা মাঝিদের গুণ টানার কারণে নৌকা ডুবে যাওয়া–তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু কোন চালক তার যাত্রীর ক্ষয়ক্ষতির জন্য দায়ী হবে না। সুতরাং নৌকা-স্টিমার ডুবে যে আরোহী জলমগ্ন হল কিংবা সওয়ারি থেকে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হল তার ক্ষতিপূরণ বহন করবে না। যদি অস্ত্র পাচারকারী অস্ত্র পাচার করে কিংবা পশু চিকিৎসক পশু দাগায় এবং যথাস্থান লঙ্ঘন না করে, তবে কোন ক্ষতি হলে সে ক্ষতির দায় তাদের ওপর বর্তাবে না। কিন্তু যদি তা লঙ্ঘন করে, তাহলে দায়ী হবে। যে কর্মচারী নির্ধারিত সময় নিজেকে হাজির রাখলে কাজ না করেও মজুরি প্রাপ্য হয় তাকে আজীরে খাস বলে। যেমন– কোন ব্যক্তি গৃহস্থালী বা বকরি রাখালীর কাজে কাউকে এক মাসের জন্য বেতনে নিয়োগ করল। আজীরে-খাসের (তত্ত্বাবধানে দেয়া জিনিসপত্রের) যা তার দখলে থাকা অবস্থায় অথবা কাজ সমাধা করতে গিয়ে বিনষ্ট হবে এর দায় তার ওপর বর্তাবে না। কিন্তু সীমাজ্ঞন করায় (নষ্ট হয়ে থাকলে) দায়ী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় শব্দার্থ ঃ اِجْرَاءُ – একবচনে اَجِيْرٌ – শ্রমিক; دَقٌّ – চূর্ণ করা, কাপড় কাচা; زَلْقٌ – পা পিছলে পড়া; حَمَّالٌ –বোঝাবাহী, কুলি; يَشُدُّ – (ن) شَدًّا – বাঁধা; مَكَارِىْ – ভাড়ায়দাতা, গাড়ি চালক; مَدُّهَا – (ن) مَدًّا – টানা, আকর্ষণ করা; فَصَّادٌ –যে শিঙ্গা লাগায়, অস্ত্রপাচারকারী; بَزَّاغٌ –পশু দাগায় যে; مُعْتَادَةٌ –স্বাভাবিক, উপযুক্ত। يَتَعَدّٰى – (تَفَعُّلٌ) –সীমালঙ্ঘন করা।

فَالْمُشْتَرِكُ مَنْ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ যারা নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ না করে স্বাধীনভাবে নিজেদের পেশাগত দায়িত্ব পালন করে তাদেরকে আজীরে-মুশতারিক বা সাধারণ শ্রমিক বলা হয়। কারণ হল, তারা এক মালিকের অধীনে কাজ নিয়ে বসে থাকে না; বরং অনেকের কাজ সমাধা দিয়ে থাকে। এ শ্রেণীর শ্রমিকদের মজুরি কাজের সাথে সম্পর্কিত; সময়ের সাথে নয়। কামার, কুমার, ছুতার, মুচি, রঞ্জক, তাঁতি এবং দর্জি এরা সকলেই এ শ্রেণীর শ্রমিক। আবার এ আজীরে-মুশতারিক যখন কোন নির্ধারিত মেয়াদের জন্য এক ব্যক্তি বা একটি প্রতিষ্ঠানের কাজ করার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়, তখন সে আজীরে-খাসে পরিণত হয়ে পড়ে।

وَالْمَتَاعُ اَمَانَةٌ فِى يَدِهِ الخ -এর আলোচনা ঃ আজীরে-মুশতারিকের দায়িত্বে দেয়া আসবাবপত্র কোন কারণ বশত বিনষ্ট হয়ে গেলে তাকে দায়ী করা হবে কি-না এবং যদি দায়ী করা হয়, তাহলে কতটুকু করা হবে সে সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, আজীরে-মুশ্তারিকের দায়িত্বে দেয়া জিনিস বিনষ্ট বা ধ্বংস হওয়ার মোট চারটি প্রণালী হতে পারে– (১) উল্লিখিত দায়িত্ব পালনকালে তার মাত্রাতিরিক্ত কোন আচরণের দরুন তা নষ্ট হওয়া, যেমন– ধোপার বেখেয়ালে ইস্ত্রি বেশি গরম হওয়ায় কাপড় পুড়ে গেল। (২) দায়িত্ব পালনকালে সীমা অতিক্রম বিনষ্ট হওয়া, যেমন– কাপড় কাচার সময় ধোপার হাতে তা ছিঁড়ে গেল। (৩) আজীরের কোনরূপ হস্তক্ষেপ ছাড়াই এমন কোন কারণে বিনষ্ট হওয়া যা সে সাবধানতা অবলম্বন করলে এড়াতে পারত, যেমন– দর্জিকে দেয়া কাপড় তার দোকান থেকে হারিয়ে গেল। (৪) আজীরের হস্তক্ষেপ ব্যতীতই বিনষ্ট হয়েছে; কিন্তু তা এড়ানো ছিল অসম্ভব। যেমন– অগ্নিসংযোগ, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি দুর্ঘটনায় বিনষ্ট হওয়া। প্রথমোক্ত দু'অবস্থায় আজীরের ওপর খেসারত বর্তাবে এবং চতুর্থ অবস্থায় বর্তাবে না। আর এতে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। কিন্তু মতবিরোধ হল ৩নং পদ্ধতি নিয়ে; ইমাম আযম (রহঃ)-এর মতে, জরিমানা বর্তাবে না, আর সাহেবাইনের মতে বর্তাবে। সম্প্রতিকালে আমানতের গুরুত্ব ব্যাপক হারে হ্রাস পেয়ে গেছে হেতু সাহেবাইনের মতের ওপরই ফতোয়া।

إِلَّا اَنَّهُ لَايَضْمَنُ بِهِ بَنِى آدَمَ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ নৌকা ডুবিতে বা যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে যাত্রীগণ কোনরূপ ক্ষতির শিকার হলে চালকের ওপর এদের ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। কারণ চালক এখানে ঘাতক প্রমাণিত হয়নি। মনে রাখতে হবে, কেউ ইচ্ছা পূর্বক বা ভুল বশত অন্য কাউকে আঘাত করে হত্যা করলে বা তার কোন অঙ্গহানী করলে অথবা আহত করলে ঘাতক সাব্যস্ত হয় এবং তার ওপর জরিমানা স্বরূপ কিসাস বা আক্রান্ত ব্যক্তির ক্ষতিপূরণ বর্তায়। শরীয়তের পরিভাষায়, এরূপ অপরাধকে জিনায়াত বলে। আলোচ্য মাসআলায় আজীরের পক্ষ থেকে কোন জিনায়াত পাওয়া যায়নি। কিন্ত আজীর 'আকদে-ইজারার মাধ্যমে যেহেতু আসবাবসামগ্রী নিরাপদে পৌছে দেয়ার দায়িত্ব নিয়ে ছিল, অথচ উক্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, সে কারণে তাকে এর জরিমানা বহন করতে হবে।

وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْاَجِيْرِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– একজন দফতরি তার নিকট অফিসের খাতাপত্র, কলম, চেয়ার, টেবিল, চাটাই, বিছানাপত্র এবং অন্যান্য আসবাবসামগ্রী আমানতস্বরূপ থাকে, এগুলো হেফাজত করার দায়িত্ব তার। কাজেই তার যথার্থ তত্ত্বাবধান সত্ত্বেও যদি এগুলোর কোন একটি ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে তাকে এর খেসারত দিতে হবে না। কিন্তু যদি এ ধ্বংসের কারণ হয় তার নিয়মলজ্ঘন, যেমন– গ্লাস-জগ কক্ষের নির্দিষ্ট স্থানে না রেখে বারান্দায় রেখে দিল অথচ বারান্দা থেকে তা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এক সময় তা চুরি হয়েও গেল, তাহলে এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

وَالْإِجَارَةُ تَفْسِدُهَا الشُّرُوطُ كَمَا تَفْسِدُ الْبَيْعَ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ عَبْدًا لِلْخِدْمَةِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يُّسَافِرَ بِهِ اِلَّا اَنْ يَّشْتَرِطَ عَلَيْهِ ذٰلِكَ فِى الْعَقْدِ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ جَمَلًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِحْمَلًا وَ رَاكِبَيْنِ اِلٰى مَكَّةَ جَازَ وَلَهُ الْمِحْمَلُ الْمُعْتَادُ وَاِنْ شَاهَدَ الْجَمَّالُ الْمِحْمَلَ فَهُوَ اَجْوَدُ وَاِنِ اسْتَاجَرَ بَعِيْرًا لِيَحْمِلَ عَلَيْهِ مِقْدَارًا مِنَ الزَّادِ فَاَكَلَ مِنْهُ فِى الطَّرِيْقِ جَازَ لَهُ اَنْ يَّرُدَّ عِوَضَ مَا اَكَلَ- وَالْاُجْرَةُ لَاتَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتَسْتَحِقُّ بِاَحَدِ ثَلٰثَةِ مَعَانٍ اِمَّا بِشَرْطِ التَّعْجِيْلِ اَوْ بِالتَّعْجِيْلِ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ اَوْ بِاسْتِيْفَاءِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهِ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ دَارًا فَلِلْمُوْجِرِ اَنْ يُّطَالِبَهُ بِاُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ اِلَّا اَنْ يُّبَيِّنَ وَقْتَ الْاِسْتِحْقَاقِ فِى الْعَقْدِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ (অসংগত) শর্তাবলী বিক্রয়-চুক্তিকে যেমন নষ্ট করে দেয় তেমনি ইজারা চুক্তিকেও নষ্ট করে দেয়। যে ব্যক্তি গৃহস্থালীর কাজ-কর্মের জন্য বেতনে গোলাম নিয়োগ করল; সে তাকে সফরে নিয়ে যেতে পারবে না। অবশ্য চুক্তির সময় সফরের কথা শর্ত করে নিলে তা ভিন্ন কথা। যদি কেউ উট ভাড়া নেয় তাতে হাওদা পেতে দু'জন লোক তুলে মক্কায় যাবার কথা বলে, তবে তা জায়েয আছে। এ স্থলে মুস্তাজির প্রচলিত সাইজের হাওদা বসাতে পারবে। যদি উট মালিক (ভাড়াদাতা) হাওদাটি (পূর্বেই একনজর) দেখে নেয়, তবে তা আরো উত্তম। যদি কোন ব্যক্তি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বহনের কথা বলে উট ভাড়া আনে এবং পথিমধ্যে তা থেকে কিছু খেয়ে (কমিয়ে) ফেলে তবে তার জন্য ভুক্ত পরিমাণ অন্য কিছু তদস্থলে রেখে দেয়া জায়েয আছে। ইজারা চুক্তি হলেই (অমনি ভাড়ায়দাতা বা শ্রমিকের জন্য) পারিশ্রমিক প্রাপ্য হয় না; বরং তিন উপায়ের কোন এক উপায়ে সে অধিকার অর্জিত হয়- (ক) (চুক্তির সময়) অগ্রিম প্রদানের শর্ত করে থাকলে বা (খ) শর্ত ছাড়াই মুস্তাজির অগ্রিম দিয়ে দিলে (গ) অথবা চুক্তিকৃত কাজ সমাধান হলে। যদি কেউ বাড়ি ভাড়া নেয় তাহলে মূজের (ভাড়া দাতা) প্রতিদিনই তার নিকট সেদিনের ভাড়া দাবি করতে পারবে; তবে চুক্তিকালে (মুস্তাজির ভাড়া) প্রাপ্তির সময় বলে দিয়ে থাকলে তা পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْاِجَارَةُ تَفْسِدُ الخ-এর আলোচনা ঃ যেমন- আজীরে-খাসকে নিয়োগ দেয়ার সময় যদি বলা হয় যে, তোমার তত্ত্বাবধানে দেয়া আসবাবপত্র তা যে কোন কারণেই ক্ষতিসাধিত হোক তোমাকে তার ক্ষতিপূরণ বহন করতে হবে, তাহলে ইজারা ফাসিদ্ হয়ে যাবে। অদ্রূপ উজরত বা মেয়াদ নির্ধারণ করা না হলে এবং কাজের ধরন বলে না নিলেও ইজারা নষ্ট হয়ে যায়।

جَازَ لَهُ اَنْ يَّرُدَّ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন- কোন যাত্রী তার এক মণ গুড় বিশিষ্ট একটি টিন থেকে পথিমধ্যে এক কেজি গুড় খেয়ে ফেলল, তাহলে উক্ত কমতি পূরণ করতে চাইলে সে তদস্থলে নতুনভাবে আরো এক কেজি গুড় বা অন্য কিছু ব্যবস্থা করে রেখে দিতে পারে।

وَالْاُجْرَةُ لَاتَجِبُ الخ -এর আলোচনা ঃ সুতরাং জিনিসপত্র ভাড়ায়দাতা বা শ্রমিক পারিশ্রমিকে তাদের অধিকার স্বীকৃত হওয়ার পূর্বে আইনত পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না। অবশ্য অগ্রিম দেয়ার পূর্বশর্ত থাকা সত্ত্বেও অগ্রিম প্রদান করা না হলে শ্রমিক-কর্মচারী আইনত কাজ বন্ধ রাখতে পারে।

وَمَنْ اِسْتَاجَرَ بَعِيْرًا اِلَى مَكَّةَ فَلِلْجَمَّالِ اَنْ يُطَالِبَهُ بِاُجْرَةِ كُلِّ مَرْحَلَةٍ وَلَيْسَ لِلْقَصَّارِ وَالْخَيَّاطِ اَنْ يُّطَالِبَ بِالْاُجْرَةِ حَتّٰى يَفْرُغَ مِنَ الْعَمَلِ اِلَّا اَنْ يَشْتَرِطَ التَّعْجِيْلَ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ خَبَّازًا لِيَخْبِزَ لَهُ فِيْ بَيْتِهِ قَفِيْزَ دَقِيْقٍ بِدِرْهَمٍ لَمْ يَسْتَحِقَّ الْاُجْرَةَ حَتّٰى يَخْرُجَ الْخُبْزُ مِنَ التَّنُّوْرِ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ طَبَّاخًا لِيَطْبُخَ لَهُ طَعَامًا لِلْوَلِيْمَةِ فَالْغَرْفُ عَلَيْهِ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ رَجُلًا لِيَضْرِبَ لَهُ لَبِنًا اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ اِذَا اَقَامَهُ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَسْتَحِقُّهَا حَتّٰى يُشَرِّجَهُ وَاِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ اِنْ خِطْتَّ هٰذَا الثَّوْبَ فَارِسِيًّا فَبِدِرْهَمٍ وَاِنْ خِطْتَّهُ رُوْمِيًّا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَاَيَّ الْعَمَلَيْنِ عَمِلَ اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ وَاِنْ قَالَ اِنْ خِطْتَّهُ الْيَوْمَ فَبِدِرْهَمٍ وَاِنْ خِطْتَّهُ غَدًا فَبِنِصْفِ دِرْهَمٍ فَاِنْ خَاطَهُ الْيَوْمَ فَلَهُ دِرْهَمٌ وَاِنْ خَاطَهُ غَدًا فَلَهُ اُجْرَةُ مِثْلِهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَا يَتَجَاوَزُ بِهِ نِصْفُ دِرْهَمٍ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى الشَّرْطَانِ جَائِزَانِ وَاَيُّهُمَا عَمِلَ اِسْتَحَقَّ الْاُجْرَةَ - وَاِنْ قَالَ اِنْ سَكَنْتَ فِيْ هٰذَا الدُّكَّانِ عَطَّارًا فَبِدِرْهَمٍ فِى الشَّهْرِ وَاِنْ سَكَنْتَهُ حَدَّادًا فَبِدِرْهَمَيْنِ جَازَ وَاَيَّ الْاَمْرَيْنِ فَعَلَ اِسْتَحَقَّ الْمُسَمّٰى فِيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى الْاِجَارَةُ فَاسِدَةٌ ـ

সরল অনুবাদ ঃ কেউ মক্কা পর্যন্ত উট ভাড়া করলে চালক তার নিকট প্রতি (মারহালায় (Station) পৌঁছেই সে) মারহালার ভাড়া দাবি করতে পারবে। ধোপা, দর্জি প্রভৃতি আজীরে-মুশ্‌তারিকগণের জন্য কাজ সমাধা করার পূর্বে উজরত দাবি করার অধিকার নেই; অবশ্য অগ্রিম প্রদানের শর্ত করে থাকলে সেটা ভিন্ন কথা। (সুতরাং) কেউ কোন রুটি প্রস্তুতকারককে তার বাড়ি এসে এক কফিয আটার রুটি তৈরি করে দেয়ার জন্য এক টাকা বেতনে ঠিক করলে চুলা থেকে রুটি নামানোর পূর্ব পর্যন্ত সে বেতনের অধিকারী হবে না এবং কেউ অলিমার খাবার রান্না করার জন্য বাবুর্চি ভাড়া নিলে ডেগ থেকে খাবার বিতরণ করার দায়িত্বও বাবুর্চির ওপর বর্তাবে। যে ব্যক্তি ইট প্রস্তুত করার জন্য কাউকে ভাড়া নিল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে সে যখন ইট (বানিয়ে তা) দাঁড় করাবে, তখন মজুরির অধিকারী হবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, ইটের স্তূপ তৈরি করার আগ পর্যন্ত সে মজুরি প্রাপ্য হবে না। কোন গ্রাহক যদি দর্জিকে বলে, এ কাপড়টি ফার্সী নিয়মে সেলাই করলে বিনিময় হবে এক দিরহাম, আর রূমী নিয়মে সেলাই করলে হবে দু'দিরহাম, তবে তা জায়েয আছে। এ স্থলে দর্জি দু'পন্থার যে পন্থায় কাজ করবে সে মোতাবেক পারিশ্রমিক পাবে। পক্ষান্তরে গ্রাহক যদি বলে, কাপড়টি অদ্য সেলাই করলে বিনিময় হবে এক দিরহাম আর আগামীকাল করলে হবে আধা দিরহাম, তাহলে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, যদি অদ্য সেলাই করে দেয় তবে সে এক দিরহাম প্রাপ্য হবে কিন্তু পর দিন সেলাই করে দিলে পাবে উজরতে মেছেল (প্রচলিত মজুরি) এবং তা আধা দিরহামের বেশি হবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, উভয় শর্তই শুদ্ধ। সুতরাং যেটা পালন করবে সে অনুপাতে মজুরি পাবে। মালিক যদি (মুস্তাজিরকে) বলে, এ দোকানে আতরের কারবার করলে মাসিক ভাড়া হবে এক দিরহাম, আর লোহার কারবার করলে হবে দু'দিরহাম, তবে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে তা জায়েয আছে। মুস্তাজির দুই কারবারের যেটা করবে মালিক সে মোতাবেক ভাড়া পাবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, ইজারা ফাসিদ বলে গণ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِأُجْرَةِ كُلِّ يَوْمٍ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ মুস্তাজির তো বসবাসের মাধ্যমে প্রতিদিনই এমনকি প্রতি মুহূর্তে বাড়ির মুনাফা ভোগ করছে। সে হিসেবে ভাড়াটিয়ার নিকট প্রতি মুহূর্তেই ভাড়া চাওয়া যায়, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে সে মুহূর্তের ভাড়া চাওয়া এবং দেয়া একটি কঠিনসাধ্য কাজ বিধায় তা এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। কিন্তু দিনের শেষে সে দিনের ভাড়া দেয়ার মধ্যে তেমন কোন কষ্ট নেই। সুতরাং মালিক দিনের শেষভাগে সে দিনের ভাড়া দাবি করতে পারবে।

حَتّٰى يُخْرِجَ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ চুলা থেকে রুটি নামানোর পর সে পারিশ্রমিকের অধিকারী হবে। পক্ষান্তরে যদি আজীরকে তার নিজ দোকানে বসে রুটি বানিয়ে দেয়ার কথা বলা হয়, তাহলে শুধুমাত্র চুলা থেকে রুটি নামিয়েই সে পারিশ্রমিক দাবি করতে পারবে না ; বরং গ্রাহকের হাতে রুটি তুলে দেয়াও তার দায়িত্বে বর্তাবে।

طَعَامًا لِلْوَلِيْمَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ অনুষ্ঠানের খানা রান্নার জন্য বাবুর্চি ভাড়া করলে তা পরিবেশনের দায়িত্বও বাবুর্চির কর্তব্য হবে; কিন্তু মনে রাখতে হবে জেয়াফতের খাবার না হয়ে যদি ঘর-বাড়ির খাবার রান্না করে, তাহলে পরিবেশনের দায়িত্ব বাবুর্চির নয়। আসলে এটা অনেকটা স্থানীয় প্রচলনের ওপর নির্ভরশীল।

حَتّٰى يُشْرِجَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা ইট শুকিয়ে স্তূপাকারে জমা করার আগ পর্যন্ত তা বিপদমুক্ত হয় না। সুতরাং স্তূপ তৈরি না করা পর্যন্ত আজীরের দায়িত্ব অসম্পূর্ণ থাকে। কিন্তু ইমাম আযম (রঃ) বলেন, স্তূপ তৈরি করা তাদের দায়িত্বের আওতাধীন নয়। ইট তৈরি হওয়ার সাথে সাথেই আজীরের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায়।

اِذَا قَالَ لِلْخَيَّاطِ الخ -এর আলোচনা ঃ ইমাম যুফারের (রঃ) মতে, এখানে সেলাই সংক্রান্ত দু'কারবারের কোন একটিও শুদ্ধ হয়নি। কারণ কাজের উল্লিখিত দু'টি ধারার মধ্যে কোন একটি নিশ্চিত সিদ্ধান্ত না হওয়ায় মা'কূদ-আলাইহ্ এবং উজরত উভয়ই অজানা রয়ে গেছে। কিন্তু আমরা বলব, মুস্তাজির এক্ষেত্রে আজীরকে দু'টি মুনাফার যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দিয়ে রেখেছে। আর উজরত যেহেতু চুক্তিবদ্ধ হওয়ার সাথে সাথেই প্রাপ্য হয় না সে কারণে প্রথম দিকে তা অজানা থাকার মধ্যে কোন দোষ নেই। আজীর কাজ সমাধা করার পর যখন উজরত প্রাপ্য হবে, ততক্ষণে তা আর অজ্ঞাত থাকবে না। ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, প্রথম চুক্তি ও দ্বিতীয় চুক্তির প্রথম শর্ত শুদ্ধ হয়েছে বিধায় শ্রমিক কথামত পারিশ্রমিক পাবে। কিন্তু দ্বিতীয় চুক্তির দ্বিতীয় শর্তটি অশুদ্ধ বিধায় সে প্রচলিত মজুরি প্রাপ্য হবে। তবে প্রচলিত মজুরি ধার্যকৃত মজুরির চেয়ে বেশি হবে না। আর সাহেবাইন (রঃ)-এর মতানুসারে উভয় কারবারই শুদ্ধ হয়েছে। এ সম্পর্কে তাঁরা যে যুক্তি পেশ করেন তাহল, শ্রমিকের কর্তব্য কাজ কি তা যদি দোদুল্যমান রাখা হয় এবং সে ভিত্তিতে মজুরিও দোদুল্যমান থাকে, তবে কোন আপত্তি নেই।

وَمَنْ اِسْتَاجَرَ دَارًا كُلَّ شَهْرٍ بِدِرْهَمٍ فَالْعَقْدُ صَحِيْحٌ فِىْ شَهْرٍ وَاحِدٍ وَفَاسِدٌ فِىْ بَقِيَّةِ الشُّهُوْرِ اِلَّا اَنْ يُّسَمِّىْ جُمْلَةَ الشُّهُوْرِ مَعْلُوْمَةً فَاِنْ سَكَنَ سَاعَةً مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِىْ صَحَّ الْعَقْدُ فِيْهِ لَمْ يَكُنْ لِلْمُوْجِرِ اَنْ يُّخْرِجَهُ اِلٰى اَنْ يَّنْقَضِىَ الشَّهْرُ وَكَذٰلِكَ حُكْمُ كُلِّ شَهْرٍ يَسْكُنُ فِىْ اَوَّلِهٖ يَوْمًا اَوْ سَاعَةً وَاِذَا اِسْتَاجَرَ دَارًا شَهْرًا بِدِرْهَمٍ فَسَكَنَ شَهْرَيْنِ فَعَلَيْهِ اُجْرَةُ الشَّهْرِ الْاَوَّلِ وَلَا شَئَ عَلَيْهِ مِنَ الشَّهْرِ الثَّانِىْ وَاِذَا اِسْتَاجَرَ دَارًا سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ جَازَ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّ قِسْطَ كُلِّ شَهْرٍ مِنَ الْاُجْرَةِ وَيَجُوْزُ اَخْذُ اُجْرَةِ الْحَمَّامِ وَالْحَجَّامِ وَلَا يَجُوْزُ اَخْذُ اُجْرَةِ عَسْبِ التَّيْسِ وَلَا يَجُوْزُ الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ وَتَعْلِيْمِ الْقُرْاٰنِ وَالْحَجِّ وَلَا يَجُوْزُ الْاِسْتِيْجَارُ عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ وَلَا يَجُوْزُ اِجَارَةُ الْمُشَاعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِجَارَةُ الْمُشَاعِ جَائِزَةٌ وَيَجُوْزُ اِسْتِيْجَارُ الظِّئْرِ بِاُجْرَةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَيَجُوْزُ بِطَعَامِهَا وَكِسْوَتِهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَلَيْسَ لِلْمُسْتَاجِرِ اَنْ يَّمْنَعَ زَوْجَهَا مِنْ وَطْئِهَا فَاِنْ حَبِلَتْ كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّفْسَخُوا الْاِجَارَةَ اِذَا خَافُوْا عَلَى الصَّبِىِّ مِنْ لَبَنِهَا وَعَلَيْهَا اَنْ تُصْلِحَ طَعَامَ الصَّبِىِّ وَاِنْ اَرْضَعَتْهُ فِى الْمُدَّةِ بِلَبَنِ شَاةٍ فَلَا اُجْرَةَ لَهَا ـ

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি মাসিক এক দিরহামে বাড়ি ভাড়া নিল তার এ চুক্তি শুধু এক মাসের জন্য শুদ্ধ এবং বাকি মাসসমূহে ফাসিদ গণ্য হবে। তবে মাসের সর্বমোট সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করে নিলে (ফাসিদ হবে না। মাসের সংখ্যা উহ্য রাখা অবস্থায় ভাড়াটিয়া) যদি দ্বিতীয় মাসের কিছু সময় উক্ত বাড়িতে অবস্থান করে (এবং মালিক তাতে কোন আপত্তি না তোলে) তাহলে সে মাসের জন্যও ইজারা শুদ্ধ হয়ে গেল। মালিক তখন মাস শেষ হওয়ার পূর্বে তাকে উঠিয়ে দিতে পারবে না। পরবর্তী মাসসমূহের বেলায়ও এ নীতি অবলম্বিত হবে। যদি এক দিরহামে এক মাসের জন্য বাড়ি ভাড়া নিয়ে তাতে দুই মাস থাকে, তাহলে তার ওপর শুধুমাত্র প্রথম মাসের ভাড়া বর্তাবে; দ্বিতীয় মাসের জন্য কিছুই বর্তাবে না। যদি কেউ এক বছরের জন্য কোন বাড়ি দশ দিরহামে ভাড়া নেয় তা জায়েয আছে, যদিও মাসিক ভাড়ার হার উল্লেখ না করে। গোসলখানার ভাড়া এবং মোক্ষণকারীর (মোক্ষণের) মজুরি গ্রহণ করা জায়েয। নরপশু মাদীর সাথে সঙ্গম করিয়ে উজরত নেয়া জায়েয নেই এবং জায়েয নেই আযান, ইকামত, তা'লীমে কুরআন ও হজ্জ (প্রভৃতি নেক কাজ)-এর বেতন গ্রহণ করা। গান-বাদ্য ও বিলাপ করে বেতন নেয়া দুরস্ত নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, ইজমালী জিনিস ভাড়ায় খাটানো দুরস্ত নেই। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, তা জায়েয। (শিশুকে দুধ পান করানোর জন্য) নির্ধারিত মজুরিতে ধাত্রী নিয়োগ করা জায়েয। ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, অন্ন-বস্ত্রের বিনিময়েও দাই রাখা দুরস্ত আছে। মুস্তাজির দাই রমণীর স্বামীকে তার সাথে মিলনে বাধা দিতে পারবে না। যদি সে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, তবে তারা তার দুধে শিশুর ক্ষতি হবে বলে আশঙ্কা করলে ইজারা-চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারবে। শিশুকে উপযুক্ত খাবার পরিবেশন করা ধাত্রীর কর্তব্য। যদি সে তাকে ইজারার মেয়াদের মধ্যে ছাগলের দুধ পান করায়, তবে সে পারিশ্রমিক পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَالْعَقْدُ صَحِيْحٌ الخ -এর আলোচনা ঃ এ স্থলে শুধুমাত্র এক মাসের মধ্যে ইজারা শুদ্ধ এবং পরবর্তী মাসসমূহে অশুদ্ধ হওয়ার কারণ হল, ব্যাপকতাসূচক পদ "كُل" (প্রত্যেক) যখন এমন জিনিসের পূর্বে প্রবিষ্ট হয় যার সংখ্যা অগণিত, তখন এর চাহিদা মোতাবেক কাজ করা সাধ্যের বাহিরে হয়ে পড়ে বিধায় তার ব্যাপকতা বিলুপ্ত হয়ে ন্যূনতম সংখ্যা 'এক' বহাল থাকে। সে কারণে মালিক দ্বিতীয় মাসে ভাড়াটিয়াকে আইনত বিদায় করে দিতে পারবে। কিন্তু দ্বিতীয় মাসের শুরুতে মালিক কোনরূপ আপত্তি না করায় যখন ভাড়াটিয়া রয়ে গেল, তখন তাদের উভয়ের এ মৌনতা চুক্তি নতুনভাবে হয়েছে বলে বুঝায়। সুতরাং মালিক সে মাসেও আর তাকে ওঠাতে পারবে না এবং এভাবে পরের মাসগুলোতেও এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

لَاشَيْئَ عَلَيْهِ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা মুস্তাজিরের দ্বিতীয় মাসের অবস্থান ইজারা-চুক্তির অনুযায়ী ছিল না। সুতরাং আইনত তার নিকট পয়সা দাবি করা যাবে না। অবশ্য মুস্তাজির এরূপ আচরণের দরুন নৈতিকভাবে দায়ী সাব্যস্ত হবে।

وَلَا يَجُوْزُ اَخْذُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ হুযূর (সাঃ) ইরশাদ করেছেন- إِنَّ مِنَ السُّحْتِ عَسْبَ التَّيْسِ অর্থাৎ নরপশুকে মাদীর সঙ্গে সঙ্গম করিয়ে অর্থ উপার্জন করা বড়োই নিকৃষ্ট কাজ। তাছাড়া সঙ্গমে মিলিত হওয়া নরপশুর একান্ত নিজস্ব ব্যাপার, তাতে মালিকের কোন দখল নেই। অতএব মালিক যে জিনিস সম্প্রদানে সক্ষম নয় তা সে সঙ্গত কারণেই ভাড়ায় খাটাতে পারে না।

عَلَى الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ একইভাবে ইমামতি ও ওয়াজ-নসীহত করেও মজুরি গ্রহণ করা জায়েয নেই। এখানে মূলনীতি হল, ইসলামের যে সকল বিষয় মুসলমান ব্যতীত অন্য কারো করার অনুমতি নেই যেমন- শাসন কার্য, বিচার কার্য, ফতোয়া প্রদান, আযান ও ইকামত ইত্যাদি সে সকল কাজের মজুরি গ্রহণ করাও জায়েয নেই। হযরত উসামা ইবনে আবুল 'আস সূত্রে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেন- وَاِنِ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَايَأْخُذُ عَلَى اَذَانِهِ اَجْرًا

কিন্তু আজকাল এসব দায়িত্ব পালন-উপযোগী লোকদের সংখ্যাল্পতা, তাদের আর্থিক দৈন্যতা এবং সর্বোপরি দীনের প্রতি সর্বসাধারণের উদাসীনতাপূর্ণ মনোভাবের প্রতি লক্ষ্য করে মুতাআখ্‌খিরীন আলিমগণ এ সকল কাজের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে মত প্রকাশ করেছেন। এ মতের ওপরই ফতোয়া। তবে সর্ব প্রকার ইবাদতকে এ ফতোয়ার অধীনে নিয়ে আসার কোন সুযোগ আছে বলে মনে হয় না। -(শামী)

عَلَى الْغِنَاءِ وَالنَّوْحِ الخ -এর আলোচনা ঃ খেলাধুলা ও অন্যান্য রং-তামাশার সামগ্রীরও এই বিধান। শুধু তা-ই নয়; বরং খেল-তামাশার উপায়-উপাদান বানিয়েও উজরত গ্রহণ করা জায়েয নেই। আলোকসজ্জা ও অন্যান্য সাজসজ্জার জিনিস (যা নিতান্তই বিলাসিতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত) ভাড়া আনা ও ভাড়া দেয়া উভয়ই না জায়েয।

وَعَلَيْهَا اَنْ تُصْلِحَ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ শিশুর শরীরে পুষ্টি যোগান দেয় এমন খাবার তার গ্রহণ উপযোগী করে পরিবেশন করা এবং শিশুর জন্য ক্ষতির কারণ হবে এমন খাদ্য গ্রহণ থেকে নিজে বিরত থাকা ধাত্রীর কর্তব্য। এছাড়া যাবতীয় সেবা-যত্নের দায়িত্বও ধাত্রীর কর্তব্যে বর্তায়।

وَكُلُّ صَانِعٍ لِعَمَلِهِ اَثَرٌ فِى الْعَيْنِ كَالْقَصَّارِ وَالصَّبَّاغِ فَلَهُ اَنْ يَّحْبِسَ الْعَيْنَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْ عَمَلِهِ حَتّٰى يَسْتَوْفِىَ الْاُجْرَةَ وَمَنْ لَيْسَ لِعَمَلِهِ اَثَرٌ فِى الْعَيْنِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّحْبِسَ الْعَيْنَ لِلْاُجْرَةِ كَالْحَمَّالِ وَالْمَلَّاحِ وَاِذَا اشْتَرَطَ عَلَى الصَّانِعِ اَنْ يَّعْمَلَ بِنَفْسِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّسْتَعْمِلَ غَيْرَهُ وَاِنْ اَطْلَقَ لَهُ الْعَمَلَ فَلَهُ اَنْ يَّسْتَأْجِرَ مَنْ يَّعْمَلُهُ وَاِذَا اخْتَلَفَ الْخَيَّاطُ وَالصَّبَّاغُ وَصَاحِبُ الثَّوْبِ فَقَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلْخَيَّاطِ اَمَرْتُكَ اَنْ تَعْمَلَهُ قُبَاءً وَقَالَ الْخَيَّاطُ قَمِيْصًا اَوْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ لِلصَّبَّاغِ اَمَرْتُكَ اَنْ تَصْبَغَهُ اَحْمَرَ فَصَبَغْتَهُ اَصْفَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِيْنِهِ فَاِنْ حَلَفَ فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ وَاِنْ قَالَ صَاحِبُ الثَّوْبِ عَمِلْتَهُ لِىْ بِغَيْرِ اُجْرَةٍ وَقَالَ الصَّانِعُ بِاُجْرَةٍ فَالْقَوْلُ قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ مَعَ يَمِيْنِهِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ كَانَ حَرِيْفًا لَهُ فَلَهُ الْاُجْرَةُ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ حَرِيْفًا لَهُ فَلَا اُجْرَةَ لَهُ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ كَانَ الصَّانِعُ مُبْتَذِلًا لِهٰذِهِ الصَّنْعَةِ بِالْاُجْرَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ اَنَّهُ عَمِلَهُ بِاُجْرَةٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ ধোপা ও রঞ্জকসহ যে সকল পেশাজীবি (শ্রমিকের) কাজের চিহ্ন মূল জিনিসের মধ্যে (প্রকাশ্যভাবে) ফুটে ওঠে (অর্থাৎ কাজের দরুন মূল জিনিসের মধ্যে কিছুটা পরিবর্তন সূচিত হয়) তারা কার্য সমাধা করার পর মজুরি আদায়ের জন্য সে জিনিস (মালিককে সমর্পণ না করে) আটক করে রাখতে পারে। আর যাদের কাজের চিহ্ন মূল জিনিসে প্রকাশ পায় তা তারা পারিশ্রমিকের জন্য দ্রব্য আটক রাখতে পারবে না যেমন–, কুলি ও মাঝি। গ্রাহক যদি কারিগরকে নিজ হাতে কাজ সমাধা করার শর্ত দেয়, তাহলে সে অন্য কারো দ্বারা তা করাতে পারবে না। আর নিঃশর্তভাবে দিলে সে কাজ সমাধা করার জন্য অন্য কাউকে ভাড়া নিতে পারবে। দর্জি বা রঞ্জকের সাথে যদি কাপড় মালিকের মতবিরোধ দেখা দেয়– কাপড় মালিক দর্জিকে বলে, আমি তো তোমায় জোব্বা তৈরি করতে বলেছিলাম। আর দর্জি বলে, না পাঞ্জাবির কথা বলেছিলেন। অথবা কাপড় মালিক রঞ্জককে বলে, আমি তো লাল রং লাগাতে বলেছিলাম আর তুমি কিনা হলুদ রং লাগিয়েছ। তাহলে কাপড় মালিকের উক্তি তার শপথের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পাবে। সুতরাং যদি মালিক হলফ করে বলে তাহলে দর্জি (বা রঞ্জক উক্ত ক্ষতির জন্য) দায়ী সাব্যস্ত হবে। পক্ষান্তরে মালিক যদি কারিগরকে বলে, তুমি আমার জন্য বিনা পয়সায় (ফ্রি) কাজ করেছ। আর কারিগর বলে, না পয়সার বিনিময়ে করেছি। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, কাপড় মালিকের কথা তার হলফের ভিত্তিতে প্রাধান্য পাবে। কিন্তু আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, শ্রমিক যদি উক্ত কাজে পেশাজীবি হয়, তবে সে পারিশ্রমিক পাবে, আর তা না হলে পাবে না। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, কারিগর যে মজুরি নিয়ে উক্ত পেশা পালন করে তা যদি প্রসিদ্ধ হয়, তবে পারিশ্রমিকের ব্যাপারে তার দাবিই হলফের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার লাভ করবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكُلُّ صَانِعٍ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ শ্রমিকদের কাজের দু' অবস্থা। হয়তো দ্রব্যের মধ্যে কাজের পরিষ্কার লক্ষণাদি ফুটে ওঠবে অথবা উঠবে না। যেমন– দর্জি সেলাই করার কারণে এবং রঞ্জক রং লাগাবার কারণে উল্লিখিত কাপড়ে কিছুটা পরিবর্তন প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে রিকসাচালক, মাঝি ও কুলি যে খাবার বয়ে বাড়ি পৌঁছে দিল সে খাবারে তাদের কাজের কারণে কোন পরিবর্তন প্রকাশ পায়নি। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, প্রথম শ্রেণী নিজেদের মজুরি উসুল করার নিমিত্ত দ্রব্য মালিককে সমর্পণ না করে আটক করে রাখতে পারলেও দ্বিতীয় শ্রেণী তা করতে পারবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) উভয় শ্রেণীর শ্রমিকের জন্য সে অধিকার আছে বলে মত ব্যক্ত করেছেন। অন্যের অধিকার মেরে খাওয়ার প্রবণতার এযুগে সাহেবাইন (রঃ)-এর মতের ওপর ফতোয়া হওয়া উচিত। – [ইসলামী ফিকহ]

ধর্মঘট ঃ শ্রমিকদের উজরতে মিছিল বা প্রচলিত মজুরির চেয়ে কম মজুরি দেয়া হলে তারা ধর্মঘট করতে পারবে কি-না তা আলিমদের ভেবে দেখা প্রয়োজন। উপরোল্লিখিত মাসআলা ধর্মঘটের স্বপক্ষে সমর্থন যোগায় বলেই মনে হয়। বিশেষত সে সকল শিল্প-শ্রমিকদের যাদের শ্রমে মূল জিনিসে পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন– পোশাক শিল্পে কাপড় তৈরিকারী শ্রমিক সুতাকে কাপড়ে রূপান্তরিত করে ইত্যাদি।

قَوْلُ صَاحِبِ الثَّوْبِ الخ -এর আলোচনা ঃ এ স্থলে মালিকের কথা অগ্রাধিকার পাওয়ার কারণ হল, কাপড় সেলাই এর দ্বারা কি হবে সেটা কাপড়ের মালিকই ভালো জানে। অবশ্য রঞ্জক বা দর্জির নিকট তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকলে তাদের বক্তব্যই গ্রহণযোগ্য হবে।

فَالْخَيَّاطُ ضَامِنٌ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কারিগর মালিককে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। সে মতে কাপড়-মালিক ইচ্ছা করলে কাপড় দর্জি বা রঞ্জককে দিয়ে তার মূল্য নিয়ে নিতে পারবে।

اِنْ كَانَ الصَّانِعُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কারিগর যে পয়সার বিনিময়ে কাজ করে তা যদি সকলের জানা থাকে, তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে। এ মাসআলায় ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর কওলের ওপর ফতোয়া।

وَالْوَاجِبُ فِى الْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ اُجْرَةُ الْمِثْلِ لَايَتَجَاوَزُ بِهِ الْمُسَمّٰى وَاِذَا قَبَضَ الْمُسْتَاجِرُ الدَّارَ فَعَلَيْهِ الْاُجْرَةُ وَاِنْ لَمْ يَسْكُنْهَا فَاِنْ غَصَبَهَا غَاصِبٌ مِنْ يَدِهٖ سَقَطَتِ الْاُجْرَةُ وَاِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا يَضُرُّ بِالسُّكْنٰى فَلَهُ الْفَسْخُ وَاِذَا خَرِبَتِ الدَّارُ اَوْ اِنْقَطَعَ شُرْبُ الضَّيْعَةِ اَوْ اِنْقَطَعَ الْمَاءُ عَنِ الرَّحٰى اِنْفَسَخَتِ الْاِجَارَةُ وَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَقَدْ عَقَدَ الْاِجَارَةَ لِنَفْسِهٖ اِنْفَسَخَتِ الْاِجَارَةُ وَاِنْ كَانَ عَقَدَهَا لِغَيْرِهٖ لَمْ تَنْفَسِخْ وَيَصِحُّ شَرْطُ الْخِيَارِ فِى الْاِجَارَةِ كَمَا فِى الْبَيْعِ وَتَنْفَسِخُ الْاِجَارَةُ بِالْاَعْذَارِ كَمَنْ اِسْتَاجَرَ دُكَّانًا فِى السُّوْقِ لِيَتَّجِرَ فِيْهِ فَذَهَبَ مَالُهُ وَكَمَنْ اَجَرَ دَارًا اَوْ دُكَّانًا ثُمَّ اَفْلَسَ فَلَزِمَتْهُ دُيُوْنٌ لَايَقْدِرُ عَلٰى قَضَائِهَا اِلَّا مِنْ ثَمَنِ مَا اَجَرَ فَسَخَ الْقَاضِى الْعَقْدَ وَبَاعَهَا فِى الدَّيْنِ وَمَنْ اِسْتَاجَرَ دَابَّةً لِيُسَافِرَ عَلَيْهَا ثُمَّ بَدَا لَهُ مِنَ السَّفَرِ فَهُوَ عُذْرٌ وَاِنْ بَدَا لِلْمُكَارِىْ مِنَ السَّفَرِ فَلَيْسَ ذٰلِكَ بِعُذْرٍ -

সরল অনুবাদ ঃ ফাসিদ ইজারার ক্ষেত্রে শ্রমিকের জন্য উজরতে-মিছিল (প্রচলিত মজুরি) প্রাপ্য হবে যা ধার্যকৃত পারিশ্রমিকের সীমা পার হবে না। মুস্তাজির বাড়ি করায়ত্ত করে যদি তাতে বাস না করে তথাপি তার ওপর ভাড়া আবশ্যক হবে। কিন্তু যদি কোন জবর দখলকারী তার থেকে বাড়ি ছিনিয়ে নেয়, তাহলে ভাড়া রহিত হয়ে যাবে। যদি মুস্তাজির তাতে এমন কোন দোষ-ত্রুটি পায় যা বসবাসে ব্যঘাত করে, তবে সে ইজারা চুক্তি বাতিল করতে পারবে। যখন বাড়ি বিরান হবে বা জমির সেচ সুবিধা বন্ধ হবে অথবা পানি চালিত চক্কির পানি প্রবাহ খতম হবে, তখন (আপনা আপনি) ইজারা রহিত হয়ে যাবে। একইভাবে যখন দুই কারবারির কেউ মারা যাবে অথচ সে ইজারা-চুক্তি (কারো উকিলরূপে নয়, বরং) নিজের জন্য করেছিল তাহলে চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি অন্য কারো জন্য করে থাকে, তাহলে রহিত হবে না। বিক্রয়-চুক্তির ন্যায় ইজারার ক্ষেত্রেও খিয়ারে শর্ত আরোপ করা জায়েয আছে। (মূজির বা মুস্তাজিরের) বিভিন্ন ওজরের কারণেও ইজারা-চুক্তি রহিত হয়ে যায়। যেমন– কেউ ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাজারে দোকান ভাড়া নেয়ার পর তার সমুদয় পুঁজি হাত ছাড়া হয়ে গেল অথবা কেউ বাড়ি কিংবা দোকান ভাড়া দেয়ার পর দেওলিয়া হয়ে পড়ল এবং এতটা ঋণগ্রস্ত হল যা সে ভাড়া দেয়া দোকান বা বাড়ির বিক্রয় লব্ধ অর্থ ব্যতীত পরিশোধ করতে সক্ষম নয়, তাহলে কাজি তার ইজারা-চুক্তি ভেঙ্গে দেবে এবং ঋণ আদায়ের জন্য তা বিক্রি করে দেবে। যে ব্যক্তি সফরের উদ্দেশ্যে যানবাহন ভাড়া করল অতঃপর তার সফর মুলতবি করার প্রয়োজন দেখা দিল তবে এটা তার ওজর গণ্য হবে। কিন্তু যদি চালকের জন্য সফর মুলতবি করার প্রয়োজন দেখা দেয় তবে তা ওজরের মধ্যে গণ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْوَاجِبُ فِى الْاِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ ইজারা-চুক্তির সাথে সঙ্গতি নয় এমন কোন শর্তারোপ করা হলে চুক্তি ফাসিদ হয়ে যায়। যেমন– আজীরে-খাসের হাতে কোন জিনিস নষ্ট হলে তাকে সেটার খেসারত দিতে হবে বলে শর্ত করা। অথবা পারিশ্রমিক কত হবে তা প্রকাশ না করে উহ্য রাখা ইত্যাদি। ফাসিদ ইজারার সকল ক্ষেত্রে আজীর উজরতে-মিছিল পাবে, কিন্তু এ উজরতে-মিছিল চুক্তিকালে স্থিরকৃত মজুরির চেয়ে কিছুতেই বেশি হতে পারবে না। কিন্তু যদি মজুরি ধার্য না করার দরুন ইজারা ফাসিদ হয়ে থাকে, তাহলে উজরতে-মিছিলের পরিমাণ যতদূর গড়ায় কোন আপত্তি নেই।

وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ ভাড়াদাতা ও গ্রহীতার কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে ইজারা কারবার নিজে নিজেই ভেঙ্গে যাবে; নিয়মতান্ত্রিকভাবে বাতিল করার প্রয়োজন হবে না। কারণ ইজারা কারবার মুনাফা ভোগের মাধ্যমে ক্রমাগতভাবে সংঘটিত হতে থাকে। আর এজন্য প্রয়োজন ঘটকদ্বয়ের জীবিত থাকা; তাদের অবর্তমানে সংঘটন কার্য বহাল থাকতে পারে না। তবে মৃতের ওয়ারিশগণ যদি চুক্তি নতুনভাবে করে নেয় সেটা ভিন্ন কথা।

وَتَنْفَسِخُ الْإِجَارَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ মালিক বা শ্রমিক পক্ষের কারো ওজর দেখা দিলে নিজ হতেই চুক্তি বাতিল হওয়া এবং একে অপরের নিকট দায়বদ্ধ না থাকাই মানবতার দাবি। তবে ওজর সঙ্গত ও বাস্তব কি-না তা খতিয়ে দেখার জন্য সরকারের আলাদা দফতর খোলা বাঞ্ছনীয়। তা না হলে ভিত্তিহীন অজুহাত তুলে মিল মালিকগণ যখন-তখন শ্রমিকদের চাকরিচ্যুত করে পথে বসাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। একইভাবে শ্রমিকগণও ভুয়া অজুহাতে অসময়ে বিদায় নিয়ে মালিকের বারোটা বাজানোর চেষ্টা করবে।

আলাদা দফতরের কথা এজন্য বলা হল যে, যাতে মালিক ও শ্রমিকের কোন পক্ষকেই তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য মাসের পর মাস, বছরের পর বছর কোর্টের মাটি মাড়াতে না হয়; বরং এক দুই ঘন্টা বা দুই এক দিনে তার সুচারুভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে।

فَهُوَ عُذْرٌ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সফরে যাওয়া মুস্তাজিরের পেশা নয়; বরং বিশেষ প্রয়োজনে সে সফরে গমন করে। আর এ কারণেই কখনো সফরের অভিষ্ট লক্ষ্য ব্যহত হবে জেনে সে তার পরিকল্পনা মুলতবি করে। যেমন- হজ্জ পালনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তির বিমান-যোগে মক্কা গমনের কথা ছিল; কিন্তু ইতোমধ্যেই হজ্জের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল, তবে এটা তার ওজরের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে। পক্ষান্তরে চালকের কর্তব্যকাজই হল সফর করে বেড়ানো এবং যাত্রী আনা-নেয়া করা। তারপরও যদি চালকের কোন অপারগতা থাকে তবে সে তো অন্য কাউকে দিয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করতে পারে এবং করা কর্তব্যও বটে। কেননা এটা তার পেশা।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْإِجَارَةُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার শর্তাবলী আলোচনা কর।
২। اَلْأَجِيْرُ الْمُشْتَرَكُ কাকে বলে? এতদ সম্পর্কীয় মাসআলাসমূহ আলোচনা কর।
৩। اَلْإِجَارَةُ ভঙ্গ হওয়ার কারণ গুলো কি কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।
৪। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর- وَيَجُوزُ اِسْتِيْجَارُ الدُّوْرِ وَالْحَوَانِيْتِ لِلسُّكْنٰى الخ

كِتَابُ الشُّفْعَةِ

اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيْطِ فِىْ نَفْسِ الْمَبِيْعِ ثُمَّ لِلْخَلِيْطِ فِىْ حَقِّ الْمَبِيْعِ كَالشِّرْبِ وَالطَّرِيْقِ ثُمَّ لِلْجَارِ وَلَيْسَ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ وَالشِّرْبِ وَالْجَارِ شُفْعَةٌ مَعَ الْخَلِيْطِ فَاِنْ سَلَّمَ الْخَلِيْطُ فَالشُّفْعَةُ لِلشَّرِيْكِ فِى الطَّرِيْقِ فَاِنْ سَلَّمَ اَخَذَهَا الْجَارُ وَالشُّفْعَةُ تَجِبُ بِعَقْدِ الْبَيْعِ وَتَسْتَقِرُّ بِالْاِشْهَادِ وَتَمْلِكُ بِالْاَخْذِ اِذَا سَلَّمَهَا الْمُشْتَرِىْ اَوْ حَكَمَ بِهَا حَاكِمٌ وَاِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ بِالْبَيْعِ اَشْهَدَ فِىْ مَجْلِسِهٖ ذٰلِكَ عَلَى الْمُطَالَبَةِ ثُمَّ يَنْهَضُ مِنْهُ فَيُشْهِدُ عَلَى الْبَائِعِ اِنْ كَانَ الْمَبِيْعُ فِىْ يَدِهٖ اَوْ عَلَى الْمُبْتَاعِ اَوْ عِنْدَ الْعِقَارِ فَاِذَا فَعَلَ ذٰلِكَ اِسْتَقَرَّتْ شُفْعَتُهٗ وَلَمْ تَسْقُطْ بِالتَّاخِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ تَرَكَهَا مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ شَهْرًا بَعْدَ الْاِشْهَادِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهٗ ـ

শুফ'আ পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ বিক্রিত সম্পত্তির স্বত্বভাগীর জন্য (প্রথমে) শুফ্'আ প্রাপ্য। অতঃপর সম্পত্তির সুবিধাদিতে যে অংশীদার তার প্রাপ্য। যেমন– উভয়ের সেচ সুবিধা বা যাতায়াতের রাস্তা (অভিন্ন)। অতঃপর প্রতিবেশীর জন্য। স্বত্বভাগী (শুফ্'আকার) বর্তমান থাকা অবস্থায় রাস্তা ও সেচ সুবিধায় শরিক এবং প্রতিবেশীর জন্য শুফ্'আ নেই। কিন্তু যদি স্বত্বভাগী ছেড়ে দেয়, তাহলে সুবিধাদির শরিক শুফ্'আ নিতে পারবে। আর যদি সেও ছেড়ে দেয়, তাহলে প্রতিবেশী শুফ্'আ নেবে। সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয় হলে শুফ্'আ প্রাপ্য হয় এবং (শুফ্'আ দাবির পক্ষে) সাক্ষী রাখা দ্বারা তা পরিপক্ক হয়। আর ক্রেতা যখন (স্বেচ্ছায়) সম্পত্তি ছেড়ে দেয় অথবা আদালত শুফ্'আর রায় ঘোষণা করে এবং শফী'ও তা বুঝে নেয়, তখন তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। যখন শফী' সম্পত্তি বিক্রির কথা জানবে তখন সেখানেই শুফ্'আ দাবির আশাবাদ ব্যক্ত করে কাউকে সাক্ষী রাখবে। অতঃপর সম্পত্তি তখনো বিক্রেতার দখলে রয়ে গেলে সেখান থেকে ওঠে গিয়ে (শুফ্'আ দাবির কথা পুনঃ ব্যক্ত করে) তার বিপক্ষে নতুবা ক্রেতার বিপক্ষে সাক্ষী রাখবে। তা না হয় ভূমির নিকট উপস্থিত হয়ে সাক্ষী রাখবে। যখন শফী' তা করে নেবে তখন তার শুফ্'আর হক পাকাপোক্ত হয়ে যাবে। এখন সে (আদালতে এতদ সংক্রান্ত দাবিনামা পেশ করতে) বিলম্ব করলেও ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তা লুপ্ত হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, সাক্ষী রাখার পর যদি বিনা ওজরে তা একমাস বিলম্ব করে, তবে তার শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شُفْعَة -এর শাব্দিক অর্থ ঃ شُفْعَةٌ শব্দটি فُعْلَةٌ -এর ওযনে। اِسْم مَفْعُوْل -এর অর্থে এটাকে كَانَ الشَّيْئُ وِتْرًا فَشَفَعْتُهٗ হতে গ্রহণ করা হয়েছে। شُفْعَةٌ -এর অর্থ হল– সংযোগ করা, মিলানো। এর বিপরীত হল اَلْوِتْرُ ; আল্লাহ তা'আলা বলেন– وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ শَفَاعَت এবং টি ও شُفْعَة হতেই বের হয়েছে। কেননা সুপারিশের মাধ্যমে গুনাহগার সম্প্রদায় সৎলোকদের সাথে মিলে যায়। যেহেতু শফী مَاخُوْذٌ بِالشُّفْعَةِ -কে স্বীয় মালিকানার সাথে মিলিয়ে দেয় এজন্যই তাকে شَفِيْع বলা হয়।

شُفْعَة -এর পারিভাষিক অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায় شُفْعَة বলা হয়–

هِىَ تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ جَبْرًا عَلَى الْمُشْتَرِىْ مِمَّا قَامَ عَلَيْهِ .

অর্থাৎ ক্রেতা যে মূল্য দিয়ে ভূমি ক্রয় করেছে, সে মূল্যের বিনিময় জোর পূর্বক প্রদান করে ঐ ভূ-খণ্ডের মালিক হওয়াকে شُفْعَه বলা হয়।

اَلْعَينِى গ্রন্থে বলা হয়েছে- ضَمُّ بُقْعَةٍ مُشْتَرَاةٍ إِلَى عِقَارِ الشَّفِيْعِ بِسَبَبِ الشَّرْكَةِ أَوِ الْجِوَارِ

অর্থাৎ شِرْكَة - جِوَار -এর কারণে ক্রয়কৃত ভূ-খণ্ডকে ভূ-খণ্ডের সহিত মিলিয়ে নেয়া।

তিরমিযী শরীফের হাশিয়াতে شُفْعَة -এর সংজ্ঞা এভাবে দেয়া হয়েছে–

هِىَ عِبَارَةٌ عَنْ تَمَلُّكِ الْعِقَارِ عَلَى الْمُشْتَرِى بِمِثْلِ مَا اشْتَرَاهُ بِهِ .

অর্থাৎ ক্রেতা যে মূল্যে ভূমি ক্রয় করেছে, সে মূল্য প্রদান পূর্বক ভূ-খণ্ডের মালিকানা গ্রহণ করাকেই شُفْعَة বলা হয়।

غَايَةُ الْبَيَانِ গ্রন্থে এভাবে شُفْعَة -এর পরিচয় দেয়া হয়েছে–

اَلشُّفْعَةُ عِبَارَةٌ عَنْ حَقِّ التَّمَلُّكِ فِى الْعِقَارِ لِدَفْعِ ضَرَرِ الْجِوَارِ .

অর্থাৎ প্রতিবেশীর ক্ষতিকে বিদূরীত করার লক্ষ্যে ভূ-খণ্ডের মধ্যে মালিকানার অধিকারকেই شُفْعَة বলা হয়।

صَاحِبُ الْعِنَايَةِ বলেছেন–

اَلشُّفْعَةُ تَمَلُّكُ الْمَرْءِ مَا اتَّصَلَ بِعِقَارِهِ مِنَ الْعِقَارِ عَلَى الْمُشْتَرِى بِشِرْكَةٍ أَوْ جِوَارٍ .

অর্থাৎ ক্রেতার যে জমি তার ভূমির সাথে মিলিত তাকে جِوَار বা شِرْكَت -এর কারণে মানুষের মালিক হওয়াকে شُفْعَة বলা হয়।

اَشْرَفُ الْهِدَايَةِ তে রয়েছে– تَمَلُّكُ الْبُقْعَةِ بِمَا قَامَ عَلَيْهِ بِالشِّرْكَةِ أَوِ الْجِوَارِ .

অর্থাৎ شِرْكَة বা جِوَار -এর কারণে ক্রেতার ক্রয়কৃত মূল্য পরিশোধ করে জমির মালিক হওয়াকে شُفْعَة বলা হয়।

বিঃ দ্রঃ (ক) শুফ'আকারী ব্যক্তিকে শফী' (شَفِيْع) (খ) যে ভূমির শুফ'আ করা হয় তাকে মাশফূ (مَشْفُوْع) (গ) শফীর যে ভূমি বা বাড়ির অংশের কারণে তার এ অধিকার অর্জিত হল তাকে মাশফূ'বিহী ((مَشْفُوع بِهِ) এবং (ঘ) প্রতিবেশীকে 'জার' (جَار) বলা হয়।

শুফ'আ লাভের যৌক্তিক দিক ঃ যদি কোন লোক তার স্থাবর সম্পত্তি যেমন ভূমি অথবা বাড়ি বিক্রি করতে চায়, তবে সে সম্পত্তিতে হয়তো কতিপয় লোকের অংশীদারিত্ব রয়েছে, অথবা আনুষঙ্গিক দিক থেকে তাতে কিছু লোকের স্বার্থ জড়িত আছে, অথবা পাশে দ্বিতীয় এমন লোক রয়েছে যার সাথে বিক্রেতার সুসম্পর্ক বিদ্যমান আর তারা প্রত্যেকে পরস্পরের লাভ-লোকসান ও সুখ-দুঃখের সাথী। কিন্তু সম্পূর্ণ অপরিচিত কোন ব্যক্তি ঐ অংশ ক্রয় করলে তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভালো নাও থাকতে পারে, অথবা সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে ফলে উভয়ের ক্ষতির আশঙ্কা থাকতে পারে এবং তাতে গোটা সমাজে ভাঙ্গন ও বিশৃঙ্খলা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠতে পারে। এসব মুসলেহাত ও সুবিধাদি সামনে রেখে শরীয়ত শুফ'আ করার অনুমতি দিয়েছে। অর্থাৎ এ অনুমতি দিয়েছে যে, বিক্রেতা যে মূল্যে সম্পত্তি বিক্রি করছে উক্ত শফী' (অংশীদার বা সাথী) ইচ্ছে করলে সে মূল্যে দিয়ে ঐ সম্পত্তিটা হস্তগত করতে পারে।

اَلشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ لِلْخَلِيْطِ الخ -এর আলোচনা ঃ তিন শ্রেণীর লোক পর্যায়ক্রমে শুফ'আ -এর দাবি করতে পারে। প্রথমত সে ব্যক্তি যার বিক্রিত ভূসম্পত্তির সত্তার মধ্যে অংশীদারিত্ব রয়েছে। যেমন– হিবা বা উত্তরাধিকার সূত্রে দু'ব্যক্তি এক বিঘা জমির মালিক হলে ভাগ করার পূর্ব পর্যন্ত জমিটা তাদের যৌথ মালিকানায় রয়ে যায়। এমতাবস্থায় তাদের একজন নিজের অংশ বিক্রি করলে অপরজন তাতে শুফ'আ দাবি করার অগ্রাধিকার পাবে। কারণ সে স্বয়ং উক্ত জমির একজন অংশীদার। যদি সে শুফ'আ দাবি না করে তবে দ্বিতীয় পর্যায়ে সে ব্যক্তি শুফ'আ করার অধিকার পাবে যার উক্ত ভূমির বিভিন্ন স্বার্থ বা সুবিধাদিতে অংশীদারিত্ব রয়েছে। যেমন– উভয়ের চলাচলের পথ, একটি বা উভয়ে এক কূপ হতে পানি সেচ করে ইত্যাদি। যদি সে শুফ'আ না করে বা এ শ্রেণীর শরিকই বিদ্যমান না থাকে, তবে তৃতীয়ত প্রতিবেশী শুফ'আ করতে পারবে। অর্থাৎ ঐ জমির পাশাপাশি যার জমি অবস্থিত সে। এটা মূলত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত। কিন্তু ইমামত্রয় অর্থাৎ ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রঃ)-এর মতানুসারে প্রতিবেশী শুফ'আ দাবি করার অধিকার রাখে না।

وَاِذَا عَلِمَ الشَّفِيْعُ الخ -এর আলোচনা ঃ শুফ'আ-দাবির তিনটি পর্ব রয়েছে। **প্রথম পর্ব ঃ** নির্ভরযোগ্য সূত্রে বিক্রয় সংবাদ অবগত হওয়ার সাথে সাথে শুফ'আ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করা। এ ইচ্ছা ব্যক্ত দু'জন সাক্ষীর সামনে হলে খুবই উত্তম। পরে মামলা পরিচালনায় সাক্ষীদ্বয়ের প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। অবশ্য সাক্ষী না রাখলেও কোন দোষ নেই। একে তলবে মুওয়াছাবা (طلب مُوَاثَبه) বা তাৎক্ষণিক দাবি বলে। **দ্বিতীয় পর্ব ঃ** ক্রেতা না হয় বিক্রেতা (যদি সম্পত্তি তখনও তার দখলে থেকে থাকে) অন্যথা সম্পত্তির নিকট হাজির হয়ে দু'জন সাক্ষীর সামনে শুফ'আ দাবি করার পূর্ব ইচ্ছার কথা পুনঃ প্রকাশ করবে। একে তলবে ইশহাদ বা সাক্ষ্যমূলক দাবি নামে অভিহিত করা হয়। **তৃতীয় পর্ব ঃ** যদি দ্বিতীয় দাবির প্রেক্ষিতে ক্রেতা মূল্য নিয়ে শফী'কে সম্পত্তি দিতে রাজি হয়, তাহলে তো খুবই ভাল। অন্যথা সে এবার তৃতীয় দফায় আদালতে দাবি পেশ করবে। আর এ পর্যায়ের দাবির নাম হল তলবে খুসূমত (طلب خُصُومَت) বা প্রতিবাদমূলক আবেদন। বিভিন্ন পর্বে দাবি করার ব্যবস্থা এজন্য রাখা হয়েছে যে, উক্ত সম্পত্তি বর্তমানে পুরোপুরি ক্রেতার মালিকানায় চলে গিয়েছে। সুতরাং শুফ'আ কারকে তার মালিক হতে চাইলে ক্রেতার সদয় সম্মতি না হয় আদালতের ফয়সালা প্রয়োজন হবে।

وَالشُّفْعَةُ وَاجِبَةٌ فِي الْعِقَارِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يُقَسَّمُ كَالْحَمَّامِ وَالرَّحٰى وَالْبِئْرِ وَالدُّورِ الصِّغَارِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْبِنَاءِ وَالنَّخْلِ إِذَا بِيْعَ بِدُوْنِ الْعَرْصَةِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْعُرُوضِ وَالسُّفُنِ - وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ فِي الشُّفْعَةِ سَوَاءٌ وَإِذَا مَلَكَ الْعِقَارَ بِعِوَضٍ هُوَ مَالٌ وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ وَلَا شُفْعَةَ فِي الدَّارِ الَّتِيْ يَتَزَوَّجُ الرَّجُلُ عَلَيْهَا أَوْ يُخَالِعُ الْمَرْأَةَ بِهَا أَوْ يَسْتَاجِرُ بِهَا دَارًا أَوْ يُصَالِحُ مِنْ دَمِ عَمْدٍ أَوْ يَعْتِقُ عَلَيْهَا عَبْدًا أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا بِإِنْكَارٍ أَوْ سُكُوْتٍ فَإِنْ صَالَحَ عَنْهَا بِإِقْرَارٍ وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ -

সরল অনুবাদ ঃ স্থাবর সম্পত্তি বন্টনযোগ্য না হলেও তাতে শুফ'আ প্রাপ্য হয়, যেমন– গোসলখানা, নলকূপ, পাতিত কূপ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ি। চত্বর ব্যতীত শুধুমাত্র তার ঘর-দুয়ার ও বৃক্ষাদি বিক্রি করা হলে তাতে শুফ'আ হয় না। এবং শুফ্'আ হয় না আসবাবসামগ্রী, নৌযান (এবং অন্যান্য যানবাহনে)। শুফ্'আ অধিকারে মুসলমান-জিম্মি উভয়েই সমান। যখন কেউ স্থাবর সম্পত্তির মালিক হবে এমন কিছুর বিনিময়ে যা মাল তখনই তাতে শুফ্'আর হক হাসিল হবে (নতুবা হবে না। সুতরাং) ঐ বাড়ি যা কোন স্বামী (তার স্ত্রীকে মোহর স্বরূপ) দিয়ে বিয়ে করে বা তার বিনিময়ে স্ত্রীর সাথে খোলা করে কিংবা তার বিনিময়ে কোন বাড়ি ভাড়া নেয় অথবা তা দিয়ে ইচ্ছাকৃত খুনের ব্যাপারে সমঝোতা (সোলাহ্) করে কিংবা তার বিনিময়ে গোলাম মুক্ত করে অথবা তার (বাড়ির) ব্যাপারে বাদী পক্ষের দাবি অস্বীকার পূর্বক বা নীরব থেকে কিছু দিয়ে আপস করে নেয় তাহলে সে বাড়িতে শুফ্'আ প্রাপ্য হবে না। তবে যদি বাদী পক্ষের দাবি স্বীকার করে নিয়ে সমঝোতা করে, তাহলে শুফ্'আ প্রাপ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ الخ -এর আলোচনা ঃ যেভাবে একজন মুসলিম অপর এক মুসলিমের সাথে শুফ্'আ করে কোন সম্পত্তি হাসিল করতে পারে, তদ্রূপ ইসলামী রাষ্ট্রের একজন অমুসলিম নাগরিকও তার কোন মুসলিম প্রতিবেশীর সম্পত্তি শুফ্'আর মাধ্যমে হাসিল করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হিদায়া গ্রন্থকার যুক্তি পেশ করে বলেন যে, যেহেতু শুফ্'আর অধিকারটাই হল অসুবিধা দূর করার জন্য আর সে কারণটি মুসলিম-অমুসলিম, অনুগত-বিদ্রোহী সবার বেলায় সমান। সুতরাং অধিকারের দিক থেকেও তারা সকলে সমান হওয়া উচিত।

أَوْ يُصَالِحُ عَنْهَا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, শহীদের ভোগ দখলে থাকা একখণ্ড জমি হানীফ তার নিজের বলে দাবি করল। অপরদিকে শহীদ (বিবাদী) তা সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করল অথবা হ্যাঁ-না কিছুই না বলে নীরব রইল এবং এক পর্যায়ে হানীফ অর্থাৎ বাদী পক্ষের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তাকে দু'শ টাকা দিয়ে বিষয়টা মীমাংসা করে নিল। এক্ষেত্রে শহীদ বাহ্যত দু'শ টাকার বিনিময়ে জমিটা গ্রহণ করেছে বলে মনে হলেও তাতে শুফ্'আ করা যাবে না। কারণ পূর্বেই বলা হয়েছে যে, শহীদ হানীফের মালিকানা স্বীকার পূর্বক টাকা দেয়নি; বরং নিজের বৈধ দখলদারিত্বের ওপর তার অনর্থক হয়রানি বন্ধ করাই ছিল টাকা দেয়ার মূল উদ্দেশ্য। পক্ষান্তরে হানীফের মালিকানা স্বীকার করে নিয়ে যদি শহীদ টাকা দিয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে যে, উক্ত টাকায় সে জমিটা ক্রয় করে নিয়েছে এবং মাল দ্বারা মালের বিনিময় করেছে। কাজেই এ অবস্থায় শুফ্'আ হবে।

وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ إِلَى الْقَاضِي فَادَّعَى الشِّرَاءَ وَطَلَبَ الشُّفْعَةَ سَأَلَ الْقَاضِي الْمُدَّعَى عَلَيْهِ عَنْهَا فَإِنِ اعْتَرَفَ بِمِلْكِهِ الَّذِي يَشْفَعُ بِهِ وَإِلَّا كَلَّفَهُ بِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ فَإِنْ عَجَزَ عَنِ الْبَيِّنَةِ اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللّٰهِ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ مَالِكٌ لِلَّذِي ذَكَرَهُ مِمَّا يَشْفَعُ بِهِ فَإِنْ نَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ أَوْ قَامَتْ لِلشَّفِيعِ بَيِّنَةٌ سَأَلَهُ الْقَاضِي هَلِ ابْتَاعَ أَمْ لَا - فَإِنْ أَنْكَرَ الْاِبْتِيَاعَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ أَقِمِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا اِسْتَحْلَفَ الْمُشْتَرِيَ بِاللّٰهِ مَا ابْتَاعَ أَوْ بِاللّٰهِ مَا يَسْتَحِقُّ عَلَى هٰذِهِ الدَّارِ شُفْعَةً مِنَ الْوَجْهِ الَّذِي ذَكَرَهُ -

সরল অনুবাদ ঃ যখন শফী' আদালতে হাজির হয়ে (কারো সম্পর্কে মাশফূ' সম্পত্তি) খরিদের দাবি করে শুফ্'আ প্রার্থনা করবে, তখন কাজি বিবাদীকে সে সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করবেন। বিবাদী যদি মাশফূ'বিহীর মধ্যে বাদীর (শফী'র) মালিকানার কথা স্বীকার করে নেয়, তবে তো খুবই ভালো। তা না হলে তাকে (বাদী) আপন মালিকানা প্রমাণ করার জন্য নির্দেশ দেবে। যদি সে প্রমাণ দানে ব্যর্থ হয়, তবে তিনি ক্রেতা (বিবাদী) থেকে হলফ নেবেন। ক্রেতা বলবে, আল্লাহর কসম! আমার জানা নেই শফী' ঐ সম্পত্তির মালিক কি-না, যা সে উল্লেখ করেছে এবং যার মাধ্যমে সে শুফ্'আ দাবি করতেছে। কিন্তু যদি সে হল্ফ থেকে বিরত থাকে কিংবা শফী'র জন্য প্রমাণ মিলে যায়, (এবং এভাবে মাশফূ'বিহীর মধ্যে শুফ্'আকারের মিলকিয়ত সাব্যস্ত হয়) তাহলে তিনি এবার তাকে (বিবাদীকে) জিজ্ঞাসা করবেন সে (মাশফূ' সম্পত্তি) খরিদ করেছে কি-না। যদি সে খরিদ করার কথা অস্বীকার করে, তাহলে শফী'কে এতদ্বিষয়ে প্রমাণ দানের জন্য বলা হবে। যদি সে প্রমাণ দানে ব্যর্থ হয়, তবে ক্রেতা থেকে হলফ নেয়া হবে। ক্রেতা বলবে "আল্লাহর শপথ! আমি (মাশফূ'ভূমি) ক্রয় করিনি।" অথবা বলবে, "আল্লাহর শপথ! শফী' যে প্রেক্ষিতে এ বাড়িতে শুফ্'আ লাভের দাবি উত্থাপন করেছে উক্ত প্রেক্ষিতে সে শুফ্'আ পেতে পারে না।"

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا تَقَدَّمَ الشَّفِيعُ الخ -এর আলোচনা ঃ বিচারক কি নিয়মে শুফ্'আ মামলার শুনানি গ্রহণ করবেন এখানে সে কথাই আলোচনা করা হয়েছে। কাজি বা বিচারককে এ মামলায় দু'টি বিষয়ের সত্যতা যাচাই করে দেখতে হবে– (এক) মাশফূ'বিহী সম্পত্তিতে শুফ্'আ কারের স্বামীত্ব ছিল কি-না বা আছে কিনা? (দুই) বিবাদী মাশফূ' সম্পত্তি কোন মালের বিনিময় সূত্রে হাসিল করেছে কি-না? সে মতে সর্বপ্রথম বিবাদীকে মাশফূ'বিহী সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে অর্থাৎ মাশফূ' সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের সময় মাশফূ'বিহী সম্পত্তিতে শফী'র মালিকানা ছিল কি-না? যদি বিবাদীর স্বীকারোক্তি কিংবা শফী' প্রদত্ত প্রমাণের মাধ্যমে মালিকানা ছিল বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজি মাশফূ' সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের বিষয়টির বাস্তবতা কতটুকু তা খতিয়ে দেখবেন অর্থাৎ বিবাদীকে জিজ্ঞাসা করবেন সে আসলেই মাশফূ' সম্পত্তি ক্রয় করেছে কি-না? বাদীর প্রমাণ পেশ কিংবা বিবাদীর হলফের মাধ্যমে যখন ক্রয়-বিক্রয় হয়েছে বলে পাকা-পাকিভাবে প্রমাণিত হবে, তখন কাজি শুফ্'আর রায় ঘোষণা করবেন।

وَتَجُوزُ الْمُنَازَعَةُ فِي الشُّفْعَةِ وَإِنْ لَمْ يَحْضُرِ الشَّفِيعُ الثَّمَنَ إِلَى مَجْلِسِ الْقَاضِي وَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِالشُّفْعَةِ لَزِمَهُ إِحْضَارُ الثَّمَنِ وَلِلشَّفِيعِ أَنْ يَرُدَّ الدَّارَ بِخِيَارِ الْعَيْبِ وَالرُّؤْيَةِ وَإِنْ أَحْضَرَ الشَّفِيعُ الْبَائِعَ وَالْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يُخَاصِمَهُ فِي الشُّفْعَةِ وَلَا يَسْمَعُ الْقَاضِي الْبَيِّنَةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي فَيَفْسَخُ الْبَيْعَ بِمَشْهَدٍ مِنْهُ وَيَقْضِي بِالشُّفْعَةِ عَلَى الْبَائِعِ وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ শফী' যদি কাজির দরবারে (মাশফূ' সম্পত্তির) দাম সঙ্গে করে নাও আনে তথাপি শুফ্'আ মামলার জেরা অনুষ্ঠিত হতে পারে। কিন্তু কাজি যখন তার জন্য শুফ্'আর রায় দিয়ে দেবেন তখন অবশ্যই তাকে দাম হাজির করতে হবে। মশফূ' সম্পত্তিতে কোনরূপ দোষ-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে কিংবা তা না দেখে নিয়ে থাকলে শফী' তা ফেরত দিতে পারবে। যদি ক্রয়কৃত সম্পত্তি বিক্রেতার দখলে রয়ে যাওয়া অবস্থায় শফী' বিক্রেতাকে (আসামী করে আদালতে) হাজির করে, তবে তার সাথেও শুফ্'আ মামলায় জেরা করতে পারে। তবে ক্রেতা হাজির না হওয়া পর্যন্ত বিচারক প্রমাণাদির শুনানী গ্রহণ করবেন না। অতঃপর তিনি (শুনানী গ্রহণ পূর্বক) ক্রেতার উপস্থিতিতে বিক্রয়-চুক্তি বাতিল করে দিয়ে বিক্রেতার বিপক্ষে শুফ্'আর রায় প্রদান করবেন এবং (লেনদেনের সকল) দায়-দায়িত্বও তার ওপর অর্পণ করবেন।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

حَتَّى يَحْضُرَ الْمُشْتَرِي الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সম্পত্তি বিক্রেতার দখলে রয়ে গেলেও মালিকানা কিন্তু ক্রেতার। কাজেই ক্রয়-চুক্তি বাতিল করতে হলে ক্রেতার উপস্থিতি একান্তই জরুরি।

وَيَجْعَلُ الْعُهْدَةَ عَلَيْهِ -এর আলোচনা ঃ এখানে দায়-দায়িত্ব বলতে ক্রয়কৃত ভূমি ও মূল্যের লেনদেন এবং পরবর্তীকালে উক্ত ভূমির মধ্যে কেউ নিজের মালিকানা বা অংশীদারিত্ব দাবি করলে অথবা তাতে কোনরূপ দোষ-ত্রুটি ধরা পড়লে বা অন্য কোন অসুবিধা দেখা দিলে তা সমাধানের সমস্ত দায়-দায়িত্ব বিক্রেতার ওপর বর্তাবে।

وَاِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الْاِشْهَادَ حِينَ عَلِمَ بِالْبَيْعِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى ذٰلِكَ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَكَذٰلِكَ اِنْ اَشْهَدَ فِى الْمَجْلِسِ وَلَمْ يُشْهِدْ عَلٰى اَحَدِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا عِنْدَ الْعَقَارِ وَاِنْ صَالَحَ مِنْ شُفْعَتِهِ عَلٰى عِوَضٍ اَخَذَهُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ وَيَرُدُّ الْعِوَضَ وَاِذَا مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَاِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِىْ لَمْ تَسْقُطِ الشُّفْعَةُ وَاِنْ بَاعَ الشَّفِيعُ مَا يُشْفَعُ بِهِ قَبْلَ اَنْ يُقْضٰى لَهُ بِالشُّفْعَةِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ وَ وَكِيلُ الْبَائِعِ اِذَا بَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَكَذٰلِكَ اِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرْكَ عَنِ الْبَائِعِ وَ وَكِيلُ الْمُشْتَرِىْ اِذَا ابْتَاعَ وَهُوَ الشَّفِيعُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ۔

সরল অনুবাদ ঃ বিক্রয় সংবাদ জানার পর শফী' যদি (শুফ্'আ গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ পূর্বক সাক্ষী রাখার মাধ্যমে) তলবে মুওয়াছাবা (তাৎক্ষণিক দাবি উত্থাপন) থেকে বিরত থাকে অথচ সে তা করতে সক্ষম ছিল, তাহলে তার শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। একইভাবে শুফ্'আ বাতিল হবে যদি সে তলবে মুওয়াছাবা করার পর ক্রেতা-বিক্রেতা বা সম্পত্তির পাশে তলবে ইশহাদ না করে। শফী' যদি (ক্রেতা বা বিক্রেতা থেকে) কিছু বিনিময় গ্রহণ পূর্বক শুফ্'আর দাবি ছেড়ে দেয়ার ব্যাপারে সন্ধি চুক্তি করে, তবে শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে এবং গৃহীত বিনিময় ফিরিয়ে দেবে। (শুফ্'আর রায় ঘোষণার পূর্বে) যদি শফী' মারা যায়, তাহলে শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু ক্রেতা (বা বিক্রেতা) মারা গেলে শুফ্'আ বাতিল হবে না। শফী'র জন্য শুফ্'আর রায় হওয়ার পূর্বেই যদি সে তার মাশফূ'বিহী সম্পত্তি বিক্রি করে দেয়, তাতেও শুফ্'আ বাতিল হয়ে যাবে। বিক্রেতার উকিল হয়ে যে ব্যক্তি (সম্পত্তি) বিক্রি করল, সে নিজেই যদি (উক্ত সম্পত্তির) বেচাকেনা সম্পর্কীয় কোন বিষয়ের শুফ্'আকার হয়, তবে তার শুফ্'আ প্রাপ্য হবে না। একইভাবে যদি শফী' বিক্রেতার পক্ষে দারকের জামিন হয়। পক্ষান্তরে ক্রেতার উকিল হয়ে যে সম্পত্তি খরিদ করল সে নিজেই যদি (উক্ত সম্পত্তির) শুফ্'আকার হয়, তবে তার জন্য শুফ্'আ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا تَرَكَ الشَّفِيعُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ গুরুতর কোন ওজর না থাকলে শফী'র জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বের দাবি উত্থাপন করা অলজ্ঘনীয় কর্তব্য। সুতরাং কোন শফী' যদি দু'দফা দাবির কোন দফাই না করে কিংবা কোন এক দফা করেই নিবৃত্ত হয়, তবে সে শুফ্'আ হাসিলের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ এটা একটা দুর্বল অধিকার, এ জন্য প্রয়োজন জোর তৎপরতা চালানো।

وَاِذَا مَاتَ الْمُشْتَرِىْ الخ -এর আলোচনা ঃ شَفِيع যদি شُفْعَة গ্রহণের পূর্বেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে, তবে شُفْعَة বাতিল হয়ে যাবে। আর যখন ক্রেতা মারা যাবে, তখন شُفْعَة বাতিল হবে না। ইমাম শাফেরী (রঃ)-এর নিকট شَفِيع মরে গেলেও شُفْعَة বাতিল হয় না; বরং তা مَوْرُوْث হয়।

আমরা হানাফীগণ বলি যে, شُفْعَة তো حَقِّ تَمَلُّك (মালিকানার অধিকার)-এর নাম। কাজেই যার অধিকার সেই যদি মৃত্যুবরণ করে, তবে তা আর বাকি থাকে না। কাজেই এর মধ্যে وِرَاثَت জারি হবে না। আর مُشْتَرِى মৃত্যুবরণ করলে شُفْعَة বাতিল না হওয়ার কারণ হল شُفْعَة-এর হকদার তো شَفِيع কাজেই ثُبُوْت شُفْعَه-এর হুকুমের পূর্বেই যদি বিক্রি করে দেয়, তবে شُفْعَة বাতিল হয়ে যাবে। কেননা মালিকানার পূর্বেই اِسْتِحْقَاق-এর কারণ শেষ হয়ে গেছে।

وَيَرُدُّ الْعِوَضَ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা কিছু আর্থিক সুবিধা নিয়ে শুফ'আ দাবি ছেড়ে দেয়ার প্রস্তাবে রাজি হলে প্রমাণিত হয় যে, শফী' শুফ'আ গ্রহণে আগ্রহী নয় এবং শুফ'আ করার তেমন দরকার তার নেই। অপর দিকে 'দাবি প্রত্যাহার' যেহেতু মালের মধ্যে গণ্য নয় সে কারণে এর বিপরীতে গৃহীত বিনিময়ও শফী'র জন্য বৈধ হতে পারে না।

وَكِيلُ الْبَائِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, একটি বাড়ির মধ্যে তিন ব্যক্তির যৌথ মালিকানা রয়েছে। এক্ষেত্রে তাদের একজন যদি নিজের অংশ বিক্রি করে দেয়ার জন্য দ্বিতীয় জনকে উকিল বানায় এবং সে তা বিক্রিও করে দেয়, তখন এ উকিল প্রথম স্তরের শফী' হওয়া সত্ত্বেও বিক্রিত অংশে শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। কারণ বিক্রির সাথে শুফ'আর বৈপরীত্ব রয়েছে। বিক্রি দ্বারা বস্তুর প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ পায়, পক্ষান্তরে শুফ'আ দাবি উক্ত জিনিসের প্রতি আগ্রহের কথাই প্রমাণ করে। এক কথায় উকিল যে সম্পত্তিকে শুফ'আ দাবি করতে পারে সে সম্পত্তি তারই হাতে বিক্রি হওয়া শুফ'আ দাবি ছেড়ে দেয়ার শামিল। আর একবার দাবি ছেড়ে দেয়ার পর পুনরায় তা করার অবকাশ শুফ'আর ক্ষেত্রে নেই।

إِنْ ضَمِنَ الشَّفِيعُ الدَّرَكَ الخ -এর আলোচনা ঃ ক্রয়কৃত সম্পত্তির দখল ও মালিকানায় পরবর্তীতে কোন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হওয়াকে 'দারক' বলে। সম্পত্তি ক্রয়ে ক্রেতাকে আগ্রহী করা বা অভয় দানের উদ্দেশ্যে দারকের জামিন হওয়া জায়েয আছে। আলোচ্য মাসআলায় তার উদাহরণ হল যেমন– মাশফূ' সম্পত্তির ক্রেতাকে প্রতিবেশী জমির মালিক বলল, যদি এ জমিতে কেউ মালিকানা বা অংশীদারিত্ব দাবি করে দখল প্রতিষ্ঠা করতে আসে কিংবা আপনার দখলে বাধা দেয়, তবে এর উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আপনি আমার কাছ থেকে নেবেন। এমতাবস্থায় জামিনদার এ প্রতিবেশী যদি উক্ত জমিতে শুফ'আ দাবি করতে চায়, তবে সে দাবি অগ্রহণীয় হবে।

وَكِيلُ الْمُشْتَرِي الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ ক্রয় ও শুফ'আ করার মূল আবেদন ও ভাবধারা এক ও অভিন্ন। শুফ'আ দাবির মাধ্যমে যেমন সম্পত্তি নিজ কব্জায় আনা হয় তেমনি ক্রয়ের মাধ্যমেও তা কব্জায়ই আনা হয়।

وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيْعِ فَإِنْ أَسْقَطَ الْبَائِعُ الْخِيَارَ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ وَإِنِ اشْتَرٰى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ وَمَنِ ابْتَاعَ دَارًا شِرَاءً فَاسِدًا فَلَا شُفْعَةَ فِيْهَا وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ الْفَسْخُ - فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ وَإِذَا اشْتَرَى الذِّمِّيُّ دَارًا بِخَمْرٍ أَوْ خِنْزِيْرٍ وَشَفِيْعُهَا ذِمِّيٌّ أَخَذَهَا بِمِثْلِ الْخَمْرِ أَوْ قِيْمَةِ الْخِنْزِيْرِ وَإِنْ كَانَ شَفِيْعُهَا مُسْلِمًا أَخَذَهَا بِقِيْمَةِ الْخَمْرِ وَالْخِنْزِيْرِ وَلَا شُفْعَةَ فِي الْهِبَةِ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ بِعِوَضٍ مَشْرُوْطٍ -

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি খেয়ারে-শর্তের ভিত্তিতে সম্পত্তি বিক্রি করল তাতে শফী'র জন্য শুফ্'আ প্রাপ্য হবে না। অতঃপর যদি বিক্রেতা খেয়ার তুলে নেয়, তাহলে শুফ্'আর হক সাব্যস্ত হবে। (পক্ষান্তরে) যদি কেউ খেয়ারে-শর্তের সাথে সম্পত্তি ক্রয় করে, তাহলে তাতে শুফ্'আ হবে। ফাসিদ নিয়মে কেউ বাড়ি ক্রয় করলে তাতে শুফ্'আ হয় না। এক্ষেত্রে ক্রেতা-বিক্রেতা প্রত্যেকেই বিক্রয়-চুক্তি ভেঙ্গে ফেলতে পারে। কিন্তু (কোন কারণে) যদি রহিত করার পথ বন্ধ হয়ে যায়, তবে শুফ্'আ প্রাপ্য হবে। যদি জিম্মি (ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক) মদ বা শূকরের বিনিময়ে বাড়ি ক্রয় করে আর এর শুফ্'আকারও একজন জিম্মি হয়, তাহলে সে সমপরিমাণ মদ বা শূকরের মূল্য দিয়ে শুফ্'আ গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি শফী' মুসলমান হয়, তবে (যথাক্রমে) মদ ও শূকরের মূল্যের বিনিময়ে শুফ্'আ নেবে। হিবাকৃত সম্পত্তিতে শুফ্'আ নেই। কিন্তু কোন বিনিময় লাভের শর্তে হিবা করা হলে তাতে শুফ্'আ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ بَاعَ بِشَرْطِ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ বিক্রেতার খেয়ারে-শর্ত থাকা অবস্থায় বিক্রি পাকা-পাকি হয় না বিধায় সম্পত্তি তারই মালিকানাধীন থেকে যায়। অথচ শুফ্'আ-অধিকার লাভের প্রধান শর্ত হচ্ছে বিক্রেতার পক্ষ থেকে বিক্রয় পাকা-পাকি হওয়া এবং সম্পত্তিও তার অধিকারমুক্ত হওয়া। পক্ষান্তরে ক্রেতার জন্য খেয়ারে-শর্ত রাখা হলে সম্পত্তি বিক্রেতার মালিকানামুক্ত হতে কোন ধরনের বাধা থাকে না।

فَإِنْ سَقَطَ الْفَسْخُ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কোন কারণে যদি ক্রয়-বিক্রয়ের ফাসিদ চুক্তি বাতিল করার পথ বন্ধ হয়ে যায়, যেমন– ক্রেতা নিয়ে সম্পত্তিটা অন্যত্র বিক্রি করে দিল, তবে শুফ্'আ প্রাপ্য হবে। কেননা তখন প্রথম বিক্রেতা ও ক্রেতা কারোই উক্ত ফাসিদ কারবার ফস্খ করার অধিকার অবশিষ্ট থাকে না। ফলে পূর্ব বিক্রয় আরো দৃঢ় হয় এবং শুফ্'আ করা যায়। পক্ষান্তরে যতক্ষণ পর্যন্ত বাতিল করার অবকাশ বিদ্যমান থাকে, ততক্ষণ ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের প্রতি শরীয়তের নির্দেশ হল চুক্তি ভেঙে ফেলা। এমতাবস্থায় শুফ্'আ করার অধিকার দেয়া হলে তার অর্থ হবে ফস্খ করার সুযোগ বন্ধ করে দিয়ে ফাসাদকে আরো দৃঢ় করে তোলা। সুতরাং কোন সম্পত্তির বিক্রয় ফাসিদ সাব্যস্ত হলে তাতে শুফ্'আ হাসিল না হওয়া নিতান্তই যুক্তিসঙ্গত।

وَإِذَا اخْتَلَفَ الشَّفِيْعُ وَالْمُشْتَرِىْ فِى الثَّمَنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِىْ فَإِنْ اَقَامَا الْبَيِّنَةَ فَالْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الشَّفِيْعِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى الْبَيِّنَةُ بَيِّنَةُ الْمُشْتَرِىْ وَإِذَا ادَّعَى الْمُشْتَرِىْ ثَمَنًا اَكْثَرَ وَادَّعَى الْبَائِعُ اَقَلَّ مِنْهُ وَلَمْ يَقْبِضِ الثَّمَنَ اَخَذَهَا الشَّفِيْعُ بِمَا قَالَ الْبَائِعُ وَكَانَ ذٰلِكَ حَطًّا عَنِ الْمُشْتَرِىْ وَإِنْ كَانَ قَبَضَ الثَّمَنَ اَخَذَهَا بِمَا قَالَ الْمُشْتَرِىْ وَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلٰى قَوْلِ الْبَائِعِ وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ عَنِ الْمُشْتَرِىْ بَعْضَ الثَّمَنِ يَسْقُطُ ذٰلِكَ عَنِ الشَّفِيْعِ وَإِنْ حَطَّ عَنْهُ جَمِيْعَ الثَّمَنِ لَمْ يَسْقُطْ عَنِ الشَّفِيْعِ وَإِذَا زَادَ الْمُشْتَرِىْ لِلْبَائِعِ فِى الثَّمَنِ لَمْ تَلْزَمِ الزِّيَادَةُ لِلشَّفِيْعِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি (মাশফূ' সম্পত্তির) দাম নিয়ে ক্রেতা এবং শফী' মতবিরোধ করে (এবং কারো পক্ষে কোন প্রমাণ না থাকে) তাহলে ক্রেতার কথা অগ্রাধিকার পাবে (তার হলফসহ)। কিন্তু যদি উভয়ে (নিজ নিজ দাবির পক্ষে) প্রমাণ পেশ করে, তবে ইমাম তরফাইন (রঃ)-এর মতে, শফী'র প্রমাণ প্রাধান্য পাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, ক্রেতার প্রমাণ প্রাধান্য পাবে। যদি (মাশফূ' সম্পত্তির) দাম ক্রেতা অধিক দাবি করে আর বিক্রেতা বলে তারচেয়ে কম অথচ সে তখনো দাম করায়ত্ত করেনি, তাহলে শফী' বিক্রেতার কথা মতো দাম দিয়ে শুফ'আ নেবে। আর এটা হবে ক্রেতাকে দামের কিছু অংশ ছাড় দেয়ার অন্তর্ভুক্ত। আর যদি দাম করায়ত্ত করে থাকে, তাহলে শফী' ক্রেতার কথামতো দাম দিয়ে শুফ'আ গ্রহণ করবে; বিক্রেতার কথা বিবেচনায় আনবে না। বিক্রেতা যখন ক্রেতাকে দামের কিছু অংশ ছেড়ে দেবে, তখন শফী'র জিম্মা থেকেও সেপরিমাণ বিয়োগ হয়ে যাবে (অর্থাৎ মূল্য ছাড়ের সুবিধা শফী'ও ভোগ করবে)। পক্ষান্তরে যদি পুরো দাম ছেড়ে দেয়, তাহলে শফী'র জিম্মা থেকে দামের কিছু মাত্র হ্রাস পাবে না। যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে ধার্যকৃত দামের অতিরিক্ত দেয়, তবে এই অতিরিক্ত অংশ শফী'র জিম্মায় বর্তাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا اخْتَلَفَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ মাশফূ' সম্পত্তির খরিদামূল্য নিয়ে যদি শফী' ও ক্রেতার মধ্যে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং ক্রেতা-সম্পত্তির ক্রয়কৃত মূল্য এক রকম আর শফী' অন্যরকম দাবি করে এবং কারো কাছেই স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকে, তবে ক্রেতা হলফ করে যা বলবে তাই ধর্তব্য হবে। কেননা সে হল মুনকির, আর বাদীপক্ষ প্রমাণ দানে ব্যর্থ হলে মুনকির তথা বিবাদীর কথাই তার হলফের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার পায়। পক্ষান্তরে যদি কোন এক পক্ষের নিকট প্রমাণ থাকে, তবে সে মোতাবেক রায় দেয়া হবে। আর যদি উভয়ের নিকট প্রমাণ বিদ্যমান থাকে, তবে ইমাম তরফাইনের মতে শফী'র প্রমাণ প্রাধান্য পাওয়ার ভিত্তিতে বিবেচনা করা হবে এবং তদনুযায়ী ফয়সালা দেয়া হবে।

إِلٰى قَوْلِ الْبَائِعِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** কারণ বিক্রেতা মূল্য নিয়ে নেয়ার পর তৃতীয় ব্যক্তিতে পরিণত হয়; আর মূল্যের ব্যাপারে তৃতীয় পক্ষের কোন দখলদারিত্ব কখনোই চলে না।

وَإِذَا حَطَّ الْبَائِعُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ক্রয়-বিক্রয় পাকা-পাকি হওয়ার পর যদি বিক্রেতা মূল্যের হিসাব থেকে কিছু ছেড়ে দেয়, তবে এ সুবিধা শফী' ও ভোগ করতে পারবে। কিন্তু পুরো দাম ছেড়ে দিলে শফী' বিনা দামে শুফ'আ গ্রহণের অধিকার পাবে না। কেননা পূর্ণদাম ছাড়ের হিসাব শফী'-এর বেলায় আনা হলে তা দু'অবস্থা থেকে খালি নয়– হয়তো বলতে হবে বিক্রেতা বিক্রয়-চুক্তি বাতিল করে তা হিবা চুক্তিতে পরিণত করেছে, না হয় বলতে হবে সে বিনা মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে। আর বিনা মূল্যে বিক্রি করা হলে তা ফাসিদ বিক্রির মধ্যে গণ্য হয় এবং তাতে শুফ'আর হক হাসিল হয় না। সুতরাং বুঝা গেল পূর্ণ দাম-ছাড়ের হিসাব শফী'র বেলায়ও প্রয়োগ করতে চাইলে শুফ'আ দাবির ক্ষেত্রই বিনষ্ট হয়ে যাবে।

وَإِذَا اجْتَمَعَ الشُّفَعَاءُ فَالشُّفْعَةُ بَيْنَهُمْ عَلَى عَدَدِ رُؤُسِهِمْ وَلَا يُعْتَبَرُ بِاخْتِلَافِ الْأَمْلَاكِ وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا بِعَوْضٍ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِقِيمَتِهِ وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِمَكِيلٍ أَوْ مَوْزُوْنٍ أَخَذَهَا بِمِثْلِهِ وَإِنْ بَاعَ عِقَارًا بِعِقَارٍ أَخَذَ الشَّفِيعُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقِيمَةِ الْآخَرِ وَإِذَا بَلَغَ الشَّفِيعُ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَلْفٍ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِأَقَلَّ مِنْ ذٰلِكَ أَوْ بِحِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ قِيمَتُهَا أَلْفٌ أَوْ أَكْثَرُ فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ وَلَهُ الشُّفْعَةُ وَإِنْ بَانَ أَنَّهَا بِيعَتْ بِدَنَانِيرَ قِيمَتُهَا أَلْفٌ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ فَسَلَّمَ الشُّفْعَةَ ثُمَّ عَلِمَ أَنَّهُ غَيْرُهُ فَلَهُ الشُّفْعَةُ وَمَنْ اشْتَرَى دَارًا لِغَيْرِهِ فَهُوَ الْخَصْمُ فِي الشُّفْعَةِ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَهَا إِلَى الْمُؤَكِّلِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ যদি (কোন সম্পত্তিতে একই স্তরের) কয়েকজন শফী' একত্রিত হয়ে পড়ে (এবং সকলে শুফ'আ দাবি করে) তবে তাদের মাঝে মাথা হারে শুফ'আ বন্টিত হবে; মাশফূ'বিহীতে মালিকানার পার্থক্য ধর্তব্য হবে না। আসবাবপত্রের বিনিময়ে কেউ বাড়ি ক্রয় করলে শফী' সেই আসবাবপত্রের বাজার মূল্যে শুফ'আ গ্রহণ করবে। আর যদি কায়লী কিংবা ওজনী দ্রব্যের বিনিময়ে ক্রয় করে, তাহলে সমপরিমাণ সেই দ্রব্য দিয়ে শুফ'আ গ্রহণ করবে। কিন্তু যদি কেউ ভূমির বিনিময়ে ভূমি বিক্রি করে, তাহলে প্রত্যেক ভূমির শফী' অপর ভূমির বাজার মূল্য দিয়ে শুফ'আ নেবে। শফী'র নিকট যদি সংবাদ পৌঁছে যে, সম্পত্তি এক হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে, ফলে তাতে শুফ'আর দাবি ছেড়ে দেয় অতঃপর জানতে পারে যে, তদপেক্ষা কমে অথবা এমন কিছু গম বা যবের বিনিময়ে বিক্রি হয়েছে যার দাম এক হাজার টাকা বা তার চেয়ে বেশি, তাহলে তার এ প্রত্যাখ্যান বাতিল গণ্য হবে এবং (পুনরায় সে) শুফ'আ দাবি করতে পারবে। আর যদি জানা যায় যে, তা এমন কিছু দিনারে বিক্রি হয়েছে যার মূল্য এক হাজার টাকা, তবে তার জন্য (পুনরায়) শুফ'আ হবে না। যখন শফী'কে বলা হয় মশফূ' সম্পত্তির ক্রেতা অমুক ব্যক্তি, তখন সে শুফ'আ ছেড়ে দিল অতঃপর জানতে পারল যে ক্রেতা অন্য কেউ, তাহলে তার জন্য (পুনঃ) শুফ'আ হবে। যে ব্যক্তি অন্য কারো জন্য (উকিল হয়ে) বাড়ি ক্রয় করল, তবে মুয়াক্কেলকে তা বুঝিয়ে না দেয়া পর্যন্ত সে-ই শুফ'আর ব্যাপারে প্রতিপক্ষ সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَى عَدَدِ رُؤُسِهِمْ الخ -এর আলোচনা ঃ মনে করুন ১৫ কাঠা ভূমিতে দুই ভাই ও এক বোন মিলে শরিক। তাতে দুই ভাই-এর অংশ ৬ কাঠা করে ১২ কাঠা আর বোনের অংশ হল বাকি ৩ কাঠা। এ স্থলে এক ভাই যদি নিজের অংশ বিক্রি করে দেয়, তবে অপর ভাই ও বোন এই বিক্রিত অংশে সমান হারে শুফ'আ পাবে। অর্থাৎ ভাই-বোন উভয়ে আধাআধি করে শুফ'আ পেয়ে যাবে। মাশফূ'বিহীতে বোনের অংশ ৩ কাঠা বলে সে $\frac{১}{৩}$ অংশ অর্থাৎ ২ কাঠা আর অপর ভাইয়ের অংশ ৬ কাঠা বলে সে $\frac{২}{৩}$ অংশ অর্থাৎ ৪ কাঠা শুফ'আ পাবে এমনটি হবে না।

فَتَسْلِيمُهُ بَاطِلٌ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ এমনও তো হতে পারে যে, মূল্য এক হাজার টাকার কম হলে শফী'র পক্ষে শুফ'আ নেয়া সম্ভব ছিল অথবা নগদ এক হাজার টাকা দেয়ার সাধ্য তার নেই বটে কিন্তু সমমূল্যের পণ্য দেয়া তার জন্য মোটেই কষ্টকর ছিল না।

وَإِنْ بَانَ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ দিনার মুদ্রারই এক শ্রেণী বিধায় তাকে দিরহামে ভাঙানো কঠিন কাজ নয়। পক্ষান্তরে অন্যান্য দ্রব্যসামগ্রীকে বাজারজাত করে টাকায় রূপান্তরিত করা অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে।

أَنَّ الْمُشْتَرِيَ فُلَانٌ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা মানবীয় বৈশিষ্ট্য, কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে পৃথিবীর সকল মানুষ সমান নয়। একজনকে হিতাকাঙ্ক্ষী মনে করে তার সান্নিধ্য কামনা করা হলেও অন্য জনকে দুশমন ভেবে দূরত্ব বজায় রাখা হয়। সে কারণে পূর্বোক্ত ব্যক্তিকে শফী' হয়তো নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী ভেবে খুশি হয়েছিল এবং শুফ'আ বর্জন করেছিল। কিন্তু শেষোক্ত ব্যক্তির নাম শুনে তাকে অবাঞ্ছিত মনে হওয়ায় শুফ'আ করা জরুরি মনে করে থাকবে।

فَهُوَ الْخَصْمُ فِي الشُّفْعَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ خَصْم অর্থ-বিবাদী, প্রতিপক্ষ ও জেরাকার। এখানে উকিল প্রতিপক্ষ হওয়ায় শুফ'আ সংক্রান্ত যাবতীয় দেন-দরবার উকিলের সাথেই সমাধা করতে হবে।

وَإِذَا بَاعَ دَارًا إِلَّا مِقْدَارَ ذِرَاعٍ فِي طُولِ الْحَدِّ الَّذِي يَلِي الشَّفِيعَ فَلَا شُفْعَةَ لَهُ وَإِنْ بَاعَ مِنْهَا سَهْمًا بِثَمَنٍ ثُمَّ ابْتَاعَ بَقِيَّتَهَا فَالشُّفْعَةُ لِلْجَارِ فِي السَّهْمِ الْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي وَإِذَا ابْتَاعَهَا بِثَمَنٍ ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا عِوَضًا عَنْهُ فَالشُّفْعَةُ بِالثَّمَنِ دُونَ الثَّوْبِ وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ فِي إِسْقَاطِ الشُّفْعَةِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى تُكْرَهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি বাড়ি বিক্রি করে তার ঐ প্রান্তের দৈর্ঘ্য থেকে এক হাত বাদ রেখে যা শফী'র (মাশফূ'বিহী সম্পত্তির) সাথে মিলিত, তবে তাতে শুফ্'আ প্রাপ্য হবে না। যদি ক্রেতা প্রথমে সম্পত্তির কিছু অংশ (উচ্চ) মূল্যে ক্রয় করে নেয় অতঃপর বাকি অংশ ক্রয় করে তাহলে প্রতিবেশীর জন্য প্রথমাংশে শুফ্'আ হবে; পরবর্তী অংশে নয়। যদি (উচ্চ বাকি) দামে ক্রয় করার পর ক্রেতা মালিককে উক্ত দামের পরিবর্তে একটা কাপড় দিয়ে দেয় তাহলে ঐ দামের বিনিময়ে শুফ্'আ নেয়া যাবে; কাপড়ের বিনিময়ে নয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, শুফ্'আ বাঞ্চাল করার উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করা মাকরূহ নয়। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, মাকরূহ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ بَاعَ مِنْهَا سَهْمًا الخ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন– দশ শতক মাশফূ' সম্পত্তির মূল্য যদি এক হাজার টাকা হয়, তাহলে এর সীমান্ত বরাবর এক দশমাংশ (যা মাশফূ'বিহী সম্পত্তির সাথে মিলিত) নয় শত টাকা দাম স্থির করে প্রথমে বিক্রি করে দেবে। অতঃপর অবশিষ্ট নয়-দশমাংশ একশ' টাকায় বিক্রি করবে। শফী' প্রথম দশমাংশে শুফ্'আ করার আইনত অধিকারী হলেও উচ্চ মূল্যের কারণে স্বভাবতই তা থেকে বিরত থাকবে। অবশিষ্ট নয়-দশমাংশে স্বয়ং ক্রেতা প্রথম শ্রেণীর শফী' সাব্যস্ত হওয়ায় আগের শফী' (যে মূলত প্রতিবেশী পর্যায়ের শফী' ছিল) অপেক্ষা অগ্রাধিকার পাবে। কাজেই আগের শফী' তাতে শুফ্'আ করতে পারবে না। এটা হল শুফ্'আ ভণ্ডুলের দ্বিতীয় কৌশল।

ثُمَّ دَفَعَ إِلَيْهِ ثَوْبًا الخ **-এর আলোচনা ঃ** যেমন– ক্রেতা বাড়ির ন্যায্য দাম ১০০ (একশত) টাকার স্থলে ১০০০ (এক হাজার) টাকা স্থির করল এবং বিক্রেতাকে এক হাজার টাকা না দিয়ে তার পরিবর্তে একশত টাকা মূল্যের একটি কোর্তা দিয়ে দিল, এমতাবস্থায় শফী' শুফ্'আ নিতে চাইলে এক হাজার টাকায় নিতে হবে; কোর্তার বিনিময়ে নিতে পারবে না। এটা হল শুফ্'আ বাঞ্চালের তৃতীয় কৌশল।

وَلَا تُكْرَهُ الْحِيلَةُ الخ **-এর আলোচনা ঃ** শফী'কে শুফ্'আ থেকে বঞ্চিত করার জন্য হীলা (সূক্ষ্ম উপায়) অবলম্বন করা জায়েয কি না সে বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, তা মাকরূহ। কারণ এতে শফী'কে নবাগত প্রতিবেশী কর্তৃক সৃষ্ট অসুবিধা সহ্য করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আর ইচ্ছা পূর্বক অন্যের ওপর কষ্ট চাপানো কিছুতেই ভালো কাজের মধ্যে গণ্য হতে পারে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতানুসারে হীলা মাকরূহ নয়। এ অধ্যায়ে ফতোয়া ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর কওলের ওপর। এ প্রসঙ্গে বেকায়া কিতাবের ব্যাখ্যাকারের মন্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন, শফী' যদি এমন স্বভাবের হয় যার দ্বারা পড়শীদের কষ্ট পাবার আশঙ্কা রয়েছে, তবে শুফ্'আ বাঞ্চালের ব্যবস্থা নেয়া মকরূহ হবে না। অন্যথা তা মাকরূহ হবে।

وَإِذَا بَنَى الْمُشْتَرِىْ أَوْ غَرَسَ ثُمَّ قَضَى لِلشَّفِيْعِ بِالشُّفْعَةِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِالثَّمَنِ وَقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوْعَيْنِ وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الْمُشْتَرِىْ بِقَلْعِهِ وَإِنْ أَخَذَهَا الشَّفِيْعُ فَبَنَى أَوْ غَرَسَ ثُمَّ اسْتَحَقَّتْ رَجَعَ بِالثَّمَنِ وَلَا يَرْجِعُ بِقِيْمَةِ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ-

সরল অনুবাদ ঃ ক্রেতা ঘর নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপণের পর যদি শফী'র পক্ষে শুফ্'আর রায় হয়, তাহলে তার (শফী'র) এখতিয়ার রয়েছে–ইচ্ছে করলে সম্পত্তি তার (নির্ধারিত) দাম এবং ঘর-দুয়ার ও গাছ-পালার উপড়ে ফেলা অবস্থার দাম দিয়ে (ঘর ও বৃক্ষসহ) নিয়ে নেবে। তা-না হলে ক্রেতাকে সেগুলো তুলে নিতে বাধ্য করবে। কিন্তু যদি শফী' সম্পত্তি লাভের পর তাতে গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষাদি রোপণ করে নেয় অতঃপর অন্য কেউ এ জমির মালিক প্রমাণিত হয়, তাহলে শফী' (ক্রেতা বা বিক্রেতা) থেকে শুধুমাত্র বাড়ির দাম ফেরত আনবে, ঘর ও বৃক্ষাদির দাম আনতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِنْ شَاءَ كَلَّفَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ এমতাবস্থায় শফী'র জন্য উভয় প্রকার এখতিয়ার রয়েছে– ইচ্ছা করলে জমির মূল্য এবং উপড়ে ফেলা অবস্থায় গাছ-পালা বা ঘর-বাড়ির যে মূল্য হত সে দাম দিয়ে সবশুদ্ধ জমি নিয়ে নেবে এবং এটা হবে ক্রেতার প্রতি তার ইহসান। অথবা ক্রেতাকে সেগুলো কেটে ফেলতে বাধ্য করবে। কারণ শুফ্'আর রায়ে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়েছে যে, এ জমির প্রকৃত অধিকারী ছিল শফী'। ক্রেতা অপরের জমিতে ঘর তৈরি ও বৃক্ষ রোপণ করেছে। সুতরাং মালিকের পক্ষে তার জমি খালি করার জন্য দখলদারকে বাধ্য করতে পারাই তো যুক্তিসঙ্গত।

وَإِنْ أَخَذَهَا الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ শুফ্'আকার যথা নিয়মে সম্পত্তি দখলে নিয়ে তাতে বৃক্ষাদি রোপণ বা ঘর-বাড়ি নির্মাণ করার পর যদি কোন দাবিদার উল্লেখিত সম্পত্তি তার নিজের বলে দাবি করে এবং সে দাবি প্রমাণ পূর্বক ক্রয়-বিক্রয় বাতিল করে দিয়ে তাতে নিজের দখল প্রতিষ্ঠা করে এবং ঘর-দুয়ার ভেঙে দেয়, তাহলে শফী' ক্রেতার নিকট শুধুমাত্র সম্পত্তির মূল্য ফিরে পাবে, ক্ষয়ক্ষতির খেসারত বা ঘর-দুয়ারের মূল্য দাবি করতে পারবে না। পূর্বোক্ত মাসআলার সাথে এর পার্থক্যের কারণ হল সেখানে ক্রেতা বিক্রেতার প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে বিক্রেতা কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়েছে। কিন্তু এ মাসআলায় শফী' ক্রেতা কর্তৃক প্রবঞ্চিত হয়নি; বরং সে নিজ থেকে সেধেই শুফ্'আ নিয়েছে।

وَإِذَا انْهَدَمَتِ الدَّارُ أَوْ احْتَرَقَتْ بِنَاؤُهَا أَوْ جَفَّ شَجَرُ الْبُسْتَانِ بِغَيْرِ عَمَلِ أَحَدٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهَا وَإِنْ نَقَضَ الْمُشْتَرِي الْبِنَاءَ قِيلَ لِلشَّفِيعِ إِنْ شِئْتَ فَخُذِ الْعَرْصَةَ بِحِصَّتِهَا وَإِنْ شِئْتَ فَدَعْ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ النُّقْضَ وَمَنْ ابْتَاعَ أَرْضًا وَعَلَى نَخْلِهَا ثَمَرٌ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِثَمَرِهَا وَإِنْ جَذَّهَا الْمُشْتَرِي سَقَطَ عَنِ الشَّفِيعِ حِصَّتُهُ وَإِذَا قَضَى لِلشَّفِيعِ بِالدَّارِ وَلَمْ يَكُنْ رَآهَا فَلَهُ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ فَإِنْ وَجَدَ بِهَا عَيْبًا فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهَا بِهِ وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرِي شَرَطَ الْبَرَاءَةَ مِنْهُ وَإِذَا ابْتَاعَ بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ فَالشَّفِيعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَخَذَهَا بِثَمَنٍ حَالٍّ وَإِنْ شَاءَ صَبَرَ حَتَّى يَنْقَضِيَ الْأَجَلُ ثُمَّ يَأْخُذُهَا وَإِذَا اقْتَسَمَ الشُّرَكَاءُ الْعَقَارَ فَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِمْ بِالْقِسْمَةِ وَإِذَا اشْتَرَى دَارًا فَسَلَّمَ الشَّفِيعُ الشُّفْعَةَ ثُمَّ رَدَّهَا الْمُشْتَرِي بِخِيَارِ رُؤْيَةٍ أَوْ بِشَرْطٍ أَوْ بِعَيْبٍ بِقَضَاءِ قَاضٍ فَلَا شُفْعَةَ لِلشَّفِيعِ وَإِنْ رَدَّهَا بِغَيْرِ قَضَاءِ قَاضٍ أَوْ تَقَايَلَا فَلِلشَّفِيعِ الشُّفْعَةُ۔

সরল অনুবাদ ঃ কারো কোন হস্তক্ষেপ ছাড়াই যদি মাশফূ' বাড়ি ধ্বসে পড়ে বা তার ঘরগুলো (আগুন লেগে) পুড়ে যায় কিংবা বাগানের গাছ-গাছালি শুকিয়ে যায় তাহলে শফী'র স্বাধীনতা রয়েছে–ইচ্ছা করলে উক্ত বাড়ি তার পুরো দাম দিয়ে নেবে, অন্যথা ত্যাগ করবে। কিন্তু যদি ক্রেতা ঘরদুয়ারগুলো ভাঙে, তাহলে শফী'কে (এখতিয়ার দিয়ে) বলা হবে– ইচ্ছে করলে তুমি এ বিরান বাড়ি হারানুপাতে দাম দিয়ে নিয়ে নাও, নতুবা তার দাবি ছেড়ে দাও। কিন্তু তার (শফী'র) ভগ্নাবশেষগুলো নেয়ার অধিকার নেই। যে ব্যক্তি ফলবিশিষ্ট বাগান খরিদ করল, তাহলে শুফ'আকার তা ফলসহ গ্রহণ করবে। আর যদি ক্রেতা ফল পেড়ে নেয়, তাহলে শফী'র দেনা থেকে ফলের দাম কাটা যাবে। শফী' বাড়ি দেখার পূর্বেই যদি তার পক্ষে শুফ'আর রায় হয়ে যায়, তবে তার জন্য খেয়ারে-রুইয়াত থাকবে। আর যদি তাতে কোন দোষ-ত্রুটি পায়, তাহলে খেয়ারে-আয়বের বলে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে; যদিও ক্রেতা এ ব্যাপারে নিজের দায়মুক্ত থাকার শর্ত দিয়ে থাকে। যদি ক্রেতা বাকি দামে খরিদ করে, তাহলে শফী'র এখতিয়ার থাকবে– ইচ্ছা করলে নগদ দামে জমি নেবে তা না হলে মেয়াদ ফুরানো পর্যন্ত ধৈর্য ধরবে অতঃপর নেবে। যখন (কোন ইজমালি) জমির অংশীদারগণ (নিজেদের অংশ) বন্টন করে নেয়, তখন তাতে পড়শির জন্য বন্টনের কারণে শুফ'আর হক হাসিল হয় না। কোন ব্যক্তি বাড়ি ক্রয় করল এবং শফী' শুফ'আর দাবি ছেড়ে দিল; এখন খেয়ারে-রুইয়াত বা খেয়ারে-শর্ত অথবা খেয়ারে-আয়বের ভিত্তিতে যদি উক্ত বাড়ি ফেরত দেয় এবং তা হয় কাজির মধ্যস্থতায়, তবে শফী' ফিরে শুফ'আর দাবি করতে পারবে না। আর যদি কাজির মধ্যস্থতা ব্যতীত দেয় কিংবা তারা একালা করে নেয়, তবে শফী'র জন্য শুফ'আ প্রাপ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

أَخَذَهَا بِجَمِيعِ الثَّمَنِ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা এ সকল ক্ষয়ক্ষতির পিছনে ক্রেতার কোন হাত ছিল না। তাছাড়া সে তো বিক্রেতাকে এসব গাছ-গাছালির মূলও চুকিয়েছে। অতএব ক্রেতার যখন কোন অপরাধই নেই, তখন শফী' তাকে ঠকাবে কোন যুক্তিতে? অবশ্য জমি অক্ষত না থাকার কারণে শফী' তা নিতে না চাইলে সে অধিকারও তার আছে।

شَرْطُ الْبَرَاءَةِ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ শফী'কে জমি হস্তান্তরের সময় ক্রেতা যদি বলে, কোন প্রকার ত্রুটির কারণে পরবর্তীতে সম্পত্তি ফেরত নেয়া হবে না, তবে তার এ কথা অসার গণ্য হবে এবং শফী'র জন্য খেয়ারে-আয়েব বহাল থেকে যাবে। কেননা জমি ফেরত গেলে অবশেষে মালিকের নিকটই যাবে। সেদিক বিবেচনায় এ ধরনের শর্তারোপের অধিকার একমাত্র মালিকের জন্যই সংরক্ষিত; ক্রেতা তা করতে পারে না। কেননা সে মালিকের প্রতিনিধি নয়।

بِثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ الخ **-এর আলোচনা :** অর্থাৎ ক্রেতা বাকি দামে ক্রয় করলে শফী'র জন্য স্বাধীনতা রয়েছে-ইচ্ছা করলে নগদ দামে শুফ'আ নেবে, তা না হয় বাকির মেয়াদ শেষ হওয়ার অপেক্ষায় থাকবে। কিন্তু দাম বাকি রেখে শুফ'আ নিতে পারবে না। কারণ বাকি কারবারতো কোন প্রয়োজনের খাতিরে বিশেষ শর্তাধীনে হয়ে থাকে। আর শাফী'র সাথে ক্রেতা বা বিক্রেতা এ জাতীয় কোন শর্তে আবদ্ধ নয়। অবশ্য ইমাম যুফার, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে, এ অবস্থায় শফী' বাকি নিতে পারবে।

وَإِذَا اقْتَسَمَ الخ **-এর আলোচনা :** মনে রাখতে হবে যৌথ সম্পত্তির প্রতি বর্গ ইঞ্চিতেই প্রত্যেক অংশীদারের অধিকার উপস্থিত থাকে। সে মতে ৬ শতাংশ জমি যদি দুই ব্যক্তির মাঝে ইজমালি থাকে, তবে প্রতি শতাংশের মধ্যেই উভয়ের অধিকার রয়েছে বলে বুঝতে হবে। এখন এ জমি সমান দুই ভাগে ভাগ করা হলে নিশ্চিতভাবে এক একজন তিন শতাংশ করে পাবে এবং একজনের ভাগে অপরজনের কোন হক অবশিষ্ট থাকবে না। অথচ যৌথ থাকা অবস্থায় তিন শতাংশের প্রতি প্লটের মধ্যেই তারা প্রত্যেকে অর্ধেকের অংশীদার ছিল। তাহলে বুঝা গেল বন্টনের মাধ্যমে তারা প্রত্যেকেই কেমন যেন নিজের অংশের সাথে অপরজনের অংশ বদল করে নিয়েছে। আর এটা সুন্দরভাবে মাল দ্বারা মালের আদান-প্রদান বিধায় তাতে বিক্রয় এর সংজ্ঞা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, 'বন্টন' যখন বিক্রয় এর রূপ ধারণ করল, তখন এতে প্রতিবেশীর জন্য শুফ'আর হক হাসিল হবে কি-না? বাহ্যিক বিবেচনায় শুফ'আর হক অর্জিত হয় বটে কিন্তু পরিভাষায় যেহেতু একে 'বিক্রয়' না বলে 'বন্টন' নামে অভিহিত করা হয় সে কারণে শুফ'আ হবে না।

بِقَضَاءِ قَاضٍ الخ **-এর আলোচনা :** আসল কথা হল, খেয়ারে-রুইয়াত বা খেয়ারে-আয়েব প্রভৃতি ক্ষেত্রে কাজির মধ্যস্থতায় পণ্য ফেরত দেয়া হলে পূর্ব কারবার সম্পূর্ণরূপে বাতিল হয়ে যায়, ফলে শুফ'আ করার অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে কাজির মধ্যস্থতা ব্যতীত কিংবা এক্বালার ভিত্তিতে ফেরত দিলে ক্রেতা-বিক্রেতার বেলায় এটা পূর্ব কারবার রহিত করণ বলে গণ্য হলেও শফী'র জন্য তা নতুন কারবার হিসেবে গ্রহণীয় হয়। সে কারণে সে শুফ'আ করতে পারে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلشُّفْعَةُ -এর শাব্দিক ও পরিভাষিক অর্থ কি এবং شُفْعَة -এর প্রাপক কারা? বিস্তারিত লিখ।
২। شَفِيْع ، مَشْفُوْع ، مَشْفُوْع بِه ও جَار -এর সংজ্ঞা দাও এবং شُفْعَة লাভের যৌক্তিক দিক গুলোর বর্ণনা দাও।
৩। شَفِيْع -এর দায়িত্ব ও অধিকারগুলো লিখ।
৪। طَلَب কত প্রকার ও কি কি? বিস্তারিত বিবরণ দাও।
৫। কি কি কারণে شُفْعَة বাতিল হয়ে যায়? লিখ।
৬। اَلشُّفْعَة বাঞ্চালের কৌশল কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।
৭। যখন شُفْعَة -এর শরিক কয়েকজন হবে তখন তাদের মাঝে شُفْعَة কিভাবে বন্টন হবে? লিখ।

كِتَابُ الشَّرْكَةِ

اَلشَّرْكَةُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ شِرْكَةُ إِمْلَاكٍ وَشِرْكَةُ عُقُوْدٍ فَشِرْكَةُ الْاِمْلَاكِ الْعَيْنُ يَرِثُهَا رَجُلَانِ اَوْ يَشْتَرِيَانِهَا فَلَا يَجُوْزُ لِاَحَدِهِمَا اَنْ يَتَصَرَّفَ فِىْ نَصِيْبِ الْاٰخَرِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِىْ نَصِيْبِ صَاحِبِهٖ كَالْاَجْنَبِيِّ وَالضَّرْبُ الثَّانِىْ شِرْكَةُ الْعُقُوْدِ وَهِىَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ مُفَاوَضَةٍ وَعِنَانٍ وَشِرْكَةِ الصَّنَائِعِ وَشِرْكَةِ الْوُجُوْهِ فَاَمَّا شِرْكَةُ الْمُفَاوَضَةِ فَهِىَ اَنْ يَشْتَرِكَ الرَّجُلَانِ فَيَتَسَاوِيَانِ فِىْ مَالِهِمَا وَتَصَرُّفِهِمَا وَدَيْنِهِمَا فَيَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرَّيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ الْبَالِغَيْنِ الْعَاقِلَيْنِ وَلَا يَجُوْزُ بَيْنَ الْحُرِّ وَالْمَمْلُوْكِ وَلَا بَيْنَ الصَّبِيِّ وَالْبَالِغِ وَلَا بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالْكَافِرِ ـ

অংশীদারিত্ব পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ শিরকত (অংশীদারি) দু'প্রকার– (ক) শিরকতে ইমলাক, (খ) শিরকতে উকূদ। দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তি মিলে মিরাস (দান, হিবা) অথবা ক্রয়সূত্রে কোন দ্রব্যের (বা নগদ অর্থের) মালিক হওয়াকে শিরকতে ইমলাক (অংশীদারি মালিকানা) বলে। (শিরকতে ইমলাকের হুকুম হল,) একজন অপর জনের অংশ তার অনুমতি ছাড়া ভোগ-ব্যবহার করা জায়েয নেই এবং তাদের প্রত্যেকে তার সাথীর অংশে আজনবী সমতুল্য। দ্বিতীয় প্রকার শিরকতে উকূদ (অংশীদারি কারবার)। এটা চার ভাগে বিভক্ত– (ক) শিরকতে মুফাওয়াযা, (খ) 'ইনান, (গ) শিরকতে সানায়ে' ও (ঘ) শিরকতে উজূহ। শিরকতে মুফাওয়াযা হল, দু'ব্যক্তি (কোন কারবারে এভাবে) শরিক হওয়া যে, (শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত) তারা উভয়ে পুঁজি, তাসাররুফ এবং ঋণ দানের অধিকারে সমান হবে। সুতরাং এ শিরকত (কেবল) এমন দু'ব্যক্তির মাঝে জায়েয যারা স্বাধীন, মুসলমান, বালেগ এবং সজ্ঞান। মুক্ত ও ক্রীতদাস, শিশু ও বালেগ এবং মুসলিম ও কাফিরের মাঝে তা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلشِّرْكَةُ -এর পরিচয় ঃ শিরকতের শাব্দিক অর্থ-মিলানো। শরীয়তের পরিভাষায়, দুই কিংবা ততোধিক ব্যক্তি মিলে কোন কারবারে মূলধন ও মুনাফায় শরিক থাকার চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াকে শিরকত (অংশীদারি) বলে। পক্ষান্তরে শুধু মুনাফায় শরিক থাকলে তাকে মুদারাবা আর শুধু মূলধনে শরিক হলে তাকে বদা'আ (بِضَاعَت) নামে অভিহিত করা হয়।

অংশীদারি কারবারের গুরুত্ব ঃ অন্যান্য পদ্ধতির কারবারের ন্যায় ইসলামী শরীয়ত শিরকত তথা অংশীদারি কারবারের ব্যবস্থা রেখেছে। যাতে করে শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক কারবারে প্রভূত উন্নতি হওয়ার সাথে সাথে স্বল্প পুঁজির মালিক ও পুঁজিহীন ব্যক্তিরাও স্বাধীনতা ও মান-সম্ভ্রম বজায় রেখে নিজ নিজ জীবিকার ব্যবস্থা করতে সামর্থ্য হয়। শিরকত কারবার বাণিজ্য ও শিল্পে যেমন হতে পারে তেমনি কৃষি ও অন্যান্য পেশায়ও হতে পারে এবং হতে পারে শিক্ষা সংক্রান্ত কাজেও। এতে দুই থেকে ওপরে যত সংখ্যক ব্যক্তি ইচ্ছা অংশগ্রহণ করতে পারে। অধুনা শিরকতি কাবারের বহুল প্রচলন রয়েছে এবং এ পদ্ধতিতে বড় বড় শৈল্পিক ও বাণিজ্যিক কারবার চলছে। তবে আজকের শিরকত অধিক পুঁজি-মালিকদের উন্নতির বাহন। স্বল্প পুঁজির লোকদের লাভ শুধুমাত্র নামকা ওয়াস্তে-বছরে সর্বোচ্চ দশ-বিশ টাকা তাদের হাতে আসতে পারে। এর বৃহত্তম অংশ চলে যায় ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও ম্যানেজারদের কব্জায়। অথবা তাদের পকেটে যারা কারবারে প্রচুর অর্থ বিনিয়োগ করতে সমর্থ। ব্যাপার হল, শিরকতি কারবারীরা লক্ষ লক্ষ লোককে অংশীদার বানিয়ে তাদের থেকে টাকা সংগ্রহ করে। অতঃপর নিজেদের বেতন নির্ধারণ করে। তারপর কিছু টাকা ব্যবস্থাপনার জন্য সংরক্ষিত রাখে। কিছু কারখানার দালানকোটা ও যন্ত্রপাতির জন্য

খরচ করে। অতঃপর কারবার শেষে অংশীদারদের ভাগে মুনাফার মাত্র সে টাকাই আসে যা উল্লিখিত খরচাদির পর অতিরিক্ত থাকে। আর যখন কোন অংশীদার মুনাফা না পাওয়ার ধরুন কেটে পড়তে চায়, তখন তার হাতে শুধু তার প্রদানকৃত অংশীদারিত্বের টাকা ব্যতীত আর কিছুই আসে না; বরং কোন কোন কারবারীরা তো অংশের টাকাও ফেরত দেয় না; বরং কারো কাছে সে অংশ বিক্রি করার শর্তারোপ করে থাকে। এভাবে সম্পূর্ণ কারবার তাদের কুক্ষিগত হয়ে পড়ে যারা প্রথমে কারবারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল।

কিন্তু ইসলামী শরীয়ত-প্রদত্ত শর্তাদি মেনে নিলে বিরাট শিরকতি কারবার এমনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব যাতে সকল অংশীদার লাভবান হওয়ার সাথে সাথে দেশের শিল্প-বাণিজ্যও প্রভূত উন্নতি লাভ করতে পারে। আর এতে হাজারো অসহায় লোকের জীবিকার ব্যবস্থাও হতে পারে। এসব শর্তের কারণে কারবারের যাবতীয় বৈষম্য, বাড়াবাড়ি, প্রতারণা ও দুর্নীতির সমাপ্তি ঘটবে। কেউ যদি স্বার্থপরতা, প্রতারণা ও বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে চায় তবে নৈতিক ও শরীয়ত উভয় দৃষ্টিতে অপরাধী সাব্যস্ত হবে। হাদীসে কুদসীতে আল্লাহপাক ইরশাদ করেন– "যখন দু'শরিক মিলে কোন কাজ করে তারা খেয়ানত ও প্রতারণায় লিপ্ত না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের হাত হই। অর্থাৎ আমি তাদের সাহায্য করি ও বরকত দেই। কিন্তু যখন তারা খেয়ানত শুরু করে তখন আমি তাদের সহায়তা করা থেকে বিরত থাকি।" –(মিশকাত)

শরিকি কারবারে অংশীদারের মর্যাদা ঃ প্রচলিত ব্যবস্থার শরিকি কারবারে সাধারণত মানুষের উদ্দেশ্য থাকে বৈষয়িক লাভ ও ব্যক্তি স্বার্থ অর্জন করা। তাদের সামনে কোন প্রকার নৈতিকমান নির্ধারিত থাকে না। কিন্তু ইসলাম বস্তুগত লাভের সাথে সাথে অংশীদারদের প্রকৃত মর্যদা এই বলে নিরূপণ করে দিয়েছে যে, তারা সবাই শিরকতের দ্রব্যাদি ও কারবারে একই সঙ্গে আমিন ও উকিল দু'টোই। আমিন এ অর্থে যে, একজন আমিন (আমানতগ্রহীতা) যেভাবে আমানতি মালের হেফাজত করে থাকে হুবহু সেভাবেই প্রত্যেক শরিক শিরকতের মালের হেফাজত করবে। যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন ক্ষতি হয়ে পড়ে তবে তার ওপর ক্ষতিপূরণের দায়-দায়িত্ব বর্তাবে না। আর উকিল এ অর্থে যে, কোন শরিক ঐ মালামাল অথবা যৌথ কারবারকে স্বীয় স্বার্থে ব্যবহার করবে না; বরং মুনাফায় প্রত্যেকের অধিকারের কথা স্মরণ রাখবে। কেউ যেন এমন আপত্তি করার সুযোগ না পায় যে, অমুক ব্যক্তি সকল সুযোগ-সুবিধা লুটে নিয়েছে এবং অন্যান্যদের তা থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

فَلَا يَجُوزُ لِأَحَدِهِمَا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– মৃত্যুকালে কেউ এক হাজার টাকা অথবা চারটা বাড়ি রেখে গেল, তাহলে এতে যত জন অংশীদার আছে তাদের অংশ কম হোক আর বেশি হোক কেউই অবশিষ্ট অংশীদরদের সম্মতি ছাড়া টাকা বা বাড়িগুলো কোন কাজে লাগাতে পারবে না। এভাবে দু'ব্যক্তি মিলে শস্য, কাপড় ও বাগান ইত্যাদি খরিদ করলে তার দু'অবস্থা– (ক) সেগুলো এমন শ্রেণীর দ্রব্য যার একক সমূহের মাঝে কোন পার্থক্য নিরূপিত হয় না, যেমন– গম, চাউল ইত্যাদি। তাহলে অন্য সদস্যদের উপস্থিতি ছাড়াও তা ভাগ করা যায়। অর্থাৎ একজন অংশীদার স্বীয় অংশ আলাদা করে তা অন্য স্থানে রেখে দিতে পারে। (খ) দ্রব্যগুলো এমন যে, এর এককগুলোর মধ্যে ঢের ব্যবধান রয়েছে যেমন– বিভিন্ন ধরনের দশ বিশ থান কাপড় অথবা ফল খরিদ করল। এক্ষেত্রে বন্টনের সময় উভয়ের উপস্থিতি জরুরি। অন্যথা পরে মতানৈক্য দেখা দিতে পারে।

شِرْكَةُ الْعُقُودِ الخ -এর আলোচনা ঃ عُقُودٌ শব্দটি عَقْدٌ শব্দের বহুবচন। অর্থ-বন্ধন, বাঁধা। যৌথ কারবারকে এ নামে নাম করণের উল্লেখযোগ্য কারণ এই যে, এতে অংশীদারগণ পরস্পরে নির্দিষ্ট নিয়মে কারবার করার প্রতিশ্রুতি-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। শরীয়তের পরিভাষায় শিরকতে 'উকূদ হল, দুই বা ততোধিক ব্যক্তি অল্প অল্প পুঁজি সংগ্রহ করে পরস্পরের মতৈক্যের ভিত্তিতে কোন নির্ধারিত কারবার করা এবং লব্ধ মুনাফা নির্দিষ্ট হারে ভাগ করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। অথবা কোন কারবার সম্পর্কে একমত হয়ে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, আমরা মিলেমিশে কাজ করব এবং তাতে যে মুনাফা হবে তা ভাগ করে নেব।

শিরকতে 'উকূদের কয়েকটি বিভাগ রয়েছে। হুকুম ও শর্তাবলীর দিক থেকে এগুলোর মধ্যে কিছুটা ব্যবধান থাকলেও কতিপয় বিষয়ে আবার মিলও রয়েছে। যেমন– (১) যথারীতি ইজাব-কবুলের মাধ্যমে শিরকতের চুক্তি ও অঙ্গীকার হতে হবে। (২) চুক্তি লিখিত হতে পারে এবং মৌখিকও হতে পারে। তবে ইমাম সারাখসী (রঃ) লিখিত চুক্তিপত্রের প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। (৩) মুনাফা বন্টনের হার সুস্পষ্ট উল্লেখ থাকতে হবে। (৪) কারবারের সকল শরিক যৌথ মালামালে আমিন ও উকিল দু'টোই। (৫) কাজ ও পুঁজি সমান হওয়া সত্ত্বেও মুনাফায় কমবেশ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য হতে পারে। (৬) কারবার বৃহদায়তনে পরিচালনার প্রয়োজনে অংশীদারদের মধ্যে কাউকে অথবা অংশীদার ছাড়া বাহিরের অন্য কাউকে ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব অর্পণ করা যায়। তবে অংশীদারদের মধ্যে যাদের ওপর এ দায়িত্ব অর্পিত হবে যেহেতু তাদের সময় অধিক ব্যয়িত হবে বা তাদের যোগ্যতা অধিক সে কারণে তাদের মুনাফা নির্দিষ্ট হার থেকে কিছু অতিরিক্ত করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অংশীদারের জন্য নির্দিষ্ট বেতন গ্রহণ এবং মুনাফায় অংশগ্রহণ একত্রে জায়েয হবে না। অনুরূপভাবে বাইরের কোন লোক নিয়োজিত হলে তার দু'অবস্থা হতে পারে– এক হল, সে কাজ করবে আর মুনাফার কিছু অংশ তার জন্যে নির্ধারিত থাকবে। এমতাবস্থায় সে হবে মুদারিব। এজন্য সে কেবল মুনাফা পাওয়ার অধিকারী হবে। দ্বিতীয় হল তাকে বেতন দেয়া হবে। এমতাবস্থায় সে হবে শ্রমিক। অর্থাৎ সে কেবল বেতন পাবে; মুনাফায় তার কোন অংশ থাকবে না।

وَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ وَالْكَفَالَةِ وَمَا يَشْتَرِيْهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَكُوْنُ عَلَى الشَّرْكَةِ اِلَّا طَعَامَ اَهْلِهِ وَكِسْوَتَهُمْ وَمَا يَلْزَمُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الدُّيُوْنِ بَدَلًا عَمَّا يَصِحُّ فِيْهِ الْاِشْتِرَاكُ فَالْاٰخَرُ ضَامِنٌ لَهُ فَاِنْ وَرِثَ اَحَدُهُمَا مَالًا تَصِحُّ فِيْهِ الشَّرْكَةُ اَوْ وَهَبَ لَهُ وَوَصَلَ اِلٰى يَدِهِ بَطَلَتِ الْمُفَاوَضَةُ وَصَارَتِ الشَّرْكَةُ عِنَانًا وَلَا تَنْعَقِدُ الشَّرْكَةُ اِلَّا بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْفُلُوْسِ النَّافِقَةِ وَلَا يَجُوْزُ فِيْمَا سِوٰى ذٰلِكَ اِلَّا اَنْ يَتَعَامَلَ النَّاسُ بِهِ كَالتِّبْرِ وَالنُّقْرَةِ فَتَصِحُّ الشَّرْكَةُ بِهِمَا وَاِنْ اَرَادَا الشَّرْكَةَ بِالْعُرُوْضِ بَاعَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَ مَالِهِ بِنِصْفِ مَالِ الْاٰخَرِ ثُمَّ عَقَدَا الشَّرْكَةَ .

সরল অনুবাদ ঃ এবং তা ওকালত ও জামানতের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে। (অর্থাৎ এতে শরিকদ্বয়ের প্রত্যেকে তার সাথীর উকিল ও জামিন দু'টোই সাব্যস্ত হয়। উকিল হওয়ার কারণে) তাদের প্রত্যেকে নিজ পরিবারের খাদ্য-খাবার ও পোশাক পরিচ্ছদ ছাড়া অন্য যা কিছু খরিদ করবে অপরজন তাতে শরিক গণ্য হবে। (আর জামিন হওয়ার কারণে) অংশীদারি শুদ্ধ হয় এমন কিছুর বিনিময় বাবদ একজন ঋণগ্রস্ত হলে অপরজন সে ঋণের দায়ভাগ বহন করবে। অতঃপর তাদের কেউ যদি মিরাস কিংবা হিবাসূত্রে এমন কিছু অর্থ-সম্পদের মালিক হয় যাতে শিরকত শুদ্ধ এবং সেগুলো তার হস্তগত হয় তবে মুফাওয়াযা বাতিল হয়ে তা শিরকতে 'ইনানে পরিণত হবে। একমাত্র দিরহাম, দিনার ও সচল পয়সা দ্বারা মুফাওয়াযা শিরকত সংঘটিত হয়। এছাড়া অন্য কোন সামগ্রীতে তা জায়েয নেই। তবে জনসাধারণ যদি ঐ সামগ্রী (মুদ্রা আকারে) লেনদেন করতে থাকে যেমন স্বর্ণ ও রৌপ্য পাত, তবে তা দ্বারাও শিরকত শুদ্ধ হবে। যদি আসবাব সামগ্রীর ওপর শিরকত গড়ে তুলতে চায়, তবে তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ মালের অর্ধেক দ্বিতীয় জনের অর্ধেকের সাথে বিনিময় করে নেবে অতঃপর মুফাওয়াযা গড়ে তুলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

عَلَى الْوَكَالَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ মুফাওয়াযা কারবারে শরিকদের মর্যাদা হল, তারা পরস্পরের জন্য উকিল ও জামিন দু'টোই। উকিল এ অর্থে যে, একজন শরিক কারবারের যে সকল সামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় করবে তা শুধু স্বীয় স্বার্থে করবে না; বরং অপর শরিকের স্বার্থের কথাও সর্বক্ষণ স্মরণ রাখবে। কাজেই সে যখন যা কেনাবেচা করবে কেমন যেন তার অংশীদারের জন্যই করল। আর কাফিল তথা জামিন এ হিসেবে যে, তার সাথী যদি কারবার সংক্রান্ত বিষয়ে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তার ওপরও সে ঋণের বোঝা বর্তাবে এবং সে হিসেবে পাওনাদার তাকেও ঋণ পরিশোধের তাগাদা দিতে পারবে। কিন্তু অংশীদার ব্যক্তিগত কাজে যদি ঋণগ্রস্ত হয়ে থাকে যেমন– বিয়ের মোহর, খোলার বিনিময়, স্ত্রীর ভরণ-পোষণ এবং ইচ্ছাকৃত খুনের আপস-মীমাংসা বাবদ দেয় অর্থ ইত্যাদি। তবে এর দায়ভার শরিককে বহন করতে হবে না।

وَلَا تَنْعَقِدُ الشَّرْكَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ শিরকতে মুফাওয়াযার মধ্যে কারবারের পুঁজি সোনা-রূপার তৈরি মুদ্রা বা এর স্থলবর্তী নোট হওয়া জরুরি। মুদ্রা ব্যতীত স্থাবর-অস্থাবর অন্য যে কোন মালের ভিত্তিতে শিরকত করা হলে তা শুদ্ধ হবে না। সে মতে মুফাওয়াযা কারবারের কোন ভাগীদার যদি মিরাস হিবাসূত্রে এ প্রকারের কিছু সম্পত্তির মালিক হয় তাতে শিরকত নষ্ট হবে না। কিন্তু অর্থের মালিক হলে মুফাওয়াযা রহিত হয়ে যাবে। কারণ এতে উভয় শরিকের মূলধনের সমতা বিনষ্ট হয়ে যায়।

وَاَمَّا شِرْكَةُ الْعِنَانِ فَتَنْعَقِدُ عَلَى الْوَكَالَةِ دُوْنَ الْكَفَالَةِ وَيَصِحُّ التَّفَاضُلُ فِى الْمَالِ وَيَصِحُّ اَنْ يَّتَسَاوِيَا فِى الْمَالِ وَيَتَفَاضَلَا فِى الرِّبْحِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّعْقِدَهَا كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِبَعْضِ مَالِهِ دُوْنَ بَعْضٍ وَلَا تَصِحُّ اِلَّا بِمَا بَيَّنَّا اَنَّ الْمُفَاوَضَةَ تَصِحُّ بِهِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّشْتَرِكَا وَمِنْ جِهَةِ اَحَدِهِمَا دَنَانِيْرُ وَمِنْ جِهَةِ الْاٰخَرِ دَرَاهِمُ وَمَا اشْتَرَاهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا لِلشِّرْكَةِ طُوْلِبَ بِثَمَنِهِ دُوْنَ الْاٰخَرِ وَيَرْجِعُ عَلَى شَرِيْكِهِ بِحِصَّتِهِ مِنْهُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ শিরকতে ‘ইনান এটা ওকালতের ভিত্তিতে সংঘটিত হয়; জামানতের ভিত্তিতে নয়। (অর্থাৎ এতে অংশীদারগণ একে অন্যের উকিল হবে বটে কিন্তু জামিন হবে না।) এতে একজনের পুঁজি অপর জন থেকে কমবেশি হওয়া জায়েয এবং জায়েয পুঁজিতে সমান হওয়া সত্ত্বেও মুনাফায় কমবেশি করা। এবং তারা প্রত্যেকে নিজ নিজ অর্থের কিছু অংশ খাটিয়েও কারবার গড়ে তুলতে পারে। যে শ্রেণীর মূলধন দ্বারা মুফাওয়াযা শুদ্ধ হওয়ার কথা আমরা বর্ণনা করে এসেছি তা ব্যতীত অন্য কিছু দ্বারা ‘ইনান শুদ্ধ হবে না। অবশ্য শরিকদ্বয়ের একজন গিনি এবং অপর জন দিরহাম দিলেও শিরকত শুদ্ধ হবে। শরিকদের যে কেউ শিরকতের জন্য কোন কিছু খরিদ করবে তার দাম তারই নিকট তলব করা হবে অপরজনের নিকট নয়। অবশ্য ক্রেতা অপর শরিক থেকে তার অংশ অনুপাতে মালের দাম নিয়ে নেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

شِرْكَةُ الْعِنَانِ-এর আলোচনা ঃ অংশীদারী কারবার (شِرْكَة عُقُوْد) -এর অন্যতম প্রকার হল শিরকতে ‘ইনান। এর শাব্দিক অর্থ– প্রকাশিত হওয়া। ব্যবহারিক অর্থে, মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্য সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগানোকে ‘ইনান বলে। বিশ্বে সাধারণত শিরকতে ‘ইনানের প্রচলনই বেশি। এতে না মূলধনের সমকক্ষতা প্রয়োজন না মুনাফার অংশ সমান হওয়ার শর্ত রয়েছে। এ শিরকতের বৈশিষ্ট্য হল– (ক) এতে মুসলিম অমুসলিম নির্বিশেষে যে কেউ শরিক হতে পারে। (খ) সকল শরিকের বরাবর মূলধন হওয়া জরুরি নয়। (গ) মূলধন সমান হওয়া সত্ত্বেও মুনাফায় বেশকম হতে পারে। এমনকি পুঁজি কম খাটিয়েও মুনাফায় অংশ বরাবর নিতে পারে। যেমন– কেউ এক হাজার টাকা লাগাল আর অন্যজন লাগাল পাঁচশ’ টাকা এবং উভয়ে সমান সমান হারে মুনাফা নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল, এটা জায়েয। কারণ মুনাফার সম্পর্ক শুধুমাত্র মূলধনের সাথে নয়; বরং শ্রম, সাধনা ছাড়াও এতে কৌশল, দক্ষতা ও বুদ্ধি প্রখরতার প্রয়োজন রয়েছে। সে কারণে হতে পারে কোন ব্যক্তির মূলধন অধিক থাকলেও বাস্তব জ্ঞান ও যোগ্যতার দিক থেকে সে পিছনে। অথচ দ্বিতীয় ব্যক্তির মূলধন স্বল্প হলেও বাস্তব জ্ঞান ও কৌশলগত যোগ্যতা বেশি। তাহলে এ লোক তার পুঁজির স্বল্পতা অন্যান্য দিক থেকে পূরণ করে নিতে পারবে। (ঘ) শরিকগণ একে অপরের উকিল হবে; কিন্তু জামিন হবে না। সে কারণে একজন দেনা হলে সেটা তারই নিকট চাইতে হবে, অপর জনের কাছে তাগাদা করা যাবে না। (ঙ) কারবার পরিচালনায় উকিল ও কর্মচারী নিয়োগ, বন্ধক দেয়া ও নেয়া এবং ধারে ও নগদে ক্রয়-বিক্রয় ইত্যাদি কাজে সকল শরিকের সমপরিমাণ অধিকার থাকবে।

بِحِصَّتِهِ مِنْهُ الخ-এর আলোচনা ঃ যেমন– উভয়ের মূলধন যদি সমান হয়, তবে ক্রয়কৃত মালের অর্ধেক দাম শরিক থেকে নিয়ে নেবে। আর শরিকের মূলধন $\frac{1}{3}$ হলে মূল্যের এক-তৃতীয়াংশ নেবে। কেননা যে শরিক ক্রয় করেছে সে তার একার জন্য ক্রয় করেনি; বরং অপর শরিকের উকিল হিসেবে নির্দিষ্ট একটি অংশ তার জন্যও ক্রয় করেছে।

وَاِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ اَوْ اَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ وَاِنْ اِشْتَرٰى اَحَدُهُمَا بِمَالِهٖ شَيْئًا وَهَلَكَ مَالُ الْاٰخَرِ قَبْلَ الشِّرَاءِ فَالْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا عَلٰى مَا شَرَطَا وَيَرْجِعُ عَلٰى شَرِيْكِهٖ بِحِصَّتِهٖ مِنْ ثَمَنِهٖ وَيَجُوْزُ الشِّرْكَةُ وَاِنْ لَمْ يَخْلِطَا الْمَالَ وَلَا تَصِحُّ الشِّرْكَةُ اِذَا اشْتَرَطَ لِاَحَدِهِمَا دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً مِنَ الرِّبْحِ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُفَاوِضَيْنِ وَشَرِيْكَيِ الْعِنَانِ اَنْ يُّبْضِعَ الْمَالَ وَيَدْفَعَهٗ مُضَارَبَةً وَيُوَكِّلَ مَنْ يَّتَصَرَّفُ فِيْهِ وَيَرْهَنَ وَيَسْتَرْهِنَ وَيَسْتَاجِرَ الْاَجْنَبِىَّ عَلَيْهِ وَيَبِيْعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ وَيَدُهٗ فِى الْمَالِ يَدُ اَمَانَةٍ وَاَمَّا شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ فَالْخَيَّاطَانِ وَالصَّبَّاغَانِ يَشْتَرِكَانِ عَلٰى اَنْ يَّتَقَبَّلَا الْاَعْمَالَ وَيَكُوْنُ الْكَسْبُ بَيْنَهُمَا فَيَجُوْزُ ذٰلِكَ وَمَا يَتَقَبَّلُهٗ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الْعَمَلِ يَلْزَمُهٗ وَيَلْزَمُ شَرِيْكَهٗ فَاِنْ عَمِلَ اَحَدُهُمَا دُوْنَ الْاٰخَرِ فَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ মালামাল ক্রয়ের পূর্বেই যদি শিরকতের সমুদয় মূলধন অথবা কোন এক শরিকের মূলধন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে শিরকত চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। কিন্তু যদি একজন তার পুঁজি দ্বারা কিছু মালামাল ক্রয় করে অতঃপর দ্বিতীয় জনের পুঁজি কোন কিছু ক্রয় করার পূর্বে ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে (শিরকত বহাল থাকবে এবং) ক্রয়কৃত মাল চুক্তির শর্তানুযায়ী তাদের মধ্যে অংশীদারি গণ্য হবে। এবং সে উক্ত শরিক থেকে তার অংশ অনুপাতে মালের দাম নিয়ে নেবে। অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজি পৃথক রেখেও শিরকত করা জায়েয। মুনাফার একটা নির্দিষ্ট অংশ কোন এক শরিকের জন্য রাখার শর্ত করা হলে শিরকত শুদ্ধ হবে না। মুফাওয়াযা ও 'ইনান কারবারে শরিকগণ প্রত্যেকে বযা'আত ও মুদারাবা আকারে পুঁজি খাটাতে পারবে এবং (কার্য সমাধায়) উকিল নিয়োগ, বন্ধক আদান-প্রদান, অনাত্মীয়দের কর্মচারী নিয়োগ এবং নগদ ও ধারে (মালামাল) ক্রয়-বিক্রয় করতে পারবে। শিরকতের মালামালে তার কব্জা আমানতী মালের কব্জা হবে।

শিরকতে সানায়ে' হল, দু'জন দর্জি বা দু'জন রংকারক আপসে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, তারা উভয়ে মিলে কাজ গ্রহণ করবে এবং উপার্জন উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে। তাহলে তা জায়েয। এ স্থলে তাদের যে কেউ কাজ গ্রহণ করবে তা তাদের উভয়ের দায়িত্বে বর্তাবে। সে মতে যদি একা একজন কাজ সমাধা করে দ্বিতীয়জন (কোন সঙ্গত কারণে) না করে তথাপি তাদের মাঝে উপার্জন আধাআধি হারে (বা শর্তানুপাতে) বন্টিত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অংশীদারি কারবারের মালামাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কয়েকটি ধরন হতে পারে– (এক) পণ্যাদি ক্রয় করার পূর্বেই সংগৃহীত সম্পূর্ণ মূলধন বা কোন এক সদস্যের অংশ পরিমাণ চুরি হয়ে গেল বা পুড়ে গেল অথবা অন্য কোনভাবে ক্ষতি হয়ে গেল, তাহলে শিরকত চুক্তি রহিত হয়ে যাবে। কারবার করতে রহিত পুনরায় নতুনভাবে চুক্তিবদ্ধ হতে হবে। পুনঃ চুক্তির পূর্বে কোন সদস্যকে কারবারে বিনিয়োগ বা অন্যান্য দায়-দেনার জন্য বাধ্য করা যাবে না। উল্লেখ থাকে যে, এ ক্ষেত্রে গোটা মূলধন নষ্ট হলে ক্ষতি সকলেরই হল, আর কোন একজনের অংশ নষ্ট হলে এর দু'অবস্থা– হয়তো তারই হাতে নষ্ট হয়েছে কিংবা তার ভাগীদারের কাছে পৃথক করে রাখা অবস্থায় নষ্ট হয়েছে। উভয় অবস্থাতে ক্ষতি তার একার ওপর বর্তাবে। কারণ তার শরিকের নিকট মূলধন ছিল আমানতস্বরূপ। আর যদি অন্যান্য মূলধন সাথে একত্রিত থাকা অবস্থায় নষ্ট হয় এবং যার হাত থেকে নষ্ট হল তার কোন অলসতা না থাকে, তবে সকলকেই নিজ নিজ অংশ অনুপাতে ক্ষতি বহন করতে হবে। (দুই) কোন একজনের মূলধন দ্বারা পণ্যসামগ্রী ক্রয় বা কারবারের অন্য কোন কাজে ব্যয় করার পর দ্বিতীয়জনের টাকা স্বীয় মালিকের হাতেই নষ্ট হয়ে গেল, তাহলে শিরকত রহিত হয়নি। এখানে ক্ষতির দায় একা

মালিককেই বহন করতে হবে এবং হার অনুপাতে ব্যয়িত অর্থও সরবরাহ করতে হবে। (তিন) সমুদয় মূলধন ব্যবসায় খাটানোর পর সম্পূর্ণ পুঁজি বা এর অংশবিশেষ বিনষ্ট হয়ে গেল। এমতাবস্থায় ব্যবসায় মুনাফা হয়ে থাকলে ক্ষতিটুকু মুনাফা বহন করা যাবে। নতুবা শরিকগণ স্ব স্ব অংশ অনুপাতে ক্ষতি বহন করবে। (চার) সর্বাবস্থায়ই কোন শরিকের অযত্ন-অবহেলার কারণে নষ্ট হলে সমস্ত ক্ষতির দায়ভার তার একার ওপর বর্তাবে।

وَإِنْ لَمْ يَخْلِطَا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– দু'জন মিলে এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হল যে, তারা নিজ নিজ মূলধন পৃথক রেখে পৃথক দোকানে বাণিজ্য করবে, তবে কারবার পরিচালনায় একে অপরকে পরামর্শ ও সর্বাত্মক সহযোগিতা করবে এবং উভয়ে উভয় দোকান অদল-বদল করে দেখা-শুনা করবে আর মুনাফা নির্দিষ্ট হারে বণ্টন করে নেবে। তবে তা জায়েয আছে। ইমাম যুফার ও শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, তা জায়েয হবে না।

دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً الخ -এর আলোচনা ঃ মনে রাখতে হবে কারো জন্য মুনাফার একটা নির্ধারিত অংশ রাখার শর্তারোপ যেমন জায়েয নয় তদ্রূপ লোকসানের সম্পূর্ণ দায়ভার কেউ একা বহন করার শর্ত করাও দুরস্ত নয়।

أَنْ يُبْضِعَ الْمَالَ الخ -এর আলোচনা ঃ শব্দটি إِبْضَاع থেকে সংগৃহীত। অর্থ– এক ব্যবসায়ী অপর ব্যবসায়ীকে এ শর্তে ব্যবসার পণ্য অর্পণ করা যেন সে এগুলো বিক্রি করে সম্পূর্ণ মুনাফা প্রথম ব্যবসায়ীর জন্য সংরক্ষণ করে। ব্যবসায়ীদের মাঝে পরস্পরকে এরূপ সহযোগিতা করার রীতি প্রচলন আছে।

وَيَسْتَرْهِنُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কাউকে ঋণ দিয়ে তার বিপরীতে বন্ধক স্বরূপ কোন দ্রব্য গ্রহণ করতে পারবে তবে পুঁজি হতে ঋণ প্রদান করতে হলে অন্যান্য শরিকদের সম্মতি নিতে হবে। উল্লেখ থাকে যে, কোন শরিক কিছুতেই ব্যক্তিগত অর্থ বিনিয়োগ করে শিরকত জাতীয় পৃথক কোন কারবার খুলতে পারবে না। যেমন– কিছু লোক একত্রিতভাবে একটি ঔষধের দোকান দিল। এমতাবস্থায় তাদের কেউ ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন ঔষধের দোকান খোলার অনুমতি পেতে পারে না। এতে অংশীদারি কারবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে সে চাইলে নিজস্ব টাকায় অন্য কোন কারবার খুলতে পারবে।

يَدُ أَمَانَةٍ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ শরিকগণ প্রত্যেকে একজন আমানতদারের ন্যায় শিরকতের মালামাল সংরক্ষণ করবে এবং সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের পরও যদি কোন শরিকের হাতে যৌথ কারবারের কিছু মূলধন বা মালামাল ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে সে দায়ী হবে না। কোন অলসতার কারণে হলে অবশ্য দায়ী হবে। একইভাবে অন্য শরিকদের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে কোন মালামাল খরিদ করে যদি লোকসান দেয় তাহলে এর ক্ষতিপূরণ তাকে একাই বহন করতে হবে।

شِرْكَةُ الصَّنَائِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ শিরকতে 'উকূদের তৃতীয় প্রকার হল শিরকাতুস্ সানায়ে'। صَنَائِع শব্দটি صِنَاعَة শব্দের বহুবচন। অর্থ– কারিগরি, পেশা। পরিভাষায় শিরকতে সানায়ে' হল, মূলধন ছাড়াই দু'জন সমপেশার লোক বা দু'জন শ্রমিক এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হওয়া যে, তারা উভয়ে একত্রিতভাবে কাজ গ্রহণ করবে এবং মিলে-মিশে তা সম্পন্ন করবে। আর এতে যা রোজগার হবে তা বণ্টন করে নেবে। এ কারবারকে শিরকতে 'আমলও বলা হয়। শিরকতে 'ইনানের মতো এতেও সকলের কাজ ও মজুরি সমান হওয়া জরুরি নয়; বরং কমবেশি হতে পারে। কারণ সকলের যোগ্যতা সমান নয়। যেমন– কয়েক জন লোক একত্রিতভাবে পুকুর খননের ঠিকা নিল। এতে একজন যুবক যে পরিমাণ শ্রম দিতে পারবে স্বভাবতই একজন বৃদ্ধ সে পরিমাণ পারবে না। তদ্রূপ দু'জন দরজির মাঝেও যোগ্যতার পার্থক্য থাকতে পারে। যেমন– একজন শুধু সেলাই করতে জানে কিন্তু কাপড় কাটতে পারে না, অথচ অন্যজন কাপড় কাটায়ও যথেষ্ট দক্ষ। এমতাবস্থায় উভয়ের মজুরিতে পার্থক্য হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

عَمِلَ أَحَدُهُمَا الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ শরিকদের কেউ কোন অনিবার্য কারণবশত যদি কাজে অংশ গ্রহণে অপারগ হয়ে পড়ে যেমন– অসুস্থ হয়ে পড়ল অথবা এমনও হতে পারে যে, দুই পেশাধারী এভাবে শিরকতে চুক্তিবদ্ধ হল যে, দোকান একজনের আর বোঝা ও কার্যাদি হবে অন্য জনের, তাহলে এক্ষেত্রে একজন কাজ সমাধা দিলেও অপরজন থাকবে কাজ থকে বিরত; কিন্তু মুনাফা পাবে ঠিকঠিক মতো।

وَأَمَّا شِرْكَةُ الْوُجُوهِ فَالرَّجُلَانِ يَشْتَرِكَانِ وَلَا مَالَ لَهُمَا عَلَى أَنْ يَّشْتَرِيَا بِوُجُوهِهِمَا وَيَبِيعَا فَتَصِحُّ الشِّرْكَةُ عَلَى هٰذَا وَكُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا وَكِيلُ الْآخَرِ فِيمَا يَشْتَرِي فَإِنْ شَرَطَا أَنْ يَّكُونَ الْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا نِصْفَانِ فَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَفَاضَلَا فِيهِ - وَإِنْ شَرَطَا الْمُشْتَرٰى بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا فَالرِّبْحُ كَذٰلِكَ۔

সরল অনুবাদ ঃ শিরকতে উজূহ হল, পুঁজিহীন দু'ব্যক্তি এ মর্মে চুক্তিবদ্ধ হবে যে, তারা নিজেদের মান-সম্ভ্রমের ভিত্তিতে (ধারে পণ্যাদি) ক্রয় করবে। অতঃপর তা বিক্রি করবে (আর তাতে যা আয় হবে তা নির্দিষ্ট হারে বন্টন করে নেবে)। তবে এ ধরনের যৌথ কারবারও বৈধ। এতে প্রত্যেক শরিক যা কিছু ক্রয় করবে তাতে দ্বিতীয় জনের উকিল গণ্য হবে। যদি উভয় শরিক সিদ্ধান্ত করে থাকে যে, ক্রয়কৃত মালের দায়-দায়িত্ব তারা অর্ধেক হারে বহন করবে, তাহলে মুনাফাও সেভাবে বন্টিত হবে। তাতে কমবেশি করা জায়েয হবে না। আর যদি ক্রয়কৃত পণ্যের দায়ভার এক তৃতীয়াংশ ও দুই তৃতীয়াংশ হারে বহনের শর্ত করে, তাহলে মুনাফাও সে হারে বন্টন হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكِيلُ الْآخَرِ الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ প্রত্যেক শরিক ঋণ করে যে পণ্য সামগ্রী ক্রয় করে আনবে তার অর্ধেক সে নিজের হয়ে আর বাকি অর্ধেক তার শরিকের উকিল হয়ে ক্রয় করেছে বুঝতে হবে। আর এ নিয়মেই উল্লিখিত কারবার যৌথ কারবারে পরিণত হবে।

فَإِنْ شَرَطَا الخ **-এর আলোচনা ঃ** অর্থাৎ উভয় শরিক মিলে যদি এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেয় যে, প্রত্যেকে স্ব স্ব সম্ভ্রম ও পরিচিতির ভিত্তিতে সমান অর্ধেক হারে পণ্য আমদানি করবে তবে অর্জিত মুনাফাও সমান আধা-আধি হারে বন্টিত হতে হবে। এমতাবস্থায় যদি মুনাফায় কমবেশির শর্ত আরোপ করে অথবা দায়িত্ব কমবেশি করে নেয়ার পরও মুনাফা সমান হারে ভাগ করার শর্ত রাখে, তবে তা অগ্রাহ্য ও বাতিল বলে পরিগণিত হবে। উল্লেখ্য যে, শিরকতে সানায়ে'র যাবতীয় শর্তাবলী শিরকতে উজূহ-এর ক্ষেত্রেও আবশ্যিকভাবে পালন করতে হবে।

وَلَاتَجُوْزُ الشَّرْكَةُ فِى الْاِحْتِطَابِ وَالْاِحْتِشَاشِ وَالْاِصْطِيَادِ وَمَا اصْطَادَهُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَوْ اِحْتَطَبَهُ فَهُوَ لَهُ دُوْنَ صَاحِبِهِ وَاِذَا اشْتَرَكَا وَلِاَحَدِهِمَا بَغْلٌ وَلِلْاٰخَرِ رَاوِيَةٌ يَسْتَقِىْ عَلَيْهَا الْمَاءَ وَالْكَسْبُ بَيْنَهُمَا لَمْ تَصِحَّ الشَّرْكَةُ وَالْكَسْبُ كُلُّهُ لِلَّذِىْ اِسْتَقَى الْمَاءَ وَعَلَيْهِ اَجْرُ مِثْلِ الْبَغْلِ وَكُلُّ شِرْكَةٍ فَاسِدَةٍ فَالرِّبْحُ فِيْهَا عَلٰى قَدْرِ رَأْسِ الْمَالِ وَيَبْطُلُ شَرْطُ التَّفَاضُلِ وَاِذَا مَاتَ اَحَدُ الشَّرِيْكَيْنِ اَوْ اِرْتَدَّ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الشَّرْكَةُ وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيْكَيْنِ اَنْ يُؤَدِّىَ زَكٰوةَ مَالِ الْاٰخَرِ اِلَّا بِاِذْنِهِ فَاِنْ اَذِنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحِبِهِ اَنْ يُّؤَدِّىَ زَكٰوتَهُ فَاَدّٰى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فَالثَّانِىْ ضَامِنٌ سَوَاءٌ عَلِمَ بِاَدَاءِ الْاَوَّلِ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِنْ لَمْ يَعْلَمْ لَمْ يَضْمَنْ۔

সরল অনুবাদ ঃ কাঠ কেটে আনা, ঘাস তোলা এবং শিকার করার ব্যাপারে শিরকত (অংশীদারি ব্যবস্থা অবলম্বন) করা জায়েয নেই। (এ ধরনের শিরকতে) শরিকগণ যে যা কিছু শিকার করবে বা কাঠ কেটে আনবে তা তার নিজস্ব হবে; অপর জনের নয়। যদি দু'ব্যক্তি যাদের একজনের খচ্চর ও অপরজনের রয়েছে মশক, অংশীদারি চুক্তি করে যে, তা দ্বারা পানি আনবে এবং আয়-উপার্জন উভয়ের মাঝে (বন্টিত) হবে, তবে তাদের শিরকত শুদ্ধ হবে না। এ স্থলে সমুদয় মুনাফা পানি উত্তোলনকারীর প্রাপ্য হবে এবং খচ্চরের প্রচলিত ভাড়া প্রদান করা তার কর্তব্য হবে। ফাসিদ শিরকতের সকল ক্ষেত্রে অংশীদারগণ নিজ নিজ পুঁজি অনুপাতে মুনাফা পাবে এবং কমবেশির সিদ্ধান্ত বাতিল হবে। যদি শরীকদ্বয়ের কোন একজন মরে যায় অথবা ধর্মত্যাগী হয়ে দারুল-হরবে অবস্থান নেয়, তবে শিরকত-চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। এক শরিকের জন্য অপর শরিকের মালের যাকাত তার অনুমতি ছাড়া আদায় করা জায়েয নেই। যদি তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মালের যাকাত আদায়ের ব্যাপারে অপরজনকে অনুমতি দিয়ে রাখে এবং ফলে দু'জনই (দু'জনের) যাকাত আদায় করে ফেলে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, দ্বিতীয়জন দায়ী সাব্যস্ত হবে। চাই সে প্রথমজনের আদায়ের কথা অবগত থাকুক বা না থাকুক। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, যদি সে অবগত না থাকে তাহলে দায়ী হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَاتَجُوْزُ الشَّرْكَةُ فِى الْاِحْتِطَابِ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কয়েকজন ব্যক্তি একত্রিত হয়ে যদি বন-জঙ্গল থেকে কাঠ-খড়ি বা পতিত ভূমি থেকে ঘাস-পাতা অথবা নদ-নদী থেকে মাছ শিকার করে এনে বিক্রি করে এবং অর্জিত মুনাফা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে নেয়ার সিদ্ধান্তে চুক্তিবদ্ধ হয়, তবে তাদের এ শিরকত ফাসিদ হিসেবে পরিগণিত হবে। কেননা যৌথ কারবারের সদস্যগণ পরস্পরে একে অপরের উকিল হয়ে থাকে। আর কারো পক্ষে কোন জিনিসের উকিল তখনই হওয়া শুদ্ধ যখন উক্ত জিনিসের ওপর স্বয়ং মুয়াক্কিলের স্বত্ব বলবৎ থাকে। অথচ এ ক্ষেত্রে বন-জঙ্গলের কাঠ ও নদ-নদীর মাছে সর্বসাধারণের অধিকার স্বীকৃত বিধায় ব্যক্তিগতভাবে উকিল বা মুয়াক্কিল কারোই সে সবের ওপর মালিকানা নেই। সুতরাং এগুলো সংগ্রহের ব্যাপারে কেউ কারো পক্ষে উকিল হতে পারে না। খচ্চর দিয়ে পানি উত্তোলনের চুক্তি অশুদ্ধ হওয়ার কারণ মূলত ইহাই। এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি পানি উত্তোলন করবে চাই সে খচ্চরের মালিক হোক কিংবা মোশকের মালিক হোক, সেই সম্পূর্ণ মুনাফা প্রাপ্য হবে। আর অপরজন পাবে তার পাত্র বা জানোয়ারের যথাযথ ভাড়া।

أَنْ يُؤَدِّيَ زَكٰوتَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ এক শরিক অপর শরিকের অনুমতি ব্যতীত তার মালের যাকাত দিতে পারবে না। কেননা উভয়ের জন্য উভয়ের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে تَصَرُّف করার অধিকার রয়েছে, যাকাত দেয়ার ক্ষেত্রে নয়। এবং যদি উভয় শরিকের প্রত্যেকেই একে অপরকে স্বীয় সম্পদের যাকাত প্রদানের অনুমতি দিয়ে দিল, অতঃপর উভয়েই একজনের পর অপরজন যাকাত দিয়ে ফেলল। ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট যে ব্যক্তি পরে যাকাত আদায় করেছে সে ضَامِن হবে। চাই পূর্বে যাকাত প্রদানের কথা তার অবগত থাকুক বা না থাকুক। আর সাহেবাইনের নিকট অনবগত হওয়ার সুরতে ضَامِن হবে না।

আর যদি উভয়ে এক সাথে যাকাত আদায় করে দেয়, তবে উভয়েই ضَامِن হবে। অতঃপর مُقَاصَّه করে নেবে। যদি কারো সম্পদ বেশি হয়, তবে সে বেশি পরিমাণ ফিরিয়ে নিয়ে নেবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلشِّرْكَةُ -এর পরিচয় ও গুরুত্ব এবং শরিকি কারবারে অংশীদারের মর্যাদা কি? বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২। اَلشِّرْكَةُ -এর শ্রেণীবিভাগ কি? বিস্তারিত লিখ।

৩। اَلشِّرْكَةُ الْفَاسِدَةُ কি? এর হুকুম উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَاِذَا هَلَكَ مَالُ الشِّرْكَةِ اَوْ اَحَدُ الْمَالَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَّشْتَرِيَا شَيْئًا بَطَلَتِ الشِّرْكَةُ الخ ۔

كِتَابُ الْمُضَارَبَةِ

اَلْمُضَارَبَةُ عَقْدٌ عَلَى الشَّرِكَةِ فِي الرِّبْحِ بِمَالٍ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ وَعَمَلٍ مِنَ الْآخَرِ وَلَا تَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ إِلَّا بِالْمَالِ الَّذِي بَيَّنَّا أَنَّ الشَّرِكَةَ تَصِحُّ بِهِ وَمِنْ شَرْطِهَا أَنْ يَكُونَ الرِّبْحُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا لَا يَسْتَحِقُّ أَحَدُهُمَا مِنْهُ دَرَاهِمَ مُسَمَّاةً وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَالُ مُسَلَّمًا إِلَى الْمُضَارِبِ وَلَا يَدَ لِرَبِّ الْمَالِ فِيهِ. فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ مُطْلَقَةً جَازَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَشْتَرِيَ وَيَبِيعَ وَيُسَافِرَ وَيُبْضِعَ وَيُوَكِّلَ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَدْفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِي ذٰلِكَ أَوْ يَقُولَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ.

মুদারাবা পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ মুদারাবা হল দুই (বা ততোধিক) ব্যক্তির মুনাফায় অংশীদারিত্বের এমন চুক্তি যাতে এক জনের পুঁজি ও অন্য জনের শ্রম থাকে। যে ধরনের মাল দ্বারা শিরকত শুদ্ধ হওয়ার কথা আমরা বর্ণনা করে এসেছি তা ব্যতীত মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। (অর্থাৎ শিরকতের ন্যায় এখানেও পুঁজি টাকা-পয়সা বা তৎ স্থলবর্তী হওয়া জরুরি।) মুদারাবা (শুদ্ধ হওয়ার জন্য) আরো শর্ত হল- (ক) মুনাফা উভয়ের মাঝে যৌথ হওয়া যাতে তাদের কেউ তা থেকে নির্দিষ্ট অংকের টাকার অধিকারী না হয়। (খ) এবং কারবারের পুঁজি মুদারিবের (কারবারীর) হাতে সমর্পিত হওয়া জরুরি যাতে রব্বুলমালের (বিনিয়োগকারীর) কোন কর্তৃত্ব না থাকে।

মুদারাবা (চুক্তি) শর্তহীন হলে মুদারিবের জন্য (নিজ ইচ্ছামত) পণ্যাদি (নগদে কিংবা ধারে) ক্রয়-বিক্রয় করা, (নিজ এলাকা ছেড়ে) অন্য কোথাও গিয়ে কারবার করা, পুঁজি বাযা'আত আকারে প্রদান করা এবং (কারবারের স্বার্থে) উকিল নিযুক্ত করা জায়েয। কিন্তু এ পুঁজি (কাউকে) মুদারাবার ভিত্তিতে দেয়া জায়েয নেই। তবে রব্বুলমাল সে রকম অনুমতি দিলে কিংবা তাকে বললে যে, তুমি নিজ বিবেচনা অনুযায়ী কাজ কর।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

مُضَارَبَة -এর সংজ্ঞা ঃ مُضَارَبَة শব্দটি বাবে مُفَاعَلَة -এর মাসদার। ضَرْبٌ থেকে উদগত। অর্থ-মারা, চলাফেরা করা। এর এক অর্থ- উপার্জনের জন্য পৃথিবীতে চলাফেরা ও চেষ্টা সাধনা করা। যেহেতু এ ব্যবস্থায় একজন অর্থ যোগান দেয় এবং অন্যজন নিজের শ্রম ও উদ্যোগের মাধ্যমে অধিক অর্থ যোগাতে ও উপকৃত হতে চেষ্টা ও ছুটা-ছুটি করে সে কারণে এ কারবারকে 'মুদারাবা' নামে অভিহিত করা হয়। সে মতে অর্থ যোগানদাতাকে 'রাব্বুল-মাল' এবং শ্রমদাতাকে 'মুদারিব' বলা হয়। বিনিয়োগকৃত অর্থকে বলা হয় রা'সুলমাল।

মুদারাবা হল এক প্রকার অংশীদারি কারবার যাতে একজনের মূলধন ও অন্যজনের শ্রম থাকে। পৃথিবীতে প্রত্যেক মানুষ সমান নয়, ভবিষ্যতে কখনো সমান হওয়ার সম্ভাবনাও নেই। জন্মগত যোগ্যতার ভেদাভেদের মতো জীবিকা-উপকরণের দিক থেকেও প্রত্যেক মানুষের যোগ্যতা বরাবর হয় না। এমন বহু লোক আছে যাদের অর্থ থাকলেও শ্রম ব্যয় করে উপার্জন করার যোগ্যতা থাকে যত সামান্য। অথবা তারা অন্যান্য ব্যস্ততার দরুন নিজের অর্থ ব্যয় করে মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায় না।

অপরদিকে এমন লোকের সংখ্যাও কম নয় যারা কর্পদকশূন্য ও নিঃস্ব অথচ তাদের রয়েছে কর্ম দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা। তারা অর্থ পেলে নিজেদের দক্ষতা ও কৌশল কাজে প্রয়োগ করে অভাবের অভিশাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে এবং সংসার ছেড়ে কোন মিল মালিকের শরণাপন্ন না হয়ে স্বাধীনভাবে যথাযোগ্য মর্যাদায় জীবিকা উপার্জনের সুযোগ অর্জন করতে পারে। এজন্য ইসলামী শরীয়ত ব্যক্তিমালিকানা কারবারের ন্যায় যৌথ কারবারও মানুষের জন্য আইনসিদ্ধ করেছে। যাতে একজন

বিত্তবান লোক নিজ অর্থ কোন দরিদ্রকে দিয়ে তার শ্রম ব্যয় করিয়ে উভয়েই উপকৃত হতে পারে। এ পদ্ধতিকে মুদারাবা ও শিরকত (অংশীদারি ও যৌথ কারবার) বলে। এ কারবারের প্রতি ইসলাম শুধু সমর্থন নয়; বরং উদ্বুদ্ধও করেছে। রাসূলে পাক (সাঃ)-এর বিশিষ্ট সাহাবী হযরত ওমর, ওসমান ও আবূ মূসা (রাঃ) সহ আরো অনেকেই মুদারাবা কারবারের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মুদারাবা ঃ অতীতে মহাজনরা যে সুদী কারবার করত বর্তমানে ব্যাংকিং-ব্যবস্থা তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে। অর্থাৎ একজন মহাজন যেভাবে কারবার ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে মানুষকে সুদের ওপর টাকা ধার দিত আজ সে কাজটাই ব্যাংক সমাধা দিচ্ছে। কিন্তু এতে ঋণের ওপর সুদের বোঝা এত বেশি ভারী হয়ে পড়েছে যে, সঠিকভাবে কারবার পরিচালনা করলেও তা ফেল না করে পারে না। এজন্য কারবারী এমনভাবে কারবার করে যেন সে ব্যাংকের সুদও পরিশোধ করতে পারে, আবার নিজের পকেটও ভরতে পারে। কারবারে সৃষ্ট যাবতীয় সমস্যা মূলত এরই ফসল। যদি এর পরিবর্তে মুদারাবার ভিত্তিতে ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহলে সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

أَنْ يَكُوْنَ مُشَاعًا الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ মুনাফায় রাব্বুল-মাল ও মুদারিব উভয়ের অংশ স্থির করতে হবে। আর তা হবে মুনাফায় উভয়ের জন্য হার নির্ধারণের মাধ্যমে। যেমন– যা মুনাফা আসবে তার (অর্ধেক) অথবা (একচতুর্থাংশ) পাবে একজন, আর অন্যজন পাবে অবশিষ্ট অংশ। কিন্তু যদি এধরনের শর্ত করা হয় যে, মুদারিব বা রাব্বুল-মালের জন্য মুনাফা থেকে পাঁচশ' টাকা পৃথক করে রাখার পর অবশিষ্ট যা থাকবে তা উভয়ে বণ্টন করে নেবে, তাহলে মুদারাবা শুদ্ধ হবে না। তাছাড়া মুদারাবা শুদ্ধ হওয়ার জন্য রাব্বুল-মাল ও মুদারিব উভয়কেই জ্ঞানবান হতে হবে, অর্থাৎ কারবারের লাভ-ক্ষতি সম্পর্কে উভয়ের সম্যক জানা থাকা শর্ত, শুধু বালেগ হলে চলবে না। পাশাপাশি মূলধনের পরিমাণ কত হবে তাও নির্দিষ্ট করে নিতে হবে।

فَإِذَا صَحَّتِ الْمُضَارَبَةُ -এর আলোচনা ঃ স্মরণ রাখতে হবে যে, মুদারাবা চুক্তি দু'প্রকারের হয়ে থাকে– (ক) মুতলাক (শর্তহীন) ও (খ) মুকাইয়াদ (শর্তভিত্তিক)। মুকাইয়াদ বলতে মুদারাবার ঐ চুক্তিকে বুঝানো হয়, যাতে অর্থ বিনিয়োগকারী কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ বা কোন বিশেষ কারবারের শর্ত আরোপ করে থাকে। অর্থাৎ সে বলে দেয় যে, এ অর্থ নিয়ে তুমি কেবল অমুক স্থানে (যেমন– ঢাকা, কুমিল্লা ইত্যাদি) কারবার করতে পারবে; অন্য কোথাও পারবে না। অথবা বলে যে, শুধু এক বছরের জন্য আমি মুদারাবার হিসেবে টাকা দিচ্ছি। অথবা বলে যে, এ টাকায় কেবল বিছানা বা কাপড়ের ব্যবসা করবে; অন্য কোন ব্যবসা করবে না। আর যে মুদারাবায় এ জাতীয় কোন শর্তাদি থাকে না; বরং মুদারিবকে স্বীয় বিচার-বিবেচনার ওপর কারবার করার স্বাধীনতা দেয়া হয় তাকে বলে মুতলাক (শর্তহীন) মুদারাবা।

وَإِنْ خَصَّ لَهُ رَبُّ الْمَالِ التَّصَرُّفَ فِيْ بَلَدٍ بِعَيْنِهِ أَوْ فِيْ سِلْعَةٍ بِعَيْنِهَا لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يَّتَجَاوَزَ عَنْ ذٰلِكَ وَكَذٰلِكَ إِنْ وَقَّتَ الْمُضَارَبَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا جَازَ وَيَبْطُلُ الْعَقْدُ بِمُضِيِّهَا وَلَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَّشْتَرِيَ أَبَ رَبِّ الْمَالِ وَلَا ابْنَهُ وَلَا مَنْ يُّعْتَقُ عَلَيْهِ فَإِنْ اِشْتَرَاهُمْ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ دُوْنَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ كَانَ فِي الْمَالِ رِبْحٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَّشْتَرِيَ مَنْ يُّعْتَقُ عَلَيْهِ وَإِنْ اِشْتَرَاهُمْ ضَمِنَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَّشْتَرِيَهُمْ فَإِنْ زَادَتْ قِيْمَتُهُمْ عَتَقَ نَصِيْبُهُ مِنْهُمْ وَلَمْ يَضْمَنْ لِرَبِّ الْمَالِ شَيْئًا وَيَسْعَى الْمُعْتَقُ لِرَبِّ الْمَالِ فِيْ قِيْمَةِ نَصِيْبِهِ مِنْهُ وَإِذَا دَفَعَ الْمُضَارِبُ الْمَالَ مُضَارَبَةً عَلٰى غَيْرِهِ وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ رَبُّ الْمَالِ فِيْ ذٰلِكَ لَمْ يَضْمَنْ بِالدَّفْعِ وَلَا يَتَصَرَّفُ الْمُضَارِبُ الثَّانِيْ حَتّٰى يَرْبَحَ فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ الْمَالَ لِرَبِّ الْمَالِ۔

সরল অনুবাদ ঃ (মুদারাবা যদি মুকাইয়াদ তথা শর্তভিত্তিক হয়) এবং রব্বুলমাল তাকে কোন নির্দিষ্ট শহর বা নির্দিষ্ট পণ্যে কারবার করার কথা বলে দেয়, তাহলে তার জন্য সে শর্ত লঙ্ঘন করা জায়েয নেই। এভাবে যদি কারবারের জন্য কোন মেয়াদ নির্দিষ্ট করে দেয় তাও জায়েয হবে এবং মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার সাথে সাথে চুক্তি ভেঙে যাবে। মুদারিব রাব্বুলমালের পিতা, পুত্র অথবা এমন কাউকে ক্রয় করতে পারবে না যে রাব্বুলমালের পক্ষ থেকে (অনিবার্যভাবে) মুক্ত হয়ে যায়। তথাপি যদি ক্রয় করে, তাহলে সে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ক্রয়কারী গণ্য হবে। অপরদিকে যদি পুঁজির সাথে লব্ধ মুনাফাও যুক্ত হয়, তবে মুদারিব এমন কোন দাস-দাসীও ক্রয় করতে পারবে না যারা তার (মুদারিবের) পক্ষ থেকে মুক্ত হয়ে যায়। যদি ক্রয় করে, তাহলে মুদারাবার পুঁজি (ক্ষতি হওয়ার) জন্য সে দায়ী হবে। পক্ষান্তরে যদি পুঁজিতে মুনাফা যুক্ত না হয়, তাহলে সে তাদের ক্রয় করতে পারবে। অতঃপর যদি তাদের দাম বেড়ে যায় তাহলে তারা তার অংশ পরিমাণ (আইনত এবং অবশিষ্ট অংশ অনিবার্য কারণে) আযাদ হয়ে যাবে এবং এতে মুদারিব রব্বুলমালকে কোনরূপ ক্ষতিপূরণ দেবে না। মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বরং রব্বুলমালকে তার ভাগ পরিমাণ অর্থ (পরিশোধের) জন্য চেষ্টা চালাবে। মুদারিব যদি রব্বুলমালের অনুমতি ব্যতীত অন্য কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে পুঁজি প্রদান করে, তাহলে সে শুধুমাত্র প্রদান কিংবা দ্বিতীয় মুদারিব তা কারবারে খাটানোর কারণে দায়ী সাব্যস্ত হবে না; বরং দ্বিতীয় মুদারিব যখন কিছু মুনাফা অর্জন করবে তখন প্রথম মুদারিব পুঁজি-মালিকের জন্য মালের জামিন হবে (অর্থাৎ তখনই তাকে রাব্বুলমালের পুঁজি ফিরিয়ে দিতে হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَّشْتَرِيَ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ এতে মুদারাবা কারবারের আসল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে। কেননা এ শ্রেণীর কারবারের মূল উদ্দেশ্য থাকে উভয়ে কমবেশি মুনাফা অর্জন করা। আর ক্রয়কৃত পণ্য পুনরায় বিক্রির সুযোগ থাকলেই তবে মুনাফা অর্জনের আশা করা যায়। কিন্তু যে সকল গোলাম-বাঁদি রাব্বুল-মালের আত্মীয় হওয়ায় বা অন্য কোন কারণে তার অধিকারভুক্ত হওয়ার সাথে সাথে স্বতঃই মুক্ত হয়ে যায়, তাদের খরিদ করার পর পুনরায় বাজারজাত করার সুযোগ কোথায়? এতদসত্ত্বেও যদি মুদারিব এ প্রকারের দাস-দাসী ক্রয় করে, তবে তার ব্যক্তিগত স্বার্থে ক্রয় করেছে বলে সাব্যস্ত হবে অর্থাৎ এজন্য তাকেই দায়ী করা হবে। অর্থাৎ এদের ক্রয়খাতে মুদারাবার যে পরিমাণ মূলধন খরচ হয়েছে কেমন যেন মুদারিব স্বেচ্ছায় সে পরিমাণ মূলধন বিনষ্ট করে ফেলেছে। কাজেই মুদারিব রাব্বুল-মালকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এ পরিমাণ

টাকা দিয়ে দিতে বাধ্য থাকবে। এ মাসআলা থেকে বুঝা গেল মুদারিব যদি মুদারাবার মূলধন ব্যয় করে এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করে যাতে লোকসান নিশ্চিত এবং বাস্তবে হলও তাই অথবা স্বেচ্ছায় বা উদাসীনতার বশবর্তী হয়ে কোন দ্রব্য লোকসান দিয়ে বিক্রি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে এ ক্ষতির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার তার নিজেকেই বহন করতে হবে, রাব্বুর-মালের ওপর তা চাপানো যাবে না।

وَإِنْ كَانَ فِى الْمَالِ رِبْحٌ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, মূলধনের পরিমাণ ছিল এক হাজার টাকা. তা ব্যবসায়ে প্রয়োগের পর দু'শ টাকা মুনাফা হল। এবার মূলধনের সাথে এ দু'শ টাকাসহ যোগ করে মোট বারশ' টাকা কারবারে বিনিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হল। এমতাবস্থায় মুদারিব যেমন রাব্বুল-মালের ঘনিষ্ট কাউকে খরিদ করতে পারবে না তেমনি স্বীয় কোন যী-রেহ্‌মে-মাহ্‌রামকেও খরিদ করার অনুমতি পাবে না। কেননা যদি খরিদ করে, তবে ব্যয়িত টাকায় তারও কিছু অংশ (অর্থাৎ একশ' টাকা) রয়েছে বিধায় উক্ত গোলাম তার পক্ষ থেকে আপনা-আপনি মুক্ত হয়ে যাবে। সে মতে গোলামের ক্রয়কৃত মূল্য যদি বারশ' টাকা হয়, তবে সর্ব প্রথম মুদারিবের অংশ অর্থাৎ একশ' টাকা পরিমাণ আইনত মুক্ত হবে। অতঃপর অবশিষ্ট অংশ মুক্ত হবে অনিবার্য কারণে। কেননা দাসত্ব-মুক্তি বিভাজ্য নয়। আর এতে করে মুদারাবা কারবারই সিকেয় ওঠবে।

فَإِنْ زَادَتْ قِيْمَتُهَا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন মুদারিব তার কোন যবীল্-আর্‌হামকে এক হাজার টাকায় খরিদ করল। অতঃপর ক্রয়কৃত গোলামের মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে হল দু'হাজার টাকা। এ স্থলে আধা-আধি মুনাফা বণ্টনের শর্তে মুদারাবা-চুক্তি হয়ে থাকলে (এক চতুর্থাংশ) গোলামের মধ্যে তখন মুদারিবের মালিকানা আছে বলে সাব্যস্ত হবে। ফলে প্রথমত গোলামের এক চতুর্থাংশ আইনত অতঃপর অবশিষ্ট অংশ অনিবার্য কারণে মুক্ত হয়ে যাবে। এ ক্ষেত্রে যদিও মুদারাবা-মূলধনের এক হাজার টাকা ক্ষতি হয়ে গেল; কিন্তু যেহেতু এ ক্ষতি মুদারিব ইচ্ছাকৃতভাবে করেনি সে জন্য তাকে দায়ী করা যাবে না।

فَإِذَا رَبِحَ ضَمِنَ الْمُضَارِبُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ দ্বিতীয় মুদারিব উক্ত মূলধন ব্যবসায়ে প্রয়োগের পর যখন তা থেকে কিছুটা মুনাফা লাভ করবে, তখনই প্রথম মুদারিবকে দায়ী সাব্যস্ত করা যাবে, নতুবা দায়ী করা যাবে না। এটা মূলত ইমাম হাসান (রঃ) সূত্রে বর্ণিত ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত। কিন্তু যাহিরুর-রেওয়ায়াতে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর যে মত উদ্ধৃত হয়েছে তাতে তিনি সুস্পষ্টভাবে বলেছেন যে, দ্বিতীয় মুদারিব কর্তৃক কারবারে মূলধন বিনিয়োগ হওয়াই প্রথম মুদারিবের দায়ী হওয়ার জন্য যথেষ্ট; মুনাফা অর্জনের প্রশ্ন একেবারেই অর্থহীন। বস্তুত ইমাম সাহেবাইন (রঃ) ও এ মতেরই পক্ষপাতী। কারণ দ্বিতীয় মুদারিব কারবারে মূলধন বিনিয়োগ করার দ্বারাই প্রমাণিত হয়ে যায় যে, এটা ভিন্ন মুদারাবা- যার সম্মতি প্রথম মুদারিবকে দেয়া হয়নি। অবশ্য দ্বিতীয় মুদারিবের নিকট শুধুমাত্র মূলধন হস্তান্তর করার কারণেই প্রথম মুদারিবকে দায়ী করা যাবে না। কেননা মুদারিবের জন্য মুদারাবা-পুঁজি অপর কারো নিকট আমানত রাখার সম্মতি যখন আছে তখন হতে পারে সে এ সমর্পণ আমানতস্বরূপ করেছে। হাঁ, দ্বিতীয় মুদারিব ব্যবসায়ে প্রয়োগ করে ফেললে প্রমাণিত হবে যে, এ সম্প্রদান আমানতস্বরূপ ছিল না। উল্লেখ্য যে, এখানে মুদারিবের দায়ী হওয়ার মানে হল লাভ-লোকসান যাই হোক না কেন পুঁজি-মালিককে তার সম্পূর্ণ পুঁজি যথাশীঘ্র ফিরিয়ে দিতে হবে।

وَإِذَا دَفَعَ إِلَيْهِ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَّدْفَعَهَا مُضَارَبَةً فَدَفَعَهَا بِالثُّلُثِ جَازَ فَإِنْ كَانَ رَبُّ الْمَالِ قَالَ لَهُ عَلٰى أَنَّ مَارَزَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِىْ ثُلُثُ الرِّبْحِ وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ وَإِنْ كَانَ قَالَ عَلٰى أَنَّ مَا رَزَقَكَ اللّٰهُ فَهُوَ بَيْنَنَا نِصْفَانِ فَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِى الثُّلُثُ وَمَا بَقِيَ بَيْنَ رَبِّ الْمَالِ وَالْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ نِصْفَانِ - فَإِنْ قَالَ عَلٰى أَنَّ مَا رَزَقَ اللّٰهُ فَلِي نِصْفُهُ فَدَفَعَ الْمَالَ إِلٰى اٰخَرَ مُضَارَبَةً بِالنِّصْفِ فَلِلثَّانِىْ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِرَبِّ الْمَالِ النِّصْفُ وَلَا شَيْءَ لِلْمُضَارِبِ الْأَوَّلِ فَإِنْ شَرَطَ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِىْ ثُلُثَيِ الرِّبْحِ فَلِرَبِّ الْمَالِ نِصْفُ الرِّبْحِ وَلِلْمُضَارِبِ الثَّانِىْ نِصْفُ الرِّبْحِ وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْأَوَّلُ لِلْمُضَارِبِ الثَّانِىْ مِقْدَارَ سُدُسِ الرِّبْحِ مِنْ مَالِهِ -

সরল অনুবাদ ঃ যদি পুঁজি মালিক মুদারিবকে আধা-আধি মুনাফা শর্তে পুঁজি প্রদান করে এবং অপর কাউকে মুদারাবার ভিত্তিতে দেয়ারও অনুমতি প্রদান করে, ফলে সে তৃতীয়াংশ মুনাফার শর্তে কাউকে পুঁজি প্রদান করে তবে তা জায়েয হবে। এ স্থলে মালিক যদি বলে থাকে, আল্লাহ পাক এ পুঁজিতে সর্বমোট যা মুনাফা দেবেন তা আমাদের মাঝে অর্ধেক হারে বন্টিত হবে, তাহলে মুনাফার অর্ধেক মালিকের, তৃতীয়াংশ দ্বিতীয় মুদারিবের আর বাকি ষষ্ঠাংশ প্রথম মুদারিবের জন্য হবে। আর যদি বলে থাকে, আল্লাহ পাক এ পুঁজিতে তোমাকে যা মুনাফা দান করবেন তা আমাদের মাঝে আধা-আধি হারে বন্টিত হবে। তাহলে দ্বিতীয় মুদারিব প্রাপ্য হবে মোট মুনাফার তৃতীয়াংশ এবং বাকি দুই তৃতীয়াংশ রব্বুলমাল এবং প্রথম মুদারিবের মাঝে আধা-আধি হারে বন্টিত হবে। কিন্তু রব্বুলমাল যদি বলে, আল্লাহ যা কিছু দেবেন তার অর্ধেক আমার। অতঃপর মুদারিব আধা-আধি মুনাফার শর্তে অন্য কাউকে পুঁজি প্রদান করে, তাহলে (সাকুল্য) মুনাফার অর্ধেক দ্বিতীয় মুদারিব এবং বাকি অর্ধেক রব্বুলমাল প্রাপ্য হবে, প্রথম মুদারিবের জন্য কিছুই প্রাপ্য হবে না। পক্ষান্তরে যদি দ্বিতীয় মুদারিবের জন্য দুই তৃতীয়াংশ মুনাফা শর্ত করে, তাহলে মুনাফার অর্ধেক রব্বুলমাল এবং অপর অর্ধেক দ্বিতীয় মুদারিব পেয়ে যাবে এবং (সিদ্ধান্ত অনুযায়ী) প্রথম মুদারিব দ্বিতীয় মুদারিবকে মুনাফার ষষ্ঠাংশ নিজ পকেট থেকে ভর্তুকি দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَّدْفَعَهَا الخ-এর আলোচনা ঃ এ মাসআলা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, পুঁজি-মালিক যদি মুদারিব (কারবারী)-কে তার নিজ বুদ্ধি-বিবেচনা মোতাবেক পুঁজি খাটানোর সম্মতি দিয়ে রাখে, তাহলে সে সরাসরি যেমন কারবার করতে পারে, তেমনি অন্য লোক মারফতও কারবার করতে পারে।

وَلِلْأَوَّلِ السُّدُسُ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ প্রথম مُضَارِب-এর জন্য উহার এক ষষ্ঠাংশ হবে। কেননা رَبُّ الْمَالِ দ্বিতীয় مُضَارِب-কে مُضَارَبَة-এর ভিত্তিতে মাল দিয়েছে। আর এ দেয়াটা বৈধও রয়েছে। কেননা مُضَارِب اَوَّل

যিনি তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং رَبُّ الْمَالِ পূর্ণ লাভের অর্ধেক নিজে পাওয়ার শর্ত করেছেন। কাজেই তার জন্য অর্ধেক হবে। আর مُضَارِب ثَانِى-এর জন্য শর্তানুযায়ী ثُلُث বা এক তৃতীয়াংশ হবে। সুতরাং এখন যে سُدُس বাকি রইল তা مُضَارِب اَوَّل -এর জন্য হবে।

وَلَا شَيْئَ لِلْمُضَارِبِ الْاَوَّلِ الخ -এর আলোচনা ঃ এ জন্য যে, رَبُّ الْمَالِ মতলক লাভের অর্ধেক বা نِصْف নিজের জন্য সাব্যস্ত করেছেন। কাজেই مُضَارِب اَوَّل - مُضَارِب -এর نِصْف-এর শর্ত مُضَارِب ثَانِى -এর জন্য হবে এবং مُضَارِب ثَانِى -এর نِصْف বা অর্ধেক হবে, আর رَبُّ الْمَالِ তিনিও نِصْف পাবেন। এবং مُضَارِب اَوَّل -এর কিছুই মিলবে না। যেমন- কোন দরজি এক টাকায় একটি কাপড় সেলাই করার জন্য নিল এবং অন্য একজন দরজিকে এক টাকার বিনিময় সেলাই করার জন্য দিল।

وَيَضْمَنُ الْمُضَارِبُ الْاَوَّلُ الخ -এর আলোচনা ঃ এটা এজন্য যে, رَبُّ الْمَالِ নিজের জন্য মতলকভাবে অর্ধেকের শর্ত করেছেন, কাজেই তার জন্য অর্ধেক হবে। এবং مُضَارِب ثَانِى তিনি مُضَارِب اَوَّل-এর শর্তানুসারে দুই ثُلُث -এর অংশীদার হবেন। কেননা مُضَارِب اَوَّل অনুমতি প্রাপ্ত হওয়ার কারণে তার শর্ত বিশুদ্ধ হবে। কিন্তু رَبُّ الْمَالِ -এর হকে এ শর্ত প্রযোজ্য হবে না। কেননা مُضَارِب اَوَّل রাব্বুলমালের শর্ত বিকৃতি করার অধিকার রাখে না। কাজেই مُضَارِب ثَانِى -এর জন্য سُدُس বা এক ষষ্ঠাংশের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা সে (مُضَارِب اَوَّل) مُضَارِب ثَانِى -এর জন্য مُضَارَبَة -এর عَقْد দ্বারা দুই ثُلُث প্রদানের জিম্মাদার হয়েছিল। কাজেই তাকে তার প্রদত্ত অঙ্গীকার পূরণ করা আবশ্যক হবে।

وَإِذَا مَاتَ رَبُّ الْمَالِ أَوِ الْمُضَارِبُ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِذَا ارْتَدَّ رَبُّ الْمَالِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الْمُضَارِبَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِعَزْلِهِ حَتّٰى اشْتَرٰى أَوْ بَاعَ فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ وَالْمَالُ عُرُوضٌ فِي يَدِهِ فَلَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَمْنَعُهُ الْعَزْلُ مِنْ ذٰلِكَ ثُمَّ لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ بِثَمَنِهَا شَيْئًا آخَرَ وَإِنْ عَزَلَهُ وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ أَوْ دَنَانِيرُ قَدْ نَضَّتْ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيهَا وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ دُيُونٌ وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ فِيهِ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى اقْتِضَاءِ الدُّيُونِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْمَالِ رِبْحٌ لَمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْتِضَاءُ وَيُقَالُ لَهُ وَكِّلْ رَبَّ الْمَالِ فِي الْاِقْتِضَاءِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ রব্বুলমাল অথবা মুদারিব মারা গেলে মুদারাবা-চুক্তি ভেঙে যাবে। (এভাবে) রব্বুলমাল ইসলাম ত্যাগী হয়ে দারুল-হরবে আশ্রয় নিলেও মুদারাবা বাতিল হয়ে যাবে। পুঁজি-মালিক যদি মুদারিবকে অব্যাহতি দেয়, আর সে তা জানতে না পারে ফলে ক্রয়-বিক্রয় (ও ব্যবসায়ের অন্যান্য কার্যক্রম অব্যাহত) রাখে, তবে তা জায়েয হবে। মূলধন পণ্যসামগ্রীতে লেগে থাকা অবস্থায় যদি মুদারিব তার অব্যাহতির কথা জানে, তবে (নগদ পুঁজি সংগ্রহের স্বার্থে) সে তা বিক্রি করতে পারবে। পদচ্যুতি তাকে এতে বাধা দেবে না। তবে বিক্রয় লব্ধ অর্থে পুনরায় কিছু ক্রয় করতে পারবে না। কিন্তু অব্যাহতির সময় মূলধন নগদ মুদ্রায় বিদ্যমান থাকলে মুদারিব তাতে কোনরূপ তাসাররুফ করতে পারবে না। টাকা-পয়সা (বিভিন্ন জনের নিকট) ঋণ আকারে পড়ে থাকা অবস্থায় যদি রব্বুলমাল এবং মুদারিব তাদের কারবার গুটিয়ে নেয়, তবে মুদারিব কারবার থেকে লাভ পেয়ে থাকলে আদালত তাকে বকেয়া উসুল করে দেয়ার জন্য বাধ্য করবে। আর যদি ব্যবসায়ে লাভ না হয়ে থাকে, তবে বকেয়া উসুল করা তার আবশ্যক নয়। তাকে বরং বলা হবে, তুমি (দেনাদারদের তালিকা পেশ করে) রব্বুলমালকে উসুলের দায়িত্ব দিয়ে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা রাব্বুলমাল ও মুদারিবের মর্যাদা হল যথাক্রমে মুয়াক্কেল ও উকিলের মর্যাদা। আর ওকালত বা প্রতিনিধিত্ব চুক্তি টিকে থাকার প্রধানতম শর্ত হল উভয়ের সুস্থ শরীরে জীবিত থাকা। এভাবে ধর্মত্যাগী হয়ে এদের কেউ যদি দারুল-হরবে চলে যায় এবং ইসলামী সরকার তা গ্রহণ করে নেয়, তাহলে মুদারাবা খতম হয়ে যাবে। কারণ ইসলামদ্রোহীতাও মৃত্যুরই নামন্তর। তবে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাতিলের ঘোষণা দিয়ে দেয়া জরুরি। এভাবে নির্দিষ্ট মেয়াদের ভিত্তিতে চুক্তি হয়ে থাকলে মেয়াদ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উভয়েরই কারবার গুটিয়ে নেবার অধিকার থাকবে।

وَإِنْ عَزَلَ رَبُّ الْمَالِ الخ -এর আলোচনা ঃ মুদারিবকে অব্যাহতি দেয়ার মানে হল রাব্বুলমালের এককভাবে মুদারাবা-চুক্তি ভেঙে ফেলা। স্মরণ রাখতে হবে, মুদারাবা-চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর এককভাবে কোন এক পক্ষ তা রহিত করতে চাইলে এর দু'অবস্থা হতে পারে– (ক) হয়তো এখনো মুদারিব তার কারবার সূচনাই করেনি, এক্ষেত্রে তাদের যে কেউ ইচ্ছা করলে অপর জনের অনুমতি ছাড়াই চুক্তি রহিত করতে পারবে। এতে সকল ইমামের ঐকমত্য রয়েছে। (খ) অথবা মুদারিব কারবার শুরু করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে ইমাম মালেক (রঃ)-এর মত হল, তাদের কারোই তখন চুক্তি ভঙ্গের অধিকার থাকবে

না। এমনকি মুদারিব মৃত্যুবরণ করলেও তার সন্তানদের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করবে। কেননা কারবার আরম্ভ করার পর তা ভঙ্গ করলে মুদারিবের কষ্ট হবে এবং শ্রম ও সমর্থ ব্যর্থ হবে। কিন্তু ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, সর্বাবস্থায় তাদের কারবার রহিত করার অধিকার রয়েছে। রহিত করার পর মুদারিব যতটুকু কাজ করেছে সেই কাজের প্রচলিত পারিশ্রমিক তাকে দিয়ে দিতে হবে। সে তখন মুনাফার অংশীদার হবে না; বরং সাধারণ আজীর হিসেবে গণ্য হবে। কিন্তু যদি উভয়ের সম্মতিতে কারবারের সমাপ্তি টানা হয়, তবে কথা মতোই লাভ-লোকসানের অংশীদার হবে।

وَإِذَا افْتَرَقَا وَفِي الْمَالِ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি رَبُّ الْمَالِ ও مُضَارِب উভয়েই عَقْد ভঙ্গ করার পর পৃথক হয়ে যায় এবং مُضَارَبَة -এর মাল মানুষের ওপর ঋণ হয় এবং مُضَارِب ব্যবসায় লাভবান হয়, তখন مُضَارِب -কে ঋণ আদায় করার ওপর বাধ্য করা হবে। কেননা مُضَارِب মজদুরের ন্যায় এবং লাভ হল اُجرت বা প্রতিদানের ন্যায়। কাজেই তাকে কার্য সম্পাদনে বাধ্য করা হবে। আর যদি তার লাভ না হয় তখন বাধ্য করা হবে না। কেননা সে مُتَبَرِّع বা দায়িত্ব মুক্ত। আর مُتَبَرِّع -এর ওপর جَبَر করা যায় না। তাকে বলা হবে যে, তুমি ঋণ পরিশোধের জন্য رَبُّ الْمَالِ -কে وَكِيل বানিয়ে দাও, যাতে করে তার সম্পদ নষ্ট না হয়ে যায়।

وَلَمْ يَلْزَمْهُ الْاِقْتِضَاءُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা মুদারিব যখন কারবার থেকে মুনাফা অর্জন করে, তখন বুঝতে হবে সে নিজের পরিশ্রমের বিনিময় পেয়ে গেছে। সুতরাং কারবারের বাকি কাজ অর্থাৎ বকেয়া উসুল করার দায়িত্বও তখন তার ওপর বর্তায়। কিন্তু মুনাফা না পেলে মুদারিবের অতিক্রান্ত শ্রম নিছক অনুগ্রহমূলক ছিল বলে সাব্যস্ত হয়। এমতাবস্থায় বকেয়া আদায়ের কাজ সমাধা দিলে তাও তার অনুগ্রহই গণ্য হবে। কিন্তু ব্যাপার হল, কাউকে তো অনুগ্রহমূলক কাজের জন্য বাধ্য করা যায় না।

وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَهُوَ مِنَ الرِّبْحِ دُوْنَ رَأْسِ الْمَالِ فَإِنْ زَادَ الْهَالِكُ عَلَى الرِّبْحِ فَلَا ضَمَانَ عَلَى الْمُضَارِبِ فِيْهِ وَإِنْ كَانَا يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ الْمَالُ كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ تَرَادَّا الرِّبْحَ حَتّٰى يَسْتَوْفِيَ رَبُّ الْمَالِ رَأْسَ الْمَالِ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ نَقَصَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَضْمَنِ الْمُضَارِبُ وَإِنْ كَانَا اِقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَفَسَخَا الْمُضَارَبَةَ ثُمَّ عَقَدَاهَا فَهَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ لَمْ يَتَرَادَّا الرِّبْحَ الْأَوَّلَ وَيَجُوْزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يَبِيْعَ بِالنَّقْدِ وَالنَّسِيْئَةِ وَلَا يُزَوِّجُ عَبْدًا وَلَا أَمَةً مِنْ مَالِ الْمُضَارَبَةِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ মুদারাবায় যা লোকসান হবে তা মুনাফা থেকে যাবে; মূলধন থেকে নয়। কিন্তু যদি মুনাফার চেয়ে ক্ষয়-ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যায়, তাহলে এ বাড়তি লোকসানের দায় মুদারিবের ওপর বর্তাবে না। যদি তারা লভ্যাংশ বন্টন করে নেয় আর মুদারাবা সে অবস্থায় বাকি থাকে এবং তারপর সম্পূর্ণ কিংবা আংশিক মূলধন ক্ষতি হয়ে যায়, তাহলে উভয়ে নিজ নিজ লভ্যাংশ ফিরিয়ে দেবে, যাতে রব্বুলমাল তার (সম্পূর্ণ) পুঁজি উঠিয়ে আনতে পারে। এক্ষেত্রে (মূলধনের কোটা পূর্ণ হওয়ার পর) যদি কিছু বাড়তি থাকে তাহলে তা তাদের মাঝে বণ্টিত হবে। কিন্তু যদি মূলধনে ঘাটতি থেকে যায় তবে তা মুদারিব বহন করবে না। পক্ষান্তরে তারা মুনাফা বন্টন করে নিয়ে যদি মুদারাবা মিটিয়ে ফেলে অতঃপর পুনরায় মুদারাবা চুক্তি করে এবং তাতে পুঁজি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে (পুঁজি দাঁড় করানোর জন্য) তারা প্রথমবারের মুনাফা ফিরিয়ে দেবে না। মুদারিব নগদ ও ধারে বিক্রি করতে পারবে; কিন্তু মুদারাবার পণ্যভুক্ত গোলাম বা বাঁদিকে বিয়ে দিতে পারবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَا هَلَكَ مِنْ مَالِ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ মুদারাবার যাবতীয় ক্ষয়-ক্ষতি ও খরচ মুনাফা থেকে বহন করা হবে। যেমন– কোন মুদারিব এক হাজার টাকার দ্রব্য ক্রয় করে দু'শ টাকা মুনাফা পেল এবং ইতোমধ্যে একশ' টাকার দ্রব্য চুরিও হয়ে গেল অথবা অন্য কোন প্রকারে বিনষ্ট হল, তাহলে একশ' টাকা মূলধনের সাথে মিশে যাবে এবং অবশিষ্ট একশ' টাকা দু'জনে বন্টন করে নেবে। কিন্তু যদি এ ক্ষতির পরিমাণ মুনাফার পরিমাণের চাইতে অধিক হয়, তাহলে মুদারিবের কোন দায়িত্ব থাকবে না; বরং ক্ষতি বহন করবে একা রাব্বুলমাল (পুঁজি-মালিক)। ধরুন উক্ত উদাহরণে পাঁচশ' টাকা লোকসান হল বা ক্ষতি হল তাহলে মুনাফার দু'শত টাকা তো মূলধনের সাথে মিশে যাবে। তারপরও এক হাজার টাকা পূর্ণ হতে আরো তিনশত টাকার ফের থেকে যায়, এটা পুঁজি-মালিক থেকে যাবে; মুদারিব থেকে নেয়া যাবে না। তবে শর্ত হল, মুদারিবের অলসতার দরুন এমন না হওয়া চাই। সে অবহেলা করে অথবা দ্রব্য ক্রয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে লোকসান দিলে সেজন্য সেই দায়ী হবে। কিন্তু কোন আকস্মিক কারণে অথবা ব্যবসার তেজী-মন্দার কারণে হলে মুদারিব দায়ী হবে না।

وَيَجُوْزُ لِلْمُضَارِبِ الخ-এর আলোচনা ঃ একইভাবে নগদ ও বাকি বিক্রির ন্যায় দ্রব্য বন্ধক দেয়া, আমানত রাখা এবং কারো দায়িত্বে ন্যস্ত করার অধিকারও মুদারিবের থাকবে এবং এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে গিয়ে কারবার করতে পারবে। মুদারাবা-কারবার সম্বন্ধে যাবতীয় ব্যয় এমনকি মুদারিবের নিজের চিকিৎসা ব্যয় পর্যন্ত মুনাফা নতুবা মূলধন থেকে গ্রহণ করতে পারবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْمُضَارَبَةُ-এর সংজ্ঞা ও হুকুম বর্ণনা কর।
২। اَلْمُضَارَبَةُ-এর প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩। اَلْمُضَارَبَةُ-এর চুক্তি ভঙ্গের কারণগুলো তার বিধানসহ বিশদভাবে আলোচনা কর।
৪। اَلْمُضَارَبَةُ-এর মধ্যে লোকসান হলে তার বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।
৫। مُضَارِب-এর অধিকার সম্পর্কে যা জান লিখ।
৬। ব্যাংকিং ব্যবস্থা ও মুদারাবা সম্পর্কে যা জান বুঝিয়ে লিখ।

كِتَابُ الْوَكَالَةِ

كُلُّ عَقْدٍ جَازَ أَنْ يَّعْقِدَهُ الْإِنْسَانُ بِنَفْسِهِ جَازَ أَنْ يُّوَكِّلَ بِهِ غَيْرَهُ وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ فِىْ سَائِرِ الْحُقُوْقِ وَإِثْبَاتِهَا وَيَجُوْزُ بِالْاِسْتِيْفَاءِ إِلَّا فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ فَإِنَّ الْوَكَالَةَ لَاتَصِحُّ بِاسْتِيْفَائِهَا مَعَ غَيْبَةِ الْمُوَكِّلِ عَنِ الْمَجْلِسِ وَقَالَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ إِلَّا بِرِضَاءِ الْخَصْمِ إِلَّا أَنْ يَّكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مَرِيْضًا أَوْ غَائِبًا مَسِيْرَةَ ثَلٰثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِغَيْرِ رِضَاءِ الْخَصْمِ وَمِنْ شَرْطِ الْوَكَالَةِ أَنْ يَّكُوْنَ الْمُوَكِّلُ مِمَّنْ يَّمْلِكُ التَّصَرُّفَ وَيَلْزَمُهُ الْأَحْكَامُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَّعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ وَإِذَا وَكَّلَ الْحُرُّ الْبَالِغُ أَوِ الْمَأْذُوْنُ مِثْلَهُمَا جَازَ وَإِنْ وَكَّلَ صَبِيًّا مَحْجُوْرًا يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ أَوْ عَبْدًا مَحْجُوْرًا جَازَ وَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الْحُقُوْقُ وَيَتَعَلَّقُ بِمُوَكِّلِيْهِمَا.

ওকালাত পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যে সকল কারবার মানুষ নিজে করার অধিকার রাখে তার জন্য সে অন্য কাউকে উকিলও বানাতে পারে। সর্ব প্রকার ন্যায্য পাওনা ও তা প্রমাণের ক্ষেত্রে জেরা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা জায়েয। এবং জায়েয উক্ত পাওনা আদায় করে আনার জন্য উকিল নিয়োগ করা। ব্যতিক্রম হল হুদূদ এবং কিসাস; কেননা মুয়াক্কেল নিজে মজলিসে অনুপস্থিত থেকে উসুলের জন্য উকিল নিযুক্তি করা দুরস্ত নেই। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, বিবাদীর সম্মতি ব্যতীত জেরার জন্য উকিল নিযুক্ত করা জায়েয নেই। তবে মুয়াক্কেল অসুস্থ হলে অথবা তিন কিংবা ততোধিক দিনের দূরত্বে অবস্থানরত হলে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, বিপক্ষের সম্মতি ব্যতীতও উকিল নিয়োগ জায়েয। উকিল নিযুক্তির জন্য আরো শর্ত হল, মুয়াক্কেল এমন ব্যক্তি হতে হবে যে হস্তক্ষেপ (কারবার) করার ক্ষমতা রাখে এবং কারবারের বিধানও তার ওপর বর্তায়। আর উকিল হতে হবে এমন যে কারবার সম্পর্কিত জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তি রাখে। সে মতে যদি স্বাধীন বালেগ ব্যক্তি অথবা ব্যবসায়ে অনুমতি প্রাপ্ত গোলাম তাদের সমতুল্য কাউকে উকিল বানায়, তবে তা জায়েয আছে। যদি এমন হজরভুক্ত শিশুকে যে কারবার বুঝে অথবা হজরভুক্ত গোলামকে উকিল বানায় তাও জায়েয আছে। তবে তাদের সাথে (কারবার-পরবর্তী) দায়-দায়িত্ব সম্পৃক্ত হবে না; সম্পৃক্ত হবে তাদের মুয়াক্কেলের সাথে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْوَكَالَةُ-এর পরিচয় ঃ وَكَالَةٌ-এর শাব্দিক অর্থ– তত্ত্বাবধান ও হেফাজত, আশ্রয় প্রদান ও কর্ম সম্পাদন। এ কারণে আল্লাহ পাকের একটা সিফাত হল 'উকিল'। কেননা তিনি আমাদের যাবতীয় কাজের তত্ত্বাবধায়ক, সংরক্ষক ও সম্পাদনকারী। এর থেকে তাওকীল শব্দের উৎপত্তি। অর্থ– তত্তাবধায়ক নির্ধারণ করা অথবা কারো ওপর একটি কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা।

ওকালাত (وَكَالَة) শব্দটি তাওকীল (تَوْكِيل) শব্দের অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ শব্দটি مُتَعَدِّى ও لَازِم উভয়ই হতে পারে। পরিভাষায় ওকালত হল- تَفْوِيضُ اَحَدٍ اَمْرَهُ لِاٰخَرَ وَاِقَامَتُهُ مَقَامَهُ অর্থাৎ "কোন ব্যক্তি নিজের একটা কাজের দায়িত্ব অন্য কাউকে প্রদান করা এবং তাকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে দেয়া।" সে মতে দায়িত্ব অর্পণকারী ব্যক্তিকে মুয়াক্কেল, দায়িত্ব অর্পিত ব্যক্তিকে উকিল এবং যে কাজের দায়িত্ব প্রদান করা হয় তাকে মুয়াক্কালবিহী বলা হয়। যেমন- আহমদের একটা ঘড়ি কেনা প্রয়োজন কিন্তু সে ঘড়ির ভালো-মন্দ চিনে না। এজন্য সে ঘড়ির যন্ত্রাংশ সম্পর্কে অভিজ্ঞ খালেদকে বলল, আপনি আমাকে এত টাকার মধ্যে একটা ঘড়ি কিনে দিন। খালেদ তার সাথে ঘড়ি ক্রয়ের প্রস্তুতি নিল। তাহলে আহমদ হল মুয়াক্কেল, খালেদ উকিল, আর ঘড়ি খরিদ হল মুয়াক্কালবিহী।

اَلْوَكَالَةُ -এর প্রয়োজনীয়তা ঃ মানব জীবনে এমন অনেক কাজ আসে যা সে নিজে সম্পন্ন করতে পারে না; বরং অন্যের দ্বারা তা করিয়ে নেয়। কোন কাজ সম্পন্ন করতে না পারার পিছনে কয়েকটা কারণ সন্নিহিত থাকে। কখনো এমন হয় যে, উক্ত কাজ সম্পন্ন করার যোগ্যতা ও সামর্থ্য তার নেই। কখনো এমনও হয় যে, সে একটা কাজে লিপ্ত থাকা অবস্থায় অপর কোন কাজ সামনে এসে যায়। ফলে তাকে বাধ্য হয়ে আরেক জনের সহযোগিতা নিতে হয়। অথবা তার কাজটা এত ব্যাপক ভিত্তিক যে, তার একার পক্ষে পুরো কাজটা সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। তখন তাতে অন্যদের অন্তর্ভুক্ত করে নিতে হয়। মোট কথা, মানুষ নিজে যে কাজ করতে পারে তা অন্যদের দিয়েও করিয়ে নিতে পারে। শরীয়তে এর সম্মতি রয়েছে। ইসলামী শরীয়তে এরই নাম ওকালতি বা ক্ষমতা প্রদান।

ওকালাতের ক্ষেত্র ঃ প্রায় সব ধরনের কাজে মানুষ অপর কাউকে উকিল বানাতে পারে। এমনকি সে সমস্ত কাজের ক্ষেত্রেও যা সে নিজে করতে পারলেও বিশেষ সময়ে কোন সাময়িক কারণে তা করতে অসমর্থ হয়। সে মতে মুদারাবা, শিরকত, রিহন, সন্ধি, নিজের দাবি প্রতিষ্ঠা, বিবাহ ইত্যাদিতে অন্যকে নিজের উকিল নিয়োজিত করা যায়। কারণ মহানবী (সাঃ) নিজের বহু কাজে অন্যকে উকিল নিয়োজিত করেছিলেন।

ওকালাত ও উকিলের মর্যাদা ঃ ওকালত শব্দটি বর্তমান সমাজে এমন এক পেশার জন্য ব্যবহার হয়ে থাকে যাতে হক না-হক সত্য-মিথ্যার ভেদাভেদ ব্যতীতই কোন জিনিসের ন্যায্য প্রাপক না হলেও প্রার্থীকে সেটা দেয়ার যোগাড়-যন্ত্র করা হয়। আর উকিল এমন লোককে বলা হয় যে অনৈসলামী আদালতে অনৈসলামী আইনের আশ্রয়ে মানুষের সত্য-মিথ্যা মামলার যোগাড়-যন্ত্র ও প্রতিনিধিত্ব করে থাকে। কিন্তু ইসলামী শরীয়তে ওকালাতের অর্থ আরো অনেক ব্যাপক ও উচ্চাঙ্গীণ। আর উকিল বলতেও হক না-হক উপার্জনকারীকে বুঝায় না; বরং তার মর্যাদা এর চেয়ে বহু উর্ধ্বে । ওপরে আলোচিত হয়েছে যে, মানুষের ওপর বর্তানো সকল জায়েয দায়িত্বসমূহকে ইসলাম আমানত বলে আখ্যায়িত করেছে। অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি দায়িত্ব এমন ভাবে সমাধা দেবে যেমন করে একজন আমানতদার তার আমানত রক্ষার দায়িত্ব আদায় করে থাকে। ওকালাতও একটা আমানত বিশেষ। এ কারণে কাউকেও কোন কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করা হলে তিনি সে কাজটা এমনভাবে সমাধা দেবেন, যেমন কোন একজন আমানতদার নিজের আমানতের দায়িত্ব সম্পন্ন করে থাকেন। অতএব উকিল নিযুক্তিতে দু'টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন- (১) পরস্পর অর্থাৎ উকিল ও মুয়াক্কেল উভয়ে দায়িত্ব প্রদান ও গ্রহণে রাজি থাকা। (২) মুয়াক্কালবিহী কারবারটা যেন হারাম, বাতিল ও অন্যায়মূলক না হয়। সে কারণে উভয়ে যদি কোন অনৈসলামী আদালতে অনৈসলামী আইনের আশ্রয়ে নিজেদের মামলা রুজু করে, তবে ইসলামী শরীয়ত তাকে বাতিল কারবার বলে সাব্যস্ত করবে।

ওকালতির প্রকারভেদ ঃ ওকালতি দু'ধরনের হতে পারে- (ক) বিশেষ ওকালাত, যেমন নির্দিষ্ট কোন কাজ নির্দিষ্ট পদ্ধতি করার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করা হল। (খ) সাধারণ ওকালাত। অতঃপর প্রত্যেকটা আবার দু'প্রকার। পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ও পারিশ্রমিকবিহীন। উভয়ের বিধানে কোন পার্থক্য নেই। কেবল একটি বিষয়ে, তা হল পারিশ্রমিকবিহীন উকিলের দায়িত্ব কম। সেটা হল মুয়াক্কেলের কোন দ্রব্য বিক্রি করলে তার পয়সা উসুলের দায়িত্ব উকিলের থাকবে না। সে হিসেবে সরকারের সকল চাকরিজীবী তার বিনিময় গ্রহণকারী উকিল হিসেবে পরিগণিত হবে।

وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِالْخُصُومَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ খুসূমত শব্দের অর্থ-ঝগড়া করা, বিতর্ক করা। (আইনে) বাদী বা বিবাদীর পক্ষ নিয়ে বাদানুবাদ করা, সওয়াল-জওয়াব করা, বিপক্ষের দাবি খন্ডন করে নিজের দাবি সপ্রমাণ ও প্রতিষ্ঠিত করা।

اِلَّا فِى الْحُدُودِ الخ -এর আলোচনা ঃ এখানে হুদূদ ও কিসাস বলতে ফৌজদারি মামলাকে বুঝানো হয়েছে। মোট কথা, পাওনা ফৌজদারি হোক বা দেওয়ানি, তার জন্য মামলা দায়ের ও মামলার যোগাড়-যন্ত্র করার জন্য উকিল নিযুক্ত

করা জায়েয। তবে পাওনাদি উসুলের ক্ষেত্রে ফৌজদারি দেওয়ানি মোকাদ্দমার মধ্যে যৎসামান্য পার্থক্য আছে। দেওয়ানি মামলার মধ্যে প্রাপ্য উসুলের জন্যও উকিল নিযুক্ত করা যায়। যেমন– খালেদের আয়ত্তে আহমদের এক খণ্ড জমি আছে। খালেদ দীর্ঘ দিন ধরে বিভিন্ন তাল-বাহানার মাধ্যমে উক্ত জমিতে নিজের অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। আহমদ নিজের এ ন্যায্য পাওনার ব্যাপারে আদালতে মামলা দায়ের ও এর যোগাড়-যন্ত্র করার জন্য রশীদকে উকিল নিযুক্ত করল। এক পর্যায়ে আহমদের পক্ষে মামলার রায় হল। এবার রায় মোতাবেক খালেদের আয়ত্ত থেকে জমিটা পৃথক করে আনার জন্য আহমদ রশীদকে পুনরায় উকিল নিযুক্ত করল। এটা জায়েয। কিন্তু ফৌজদারি বিষয় অর্থাৎ মার-পিট, খুন-খারাবি ইত্যাদি উসুলের জন্য উকিল নিযুক্ত করা জায়েয নেই। যেমন– নাসিম আঘাত দিয়ে বশিরের হাত ভেঙ্গে ফেলল। বশির নাসিমের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের জন্য করিমকে উকিল নিযুক্ত করল। শেষ পর্যন্ত মামলার রায়ে দেখা গেল নাসিম অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে এবং বশির ইচ্ছে করলে কিসাসস্বরূপ নাসিমের একটি হাত ভেঙ্গে দিতে পারে। এক্ষেত্রে বশির নাসিমের হাত ভাঙ্গার জন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে না এবং একইভাবে নাসিমও নিজের এ সাজা ভোগের জন্য কাউকে উকিল বানাতে পারবে না।

বিঃ দ্রঃ মনে রাখতে হবে যে, নিজের ফৌজদারি বা দেওয়ানি কোন মামলা ইসলামী শাসন ব্যবস্থাধীন কোন আদালতে দায়ের করতে চাইলে নিজে না পারলে অন্য কাউকে সে কাজে উকিল নিয়োজিত করতে পারবে। কিন্তু ইসলাম বিরোধী আদালত ইসলাম বিরোধী আইনের অধীনে নিজের কোন মামলা মীমাংসা করানো অথবা কারো উকিল হওয়া উচিত নয়। কুরআন মাজীদে অনৈসলামী আইনের ভিত্তিতে বিচারকারী, বিচারপ্রার্থী ও বিচার উত্থাপনকারীদের জালিম, ফাসিক এমনকি কাফির পর্যন্ত আখ্যায়িত করা হয়েছে।

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ الخ -এর আলোচনা ঃ সাহেবাইন (রঃ)-এর মতে, যে কোন পক্ষ তার বিপক্ষের মতামত ব্যতীতই মামলা দায়ের ও যোগাড়-যন্ত্রের জন্য উকিল নিযুক্ত করতে পারবে। ইমামত্রয়ও মূলত এ মত পোষণ করেন। ফকীহ আবুল-লাইছসহ আরো অনেক আলিম এরই ওপর ফতোয়ার কথা বলেছেন। অবশ্য বিচারক যদি মনে করেন যে, মুয়াক্কেল এ উকিলের মাধ্যমে বিভিন্ন অপকৌশলে বাদীপক্ষের হক নষ্ট করতে চাচ্ছে, তবে তিনি তার সে উকিলকে অগ্রাহ্য করে বাদী পক্ষের সম্মতিক্রমে পুনরায় উকিল নিযুক্তির নির্দেশ দিতে পারেন। –[দুররে মুখতার]

وَيَقْصِدُهُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ উকিল এমন ব্যক্তি হতে হবে যে নিজ ইচ্ছার ভিত্তিতে কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম; অন্যের চাপের মুখে বা তামাশার ছলে করলে চলবে না। মোট কথা, উকিল-মুয়াক্কেল উভয়ই সজ্ঞান, বালেগ, সংশ্লিষ্ট কারবার সম্বন্ধে জ্ঞাত এবং স্বাধীন হতে হবে। তবে গোলাম যদি মুকাতাব বা মাযূন হয়, তাহলে উকিল বা মুয়াক্কেল উভয়ই হতে পারে। কিন্তু শিশু এবং হজরকৃত গোলামকে উকিল বানানো গেলেও তারা মুয়াক্কেল হতে পারবে না। কেননা মুয়াক্কেল হতে হলে কারবারের পরবর্তী দায়-দায়িত্ব বহনের মতো সামর্থ্য থাকতে হয়। অথচ শিশু এবং মাহজূর গোলামের মধ্যে সেরকম কোন ক্ষমতা নেই। অবশ্য শিশুকে কোন কাজের জন্য উকিল বানাবার সময় দেখতে হবে সে বিষয়ে তার সুস্পষ্ট বুঝ আছে কি-না। বুঝ না থাকলে উকিল বানানোও জায়েয হবে না।

لَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কারবার-পরবর্তী দেন-দরবারের ভার শিশু বা গোলামের ওপর থাকবে না। যেমন ধরুন, আপনি একটা বাচ্চার হাতে ৫ টাকা দিয়ে একটি কলম কিনে আনতে বললেন। কলম কিনে আনার পর তাতে যদি কোন দোষ প্রকাশিত হয় তাহলে আপনি উক্ত বাচ্চাকে দায়ী সাব্যস্ত করতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যদি বাচ্চার পরিবর্তে কোন বালেগ ব্যক্তি দ্বারা কলমটি আনাতেন, তাহলে এর জন্য তাকে দায়ী সাব্যস্ত করতে পারতেন এবং তার নিকট কলম ফেরত দিয়ে ৫ টাকা দাবি ও উসুল করার এখতিয়ার আপনার ছিল।

وَالْعُقُوْدُ الَّتِي يَعْقِدُهَا الْوُكَلَاءُ عَلٰى ضَرْبَيْنِ كُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ إِلٰى نَفْسِهٖ مِثْلُ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ فَحُقُوْقُ ذٰلِكَ الْعَقْدِ تَتَعَلَّقُ بِالْوَكِيْلِ دُوْنَ الْمُوَكِّلِ فَيُسَلِّمُ الْمَبِيْعَ وَيَقْبِضُ الثَّمَنَ وَيُطَالِبُ بِالثَّمَنِ إِذَا اشْتَرٰى وَيَقْبِضُ الْمَبِيْعَ وَيُخَاصِمُ فِي الْعَيْبِ. وَكُلُّ عَقْدٍ يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ إِلٰى مُوَكِّلِهٖ كَالنِّكَاحِ وَالْخُلْعِ وَالصُّلْحِ عَنْ دَمِ الْعَمَدِ فَإِنَّ حُقُوْقَهُ تَتَعَلَّقُ بِالْمُوَكِّلِ دُوْنَ الْوَكِيْلِ فَلَا يُطَالَبُ وَكِيْلُ الزَّوْجِ بِالْمَهْرِ وَلَا يَلْزَمُ وَكِيْلَ الْمَرْأَةِ تَسْلِيْمُهَا وَإِذَا طَالَبَ الْمُوَكِّلُ الْمُشْتَرِيْ بِالثَّمَنِ فَلَهُ أَنْ يَّمْنَعَهُ إِيَّاهُ فَإِنْ دَفَعَهُ إِلَيْهِ جَازَ وَلَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يُّطَالِبَهُ ثَانِيًا- وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشِرَاءِ شَيْءٍ فَلَا بُدَّ مِنْ تَسْمِيَةِ جِنْسِهٖ وَصِفَتِهٖ وَمَبْلَغِ ثَمَنِهٖ إِلَّا أَنْ يُّوَكِّلَهُ وَكَالَةً عَامَّةً فَيَقُوْلُ اِبْتَعْ لِيْ مَا رَأَيْتَ.

সরল অনুবাদ ঃ যে সমস্ত কারবার উকিলগণ সমাধা করে তা দু'ধরনের– (এক) কতগুলো কাজ এমন যা উকিল নিজের দিকে সম্বন্ধ করে। (অর্থাৎ যে কাজের জন্য সে উকিল নিযুক্ত হয়েছে তা নিজের বলে প্রকাশ করে) যেমন– ক্রয়, বিক্রয় ও ইজারা (প্রভৃতি)। এ শ্রেণীর কারবারের যাবতীয় দেন-দরবার উকিলের সাথে সম্পৃক্ত হবে; মুয়াক্কেলের সাথে নয়। অতএব সে (বিক্রির জন্য উকিল হলে) ক্রেতাকে পণ্য হস্তান্তর করবে এবং দামও সে আদায় করবে। আর ক্রয়ের জন্যে উকিল হলে তার নিকট দাম চাওয়া হবে এবং ক্রয়কৃত দ্রব্যও গ্রহণ করবে সে। এবং পণ্যের দোষ-ত্রুটির ব্যাপারে তাকেই প্রতিবাদ করা হবে। (দুই) আর কতগুলো কারবার এমন যার সম্বন্ধ উকিল মুয়াক্কেলের দিকে করে। যেমন– বিয়ে, খোলা, ইচ্ছাকৃত খুনের ব্যাপারে আপস-মীমাংসা (মুদারাবা, শিরকত, ফৌজদারি বা দেওয়ানি মামলার তদবীর ইত্যাদি)। এ শ্রেণীর কারবারে সকল দেনা-পাওনা মুয়াক্কেলের সাথে মিট হবে; উকিলের সাথে নয়। সুতরাং স্বামীর উকিলের নিকট মোহর দাবি করা যাবে না এবং স্ত্রীর উকিলের ওপর 'বউ' বুঝিয়ে দেয়া আবশ্যক হবে না। (বিক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিলের) মুয়াক্কেল যদি ক্রেতার নিকট পণ্যের দাম দাবি করে, তাহলে ক্রেতা তাকে বারণ করতে পারবে। আর যদি দিয়ে দেয় তাও জায়েয আছে। তখন উকিল দ্বিতীয়বার তার নিকট দাম তলব করতে পারবে না।

(ওকালাত দুই ধরনের– খাস এবং আম। উকিলের দায়িত্বে দেয়া কাজ তার বুদ্ধি-বিবেচনার ওপর না ছেড়ে মুয়াক্কেল যদি তা নির্দিষ্ট করে দেয়, তবে তাকে খাস ওকালাত বলে। এ পর্যায়ে) যে ব্যক্তি কাউকে কোন কিছু খরিদ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করবে তার আবশ্যক শ্রেণী এবং দামের পরিমাণ বর্ণনা করে দেয়া। কিন্তু যদি আম পর্যায়ের উকিল বানিয়ে থাকে তবে শুধু এ কথা বলে দেবে যে, তোমার বিবেচনা মতো আমাকে জিনিসটা কিনে দাও।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

يُضِيْفُهُ الْوَكِيْلُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– কোন সামগ্রী বিক্রির জন্য উকিল নিযুক্ত হয়ে থাকলে সে বিক্রয় প্রস্তাবের সময় "দ্রব্যটা আমি বিক্রি করব বা করলাম" বলতে পারবে। মনে রাখা প্রয়োজন যে, ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা ও শ্রমিক নিয়োগ প্রভৃতি কাজের সম্বন্ধ (إضافت) উকিল যদিও তার নিজের দিকে করার এখতিয়ার রাখে; কিন্তু এরূপ করা তার

অত্যাবশ্যকীয় নয়; বরং সে ইচ্ছা করলে মুয়াক্কেলের সাথেও সম্পর্কযুক্ত করতে পারে। পক্ষান্তরে বিয়ে-শাদী, খোলা, তালাক, মুদারাবা এবং শিরকত ইত্যাদিতে কেউ উকিল নিযুক্ত হলে প্রকাশ্যে তাকে মুয়াক্কেলের সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এভাবে বলতে হবে যে, আমি অমুকের পক্ষ থেকে কারবার করছি; বিয়ের প্রস্তাব বা সম্মতি জ্ঞাপন করছি ইত্যাদি।

يُطَالِبُ بِالثَّمَنِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন- আপনার কর্মচারী কোন কিছু ধারে ক্রয় করল কিন্তু কার জন্য ধার নিচ্ছে তা সঠিক করে বলল না, তাহলে দোকানি এখন স্বীয় প্রাপ্য তার কাছেই তলব করবে- আপনার নিকট নয়। কিন্তু কর্মচারী ঋণে খরিদ ক্রয় করার সময় বলে থাকে যে, অমুক সাহেবের জন্য, তাহলে তার ওপর কোন দায়-দায়িত্ব থাকবে না।

وَلَا يَلْزَمُ وَكِيلَ الْمَرْأَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ কনে পক্ষীয় উকিলের ওপর যেমন বধু সম্প্রদানের দায়িত্ব আরোপিত হয় না; ঠিক তদ্রূপ কোন ফৌজদারি মামলার যোগাড়-যন্ত্রের জন্য উকিল নিযুক্ত করে থাকলে মামলার রায় যদি তার বিপক্ষে হয়, তাহলে জরিমানা বা দেয় অর্থ-সম্পদ অথবা কারা-ভোগও উকিলের পরিবর্তে মুয়াক্কেলের ঘাড়েই চাপবে।

وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন- যায়েদ একটি ঘড়ি ক্রয় করে দেয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। যদি যায়েদ ঘড়ির শ্রেণী অর্থাৎ সিকো হবে না সিটিজেন হবে; গুণাগুণ অর্থাৎ কি ডিজাইন এবং কোন কালারের এবং কত মূল্যের হবে তা বলে দেয়, তাহলে এটা হবে খাস ওকালাত। এক্ষেত্রে উকিল মুয়াক্কেলের বর্ণিত সীমা থেকে সামান্যতম বাইরে যেতে পারবে না। যদি যায় এবং সে কারণে মুয়াক্কেল জিনিসটা গ্রহণ না করে এবং ঘটনাক্রমে বিক্রেতাও সে জিনিস ফেরত না নেয়, তাহলে উকিলকেই তার ব্যয় বহন করতে হবে এবং মুয়াক্কেলকে তার দেয়া টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে; কিন্তু ওকালাত আম হলে এ ধরনের সমস্যা থাকবে না।

وَإِذَا اشْتَرَى الْوَكِيلُ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى عَيْبٍ فَلَهُ أَنْ يَرُدَّهُ بِالْعَيْبِ مَادَامَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُوَكِّلِ لَمْ يَرُدَّهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ وَيَجُوزُ التَّوْكِيلُ بِعَقْدِ الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ فَإِنْ فَارَقَ الْوَكِيلُ صَاحِبَهُ قَبْلَ الْقَبْضِ بَطَلَ الْعَقْدُ وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الْمُوَكِّلِ وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الثَّمَنَ مِنْ مَالِهِ وَقَبَضَ الْمَبِيعَ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِهِ عَلَى الْمُوَكِّلِ فَإِنْ هَلَكَ الْمَبِيعُ فِي يَدِهِ قَبْلَ حَبْسِهِ هَلَكَ مِنْ مَالِ الْمُوَكِّلِ وَلَمْ يَسْقُطِ الثَّمَنُ وَلَهُ أَنْ يَحْبِسَهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ الثَّمَنَ فَإِنْ حَبَسَهُ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ كَانَ مَضْمُونًا ضَمَانَ الرَّهْنِ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَضَمَانَ الْبَيْعِ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلٌ رَجُلَيْنِ فَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا أَنْ يَتَصَرَّفَ فِيمَا وُكِّلَا فِيهِ دُونَ الْآخَرِ إِلَّا أَنْ يُوَكِّلَهُمَا بِالْخُصُومَةِ أَوْ بِطَلَاقِ زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِعِتْقِ عَبْدِهِ بِغَيْرِ عِوَضٍ أَوْ بِرَدِّ وَدِيعَةٍ عِنْدَهُ أَوْ بِقَضَاءِ دَيْنٍ عَلَيْهِ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি উকিল পণ্য ক্রয় করে তা করায়ত্ত করে নেয় অতঃপর কোন দোষ-ত্রুটি সম্পর্কে অবহিত হয়, তবে পণ্য যতক্ষণ তার দখলে থাকবে দোষের কারণে সে তা ফিরিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু যদি মুয়াক্কেলের নিকট হস্তান্তর করে ফেলে তবে তার অনুমতি না নিয়ে ফেরত দিতে পারবে না। সরফ এবং সলম চুক্তির জন্য উকিল নিযুক্ত করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে যদি (সরফের বদল বা সলমের রা'সুলমাল) করায়ত্ত করার আগেই উকিল দ্বিতীয় কারবারী থেকে পৃথক হয়ে পড়ে, তাহলে চুক্তি বাতিল হয়ে যাবে। মুয়াক্কেল পৃথক হলে কিছু আসে যায় না। ক্রয়ের জন্য নিযুক্ত উকিল যদি পণ্যের দাম নিজের পকেট থেকে পরিশোধ করে পণ্য করায়ত্ত করে নেয়, তবে সে মুয়াক্কেলের নিকট উক্ত দাম চেয়ে নিতে পারবে। এ স্থলে যদি জিনিস আটক করার পূর্বেই তার হাতে সেটা (বিনা অবহেলায়) নষ্ট হয়ে যায়, তবে তা মুয়াক্কেলের মাল থেকে নষ্ট হবে; উকিলের টাকা মারা যাবে না। (ধারে বা নগদে যেভাবেই কিনুক দ্রব্যের) পূর্ণ দাম বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত উকিল তা মুয়াক্কেল থেকে আটক করে রাখতে পারবে। যদি সে আটক রাখে অতঃপর সেটা তার হাতে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, বন্ধকী জিনিসের ক্ষতিপূরণের ন্যায় তা ক্ষতিপূরণীয় হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর মতে, (ক্ষতিগ্রস্ত) বিক্রিত দ্রব্যের ক্ষতিপূরণের ন্যায় হবে। যদি কেউ দুই ব্যক্তিকে (সম্মিলিতভাবে কোন কাজের) উকিল বানায়, তবে তাদের একজন অপর জনকে বাদ দিয়ে সে কাজ আঞ্জাম দিতে পারবে না। কিন্তু (কোন মামলায়) জেরা করা বা তার পত্নীকে বিনিময়হীন তালাক প্রদান অথবা তার গোলামকে বিনিময়হীন মুক্তকরণ কিংবা মুয়াক্কেলের হাতে গচ্ছিত আমানতের মাল প্রত্যার্পণ অথবা তার কোন দেনা পরিশোধের জন্য উকিল বানালে (দু'জনের যে কেউ তা এককভাবে সমাধা করতে পারবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بَطَلَ الْعَقْدُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ সলম ও সরফ কারবার শুদ্ধ হওয়ার পূর্বশর্ত হল উভয় কারবারী চুক্তিস্থল থেকে বিদায় নেয়ার পূর্বেই রা'সুলমাল ও সরফের বদল বিনিময় করে ফেলা।

وَلَا يُعْتَبَرُ مُفَارَقَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ সরফ বা সলম-চুক্তি সম্পন্ন করার জন্য উকিল নিযুক্ত করা হলে চুক্তির দায়-দায়িত্ব সব উকিলের ওপর থাকে। সে মতে রা'সুলমাল বা সরফের বদল কব্জা করার আগেই যদি মুয়াক্কেল

চুক্তিস্থল থেকে সরে পড়ে, তবে চুক্তি রহিত হবে না। কেননা মুয়াক্কেলের পক্ষে উকিলের উপস্থিতিই যথেষ্ট। এ হুকুম হল তখন যদি কথাবার্তা কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর মুয়াক্কেল হাজির হয় এবং পাকাপাকি হওয়ার পূর্বেই মজলিস থেকে বিদায় নেয়। কিন্তু যদি মজলিস তথা কথাবার্তার শুরুলগ্ন থেকে সে উপস্থিত থাকে, তাহলে লেনদেন পাকা-পাকি হওয়া পর্যন্ত তাকে সেখানে থাকতে হবে, নতুবা কারবার শুদ্ধ হবে না। কারণ মুয়াক্কেল হাজির থাকার কারণে সাময়িকভাবে হলেও উকিলের ওকালাত অকার্যকর হয়ে পড়েছে।

وَإِذَا دَفَعَ الْوَكِيلُ بِالشِّرَاءِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ যদি উকিল নিজের পক্ষ থেকে পণ্যের দাম আদায় করে, তবে মুয়াক্কেল থেকে সম্পূর্ণ মূল্য বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত পণ্য আটক করে রাখতে পারবে। কিন্তু ইমাম যুফার (রঃ)-এর মতে, উকিল তা করতে পারবে না। কেননা উকিলের কব্জা মুয়াক্কেলের কব্জার স্থলবর্তী, কেমন যেন পণ্য এখন মুয়াক্কেলের আয়ত্তেই আছে। সুতরাং আটক করার কোন মানে হয় না। কিন্তু আমাদের বক্তব্য হল, এ স্থলে উকিল মূল্য উসুলের বিবেচনায় একজন বিক্রেতার ভূমিকায় রয়েছে। বিক্রেতা যেমন মূল্য বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত ক্রেতা থেকে পণ্য আটক করে রাখতে পারে তদ্রূপ উকিলও তা করতে পারে। এখন যদি উকিলের হাতে পণ্য নষ্ট হয়ে যায়, তবে তার দু'অবস্থা হতে পারে- (ক) মুয়াক্কেল পণ্য চাওয়ার আগে তা নষ্ট হয়েছে। (খ) অথবা চাওয়ার পর উকিল তা আটক করে রাখা অবস্থায় নষ্ট হয়েছে। চাওয়ার পূর্বে নষ্ট হলে কেমন যেন মুয়াক্কেলের আয়ত্তে থাকা অবস্থায়ই তা নষ্ট হল। কেননা উকিলের কব্জা তো মুয়াক্কেলেরই কব্জা। সুতরাং এ ক্ষতির ব্যয়ভার একা মুয়াক্কেলকেই বহন করতে হবে। উকিল তার সম্পূর্ণ দাম মুয়াক্কেল থেকে পেয়ে যাবে। আর যদি পণ্য আটক করে রাখা অবস্থায় নষ্ট হয়, তবে উকিলকেও এ ক্ষতির ভাগ নিতে হবে। কিন্তু ইমাম তরফাইন (রঃ)-এর মতে, সম্পূর্ণ ক্ষতির ব্যয়ভার উকিলকে একা বহন করতে হবে। কেননা সে তো ঐ বিক্রেতার মতো যে দামের জন্য ক্রেতা থেকে পণ্য আটক করে রেখেছে। এ অবস্থায় বিক্রেতার নিকট পণ্য নষ্ট হলে যেমন সে ক্রেতার নিকট এর মূল্য দাবি করতে পারে না, তদ্রূপ উকিলও নষ্ট হয়ে যাওয়া পণ্যের দাম মুয়াক্কেলের নিকট তলব করতে পারবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, একজন মুরতাহিন যেভাবে নষ্ট হয়ে যাওয়া বন্ধকী দ্রব্যের ক্ষতিপূরণ বহন করে উকিল সেভাবে ক্ষতিপূরণ বহন করবে। কারণ মুয়াক্কেল দাম না দেয়ার কারণে যখন উকিল তাকে দ্রব্য অর্পণ করা থেকে বিরত থাকল, তখন সে একজন রাহেনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। সে মতে দ্রব্যের ক্রয়কৃত মূল্য যদি তার বাজারমূল্যের সমান হয়, তবে উকিল মুয়াক্কেল থেকে কিছুই দাবি করতে পারবে না। কিন্তু যদি বাজার মূল্য বেশি হয়, তবে বেশিটুকু চেয়ে আনতে পারবে।

وَإِذَا وَكَّلَ رَجُلَ الخ -এর আলোচনা ঃ কেউ যদি দুই ব্যক্তিকে সম্মিলিতভাবে কোন মামলায় জেরা করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে, তবে তাদের উভয়ের এক সাথে জেরা করতে হবে না; বরং যে কোন একজন করলেই চলবে। কেননা মামলার শুনানিকালে কোন বিষয়ে একাধিক ব্যক্তি এক সাথে কথা বলতে পারে না। একাধিক মুখে কথা বললে বিচারালয়ের শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। সে কারণে বক্তব্য একজনকেই উপস্থাপন করতে হয়। তবে মামলার রায় হয়ে যাওয়ার পর বিপক্ষ থেকে প্রাপ্য উসুলের প্রশ্ন দেখা দিলে উভয়ে মিলিত হয়ে কাজ করতে হবে। এভাবে বিনিময়হীন তালাক, দাসমুক্তি এবং ঋণ পরিশোধ প্রভৃতি কাজে দু'জনকে একত্রে উকিল বানানো হলে তাদের যে কেউ একা কাজ সমাধা দিতে পারবে। কেননা এ সকল কাজ চিন্তা-ভাবনা করে করার প্রয়োজন পড়ে না। শুধুমাত্র মুয়াক্কেলের বক্তব্য উকিল নিজ মুখে প্রকাশ করলেই চলে। কিন্তু যদি মুয়াক্কেল বলে, তালাক ও দাসমুক্তির বিষয়টা তোমাদের বিবেচনার ওপর ছেড়ে দিলাম, তাহলে উভয়কে পরামর্শক্রমে কাজ সম্পন্ন করতে হবে। কারণ পরামর্শ দ্বারা এখানে কল্যাণ বয়ে আসবে। মোট কথা, যে সমস্ত কারবার চিন্তা-ভাবনা করে করার দরকার হয় সেগুলো একা একজনে সম্পন্ন করতে পারবে না। আর তেমনটি না হলে একা করার মধ্যে দোষের কিছু নেই।

وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ اَنْ يُّوَكِّلَ فِيْمَا وُكِّلَ بِهٖ اِلَّا اَنْ يَّأْذَنَ لَهُ الْمُوَكِّلُ اَوْ يَقُوْلَ لَهُ اِعْمَلْ بِرَأْيِكَ فَاِنْ وَكَّلَ بِغَيْرِ اِذْنِ مُوَكِّلِهٖ فَعَقَدَ وَكِيْلُهٗ بِحَضْرَتِهٖ جَازَ وَاِنْ عَقَدَ بِغَيْرِ حَضْرَتِهٖ فَاَجَازَهُ الْوَكِيْلُ الْاَوَّلُ جَازَ وَلِلْمُوَكِّلِ اَنْ يَّعْزِلَ الْوَكِيْلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَاِنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الْعَزْلُ فَهُوَ عَلٰى وَكَالَتِهٖ وَتَصَرُّفُهٗ جَائِزٌ حَتّٰى يَعْلَمَ - وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّلِ وَجُنُوْنِهٖ جُنُوْنًا مُّطْبِقًا وَلِحَاقِهٖ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا وَاِذَا وَكَّلَ الْمُكَاتَبُ رَجُلًا ثُمَّ عَجَزَ اَوِ الْمَاذُوْنُ لَهٗ فَحُجِرَ عَلَيْهِ اَوِ الشَّرِيْكَانِ فَافْتَرَقَا فَهٰذِهِ الْوُجُوْهُ كُلُّهَا تُبْطِلُ الْوَكَالَةَ عَلِمَ الْوَكِيْلُ اَوْ لَمْ يَعْلَمْ - وَاِذَا مَاتَ الْوَكِيْلُ اَوْ جُنَّ جُنُوْنًا مُّطْبِقًا بَطَلَتْ وَكَالَتُهٗ وَاِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا لَمْ يَجُزْ لَهُ التَّصَرُّفُ اِلَّا اَنْ يَّعُوْدَ مُسْلِمًا وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِشَيْءٍ ثُمَّ تَصَرَّفَ الْمُوَكِّلُ بِنَفْسِهٖ فِيْمَا وُكِّلَ بِهٖ بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ -

সরল অনুবাদ ঃ উকিলকে যে কাজের জন্য উকিল বানানো হয়েছে তাতে সে অন্য কাউকে উকিল নিযুক্ত করতে পারবে না। তবে যদি মুয়াক্কেল তাকে অনুমতি দেয় কিংবা বলে দেয় যে, তোমার বিবেচনা মতো কর। যদি উকিল মুয়াক্কেলের অনুমতি ছাড়া কাউকে উকিল বানায় এবং সে উকিল তারই উপস্থিতিতে কাজ আঞ্জাম দেয়, তাহলে জায়েয হবে। আর যদি সে তার (প্রথম উকিলের) অনুপস্থিতিতে আঞ্জাম দেয় অতঃপর প্রথম উকিল তাতে সন্তোষ প্রকাশ করে তাও জায়েয আছে।

মুয়াক্কেল উকিলকে তার (দায়িত্ব পালনের আগে বা পরে) ওকালাত থেকে পদচ্যুত করতে পারে। যদি পদচ্যুতির সংবাদ তার নিকট না পৌঁছে তাহলে সে তার দায়িত্বে বহাল থাকবে এবং যতক্ষণ না সে জানতে পারবে তার কাজ কর্ম গ্রহণযোগ্য হবে। (একইভাবে উকিলও ইচ্ছা করলে অপারগতা প্রকাশ পূর্বক দায়িত্ব ছেড়ে দিতে পারে।)

মুয়াক্কেলের মৃত্যুবরণ, তার পূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি এবং তার ইসলাম ত্যাগ করে দারুল হরবে চলে যাওয়ার দ্বারা ওকালাত বাতিল হয়ে যায়। যদি মুকাতাব কাউকে উকিল নিযুক্ত করার পর (কিতাবাতের অর্থ আদায়ে) অপারগ হয়ে পড়ে অথবা ব্যবসায়ে অনুমতিপ্রাপ্ত গোলাম (কাউকে উকিল বানাবার পর) হজরবদ্ধ হয় অথবা (যৌথ কারবারের) অংশীদারদ্বয় (উকিল বানানোর পর) কারবার গুটিয়ে নেয়, তবে এ সকল অবস্থায় উকিল সে সংবাদ জানতে পারুক বা না পারুক ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে। যদি উকিল মরে যায় কিংবা একেবারে পাগল হয়ে পড়ে, তাহলে তার ওকালত বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি সে ধর্মত্যাগী হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তাহলে পুনরায় মুসলমান হয়ে ফিরে না আসা পর্যন্ত (উকিল হিসেবে) তার কোন কাজকর্ম গ্রাহ্য হবে না। যে ব্যক্তি কাউকে কোন কাজের জন্য উকিল নিযুক্ত করে অতঃপর ঐ কাজটি নিজেই সমাধা করে ফেলে, তবে তার ওকালাত বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ الخ-এর আলোচনা ঃ কারণ কোন কাজের জন্য উকিল বানানোর পিছনে মুয়াক্কেলের লক্ষ্য থাকে কাজটা যেন উকিলের দক্ষতা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে সমাধা পায়। সুতরাং মুয়াক্কেলের বিনা সম্মতিতে সে অন্য কাউকে উক্ত কাজের জন্য নিযুক্ত করতে পারবে না। তদুপরি যদি নিযুক্ত করে এবং কাজ সম্পন্নর সময় নিজেও উপস্থিত থাকে বা পরে সন্তুষ্টি প্রকাশ করে, তবে তা জায়েয গণ্য হবে। কেননা কাজের সময় উকিলের উপস্থিতি বা পরবর্তীকালে তার সন্তোষ প্রকাশ

দ্বারাও উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হয়। যেমন আপনি একজনকে একটি কলম ক্রয় করে আনতে বললেন, কিন্তু সে নিজে না ক্রয় করে অন্য কাউকে দিয়ে ক্রয় করাল, তাহলে সে কলমটি আপনার গ্রহণ না করারও স্বাধীনতা থাকবে।

وَلِلْمُوَكِّلِ اَنْ يَعْزِلَ الخ -এর আলোচনা ঃ এমনকি কোন কাজ আধা-আধি পরিমাণ সমাধা হওয়ার পরও মুয়াক্কেল উকিলকে পদচ্যুত করতে পারবে এবং উকিলও কাজ ছেড়ে দিতে পারবে।

وَتَبْطُلُ الْوَكَالَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ উল্লিখিত কারণে ওকালাত রহিত হয়ে যাবে। কেননা تَوْكِيْل হল একটি অনাবশ্যক تَصَرُّف যাকে উভয় পক্ষই ভঙ্গ করতে পারে। উকিলের জন্য নিজেকে ওকালাত হতে বিরত রাখা বৈধ। তদ্রূপ مُوَكِّل ও উকিলকে ওকালতী করা থেকে বারণ করতে পারবে। কাজেই دَوَام تَوْكِيْل -এর বিধান اِبْتِدَائے تَوْكِيْل -এর ন্যায় হবে। সুতরাং تَوْكِيْل -এর সাথে مُوَكِّل -এর নির্দেশের প্রয়োজন হবে। অথচ এ সকল عَوَارِض বা প্রতিবন্ধকতার কারণে আমল রহিত হয়ে গেছে।

جُنُوْنًا مُطْبِقًا الخ -এর আলোচনা ঃ মুত্ববিকুন শব্দটি اِطْبَاق থেকে উদগত, অর্থ– আচ্ছন্নকারী। অর্থাৎ এমন উন্মাদনা যা মস্তিষ্ককে আচ্ছন্ন করে নেয়। ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতে, একাধারে এক মাস পাগল থাকলে তাকে বদ্ধ বা পূর্ণ পাগল বলা হবে। দুররে মুখতারে উদ্ধৃত ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর উক্তি মোতাবেক লাগাতার এক বছর পাগল থাকলে তাকে বদ্ধ পাগল বলা হবে। ফতোয়া ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ)-এর কওলের ওপর। –(কাযীখান)

وَ الشَّرِيْكَانِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ শরিকগণ তাদের অংশীদারি কারবার বন্ধ করে ফেললে কারবার সংক্রান্ত ব্যাপারে নিযুক্ত উকিলের ওকালাত তাতে রহিত হয়ে যাবে। কারণ এক্ষেত্রে নিয়ম ছিল একজন অংশীদার যদি কাউকে উকিল বানায়, তাহলে সে অপর অংশীদারের উকিল গণ্য হবে; কিন্তু কারবার বন্ধ করে ফেলায় আইনত সে আর দ্বিতীয় শরিকের উকিল থাকতে পারছে না। অবশ্য তখনও সে নিযুক্তকারী শরিকের উকিল থেকে যাবে।

بَطَلَتِ الْوَكَالَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ وَكَالَت এজন্য বাতিল হয়ে যাবে যে, যার জন্য وَكِيْل নিযুক্ত করেছে, অতঃপর مُوَكِّل নিজেই সে কাজ সম্পাদন করে ফেলল, তখন সে ক্ষেত্রে وَكِيْل -এর تَصَرُّف করা অসম্ভব হয়ে গেল। এর মধ্যে কয়েকটি সুরত সন্নিবেশিত রয়েছে। যথা– কেউ স্বীয় কৃতদাসকে মুক্ত করার ব্যাপারে বা مُكَاتَب বানানোর ব্যাপারে কাউকে উকিল নিযুক্ত করল। পরবর্তীতে مُوَكِّل নিজেই তাকে মুক্ত করে দিল বা مُكَاتَب বানিয়ে ফেলল। অথবা কোন নারীকে বিবাহ করার ব্যাপারে বা কোন বস্তুকে ক্রয় করার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। অতঃপর সে নিজেই সে কর্ম সম্পাদন করে ফেলল। অথবা কেউ স্বীয় স্ত্রীকে তালাক দেয়ার জন্য উকিল নিযুক্ত করল। অতঃপর সে নিজেই তিন তালাক প্রদান করল বা এক তালাক দেয়ার পর ইদ্দত অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কেননা ইদ্দত অতিক্রান্ত না হলে উকিল সে মহিলাকে বাকি দু'তালাক দিয়ে দেবে।

তদ্রূপ যখন خُلْع -এর সাথে উকিল বানিয়ে দিল। পরবর্তীতে নিজেই خُلْع করে নিল।

এ সকল সুরতেই উকিল স্বীয় দায়িত্ব হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়ে যাবে। কেননা مُوَكِّل -এর تَصَرُّف করার পর উকিলের জন্য তাতে تَصَرُّف করা অসম্ভব।

وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لَايَجُوْزُ لَهُ اَنْ يَعْقِدَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَعَ اَبِيْهِ وَجَدِّهٖ وَ وَلَدِهٖ وَلَدِ وَلَدِهٖ وَ زَوْجَتِهٖ وَعَبْدِهٖ وَمُكَاتَبِهٖ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ بَيْعُهٗ مِنْهُمْ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اِلَّا فِىْ عَبْدِهٖ وَمُكَاتَبِهٖ وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ يَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِنُقْصَانٍ لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِىْ مِثْلِهَا وَلَا يَجُوْزُ بِمَا لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِىْ مِثْلِهٖ وَالَّذِىْ لَايَتَغَابَنُ النَّاسُ فِىْ مِثْلِهٖ وَالْوَكِيْلُ بِالشِّرَاءِ يَجُوْزُ عَقْدُهٗ بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ وَ زِيَادَةٍ يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ مَالَا يَدْخُلُ تَحْتَ تَقْوِيْمِ الْمُتَقَوِّمِيْنَ وَاِذَا ضَمِنَ الْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ الثَّمَنَ عَنِ الْمُبْتَاعِ فَضَمَانُهٗ بَاطِلٌ۔

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতানুসারে ক্রয়-বিক্রয়ের উকিলের জন্য তার পিতা, পিতামহ, সন্তান, সন্তানের সন্তান এবং আপন স্ত্রী, গোলাম ও মুকাতাবের সাথে কারবার করা জায়েয নেই। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, আপন গোলাম ও মুকাতাব ছাড়া বাকি সকলের নিকট তার প্রচলিত দামে বিক্রি করা জায়েয আছে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বিক্রয় কাজে নিযুক্ত উকিলের কমবেশি (যে কোন) দামে বিক্রি করা জায়েয আছে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, সাধারণ মানুষ যে লোকসান দেয় না তার জন্য সেরকম লোকসানে বিক্রি করা জায়েয নেই। পক্ষান্তরে (আমাদের সকল ইমামের মতে) ক্রয় সংক্রান্ত উকিলের জন্য প্রচলিত দামে এবং এত চড়া দামে ক্রয় করা জায়েয যা লোকজনের মাঝে প্রচলিত। কিন্তু এত চড়া দামে জায়েয নেই যা লোকজনের মাঝে প্রচলিত নয়। আর মানুষের মাঝে যে লোকসানের প্রচলন নেই তা হল দামের ঐ মাত্রা যা দাম নির্ধারকদের নির্ধারণী আওতায় পড়ে না। বিক্রয়ের উকিল যদি বিক্রিত দ্রব্যের দামের ব্যাপারে ক্রেতার পক্ষে জামিন হয়, তবে তার জামানত বাতিল।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْوَكِيْلُ بِالْبَيْعِ الخ-এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ ক্রয়-বিক্রয়, ইজারা, সলম এবং সরফ ইত্যাদি কারবার উকিল নিজের ঊর্ধ্বতন, অধস্তন (যেমন– পিতামাতা, সন্তান, পৌত্র ও দৌহিত্রাদি) স্ত্রী ও গোলাম প্রমুখের সাথে করতে পারবে না। কারণ উকিল হল একজন আমিনের মর্যাদায়। কেননা মুয়াক্কেল সর্বদা তার আস্থাভাজন ব্যক্তিকেই উকিল বানিয়ে থাকে। কাজেই অপবাদ ও অভিযোগ উত্থাপিত হতে পারে এমন কোন কাজ তার করা উচিত নয়। উকিল যদি তার আপনজনদের নিকট বেচাকেনা করে তাহলে অভিযোগ ওঠতে পারে যে, সে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য এমনটি করেছে। সুতরাং তাকে সন্দেহমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।

وَيَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِالْقَلِيْلِ الخ-এর আলোচনা ঃ ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট وَكِيْلٌ بِالْبَيْعِ কমবেশির সাথে (যদিও তা غَبْن فَاحِش বা অতিশয় ধোঁকা হয়) এর বাকি (যদিও অনির্দিষ্ট সময়ের জন্যই হোক না কেন) এবং সমানের বিনিময়, মোট কথা প্রত্যেক প্রকারের বেচাকেনা করতে পারে। কেননা تَوْكِيْل مُطْلَق টা স্বীয় اِطْلَاق-এর অবস্থায়ই বিদ্যমান থাকবে।

সাহেবাইনের নিকট وَكِيْلٌ بِالْبَيْعِ-এর বিশুদ্ধতা মূল্যের ন্যায় نُقُوْد ও اَجَل مُتَعَارِف-এর সাথে নির্দিষ্ট। কেননা এটাই مُتَعَارِف বা সমাজে প্রচলিত। আর আইম্মায়ে ছালাছার নিকট বাকি বিক্রি করা জায়েয নেই।

বাযাযিয়াতে উল্লেখ রয়েছে যে, সাহেবাইনের মতামতের ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। তবে تَصْحِيح قُدُورِي-এর মধ্যে শায়খ কাসেম (রঃ) ইমাম আযম (রঃ)-এর মতামতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এবং ইমাম নসফী, সদরুশ শারীয়াহ, ওবায়দুল্লাহ মাহ্বূবী প্রমুখগণ এ মতকেই সমর্থন করেছেন।

لَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِيْهِ الخ-এর আলোচনা ঃ غَبْنٌ শব্দ থেকে تَغَابُن শব্দের উৎপত্তি। অর্থ–একে অপরকে লোকসান দেয়া বা ঠকানো। ঠক দু'প্রকার ঃ স্বাভাবিক ঠক (غَبْن يَسِيْر) আর অস্বাভাবিক ঠক (غَبْن فَاحِش) উভয় প্রকার ঠকের পরিমাপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা এভাবে দেয়া যায় যে, আমরা নিত্যদিন যে সকল জিনিস বেচাকেনা করি যেমন– চাল, ডাল, মাছ ও তরি-তরকারি। একশ' টাকা মূল্যের এ জাতীয় দ্রব্য একশ' পাঁচ টাকায় ক্রয় করলে এটা হবে স্বাভাবিক ঠক। আর তার চেয়ে বেশি দামে ক্রয় করলে অস্বাভাবিক ঠক বলে গণ্য হবে। পক্ষান্তরে, পোশাক-পরিচ্ছদসহ যে জিনিস বছরে দু'একবার ক্রয় করতে হয় সেগুলোতে একশ' টাকা মূল্যের বস্তু একশ' দশ টাকায় ক্রয় করলে তা হবে স্বাভাবিক ঠকের অন্তর্ভুক্ত। আর তার চেয়ে অধিক হলে অস্বাভাবিক ঠক বলে সাব্যস্ত হবে। উকিল স্বাভাবিক ঠকে কোন কিছু খরিদ করলে মুয়াক্কেল তা বহন করতে বাধ্য থাকবে; কিন্তু অস্বাভাবিক হলে তা মেনে নিতে বাধ্য থাকবে না; বরং তা উকিলের ওপর বর্তাবে।

وَاِذَا وَكَّلَهُ بِبَيْعِ عَبْدِهِ فَبَاعَ نِصْفَهُ جَازَ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ وَاشْتَرٰى نِصْفَهُ فَالشِّرَاءُ مَوْقُوْفٌ فَاِنِ اشْتَرٰى بَاقِيَهُ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ وَاِذَا وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ اَرْطَالِ لَحْمٍ بِدِرْهَمٍ فَاشْتَرٰى عِشْرِيْنَ رِطْلًا بِدِرْهَمٍ مِنْ لَحْمٍ يُبَاعُ مِثْلُهُ عَشَرَةُ اَرْطَالٍ بِدِرْهَمٍ لَزِمَ الْمُوَكِّلَ مِنْهُ عَشَرَةٌ بِنِصْفِ دِرْهَمٍ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَلْزَمُهُ الْعِشْرُوْنَ وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ شَيْءٍ بِعَيْنِهِ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ يَّشْتَرِيَهُ لِنَفْسِهِ وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ بِغَيْرِ عَيْنِهِ فَاشْتَرٰى عَبْدًا فَهُوَ لِلْوَكِيْلِ اِلَّا اَنْ يَّقُوْلَ نَوَيْتُ الشِّرَاءَ لِلْمُوَكِّلِ اَوْ يَشْتَرِيَهُ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ وَالْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَاَبِيْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَالْوَكِيْلُ بِقَبْضِ الدَّيْنِ وَكِيْلٌ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْهِ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاِذَا اَقَرَّ الْوَكِيْلُ بِالْخُصُوْمَةِ عَلٰى مُوَكِّلِهِ عِنْدَ الْقَاضِيْ جَازَ اِقْرَارُهُ وَلَا يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِيْ عِنْدَ اَبِيْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنَّهُ يَخْرُجُ مِنَ الْخُصُوْمَةِ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ اِقْرَارُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ غَيْرِ الْقَاضِيْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি তাকে গোলাম বিক্রির জন্য উকিল বানায় আর অর্ধেক গোলাম বিক্রি করে আসে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, বিক্রি কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে যদি গোলাম ক্রয়ের জন্য উকিল বানায় আর সে কোন গোলামের অর্ধাংশ ক্রয় করে, তবে তা স্থগিত থাকবে– পরে গোলামের বাকি অংশ ক্রয় করে নিলে (কার্যকর হবে এবং) মুয়াক্কেল তা নিতে বাধ্য থাকবে। কোন ব্যক্তি এক দিরহামে দশ পাউণ্ড গোশ্‌ত কিনে আনার জন্য কাউকে উকিল বানাল আর সে এক দিরহামে ক্রয় করে আনল এমন পদের বিশ পাউণ্ড গোশ্‌ত যার দশ পাউণ্ডই এক দিরহামে বিক্রি হয়। তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, মুয়াক্কেল আধা দিরহামের বিনিময়ে দশ পাউণ্ড গোশত নিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, মুয়াক্কেলকে সম্পূর্ণ বিশ পাউণ্ড গোশ্‌তই নিতে হবে। যদি কোন জিনিস হুবহু কিনে আনার জন্য উকিল নিযুক্ত করে তাহলে উকিল সেটা নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না। যদি কেউ কোন একটা গোলাম কিনে দেয়ার জন্য উকিল বানায় অতঃপর উকিল গোলাম ক্রয় করে, তাহলে ক্রয়ের সময় মুয়াক্কেলের উদ্দেশ্যে বা তার প্রদত্ত অর্থে ক্রয় করে না থাকলে তা তার নিজের জন্য বলে গণ্য হবে। মামলায় তদবীরের (জন্য নিযুক্ত) উকিল ইমাম আবূ হানীফা ও সাহেবাইন (রঃ)-এর মতানুসারে (রায়কৃত জিনিস) করায়ত্ত করারও ক্ষমতা লাভ করে। এবং ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে পাওনা তুলে আনার উকিল সে সম্পর্কে জেরা করারও উকিল সাব্যস্ত হবে। জেরার উকিল যদি তার মুয়াক্কেলের ওপর কোন দেনার কথা বিচারকের সম্মুখে স্বীকার করে আসে, তবে তার ইকরার সঙ্গতই হবে। কিন্তু আদালত ছাড়া অন্য কারো সম্মুখে তার স্বীকারোক্তি তরফাইন (রঃ)-এর মতে গ্রাহ্য নয়, তবে এতে তার জেরার অধিকার বিলুপ্ত হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসূফ (রঃ) বলেন, আদালতের বাহিরে (কোন সালিসী বৈঠকে) ও তার স্বীকারোক্তি যথার্থ সাব্যস্ত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَشَرَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ এক টাকায় দশ পাউন্ড গোশত ক্রয় করে আনার জন্য নিযুক্ত উকিল যদি টাকায় বিশ পাউণ্ড গোশত ক্রয় করে নিয়ে আসে এবং গোশতও মুয়াক্কেলের ব্যাখ্যাকৃত মান সম্পন্ন হয়, তাহলে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, মুয়াক্কেল তা থেকে দশ পাউণ্ড গোশত পঞ্চাশ পয়সায় নিতে বাধ্য থাকবে। কারণ উকিল হচ্ছে মুয়াক্কেলের প্রতিনিধি। আর প্রতিনিধির দায়িত্ব হল প্রধানের হুকুম মতো কর্তব্য পালন করা। প্রধানের হুকুম ছিল দশ পাউন্ড গোশত ক্রয় করে আনা; তার চেয়ে বেশি নয়। কিন্তু তদুপরি যখন বেশি ক্রয় করেছে, তখন বুঝতে হবে অতিরিক্তটুকু সে নিজের জন্য ক্রয় করেছে। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ)-এর মত হল, মুয়াক্কেলকে বিশ পাউন্ডই নিতে হবে। কেননা উকিল মুয়াক্কেলের কোন লোকসান করেনি। এতো গেল যদি গোশত কাঙ্ক্ষিত মানের হয়। কিন্তু এক দিরহামে যে মানের দশ পাউন্ড গোশত পাওয়া যায় তার পরিবর্তে যদি নিম্ন মানের বিশ পাউন্ড গোশত ক্রয় করে আনে তাহলে সকল ইমামের মতে সম্পূর্ণটাই উকিলকে নিতে হবে। কারণ উকিল মুয়াক্কেলের মর্জিমাফিক কাজ করেনি।

اِنْ وَكَّلَ بِشِرَاءِ شَيْئٍ بِعَيْنِهِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– আহমদ খালেদকে বলল, রশিদের বাড়ির অমুক তালগাছটা আমাকে ক্রয় করে দাও। তাহলে এ গাছটা রশিদ নিজের জন্য ক্রয় করতে পারবে না।

وَاِنْ وَكَّلَهُ بِشِرَاءِ عَبْدٍ الخ -এর আলোচনা ঃ এর কয়েকটি সুরত হতে পারে—

* যদি عَقْد -এর মধ্যে নির্দেশ দাতার দিরহামের দিকে اِضَافَت (সম্বন্ধ) করে, তবে নির্দেশদাতার জন্য হবে। মুসান্নিফের ইবারত اَوْ يَشْتَرِيْهِ بِمَالِ الْمُوَكِّلِ -এর দ্বারা এটাই উদ্দেশ্য এবং এটা সর্বসম্মত মত।

* আর যদি স্বীয় দিরহামের দিকে اِضَافَت করে, তবে তা উকিলের জন্য হবে। কেননা عُرْف -এর মধ্যে এটাই পরিচিত।

* আর যদি মতলক দিরহামের দিকে اِضَافَت করে এবং মনে মনে নির্দেশ দাতার জন্য নিয়ত করে, তবে নির্দেশ দাতার জন্য হবে। আর যদি নিয়ত নিজের জন্য করে, তবে তার হবে।

* আর যদি নিয়তকে مُوَكِّل মেনে না নেয়, তবে যদি مُوَكِّل -এর টাকার থেকে মূল্য আদায় করা হয়, তবে مُوَكِّل -এর জন্য হবে। আর যদি وَكِيْل -এর টাকার থেকে মূল্য পরিশোধ করা হয়, তবে তা وَكِيْل -এর জন্য হবে।

আর যদি উভয়ে এ ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করে যে, কোন নিয়তই ছিল না, তখন ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ)-এর মতে তা عَاقِد -এর জন্য হবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর নিকট টাকাকে হাকিম বানানো হবে। অর্থাৎ যদি مُوَكِّل -এর টাকা হতে তার মূল্য পরিশোধ করা হয়, তবে مُوَكِّل -এর জন্য হবে। আর যদি উকিলের টাকা হতে মূল্য পরিশোধ করা হয়ে থাকে, তবে উকিলের জন্য হবে।

وَكِيْلٌ بِالْقَبْضِ الخ -এর আলোচনা ঃ কিন্তু এ মাসআলায় ইমাম যুফার (রঃ)-এর মত সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বলেন, মামলার জন্য নিয়োজিত উকিল রায়কৃত পাওনা উসুল করে আনার অধিকার পাবে না। কারণ মামলায় জেরা করার জন্য কাউকে নির্বাচিত ও উপযুক্ত বিবেচনা করা হলে প্রাপ্য আদায় করে আনার ব্যাপারেও যে সে নির্বাচিত তা প্রমাণিত হয় না। ইমামত্রয়ও এ মতই পোষণ করেন। সুতরাং উকিল প্রাপ্য উসুলের ক্ষমতা পাবে না। ফতোয়া ইমাম যুফার (রঃ)-এর কওলের ওপর। কারণ আজকাল উকিলের মধ্যে সে আমানতদারী আর নেই; বরং ছলচাতুরী ও বিশ্বাসঘাতকতার দৌরাত্মই অধিক।

وَاِذَا اَقَرَّ الْوَكِيْلُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– আহমাদ নিজের একটি বেদখল নারিকেল গাছের ব্যাপারে জেরা করার জন্য যায়েদকে উকিল নিযুক্ত করল, যাতে আদালতের মাধ্যমে সে উক্ত গাছের দখল ফিরে পায়। কিন্তু যায়েদ বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক ও বাদানুবাদের পর এক পর্যায়ে বিচারকের সম্মুখে এ কথা স্বীকার করে নিল যে, গাছটির দখল তার মুয়াক্কেল ফিরে পায় না। তাহলে আহমাদ এ রায় মেনে নিতে বাধ্য থাকবে।

وَمَنْ اِدَّعٰى اَنَّهٗ وَكِيْلُ الْغَائِبِ فِىْ قَبْضِ دَيْنِهٖ فَصَدَّقَهُ الْغَرِيْمُ اُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ اِلَيْهِ فَاِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ فَصَدَّقَهٗ جَازَ وَاِلَّا دَفَعَ اِلَيْهِ الْغَرِيْمُ الدَّيْنَ ثَانِيًا وَيَرْجِعُ بِهٖ عَلَى الْوَكِيْلِ اِنْ كَانَ بَاقِيًا فِىْ يَدِهٖ وَاِنْ قَالَ اِنِّىْ وَكِيْلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيْعَةِ فَصَدَّقَهُ الْمُوْدَعُ لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيْمِ اِلَيْهِ -

---

সরল অনুবাদ ঃ যদি কেউ নিজেকে কোন অনুপস্থিত ব্যক্তির কর্জ উসুলের উকিল বলে দাবি করে এবং দেনাদারও তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তাকে তার নিকট কর্জ হস্তান্তরের নির্দেশ দেয়া হবে। এবার উক্ত অনুপস্থিত ব্যক্তি এসে যদি উকিলকে সমর্থন দেয়, তবে তা চমৎকার। নতুবা দেনাদার তাকে পুনরায় কর্জ পরিশোধ করবে এবং (ভুয়া) উকিল থেকে প্রদত্ত অর্থ ফেরত নিয়ে নেবে যদি তা তার নিকট মওজুদ থাকে। পক্ষান্তরে কেউ যদি নিজেকে কারো গচ্ছিত আমানত তুলে নেয়ার উকিল বলে পরিচয় দেয় আর আমানত গ্রহীতা তাকে সত্যায়ন করে, তাহলে তাকে তার হাতে আমানতীমাল প্রত্যার্পণের নির্দেশ দেয়া হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اُمِرَ بِتَسْلِيْمِ الدَّيْنِ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ দেনাদার উকিলকে সত্যায়ন করে প্রকারান্তরে এ কথাই স্বীকার করে নিল যে, দেনার অর্থ তার নিকট দেয়া যেতে পারে বা দেয়া আবশ্যক। কাজেই আদালতও দেনাদারকে তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক দেনা পরিশোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করবে। পরবর্তীকালে অনুপস্থিত ব্যক্তি হাজির হয়ে উকিলের কাজে সমর্থন দিলেতো খুবই ভালো। কিন্তু যদি সে উকিলের উক্তি ভিত্তিহীন ছিল বলে দাবি করে এবং তৎসঙ্গে হলফও করে, তাহলে দেনাদারকে দ্বিতীয়বার দেনা পরিশোধ করতে হবে এবং এক্ষেত্রে উকিলের নিকট দেয়া কর্জের সে অর্থ বা দ্রব্য বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাকলে সে তা ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু যদি উকিলের বিনা গাফলতিতে তা নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, তবে উকিল থেকে দ্রব্যের মূল্য বা অন্য কিছু আদায় করতে পারবে না। কেননা দেনাদার উকিলকে সত্যায়ন করে নিজেই নিজের লোকসান ডেকে এনেছে।

لَمْ يُؤْمَرْ بِالتَّسْلِيْمِ الخ -এর আলোচনা ঃ উপরোক্ত মাসআলার বিধানের সাথে এ মাসআলার পার্থক্য হওয়ার কারণ হল, আমানতী মাল হুবহু আমানত কারককে ফেরত দিতে হয়। কিন্তু কর্জের ব্যাপার কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী; সেখানে কর্জরূপে গৃহীত দ্রব্য নিঃশেষ করে কর্জদাতাকে তার অনুরূপ কিছু শোধ করা হয় মাত্র। অতএব উকিলের দাবি মোতাবেক যদি আমানতী মাল তার হাতে সোপর্দ করা হয় আর আমানতদার পরে উকিলের কথা ভিত্তিহীন ছিল বলে দাবি করত আমানতের দ্রব্য তলব করে, তখন আমানতগ্রহীতার পক্ষে তা দেয়া অসম্ভব হয়ে পড়বে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْوَكَالَةُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার প্রকারভেদ সম্পর্কে যা জান লিখ।
২। কোন্ কোন্ কাজে উকিল নিযুক্ত করা যায় এবং কোন্ কোন্ কাজে উকিল নিযুক্ত করা যায় না? বিস্তারিত লিখ।
৩। اَلْوَكَالَةُ -এর ক্ষেত্র ও উকিলের মর্যাদা সম্পর্কে আলোচনা কর।
৪। اَلْوَكَالَةُ -এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একটি টিকা লিখ।
৫। উকিল, মুয়াক্কেল ও ওকালাতের ক্ষমতার সীমা বর্ণনা কর।
৬। اَلْوَكَالَةُ -এর বিলুপ্তির কারণসমূহ বিশদভাবে আলোচনা কর।
৭। وَيَجُوْزُ بَيْعُهٗ بِالْقَلِيْلِ وَالْكَثِيْرِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ الخ -এর ব্যাখ্যা লিখ।

كِتَابُ الْكَفَالَةِ

اَلْكَفَالَةُ ضَرْبَانِ كَفَالَةٌ بِالنَّفْسِ وَكَفَالَةٌ بِالْمَالِ وَالْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ جَائِزَةٌ وَعَلَى الْمَضْمُوْنِ بِهَا اِحْضَارُ الْمَكْفُوْلِ بِهِ وَتَنْعَقِدُ اِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِنَفْسِ فُلَانٍ اَوْ بِرَقَبَتِهِ اَوْ بِرُوْحِهِ اَوْ بِجَسَدِهِ اَوْ بِرَأْسِهِ اَوْ بِنِصْفِهِ اَوْ بِثُلُثِهِ وَكَذٰلِكَ اِنْ قَالَ ضَمِنْتُهُ اَوْ هُوَ عَلَىَّ اَوْ اِلَىَّ اَوْ اَنَا بِهِ زَعِيْمٌ اَوْ قَبِيْلٌ بِهِ ـ فَاِنْ شَرَطَ فِى الْكَفَالَةِ تَسْلِيْمَ الْمَكْفُوْلِ بِهِ فِىْ وَقْتٍ بِعَيْنِهِ لَزِمَهُ اِحْضَارُهُ اِذَا طَالَبَهُ بِهِ فِىْ ذٰلِكَ الْوَقْتِ فَاِنْ اَحْضَرَهُ وَاِلَّا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ وَاِذَا اَحْضَرَهُ وَسَلَّمَهُ فِىْ مَكَانٍ يَقْدِرُ الْمَكْفُوْلُ لَهُ عَلٰى مُحَاكَمَتِهِ بَرِئَ الْكَفِيْلُ مِنَ الْكَفَالَةِ وَاِذَا تَكَفَّلَ عَلٰى اَنْ يُّسَلِّمَهُ فِىْ مَجْلِسِ الْقَاضِىْ فَسَلَّمَهُ فِى السُّوْقِ بَرِئَ وَاِنْ كَانَ فِىْ بَرِّيَّةٍ لَمْ يَبْرَأْ وَاِذَا مَاتَ الْمَكْفُوْلُ بِهِ بَرِئَ الْكَفِيْلُ بِالنَّفْسِ مِنَ الْكَفَالَةِ ـ

জামানত পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ জামানত দু' প্রকার— (১) ব্যক্তি জামানত ও (২) অর্থের জামানত। ব্যক্তির পক্ষে জামিন হওয়া জায়েয। এতে জামিনদারের দায়িত্ব হয় মাকফূলবিহীকে হাজির করা। (জামানতের এ চুক্তি) সংঘটিত হয় যখন জামিনদার বলে, আমি অমুকের সত্তা অথবা তার গ্রীবা বা আত্মা বা দেহ বা তার মাথা কিংবা তার অর্ধাংশ অথবা তৃতীয়াংশের জামিন হলাম। অনুরূপভাবে যদি বলে, আমি তার জামিন হলাম বা সে আমার দায়িত্বে বা আমি তার জিম্মাদার অথবা দায়িত্বশীল (তাতেও জামানত নিষ্পন্ন হবে)। জামানত চুক্তিতে যদি মাকফূলবিহী (আসামী)-কে কোন সুনির্দিষ্ট সময় হাজির করার শর্ত করা হয় তাহলে কাফীলের অবশ্যক হবে মাকফূললাহু দাবি করলে সে সময়ই তাকে হাজির করা। যদি হাজির করে, তবে তো খুবই উত্তম। অন্যথা আদালত কাফীলকেই গ্রেফতার করে নেবে। যখন তাকে এমন স্থানে হাজির ও হাওয়ালা করবে যেখানে মাকফূললাহু তার সাথে জেরা করতে সক্ষম তখন কাফীল তার দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এভাবে যদি মাকফূলবিহীকে আদালতে সোপর্দ করার দায়িত্ব নিয়ে তাকে বাজারে সোপর্দ করে, তাতেও সে মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু বন-জঙ্গল (বা অন্য কোথাও) হাওয়ালা করলে দায়িত্বমুক্ত হবে না। মাকফূলবিহী মারা গেলেও ব্যক্তির কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْكَفَالَةُ -এর সংজ্ঞা ঃ اَلْكَفَالَةُ শব্দটি বাবে نَصَرَ -এর মাসদার। এর অর্থ হল– মিলানো। যথা, আল্লাহ্‌র বাণী– وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا অর্থাৎ হযরত যাকারিয়া (আঃ) হযরত মরিয়ম (আঃ)-কে নিজের সাথে মিলিয়ে নিলেন।

كَفَالَةٌ -এর শরয়ী অর্থ ঃ শরীয়তের পরিভাষায়, ব্যক্তি, ঋণ বা কোন দ্রব্যের দায়িত্ব গ্রহণকে কাফালত বা জামানত বলে।

কাফালতের প্রয়োজনীয়তা ঃ অনেক সময় মানুষ প্রয়োজন বশত টাকা ঋণ নেয় বা কোন জিনিস ধার গ্রহণ করে; কিন্তু যথা সময় সে ঋণ পরিশোধে সামর্থ্য না হওয়ায় ঋণদাতার পক্ষ থেকে জোরাজুরির সম্মুখীন হয়। এহেন পরিস্থিতিতে উৎপীড়ন থেকে বাঁচার জন্য অন্য ব্যক্তিকে জামিন হিসেবে পেশ করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তিও এই বলে দায়িত্ব নিয়ে নেয় যে, সে তা না দিলে আমি দেব। এতে ঋণদাতা তার টাকা মারা না পড়ার ব্যাপারে অনেকটা অভয়প্রাপ্ত হয়। তদ্রূপ আদালত কোন অভিযুক্ত

ব্যক্তিকে যতক্ষণ পর্যন্ত তার অপরাধ প্রমাণিত না হয় হাজতে রাখে। তখন অভিযুক্ত লোকটি কোন প্রভাবশালী ব্যক্তিকে জামিন স্বরূপ পেশ করে এবং আদালত তার জামিন মেনে তাকে মুক্তি দেয়। শর্ত থাকে যে, প্রয়োজনবোধে জামিনদার তাকে আদালতে উপস্থিত করবে। এভাবে সে সাময়িকভাবে মুক্তি পায়। এরূপ জামানত গ্রহণকে শরীয়তের ভাষায় কাফালত বলা হয়।

কতিপয় পরিভাষা ঃ كَفِيْل – দায়িত্ব ও জামানত গ্রহণকারী ব্যক্তি। مَكْفُوْل عَنْهُ বা اَصِيْل – যার জিম্মায় দেনা রয়েছে এবং যে কাউকে জামিনরূপে পেশ করে। مَكْفُوْل لَهٗ –দাবিদার বা পাওনাদার। مَكْفُوْل بِهٖ – যে ব্যক্তি বা মালের দায়িত্ব নেয়া হয়েছে।

কাফালত শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ঃ (১) কাফীল ও আসীল উভয়ে বালেগ ও সজ্ঞান হতে হবে। (২) মাক্‌ফূলবিহী কোন ব্যক্তি হয়ে থাকলে তার নাম, ঠিকানা ভালোভাবে জেনে নিতে হবে। কিন্তু মাক্‌ফূলবিহী মাল হলে তার পরিমাণ জানা নিষ্প্রয়োজন; বরং একথা বলাই যথেষ্ট যে, আমি অমুকের মালের জামিন। (৩) মাক্‌ফূলবিহী মাল হলে তা এমন হতে হবে যার জামিন আসীল নিজে হতে পারে। সুতরাং কোন বন্ধকী জিনিস বা 'আরিয়তস্বরূপ গ্রহণকৃত মালের জামিন হলে তা শুদ্ধ হবে না। কারণ বন্ধকগ্রহীতা বা 'আরিয়তগ্রহীতার প্রতি তা নষ্ট হয়ে গেলে কোন জরিমানা আরোপিত হয় না। একইভাবে আমানত ও গচ্ছিত বস্তুর কাফালতও শুদ্ধ নয়।

وَاِلَّا حَبَسَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা কাফীল নিজের কর্তব্য পালন করেনি। অবশ্য প্রথমবারেই গ্রেফতার করবে না; বরং কর্তব্য পালনের জন্য আরও কিছুটা অবকাশ দেবে। তারপরও যদি দায়িত্ব আদায় না করে, তবে গ্রেফতার করে নেবে।

وَاِذَا تَكَفَّلَ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ আসামী হাকিমের সম্মুখে হস্তান্তর করার শর্ত থাকলে তাকে সেখানে অথবা বাজারে বা কোর্টের আশে-পাশে উপস্থিত করলেও চলবে। কেননা বাজার বা নগরের লোকজন তখন সহযোগিতা করে আসামীকে দরবার পর্যন্ত পৌঁছে দেবে; পালাতে দেবে না। কিন্তু ইমাম যুফার (রঃ)-এর মতে, বাজারে হস্তান্তর করলে চলবে না, যদিও বা বিচারালয় বাজারে অবস্থিত থাকে। বর্তমান নৈতিক অবক্ষয়ের এ যুগে ইমাম যুফার (রঃ)-এর কওলের ওপর ফতোয়া হবে। কারণ আজকাল লোকজন আসামীকে কোর্টে পৌঁছে দেয়ার পরিবর্তে বরং পালিয়ে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে। অতএব যেখান থেকে আসামী পালিয়ে যেতে পারবে বলে মনে হয় সেখানে সমর্পণ করলে দায়িত্ব সমাপ্ত হবে না।

وَاِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهٖ عَلٰى اَنَّهٗ اِنْ لَمْ يُوَافِ بِهٖ فِىْ وَقْتٍ كَذَا فَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا عَلَيْهِ وَهُوَ اَلْفٌ فَلَمْ يُحْضِرْهُ فِى الْوَقْتِ لَزِمَهٗ ضَمَانُ الْمَالِ وَلَمْ يَبْرَأْ مِنَ الْكَفَالَةِ بِالنَّفْسِ وَلَا تَجُوْزُ الْكَفَالَةُ بِالنَّفْسِ فِى الْحُدُوْدِ وَالْقِصَاصِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاَمَّا الْكَفَالَةُ بِالْمَالِ فَجَائِزَةٌ مَعْلُوْمًا كَانَ الْمَكْفُوْلُ بِهٖ اَوْ مَجْهُوْلًا اِذَا كَانَ دَيْنًا صَحِيْحًا مِثْلُ اَنْ يَّقُوْلَ تَكَفَّلْتُ عَنْهُ بِاَلْفِ دِرْهَمٍ اَوْ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ اَوْ بِمَا يُدْرِكُكَ فِىْ هٰذَا الْبَيْعِ وَالْمَكْفُوْلُ لَهٗ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ طَالَبَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الْاَصْلُ وَاِنْ شَاءَ طَالَبَ الْكَفِيْلَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি কেউ ব্যক্তির পক্ষে এ শর্তে জামিন হয় যে, তাকে অমুক সময় হাজির না করলে তার (আসামীর) দেনার জন্য সে (কাফীল) দায়ী। আর দেনা হয় (কথার কথা) এক হাজার। অতঃপর তাকে সময় মতো হাজির না করে, তাহলে টাকার জিম্মাদারী তার ওপর বর্তাবে ঠিকই; কিন্তু ব্যক্তি জামানত থেকে সে রেহাই পাবে না। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, হদ ও কিসাসের ক্ষেত্রে আসামী পক্ষে জামিন পেশ করার জন্য বাধ্য করা জায়েয নেই। মালের ব্যাপারে জামিন হওয়া জায়েয– চাই সে মালের পরিমাণ কাফীলের জানা থাকুক বা না থাকুক, তবে তা শক্তিশালী ঋণ হতে হবে। (ঋণের জামিন হওয়ার পদ্ধতি হল) যেমন– কাফীল বলবে, "আমি অমুকের পক্ষ থেকে এক হাজার টাকার দায়িত্ব নিলাম। অথবা বলবে, অমুকের নিকট তোমার যা পাওনা অথবা এ পণ্য বিক্রি বাবদ অমুকের কাছে তোমার যা পাওনা হবে তা আমার জিম্মায়।" (মালের জামানতের ক্ষেত্রে) মাকফূললাহুর এখতিয়ার রয়েছে– ইচ্ছা করলে সে মূল দেনাদারের নিকট মাল তলব করবে এবং ইচ্ছা করলে কাফীলের নিকটও চাইতে পারে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِنْ تَكَفَّلَ بِنَفْسِهٖ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি কেউ কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিন হওয়ার সময় বলে, আগামী অমুক তারিখে তাকে আমি উপস্থিত করে দেব। যদি না করি তবে তার নিকট পাওনা টাকার জিম্মাদারী আমার। এমতাবস্থায় কাফীল যদি সে ব্যক্তিকে উপস্থিত না করে, তবে যুগপৎ সে ব্যক্তি ও অর্থ উভয়টার জন্য জামিন সাব্যস্ত হবে। কেননা এ দু'য়ের মধ্যে কোনরূপ বৈপরীত্য নেই। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতে, এভাবে মালের জামিন হওয়া শুদ্ধ নয়। তাঁর মতে এমন কোন শর্তের ভিত্তিতে মালের জামিন হওয়া দুরস্ত নেই, যে শর্ত বাস্তবায়ন হওয়া এবং না হওয়ার উভয়বিধ সম্ভাবনা রাখে। আমাদের মতে, দোদুল্যমান শর্তটি যদি অধিক প্রচলিত হয়, তবে তার সাথে নির্ভরশীল করে মালের জামিন হওয়া জায়েয। আসামীর নিকট প্রাপ্য টাকার জন্য আমি জামিন যদি তাকে উপস্থিত না করি, এখানে "যদি উপস্থিত না করি" কথাটা একটা অধিক প্রচলিত কথা বা শর্ত। সুতরাং জামানত শুদ্ধ।

دَيْنًا صَحِيْحًا الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ এমন দেনা যা থেকে মুক্তি লাভের পন্থা, হয় তা পরিশোধ করা; না হয় প্রাপকের তা ক্ষমা করে দেয়া। সে মতে কিতাবত চুক্তিতে মুকাতাব তার মনিবকে যে অর্থ দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয় তা দাইনে-সহীহ বা শক্তিশালী দেনার আওতাভুক্ত নয়। কারণ মুকাতাবের জন্য উক্ত দেনা থেকে মুক্তি লাভের তৃতীয় একটি উপায়ও রয়েছে। তাহল নিজের আপারগতা ব্যক্ত করা। এতে কিতাবতের চুক্তি বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে দেনাও রহিত হয়ে যায়। সুতরাং মালে-কিতাবতের কাফীল হওয়া শুদ্ধ নয়।

وَالْمَكْفُوْلُ لَهٗ بِالْخِيَارِ الخ -এর আলোচনা ঃ মাকফূললাহুর জন্য এ স্বাধীনতা হল তখন যদি কাফীল মুতলাক্ব (সাধারণ) ভাবে কাফালাত গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু যদি শর্ত ক্রমে কাফালাত গ্রহণ করে, যেমন বলে– "যদি তিনি না দেন তাহলে আমি দেব" তাহলে মাকফূললাহুকে প্রথমে আসীলের নিকট চাইতে হবে। সে পরিশোধ না করলে কাফীল থেকে চেয়ে নেবে। উল্লেখ্য যে, কাফালাত মুতলাক্ব হলে হকদার যুগপৎ জামিন ও দেনাদার উভয়ের নিকট পাওনা চাইতে পারে। কেননা জামিন হওয়ার কারণে মূল দেনাদারের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। কারণ কাফালাতের আসল অর্থ হল একজনের দায়িত্বের সাথে আরেকজনের দায়িত্ব মিলিয়ে নেয়া; দ্বিতীয় জনের মাধ্যমে পূর্বজনকে মুক্ত করা নয়। অবশ্য পূর্বজন যদি তার নিকট তলব করতে পারবে না বলে শর্তারোপ করে, তাহলে এটা 'হাওয়ালা চুক্তিতে' রূপান্তরিত হবে। তখন হকদার শুধুমাত্র জামিনদারের নিকট তলব করতে পারবে–দেনাদারের নিকট নয়।

وَيَجُوزُ تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ بِالشُّرُوطِ مِثْلَ اَنْ يَّقُولَ مَا بَايَعْتَ فُلَانًا فَعَلَيَّ اَوْ مَاذَابَ لَكَ عَلَيْهِ فَعَلَيَّ اَوْ مَا غَصَبَكَ فُلَانٌ فَعَلَيَّ وَاِذَا قَالَ تَكَفَّلْتُ بِمَا لَكَ عَلَيْهِ فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ بِالْفٍ عَلَيْهِ ضَمِنَهُ الْكَفِيلُ وَاِنْ لَمْ تَقُمِ الْبَيِّنَةُ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْكَفِيلِ مَعَ يَمِينِهِ فِي مِقْدَارِ مَا يَعْتَرِفُ بِهِ فَاِنْ اِعْتَرَفَ الْمَكْفُولُ عَنْهُ بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ لَمْ يُصَدَّقْ عَلٰى كَفِيلِهِ ـ وَتَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِاَمْرِ الْمَكْفُولِ عَنْهُ وَبِغَيْرِ اَمْرِهٖ فَاِنْ كَفَلَ بِاَمْرِهٖ رَجَعَ بِمَا يُؤَدِّي عَلَيْهِ وَاِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ لَمْ يَرْجِعْ بِمَا يُؤَدِّي وَلَيْسَ لِلْكَفِيلِ اَنْ يُّطَالِبَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ بِالْمَالِ قَبْلَ اَنْ يُّؤَدِّيَ عَنْهُ فَاِنْ لُوزِمَ بِالْمَالِ كَانَ لَهُ اَنْ يُّلَازِمَ الْمَكْفُولَ عَنْهُ حَتّٰى يُخَلِّصَهُ وَاِذَا اَبْرَأَ الطَّالِبُ الْمَكْفُولَ عَنْهُ اَوْ اِسْتَوْفٰى مِنْهُ بَرِئَ الْكَفِيلُ وَاِنْ اَبْرَأَ الْكَفِيلَ لَمْ يَبْرَأِ الْمَكْفُولُ عَنْهُ وَلَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْبَرَاءَةِ مِنَ الْكَفَالَةِ بِشَرْطٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ কাফালাতকে কোন শর্তের সাথে নির্ভরশীল করা দুরস্ত আছে। যেমন– কাফীল মাকফূললাহুকে বলবে, "যদি অমুকের কাছে বিক্রি কর তবে তার দাম আমার জিম্মায় অথবা যদি অমুকের নিকট তোমার পাওনা সাব্যস্ত হয়, তবে তা আমার জিম্মায় বা অমুক যদি তোমার কোন বস্তু আত্মসাৎ করে, তবে তার দায়িত্ব আমার।" যদি কেউ বলে, অমুকের নিকট তোমার যা প্রাপ্য আমি তার জামিন হলাম। অতঃপর অমুকের নিকট তার (মাকফূললাহুর) এক হাজার টাকা প্রাপ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে কাফীল এক হাজার টাকারই জামিন সাব্যস্ত হবে। আর যদি প্রমাণাদি না থাকে, তবে টাকার পরিমাণের ব্যাপারে কাফীল হলফ করে যা স্বীকার করবে তাই ধর্তব্য হবে। যদি মাক্ফূল'আনহু (দেনাদার) তদপেক্ষা বেশি স্বীকার করে তবে কাফীলের মোকাবেলায় তাকে বিশ্বাস করা হবে না। (অর্থাৎ দেনাদারকে সত্যবাদী সাব্যস্ত করা হবে বটে তবে বেশিটুকুর জন্য কাফীলকে ধরা যাবে না; বরং তা আসীল থেকে নিতে হবে।)

মাকফূল'আনহুর আদেশক্রমে এবং বিনা আদেশেও কাফালাত গ্রহণ করা দুরস্ত আছে। যদি তার আদেশক্রমে কাফালাত গ্রহণ করে, তবে কাফীল যা পরিশোধ করবে তা মাকফূল'আনহু থেকে নিয়ে নেবে। আর যদি বিনা আদেশে কাফালাত গ্রহণ করে, তবে মাকফূল'আনহু থেকে আদায়কৃত দেনা চেয়ে নিতে পারবে না। মাকফূল'আনহুর নিকট মাল দাবি করার অধিকার কাফীলের নেই সে মাল তার পক্ষ থেকে আদায় করার পূর্বে। কিন্তু যদি মালের জন্য কাফীলকে বিরক্ত করা হয়, তাহলে কাফীলও মাকফূল'আনহুকে বিরক্ত করতে পারবে, যাতে সে দেনা আদায় করে কাফীলকে যন্ত্রণামুক্ত করে। মাকফূললাহু (প্রাপক) যদি মাকফূল'আনহু (দায়িক)-কে দেনা মাফ করে দেয় অথবা (কোনভাবে) তার থেকে উসুল করে নেয়, তবে কাফীল দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি প্রাপক কাফীলকে দায়মুক্ত করে দেয়, তাহলে মাকফূল'আনহু দেনামুক্ত হবে না। কাফালাতের দায়মুক্তিকে কোন শর্তের সাথে নির্ভরশীল করা জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

تَعْلِيقُ الْكَفَالَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন শর্তের সাথে আস্থাশীল করে জামানত গ্রহণ করা জায়েয আছে। তবে সে শর্তটি অবশ্যই এমন হতে হবে যা কাফালাতের সাথে পূর্ণ সঙ্গতিশীল।

فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, আহমদের কিছু কর্জ ছিল রশিদের দায়িত্বে। এক পর্যায়ে খালেদ সে টাকার জামিন হয়ে আহমদকে বলল, রশিদের কাছে তোমার যা পাওনা রয়েছে তার দায়িত্ব আমি নিলাম। এখন

আহমদ যদি তার প্রাপ্য এক হাজার টাকা ছিল বলে দাবি করে এবং সাথে সাথে প্রমাণও পেশ করে, তবে খালেদকে এক হাজারই দিতে হবে। কেননা যে জিনিস প্রমাণ দ্বারা সাবেত হয় তা চোখে দেখা জিনিসেরই ন্যায়। কিন্তু আহমদের নিকট দাবির স্বপক্ষে কোন প্রমাণ না থাকলে কাফীল অর্থাৎ খালেদ হলফ করে টাকার যে অংক স্বীকার করবে কমবেশি যা হোক তা-ই গ্রাহ্য হবে। এমতাবস্থায় দেনাদার অর্থাৎ রশিদ যদি টাকার পরিমাণ আরো বেশি বলে স্বীকার করে, তবে বেশিটুকু খালেদের ওপর বর্তাবে না। কারণ বিনা প্রমাণে অন্যের ওপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না।

وَاِنْ كَفَلَ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ যদি কেউ স্বেচ্ছায়-স্বউদ্যোগে কোন ব্যক্তির দেনার জামিন হয় এবং নিজের পক্ষ থেকে তা আদায় করে দেয়, তবে দেনাদারের নিকট সে উক্ত টাকা চেয়ে নিতে পারবে না। কারণ এ স্থলে কাফীল জামানত সূত্রে নয়; বরং সৌজন্যতার ভিত্তিতে মাকফূল'আনহুর ধার পরিশোধ করেছে বলে বুঝতে হবে। আর অনুগ্রহের ভিত্তিতে কারো ধার পরিশোধ করা হলে পরে তা আর সে ব্যক্তির থেকে চেয়ে নেয়া যায় না। অবশ্য দেনাদার যদি নিজ থেকে উক্ত টাকা আদায়কারীকে দিয়ে দেয় সেটা ভিন্ন কথা।

اَنْ يُّلَازِمَ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ কাফীল এ সঙ্কটে পড়ার মূলে রয়েছে মাকফূল'আনহু। কেননা মাকফূল 'আনহুকে রক্ষা করতে গিয়েই কাফীল পাওনাদারের সার্বক্ষণিক জোরাজুরির শিকার হয়েছে। কাজেই সেও মাক্ফূল'আনহুকে বার বার তাগাদা দিতে পারবে।

وَلَا يَجُوْزُ تَعْلِيْقُ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– কাফীল যদি জামিন হওয়ার সময় বলে, "অমুকে যে দিন দেশে ফিরবে সে দিন থেকে আমার দায়িত্ব শেষ" তবে তা শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ এ শর্তারোপ অসার ও অনর্থক হিসেবে পরিগণিত হবে। সে মতে শর্ত পাওয়া গেলেও তার দায়িত্ব শেষ হবে না। কিন্তু কোন কোন আলিমের মতে, জামানতের সমাপ্তিতে মিল রয়েছে এমন কোন শর্তের সাথে নির্ভরশীল করা হলে তা জায়েয হবে, নতুবা জায়েয হবে না। সামঞ্জস্যহীন শর্তের উদাহরণ হল, যেমন কাফীল বলল, যদি আকাশে বিদ্যুৎ চমকায় তবে আমার দায়িত্ব শেষ।

وَكُلُّ حَقٍّ لَا يُمْكِنُ اِسْتِيفَاؤُهُ مِنَ الْكَفِيلِ لَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهِ كَالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَإِذَا تَكَفَّلَ عَنِ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ جَازَ وَإِنْ تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ بِالْمَبِيعِ لَمْ تَصِحَّ وَمَنِ اسْتَاجَرَ دَابَّةً لِلْحَمْلِ فَإِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ وَإِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ وَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ إِلَّا بِقَبُولِ الْمَكْفُولِ لَهُ فِي مَجْلِسِ الْعَقْدِ إِلَّا فِي مَسْئَلَةٍ وَاحِدَةٍ وَهُوَ أَنْ يَقُولَ الْمَرِيضُ لِوَارِثِهِ تَكَفَّلْ عَنِّي بِمَا عَلَيَّ مِنَ الدَّيْنِ فَتَكَفَّلَ بِهِ مَعَ غَيْبَةِ الْغُرَمَاءِ جَازَ. وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ عَلَى اثْنَيْنِ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ ضَامِنٌ عَنِ الْآخَرِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْجِعْ بِهِ عَلَى شَرِيكِهِ حَتَّى يَزِيدَ مَا يُؤَدِّيهِ عَلَى النِّصْفِ فَيَرْجِعُ بِالزِّيَادَةِ وَإِذَا تَكَفَّلَ اثْنَانِ عَنْ رَجُلٍ بِأَلْفٍ عَلَى أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَفِيلٌ عَنْ صَاحِبِهِ فَمَا أَدَّى أَحَدُهُمَا يَرْجِعُ بِنِصْفِهِ عَلَى شَرِيكِهِ قَلِيلًا كَانَ أَوْ كَثِيرًا وَلَا تَجُوزُ الْكَفَالَةُ بِمَالِ الْكِتَابَةِ سَوَاءٌ حُرٌّ تَكَفَّلَ بِهِ أَوْ عَبْدٌ وَإِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا فَتَكَفَّلَ رَجُلٌ عَنْهُ لِلْغُرَمَاءِ لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا تَصِحُّ.

সরল অনুবাদ ঃ যে সমস্ত পাওনা কাফীল থেকে আদায় করে নেয়া সম্ভব নয় তার ব্যাপারে জামিন হওয়া দুরস্ত নেই। যেমন- হদ এবং কিসাস। যদি ক্রেতার পক্ষ থেকে দামের জামিন হয় তবে তা দুরস্ত আছে; কিন্তু বিক্রেতার পক্ষ থেকে পণ্যের জামিন হওয়া দুরস্ত নেই। (কোন নির্দিষ্ট পরিবহনের সাহায্যে মালামাল পৌঁছে দেয়ার কাফালাত গ্রহণ করা দুরস্ত নেই। কাজেই) যে ব্যক্তি বোঝা বহনের কাজে কোন সওয়ারি ভাড়া আনে, যদি তা নির্দিষ্ট হয় তবে তাতে করে কারো বোঝা পৌঁছে দেয়ার কাফালাত গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে না। কিন্তু যে কোন সওয়ারির সাহায্যে বোঝা পৌঁছে দেয়ার কাফালাত গ্রহণ করা শুদ্ধ হবে। (কাফালাতের) চুক্তি স্থলে মাকফূললাহু নিজ সম্মতি প্রকাশ না করলে (কোন প্রকার) কাফালাত শুদ্ধ হবে না। তবে একটি মাসআলা ব্যতিক্রম। তাহল কোন (ঋণগ্রস্ত) মুমূর্ষ ব্যক্তি যখন তার ওয়ারিশকে ডেকে বলে, "আমার সমুদয় ঋণের দায়িত্বভার তুমি নাও" আর ওয়ারিশ পাওনাদার (মাকফূললাহু)-দের অনুপস্থিতিতে সে দায়িত্ব নিয়ে নেয়, তবে তা জায়েয আছে। যদি দু' ব্যক্তি মিলে কারো কাছে ঋণী হয় এবং তারা নিজেরা একে অপরের কাফীল বলে স্থির করে নেয়, তবে (তা জায়েয আছে। এমতাবস্থায়) তাদের একজন যা কিছু পরিশোধ করবে অপরজন থেকে তা চেয়ে নেবে না যতক্ষণ না তার আদায়কৃত ঋণ অর্ধেকের বেশি হবে। তখন বেশিটুকু দ্বিতীয় শরিক থেকে চেয়ে নেবে। পক্ষান্তরে দুই ব্যক্তি মিলে যদি তৃতীয় কারো এক হাজার টাকার জামিন হয় এবং এতে তারা আপসের মধ্যে একে অন্যের কাফীল বলেও সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাদের একজন কমবেশি যতটুকু (দেনা) পরিশোধ করবে আপন শরিক থেকে তার অর্ধেক চেয়ে নিতে পারবে। স্বাধীন অথবা গোলাম কারো জন্যই (কোন মুকাতাবের) কিতাবতের অর্থের জামিন হওয়া শুদ্ধ নয়। যদি কোন লোক ঋণগ্রস্ত হয়ে মারা যায় এবং মৃত্যুর সময় (অর্থ-সম্পদ বলতে) কিছুই রেখে না যায়; অতঃপর কেউ পাওনাদারদের জন্য তার এ ঋণের জামিন হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, এ কাফালাত শুদ্ধ নয়। (অবশ্য কেউ ইচ্ছা কারলে অনুগ্রহমূলক ভাবে ঋণ আদায় করে দিতে পারবে।) কিন্তু সাহেবাইন (রঃ)-এর মতে, তা দুরস্ত আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَالْحُدُوْدِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ হদ এবং কিসাসসহ যাবতীয় সাজা যেহেতু সংশ্লিষ্ট অপরাধী ব্যতীত অন্য কেউ ভোগ করার অধিকার রাখে না সে কারণে এদের তরফ থেকে কেউ জামিনও হতে পারে না। অবশ্য এক প্রকারের আসামীদের অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদের জামিন হওয়া যায়। যেন স্বল্পকালীন হলেও তারা হাজতে আবদ্ধ থাকা থেকে পরিত্রাণ পেতে পারে। কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত হওয়ার পর আর সে সুযোগ থাকে না।

وَاِنْ تَكَفَّلَ عَنِ الْبَائِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ বিক্রেতার তরফ থেকে কেউ পণ্যের জামিন হতে পারবে না। কারণ জামানতের ব্যবস্থা মূলত দেনার জন্য নগদ দ্রব্যের জন্য নয়। অথচ বিক্রিত পণ্য হল নগদ দ্রব্য। পক্ষান্তরে মূল্য অর্থাৎ টাকা-পয়সা যেহেতু নির্দিষ্ট করা দ্বারা নির্দিষ্ট হয় না; সে কারণে তা দেনার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ফলে ক্রেতার পক্ষ থেকে ক্রয়কৃত পণ্যের মূল্যের জামিন হওয়া জায়েয আছে।

اَلْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ الخ -এর আলোচনা ঃ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যেভাবে ব্যক্তির উপস্থিতি ও মাল পরিশোধের জামানত হতে পারে, ঠিক তদ্রূপ স্থানান্তর ও পরিবহনেরও জামানত জায়েয আছে।

রেলওয়ে জামিন ঃ রেল বা পরিবহন-যাত্রীরা যে স্থানের টিকেট কেটেছে অথবা নিজের মাল-সামান যেখানে পৌঁছানোর জন্য বুক করিয়েছে, রেলওয়ে সে স্থান পর্যন্ত পৌঁছানোর ব্যাপারে জামিন বা কাফীল। অতঃপর গাড়ি যদি বন্ধ হয়ে পড়ে অথবা লাইনচ্যুত হয় এবং যাত্রীদের জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি হয় অথবা তাদের টিকেট রেলের বিপদের সময় হারিয়ে যায়, তাহলে এসবের ক্ষতিপূরণ রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে এবং তাকে টিকেট ছাড়াই স্টেশনে পৌঁছাতে হবে। ক্ষতিপূরণ না দিলে আইনের আশ্রয় নেয়া যেতে পারে। তদ্রূপ যেসব মাল-সামান ব্যবসায়ীরা রেলওয়ের মাধ্যমে আনয়ন বা প্রেরণ করে সেসব কিছুর দায়িত্বও রেলওয়ের ওপর বর্তাবে। অর্থাৎ তা যদি হারিয়ে যায় বা ভেঙ্গেচুরে যায়, তবে তার ক্ষতিপূরণ রেলওয়ে বহন করবে। ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি না হলে আইনের সাহায্যে আদায় করা যাবে। একই বিধান অন্য সব পরিবহনের বেলায়ও।

ডাকঘর ও কাফীল ঃ এভাবে যেসব চিঠি, রেজিস্ট্রি, মনি অর্ডার, বীমা, পার্সেল ডাকঘরের মাধ্যমে প্রেরিত হয়ে থাকে। ডাকঘর এসব কিছুর কাফীল। অর্থাৎ এগুলো হারিয়ে গেলে এবং তার প্রমাণ থাকলে ডাক বিভাগকেই তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। একে كَفَالَةُ بِالدَّرْكِ বলা হয়।

কোন দ্রব্য পৌঁছানোর বীমা ঃ তদ্রূপ যদি কোন জাহাজচালক-কোম্পানী অথবা বীমা-কোম্পানী কোন জিনিস একটা নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়ার এবং জিনিসগুলো নষ্ট হয়ে গেলে ক্ষতিপূরণ দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে, তাহলে এরূপ বীমা করা জায়েয। এ ক্ষেত্রে উল্লিখিত কোম্পানী এসবের জামিন হবে। অবশ্য জাহাজচালক-কোম্পানী ও বীমা-কোম্পানীর দায়িত্বের মধ্যে কিছুটা ব্যবধান আছে। জাহাজ-কোম্পানী কখনো "অংশীদার শ্রমিক" আবার কখনো বা "বেতনভোগী আমানতদারের" ভূমিকায় থাকে। কিন্তু বীমা সংস্থা এমনটি হয় না।

বিশেষ নির্দেশিকা ঃ এ প্রসঙ্গে দু'টি কথা বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে। (প্রথমত) পণ্যসামগ্রী যে পরিমাণ বহন করা হয়েছে ঠিক সে পরিমাণই তালিকাভুক্ত করতে হবে। অযথা অধিক পরিমাণ দেখালে গুনাহ্গার হবে। (দ্বিতীয়ত) এর ওপর আজকের বহুল প্রচলিত জীবন বীমা (Life Insurance) ও সম্পদ বীমাকে কিয়াস করা যাবে না। এর মূলে রয়েছে সুদ ও জুয়া (রিবা অধ্যায় দেখুন)।

وَاِذَا مَاتَ الرَّجُلُ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি কোন ব্যক্তি কিছু দেনা রেখে নিঃস্ব অবস্থায় মারা যায় এবং মৃত্যুর পর কেউ তার দেনার জামিন হয়, তবে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে, এ জামানত শুদ্ধ নয়। কারণ এখানে দেনা লুপ্ত হয়ে গেছে। দেনাদার জীবিত থাকলে কিংবা তার অবর্তমানে তাঁর সম্পদ থাকলে দেনা বহাল থাকে। অথচ কোন দেনার কাফালাত শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত হল সে দেনা বলবৎ থাকা। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) সহ ইমামত্রয়ের মত হল, এমতাবস্থায় জামিন হওয়া জায়েয আছে। কারণ জনৈক নিঃস্ব আনসারী সাহাবীর মৃত্যুর পর হযরত আবূ কাতাদা (রাঃ) তার ঋণের জামিন হয়েছিলেন। এতে জামানত জায়েয হওয়ার কথা প্রমাণিত হয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْكَفَالَةُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং اَلْكَفَالَةُ -এর পরিভাষাগুলো লিখ।
২। اَلْكَفَالَةُ -এর প্রকারভেদ ও নিয়মাবলীর বর্ণনা দাও।
৩। اَلْكَفَالَةُ বিশুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী আলোচনা কর।
৪। কাফীলের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কে যা জান তা বিস্তারিত লিখ।
৫। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে জামানত শুদ্ধ নয়? বর্ণনা কর।
৬। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

اَلْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ وَاِنْ كَانَتْ بِعَيْنِهَا لَمْ تَصِحَّ الْكَفَالَةُ بِالْحَمْلِ وَاِنْ كَانَتْ بِغَيْرِ عَيْنِهَا جَازَتِ الْكَفَالَةُ ·

كِتَابُ الْحَوَالَةِ

اَلْحَوَالَةُ جَائِزَةٌ بِالدُّيُونِ وَتَصِحُّ بِرِضَاءِ الْمُحِيلِ وَالْمُحْتَالِ لَهُ وَالْمُحْتَالِ عَلَيْهِ وَإِذَا تَمَّتِ الْحَوَالَةُ بَرِئَ الْمُحِيلُ مِنَ الدُّيُونِ وَلَمْ يَرْجِعِ الْمُحْتَالُ لَهُ عَلَى الْمُحِيلِ إِلَّا أَنْ يَتْوِى حَقُّهُ وَالتَّوٰى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى بِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَجْحَدَ الْحَوَالَةَ وَيَحْلِفَ وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عَلَيْهِ أَوْ يَمُوتَ مُفْلِسًا وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى هٰذَانِ الْوَجْهَانِ وَوَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ بِإِفْلَاسِهِ فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَإِذَا طَالَبَ الْمُحْتَالُ عَلَيْهِ الْمُحِيلَ بِمِثْلِ مَالِ الْحَوَالَةِ فَقَالَ الْمُحِيلُ أَحَلْتُ بِدَيْنٍ لِي عَلَيْكَ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ وَكَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ الدَّيْنِ وَإِنْ طَالَبَ الْمُحِيلُ الْمُحْتَالَ بِمَا أَحَالَهُ بِهِ فَقَالَ إِنَّمَا أَحَلْتُكَ لِتَقْبِضَهُ لِي وَقَالَ الْمُحْتَالُ لَا بَلْ أَحَلْتَنِي بِدَيْنٍ لِي عَلَيْكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُحِيلِ مَعَ يَمِينِهِ ـ وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ وَهُوَ قَرْضٌ اِسْتَفَادَ بِهِ الْمُقْرِضُ أَمْنَ خَطَرِ الطَّرِيقِ ـ

হাওয়ালাহ পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ আপন ঋণের বোঝা (অন্যের ওপর) হাওয়ালাহ (অর্পণ) করা জায়েয আছে। মুহীল, মুহতাল-লাহু এবং মুহতাল-'আলইহ্ এই তিন জনের সম্মতির ভিত্তিতে হাওয়ালাহ চুক্তি শুদ্ধ হয়। যখন হাওয়ালাহ চুক্তি সম্পন্ন হয়ে যাবে, তখন মুহীল ঋণের দায় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। কাজেই মুহ্তাল-লাহু মুহীলের নিকট তার প্রাপ্য তলব করতে পারবে না। কিন্তু তার প্রাপ্য মারা পড়লে (রুজু করতে পারবে)। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, মারা পড়া দু'টি কারণে হতে পারে – (১) হয়তো মুহতাল-আলাইহ হাওয়ালার কথা হলফ করে অস্বীকার করে বসল; আর মুহ্তাল-লাহুর নিকটও এতদসংক্রান্ত কোন সনদপত্র নেই। (২) অথবা সে (মুহ্তাল-আলাইহি) দেওলিয়া অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, মারা পড়ার উক্ত দু' কারণ ছাড়াও তৃতীয় একটি কারণ রয়েছে। তাহল– মুহ্তাল-'আলাইহ্র জীবদ্দশায়ই সরকার তাকে দেওলিয়া ঘোষণা করা। মুহতাল-'আলাইহ্ যখন তার ওপর হওয়ালাকৃত অর্থ মুহীলের নিকট ফিরে চাবে, তখন যদি মুহীল বলে, আমিতো ঐ ঋণের জন্য তোমাকে হাওয়ালাহ করেছি যা তোমার কাছে আমার প্রাপ্য ছিল। তাহলে মুহীলের এ দাবি গ্রাহ্য হবে না; বরং অর্পিত ঋণের সমপরিমাণ অর্থ প্রদান করা তার ওপর আবশ্যক হবে। মুহ্তাল-লাহুকে যে অর্থের জন্য হাওয়ালাহ করা হয়েছিল মুহীল যদি তার নিকট সে অর্থ তলব করে বলে, আমি তো তোমাকে আমার জন্য ঋণ উসুলের হাওয়ালাহ করে ছিলাম। আর মুহতাল বলে না, আপনি বরং ঐ ঋণের জন্য আমাকে হাওয়ালাহ করেছেন যা আপনার নিকট আমার প্রাপ্য ছিল। তাহলে মুহীলের কথা তার হলফের ভিত্তিতে অগ্রগণ্য হবে। সাফাতাজা মাকরূহে তাহরীমি। আর তা হল এমন কর্জ যা দ্বারা কর্জদাতা রাস্তা-ঘাটের নিরাপত্তা সুবিধা লাভ করে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

كَفَالَة ও حَوَالَة-এর সম্পর্ক ঃ كَفَالَة ও حَوَالَة-এর মাঝে সম্পর্ক হল, উভয়ের মধ্যে اِعْتِمَاد ও وُثُوق-এর ভিত্তিতে এমন ঋণ আবশ্যক হয় যা اَصِيل-এর জিম্মায় ওয়াজিব হয়।

কাফালাত ও হাওয়ালাহ -এর মধ্যকার পার্থক্য ঃ কাফালাতের মধ্যে পাওনাদার আসীল ও কাফীল উভয়ের নিকট পাওনা দাবি করতে পারে। আর হাওয়ালায় দেনাদারের সাথে কোন কথা নেই; পাওনাদার কেবল মুহতাল-আলাইহ্ দায়িত্ব গ্রহণকারী-এর নিকট দাবি করতে পারে।

كَفَالَةٌ টি যেন مُفْرَد -এর স্থানে হল, আর حَوَالَة যেন مُرَكَّب -এর স্থানে হল। আর مُفْرَد সর্বদাই مُرَكَّب এর ওপর مُقَدَّم হয় বিধায় كَفَالَة -কে حَوَالَة -এর পূর্বে বর্ণনা করেছেন।

حَوَالَة -এর পরিচয় ঃ حَوَالَة -এর শাব্দিকার্থ হল– কোন একটি জিনিসকে এক স্থান হতে অন্য স্থানের দিকে নিয়ে যাওয়া বা দায়িত্ব স্থানান্তর করা বা হওয়া। কিন্তু শরীয়তের পরিভাষায় হাওয়ালাহ বলে– نَقْلُ الدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ اِلَى ذِمَّةٍ অর্থাৎ নিজের ঋণের দায়িত্ব অন্যের ওপর ছেড়ে দেয়া। অর্থনীতির পরিভাষায় একে বলে (Novetion)। মহানবী (সাঃ) মুসলিম উম্মাহর সম্পদশালী লোকদের নির্দেশ দিয়েছেন, কোন ঋণগ্রস্ত যদি তাদের কাউকে তার ঋণের দায়িত্ব অর্পণ করে, তবে সে যেন উক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করে। হাদীসের ভাষায়– مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَاِذَا اُتْبِعَ اَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتْبَعْ (ابو داود)

তাছাড়া হাওয়ালাহকে বাট্টাবিহীন হুন্ডির একটি ভিন্নরূপ বলা যায়। বিশেষত আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ আদায় করার ব্যাপারে হাওয়ালার (Novetion) বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। ইহা ফরেন বিল অফ একচেঞ্জের (Foreign Bills of Exchange) স্থলাভিষিক্ত বা বিকল্প হতে পারে এবং শুধু অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেই নয় বর্হিবাণিজ্যেও এর দ্বারা অনেক সুবিধা ও পারস্পরিক ঋণ আদায় অনেকখানি সহজ হয়। জার্মান প্রাচ্যবিদ ফন ক্রেসার বলেন, হাওয়ালাহ সম্পর্কে ইসলামী শাস্ত্রবিদগণ যে গভীর আলোচনা করেছেন তা মুসলমানদের উন্নত ব্যবসায়ী কার্যক্রমের পরিচয় দেয়।

ইসলামী শরীয়ত যেভাবে একজন দরিদ্র অভাবী লোককে ঋণ গ্রহণের অনুমতি দিয়েছে এবং যেভাবে ঋণগ্রহীতার বোঝা হালকা করার জন্য কাফালাতের অনুমতি দিয়েছে, সেভাবে ঋণে জড়িত ব্যক্তির সুবিধার আরও একটি পদ্ধতি সৃষ্টি করে দিয়েছে, তাকে বলা হয় হাওয়ালাহ বা ভার অর্পণ।

হাওয়ালাহ একটি নৈতিক দায়িত্ব ঃ কেউ যদি অন্যের অর্পিত দায়িত্ব গ্রহণ না করে, তবে তার বিরুদ্ধে কোন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় না বটে, তবে সে একটা নৈতিক দায়িত্বে অবজ্ঞা প্রদর্শন করল। এটা একটা নৈতিক দায়িত্ব মনে করেই তা আদায় করা প্রয়োজন, এমনকি নিজের কিছু ক্ষতি হলেও।

কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষা ঃ (১) مُحِيل – যে ঋণী আপন দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপাতে চায়। (২) مُحْتَال لَهُ বা مُحَال لَهُ – ঋণ প্রাপক অথবা সে ব্যক্তি যার অর্থ মুহীল এর দায়িত্বে বাকি। (৩) مُحْتَال عَلَيْهِ – যে ব্যক্তি মুহীল এর ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছে। (৪) مُحْتَال بِهِ – যে অর্থের জন্য হাওয়ালাহ করা হয়েছে। যেমন ধরুন, খালেদের নিকট তারেকের একশত টাকা পাওনা। এখন খালেদ তৃতীয় এক ব্যক্তি বশিরকে বলল, আপনি তারেকের টাকার দায়িত্ব নিন, আমিতো এখন পরিশোধ করতে পারছি না। বশির স্বীকার করে নিল। তাহলে খালেদ হল মুহীল; তারেক মুহতাল-লাহু; বশির মুহ্তাল-'আলাইহি এবং একশত টাকা হল মুহতালবিহী।

হাওয়ালাহ শুদ্ধ হওয়ার শর্তাবলী ঃ (১) মুহতাল-লাহু ও মুহতাল-'আলাইহ্ উভয়ের সম্মতি থাকা প্রয়োজন। (২) হাওয়ালার দলিল (Deed) সম্পাদনের সময় মুহীল ও মুহতাল-লাহু স্বশরীরে হাজির থাকা জরুরি। অবশ্য মুহতাল-'আলাইহ্ অনুপস্থিত থাকলে কোন অসুবিধা নেই। তবে তাকে তথ্য পাঠিয়ে সম্মতি নিয়ে নিতে হবে। (৩) মুহীল, মুহতাল-লাহু এবং মুহতাল-'আলাইহ্ এ তিন জনকেই বালেগ ও জ্ঞানী হতে হবে। (৪) যে ঋণের কাফালাত শুদ্ধ নয় তার হাওয়ালাহও শুদ্ধ নয়। যেমন– আমানতের টাকার হাওয়ালাহ। কাফালাতে ঋণের পরিমাণ জানা থাকা জরুরি নয়; কিন্তু হাওয়ালায় তা জরুরি।

وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ الخ -এর আলোচনা ঃ اَلسَّفَاتِجُ শব্দটি বহুবচন, একবচন سَفْتَجَةٌ অর্থ– সুরক্ষিত জিনিস। পরিভাষায় সুফতাজা হল, এক শহরের কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট টাকা বা পণ্যদ্রব্য জমা রেখে তার থেকে একটি অঙ্গীকারপত্র (Letter of Credit) গ্রহণ করা এবং অন্য শহরে জমাকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধির নিকট অঙ্গীকারপত্র জমা দিয়ে সমপরিমাণ টাকা বা পণ্য উসুল করে নেয়া। এভাবে মালের মালিক রাস্তায় নিরাপত্তা-সুবিধা লাভ করে থাকে। মনে রাখতে হবে, নগদ টাকার স্থলাভিষিক্ত স্বরূপ যে অঙ্গীকারপত্র নেয়া হয় তাকে অর্থনীতির ভাষায় ক্রেডিট নোট বলে। ভবিষ্যতে টাকা আদায় করার প্রতিশ্রুতিতে হুন্ডিচেক, সরকারী প্রমিসরি নোট, ব্যাংকের জারী করা নোট এবং পোষ্টাল অর্ডার ও মনি অর্ডার ক্রেডিটেরই বিভিন্ন রূপ।

প্রমিসরি নোট ইস্যু করার প্রচলন ইসলামের প্রথম যুগেও ছিল। হযরত আব্দুল্লাহ্ ইবনে যুবায়ের (রাঃ) মক্কা নগরে ইরাকগামী লোকদের থেকে টাকা গ্রহণ করতেন এবং সে সম্পর্কে তার ভাই ইরাকের গভর্নর মুস'আব ইবনে যুবায়েরকে লেখে পাঠাতেন, লোকেরা তার কাছ থেকে এ টাকা আদায় করে নিত। -(আবূ দাউদ) কিন্তু সমস্যা হবে তখন যদি এ লেনদেন কাজে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এজন্য কোন বাট্টা বা সুদ গ্রহণ করে। যেমনটি কোন কোন প্রতিষ্ঠান করে থাকে। কিন্তু যদি ব্যবস্থাপনার লেনদেন বাবদ কিছু গ্রহণ করে, তবে না জায়েয হওয়ার কোন কারণ নেই। ব্যাংক, পোষ্ট অফিস প্রভৃতি সরকারি সিকিউরিটি সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের মারফতে এক শহর থেকে অন্য শহরে পণ্যদ্রব্য কিংবা নগদ টাকা স্থানান্তর করা এবং প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক মজুরি বাবদ নির্দিষ্ট হারে কমিশন লওয়া কোনরূপই অসঙ্গত হতে পারে না। মাওলানা আব্দুল হাই লক্ষ্ণৌবী (রঃ) হিদায়া ও শরহে বেকায়ার হাশিয়ায় এ কমিশন প্রসঙ্গে যা লেখেছেন তা হল—

تَعَطَّلَتِ الْاُمُوْرُ وَكَسَدَتِ التِّجَارَةُ وَانْقَلَبَتِ الْاَحْوَالُ مِنَ الْيُسْرِ اِلَى الْعُسْرِ فَلَا يُضَافُ عَلَى النَّاسِ.

অর্থাৎ "অনেক বাণিজ্যিক কারবার বন্ধ হয়ে যাবে, সহজ কারবারে সৃষ্টি হবে জটিলতা। সুস্পষ্ট দলিল- প্রমাণ ব্যতীত লোকজনকে এরূপ জটিলতায় নিক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নয়।" অবশেষে তিনি লেখেছেন- উকিল ও মুহ্তাল-'আলাইহ্ যদি মুয়াক্কেল ও মুহীলের কোন কাজ সমাধা দিয়ে কিছু বিনিময় গ্রহণ করে, তবে তা হারাম এমন কথা কেউ বলেননি। আমার মতে কিছু পারিতোষিক গ্রহণ করাতে কোন দোষ নেই ইনশাআল্লাহ্। অবশ্য বাট্টা কর্তন বা সুদ নেয়ার প্রচলন থাকলে তা হারাম হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْحَوَالَةُ ও اَلْكَفَالَةُ -এর মধ্যকার সম্পর্ক এবং উভয়ের পার্থক্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। اَلْحَوَالَةُ -এর সংজ্ঞা ও তার পরিভাষাগুলো লিখ।

৩। اَلْحَوَالَةُ শুদ্ধ হওয়ার শর্তগুলো কি কি? বিস্তারিত লিখ।

৪। وَيُكْرَهُ السَّفَاتِجُ -এর ব্যাখ্যা কর।

كِتَابُ الصُّلْحِ

اَلصُّلْحُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَضْرُبٍ صُلْحٌ مَعَ اِقْرَارٍ وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَهُوَ اَنْ لَا يُقِرَّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ وَلَا يُنْكِرَ وَصُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ وَكُلُّ ذٰلِكَ جَائِزٌ ـ فَاِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ اِقْرَارٍ اُعْتُبِرَ فِيْهِ مَا يُعْتَبَرُ فِى الْبِيَاعَاتِ اِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَالٍ وَاِنْ وَقَعَ عَنْ مَالٍ بِمَنَافِعٍ فَيُعْتَبَرُ بِالْاِجَارَاتِ وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوْتِ وَالْاِنْكَارِ فِىْ حَقِّ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ لِاِفْتِدَاءِ الْيَمِيْنِ وَقَطْعِ الْخُصُوْمَةِ وَفِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ لِمَعْنَى الْمُعَاوَضَةِ وَاِذَا صَالَحَ عَنْ دَارٍ لَمْ يَجِبْ فِيْهَا الشُّفْعَةُ وَاِذَا صَالَحَ عَلٰى دَارٍ وَجَبَتْ فِيْهَا الشُّفْعَةُ ـ

আপস-মীমাংসা পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ আপস-রফা তিন প্রকার– (ক) (বিপক্ষের দাবি) স্বীকার করে নিয়ে আপস করা, (খ) নীরবতা অবলম্বন পূর্বক অর্থাৎ বিবাদী স্বীকার বা প্রতিবাদ কিছুই না করে আপস করা, (গ) দাবি অস্বীকার পূর্বক আপস করা। এ সবক'টি ধারাই জায়েয। যদি বিপক্ষের দাবি স্বীকার করে নিয়ে আপস করা হয়, তবে (তার দু'অবস্থা) যদি অর্থ দাবির প্রেক্ষিতে অর্থ দিয়ে আপস হয় তাহলে (এটা এক ধরনের ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে এবং) ক্রয়-বিক্রয়ের সমস্ত নীতি তাতে ধর্তব্য হবে। আর যদি অর্থ দাবির প্রেক্ষিতে মুনাফা দিয়ে সোলাহ হয়, তবে তা ইজারা-চুক্তির সাথে তুল্য হবে (এবং ইজারার সমুদয় নিয়ম-নীতি তাতে কার্যকর হবে)।

নীরবতা অবলম্বন অথবা দাবি অস্বীকার পূর্বক সোলাহ বিবাদীর বিবেচনায় কসমের পণ ও বিবাদ নিরসনমূলক চুক্তি। আর বাদীর বিবেচনায় (নিছক) বিনিময় চুক্তিরূপে গণ্য হয়। সুতরাং যখন কোন বাড়ির ব্যাপারে (কিছু অর্থ-কড়ি দিয়ে) আপস করবে, তখন তাতে শুফ'আ প্রাপ্য হবে না। কিন্তু যখন (অন্য মালামালের ব্যাপারে) কোন বাড়ি দিয়ে সোলাহ করবে, তখন তাতে শুফ'আ প্রাপ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

صُلْحٌ -এর পরিচয় ঃ صُلْحٌ শব্দটি مُصَالَحَةٌ থেকে উদগত একটি বিশেষ্য। অর্থ– সন্ধি (Compromise), আপসে মিলে নিজেদের বিরোধ নিষ্পত্তি করা, সমঝোতায় উপনীত হওয়া। শরীয়তের পরিভাষায় সোলাহ হল, বিবাদমান দু' পক্ষের মধ্যে ঝগড়া নিরসনের জন্য উভয়ের অনুমতিক্রমে সংঘটিত সন্ধিচুক্তি। উল্লেখ্য যে, صُلْحٌ -এর বিপরীত শব্দ হল فَسَاد যার অর্থ– বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা, বিপর্যয় ছড়ানো।

ব্যবসা-বাণিজ্যে ও অন্যান্য কারবারে শরিকদের পরস্পরের মধ্যে কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে। কোন বিরোধ দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকলে সামাজিক শান্তি-শৃঙ্খলা যেমন বিনষ্ট হয় তেমনি লাভের সম্ভাবনাও অদৃশ্য হয়। সে কারণে ইসলামী শরীয়ত বিবাদমান ব্যক্তিদের আপসে তা মিট করে নেয়ার সুব্যবস্থা করে দিয়েছে। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ـ

অর্থাৎ "নিজেরা মিলে সোলাহ করে নেয়ার মধ্যে কোন আপত্তি নেই; সোলাহ করে নেয়াই বরং শ্রেয়।" হাদীসে পাকে রাসূল (সাঃ) বলেছেন– মুসলমানদের আপসে মীমাংসা করে নেয়া যুক্তিসঙ্গত, তবে তা যেন কোন হালালকে হারাম বা হারামকে হালাল করার জন্য না হয়।

সোলাহের রোকন ও শর্তাবলী ঃ সোলাহের রোকন হল ইজাব ও কবুল। আর তা শুদ্ধ হওয়ার জন্য শর্ত হল, মুসালাহ-'আনহু মাল হওয়া। অথবা এমন অধিকার হওয়া যা মাল দ্বারা আদান-প্রদান করা যায়, যেমন কিসাসের অধিকার। সুতরাং শুফ'আ দাবির মোকাবেলায় সোলাহ করা যাবে না। কারণ শুফ'আ মাল দ্বারা বিনিময়যোগ্য কোন অধিকার নয়।

ফায়দা ঃ (১) صُلْحٌ - আপস করা, (২) مُدَّعِي - বাদী, (৩) مُدَّعٰى عَلَيْهِ - বিবাদী, (৪) مُصَالَحٌ عَنْهُ - যে দাবির প্রেক্ষিতে আপস করা হয়, (৫) مُصَالَحٌ عَلَيْهِ - যে বিনিময় দিয়ে আপস করা হয়। যেমন– নাসিমের আয়ত্তে থাকা একটি আমগাছ হামিদ নিজের বলে দাবি করল। নাসিম দাবি স্বীকার করে নিয়ে হামিদকে গাছের পরিবর্তে পাঁচশত টাকা নিয়ে রাজি থাকার প্রস্তাব দিল এবং হামিদ উক্ত প্রস্তাব মেনে নিয়ে পাঁচশত টাকা গ্রহণ করল। তাহলে এখানে হামিদ হল বাদী, নাসিম বিবাদী, আম এবং গাছ মুসালাহ-'আনহু, পাঁচশত টাকা মুসালাহ-'আলাইহ্ এবং কৃতচুক্তিটি হল সোলাহ।

كُلُّ ذٰلِكَ جَائِزٌ الخ -এর আলোচনা ঃ এ হল হানাফী আলিমদে মত। ইমাম মালিক ও আহমদ (রঃ) ও এ মত পোষণ করেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর মতানুসারে শুধুমাত্র প্রথম প্রকার অর্থাৎ স্বীকার পূর্বক আপসই যুক্তিসঙ্গত; অবশিষ্ট দু' প্রকার যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, كُلُّ صُلْحٍ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا اَوْ حَرَّمَ حَلَالًا অর্থাৎ মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত প্রতিটি সন্ধিই বৈধ। তবে যে সন্ধিতে হারামকে হালাল করা হয়েছে বা হালালকে হারাম করা হয়েছে (তা বৈধ নয়)।

কাজেই صُلْحٌ مَعَ السُّكُوْتِ এবং صُلْحٌ مَعَ الْاِنْكَارِ -এর ক্ষেত্রে হারামকে হালাল ও হালালকে হারাম করা পাওয়া যায়। যে ব্যাপারে উপরোক্ত হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে। এ জন্যই যদি مُدَّعِي হকের ওপর থাকে তবে তার مُدَّعٰى بِهٖ -কে صُلْحٌ -এর পূর্বে নেয়া হালাল এবং সন্ধির পরে হারাম। আর যদি সে বাতিলের ওপর থাকে তবে ভ্রান্ত দাবির মাধ্যমে সন্ধির পূর্বে মাল নেয়া হারাম।

আমাদের দলিল হল আল্লাহ্র বাণী– وَالصُّلْحُ خَيْرٌ, অর্থাৎ সন্ধি করা উত্তম এবং উল্লিখিত হাদীস, যা সন্ধির বৈধতার সংবাদ বহন করছে। এবং সন্ধির বৈধতা কিতাবুল্লাহ, সুন্নত-ই-রাসূল (সাঃ) ও ইজমা দ্বারা প্রমাণিত। আর اَلصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ এটা মতলক হওয়ার কারণে সন্ধির তিন প্রকারকেই অন্তর্ভুক্ত করেছে। আর হাদীসের শেষাংশের ব্যাখ্যা হল, যে সন্ধি নিশ্চিত হারাম বস্তুকে হালাল হওয়া আবশ্যক করে। যথা– মদের ওপর সন্ধি করা, অথবা নিশ্চিত হালালকে হারাম হওয়ার আবশ্যক করে যথা– স্ত্রীর সাথে এ মর্মে সন্ধি করা যে, তার সতীনের সাথে সে সহবাস করবে না।

فَاِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ প্রথম পক্ষের দাবি স্বীকার করে নিয়ে দ্বিতীয় পক্ষ আপস-রফা করে, তবে তার দু'অবস্থা হতে পারে– (১) হয় প্রথম পক্ষ কোন মাল প্রাপ্তির দাবি করেছিল আর দ্বিতীয় পক্ষ কিছু মাল দিয়ে তার সাথে মীমাংসা করে নিয়েছে। তাহলে এটা এক প্রকার ক্রয়-বিক্রয় বলে গণ্য হবে। যেমন– খালেদের দখলে থাকা এক কাঠা জমি আহমদ নিজের বলে দাবি করল। খালেদ দাবি মেনে নিয়ে আহমদকে দুই হাজার টাকা দিয়ে তার সাথে আপস করে নিল। এখানে খালেদ কেমন যেন আহমদ থেকে দু'হাজার টাকায় এক কাঠা ভূমি খরিদ করে নিল। সুতরাং সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়ের বিধানসমূহ এখানেও প্রযোজ্য হবে এবং সেমতে খালেদের জন্য খেয়ারে-শর্ত ও খেয়ারে-রুইয়াত অর্জিত হবে এবং উক্ত ভূমিতে কেউ শুফ'আ দাবি করতে চাইলে তাও করতে পারবে। (২) অথবা প্রথম পক্ষ কোন মুনাফা প্রাপ্তির দাবি করায় দ্বিতীয়পক্ষ কিছু অর্থ দিয়ে তার সাথে সমঝোতা করে নিয়েছে। তাহলে এটা ইজারা-চুক্তির মধ্যে গণ্য হবে। যেমন– রশিদের আয়ত্তে থাকা একটা দোকান সম্পর্কে তারেক দাবি করল যে, মালিকের মৃত্যুর সময় তারেকের জন্য পাঁচ বৎসরকাল এ দোকানের মুনাফা ভোগ করার অসিয়ত করে গিয়েছিল। আর রশিদ সে দাবি মেনে নিয়ে পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তার সাথে আপস করে নিল। তাহলে এখানে রশিদ কেমন যেন তারেক থেকে পাঁচ বছরের জন্য পাঁচ হাজার টাকায় দোকানটি ভাড়া নিয়ে নিল। সুতরাং ইজারার যাবতীয় বিধি-বিধান এখানে কার্যকরী হবে।

وَالصُّلْحُ عَنِ السُّكُوْتِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ বিবাদী নীরবতা অবলম্বন কিংবা প্রতিবাদ পূর্বক যদি কিছু অর্থকড়ি দিয়ে বাদীপক্ষের সাথে মীমাংসা উপনীত হয়, তবে বাদীপক্ষের বিবেচনায় এটা একটা 'বিনিময়-চুক্তি' বটে। কারণ সে যে অর্থকড়ি নিয়েছে তার ধারণায় আপন প্রাপ্যের বিনিময় নিয়েছে। কিন্তু বিপক্ষের হিসেবে এ অর্থকড়ি হচ্ছে– শপথ মুক্তি ও বিবাদ বন্ধের পণ। নতুবা ঝগড়া-কলহ লেগেই থাকত এবং তাকে অকারণে শপথ করতে হত। সুতরাং বিপক্ষ এ ক্ষেত্রে কোন প্রকার পণ্য-দ্রব্যের দাম দেয়নি; বরং শপথ থেকে বাঁচা ও ঝগড়া খতম করার জন্য কিছু দিয়ে আপস করেছে মাত্র। যেমন– খালেদের আয়ত্তে থাকা একটা বাড়ি আহমদ নিজের বলে দাবি করল। উত্তরে খালেদ কিছু না বলে নীরব থাকল অথবা তার দাবি সত্য নয় বলে প্রত্যুত্তর করল। অতঃপর খালেদ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে আহমদের সাথে সন্ধি করে নিল। সুতরাং এ স্থলে উল্লিখিত বাড়িতে শুফ'আর হকদার শুফ'আ দাবি করতে পারবে না। কারণ খালেদের প্রদানকৃত টাকা জমির বিনিময় স্বরূপ ছিল না। এ টাকা সে দিয়েছিল যাতে বিচারকের সম্মুখে দাঁড়িয়ে তাকে অনর্থক কসম খেতে না হয়। কিন্তু যদি সে আহমদের দাবি মেনে নিয়ে এরূপ সোলাহ করত, তাহলে অবশ্যই আইনত শুফ'আ প্রাপ্য হত।

وَجَبَتْ فِيْهِ الشُّفْعَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ কারণ বাদীপক্ষ আপন ধারণা অনুযায়ী প্রাপ্য মালের পরিবর্তে এ বাড়ি লাভ করেছে। কাজেই সে নিজ-বিবেচনায় কেমন যেন এ জমির ক্রেতা। অতএব তাতে শুফ'আ প্রাপ্য হবে।

وَإِذَا كَانَ الصُّلْحُ عَنْ إِقْرَارٍ فَاسْتُحِقَّ بَعْضُ الْمُصَالَحِ عَنْهُ رَجَعَ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ بِحِصَّةِ ذٰلِكَ مِنَ الْعِوَضِ وَإِذَا وَقَعَ الصُّلْحُ عَنْ سُكُوْتٍ أَوْ إِنْكَارٍ فَاسْتَحَقَّ الْمُتَنَازَعَ فِيْهِ رَجَعَ الْمُدَّعِىْ بِالْخُصُوْمَةِ وَ رَدَّ الْعِوَضَ وَإِنِ اسْتَحَقَّ بَعْضَ ذٰلِكَ رَدَّ حِصَّتَهُ وَ رَجَعَ بِالْخُصُوْمَةِ فِيْهِ وَإِنِ ادَّعٰى حَقًّا فِىْ دَارٍ وَلَمْ يُبَيِّنْهُ فَصُوْلِحَ مِنْ ذٰلِكَ عَلٰى شَىْءٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّ بَعْضُ الدَّارِ لَمْ يَرُدَّ شَيْئًا مِنَ الْعِوَضِ ـ وَالصُّلْحُ جَائِزٌ مِنْ دَعْوَى الْاَمْوَالِ وَالْمَنَافِعِ وَجِنَايَةِ الْعَمْدِ وَالْخَطَاِ وَلَايَجُوْزُ مِنْ دَعْوٰى حَدٍّ وَإِذَا ادَّعٰى رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ نِكَاحًا وَهِىَ تَجْحَدُ فَصَالَحَتْهُ عَلٰى مَالٍ بَذَلَتْهُ حَتّٰى يَتْرُكَ الدَّعْوٰى جَازَ وَكَانَ فِىْ مَعْنَى الْخُلْعِ وَإِذَا ادَّعَتِ امْرَأَةٌ نِكَاحًا عَلٰى رَجُلٍ فَصَالَحَهَا عَلٰى مَالٍ بَذَلَهُ لَهَا لَمْ يَجُزْ وَإِنِ ادَّعٰى رَجُلٌ عَلٰى رَجُلٍ أَنَّهُ عَبْدُهُ فَصَالَحَهُ عَلٰى مَالٍ أَعْطَاهُ جَازَ وَكَانَ فِىْ حَقِّ الْمُدَّعِىْ فِىْ مَعْنَى الْعِتْقِ عَلٰى مَالٍ ـ

সরল অনুবাদ ঃ দাবি স্বীকার পূর্বক আপস করার পর যদি মুসালাহ্-'আনহুর কিছু অংশে অন্য কারো হক প্রমাণিত হয়, তাহলে বিবাদী তার প্রদত্ত বিনিময় (মুসালাহ-'আলাইহ্) বাদী থেকে ঐ হারে ফেরত নিয়ে আসবে। পক্ষান্তরে যদি নীরবতা বা অস্বীকার পূর্বক আপস-রফা করে অতঃপর পুরো মুসালাহ্-'আনহুর হকদার বেরিয়ে আসে, তাহলে বাদী এ হকদারের সাথে জেরা করবে এবং গৃহীত বিনিময় (মুসালাহ-'আলাইহ্) বিবাদীকে ফিরিয়ে দেবে। কিন্তু যদি কিছু অংশের হকদার বেরিয়ে আসে, তাহলে বাদী সে হারে বিনিময় ফিরিয়ে দেবে। এ নতুন দাবিদারের বিরুদ্ধে উক্ত অংশ নিয়ে জেরা করবে। যদি কোন ব্যক্তি একটি বাড়িতে তার হক আছে বলে দাবি করে এবং বিস্তারিত কিছু না বলে, ফলে এ ব্যাপারে কিছু দিয়ে তার আপস করা হয় অতঃপর উক্ত বাড়ির কিছু অংশ অন্য কারো হক প্রমাণিত হয়, তবে (বাদী তার প্রাপ্ত) বিনিময় থেকে বিন্দুমাত্র ফেরত দেবে না। অর্থ-সম্পদ, মুনাফা এবং ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত জিনায়াত (খুন, অঙ্গহানি) সংক্রান্ত দাবির প্রেক্ষিতে আপস-নিষ্পত্তি করা জায়েয।'কিন্তু হদ সম্পর্কিত দাবির প্রেক্ষিতে সোলাহ্ করা জায়েয নেই। কেউ যদি কোন রমণীকে তার স্ত্রী দাবি করে আর সে তা অস্বীকার পূর্বক কিছু অর্থ ব্যয়ে তার সাথে সোলাহ্ করে নেয় যাতে সে তার দাবি ছেড়ে দেয়, তবে তা জায়েয এবং এ সোলাহ্-চুক্তি খোলা হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু কোন স্ত্রীলোক যদি কোন পুরুষকে স্বামী দাবি করে আর সে তা অস্বীকার পূর্বক কিছু অর্থ দিয়ে তার সাথে সোলাহ করে নেয়, তবে তা জায়েয নেই। (এভাবে) যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার গোলাম দাবি করে অতঃপর সে দাবিদারের সাথে মাল দিয়ে আপস করে নেয়, তবে তা জায়েয এবং এ আপস বাদীর ক্ষেত্রে অর্থের বিনিময়ে গোলাম মুক্তকরণ বলে ধর্তব্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَالْمَنَافِعِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন– করিমের ব্যবহারে থাকা একটি গাড়ি সম্পর্কে শফিক দাবি করল যে, করিমের পিতা মৃত্যুর সময় তার জন্য এক বছর এ গাড়ি ব্যবহারের অসিয়ত করে গিয়েছিল। করিম যদি এস্থলে শফিককে কিছু দিয়ে আপস করে নেয়, তবে জায়েয হবে।

جِنَايَةِ الْعَمْدِ الخ -এর আলোচনা ঃ যেমন ধরুন, রফিক কোন লোককে ইচ্ছা পূর্বক বা অনিচ্ছায় খুন করে ফেলল কিংবা আঘাত করে আহত করল। ইচ্ছাকৃতভাবে খুন বা আহত করা হলে নিহতের ওয়ারিশগণ বা স্বয়ং আক্রান্ত ব্যক্তি ঘাতক থেকে কিসাস গ্রহণ করতে পারে। আর অনিচ্ছায় হলে আর্থিক জরিমানা দাবি করতে পারে। এ অবস্থায় রফিক যদি তাদের সাথে কিছু দিয়ে আপস-নিষ্পত্তি করে নেয়, তবে তা জায়েয।

مِنْ دَعْوٰى حَدٍّ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ চুরি, ডাকাতি ও ব্যভিচার ইত্যাদি ফৌজদারি অপরাধে দণ্ডিত এমনকি অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সাথে এ সকল বিষয়ে সোলাহ করা যাবে না। কারণ এ শ্রেণীর অপরাধের শাস্তি বা হদ হচ্ছে

সরাসরি আল্লাহ্ পাকের হক। কোন ব্যক্তি অন্যের হক যেমন মাফ করতে পারে না, তেমনি বিনিময় গ্রহণ পূর্বক তা ধামা-চাপাও দিতে পারে না। সে মতে কোন ব্যক্তি যিনাকারী, মদ্যপ অথবা কোন চোরকে গ্রেফতার পূর্বক আদালতে উপস্থিত করতে চাইলে অপরাধী যদি কিছু অর্থকড়ি দিয়ে তার সাথে আপস করে নেয়, তাহলে এ আপস-রফা বাতিল গণ্য হবে এবং গ্রেফতারকারীর জন্য উল্লিখিত অর্থ ভোগ করা হারাম হবে। এখানে আসামী বরং প্রদানকৃত বিনিময় ফিরিয়ে নিতে পারবে।

فَصَالَحَتْهُ عَلَى الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ দাবিদার যাতে তার দাবি প্রত্যাহার করে নেয় সে জন্য স্ত্রী লোকটি যদি কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে তার সাথে আপস করে নেয়, তবে তা জায়েয হবে এবং এটা খোলা হিসেবে পরিগণিত হবে। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি যদি বাস্তবিকই নিজ দাবিতে মিথ্যাবাদী হয়, তাহলে তার জন্য এ টাকা আদৌ হালাল হবে না। দুনিয়ার বিচারালয় থেকে পরিত্রাণ পেলেও আল্লাহ্ পাকের গ্রেফতারী সে এড়াতে পারবে না। পক্ষান্তরে এরূপ দাবি কোন স্ত্রীলোক উত্থাপন করলে বিবাদী কোন কিছু দিয়ে আপস করতে পারবে না। কারণ কোন স্বামীর জন্য বাড়তি অর্থ ব্যয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক অবসানের বিধান নেই। কেননা সে তো তালাক প্রদানের মাধ্যমে সহজেই এ সঙ্কট নিরসন করতে পারে।

وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌّ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى الْمُعَاوَضَةِ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اِسْتَوْفَى بَعْضَ حَقِّهِ وَاَسْقَطَ بَاقِيَهُ كَمَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ جِيَادٍ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ زُيُوفٍ جَازَ وَصَارَ كَأَنَّهُ اَبْرَأَهُ عَنْ بَعْضِ حَقِّهِ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى أَلْفٍ مُؤَجَّلَةٍ جَازَ وَكَأَنَّهُ اَجَّلَ نَفْسَ الْحَقِّ وَلَوْ صَالَحَهُ عَلَى دَنَانِيْرَ اِلَى شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ حَالَّةً لَمْ يَجُزْ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفُ دِرْهَمٍ سُوْدٌ فَصَالَحَهُ عَلَى خَمْسِمِائَةٍ بِيْضٍ لَمْ يَجُزْ .

সরল অনুবাদ ঃ যদি এমন কিছুর বিনিময়ে সোলাহ করা হয় যা (বিবাদীর নিকট) ঋণের কারবার সূত্রে (বাদীর) প্রাপ্য ছিল তাহলে এ সোলাহকে 'বিনিময় চুক্তি' রূপে গণ্য করা যাবে না; বরং বাদী তার পাওনার কিছু অংশ আদায় করে নিয়েছে এবং বাকি অংশ ছেড়ে দিয়েছে বুঝতে হবে। যেমন- (ধরুন) কোন ব্যক্তির নিকট কারো এক হাজার নিখুঁত মানের ধাতব মুদ্রা পাওনা ছিল, এখন সে পাঁচশত নিম্ন মানের মুদ্রা দিয়ে পাওনাদারের সাথে আপস করে নিল, তবে তা জায়েয। এ স্থলে পাওনাদার কেমন যেন তার পাওনার কিছু অংশ দেনাদারকে মাফ করে দিয়েছে। আর যদি ঋণগ্রস্ত তার সাথে মেয়াদী এক হাজার টাকার ওপর সোলাহ করে নেয় তাতেও জায়েয হবে। (এ ক্ষেত্রে) প্রাপক কেমন যেন তার 'নগদ' অধিকার 'বাকি' করে দিয়েছে। কিন্তু যদি এই মর্মে সন্ধি করে যে; দেনাদার মাসখানেক পর কিছু দিনার দিয়ে দেবে, তাহলে জায়েয হবে না। (এভাবে) উত্তমর্ণের প্রাপ্য যদি মেয়াদী এক হাজার টাকা হয়, আর অধমর্ণ তাকে নগদ পাঁচশত টাকা দিয়ে আপস রফা করে নেয় তা জায়েয নেই। (তদ্রূপ) যদি প্রাপ্য হয় এক হাজার কালো দিরহাম আর আপস করে নেয় পাঁচশত সাদা দিরহাম দিয়ে, তবে তাও জায়েয নেই।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ বাদী যদি বিবাদীর নিকট এমন কিছু দাবি করে যা সে ঋণে কারবার সূত্রে তার নিকট প্রাপ্য। হয়তো তাকে ঋণ দিয়ে ছিল বা তার নিকট কোন কিছু বাকি বিক্রি করে ছিল। এ স্থলে দ্বিতীয় পক্ষ যদি কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে প্রথম পক্ষের সাথে সোলাহ করে নেয়, তবে এ সোলাহকে 'বিনিময়-চুক্তি' আখ্যা দেয়া যাবে না। কারণ এখানে বাদী আপস-রফায় যা কিছু পেয়েছে তা তার হুবহু প্রাপ্যেরই সামান্য অংশ। যেমন ধরুন, আহমদের নিকট ইমরানের পাঁচশত টাকা পাওনা ছিল। ইমরান আপন পাওনা দাবি করলে আহমদ তিন শত টাকা দিয়ে তার সাথে মীমাংসা করে নিল যেন সে অবশিষ্ট টাকা আর দাবি না করে। তাহলে একে বিনিময়-চুক্তি বলা যাবে না। যদি বলা হয় তাহলে এর অর্থ দাঁড়াবে কেমন যেন আহমদ তিনশত টাকায় পাঁচশত টাকা ক্রয় করল।

عَلَى دَنَانِيْرَ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ প্রাপ্য ছিল কিছু দিরহাম এবং তা নগদ, এখন যদি তার পরিবর্তে মেয়াদান্তে সমপরিমাণ দিনার গ্রহণের সিদ্ধান্তে আপস করা হয়, তবে তা যুক্তিসঙ্গত হবে না। কারণ এতে রিবা-নাসীআ সৃষ্টি হয়। কেননা এখানে 'ঋণে-কারবার' সূত্রে প্রাপকের পাওনা ছিল দিরহাম অথচ সে এ নগদ দিরহামের পরিবর্তে মাসখানেক পর কিছু দিনার নিতে রাজি হয়েছে। সে কারণে এটা আর 'মুদায়ানা' থাকছে না; বরং পরিষ্কার আকদে-মুযাবানা'য় পরিণত হয়েছে।

وَمَنْ وَكَّلَ رَجُلًا بِالصُّلْحِ عَنْهُ فَصَالَحَهُ لَمْ يَلْزَمِ الْوَكِيْلَ مَا صَالَحَهُ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ يَّضْمَنَهُ وَالْمَالُ لَازِمٌ لِلْمُوَكِّلِ فَاِنْ صَالَحَ عَنْهُ عَلٰى شَيْءٍ بِغَيْرِ اَمْرِهٖ فَهُوَ عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ اِنْ صَالَحَ بِمَالٍ وَضَمِنَهُ تَمَّ الصُّلْحُ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفِىْ هٰذِهٖ اَوْ عَلٰى عَبْدِىْ هٰذَا تَمَّ الصُّلْحُ وَلَزِمَهُ تَسْلِيْمُهَا اِلَيْهِ وَكَذٰلِكَ لَوْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفٍ وَسَلَّمَهَا اِلَيْهِ وَاِنْ قَالَ صَالَحْتُكَ عَلٰى اَلْفٍ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيْهِ فَالْعَقْدُ مَوْقُوْفٌ فَاِنْ اَجَازَهُ الْمُدَّعٰى عَلَيْهِ جَازَ وَلَزِمَهُ الْاَلْفُ وَاِنْ لَمْ يُجِزْهُ بَطَلَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি কাউকে তার পক্ষ থেকে সোলাহ করার জন্য উকিল নিযুক্ত করে অতঃপর সে কোন কিছুর ওপর আপস করে, তাহলে মুসালাহ-'আলাইহ্ (আপস-বিনিময়) উকিলের ঘাড়ে বর্তাবে না; বর্তাবে মুয়াক্কেলের ঘাড়ে। তবে উকিল উক্ত 'বিনিময়'-এর জন্য নিজে জামিন হলে (সেটা ভিন্ন কথা)। যদি কেউ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে বিবাদীর পক্ষ থেকে আপস-রফা করে, তবে তা চারভাবে হতে পারে- (১) হয় নির্দিষ্ট পরিমাণ মালের ওপর আপস করে নিজেই উক্ত মালের দায়িত্ব নিয়ে নিলে। তাহলে সোলাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। (২) অথবা (নিজের কোন সম্পদ দেখিয়ে) বলল, আমার এ এক হাজার টাকা বা এ গোলামের ওপর সন্ধি করলাম। এতেও সোলাহ্ সম্পন্ন হবে এবং উক্ত টাকা বা গোলাম বাদীর হাতে সোপর্দ করা তার আবশ্যক হবে। (৩) অনুরূপভাবে যদি (ইশারা না করে) বলে, "এক হাজার টাকার ওপর তোমার সাথে সোলাহ্ করলাম" আর বাদীকে টাকা বুঝিয়ে দেয় তাতেও সোলাহ্ হয়ে যাবে। (৪) কিন্তু যদি বলে, "এক হাজার টাকায় তোমার সাথে সোলাহ্ করলাম" আর টাকা হস্তান্তর না করে, তবে এ আপোস-চুক্তি (বিবাদীর মতামতের ওপর) স্থগিত থাকবে। যদি সে সম্মতি দেয়, তবে কার্যকরী হবে এবং টাকা তার (বিবাদী) ঘাড়ে বর্তাবে। আর যদি সম্মতি না দেয়, তবে বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَمَنْ وَكَّلَ الخ-এর আলোচনা ঃ যেমন- কোন কিসাসের আসামী নিহতের ওলীর সাথে আপস করার জন্য কাউকে উকিল বানাল। এখন উকিল যদি বিশ হাজার টাকার ওপর সোলাহ করে আসে, তবে এ টাকা মুয়াক্কেলরই দিতে হবে। অবশ্য উকিল ইচ্ছা করলে উল্লিখিত টাকার জিম্মা নিজেও গ্রহণ করতে পারে। তখন জামানতের নিয়ম অনুযায়ী এ টাকা উকিলের কাছেও দাবি করা যাবে।

بِغَيْرِ اَمْرِهٖ الخ-এর আলোচনা ঃ এ ইবারতে গ্রন্থকার বিবাদীর পক্ষ হয়ে তৃতীয় কেউ নিজ উদ্যোগে আপস করলে তার ধরন কি হবে বর্ণনা করেছেন। এরূপ আপসের মোট চার অবস্থা হতে পারে- (১) হয় উদ্যোগী নির্দিষ্ট বিনিময়ের ওপর আপস করে 'আপস-বিনিময়ের' (بدل صلح) দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করবে। (২) না হয় নিজের আওতাধীন কোন মাল দেখিয়ে তার বিনিময়ে সোলাহ করবে। (৩) বা সাধারণ মালের ওপর আপস করে তা বাদীর আয়ত্তে দিয়ে দেবে। (৪) অথবা সাধারণ মাল (অর্থাৎ যে মাল ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়নি) এর ওপর আপস করবে, কিন্তু তাতে বাদীর দখল দেবে না। এ চার অবস্থার মধ্যে প্রথমোক্ত তিন অবস্থায় সোলাহ কার্যকরী হবে, আর চতুর্থ অবস্থায় তা বিবাদীর অনুমোদনের ওপর মুলতবি থাকবে।

فَالْعَقْدُ مَوْقُوْفٌ-এর আলোচনা ঃ এটা কতিপয় ফিকাহবিদগণের নিকট। আবার কতিপয় ফিকাহবিদগণ বলেছেন যে, এক্ষেত্রে عقد টা সন্ধিকারীর ওপর বর্তাবে এবং এ কথার ওপর موقوف হবে যে, صالح فلان على الف درهم من تبرع এবং موقوف হওয়ার কারণ হল عقد - عاقد-এর সাথে تبرع করেছেন এবং মালের সাথে دعواك على فلان করেননি। কেননা তিনি মালকে স্বীয় সত্তার দিকে اضافت করেননি। এ জন্য তার ওপর আবশ্যক হয়নি। কাজেই যদি مطلوب বৈধ রাখে তাহলে তার ওপর মাল আবশ্যক হবে। আর যদি বৈধ না রাখে তবে সন্ধি বাতিল হয়ে যাবে।

وَإِذَا كَانَ الدَّيْنُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهٖ عَلٰى ثَوْبٍ فَشَرِيْكُهٗ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ اتَّبَعَ الَّذِىْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ بِنِصْفِهٖ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ نِصْفَ الثَّوْبِ إِلَّا أَنْ يَّضْمَنَ لَهٗ شَرِيْكُهٗ رُبْعَ الدَّيْنِ وَلَوِ اسْتَوْفٰى نِصْفَ نَصِيْبِهٖ مِنَ الدَّيْنِ كَانَ لِشَرِيْكِهٖ أَنْ يُّشَارِكَهٗ فِيْمَا قَبَضَ ثُمَّ يَرْجِعَانِ عَلَى الْغَرِيْمِ بِالْبَاقِىْ وَلَوِ اشْتَرٰى أَحَدُهُمَا بِنَصِيْبِهٖ مِنَ الدَّيْنِ سِلْعَةً كَانَ لِشَرِيْكِهٖ أَنْ يُّضَمِّنَهٗ رُبْعَ الدَّيْنِ وَإِذَا كَانَ السَّلَمُ بَيْنَ الشَّرِيْكَيْنِ فَصَالَحَ أَحَدُهُمَا مِنْ نَصِيْبِهٖ عَلٰى رَأْسِ الْمَالِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ أَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ الصُّلْحُ ـ

সরল অনুবাদ ঃ যদি দুই ব্যক্তি সম্মিলিতভাবে কারো নিকট ঋণ প্রাপ্য থাকে আর তাদের একজন স্বীয় অংশের পরিবর্তে একটি কাপড় নিয়ে দায়িকের সাথে আপস করে নেয়, তাহলে দ্বিতীয় জনের এখতিয়ার থাকবে–ইচ্ছা করলে সে দেনাদার থেকে নিজের অর্ধেক অংশ নিয়ে আসবে অথবা ইচ্ছা করলে কাপড়ের অর্ধেক নিয়ে নেবে। কিন্তু যদি আপসকারী তার শরিককে ঋণের চার ভাগের এক ভাগ দিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করে (তাহলে সে কাপড়ে ভাগ দাবি করতে পারবে না)। আর যদি উক্ত শরিক নিজ অংশ যা মোট ঋণের অর্ধেক উসুল করে নিয়ে আসে, তবে দ্বিতীয়জন তাতে ভাগ বসাতে পারবে। পরে অবশিষ্ট ঋণ উভয়ে মিলে দেনাদার থেকে আদায় করে নেবে। আর যদি তাদের একজন আপন অংশ ঋণের বিনিময়ে (দায়িক থেকে) কিছু দ্রব্য ক্রয় করে নেয়, তবে অপরজন তাকে একচতুর্থাংশ ঋণের জন্য দায়ী বানাতে পারবে। (অর্থাৎ শরিক থেকে সে পরিমাণ আদায় করে নিতে পারবে।) যদি দু'ব্যক্তি মিলে কারো সাথে সলম কারবার করে, অতঃপর তাদের একজন মুসলাম-ইলাইহ্-এর সাথে নিজ ভাগের মুসলাম-ফীহ-এর পরিবর্তে রা'সুল-মালের অংশ নিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সমঝোতা করে নেয়, তাহলে ইমাম তরফাইন (রঃ)-এর মতে, তা সঙ্গত হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, সমঝোতা সঙ্গত হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

دَيْن مُشْتَرِك -এর সংজ্ঞা ঃ যে ঋণটা একই কারণে ওয়াজিব হয়, তাকে دَيْن مُشْتَرِك বলা হয়। যথা– এমন مَبِيْع -এর মূল্য যার বেচাকেনা একই صَفْقَة তে হয়েছে। অথবা এমন ঋণ যা দু'ব্যক্তির موروث হয়েছে।

فَشَرِيْكُهٗ بِالْخِيَارِ الخ -এর আলোচনা ঃ এর মূলনীতি হল دَيْن مُشْتَرِك হতে যখন কোন একজন কিছু জিনিস হস্তগত করে, তখন তার সাক্ষীর জন্য হস্তগত বস্তুতে শরিক হওয়া জায়েয হবে। কেননা তা হস্তগত করার কারণে অতিরিক্ত হয়ে গেছে। কেননা ঋণের مَالِيَت হস্তগত করা পরিণামের হিসেবে হয়ে থাকে এবং এ অতিরিক্ততা মূল হকের দিকে ফিরবে। যথা– مُشْتَرِك বাঁদির মধ্যে সন্তান এবং مُشْتَرِك গাছের ফল। কাজেই তার জন্য مُشَارَكَت-এর অধিকার থাকবে। তবে مُشَارَكَت টা قَبْضَه করার পূর্বে قَابِض -এর মালিকানায় অটুট থাকবে। কেননা عَيْن -এর হাকীকত غَيْر دَيْن এবং সে স্বীয় হকের বদলকে আয়ত্ত করেছে। কাজেই সে তার মালিক হবে এবং এর মধ্যে تَصَرُّف করার সম্ভাবনা প্রযোজ্য হবে।

رُبْعَ الدَّيْنِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ এক চতুর্থাংশ ঋণের জামিন হল। যেমন ধরুন, নাহিদ ও নাভীদ মিলে তাদের শরিকি কোন দ্রব্য করিমের নিকট চারশ' টাকায় বাকি বিক্রি করল। তারপর নাহিদ এক পর্যায়ে বকরের সাথে আপস করে ঋণের মধ্যে তার দু'শ টাকার পরিবর্তে দু'টি লুঙ্গি নিয়ে এল। এমতাবস্থায় নাভীদ ইচ্ছা করলে তার প্রাপ্য দু'শ টাকা বকর থেকে নিয়ে আসতে পারে। অথবা ইচ্ছা করলে নাহিদ থেকে দু'টি লুঙ্গির একটি দাবি করতে পারে। কিন্তু নাহিদ যদি আপস করার সময় বলে আমি একশ' টাকা নাভীদকে দিয়ে দেব, তাহলে সে আর লুঙ্গি দাবি করতে পারবে না। কারণ নাভীদের অধিকার মূলত টাকার মধ্যে লুঙ্গির মধ্যে নয়।

وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ بَيْنَ وَرَثَةٍ فَأَخْرَجُوا أَحَدَهُمْ مِنْهَا بِمَالٍ أَعْطُوهُ إِيَّاهُ وَالتَّرِكَةُ عِقَارٌ أَوْ عُرُوضٌ جَازَ قَلِيلًا كَانَ مَا أَعْطُوهُ أَوْ كَثِيرًا فَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ فِضَّةً فَأَعْطُوهُ ذَهَبًا أَوْ ذَهَبًا فَأَعْطُوهُ فِضَّةً فَهُوَ كَذٰلِكَ وَإِنْ كَانَتِ التَّرِكَةُ ذَهَبًا وَفِضَّةً وَغَيْرَ ذٰلِكَ فَصَالَحُوهُ عَلٰى ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ مَا أَعْطُوهُ أَكْثَرَ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ ذٰلِكَ الْجِنْسِ حَتّٰى يَكُونَ نَصِيبُهُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِحَقِّهِ مِنْ بَقِيَّةِ الْمِيرَاثِ وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ دَيْنًا عَلَى النَّاسِ فَأَدْخَلُوهُ فِي الصُّلْحِ عَلٰى أَنْ يُخْرِجُوا الْمُصَالِحَ عَنْهُ وَيَكُونَ الدَّيْنُ لَهُمْ فَالصُّلْحُ بَاطِلٌ فَإِنْ شَرَطُوا أَنْ يَبْرَئَ الْغُرَمَاءُ مِنْهُ وَلَا يَرْجِعَ عَلَيْهِمْ بِنَصِيبِ الْمُصَالِحِ عَنْهُ فَالصُّلْحُ جَائِزٌ ـ

<u>সরল অনুবাদ ঃ</u> যদি তারাকা কতিপয় ওয়ারিশের হয় আর তারা আপসে তাদের একজনকে কিছু অর্থ দিয়ে তারাকা থেকে পৃথক করে দেয় এবং ঐ তারাকা হয় স্থাবর সম্পত্তি বা আসবাবপত্র, তবে তাদের প্রদত্ত অর্থ কমবেশি যাই হোক তা জায়েয আছে। এভাবে তারাকা যদি রূপা হয় আর তারা স্বর্ণ দিয়ে (তার সাথে আপস করে) অথবা তারাকা হয় স্বর্ণ আর আপস করে রূপা দিয়ে, তবে (প্রদত্ত বিনিময় কমবেশি যাই হোক) তা জায়েয আছে। কিন্তু তারাকা যদি স্বর্ণ-রূপাসহ অন্যান্য মালামালও হয় আর তারা শুধু স্বর্ণ কিংবা রূপা দিয়ে তার সাথে সোলাহ করে, তখন তাদের প্রদত্ত স্বর্ণ বা রূপা অবশ্যই তারাকা থেকে তার প্রাপ্য স্বর্ণ বা রূপার অংশের চেয়ে বেশি হতে হবে। যাতে তার (স্বর্ণ বা রূপার) অংশ তারই সমান হয়ে অতিরিক্ত অংশ ঐ প্রাপ্যের বিনিময় হয়ে যায় যা তারাকার অন্যান্য মালামালে তার রয়েছে। যদি তারাকায় এমন কিছু ঋণ থাকে যা মানুষের কাছে পড়ে আছে, আর ওয়ারিশগণ সেই ঋণকে হিসেবে ধরে নিয়ে এরূপে সন্ধি করে যে, তারা আপসকারী ওয়ারিশকে ঋণ থেকে বাদ রাখবে এবং পুরো ঋণের মালিক তারা হবে, তাহলে সোলাহ বাতিল গণ্য হবে। কিন্তু যদি তারা এভাবে শর্তারোপ করে যে, আপসপ্রার্থী ওয়ারিশ (পড়ে থাকা ঋণের মধ্যে তার যে অংশ রয়েছে সে) তা ঋণগ্রস্তদের মওকুফ করে দেবে এবং নিজের এ অংশ ওয়ারিশদের থেকেও নেবে না, তবে সোলাহ শুদ্ধ হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا كَانَتِ التَّرِكَةُ بَيْنَ الخ -এর আলোচনা ঃ কোন ব্যক্তি কিছু ধন-সম্পত্তি রেখে মারা গেল। এখন তার কোন ওয়ারিশের সাথে অবশিষ্ট ওয়ারিশগণ মিলে যদি কিছু অর্থ-সম্পদ দিয়ে এ মর্মে আপস করে নেয় যে, সে এ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে– মিরাস থেকে তার নির্দিষ্ট অংশ দাবি করবে না, তবে তা দুরস্ত আছে। ফারায়েযের ভাষায় একে 'তাখারুজ' বলে। এ ধরনের মীমাংসায় আপসকারী ওয়ারিশ বিনিময়স্বরূপ যা পেল, তা কমবেশি যাই হোক অসুবিধা নেই। কিন্তু একটি মাসআলায় ব্যতিক্রম। তা হল, তারাকার মধ্যে অন্যান্য মালামালের পাশাপাশি যদি স্বর্ণ-রূপাও থাকে আর আপসকারীকে 'আপস-বিনিময়' স্বরূপ স্বর্ণ বা রূপা দেয়া হয়, তখন এ প্রদানকৃত স্বর্ণ তারাকার মধ্যে তার পাওনা স্বর্ণ-অংশের চেয়ে অবশ্যই বেশি হতে হবে। যেমন– মিরাসের বন্টননীতি অনুযায়ী সে যদি কিছু জমি ও চার ভরি স্বর্ণের অধিকারী হয়, তাহলে 'আপস-বিনিময়' স্বরূপ তাকে আনুমানিক পাঁচ ভরি স্বর্ণ দিতে হবে। তাতে চারের সাথে পাঁচ কাটাকাটি হওয়ার পর যে এক ভরি বাকি থাকবে তা ঐ জমি-জিরাতের বিনিময় সাব্যস্ত হবে। নতুবা এ সোলাহ্ সুদী কারবারে পরিণত হবে।

وَإِنْ كَانَ فِي التَّرِكَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ মৃত্যু ব্যক্তির রেখে যাওয়া কিছু সম্পত্তি যদি বিভিন্ন জনের কাছে ঋণ আকারে পড়ে থাকে, আর ওয়ারিশগণ আপসকারীকে নগদ কিছু দিয়ে এ মর্মে চুক্তি করে যে, ঋণের মধ্যে তার যে অংশ রয়েছে ঋণ আদায়ের পর তা সে প্রাপ্ত হবে না; বরং অবশিষ্ট ওয়ারিশগণ তা নিয়ে নেবে, তবে তা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এতে অন্যান্য ওয়ারিশদেরকে ঋণের উক্ত অংশের মালিক বানিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ ঋণী ছাড়া অন্য কাউকে পড়ে থাকা ঋণের মালিক বানানো বৈধ নয়।

فَلَابُدَّ أَنْ يَكُونَ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি তারাকার মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য ও অন্যান্য জিনিস উভয়ই হয় এবং ওয়ারিশকে শুধু স্বর্ণ বা রৌপ্য দিয়ে বের করে দেয়। তখন এ تَخَارُج বৈধ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওয়ারিশকে প্রদত্ত স্বর্ণ রৌপ্য ঐ পরিমাণ হতে বেশি না হয়, যা ওয়ারিশ সে جِنْس -এর অংশ হতে পাবে। যথা– উল্লিখিত ওয়ারিশ দশ টাকা ও আরো অন্যান্য কিছু পাচ্ছিল। তখন تَخَارُج বৈধ হওয়ার জন্য প্রয়োজন হল দশ টাকার অতিরিক্তে সন্ধি করা। যাতে করে দশ টাকা দশ টাকার বিনিময় পাবে, আর অতিরিক্ত টাকা اَسْبَاب -এর বিনিময় হবে। অন্যথা সুদ আবশ্যক হবে, যা হারাম।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلصُّلْحُ -এর সংজ্ঞা দাও ও তার প্রকারভেদ বিস্তারিত আলোচনা কর।
২। اَلصُّلْحُ -এর রোকন, শর্তাবলী ও পরিভাষাসমূহ বুঝিয়ে লিখ।
৩। ঋণের ব্যাপারে আপস (صُلْح) করার বিধান লিখ।
৪। اَلصُّلْحُ عَلٰى ثَلَاثَةِ اَضْرُبٍ صُلْحٌ مَعَ اِقْرَارٍ وَصُلْحٌ مَعَ سُكُوْتٍ وَصُلْحٌ مَعَ اِنْكَارٍ وَكُلُّ ذَالِكَ جَائِزٌ এ ইবারতের ব্যাখ্যা কর।
৫। কারো পক্ষের উকিল হয়ে বা স্বেচ্ছায় صُلْح করার বিধান বিস্তারিত আলোচনা কর।
৬। ইসলামী ঋণের ব্যাপারে صُلْح -এর বিধান কি? বিস্তারিত লিখ।
৭। মীরাসের দাবি ছাড়ানোর ক্ষেত্রে صُلْح -এর নিয়ম কি?
৮। যে সকল ব্যাপারে صُلْح করা যায় না তা বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা কর।
৯। স্বীকার পূর্বক ও অস্বীকার পূর্বক صُلْح -এর পজিশন বর্ণনা কর।
১০। বাদী ও বিবাদীর অধিকারের সীমা সম্পর্কে আলোচনা কর।

كِتَابُ الْهِبَةِ

اَلْهِبَةُ تَصِحُّ بِالْاِيْجَابِ وَ الْقَبُوْلِ وَ تَتِمُّ بِالْقَبْضِ فَاِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوْبُ لَهُ فِى الْمَجْلِسِ بِغَيْرِ اِذْنِ الْوَاهِبِ جَازَ وَاِنْ قَبَضَ بَعْدَ الْاِفْتِرَاقِ لَمْ تَصِحَّ اِلَّا اَنْ يَّاْذَنَ لَهُ الْوَاهِبُ فِى الْقَبْضِ وَ تَنْعَقِدُ الْهِبَةُ بِقَوْلِهِ وَهَبْتُ وَنَحَلْتُ وَاَعْطَيْتُ وَاَطْعَمْتُكَ هٰذَا الطَّعَامَ وَجَعَلْتُ هٰذَا الثَّوْبَ لَكَ وَاَعْمَرْتُكَ هٰذَا الشَّئَ وَحَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ اِذَا نَوٰى بِالْحَمْلَانِ الْهِبَةَ وَلَاتَجُوْزُ الْهِبَةُ فِيْمَا يُقَسَّمُ اِلَّامَحُوْزَةً مَقْسُوْمَةً وَهِبَةُ الْمَشَاعِ فِيْمَا لَايُقَسَّمُ جَائِزَةٌ وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَاِنْ قَسَّمَهُ وَسَلَّمَهُ جَازَ وَلَوْ وَهَبَ دَقِيْقًا فِىْ حِنْطَةٍ اَوْ دُهْنًا فِىْ سِمْسِمٍ فَالْهِبَةُ فَاسِدَةٌ فَاِنْ طَحَنَ وَسَلَّمَ لَمْ يَجُزْ وَاِذَا كَانَتِ الْعَيْنُ فِىْ يَدِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ مَلَكَهَا بِالْهِبَةِ وَاِنْ لَمْ يُجَدِّدْ فِيْهَا قَبْضًا وَاِذَا وَهَبَ الْاَبُ لِاِبْنِهِ الصَّغِيْرِ هِبَةً مَلَكَهَا الْاِبْنُ بِالْعَقْدِ وَاِنْ وَهَبَ لَهُ اَجْنَبِىٌّ هِبَةً تَمَّتْ بِقَبْضِ الْاَبِ وَاِذَا وَهَبَ لِلْيَتِيْمِ هِبَةً فَقَبَضَهَالَهُ وَلِيُّهُ جَازَ-

হিবার পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ ঈজাব এবং কবুলের দ্বারা হিবা বিশুদ্ধ হয় এবং কবজার (দখল) দ্বারা পূর্ণতা লাভ করে। যদি হিবাকৃত বস্তু হিবার মজলিসেই হিবাকারীর বিনা অনুমতিতে হস্তগত করে নেয়, তাহলে হিবা জায়েয হবে। আর হিবার মজলিস হতে পৃথক হবার পর কবজা করলে বিশুদ্ধ হবে না, তবে হিবাকারী তার জন্য অনুমতি দিলে জায়েয হবে। আর নিম্ন লিখিত কথাগুলো দ্বারা হিবা সম্পাদিত হবে। (যথা-) وَهَبْتُ আমি হিবা করলাম, نَحَلْتُ আমি দান করেছি, اَعْطَيْتُ আমি বখশিশ করেছি, اَطْعَمْتُكَ هٰذَا الطَّعَامَ আমি তোমাকে এ খাদ্য খাইয়েছি, جَعَلْتُ هٰذَا الثَّوْبَ لَكَ তোমার জন্য এ কাপড়টি দিলাম, اَعْمَرْتُكَ هٰذَا الشَّئَ সারা জীবনের জন্য তোমাকে এ বস্তুটি দিয়ে দিলাম এবং এ কথা বলা যে, حَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ এ জন্তুর ওপর তোমাকে আরোহণ করালাম, যখন উহার দ্বারা হিবার নিয়ত করবে। আর যেসব বস্তু বন্টনযোগ্য তা অন্যের বন্টন হতে পৃথক করা ব্যতীত হিবা জায়েয হবে না। কিছু সংখ্যক অংশীদারের এমন বস্তু যা বন্টন করা যায় না তা হিবা করা জায়েয। কেউ যদি-যুগ্ম বস্তুর অংশ বিশেষ হিবা করে, তবে তা ফাসিদ হয়ে যাবে, আর যদি উহাকে বন্টন করে সোপর্দ করে, তাহলে জায়েয হবে। যদি গমের ভিতরে রেখে আটা এবং সরিষার ভিতর রেখে তেল হিবা করে, তখন হিবা ফাসিদ হবে। পরে যদি গম ভেঙ্গে আটা করে তাকে সোর্পদ করে তবুও জায়েয হবে না। যদি দান করা বস্তু প্রথম হতে ঐ ব্যক্তির অধীনে থাকে যাকে দান করা হয়েছে, তখন হিবা দ্বারা সে উহার মালিক হয়ে যাবে, যদিও উহাকে নতুনভাবে কবজা না করে। যদি পিতা তার নাবালেগ ছেলেকে কোন কিছু হিবা করে, তাহলে হিবার বন্ধনের দ্বারা সে উহার মালিক হয়ে যাবে। আর যদি নাবালেগকে আজনবী তথা অনাত্মীয় কেউ কিছু দান করে, তাহলে পিতার কবজার দ্বারা হিবা সম্পন্ন হবে। আর এতিমকে যদি কেউ কিছু হিবা করে, তাহলে তার ওলি তা কবজা করলেই জায়েয হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ভূমিকা ঃ সদকার ন্যায় হিবা বা উপঢৌকনও দরিদ্র ও অভাবী লোকদের সাহায্য করার এক উত্তম পদ্ধতি। এবং উপঢৌকনের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ বৃদ্ধি পায়, ভালোবাসা জন্মে। এদিকে ইঙ্গিত করেই তো মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— تَهَادُوْا تَحَابُّوْا অর্থাৎ "তোমরা একে অপরকে উপঢৌকন দাও, তাতে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।" পবিত্র কুরআন ও হাদীসে রাসূল (সাঃ) বিশেষভাবে মানুষকে এর দিকে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাইতো মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন— হাদিয়া যতই তুচ্ছ হোকনা কেন তা গ্রহণ করা উচিত। তদ্রূপ সাধারণ বস্তু হাদিয়া প্রেরণ করার ক্ষেত্রেও কোনরূপ সংকোচ করা উচিত নয়।

উপঢৌকন প্রদানে নৈতিক পরামর্শ ঃ

যখন কেউ কাউকে কোন কিছু উপঢৌকন পাঠায় তখন হাদিয়া দাতার এমন কোন ভাব দেখানো উচিত নয় যার দ্বারা অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হচ্ছে বলে মনে করা হয়। এ ধরনের আচরণের প্রতি কুরআন ও হাদীসে তিরস্কার করা হয়েছে। সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে— উপকার প্রচারকারীর উপমা হল, ওপরে মাটি জমা প্রস্তর খণ্ডের মতো, যা সামান্য বাতাসের ধাক্কায় ধ্বসে পড়ে। এ ধরনের লোকেরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না। এবং হাদিয়া গ্রহীতার জন্য সমীচীন হল— সর্বদা শুধুমাত্র হাদিয়া গ্রহণই না করা; বরং সময় সুযোগে হাদিয়া দাতাকেও নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুপাতে কিছু প্রদান করা। এটাও যদি সম্ভব না হয় তবে অন্তত মুখে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা। মহানবী (সাঃ) বলেছেন— যাকে কিছু হাদিয়া দেয়া হয় তার কর্তব্য তার পরিবর্তে কিছু প্রদান করা। সে সঙ্গতি না থাকলে তার উচিত হাদিয়া দাতার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। যে তাও করেনি সে অকৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করল এবং নিয়ামতের অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল। (আবূ দাউদ, তিরমিযী)

হিবা, হাদিয়া ও সদকার মধ্যে পার্থক্য ঃ

মানুষ কারো উৎসাহ উদ্দীপনা বৃদ্ধি বা ভালোবাসার তাগিদে তার জন্য যে জিনিস পাঠিয়ে থাকে তাকেই হাদিয়া বলা হয়। আর শুধুমাত্র ছওয়াবের উদ্দেশ্যে যে দান করা হয় তাকে সদকা বলা হয়। আর কোন প্রকার বিনিময় ছাড়া স্বীয় বস্তু অন্যকে দেয়া হল হিবার অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য এগুলো একটি অপরটির মুরাদিফ। কাজেই নিয়ত ঠিক থাকলে সদকার ন্যায় হাদিয়া ও হিবাতেও ছওয়াব পাওয়া যাবে।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিমদের সাথেও হাদিয়া আদান প্রদান করা যায়। কেননা মহানবী (সাঃ)-এর দরবারে অনেক অমুসলিমের পক্ষ থেকে হাদিয়া এসেছে, প্রিয় নবী (সাঃ) তা প্রত্যাখ্যান করেননি। তাদের থেকে যেমনি হাদিয়া গ্রহণ করা যায় তেমনি তাদেরকে দেয়াতেও কোন নিষেধাজ্ঞা নেই; বরং তাদেরকে হাদিয়া দানের মাধ্যমে তাদের হৃদয়কে নিজের দিকে আকর্ষণ করে ইসলামের পথে আনার চেষ্টা করা অত্যন্ত পুণ্যের কাজ।

হিবার পরিচয় ও উহার বিধানাবলী

হিবার পরিচয় ঃ

قَوْلُهُ الْهِبَةُ تَصِحُّ الخ ঃ هِبَةٌ শব্দটি فِعْلَةٌ-এর ওযনে বাবে ضَرَبَ-এর মাসদার। শাব্দিক অর্থ হল, দান করা, বখশিশ করা বা অনুগ্রহ করা। এটি মূলে ছিল وَهْبٌ, এর واو টি বাদ দিয়ে শেষে একটি "ة" বর্ধিত করে هِبَة করা হয়েছে। পরিভাষায় এর পরিচয় হল, কোনরূপ বিনিময় গ্রহণ ব্যতীতই দেয়াকে হিবা বলে।

উল্লেখ্য যে, যে হিবা করে তাকে বলে وَاهِبٌ আর যাকে করা হয় তাকে বলে مَوْهُوْبٌ لَهُ এবং যা হিবা করা হয় তাকে مَوْهُوْبٌ বলে।

হিবার রুকন ঃ

قَوْلُهُ تَصِحُّ بِالْإِيْجَابِ وَالْقَبُوْلِ الخ ঃ হিবার রুকন দু'টি- (১) ঈজাব তথা প্রস্তাবটি, (২) কবুল অর্থাৎ মেনে নেয়া বা সম্মতি। কেউ কেউ বলেন, শুধু ঈজাব হল হিবার রুকন, আর কবুল হল তার শর্ত। কাজেই ঈজাব ও কবুল দ্বারা হিবা বিশুদ্ধ হয়, আর قَبْض বা হস্তগত করণের দ্বারা তা পরিপূর্ণ হয়।

হিবার হুকুম ঃ

কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমার দ্বারা হিবা জায়েয বলে সাব্যস্ত হয়েছে। তাই হানাফীদের নিকট হিবাকৃত বস্তু মালিক ইচ্ছা করলে যাকে হিবা করেছে তার নিকট হতে গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য ইমামদের নিকট হিবাকৃত বস্তু পুনঃ ফেরত লওয়া জায়েয হবে না।

হিবার মালিকানার জন্য কবজা শর্ত ঃ

قَوْلُهُ فَإِنْ قَبَضَ الْمَوْهُوبُ لَهُ الخ ঃ হিবা গ্রহীতা হিবার মজলিসে যদি মালিকের অনুমতি ছাড়া হিবাকৃত বস্তু গ্রহণ করে, তাহলে জায়েয হবে এবং হিবা পরিপূর্ণ হয়ে যাবে। কেননা মজলিসের মধ্যে পরোক্ষভাবে হিবাকারীর অনুমতি সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর হিবার মজলিস শেষ হয়ে যাবার পর মালিকের পক্ষ হতে পরোক্ষ অনুমতি থাকে না, তাই মজলিশ ভঙ্গ হবার পর গ্রহণ করলে তা বিশুদ্ধ হবে না; বরং তা বিনা অনুমতিতে গ্রহণেরই শামিল। কাজেই হিবাকৃত বস্তুর ওপর মালিকানা সাব্যস্ত হবার জন্য যথা সময়ে কবজা করা আবশ্যক। এ জন্য রাসূল (সাঃ) বলেছেন— لاتَجُوزُ الْهِبَةُ اِلاَّمَقْبُوضَةً তথা কবজা করা ব্যতীত হিবা কার্যকর হয় না। কিন্তু ইমাম মালিক (রহঃ)-এর মতে, কবজা করবার পূর্বেই ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়, যেমনিভাবে ক্রয়-বিক্রয় সহ অন্যান্য চুক্তি ঈজাব ও কবুলের মাধ্যমে মালিকানা সাব্যস্ত হয়।

اَطْعَمْتُكَ هٰذَا الطَّعَامَ দ্বারা হিবা সহীহ হবে কিনা ঃ

قَوْلُهُ اَطْعَمْتُكَ هٰذَا الخ ঃ যদি হিবাকারী বলে যে, আমি তোমাকে এ খাবার খাইয়ে দিলাম, তাহলে হিবা বিশুদ্ধ হবে এবং হিবা হিসেবে গণ্য হবে। কেননা খাওয়ানোর সম্বন্ধ যদি ঐ বস্তুর দিকে হয় যা হুবহু আহার্য বস্তু হয়, তবে এটা দ্বারা কোনরূপ প্রতিদান ব্যতীত মালিক বানিয়ে দেয়া উদ্দেশ্য হয়, আর শরীয়তের পরিভাষায় একেই হিবা বলা হয়; কিন্তু খাওয়ানোকে যদি আহার্য নয় এমন বস্তুর দিকে সম্বন্ধ করা হয় তাহলে উহা দ্বারা ঋণদেয়া উদ্দেশ্য হবে, যেমন- এটা বলা যে, اَطْعَمْتُكَ هٰذِهِ الاَرْضَ তথা আমি তোমাকে এ জমিন ধার দিলাম যেন তুমি উহার উৎপন্ন ফসল খেতে পার।

عُمْرٰى বা আজীবন করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَاَعْمَرْتُكَ هٰذَا الشَّيْئَ الخ ঃ অর্থাৎ "এ বস্তুটি আজীবনের জন্য তোমাকে হিবা বা দান করলাম।" এ কথা দ্বারা হিবা সংঘটিত হয়ে যাবে। কেননা রাসূল (সাঃ) বলেছেন— مَنْ اَعْمَرَ عُمْرٰى فَهُوَ لِلْمُعْمَرِلَهُ وَلِوَرَثَتِهِ بَعْدَهُ

অর্থাৎ কেউ যদি عُمْرٰى করে তাহলে যার জন্য عُمْرٰى করা হয়েছে সে এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ এর মালিক হবে। কাজেই অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, اِعْمَار দ্বারা হিবা বিশুদ্ধ হবে।

حَمَلْتُكَ বা আরোহণ করানো বললে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ حَمَلْتُكَ عَلٰى الخ ঃ কেউ যদি কাউকে কোন জন্তু হিবা করার উদ্দেশ্যে বলে যে, حَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ অর্থাৎ "এ জানোয়ারের ওপর আমি তোমাকে আরোহণ করিয়ে দিলাম।" এ কথার দ্বারা হিবা কার্যকর হবে। কেননা কোন জানোয়ারের ওপর সওয়ার করিয়ে দেয়ার অর্থ হল তা হতে উপকার অর্জন করার ক্ষমতা প্রদান করা, তাই এর দ্বারা ঋণ সাব্যস্ত হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবে উক্ত শব্দের মধ্যে হিবার অর্থেরও অবকাশ রয়েছে বিধায় নিয়তের দ্বারা উহাতে হিবা সাব্যস্ত হবে। এতে কোনরূপ সন্দেহের অবকাশ নেই।

বন্টনযোগ্য বস্তুর হিবার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ وَلاتَجُوزُ الْهِبَةُ فِيْمَا يُقَسَّمُ الخ ঃ যে বস্তু বন্টন করবার পর উপকারে আসে তার হিবা সহীহ হবার জন্য দু'টি শর্ত আবশ্যক- (১) উহা বন্টিত হওয়া, (২) উহা অন্যের মালিকানার সাথে সংশ্লিষ্ট না হওয়া। আর যে বস্তু বন্টনযোগ্য তাকে বন্টন পূর্বাবস্থায় مُشَاع বলে। এ অবস্থায় হিবা সহীহ নয়। এমনিভাবে বৃক্ষে ঝুলন্ত অবস্থায় ফল হিবা করা জায়েয নেই। কেননা এমতাবস্থায় হিবা গ্রহীতার মালিকানা বৃক্ষের সাথে জড়িত থাকবে, আর এটা জায়েয নেই। সুতরাং গ্রন্থকার مُحَوَّزَةً কথাটি উল্লেখ করে এ শেষ অবস্থাকেই প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বন্টনযোগ্য নয় এমন বস্তুর হিবার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ فِيْمَا لاَيُقَسَّمُ الخ ঃ যেসব বস্তু বন্টনযোগ্য নয় তা হিবা করা জায়েয। বন্টনযোগ্য না হওয়ার অর্থ হল যা বন্টন করার পর সম্পূর্ণভাবে অকেজো ও ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে যায়। যেমন- মালিকানাভুক্ত গোলাম, ঘোড়া ইত্যাদি। অর্থাৎ বন্টন অযোগ্য হবার অর্থ হলো বন্টন পূর্ব অবস্থায় যেরূপ উপকারে আসত বন্টন পরবর্তী অবস্থায় অনুরূপ উপকারে না আসা, যেমন- ছোট কূপ বা ছোট ঘর ইত্যাদি।

যুগ্ম বস্তুর হিবা করা প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ وَهَبَ شِقْصًا مُشَاعًا الخ ঃ যদি কোন ব্যক্তি যুগ্ম বস্তুর যুগ্ম অংশ বন্টন হবার পূর্বে হিবা করে, তবে তার উক্ত হিবা ফাসিদ হয়ে যাবে। যেমন– যৌথ মালিকানাধীন কোন ঘরের অর্ধাংশ বন্টন হবার পূর্বে হিবা করা। তবে বন্টন করার পর যদি হিবা করে তাহলে তা জায়েয হবে।

গমের মধ্যস্থিত আটা এবং তিলের মধ্যকার তৈল হিবা করা প্রসঙ্গে ঃ

قَوْلُهُ ولووهب دَقِيقًا الخ ঃ যদি গমের মধ্যস্থিত আটা এবং তিলের মধ্যকার তৈল হিবা করে, তাহলে উক্ত হিবা ফাসিদ হয়ে যাবে। কেননা আটা এবং তৈল এখনো অস্তিত্বহীন, আর অস্তিত্বহীন (مَعْدُوْم) বস্তুর হিবা জায়েয নেই। সুতরাং গমকে আটায় পরিণত করা এবং তিলকে তৈলে পরিণত করার পর হিবা করা বিশুদ্ধ হবে। কেননা এ অবস্থায় হিবা গ্রহীতার নিকট সমর্পণযোগ্য।

হিবাকৃত বস্তু গ্রহীতার মালিকানায় পূর্ব হতে থাকলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ فِي يَدِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ مَلَكَهَا الخ ঃ কোন ব্যক্তি যদি এমন বস্তু হিবা করে যা পূর্ব হতেই হিবাগ্রহীতার কাছে রয়েছে, তবে হিবার দ্বারা সে উহার মালিক হয়ে যাবে। সে বস্তু নতুনভাবে তাকে কবজা করতে হবে না। যেহেতু হিবার পর হিবাগ্রহীতা হিবাকৃত বস্তুর মালিক হবার জন্য কবজা করা শর্ত আর এখানে তো পূর্ব হতেই কবজা রয়েছে, তাই মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে।

নাবালেগ সন্তানকে হিবা করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا وَهَبَ الْاَبُ لِاِبْنِهِ الصَّغِيْرِ الخ ঃ পিতা যদি তার নাবালেগ সন্তানকে কিছু হিবা করে, তবে হিবার (عَقْد) বন্ধন বা চুক্তি সম্পাদিত হবার সাথে সাথে নাবালেগ সন্তান হিবাকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে। কেননা হিবাগ্রহীতা অপ্রাপ্ত বয়স্ক হবার কারণে মালিকানা সাব্যস্ত হবার জন্য তার পিতা অথবা পিতামহের কবজা অথবা তাদের ওলির কবজাই যথেষ্ট। সুতরাং পিতা হিবাকারী হওয়া অবস্থায় স্বয়ং পিতাই কবজাকারী হবে। অতএব আকদের দ্বারাই সন্তানের মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে যাবে। এমনিভাবে অন্য কেউ নাবালেগ সন্তানের জন্য হিবা করলে তা পিতা বা ওলির কবজার দ্বারাই মালিকানা সাব্যস্ত হবে এবং হিবা বিশুদ্ধ হবে।

وَإِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ فَقَبَضَهَا لَهُ جَائِزٌ وَكَذٰلِكَ إِنْ كَانَ فِي حِجْرِ أَجْنَبِيٍّ يُرَبِّيهِ فَقَبَضَهُ لَهُ جَائِزٌ وَإِنْ قَبَضَ الصَّبِيُّ الْهِبَةَ بِنَفْسِهِ وَهُوَ يَعْقِلُ جَازَ وَإِذَا وَهَبَ اثْنَانِ مِنْ وَاحِدٍ دَارًا جَازَ وَإِنْ وَهَبَ وَاحِدٌ مِنْ اثْنَيْنِ لَمْ تَصِحَّ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى تَصِحُّ وَإِذَا وَهَبَ لِأَجْنَبِيٍّ هِبَةً فَلَهُ الرُّجُوعُ فِيهَا إِلَّا أَنْ يُعَوِّضَهُ عَنْهَا أَوْ يَزِيدَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً أَوْ يَمُوتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ أَوْ يَخْرُجَ الْهِبَةُ مِنْ مِلْكِ الْمَوْهُوبِ لَهُ وَإِنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَلَا رُجُوعَ فِيهَا وَكَذٰلِكَ مَا وَهَبَهُ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ وَإِذَا قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ لِلْوَاهِبِ خُذْ هٰذَا عِوَضًا عَنْ هِبَتِكَ أَوْ بَدَلًا عَنْهَا أَوْ فِي مُقَابَلَتِهَا فَقَبَضَهُ الْوَاهِبُ سَقَطَ الرُّجُوعُ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি সন্তান তার মায়ের কোলে থাকে, তাহলে তার পক্ষ হতে মায়ের কবজা করা জায়েয হবে। এমনিভাবে যদি বাচ্চা এমন অনাত্মীয়ের কোলে থাকে যে তাকে লালন-পালন করে, তাহলে বাচ্চার পক্ষ হতে তার কবজা জায়েয হবে। আর যদি বুদ্ধি বা জ্ঞান সম্পন্ন বাচ্চা নিজেই হিবা কবুল করে, তাহলেও জায়েয হবে। দুই ব্যক্তি (যৌথভাবে) যদি তৃতীয় কোন ব্যক্তিকে কোন ঘর হিবা করে, তাহলে জায়েয হবে। আর যদি এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে হিবা করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর নিকট হিবা সহীহ হবে না, কিন্তু সাহেবাইন (রহঃ)-এর নিকট উক্ত হিবা সহীহ হবে। আর যদি কেউ কোন (আজনবী) অপরিচিতকে কিছু হিবা করে, তাহলে উক্ত হিবা প্রত্যাহার করতে পারবে। কিন্তু নিম্নোল্লিখিত অবস্থায় প্রত্যাহার করতে পারবে না। যদি সে উক্ত হিবার বিনিময় গ্রহণ করে, অথবা তার সাথে কোন অবিচ্ছেদ্য বস্তু যুক্ত করে ফেলে কিংবা হিবাকারী ও হিবা গ্রহীতার মধ্য হতে কোন একজন মৃত্যুবরণ করে, অথবা হিবাকৃত বস্তু হিবাগ্রহীতার মালিকানা হতে বের হয়ে যায়। আর যদি কেউ স্বীয় রক্ত সম্পর্কীয় কোন আত্মীয়কে হিবা করে, তবে উহাতে ফেরত লওয়া জায়েয নেই। এমনিভাবে স্বামী-স্ত্রী একে অপরকে হিবা করলে তা লওয়া চলে না। আর হিবাগ্রহীতা যদি হিবাকারীকে বলে যে, এ বস্তুটি তোমার, হিবার বিনিময়ে গ্রহণ কর অথবা পরিবর্তে গ্রহণ কর কিংবা হিবার মোকাবেলায় লও তারপর হিবাকারী উহা কবজা করে নিল, তাহলে তার রুজু করার (ফিরিয়ে নেয়ার) অধিকার বাতিল হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বাচ্চার পক্ষ হতে মা অথবা লালন-পালনকারী হিবাকৃত বস্তু গ্রহণ করতে পারবে ঃ

قَوْلُهُ فَقَبَضَهُ لَهُ جَائِزٌ الخ ঃ বাচ্চার পক্ষ হতে তাঁর মা এবং প্রতিপালনকারী হিবাকৃত বস্তু কবজা করতে পারবে। কেননা যার তত্ত্বাবধানে বাচ্চার লালন-পালন হচ্ছে সে বাচ্চার ব্যাপারে এরূপ ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার রাখে যা বাচ্চার জন্য কল্যাণকর, আর সম্পদ লাভ করা তো বাচ্চার জন্য অধিক কল্যাণকর। সুতরাং বাচ্চার জন্য যা হিবা করা হয়েছে তার পালনকারী উহা কবজা করতে পারবে এবং উহার হেফাজতকারীও সে হবে।

উল্লেখ্য যে, জ্ঞানসম্পন্ন বাচ্চা নিজে কবজা করলেও জায়েয হবে।

যৌথভাবে হিবা করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا وَهَبَ وَاحِدٌ الخ ঃ কেউ যদি তার মালিকানাধীন একটি ঘর দুই ব্যক্তিকে হিবা করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, উক্ত হিবা জায়েয হবে না। কেননা কবজা করবার সময় হিবাকৃত বস্তু যৌথ মালিকানাধীন থাকা হিবা কার্যকর হবার জন্য প্রতিবন্ধক। তবে হিবা করবার সময় হিবাকৃত বস্তু যৌথ মালিকানাধীন থাকা হিবা কার্যকর হবার জন্য

প্রতিবন্ধক নয়। এ সূত্রের আলোকে দুই ব্যক্তির যৌথ মালিকানাধীন একটি ঘর যদি তারা কোন এক ব্যক্তিকে হিবা করে তাহলে উহা বিশুদ্ধ হবে। যেহেতু উক্ত অবস্থায় কবজা করবার সময় অংশীদারিত্ব পাওয়া যায় না। পক্ষান্তরে দুই ব্যক্তিকে যদি এক ব্যক্তি হিবা করে, তবে সহীহ হবে না। কেননা এ অবস্থায় কবজা করবার সময় অংশীদারিত্ব পাওয়া গেছে।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, এক ব্যক্তি যদি কোন ঘর দুই ব্যক্তিকে হিবা করে, তবে উক্ত হিবাও সহীহ হবে। কেননা এ অবস্থায় উভয় হিবাগ্রহীতাকে একই সাথে সম্পূর্ণ ঘরের মালিক বানিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব মালিক বানানোর মধ্যে অংশীদারিত্ব পাওয়া যায়নি।

যেসব অবস্থায় হিবা রুজু তথা ফিরিয়ে নেয়া জায়েয নেই ঃ

قَوْلُهُ فَلَهُ الرُّجُوْعُ فِيْهَا الخ ঃ নিম্নোক্ত সাতটি অবস্থায় হানাফীদের মতে হিবা রুজু করা জায়েয নেই—

১. হিবাকৃত বস্তুর বিনিময়ে হিবাকারী হিবাগ্রহীতা হতে কিছু গ্রহণ করলে।

২. যদি হিবাগ্রহীতা হিবাকৃত বস্তুর সাথে অবিচ্ছেদ্য কিছু যুক্ত করে ফেলে। যেমন— হিবাকৃত ছাতুর সাথে ঘি মিলিয়েছে।

৩. হিবাকারী ও হিবাগ্রহীতার যে কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে। কেননা যদি হিবাগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করে, তাহলে হিবাকৃত বস্তুর মালিকানা তার ওয়ারিশরা উহা হিবাকারী হতে পায়নি, তাই তাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করা হবে না। পক্ষান্তরে হিবাকারী মৃত্যুবরণ করবার পর তার প্রত্যাহার করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। সুতরাং তার ওয়ারিশরা প্রত্যাহার করতে পারবে না।

৪. হিবাকৃত বস্তু হিবাগ্রহীতার মালিকানা বহির্ভূত হয়ে গেলে। কেননা হিবাকারী হিবাগ্রহীতাকে উহা হস্তান্তর করার অধিকার প্রদান করেছে। কাজেই হিবাকারী রুজু করে উক্ত হস্তান্তরের অধিকারকে বাতিল করতে পারবে না।

৫. হিবাকারী ও হিবাগ্রহীতার মধ্যে এমন রক্ত সম্পর্ক থাকা, যার ফলে তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক নিষিদ্ধ হয়; যদি তাদের একজনকে পুরুষ এবং অপরজনকে রমণী হিসেবে গণ্য করা হয়। কেননা রাসূল (সাঃ) ইরশাদ করেছেন যে, মাহরামকে হিবা করলে উহা প্রত্যাহার করা যাবে না।

৬. হিবাকারী ও হিবাগ্রহীতার মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক থাকলে। কেননা বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আত্মীয়তা সাব্যস্ত হয়ে থাকে। এ কারণে তারা একে অপরের ওয়ারিশ হয়ে থাকে।

৭. আর হিবাকৃত বস্তুটি যদি বিনষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়। কেননা এমতাবস্থায় রুজু করতে চাইলেও তা সম্ভব নয়। এ প্রকারটি সঠিক স্পষ্ট বলে গ্রন্থকার উল্লেখ করেননি।

وَاِنْ عَوَّضَهُ اَجْنَبِيٌّ عَنِ الْمَوْهُوْبِ لَهُ مُتَبَرِّعًا فَقَبَضَ الْوَاهِبُ الْعِوَضَ سَقَطَ الرُّجُوْعُ وَاِذَا اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْهِبَةِ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ وَاِنِ اسْتَحَقَّ نِصْفَ الْعِوَضِ لَمْ يَرْجِعْ فِى الْهِبَةِ بِشَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَرُدَّ مَابَقِىَ مِنَ الْعِوَضِ ثُمَّ يَرْجِعُ فِى كُلِّ الْهِبَةِ وَلَا يَصِحُّ الرُّجُوْعُ فِى الْهِبَةِ اِلَّا بِتَرَاضِيْهِمَا اَوْ بِحُكْمِ الْحَاكِمِ وَاِذَا تَلَفَتِ الْعَيْنُ الْمَوْهُوْبَةُ ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا مُسْتَحِقٌّ فَضَمِنَ الْمَوْهُوْبُ لَهُ لَمْ يَرْجِعْ عَلَى الْوَاهِبِ بِشَيْءٍ وَاِذَا وَهَبَ بِشَرْطِ الْعِوَضِ اُعْتُبِرَ التَّقَابُضُ فِى الْعِوَضَيْنِ جَمِيْعًا وَاِذَا تَقَابَضَا صَحَّ الْعَقْدُ وَكَانَ فِىْ حُكْمِ الْبَيْعِ يُرَدُّ بِالْعَيْبِ وَخِيَارِ الرُّؤْيَةِ وَيَجِبُ فِيْهَا الشُّفْعَةُ وَالْعُمْرٰى جَائِزَةٌ لِلْمُعْمَرِ لَهُ فِىْ حَالِ حَيَاتِهٖ وَلِوَرَثَتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ وَ الرُّقْبٰى بَاطِلَةٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى جَائِزَةٌ -

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি হিবাগ্রহীতার পক্ষ হতে (অজনবী) অন্য কেউ অনুগ্রহ পূর্বক বিনিময় হিসেবে হিবা কারীকে কিছু প্রদান করে আর হিবাকারী বিনিময় গ্রহণ করে, তাহলে রুজু করার অধিকার বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি এ অবস্থায় হিবা করা বস্তুর অর্ধেকের মধ্যে কোন হকদার প্রকাশ পায়, তখন অর্ধেক বিনিময় ফিরিয়ে নিতে পারবে। আর যদি বিনিময় দেয়া বস্তুর অর্ধেকের হকদার প্রকাশ পায়, তাহলে হিবাকারী হিবাকৃত বস্তু হতে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। তবে যদি হিবাকারী হিবাগ্রহীতাকে অবশিষ্ট বিনিময়ও ফেরত দিয়ে দেয়, তাহলে সম্পূর্ণ হিবা ফেরত নিতে পারবে। হিবাকারী ও হিবাগ্রহীতার পারস্পরিক সম্মতি ছাড়া অথবা বিচারকের হুকুম ব্যতীত হিবা রুজু করা বা ফেরত নেয়া বিশুদ্ধ হবে না। আর যদি দানকৃত মূলবস্তু ধ্বংস হয়ে যায়, তারপর কোন হকদার আত্মপ্রকাশ করে, আর হিবাগ্রহীতাকে উহার ক্ষতিপূরণ প্রদান করে, তাহলে হিবাগ্রহীতা হিবাকারী হতে কিছুই ফেরত নিতে পারবে না। যদি বিনিময়ের শর্তে হিবা করে, তাহলে উভয় বিনিময়ের পারস্পরিক হস্তগতকরণ একসাথে ধর্তব্য হবে। আর যখন উভয়ে কবজা করবে, তখন (আকদ) চুক্তি বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, আর এটা ক্রয় বিক্রয়ের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। তাই খিয়ারে আয়েব (দোষের কারণে ফিরিয়ে দেয়া) এবং খিয়ারে রুইয়াত (দেখবার পর ফেরত দেয়া)-এর দ্বারা ফেরত দিতে পারবে এবং তাতে শুফার অধিকারও সাব্যস্ত হবে। আর مُعْمَرلَه (জীবনের জন্য যাকে দান করা হয়) -এর জীবদ্দশায় তার এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশদের জন্য ওমরা (عُمْرٰى) জায়েয হবে। আর ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, রাক্বা (رُقْبٰى) (জায়েয নয় তথা) বাতিল। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে রাকবা (رُقْبٰى) ও জায়েয।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

বিনিময় প্রদানের হিবাকৃত বস্তুর অর্ধেকে অপরের অধিকার সাব্যস্ত হলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ رَجَعَ بِنِصْفِ الْعِوَضِ الخ ঃ হিবাকৃত বস্তুর অর্ধাংশের হকদার সাব্যস্ত হয়ে গেলে হিবাগ্রহীতা হিবাকারী হতে প্রদত্ত বিনিময়ের অর্ধাংশ ফেরত নিতে পারবে। কেননা হিবাগ্রহীতা হিবাকারীকে এ জন্য বিনিময় দিয়েছিল যেন হিবাকৃত বস্তু তার নিকট নিরাপদ থাকে। সুতরাং যখন হিবাকৃত বস্তুর অর্ধেক তার হাত হতে চলে গেল, তখন সে প্রদত্ত বিনিময়ের অর্ধেক হিবাকারী হতে ফেরত নিতে পারবে।

হিবার বিনিময়ে দেয়া মালের অর্ধেকের হকদার প্রকাশ পেলে তার হুকুম ঃ

قوله لم يرجع في الهبة بشئ الخ ঃ হিবাগ্রহীতা হিবার বিনিময়ের প্রদান করবার পর উক্ত বিনিময়ের অর্ধাংশে যদি অন্যের অধিকার সাব্যস্ত হয়, তাহলে হিবাকারী হিবার অর্ধাংশ রুজু করতে বা ফেরত নিতে পারবে না। কেননা হিবার বিনিময় হিবার সমান হওয়া অবশ্যক নয়। সুতরাং বিনিময়ের অর্ধেক অংশের হকদার প্রকাশ পাওয়ার পর বলা যেতে পারে, অবশিষ্ট বিনিময় সম্পূর্ণ হিবার বিনিময়ে অবশিষ্ট থাকার অবস্থায় হিবার মধ্যে রুজু করা জায়েয নেই। তবে হিবাকারী যদি অবশিষ্ট বিনিময়ও ফেরত দিয়ে দেয়, তবে তার নিকট হিবার বিনিময় না থাকার দরুন হিবার মধ্যে রুজু করা জায়েয হবে।

হিবা রুজু করা কখন সহীহ হবে ঃ

قوله بتراضيهما الخ ঃ হিবাকারী ও হিবাগ্রহীতার পারস্পরিক সমঝোতা ব্যতীত হিবার মধ্যে রুজু করা বিশুদ্ধ হবে না। কেননা হিবা করবার পর হিবাকৃত বস্তুর ওপর হিবাগ্রহীতার মালিকানা সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আর মালিকের মালিকানা হতে কোন বস্তু হস্তান্তরিত হবার জন্য মালিকের সন্তুষ্টি অথবা বিচারকের ফয়সালা একান্ত আবশ্যক, অন্যথা তা কার্যকর হবে না।

হিবার পর তার হকদার প্রকাশ পেলে তার হুকুম ঃ

قوله واذا تلفت الخ ঃ হিবাকৃত বস্তু ধ্বংস হবার পর উহার কোন পাওনাদার আত্মপ্রকাশ করলে হিবাগ্রহীতার নিকট হতে উহার ক্ষতিপূরণ আদায় করলে হিবাগ্রহীতা হিবাকারী হতে কিছুই আদায় করতে পারবে না। কেননা হিবা হল অনুগ্রহ বা দান, আর এর ক্ষতিপূরণ হিবাকারী দিতে বাধ্য নয়।

বিনিময়ের শর্তে হিবা করলে তার বিধান ঃ

قوله واذا وهب بشرط العوض الخ ঃ বিনিময়ের শর্তে হিবা করলে উভয় বিনিময় হস্তগতকরণ ধর্তব্য হবে। কেননা উক্ত অবস্থায় প্রত্যেক বিনিময় হিবা হিসেবে গণ্য হবে, আর হিবাগ্রহীতা হিবাকৃত বস্তুর মালিক হওয়ার জন্য কবজা শর্ত, তাই উভয় বিনিময়ের ওপর কবজা আবশ্যক। আর কবজার পর উহা بيع তথা ক্রয়-বিক্রয় হিসেবে গণ্য করা হবে। কেননা শর্তের বিনিময়ে যে হিবা হয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত তা بيع ই হয়ে যায়। কাজেই ক্রেতা خيار عيب ও خيار رؤية -এর মাধ্যমে বিনিময় ফেরত দিতে পারবে। আর এ বিনিময় ভূমি হলে শুফার অধিকারও সাব্যস্ত হবে।

ওমরা হিবার বিধান

قوله و العمرى جائزة الخ ঃ কাউকে যদি কোন কিছু এ শর্তে দান করে যে, আজীবন সে উহা ভোগ করবে, তাহলে হিবা বিশুদ্ধ হবে। ফলে হিবাগ্রহীতা উহা ভোগ করবে এবং তার মৃত্যুর পর তার ওয়ারিশগণ উক্ত হিবাকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে। আর যদি ফেরতের শর্ত করে, তবে বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা হল ফাসিদ শর্ত, আর ফাসিদ শর্তের দ্বারা হিবার চুক্তি ফাসিদ হয় না।

رقبى -এর পরিচয় ও উহার সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ

قوله والرقبى باطلة الخ ঃ رقبى (রাকবা) বলা হয় এ শর্তে হিবা করা যে হিবাকারী যদি হিবাগ্রহীতার পূর্বে ইন্তেকাল করে, তাহলে হিবাগ্রহীতা হিবাকৃত বস্তুর মালিক হয়ে যাবে। আর যদি হিবাগ্রহীতা হিবাকারীর পূর্বে মারা যায়, তাহলে হিবাকৃত বস্তু হিবাকারীর নিকট ফেরত যাবে।

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রাঃ)-এর মতে, رقبى তথা এরূপ হেবা জায়েয নেই। এটা বাতিল বলে গণ্য হবে। কেননা এর মধ্যে হিবাকারীর মৃত্যুবরণের পর تمليك (মালিকানা) পাওয়া যায়, তাৎক্ষণিক تمليك পাওয়া যায় না। আর মালিকানা সাব্যস্ত না হলে তা বিশুদ্ধ হয় না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রাঃ)-এর মতে, رقبى জায়েয। কেননা رقبى-এর মধ্যে তাৎক্ষণিকভাবে মালিক বানিয়ে দেয়া সাব্যস্ত হয়। তবে হিবাকারী রুজু করবার জন্য হিবাগ্রহীতার মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে। এ অপেক্ষা থাকাটা সহীহ হবে না, কিন্তু হিবা সহীহ হয়ে যাবে।

وَمَنْ وَهَبَ جَارِيَةً إِلَّا حَمْلَهَا صَحَّتِ الْهِبَةُ وَبَطَلَ الْاِسْتِثْنَاءُ وَ الصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَاتَصِحُّ إِلَّا بِالْقَبْضِ وَلَاتَجُوزُ فِى مُشَاعٍ يَحْتَمِلُ الْقِسْمَةَ وَإِذَا تَصَدَّقَ عَلَى فَقِيرَيْنِ بِشَئٍ جَازَ وَلَايَصِحُّ الرُّجُوعُ فِى الصَّدَقَةِ بَعْدَ الْقَبْضِ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمَالِهٖ لَزِمَهٗ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِجِنْسِ مَاتَجِبُ فِيهِ الزَّكٰوةُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِمِلْكِهٖ لَزِمَهٗ اَنْ يَّتَصَدَّقَ بِالْجَمِيعِ وَيُقَالُ لَهٗ اَمْسِكْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَاتُنْفِقُهٗ عَلٰى نَفْسِكَ وَعَيَالِكَ إِلٰى اَنْ تَكْسِبَ مَالًا فَإِذَا اكْتَسَبْتَ مَالًا تَصَدَّقْهُ بِمِثْلِ مَا اَمْسَكْتَ لِنَفْسِكَ -

সরল অনুবাদ ঃ আর কোন ব্যক্তি দাসীর গর্ভ বাদ দিয়ে দাসীটি হিবা করলে হিবা বিশুদ্ধ হবে, তবে তার ইস্‌তিছনা তথা গর্ভ বাদ দেয়া বাতিল হয়ে যাবে। (ফলে গর্ভের সন্তানসহ হিবা হয়ে যাবে।) হিবার ন্যায় সদকাও কবজা ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না। এবং যে যুগ্ম বস্তু বন্টনের সম্ভাবনা রাখে উহার মধ্যে সদকা জায়েয নেই। কোন বস্তু দু'জন ফকিরকে সদকা করলে জায়েয হবে। কবজার পর সদকার মধ্যে রুজু করা জায়েয নেই। আর যে ব্যক্তি তার মাল সদকা করবার মানত করে তার ওপর ঐ জাতীয় মাল সদকা করা আবশ্যক হবে যে গুলোর ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়েছে। আর যে ব্যক্তি স্বীয় মালিকানাধীন সম্পদ সদকা করবার মানত করে তার ওপর আবশ্যক হবে সমস্ত সম্পদ সদকা করা আর তাকে বলা হবে যে, মাল কামাই করবার পূর্ব পর্যন্ত তোমার এবং তোমার পরিবার-পরিজনের খরচ পরিমাণ সম্পদ তা হতে রেখে দাও। অতঃপর যখন তুমি সম্পদ অর্জন করবে, তখন যে পরিমাণ নিজের জন্য রেখেছিলে তা সদকা করে দেবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

দাসী দান করার বিধান ঃ

قَوْلُهٗ مَنْ وَهَبَ جَارِيَةً الخ ঃ দাস-দাসী হিবা করা জায়েয। তবে যদি কেউ দাসী হিবা করার সময় এ শর্ত করে যে, দাসীর গর্ভ তার, তবে হিবা বিশুদ্ধ হয়ে যাবে এবং শর্ত বাতিল হয়ে যাবে। অর্থাৎ দাসীর সাথে সাথে তার গর্ভও হিবা হয়ে যাবে।

সদকা হিবার ন্যায় ঃ

وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ الخ ঃ সদকাও হুকুমের দিক থেকে হিবার ন্যায়। হিবার যে হুকুম সদকারও অনুরূপ হুকুম। এটাও কবজা ছাড়া বিশুদ্ধ হয় না এবং শরীকি জিনিস দান করা জায়েয নেই।

(بِمَالِهٖ) মাল দান করা ও (بِمِلْكِهٖ) মালিকানা দান করার মধ্যে পার্থক্য ও উহার হুকুম ঃ

قَوْلُهٗ يَتَصَدَّقَ بِمَالِهٖ الخ ঃ বাহ্যিক দৃষ্টিতে بِمِلْكِهٖ ও بِمَالِهٖ উভয় বক্তব্যের হুকুম একই রকম হওয়া আবশ্যক তাই উভয় অবস্থায়ই সম্পূর্ণ মাল সদকা করে দেয়াই উচিত, তবে ইস্‌তিছনার দৃষ্টিকোণ হতে مَال বলার অবস্থায় সে জাতীয় সম্পদকে বোঝানো হয়েছে যার ওপর যাকাত ফরয হয়েছে, আর ফরয সদকাকে শরীয়তের দৃষ্টিতে যাকাত বলা হয়। যাকাত কেবল স্বর্ণ, রৌপ্য, ব্যবসার মাল এবং সায়িমাহ পশুর ওপরই ফরয হয়। সুতরাং بِمَالِهٖ বললে উপরোক্ত চার প্রকার মালই সদকা করা জরুরী হবে। পক্ষান্তরে بِمِلْكِهٖ বললে তার সম্পূর্ণ সম্পদই সদকা করতে হবে। কেননা مِلْك বা মালিকানা শব্দটি যাকাতযোগ্য ও যাকাতযোগ্য নয় সর্বপ্রকার সম্পদকে অন্তর্ভুক্ত করে। কাজেই بِمِلْكِهٖ শব্দটি বলে মানত করলে তার সমুদয় সম্পদ সদকা করা আবশ্যক হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। هِبَةٌ-এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।
২। اَلْهِبَةُ শব্দটির বিশ্লেষণ কর।
৩। কোন্ কোন্ শব্দ দ্বারা هِبَةٌ সম্পাদিত হয়?
৪। কোন্ কোন্ শব্দ দ্বারা হিবা বিশুদ্ধ হয়?
৫। কি কি কারণে হিবা রহিত হতে পারে?
৬। هِبَةٌ কখন রুজু করা জায়েয এবং কখন জায়েয নয়।
৭। هِبَةٌ কিভাবে শুদ্ধ হয় এবং কখন সম্পন্ন হয় ?
৮। هِبَةٌ কিভাবে (مُنْعَقِدْ) সংঘটিত হয়।
৯। ছোট শিশুকে হিবা করলে তা কিভাবে কার্যকর হবে।
১০। কোন এতিমকে হিবা করলে তার হুকুম কি?
১১। কোন্ কোন্ বস্তুতে হিবা জায়েয আর কোন্ কোন্ বস্তুতে জায়েয নেই? বর্ণনা কর।
১২। দুই ব্যক্তি এক ব্যক্তিকে এবং এক ব্যক্তি দুই ব্যক্তিকে কোন ঘর হিবা করলে তার হুকুম কি?
১৩। কোন্ কোন্ অবস্থায় হিবা রুজু বা প্রত্যার্পণ করা জায়েয নেই?
১৪। হিবাকৃত বস্তু নষ্ট হয়ে যাবার পর উহার দাবিদার পাওয়া গেলে তার হুকুম কি?
১৫। বিনিময়ের শর্তে হিবা করলে তার হুকুম কি?
১৬। عُمْرٰى ও رُقْبٰى কাকে বলে? উহা জায়েয আছে কি? বর্ণনা কর।
১৭। যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় দাসীকে তার গর্ভ বাদ দিয়ে হিবা করে তাহলে উহার হুকুম কি?
১৮। وَالصَّدَقَةُ كَالْهِبَةِ لَاتَصِحُّ اِلَّا بِالْقَبْضِ-এর ব্যাখ্যা কর।
১৯। নিজের জীবনের শর্ত দিয়ে কোন বস্তু হিবা করলে উহার হুকুম কি?
২০। بِمَالِهٖ অথবা بِمِلْكِهٖ বলে মানত করলে তার হুকুম কি?

كِتَابُ الْوَقْفِ

لَايَزُوْلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ عَنِ الْوَقْفِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يَّحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ اَوْ يُعَلِّقَهُ بِمَوْتِهٖ فَيَقُوْلُ اِذَا مِتُّ فَقَدْ وَقَفْتُ دَارِىْ عَلٰى كَذَا وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَزُوْلُ الْمِلْكُ بِمُجَرَّدِ الْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَزُوْلُ الْمِلْكُ حَتّٰى يَجْعَلَ لِلْوَقْفِ وَلِيًّا وَيُسَلِّمَهُ اِلَيْهِ وَاِذَا صَحَّ الْوَقْفُ عَلٰى اِخْتِلَافِهِمْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَلَمْ يَدْخُلْ فِىْ مِلْكِ الْمَوْقُوْفِ عَلَيْهِ وَ وَقْفُ الْمُشَاعِ جَائِزٌ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَايَجُوْزُ وَلَايَتِمُّ الْوَقْفُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يَجْعَلَ اٰخِرَهُ بِجِهَةٍ لَاتَنْقَطِعُ اَبَدًا-

---

ওয়াক্‌ফের পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ হতে ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা বিদূরীত হয় না। কিন্তু যখন বিচারক উহার হুকুম প্রদান করবে অথবা ওয়াক্‌ফকে তার মৃত্যুর সাথে সম্পর্ক করে বলে যে, আমি যখন মৃত্যুবরণ করব তখন আমার ঘর অমুকের জন্য ওয়াক্‌ফ করলাম। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন যে, শুধু বলার মাধ্যমে মালিকানা দূর হয়ে যাবে। ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যে পর্যন্ত ওয়াক্‌ফের জন্য মুতাওয়াল্লী নিয়োগ করে তার হাতে সমর্পণ না করবে সে পর্যন্ত মালিকানা বিদূরীত হবে না। আর ইমামদের উল্লিখিত মতান্তরের ভিত্তিতে যখন ওয়াক্‌ফ সহীহ হয়ে যাবে, তখন ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যাবে। তবে (مَوْقُوْف عَلَيْه তথা) যাকে ওয়াক্‌ফ করা হবে তার মালিকানায় প্রবেশ করবে না। ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, বন্টনযোগ্য বস্তু ওয়াক্‌ফ করা জায়েয, আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, জায়েয নেই এবং ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ওয়াক্‌ফও পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উহার শেষ দিককে এরূপ করে দেবে যে উহা আর কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওয়াক্‌ফের বিধানাবলী ও বিভিন্ন মাসায়েল

وَقْف-এর পরিচয় ঃ

وَقْف-এর শাব্দিক অর্থ হল আবদ্ধ রাখা, আটক রাখা এবং দান করা। আর শরীয়তের পরিভাষায় এর পরিচয় হল— هُوَحَبْسُ الْعَيْنِ عَلٰى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ অর্থাৎ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানায় সম্পদ আটক রেখে উপকার দান করাকে ওয়াক্‌ফ বলে।

ওয়াক্‌ফের হুকুম সম্পর্কে ইমামদের মতভেদ ঃ

قَوْلُهُ لَايَزُوْلُ مِلْكُ الْوَاقِفِ الخ ঃ ওয়াক্‌ফ সম্পর্কে হানাফী মাযহাবের তিন ইমামের মতভেদের মূলকথা হল—

১. ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্‌ফকৃত সম্পদ ওয়াক্‌ফকারীর মালিকানা হতে বের হবার জন্য দু'টি শর্তের যে কোন একটি পাওয়া যাওয়া আবশ্যক। শর্তদ্বয় হল—

ক) ইমাম বা বিচারক ফয়সালার মাধ্যমে ওয়াক্ফ কার্যকর করতে হবে।

খ) অথবা, ওয়াক্ফকারী এরূপ বলবে যে, আমার মৃত্যুর পর আমার অমুক সম্পদ অমুক ব্যক্তির জন্য ওয়াক্ফ হিসেবে গণ্য হবে।

২. ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্ফকারী কোন বস্তুকে ওয়াক্ফ করা মাত্রই উহা তার মালিকানা হতে বের হয়ে যাবে। এতে বিচারকের ফয়সালারও প্রয়োজন হবে না, কোন শর্ত করা এবং মুতাওয়াল্লী নির্ধারণেরও দরকার হবে না।

৩. আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে ওয়াক্ফকৃত বস্তু বের হবার জন্য শর্ত হল ওয়াক্ফকারী কোন ব্যক্তিকে মুতাওয়াল্লী তথা অভিভাবক বানিয়ে ওয়াক্ফকৃত সম্পদ তার নিকট হস্তান্তর করা।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর কথার ওপরই ফতোয়া সাব্যস্ত হয়েছে।

ওয়াক্ফকৃত সম্পদের মালিকানার হুকুম ঃ

قوله لم يدخل الخ ঃ ওয়াক্ফ করার পর ওয়াক্ফকৃত বস্তু যখন ওয়াক্ফকারীর মালিকানা হতে বের হয়ে যায়, তখনও উহা موقوف عليه (যার ওপর ওয়াক্ফ করা হয়েছে)-এর মালিকানায় প্রবেশ করে না। কেননা মালিকানা সাব্যস্ত হবার জন্য ওয়াক্ফকৃত সম্পদের মধ্যে স্বাধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করা বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক, অথচ موقوف عليه তা দ্বারা উপকৃত হওয়া ছাড়া অন্য কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে না। যেমন– বিক্রয় করা বা হিবা করা। কাজেই বুঝা গেল যে, যাকে ওয়াক্ফ করা হয়েছে সে উহার মালিক হয় না এবং উহাতে ওয়াক্ফকারীর মালিকানাও অবশিষ্ট থাকে না।

যুগ্ম বস্তুর ওয়াক্ফ সম্পর্কে হুকুম ঃ

قوله و وقف المشاع الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, বন্টনযোগ্য যুগ্ম বস্তু বন্টনের পূর্বে ওয়াক্ফ করা জায়েয। কেননা ওয়াক্ফ হল ওয়াক্ফকারীর সে সম্পদ হতে স্বীয় মালিকানা প্রত্যাহার করা, আর ওয়াক্ফের সম্পদ مُشَاع বা যুগ্ম হওয়াতে মালিকানা প্রত্যাহারের জন্য প্রতিবন্ধক নয়।

আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, বন্টনযোগ্য যুগ্ম বস্তু বন্টনের পূর্বে ওয়াক্ফ করা জায়েয নয়। কেননা তাঁর মতে ওয়াক্ফ পরিপূর্ণ হবার জন্য ওয়াক্ফের মালের মধ্যে মুতাওয়াল্লীর কবজা শর্ত। কেননা যৌথ মালিকানাধীন বস্তুর মধ্যে বন্টনের পূর্বে হস্তগতকরণ অসম্ভব। সুতরাং বন্টনের পূর্বে উহার ওয়াক্ফ সহীহ নয়। তবে যা বন্টন অযোগ্য তাতে ওয়াক্ফ জায়েয আছে। অবশ্য কবরস্থান ও মসজিদ যৌথ মালিকানাধীন জমিনে হলে উহা ওয়াক্ফ করা কারো মতেই জায়েয নেই। কেননা যাতে যৌথ মালিকানা রয়েছে তার পুরো অংশ ওয়াক্ফ না করলে তা একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় না, অথচ ওয়াক্ফের মসজিদ ও কবরস্থান একমাত্র আল্লাহর জন্যই হওয়া উচিত।

ওয়াক্ফের জন্য চিরস্থায়ী হওয়া আবশ্যক ঃ

قوله حتى يجعل اخره الخ ঃ ইমাম মুহাম্মদ ও আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্ফ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তা চিরস্থায়ী না করে দেবে। কেননা আযাদকরণের ন্যায় ওয়াক্ফের জন্য স্থায়ী হওয়া শর্ত। এ জন্য নির্ধারিত সময়ের জন্য ওয়াক্ফ করা সহীহ হবে না। উদাহরণত এভাবে বলা যে, আমার এই এই সম্পদ অমুকের অনুকূলে তার বংশধরদের জন্য ওয়াক্ফ করলাম। ঘটনাক্রমে যদি তার বংশধর না থাকে, তাহলে উক্ত ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির উৎপন্ন ফসল গরিব-মিসকিনরা ভোগ করবে। কেননা গরিব মিসকিনরা তো কখনো নিঃশেষ হয়ে যাবে না। আর ওয়াক্ফ করার সময় নিঃস্ব-মিসকিনদের কথা উল্লেখ না করলেও ওয়াক্ফ বিশুদ্ধ হবে এবং তারা তা হতে বঞ্চিত হবে না।

وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَاسَمّٰى فِيْهِ جِهَةً تَنْقَطِعُ جَازَ وَصَارَ بَعْدَهَا لِلْفُقَرَاءِ وَاِنْ لَمْ يُسَمِّهِمْ وَيَصِحُّ وَقْفُ الْعِقَارِ وَلَايَجُوْزُ وَقْفُ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَقَالَ اَبُوْيُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا وَاَكَرَتِهَا وَهُمْ عَبِيْدُهُ جَازَ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَجُوْزُ حَبْسُ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ وَاِذَا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ وَلَاتَمْلِيْكُهُ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ مُشَاعًا عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَيَطْلُبُ الشَّرِيْكُ الْقِسْمَةَ فَتَصِحُّ مُقَاسَمَتُهُ وَالْوَاجِبُ اَنْ يَّبْتَدِئَ مِنْ اِرْتِفَاعِ الْوَقْفِ بِعِمَارَتِهِ شَرَطَ ذٰلِكَ الْوَاقِفُ اَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যদি ওয়াক্‌ফের মধ্যে এমন কোন দিকের উল্লেখ করে যার ফলে ওয়াক্‌ফ শেষ হয়ে যায়, ওয়াক্‌ফ জায়েয হবে। আর সে দিকটি নিঃশেষ হয়ে যাবার পর উক্ত ওয়াক্‌ফ দরিদ্রদের জন্য হয়ে যাবে; যদিও ওয়াক্‌ফের সময় তাদের নাম উল্লেখ না করে। জমিন ওয়াক্‌ফ করা জায়েয, আর যে জিনিস স্থানান্তরযোগ্য তা ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নেই। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি চাষযোগ্য জমিনকে তার বলদ ও শ্রমিকসহ ওয়াক্‌ফ করে আর সে শ্রমিকগণ তার গোলাম হয় তাহলে উক্ত ওয়াক্‌ফ জায়েয হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, ঘোড়া ও অস্ত্রশস্ত্র ওয়াক্‌ফ করা জায়েয। যখন ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন উহা বিক্রয় করা এবং কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়া জায়েয হবে না। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর নিকট যদি উহা যুগ্ম বস্তু হয় তাহলে জায়েয হবে। তখন অংশীদার তার অংশ বন্টন করবার দাবি করবে এবং উহা বন্টন করা বিশুদ্ধ হবে। ওয়াক্‌ফের লাভ দিয়ে প্রথমত উহার মেরামত ও সংস্কার করা আবশ্যক, ওয়াক্‌ফকারী উহার শর্ত করুক বা না করুক।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ওয়াক্‌ফের শেষ দিক যদি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে তার হুকুম ঃ

قَوْلُهُ تَنْقَطِعُ جَازَ الخ ঃ ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্‌ফের মধ্যে যদি এমন শেষ দিক উল্লেখ করে যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলেও ওয়াক্‌ফ সহীহ হবে। তবে উক্ত দিক নিঃশেষ হয়ে যাবার পর উহা গরিবের সম্পদ হিসেবে গণ্য হবে। মূলকথা, তাঁর মতে ওয়াক্‌ফের মধ্যে স্থায়ীত্ব শর্ত, স্থায়ীত্ব ও অবিচ্ছিন্ন দিকের উল্লেখ আবশ্যক নয়। কাজেই যাদের জন্য ওয়াক্‌ফ করা হয়েছে তাদের ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবার পর উহা গরিব মিসকিনদের হক হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তারাই উহা ভোগ করবে।

অস্থায়ী সম্পদকে স্থায়ী সম্পদের অধীনে ওয়াক্‌ফ করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ اِذَا وَقَفَ ضَيْعَةً بِبَقَرِهَا الخ ঃ অস্থায়ী বা স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ ওয়াক্‌ফ করা জায়েয নেই। তবে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, স্থানান্তরযোগ্য বস্তুকে স্থায়ী তথা স্থানান্তরযোগ্য নয় বস্তুর অধীনে ওয়াক্‌ফ করা বিশুদ্ধ হবে। যেমন– ভূমির অধীনে হাল চাষের গরুকে ওয়াক্‌ফ করা। এটা অস্থাবর হওয়া সত্ত্বেও জমিনের অধীনে হওয়াতে জায়েয হয়েছে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, যুদ্ধের ঘোড়া ও হাতিয়ার ওয়াক্‌ফ করা জায়েয আছে।

ওয়াক্‌ফের সম্পদ বিক্রয় করা বা অন্যকে মালিক বানানোর বিধান ঃ

قَوْلُهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ الخ ঃ সকল ইমাম এ কথার ওপর এর মত যে, ওয়াক্‌ফের সম্পদ ওয়াক্‌ফ বিশুদ্ধ হবার পর বিক্রয় করা বা অন্যকে মালিক বানানো জায়েয নেই। কেননা এ প্রসঙ্গে মহানবী (সঃ) ইরশাদ করেছেন—

تَصَدَّقَ بِاَصْلِهَا لَايُبَاعُ وَلَايُوْرَثُ وَلَايُوْهَبُ

অর্থাৎ মূল জমিনটি এমনভাবে সদকা তথা ওয়াক্ফ কর যেন উহা বিক্রয় করা না যায়, মিরাস সাব্যস্ত না হয় এবং উহা যেন হিবা করা না হয়।

ওয়াক্ফের সম্পদ মেরামতের হুকুম ঃ

قَوْلُهُ الْوَاجِبُ اَنْ يَّبْتَدِئَ الخ ঃ ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় হতে প্রথমেই উহার মেরামতের কাজ সম্পাদন করতে হবে। কেননা ওয়াক্ফকারীর একান্ত ইচ্ছা যে, ওয়াক্ফকৃত সম্পদের আয় দ্বারা যাকে ওয়াক্ফ করা হয়েছে সে উপকৃত হোক। কাজেই ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তি বিনষ্ট হয়ে গেলে ওয়াক্ফকারীর মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়ে যাবে। অতএব ওয়াক্ফকৃত সম্পদ আবাদযোগ্য রাখার প্রচেষ্টাকে সব কিছুর ওপর প্রাধান্য দিতে হবে। ওয়াক্ফকারী মেরামতের শর্ত না করলেও তা করতে হবে।

وَاِذَا وَقَفَ دَارًا عَلٰى سُكْنٰى وَلَدِهٖ فَالْعِمَارَةُ عَلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى فَاِنِ امْتَنَعَ مِنْ ذٰلِكَ اَوْ كَانَ فَقِيْرًا اٰجَرَهَا الْحَاكِمُ وَعَمَّرَهَا بِاُجْرَتِهَا فَاِذَا عُمِّرَتْ رَدَّهَا اِلٰى مَنْ لَهُ السُّكْنٰى وَمَا انْهَدَمَ مِنْ بِنَاءِ الْوَقْفِ وَاٰلَتِهٖ صَرَفَهُ الْحَاكِمُ فِىْ عِمَارَةِ الْوَقْفِ اِنِ احْتَاجَ اِلَيْهِ وَاِنِ اسْتَغْنٰى عَنْهُ اَمْسَكَهُ حَتّٰى يَحْتَاجَ اِلٰى عِمَارَتِهٖ فَيَصْرِفُهُ فِيْهَا وَلَا يَجُوْزُ اَنْ يَقْسِمَهُ بَيْنَ مُسْتَحِقِّى الْوَقْفِ وَاِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ غَلَّةَ الْوَقْفِ لِنَفْسِهٖ اَوْ جَعَلَ الْوِلَايَةَ اِلَيْهِ جَازَ عِنْدَ اَبِىْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَ قَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى لَا يَجُوْزُ-

---

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি কোন ব্যক্তি স্বীয় সন্তানের বসবাসের জন্য কোন ঘর ওয়াক্ফ করে, তবে সে সন্তানের ওপর উহার মেরামত করা আবশ্যক হবে যে উহাতে বসবাস করে। যদি সে উহার মেরামত হতে বিরত থাকে অথবা দরিদ্র হয়ে পড়ে তখন বিচারক উহা ভাড়া দিয়ে ভাড়ার টাকা দ্বারা উহা মেরামত করবে। এরপর যখন মেরামত হয়ে যাবে, তখন যারা তাতে বসবাস করে তাদের নিকট পুনরায় ফিরিয়ে দেবে। আর যদি ওয়াক্ফের স্থানের কোন দেয়াল ধ্বংস হয়ে যায় অথবা উহার কোন যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়, হাকিম উহাকে ওয়াক্ফের মেরামতের কাজে ব্যয় করবে যদি মেরামতের প্রয়োজন হয়, আর প্রয়োজন না হলে উহাকে জমা রাখবে মেরামতের প্রয়োজন হওয়া পর্যন্ত, তারপর মেরামতের খরচ করবে; কিন্তু সেগুলোকে ওয়াক্ফের হক্দারদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া জায়েয নেই। আর যদি ওয়াক্ফকারী ওয়াক্ফকৃত জমির উৎপন্ন ফসল নিজের জন্য ওয়াক্ফ করে অথবা সে সম্পদের অভিভাকত্ব নিজের জন্য নির্ধারণ করে, তাহলে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয হবে, আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, তা জায়েয হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

নিজ সন্তানদের জন্য ওয়াক্ফ করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ اِذَا وَقَفَ دَارًا الخ ঃ নিজ সন্তানদের বসবাসের জন্য ঘর ওয়াক্ফ করলে উহার মেরামত করা তাদের ওপরই আবশ্যক হবে যারা তাতে বসবাস করে। যদি তারা ঘরটি মেরামত না করে কিংবা গরিব হয়ে যায়, তাহলে বিচারক ঘরটি ভাড়া দিয়ে উক্ত ভাড়ার টাকা দিয়ে ঘরটি মেরামত করে দেবেন। কেননা তিনি যদি ভাড়া না দিয়ে মেরামত না করান তাহলে ঘরটি বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং বসবাসের অনুপযোগী হয়ে পড়বে। আর ওয়াক্ফকৃত ঘর ভেঙ্গে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে ভগ্নাংশগুলো দ্বারা মেরামত করবে। আর যদি মেরামতের প্রয়েজন না হয়, তবে তা হেফাজত করবে কিংবা বিক্রয় করে পরবর্তীতে মেরামতের প্রয়োজন দেখা দিলে মেরামত করবে, তবে কখনো তা ওয়াক্ফের হকদারদের মধ্যে বন্টন করতে পারবে না।

ওয়াকফকারী ওয়াকফের জমিনের উৎপন্ন ফসল ও উহার অভিভাবকত্ব নিজের জন্য নির্ধারণ করলে তার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَإِذَا جَعَلَ الْوَاقِفُ الخ ঃ ওয়াকফকৃত সম্পদের উৎপন্ন ফসল ওয়াকফকারী নিজের জন্য ব্যয় করা ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে জায়েয। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে যে, রাসূল (সাঃ) নিজেই ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির ফসল ভোগ করতেন। কাজেই ওয়াকফকারী নিজেই ভোগ করার শর্ত আরোপ করলে তা জায়েয হবে।

কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, এরূপ ওয়াকফ করা জায়েয হবে না। কেননা ওয়াক্ফ করার কারণে ওয়াকফকারীর অধিকার হতে সে সম্পদ চলে গেছে এবং সে ছওয়াবের ভাগী হয়েছে। এ অবস্থায় সে সম্পত্তির উৎপন্ন ফসল নিজে ভোগ করার অর্থ সম্পত্তির ওপর মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকা, এটা ওয়াক্ফের পরিপন্থী, তাই এরূপ করা জায়েয হবে না। তবে ওয়াক্ফকৃত সম্পত্তির অভিভাবকত্ব তথা রক্ষণাবেক্ষণ করা ওয়াক্ফকারীর জন্য জায়েয। এ কথার ওপর সকল ইমাম ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

وَإِذَا بَنَى مَسْجِدًا لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ حَتَّى يُفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ بِطَرِيْقِهِ وَيَأْذَنَ لِلنَّاسِ بِالصَّلٰوةِ فَإِذَا صَلّٰى فِيْهِ وَاحِدٌ زَالَ مِلْكُهُ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَزُوْلُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِقَوْلِهِ جَعَلْتُ مَسْجِدًا وَمَنْ بَنٰى سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ اَوْ خَانًا يَسْكُنُهُ بَنُو السَّبِيْلِ اَوْ رِبَاطًا اَوْ جَعَلَ اَرْضَهُ مَقْبَرَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْ ذٰلِكَ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يَحْكُمَ بِهِ الْحَاكِمُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَزُوْلُ مِلْكُهُ بِالْقَوْلِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِذَا اسْتَسْقَى النَّاسُ مِنَ السِّقَايَةِ وَسَكَنُوا الْخَانَ وَالرِّبَاطَ وَ دَفَنُوْا فِى الْمَقْبَرَةِ زَالَ الْمِلْكُ -

---

সরল অনুবাদ ঃ আর যদি কেউ কোন মসজিদ নির্মাণ করে, তবে ততক্ষণ পর্যন্ত উহা হতে তার মালিকানা দূরীভূত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে উক্ত মসজিদ রাস্তাসহ তার মালিকানা হতে পৃথক করে লোকদেরকে উহাতে সালাত পড়ার অনুমতি না দেয়। অতঃপর যখন উহাতে একজন লোকও সালাত পড়বে তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, মালিকানা দূরীভূত হয়ে যাবে। আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, তার এ কথা বলার দ্বারা মালিকানা বিদূরীত হয়ে যাবে যে, আমি উহাকে মসজিদ বানিয়েছি। আর যদি কেউ মুসলমানদের জন্য পানির ফোয়ারা বানাল অথবা এমন ঘর নির্মাণ করল যাতে মুসাফিরগণ বসবাস করে, অথবা সীমান্ত ফাঁড়ি নির্মাণ করল কিংবা স্বীয় জমিকে কবরস্থান বানাল, তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, হাকিমের হুকুম ছাড়া তার মালিকানা দূরীভূত হবে না; কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, তার (ওয়াক্ফের) কথা বলার সাথে সাথে মালিকানা চলে যাবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ) বলেন, যখন মানুষ কুয়ার পানি পান করবে, মুসাফির খানায় বসবাস করবে, সে ঘরে থেকে সীমানা প্রহরা দেবে এবং কবরস্থানে লাশ দাফন করবে, তখন মালিকানা দূর হয়ে যাবে। (অন্যথা মালিকানা থেকে যাবে।)

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মসজিদ নির্মাণ করে ওয়াকফ করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ حَتّٰى يُفْرِزَهُ عَنْ مِلْكِهِ الخ ঃ মসজিদ নির্মাণের পর তার ওয়াক্ফ কার্যকরী হবার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতান্তর পরিলক্ষিত হয়—

ইমাম আবূ হানীফা ও মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্ফের মধ্যে কবজা করানো আবশ্যক আর মসজিদ তো ওয়াক্ফ করবে একমাত্র আল্লাহর নামে, তাই এখানে প্রকৃত কবজা না পাওয়া যাবার কারণে মসজিদ নির্মাণ করে তার রাস্তাসহ তার

মালিকানা হতে পৃথক করে মানুষদেরকে সালাত পড়ার অনুমতি দেয়া ব্যতীত মালিকানা বিদূরীত হবে না এবং ওয়াক্‌ফও কার্যকর হবে না। আর যখনই মানুষ সালাত পড়া শুরু করবে তখন কবজা সাব্যস্ত হয়ে ওয়াক্‌ফ কার্যকর হবে। পক্ষান্তরে ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ) বলেন, যে মসজিদ নির্মাণ করে বলে যে, আমি আল্লাহ জন্য মসজিদ নির্মাণ করেছি, তাহলেই ওয়াক্‌ফ কার্যকর হয়ে যাবে।

পানির কূপ, মুসাফিরখানা, সীমান্ত ফাঁড়ি ও কবরস্থান ওয়াক্‌ফ করার বিধান ঃ

قَوْلُهُ وَمَنْ بَنَى سِقَايَةً لِلْمُسْلِمِيْنَ الخ ঃ কেউ যদি পানির কূপ, মুসাফিরের বিশ্রামাগার, সীমান্ত ফাঁড়ি এবং কবরস্থান ওয়াক্‌ফ করে, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর মতে, হাকিমের হুকুম ব্যতীত তার মালিকানা বিদূরীত হবে না এবং ওয়াক্‌ফও কার্যকর হবে না। কেননা এগুলো দ্বারা মালিক উপকারিতা বা লাভবান হতে পারে, তাই যে কোন সময় সে ওয়াক্‌ফ অকার্যকর করতে পারে। পক্ষান্তরে মসজিদ হতে কোন উপকারতি অর্জন করতে পারে না বলেই হাকিমের হুকুমের প্রয়োজন হয় না।

আর ইমাম আবূ ইউসুফ (রহঃ)-এর মতে, মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারাই মালিকানা বিদূরীত হয়ে ওয়াক্‌ফ কার্যকর হবে।

পক্ষান্তরে ইমাম মুহাম্মদ (রহঃ)-এর মতে, ওয়াক্‌ফের মধ্যে কবজা শর্ত, তাই কূপ হতে লোকেরা পানি পান করলে মুসাফিরখানায় মুসাফির এবং সীমান্ত চৌকিতে পাহারাদার অবস্থান করলে এবং কবরস্থানে লাশ দাফন করলেই মালিকানা বিদূরীত হয়ে ওয়াক্‌ফ কার্যকর হয়ে যাবে। অন্যথা ওয়াক্‌ফ কার্যকর হবে না।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। ওয়াক্‌ফ (وَقْف) -এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

২। وَقْف কাকে বলে ? وَقْف শব্দটির বিশ্লেষণ কর।

৩। ওয়াক্‌ফ কখন কার্যকর হয়? ইমামদের মতান্তরসহ লিখ।

৪। وَقْف কখন রহিত করা যায় এবং কখন জায়েয নয় ? বর্ণনা কর।

৫। কোন্ কোন্ বস্তু ওয়াক্‌ফ করা জায়েয? বিশদভাবে বর্ণনা কর।

৬। কোন্ কোন বস্ত ওয়াক্‌ফ করা বৈধ নয়? আলোচনা কর।

৭। وَقْف দ্বারা ওয়াক্‌ফাকারীর মালিকানা স্বত্ব লোপ পায় কি না ?

৮। স্থানান্তরযোগ্য বস্তুকে স্থানান্তরযোগ্য নয় এমন বস্তুর সাথে ওয়াক্‌ফ জায়েয কি না ?

৯। مُشْتَرِك বা যুগ্ম বস্তুর মধ্যে ওয়াক্‌ফের হুকুম কি?

১০। কোন ঘর সন্তানের বসবাসের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে তার হুকুম কি ?

১১। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির পুরাতন দেয়াল ও যন্ত্রপাতির কি হুকুম ?

১২। যদি কোন ব্যক্তি নিজ জমিনে মসজিদ নির্মাণ করে তবে কি অবস্থায় তার মালিকানা রহিত হবে ?

১৩। ওয়াকফকৃত সম্পত্তির ফসল ওয়াক্‌ফকারী নিজের জন্য ওয়াক্‌ফ করলে অথবা অভিভাবকের দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করলে তার বিধান কি ?

১৪। ওয়াক্‌ফকৃত বস্তু বিক্রয় করা অথবা কাউকে মালিক বানিয়ে দেয়ার হুকুম কি ?

১৫। ওয়াক্‌ফকৃত সম্পত্তির আয় কোন খাতে ব্যায় করবে।

১৬। যদি কোন ব্যক্তি মুসলমানদের পানি পানের জন্য কূপ খনন করে, অথবা মুসাফিরের বসবাসের জন্য ঘর নির্মাণ করে, অথবা সীমান্ত প্রহরা ঘাঁটি বানায় কিংবা স্বীয় জায়গায় কবরস্থান করে তবে কি অবস্থায় তার মালিকানা বিলুপ্ত হবে? বর্ণনা কর।

كِتَابُ الْغَصَبِ

وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا مِمَّا لَهُ مِثْلٌ فَهَلَكَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ مِثْلِهِ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا مِثْلَ لَهُ فَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ وَعَلَى الْغَاصِبِ رَدُّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ فَإِنِ ادَّعَى هَلَاكَهَا حَبَسَهُ الْحَاكِمُ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّهَا لَوْ كَانَتْ بَاقِيَةً لَأَظْهَرَهَا ثُمَّ قَضَى عَلَيْهِ بِبَدَلِهَا وَالْغَصَبُ فِيمَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ وَإِذَا غَصَبَ عِقَارًا فَهَلَكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَضْمَنْهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالَى وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَضْمَنُهُ وَمَا نَقَصَ مِنْهُ بِفِعْلِهِ أَوْ سُكْنَاهُ ضَمِنَهُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا وَإِذَا هَلَكَ الْمَغْصُوبُ فِي يَدِ الْغَاصِبِ بِفِعْلِهِ أَوْ بِغَيْرِ فِعْلِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُهُ وَإِنْ نَقَصَ فِي يَدِهِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ النُّقْصَانِ وَمَنْ ذَبَحَ شَاةَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَمَالِكُهَا بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ قِيمَتَهَا وَسَلَّمَهَا إِلَيْهِ وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَهُ نُقْصَانَهَا وَمَنْ خَرَقَ ثَوْبَ غَيْرِهِ خَرْقًا يَسِيرًا ضَمِنَ نُقْصَانَهُ وَإِنْ خَرَقَ خَرْقًا كَثِيرًا يُبْطِلُ عَامَّةَ مَنْفَعَتِهِ فَلِمَالِكِهِ أَنْ يُضَمِّنَهُ جَمِيعَ قِيمَتِهِ وَإِذَا تَغَيَّرَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ بِفِعْلِ الْغَاصِبِ حَتَّى زَالَ اسْمُهَا وَأَعْظَمُ مَنَافِعِهَا زَالَ مِلْكُ الْمَغْصُوبِ مِنْهُ عَنْهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ وَضَمِنَهَا وَلَا يَحِلُّ لَهُ الْاِنْتِفَاعُ بِهَا حَتَّى يُؤَدِّيَ بَدَلَهَا ـ

অপহরণ পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যে ব্যক্তি এমন দ্রব্য অপহরণ করে যার অনুরূপ আছে এবং সেটা তার হাতে নাশ হয়ে যায়, তবে তাকে অনুরূপ দ্রব্য খেসারত দিতে হবে। কিন্তু যদি সেটা এমন হয় যার অনুরূপ নেই, তবে তার মূল্য আবশ্যক হবে। অপহারকের ওপর হুবহু অপহৃত দ্রব্য ফিরিয়ে দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু যদি সে তা বিনাশ হয়ে যাওয়ার দাবি করে, তবে হাকিম তাকে গ্রেফতার করবে এবং তার নিকট দ্রব্য বিদ্যমান থাকলে নির্ঘাত সে বের করে দিত বলে বদ্ধমূল ধারণা না হওয়া পর্যন্ত (তাকে আটক করে রাখবে)। অতঃপর দ্রব্যের বিনিময় (আদায়ের) জন্য তার প্রতি রায় প্রদান করবে। অপহরণ কথাটি শুধুমাত্র অস্থাবর সম্পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি কোন ব্যক্তি ভূমি জবর দখল করার পর তার হাতে সেটা নাশ হয়ে যায়, তাহলে শায়খাইন (রঃ)-এর মতে, দখলদার দায়ী হবে না (অর্থাৎ তার ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না)। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, দায়ী হবে। কিন্তু তার বসবাস কিংবা ব্যবহারের দরুন জমির যা ক্ষয়-ক্ষতি হবে সর্বসম্মতিক্রমে সে তার জন্য দায়ী হবে। যদি গসবকৃত দ্রব্য গাসিবের নিকট তার হস্তক্ষেপে কিংবা আপনা-আপনি বিনাশ হয়ে যায়, তবে তার ওপর এর (পুরো) ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আর যদি ক্রটি গ্রস্ত হয়, তাহলে ক্রটি পরিমাণ খেসারত বর্তাবে। যদি কেউ অন্যের ছাগল জবাই করে ফেলে, তবে মালিকের ইচ্ছা– যদি সে চায় ছাগল তাকে দিয়ে মূল্য নিয়ে নেবে অথবা (ছাগল রেখে দিয়ে) ক্ষতিপূরণ আদায় করবে। যে ব্যক্তি অন্যের কাপড় সামান্য ছিঁড়ে ফেলল, সে এ ক্রটির ক্ষতিপূরণ দেবে। আর যদি এতটা ছিঁড়ে যে, কাপড়ের প্রধান ব্যবহারিক দিকটিই বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে, তাহলে মালিক পুরো দাম আদায় করে নিতে পারবে। যদি গাসিবের হস্তক্ষেপে গসবকৃত দ্রব্য বিকৃত হয়ে পড়ে এমনকি তার নাম ও প্রধান ব্যবহারিক দিকসহ বিলীন হয়ে যায় তবে তা থেকে মাগসূবমিনহুর (মালিক) মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে গাসিব তার মালিক হয়ে যাবে এবং (পুরো) ক্ষতিপূরণ বহন করবে। তবে ক্ষতিপূরণ আদায় না করা পর্যন্ত তার জন্য সেটা ব্যবহার করা হালাল হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় প্রয়োজনীয় পরিভাষা ঃ غَاصِب – ছিনতাইকারী, অপহারক; مَغْصُوْب – অপহৃত; مَغْصُوْب مِنْهُ – যে ব্যক্তির মাল ছিনতাই করা হয়েছে।

غَصَب -এর সংজ্ঞা ঃ اَلْغَصَبُ শব্দের আভিধানিক অর্থ– জোরপূর্বক নিয়ে নেয়া, অপহরণ করা। শরীয়তের পরিভাষায় গসব হল– اِزَالَةُ يَدٍ مُحِقَّةٍ بِاِثْبَاتِ يَدٍ مُبْطِلَةٍ فِى مَالٍ مُتَقَوَّمٍ مُحْتَرَمٍ قَابِلٍ لِلنَّقْلِ بِغَيْرِ اِذْنِ مَالِكِهٖ لَايَخْفِيَهٗ অর্থাৎ কারো হালাল স্থাবর সম্পদে তার অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ্যে তারই ন্যায্য দখল ছিন্ন করে অন্যায় দখল প্রতিষ্ঠা করা। — (তানবীর)

বলা বাহুল্য, জোরপূর্বক অন্যায়ভাবে কারো কোন কিছু ছিনিয়ে নেয়া বড় শক্ত গুনাহ। কুরআন-হাদীসে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে তিরস্কার করা হয়েছে। কেউ কারো জিনিস সম্মতি ব্যতীত নিলে বা ব্যবহার করলে সে গাসেব তথা অপহরণকারী গণ্য হবে। এজন্য তাকে পরকালে শক্ত আযাব ভোগ করতে হবে এবং ইহকালেও শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কুরআন পাকে ইরশাদ হয়েছে "যারা অন্যায়ভাবে বিনা কারণে এতিমের মাল ভক্ষণ করে তারা যেন পেটের ভিতরে আগুন পুরিয়ে নিল।" ইসলামী শরীয়ত সামাজিক শৃঙ্খলা, সংহতি ও শান্তি রক্ষার জন্য অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় গসব বা অপহরণেরও বিস্তারিত বিধান পেশ করেছে। মাননীয় ফিকাহবিদগণ কুরআন পাকের وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَّاْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ غَصْبًا এ আয়াতসহ বেশকিছু হাদীসের আলোকে অপহরণের যাবতীয় মাসায়েল উদ্ভাবনের প্রয়াস পেয়েছেন।

رَدُّ عَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ অপহৃত দ্রব্যের দু'অবস্থা– (১) হয়তো গাসিবের নিকট তা হুবহু বিদ্যমান রয়েছে, (২) না হয় হারিয়ে বা ধ্বংস হয়ে গেছে। প্রথম অবস্থায় গাসিবকে হুবহু দ্রব্য ফেরত দিতে হবে, আর দ্বিতীয় অবস্থায় দ্রব্যটি যদি সাদৃস্যপূর্ণ হয় যেমন– চাল, গম, ডাল, ডিম, দুধ প্রভৃতি কায়ল বা ওজনভুক্ত কিংবা স্বল্পপার্থক্য বিশিষ্ট দ্রব্যসামগ্রী, তবে অনুরূপ দ্রব্য ব্যবস্থা করে দিতে হবে। কারণ কুরআন পাকের ঘোষণা হল– فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا بِمِثْلِ مَااعْتَدٰى কিন্তু অনুরূপীয় না হলে কিংবা অনুরূপীয় হওয়া সত্ত্বেও তা মার্কেট-শূন্য হলে মূল্য প্রদান করাই একমাত্র বিকল্প। ইমাম সাহেবের মতে বিচারকের রায় ঘোষণার দিন মার্কেটে দ্রব্যের যে মূল্য থাকবে তাই ধর্তব্য হবে। কিন্তু ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ)-এর মতানুসারে অপহরণ দিবসে যে মূল্য ছিল সে মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে। আর ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, যে দিন বাজারশূন্য হল সেদিনের হিসাব করতে হবে।

فِيْمَا يُنْقَلُ الخ -এর আলোচনা ঃ শায়খাইনের নিকট শুধুমাত্র স্থানান্তরযোগ্য জিনিসেই غَصَب সাব্যস্ত হয়। কাজেই কোন ব্যক্তি যদি কোন জমিন অবৈধ দখল করে, তবে তা غَصَب -এর অন্তর্ভুক্ত হবে না। কেননা এটা স্থানান্তরযোগ্য নয়। এবং যদি অবৈধ দখলের পর কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তাতে শায়খাইনের নিকট জরিমানা আসবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদ (রঃ) বলেন, তার ওপর ضِمَان বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিব হবে। কেননা তাঁর নিকট غَيْر مَنْقُوْلَه জিনিসের মধ্যেও غَصَب সাব্যস্ত হয়। এবং ইমাম যুফার, ইমাম আহমদ, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক (রঃ)ও এ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। 'আইনী গন্থের প্রণেতাসহ অনেক আলিম ইমাম মুহাম্মদ (রঃ)-এর কওলের ওপর ফতোয়া বলে মত ব্যক্ত করেছেন।

وَهٰذَا كَمَنْ غَصَبَ شَاةً فَذَبَحَهَا وَشَوَّاهَا اَوْ طَبَخَهَا اَوْ غَصَبَ حِنْطَةً فَطَحَنَهَا اَوْ حَدِيْدًا فَاتَّخَذَهُ سَيْفًا اَوْ صُفْرًا فَعَمِلَهُ اٰنِيَةً وَاِنْ غَصَبَ فِضَّةً اَوْ ذَهَبًا فَضَرَبَهَا دَرَاهِمَ اَوْ دَنَانِيْرَ اَوْ اٰنِيَةً لَمْ يَزُلْ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَمَنْ غَصَبَ سَاجَةً فَبَنٰى عَلَيْهَا زَالَ مِلْكُ مَالِكِهَا عَنْهَا وَلَزِمَ الْغَاصِبَ قِيْمَتُهَا وَمَنْ غَصَبَ اَرْضًا فَغَرَسَ فِيْهَا اَوْ بَنٰى قِيْلَ لَهُ اِقْلَعِ الْغَرْسَ وَالْبِنَاءَ وَ رُدَّهَا اِلٰى مَالِكِهَا فَارِغَةً فَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ تَنْقُصُ بِقَلْعِ ذٰلِكَ فَلِلْمَالِكِ اَنْ يُضْمَنَ لَهُ قِيْمَةَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ مَقْلُوْعًا وَمَنْ غَصَبَ ثَوْبًا فَصَبَغَهُ اَحْمَرَ اَوْ سَوِيْقًا فَلَتَّهُ بِسَمْنٍ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ ضَمَّنَهُ قِيْمَةَ ثَوْبٍ اَبْيَضَ وَمِثْلَ السَّوِيْقِ وَسَلَّمَهُ لِلْغَاصِبِ وَاِنْ شَاءَ اَخَذَهُمَا وَضَمِنَ مَازَادَ الصَّبْغُ وَالسَّمْنُ فِيْهِمَا وَمَنْ غَصَبَ عَيْنًا فَغَيَّبَهَا فَضَمَّنَهُ الْمَالِكُ قِيْمَتَهَا وَمَلَكَهَا الْغَاصِبُ بِالْقِيْمَةِ وَالْقَوْلُ فِى الْقِيْمَةِ قَوْلُ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِيْنِهِ اِلَّا اَنْ يُّقِيْمَ الْمَالِكُ الْبَيِّنَةَ بِاَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَاِذَا ظَهَرَتِ الْعَيْنُ وَقِيْمَتُهَا اَكْثَرُ مِمَّا ضَمِنَ وَقَدْ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْمَالِكِ اَوْ بِبَيِّنَةٍ اَقَامَهَا اَوْ بِنُكُوْلِ الْغَاصِبِ عَنِ الْيَمِيْنِ فَلَا خِيَارَ لِلْمَالِكِ وَهُوَ لِلْغَاصِبِ وَاِنْ كَانَ ضَمِنَهَا بِقَوْلِ الْغَاصِبِ مَعَ يَمِيْنِهِ فَالْمَالِكُ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَمْضَى الضِّمَانَ وَاِنْ شَاءَ اَخَذَ الْعَيْنَ وَ رَدَّ الْعِوَضَ۔

সরল অনুবাদ ঃ এ মাসআলার উদাহরণ হল, যেমন এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বকরি হরণ করে জবাই করার পর ভুনা বা রান্না করে নিল, অথবা গম ছিনিয়ে নিয়ে পিষে ফেলল, অথবা লোহা নিয়ে তরবারি বানিয়ে নিল, কিংবা তাম্র নিয়ে বাসন তৈরি করে নিল। যদি কোন ব্যক্তি রৌপ্য বা স্বর্ণ অপহরণ পূর্বক তা গালিয়ে ধাতব মুদ্রা বা আশ্রাফী অথবা থালা-বাটি তৈরি করে নেয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, তা থেকে মালিকের মালিকানা লুপ্ত হবে না। পক্ষান্তরে কেউ কড়ি-কাঠ গসব করে তাতে দালান নির্মাণ করলে তা থেকে মালিকের মালিকানা বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং গাসিবের ওপর এর মূল্য পরিশোধ করা আবশ্যক হবে। যে অপরের জমি দখল পূর্বক তাতে বৃক্ষ রোপণ কিংবা গৃহ নির্মাণ করল তাকে বলা হবে তুমি বৃক্ষাদি ও ঘর সমূলে তুলে নাও এবং মালিককে খালি ভূমি ফিরিয়ে দাও। যদি উপড়ানোর কারণে জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে মালিক গাসিবকে বৃক্ষ ও গৃহের উৎপাটিত অবস্থার মূল্য দিয়ে (সেগুলোর মালিক হয়ে যেতে পারে)। যদি কোন ব্যক্তি সাদা কাপড় হরণ পূর্বক লাল রং দ্বারা রঙ্গিয়ে নেয়, কিংবা ছাতু এনে ঘি দ্বারা মেখে নেয়, তবে মালিকের ইচ্ছা– সে গাসিবকে এগুলো দিয়ে সাদা কাপড়ের মূল্য এবং সমপরিমাণ ছাতু আদায় করে নেবে অথবা নিজে এগুলো নিয়ে নেবে এবং বর্ধিত রং ও ঘি -এর দাম তাকে দিয়ে দেবে। কোন ব্যক্তি দ্রব্য অপহরণ পূর্বক তা গায়েব করে ফেলল, অতঃপর মালিক জরিমানামূলক তার থেকে দ্রব্যের মূল্য আদায় করে নিল, তবে গাসিব মূল্য প্রদানের কারণে দ্রব্যের মালিক হয়ে যাবে। আর মূল্যের ব্যাপারে গাসিব হলফ করে যা বলবে তাই ধর্তব্য হবে। অবশ্য মালিক যদি মূল্য আরো অধিক বলে প্রমাণ দেয় (তবে তার কথা গ্রহণ করা হবে)। অতঃপর যদি দ্রব্য প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং তার মূল্য প্রদত্ত মূল্যের চেয়ে বেশি হয় অথচ গাসিব মালিকের উক্তি কিংবা তার পেশকৃত দলিল অথবা নিজে হলফে সম্মত না হওয়ার প্রেক্ষিতে মূল্য প্রদান করেছিল, তাহলে মালিকের কোনরূপ স্বাধীনতা থাকবে না; দ্রব্য গাসিবের থেকে যাবে। আর যদি গাসিব নিজের শপথমূলক উক্তির ভিত্তিতে মূল্য প্রদান করে থাকে, তবে মালিক বিবেচনার সুযোগ পাবে– ইচ্ছা করলে পূর্ব জরিমানা অপরিবর্তিত রাখবে, নতুবা বিনিময় ফেরত দিয়ে দ্রব্য নিয়ে আসবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَصَاحِبُهٗ بِالْخِيَارِ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা উভয় পক্ষ হতে উভয়ের হকের رِعَايَتِ হয়ে থাকে। আর যেহেতু কাপড় ওয়ালার কথাই মূল, এ জন্যই তার স্বাধীনতা থাকবে। কেননা তার মাল হল مَتْبُوْع এবং غَاصِب -এর কথা হল تَابِع (অনুগামী)।

وَالْقَوْلُ فِى الْقِيْمَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ গাসিব দ্রব্য উধাও করে ফেলার পর যখন মূল্য প্রদানের কথা স্থির হল, তখন তার ও মালিকের মধ্যে যদি মূল্যের পরিমাণ নিয়ে মতানৈক্য দেখা দেয় এবং মালিক নিজ দাবির স্বপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ করতে ব্যর্থ হয় তবে গাসিবের উক্তি অনুযায়ীই মূল্য স্থিরীকৃত হবে। কেননা সে হল মুনকির বা বিবাদী। বাদীর নিকট উপযুক্ত প্রমাণ না থাকা অবস্থায় বিবাদী শপথ করে যা বলে তাই অগ্রাধিকার পায়।

وَوَلَدُ الْمَغْصُوْبَةِ وَنَمَاؤُهَا وَثَمَرَةُ الْبُسْتَانِ الْمَغْصُوْبِ اَمَانَةٌ فِىْ يَدِ الْغَاصِبِ اِنْ هَلَكَ فِىْ يَدِهٖ فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ اِلَّا اَنْ يَّتَعَدّٰى فِيْهَا اَوْ يَطْلُبَهَا مَالِكُهَا فَيَمْنَعُهَا اِيَّاهُ وَمَا نَقَصَتِ الْجَارِيَةُ بِالْوِلَادَةِ فَهُوَ فِىْ ضِمَانِ الْغَاصِبِ فَاِنْ كَانَ فِىْ قِيْمَةِ الْوَلَدِ وَفَاءٌ بِهٖ جَبَرَ النُّقْصَانَ بِالْوَلَدِ وَسَقَطَ ضِمَانُهٗ عَنِ الْغَاصِبِ وَلَا يَضْمَنُ الْغَاصِبُ مَنَافِعَ مَا غَصَبَهٗ اِلَّا اَنْ يَّنْقُصَ بِاسْتِعْمَالِهٖ فَيَغْرِمُ النُّقْصَانَ وَاِذَا اِسْتَهْلَكَ الْمُسْلِمُ خَمْرَ الذِّمِّيِّ اَوْ خِنْزِيْرَهٗ ضَمِنَ قِيْمَتَهُمَا وَاِنْ اِسْتَهْلَكَهُمَا الْمُسْلِمُ لِمُسْلِمٍ لَمْ يَضْمَنْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ অপহৃত প্রাণীর বাচ্চা ও তার (অন্যান্য) আয় এবং জবর দখলী বাগানের ফল গাসিবের হাতে আমানত গণ্য হবে; নাশ হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। কিন্তু যদি অনিয়ম করে কিংবা মালিক নিতে চেয়েছিল তাকে হস্তান্তর না করে (রেখে দেয়ার পর নাশ হয়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে)। সন্তান প্রসবের কারণে অপহৃতা দাসীর যে ক্ষতি হবে তা গাসিবকে বহন করতে হবে। এ স্থলে সন্তানের মূল্য যদি সম্পূরক হয়, তবে তা দিয়েই ক্ষতিপূরণ করা হবে এবং গাসিব ভর্তুকি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। গাসিব অপহৃত দ্রব্য (থেকে তার লুটে নেয়া) মুনাফার জন্য (আইনত) দায়ী হয় না। তবে তার ব্যবহারে দ্রব্য ক্রুটিগ্রস্ত হলে সে ক্রুটির ক্ষতিপূরণ দেবে। যদি মুসলমান অমুসলিম নাগরিকের মদ কিংবা তার শূকর নষ্ট করে দেয়, তবে সে তার মূল্য ক্ষতিপূরণ দেবে। কিন্তু এক মুসলমান অন্য মুসলমানের এসব নষ্ট করলে ক্ষতিপূরণ দেবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

فَلَا ضِمَانَ عَلَيْهِ -এর আলোচনা ঃ যেহেতু غَصَب -এর মাধ্যমে আমাদের নিকট ইচ্ছাকৃতভাবে প্রকৃত মালিকের ক্ষমতাকে দূরীভূত করা হয় এবং অসত্যের ক্ষমতাকে সাব্যস্ত করা হয় ضِمْنِى ভাবে। এবং উল্লিখিত সুরতে প্রকৃত মালিকের ক্ষমতা দূরীভূত হওয়া পাওয়া যায়নি। এবং সে বৃদ্ধির ওপর মালিকের পূর্ণাঙ্গ হাত নেই যে, ছিনতাইকারী তাকে দূর করবে এবং ছিনতাইকারীর হাতে সন্তান হওয়ার দুটি সুরত রয়েছে। (১) যদি ছিনতাইয়ের পর ছিনতাইকারীর নিকট জন্ম হয়, তবে তা আমানত। কিন্তু ছিনতাইকারী তাতে تَعَدِّى করবে বা মালিককে তা হতে নিষেধ করবে। চাই বাদীকে গর্ভবতী ছিনতাই করুক বা অগর্ভবতী ছিনতাই করুক এবং সন্তান আমানত হবে। কেননা حَمْل-এর কোন মূল্য হয় না।

(২) বাঁদিকে সন্তানসহ ছিনতাই করেছে। সে সুরতে ছিনতাইকারী সন্তানের ضَامِن হবে। কেননা সন্তানের ওপর আয়ত্ত করা ضِمَان বা ক্ষতিপূরণ ওয়াজিবকারী হয়েছে।

وَمَا نَقَصَتِ الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ গসবকৃত প্রাণী গাসিবের নিকট বিদ্যমান থাকাকালীন সন্তান প্রসব করলে তাতে তার যে মূল্য ঘাটতি দেখা দেবে তা যদি সন্তান দ্বারা পূরণ হয়ে আসে, তবে গাসিবকে পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ

দিতে হবে না। মাকে সন্তানসহ ফেরত দিলেই যথেষ্ট হবে। যেমন দরুন, অপহৃত বকরির মূল্য যদি বাচ্চা প্রসবের কারণে ৫০০ টাকা থেকে নেমে ৪০০ টাকায় উপনীত হয়, আর পৃথকভাবে বাচ্চার দাম হয় ১০০ টাকা, তবে মালিককে বাচ্চাসহ ছাগী ফেরত দিলেই চলবে। কিন্তু যদি বাচ্চার দাম হয় ৫০ টাকা, তবে তাকে অতিরিক্ত ৫০ টাকা দিতে হবে। আর বাচ্চা মরে গিয়ে থাকলে ছাগলসহ আরো ১০০ টাকা বুঝাতে হবে।

مَنَافِعَ مَا غَصَبَهُ الغ -এর আলোচনা ঃ আহনাফের নিকট ছিনতাইকারী ছিনতাইকৃত বস্তু مَنَافِع-এর ضَامِن হয় না। তাই সে তার দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করুক বা না করুক। তবে শাফেরী ও হাম্বলীদের নিকট مَنَافِع-এর পরিবর্তে أَجْر مِثْل ওয়াজিব হয়। আর মালেকীদের নিকট ফায়দা গ্রহণ করার সুরতে أَجْر مِثْل ওয়াজিব হয় এবং تَعْطِيل তথা ফায়দা গ্রহণ না করার সুরতে কিছুই ওয়াজিব হবে না। তিনি বলেন, مَنَافِع হল مَال مُتَقَوِّم যেভাবে عُقُود-এর মাধ্যমে أَعْيَان-এর مَضْمُوْن হয়, এ ভাবে مَنَافِع টা مَضْمُوْن হয়। আহনাফের দলিল হল হযরত ওমর (রাঃ) ও হযরত আলী (রাঃ) وَلَد مَغْرُوْر-এর মূল্য এবং বাচ্চার স্বাধীনতা এবং ভূমিসহ বাঁদিকে ফেরত দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছিলেন এবং বাঁদির مَنَافِع-এর প্রতিদান দেয়ার নির্দেশ প্রদান করেননি।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। غَصَب-এর সংজ্ঞা দাও এবং তার হুকুম বিস্তারিত লিখ।

২। غَصَب কৃত সম্পদের জরিমানা কিভাবে আদায় করতে হয়? বিস্তারিত বিবরণ দাও।

৩। যদি কেউ কারো জমিন জোর পূর্বক দখল করে। অতঃপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে তা ধ্বংস হয়ে যায়, তখন এর জরিমানা দিতে হবে কিনা? ইমামদের মতভেদসহ আলোচনা কর।

৪। غَصَب কৃত বস্তুর مَنَافِع সম্পর্কে যা জান লিখ।

৫। বাঁদি غَصَب করা হলে তার বিধান কি হবে? বিস্তারিত লিখ।

كِتَابُ الْوَدِيْعَةِ

اَلْوَدِيْعَةُ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِ الْمُوْدَعِ اِذَا هَلَكَتْ فِيْ يَدِهٖ لَمْ يَضْمَنْهَا وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يَّحْفَظَهَا بِنَفْسِهٖ وَبِمَنْ فِيْ عِيَالِهٖ فَاِنْ حَفِظَهَا بِغَيْرِهِمْ اَوْ اَوْدَعَهَا ضَمِنَ اِلَّا اَنْ يَّقَعَ فِيْ دَارِهٖ حَرِيْقٌ فَيُسَلِّمَهَا اِلٰى جَارِهٖ اَوْ يَكُوْنَ فِيْ سَفِيْنَةٍ وَهُوَ يَخَافُ الْغَرَقَ فَيُلْقِيَهَا اِلٰى سَفِيْنَةٍ اُخْرٰى وَاِنْ خَلَطَهَا الْمُوْدَعُ بِمَالِهٖ حَتّٰى لَاتَتَمَيَّزَ ضَمِنَهَا فَاِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَحَبَسَهَا عَنْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى تَسْلِيْمِهَا ضَمِنَهَا وَاِنِ اخْتَلَطَتْ بِمَالِهٖ مِنْ غَيْرِ فِعْلِهٖ فَهُوَ شَرِيْكٌ لِصَاحِبِهَا وَاِنْ اَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا وَهَلَكَ الْبَاقِيْ ضَمِنَ ذٰلِكَ الْقَدْرَ فَاِنْ اَنْفَقَ الْمُوْدَعُ بَعْضَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهٗ فَخَلَطَهٗ بِالْبَاقِيْ ضَمِنَ الْجَمِيْعَ وَاِذَا تَعَدَّى الْمُوْدَعُ فِي الْوَدِيْعَةِ بِاَنْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا اَوْ ثَوْبًا فَلَبِسَهٗ اَوْ عَبْدًا فَاسْتَخْدَمَهٗ اَوْ اَوْدَعَهَا عِنْدَ غَيْرِهٖ ثُمَّ اَزَالَ التَّعَدِّيْ وَرَدَّهَا اِلٰى يَدِهٖ زَالَ الضَّمَانُ فَاِنْ طَلَبَهَا صَاحِبُهَا فَجَحَدَهٗ اِيَّاهَا ضَمِنَهَا فَاِنْ عَادَ اِلَى الْاِعْتِرَافِ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الضَّمَانِ ـ

আমানত পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ গচ্ছিত জিনিস মূদা'র (আমানত গ্রহীতার) নিকট আমানতস্বরূপ থাকে। যদি তার হাতে সেটা নাশ হয়ে যায়, তবে সে দায়ী হবে না। দ্রব্যের হেফাজত মূদা' নিজে এবং পরিবারস্থ কাউকে দিয়ে করতে পারে। কিন্তু যদি এতদ্ভিন্ন অপর কারো মাধ্যমে হেফাজত করে বা কোথাও গচ্ছিত রাখে, তবে দায়ী হবে। অবশ্য যদি নিজ ঘরে আগুন ধরে যাওয়ায় প্রতিবেশীর নিকট সোপর্দ করে কিংবা নৌকায় থাকে, আর ডুবে যাওয়ার ভয়ে অন্য নৌকায় তা নিক্ষেপ করে (এবং দ্রব্য নষ্ট হয়ে যায় তবে দায়ী হবে না)। যদি আমানতদার নিজস্ব মালের সাথে গচ্ছিত মাল এমনভাবে মিশিয়ে নেয় যে, তা পৃথক হতে পারে না তবে সে দায়ী হবে। যদি মালিক দ্রব্য নিতে চায় আর সে তা দিতে সক্ষম থাকা সত্ত্বেও তাকে না দেয়, (অতঃপর সেটা বিনাশ হয়ে যায়) তবে সে দায়ী হবে। যদি তার (আমানতদারের) মালের সাথে তার বিনা হস্তক্ষেপে গচ্ছিত দ্রব্য মিশে যায়, তবে সে মালিকের সাথে (উক্ত মালে) শরিক গণ্য হবে। যদি আমানতী দ্রব্যের কিছু অংশ আমানতদার খরচ করে নেয় আর বাকি অংশ বিনাশ হয়ে যায়, তবে শুধুমাত্র ব্যয়িত অংশের জন্য সে জামিন হবে। পক্ষান্তরে কিছু অংশ খরচ করে যদি পুনরায় সে পরিমাণ অবশিষ্ট মালের সাথে মিশিয়ে রেখে দেয়, (অতঃপর সমস্ত মাল বিনাশ হয়ে যায়) তবে সমুদয় মালের জামিন হবে। আমানদতার যখন আমানতী দ্রব্যে অনধিকার প্রয়োগ করে, যেমন– সওয়ারি ছিল, তাতে আরোহণ করল বা পোশাক ছিল, তা পরিধান করল কিংবা ক্রীতদাস ছিল, তাকে কাজে খাটাল অথবা দ্রব্য অপর কারো নিকট গচ্ছিত রাখল এবং তারপর অনিয়ম বন্ধ করে মালিককে তা (নিখুঁত অবস্থায়) ফিরিয়ে দেয়, তখন তার দায়দায়িত্ব রহিত হয়ে যায়। আমানতকারক দ্রব্য ফেরত চাইলে মূদা' যদি আমানতের কথা অস্বীকার করে, (অতঃপর তা নাশ হয়) তবে সে জামিন হবে, এমনকি পরে স্বীকার করে নিলেও দায় থেকে রক্ষা পাবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

الْوَدِيْعَةُ -এর সংজ্ঞা ঃ الْوَدِيْعَةُ শব্দটি বাবে فَتَحَ -এর মাসদার। এর অর্থ হল– পরিত্যাগ করা, ছেড়ে দেয়া। শরীয়তের পরিভাষায়, স্বীয় সম্পদের দেখা-শুনা ও হেফাজতের দায়িত্ব অন্যের ওপর অর্পণ করা। কেননা পৃথিবীতে মানুষ অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে তার নিজস্ব দ্রব্য বা টাকা-পয়সার হেফাজতের জন্য অন্যের সাহায্যের প্রতি দারুনভাবে মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ে এবং তার তত্ত্বাবধানে দ্রব্য-সামগ্রী রাখে। এভাবে নিজের সম্পদ অপরের হেফাজতে অর্পণ করাকে শরীয়তের ভাষায় وَدِيْعَةٌ (Deposit) বলে।

اَلْفَرْقُ بَيْنَ الْاَمَانَةِ وَالْوَدِيْعَةِ বা আমানত ও ওদীয়তের মধ্যে পার্থক্য ঃ আমানত ও ওদীয়তের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে। ওদীয়তে ইচ্ছা ও অভিপ্রায় থাকা শর্ত আর আমানত ইচ্ছা ও অভিপ্রায়সহ এবং বিনা ইচ্ছা-অভিপ্রায়েও হতে পারে। ধরুন আপনি পথে পড়ে থাকা কোন জিনিস পেলেন। এটা আপনার হাতে আমানত হবে, একে ওদীয়ত আখ্যা দেয়া যাবে না। কিন্তু অনুরূপ কোন দ্রব্য যদি কেউ আপনার তত্ত্বাবধানে রেখে যায়, তবে তাকে ওদীয়ত বলতে পারেন, আমানতও বলতে পারেন। সুতরাং প্রত্যেক ওদীয়তকে আমানত বলা গেলেও প্রত্যেক আমানতকে ওদীয়ত বলা যায় না। যেহেতু আমানত শব্দের মাঝে ওদীয়ত শব্দের অর্থও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, সে কারণে পবিত্র কুরআনে আমানত ও ওদীয়তের জন্য ব্যাপকার্থক শব্দ আমানতই ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু হাদীসে উভয় প্রকার শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে পারস্পরিক অর্থে।

আমানত বা ওদীয়তের তাৎপর্য ও হুকুম ঃ আমানত কথাটি গচ্ছিত (Deposited) দ্রব্যের ক্ষেত্রেই শুধু সীমাবদ্ধ নয়; এর অঙ্গন আরো ব্যাপক। যেমন– আপনি যদি কোন দ্রব্য পড়ে থাকা অবস্থায় পান, অথবা বন্ধকস্বরূপ হাতে আসে, অথবা চেয়ে ('আরিয়ত) নেন বা কোন দ্রব্য ভাড়া রাখেন, অথবা স্বেচ্ছায় কেউ আপনার তত্ত্বাবধানে রাখে, অথবা আপনাকে কোন জিনিসের দায়িত্বশীল, ওলী বা উকিল বানিয়ে দেয়া হয় তবে এ সবই আপনার নিকট আমানত বলে গণ্য হবে, আর আপনি হবেন আমানতদার। অর্থাৎ আপনাকে নিজের দ্রব্যের ন্যায় এগুলোর হেফাজত করতে হবে এবং যথাসময়ে যার পাওনা তাকে পৌছে দিতে হবে। ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا (النساء)

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন– যেন তোমরা আমানতকে তার অভিভাবকের নিকট পৌছে দাও।

কিন্তু যথার্থ হেফাজত ও নিয়ম পালনের পরও যদি তা ধ্বংস বা নষ্ট হয়ে যায়, তবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। (অবশ্য বন্ধকী দ্রব্যের হুকুম কিছুটা ব্যতিক্রম।)

কতিপয় পরিভাষা ঃ مُوْدِعٌ – যে ব্যক্তি মাল হেফাজতের জন্য রাখল। مُوْدَعٌ বা اَمِيْنٌ – যার হেফাজতে রাখা হল। وَدِيْعَةٌ – গচ্ছিত দ্রব্য।

فَجَحَدَهُ اِيَّاهَا الخ -এর আলোচনা ঃ অর্থাৎ কোন আমানতদার যদি প্রথমে আমানতের কথা অস্বীকার করে পরে তা স্বীকার করে নেয় তথাপি দায় থেকে পরিত্রাণ পাবে না; বরং খেসারত দিতে হবে। তবে এর জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে– (১) মালিকের দ্রব্য প্রার্থনার জবাবে অস্বীকৃতি হতে হবে। (২) অস্বীকার কালে দ্রব্য পূর্বস্থান থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে এমন হতে হবে। (৩) যার দ্বারা গচ্ছিত সম্পদের নিরাপত্তা ব্যাঘাত হতে পারে এমন কোন সন্দেহভাজন ব্যক্তির সম্মুখে অস্বীকার না হওয়া চাই। কারণ এ অবস্থায় অস্বীকার করলে হেফাজতের স্বার্থে করে থাকবে। (৪) অস্বীকার পূর্বক মালিকের সামনে দ্রব্য উপস্থিত না করা চাই।

وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يُّسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ وَاِنْ كَانَ لَهَا حَمْلٌ وَمُؤْنَةٌ وَاِذَا اَوْدَعَ رَجُلَانِ عِنْدَ رَجُلٍ وَدِيْعَةً ثُمَّ حَضَرَ اَحَدُهُمَا يَطْلُبُ نَصِيْبَهُ مِنْهَا لَمْ يَدْفَعْ اِلَيْهِ شَيْئًا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى حَتّٰى يَحْضُرَ الْاٰخَرُ وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ وَمُحَمَّدٌ رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَدْفَعُ اِلَيْهِ نَصِيْبَهُ وَاِنْ اَوْدَعَ رَجُلٌ عِنْدَ رَجُلَيْنِ شَيْئًا مِمَّا يُقَسَّمُ لَمْ يَجُزْ اَنْ يَّدْفَعَهُ اَحَدُهُمَا اِلَى الْاٰخَرِ وَلٰكِنَّهُمَا يَقْتَسِمَانِهِ فَيَحْفَظُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفَهُ وَاِنْ كَانَ مِمَّا لَايُقَسَّمُ جَازَ اَنْ يَّحْفَظَ اَحَدُهُمَا بِاِذْنِ الْاٰخَرِ ـ وَاِذَا قَالَ صَاحِبُ الْوَدِيْعَةِ لِلْمُوْدَعِ لَاتُسَلِّمْهَا اِلٰى زَوْجَتِكَ فَسَلَّمَهَا اِلَيْهَا لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ قَالَ لَهُ اِحْفَظْهَا فِىْ هٰذَا الْبَيْتِ فَحَفِظَهَا فِىْ بَيْتٍ اٰخَرَ مِنَ الدَّارِ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ حَفِظَهَا فِىْ دَارٍ اُخْرٰى ضَمِنَ ـ

সরল অনুবাদ ঃ মূদা'র জন্য আমানতী দ্রব্য সফরে নিয়ে যাওয়া জায়েয আছে, যদিও বা তা বহন ও ব্যয়সাধ্য হয়। যদি দু' ব্যক্তি মিলে কারো নিকট কিছু আমানত রাখে, অতঃপর তাদের একজন এসে নিজ অংশ ফেরত নিতে চায়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, দ্বিতীয় ব্যক্তিসহ হাজির না হওয়া পর্যন্ত তাঁর নিকট কিছুই দেবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, তার অংশ তাকে দিয়ে দেবে। যদি কেউ দু' ব্যক্তির নিকট এমন বস্তু আমানত রাখে যা বন্টন করা যায়, তবে তাদের একজন অপরজনের দায়িত্বে (পুরো) দ্রব্য সমর্পণ করা জায়েয নেই বরং তা ভাগ করে নেবে। অতঃপর প্রত্যেকেই তার অর্ধেক অংশ হেফাজত করবে। আর যদি দ্রব্য অবন্টনযোগ্য হয়, তবে যে কোন একজন অপরজনের অনুমতি সাপেক্ষে হেফাজত করতে পারবে। আমানতকারী যদি মূদা'কে বলে, "দ্রব্য তোমার স্ত্রীর নিকট সোপর্দ করো না" আর সে সোপর্দ করে, (ও তা নাশ হয়) তবে সে দায়ী হবে না। যদি মূদা'কে বলে, "দ্রব্য এ কক্ষে হেফাজত করবে" আর সে গৃহের ভিন্ন কক্ষে হেফাজত করে তাতেও সে দায়ী হবে না। কিন্তু যদি ভিন্ন গৃহে রাখে (এবং দ্রব্য নাশ হয়) তবে দায়ী হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَلِلْمُوْدَعِ اَنْ يُّسَافِرَ بِالْوَدِيْعَةِ الخ -এর আলোচনা ঃ এ বিধান ঐ সময় হবে, যখন মালিক তাতে বাধা না দেবে এবং সফরের কারণে গচ্ছিত মালামাল নষ্ট হয়ে যাওয়ার কোন সম্ভাবনা যদি না থাকে। যদি মালিক তাকে বাধা দেয়, অথবা গচ্ছিত সম্পদের ব্যাপারে ভয় হয় এবং তার সফর যদি অত্যন্ত জরুরি না হয়; তবে সে ضَامِن হবে।

সাহেবাইন (রঃ) বলেন যে, যখন গচ্ছিত মাল ভারী ও ওজন দায়ক হবে এবং তা বহন করতে খরচের প্রয়োজন হবে, তখন তা নিয়ে সফর করবে না। যদি করে তবে সে ضَامِن হবে। কেননা তখন মালিকের জন্য স্থানান্তরের ভাড়া আবশ্যক হবে, যার প্রতি মালিক সন্তুষ্ট হবে না।

يَدْفَعُ اِلَيْهِ نَصِيْبَهُ الخ -এর আলোচনা ঃ কেননা সে স্বীয় অংশ প্রার্থনা করেছে, যেমন– যদি উভয়ে উপস্থিত হয়ে চায়। আইম্মায়ে ছালাছা (রঃ)-এরও এরূপ অভিমত। এ মতবিরোধ مِثْلِيَات -এর মধ্যে হবে। আর যদি مِثْلِيَات থেকে না হয়, তবে অর্পণ করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ নয়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْوَدِيْعَةُ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

২। اَلْوَدِيْعَةُ -এর প্রয়োজন কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

৩। اَلْوَدِيْعَةُ ও اَلْاَمَانَةُ -এর মধ্যে প্রার্থক্য নির্ণয় কর।

৪। গচ্ছিত সম্পদ নিয়ে সফর করার বিধান কি? বিস্তারিত আলোচনা কর।

৫। اَلْوَدِيْعَةُ -এর তাৎপর্য ও হুকুম সম্পর্কে যা জান লিখ।

৬। আমানতদারের মর্যাদা ও অধিকারের ওপর একটি টিকা লিখ।

كِتَابُ الْعَارِيَةِ

اَلْعَارِيَةُ جَائِزَةٌ وَهِىَ تَمْلِيكُ الْمَنَافِعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ وَتَصِحُّ بِقَوْلِهِ اَعَرْتُكَ وَاَطْعَمْتُكَ هٰذِهِ الْاَرْضَ وَمَنَحْتُكَ هٰذَا الثَّوْبَ وَحَمَلْتُكَ عَلٰى هٰذِهِ الدَّابَّةِ اِذَا لَمْ يُرِدْ بِهِ الْهِبَةَ وَاَخْدَمْتُكَ هٰذَا الْعَبْدَ وَدَارِىْ لَكَ سُكْنٰى وَدَارِىْ لَكَ عُمْرٰى سُكْنٰى وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَّرْجِعَ فِى الْعَارِيَةِ مَتٰى شَاءَ وَالْعَارِيَةُ اَمَانَةٌ فِىْ يَدِ الْمُسْتَعِيْرِ اِنْ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ لَمْ يَضْمَنِ الْمُسْتَعِيْرُ وَلَيْسَ لِلْمُسْتَعِيْرِ اَنْ يُّؤْجِرَ مَا اسْتَعَارَهُ فَاِنْ اٰجَرَهُ فَهَلَكَ ضَمِنَ وَلَهُ اَنْ يُّعِيْرَهُ اِذَا كَانَ الْمُسْتَعَارُ مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْمُسْتَعْمِلِ ـ

'আরিয়ত (ধার) পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ 'আরিয়ত জায়েয আছে। আর তা হল, (নিজস্ব কোন জিনিসের) মুনাফার মালিকানা বিনা বিনিময়ে (অন্যকে) প্রদান করা। এ সকল শব্দে ধার শুদ্ধ ও সংঘটিত হয়– আমি তোমাকে এটা ধার দিলাম। তোমাকে এ জমি ভোগ করতে দিলাম। এ কাপড়টি তোমায় দান করলাম বা তোমাকে এ সওয়ারিটা আরোহণ করতে দিলাম–' যখন এ বাক্যদ্বয় দ্বারা হিবার উদ্দেশ্য না করে। এ গোলামটি তোমার খেদমতের জন্য দিলাম, আমার ঘর তোমার বসবাসের জন্য এবং আমার ঘর তোমার আজীবন বসবাসের জন্য ইত্যাদি।

মু'য়ীর (ধারদাতা) যখন ইচ্ছা 'আরিয়ত ফিরিয়ে নিতে পারবে। ধার দেয়া দ্রব্য মুস্তা'য়ীর (ধার গ্রহীতা)-এর হাতে আমানত গণ্য হয়; যদি বিনা বাড়াবাড়িতে নাশ বা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে মুস্তা'য়ীর দায়ী হবে না। 'আরিয়ত স্বরূপ গৃহীত দ্রব্য কোথাও ভাড়ায় খাটানো মুস্তা'য়ীরের জন্য জায়েয নেই। তথাপি যদি ভাড়া দেয় আর তা নাশ হয়ে যায়, তবে সে দায়ী হবে। ধারের বস্তু যদি এমন হয় যা ব্যবহারকারীর ভিন্নতায় পরিবর্তিত হয় না, তবে মুস্তা'য়ীরের জন্য তা (অন্য কাউকে) ধার দেয়া জায়েয আছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

উপস্থাপনা ঃ পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যা খুবই কম যাদের জীবন ধারণের যাবতীয় উপাদান মওজুদ আছে। বেশির ভাগ মানুষ এমন যাদের জীবনের অনেক ক্ষেত্রে অনেক জিনিস অন্যদের থেকে চেয়ে নিতে হয়। এই চেয়ে নেয়াকে শরীয়তের পরিভাষায় 'আরিয়ত বা ধার বলে। যেভাবে জামিন হওয়া, ঋণ প্রদান করা, গচ্ছিত জিনিস হেফাজতের দায়িত্ব নেয়া ইসলামী সমাজের একটা নৈতিক দায়িত্ব তেমনি একজন অভাবী লোক নিজের কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চেয়ে নিতে আসলে সমাজ সভ্যদের নৈতিক কর্তব্য হল কোন বিনিময় ছাড়া তা নির্দ্বিধায় যোগান দেয়া। বিশেষত দৈনন্দিন ব্যবহার্য খুটিনাটি জিনিসপত্র দ্বিধাহীনভাবে দেয়া চাই।

عَارِيَةٌ -এর সংজ্ঞা ঃ عَارِيَةٌ শব্দটি اِعَارَةٌ শব্দের বিশেষ্যরূপ, عَارَةٌ -এর সাথে সম্বন্ধযুক্ত। অর্থ– ধার। শরীয়তের পরিভাষায় 'আরিয়ত হল, কোন দ্রব্যের মূল অক্ষত রেখে তা থেকে উপকার অর্জনের জন্য কাউকে সাময়িক ক্ষমতা প্রদান করা। সে হিসেবে টাকা-পয়সা এবং কায়ল ও ওজনভুক্ত জিনিসের ক্ষেত্রে 'ধার' কথাটি প্রযোজ্য হবে না। কেননা গ্রহীতা এগুলো অক্ষত রেখে ফেরত দিতে সক্ষম নয়; বরং ভোগ-ব্যবহারের মাধ্যমে আসল বিলীন করে তার সমপরিমাণ জিনিস ফেরত দেয় মাত্র। এ শ্রেণীর ধার দেয়ানেয়ার ক্ষেত্রে শরীয়তে 'কর্জ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

কতিপয় পরিভাষা ঃ إِعَارَةٌ – ধার প্রদান; إِسْتِعَارَةٌ – ধার গ্রহণ; مُعِيْر – ধার দাতা; مُسْتَعِيْر – ধারগ্রহীতা; مُسْتَعَار বা عَارِيَة – যে জিনিস ধার নেয়া হয়।

دَارِيْ لَكَ عُمْرِيْ الخ **-এর আলোচনা ঃ** عُمْرِيْ হল কেউ স্বীয় সাথীকে বলল– أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ বা বলল– دَارِيْ لَكَ عُمْرِيْ سُكْنٰى এর দ্বারা ধার এজন্য বৈধ হয় যে, সে বাড়িকে তার জন্য তার জীবদ্দশা পর্যন্ত সময়ের জন্য প্রদান করল। এবং لَكَ -এর ব্যাখ্যা سُكْنٰى -এর দ্বারা করেছে। কেননা এ কথাটি যেমন নাকি تَمْلِيْكُ الْعَيْنِ -এর সম্ভাবনায় রয়েছে, তদ্রূপ تَمْلِيْكُ الْمَنَافِعِ -এরও সম ভাবনা রয়েছে। শেষ কথা যা سُكْنٰى উহার দালালতের কারণেই ধারের ওপর অর্পণ করা হয়েছে।

وَإِنْ هَلَكَ مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ الخ **-এর আলোচনা ঃ** এ ইবারতে গ্রন্থকার 'আরিয়তী দ্রব্যের বিধান বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ ধারগ্রহীতার হাতে ধারের মাল, জামানতহীন আমানত গণ্য হবে। গ্রহীতাকে তা আমানতী মালের ন্যায়ই হেফাজত করতে হবে। কিন্তু যথাযথ যত্নের পরও যদি নষ্ট বা ধ্বংস হয়ে যায়, তবে তার ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে না। পক্ষান্তরে কোনরূপ অনিয়ম পাওয়া গেলে যেমন ৫ মাইল চলার কথা বলে সাইকেল এনে ৬ মাইল চালানো হল এবং সে কারণে এর টায়ার টিউব বা অন্য কিছু নষ্ট হয়ে গেল, তবে পরিমাণ মতো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বস্তুত এ হল ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত।

وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيْرِ وَالْمَكِيْلِ وَالْمَوْزُوْنِ قَرْضٌ وَاِذَا اسْتَعَارَ اَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيْهَا اَوْ يَغْرِسَ جَازَ وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَّرْجِعَ عَنْهَا وَيُكَلِّفَهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ فَاِنْ لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ وَاِنْ كَانَ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ وَ رَجَعَ قَبْلَ الْوَقْتِ ضَمِنَ الْمُعِيْرُ لِلْمُسْتَعِيْرِ مَانَقَصَ مِنَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ بِالْقَلْعِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيْرِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَاجَرَةِ عَلَى الْمُوْجِرِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوْبَةِ عَلَى الْغَاصِبِ وَاُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُوْدَعَةِ عَلَى الْمُوْدِعِ وَاِذَا اسْتَعَارَ دَابَّةً فَرَدَّهَا اِلٰى اِصْطَبْلِ مَالِكِهَا فَهَلَكَتْ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنِ اسْتَعَارَ عَيْنًا وَ رَدَّهَا اِلٰى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيْهِ لَمْ يَضْمَنْ وَاِنْ رَدَّ الْوَدِيْعَةَ اِلٰى دَارِ الْمَالِكِ وَلَمْ يُسَلِّمْهَا اِلَيْهِ ضَمِنَ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ۔

সরল অনুবাদ ঃ ধাতব মুদ্রা, আশ্রাফী এবং কায়ল ও ওজনভুক্ত দ্রব্যসামগ্রী 'আরিয়ত দেয়া-নেয়াকে 'করজ' বলা হয়। যদি কোন ব্যক্তি গৃহ নির্মাণ বা বৃক্ষ রোপণের জন্যে জমি ধার নেয়, তবে তা জায়েয আছে। তবে মু'য়ীর (প্রয়োজনে) জমি ফিরিয়ে নিতে এবং মুস্তা'য়ীরকে ঘর ও বৃক্ষাদি তুলে নেয়ার জন্য বাধ্য করতে পারবে। এ স্থলে যদি 'আরিয়তের মেয়াদ নির্দিষ্ট করে থাকে এবং তা ফুরানোর পূর্বেই জমি ফিরিয়ে নিতে চায়, তবে মু'য়ীর মুস্তা'য়ীরকে ঘর ও বৃক্ষাদি (অসময়ে) তুলে নেয়ার কারণে যে ক্ষতিগ্রস্ত হল তার ভর্তুকি প্রদান করবে। 'আরিয়তী জিনিসের প্রত্যার্পণ-ব্যয় মুস্তা'য়ীরের দায়িত্বে। (অপর দিকে) ভাড়ায় আনীত দ্রব্যের প্রত্যার্পণ-ব্যয় মূজেরের (ভাড়ায় দাতার) দায়িত্বে। আর অপহৃত দ্রব্য ফেরত দানের খরচ অপহারক এবং গচ্ছিত পণ্যের প্রত্যার্পণ-ব্যয় আমানতকারীর ওপর বর্তাবে। কোন ব্যক্তি সওয়ারি ধার আনার পর তা মালিকের আস্তাবলখানায় রেখে আসল অতঃপর সেটা ধ্বংস হয়ে গেল, তবে সে দায়ী হবে না। এভাবে যদি কোন জিনিস ধার আনার পর তা মালিকের হাতে সোপর্দ না করে তার ঘরে পৌছে দিয়ে আসে, (অতঃপর তা নাশ হয়) তবে সে দায়ী হবে না। কিন্তু গচ্ছিত মাল মালিকের হাতে না দিয়ে শুধুমাত্র তার ঘরে রেখে আসলে (অতঃপর তা নাশ হলে আমানতদার) দায়ী হবে (অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ দিতে হবে)।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَعَارِيَةُ الدَّرَاهِمِ الخ -এর আলোচনা ঃ ঐ সকল জিনিসের ধার ঋণের হুকুমের অন্তর্ভুক্ত এজন্য হবে যে, ধার দেয়ার মধ্যে مَنَافِع -এর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে। এবং উল্লিখিত জিনিস গুলোকে عَيْن -এর اِسْتِهْلَاك ব্যতীত উপকার লাভ করা সম্ভব নয়। এজন্য ঐ সকল জিনিসের ক্ষেত্রে ধার ঋণের অর্থে হবে। আর এটা ঐ সময় হবে, যখন মতলক ধার দেয়া হয়। যদি কোন একটি দিক নির্দিষ্ট করে দেয়, যথা– আমি দিরহাম এ জন্য দিচ্ছি যাতে করে দোকানের শ্রীবৃদ্ধি পায়। আর লোকেরা আমায় ধনী মনে করে আমার সাথে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে থাকবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। عَارِيَة কাকে বলে? এর প্রয়োজনীয়তা কি? বিশদভাবে আলোচনা কর।

২। مُعِيْر ও مُسْتَعِيْر -এর দায়িত্ব কি বুঝিয়ে লিখ।

৩। عَارِيَة কখন قَرْض -এ রূপান্তরিত হয়? বুঝিয়ে দাও।

৪। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ وَدَارِىْ لَكَ عُمْرٰى سُكْنٰى وَلِلْمُعِيْرِ اَنْ يَّرْجِعَ فِى الْعَارِيَةِ مَتٰى شَاءَ .

كِتَابُ اللَّقِيْطِ

اَللَّقِيْطُ حُرٌّ وَنَفَقَتُهُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ وَاِنِ الْتَقَطَهُ رَجُلٌ لَمْ يَكُنْ لِغَيْرِهِ اَنْ يَّاْخُذَهُ مِنْ يَدِهِ فَاِنِ ادَّعٰى مُدَّعٍ اَنَّهُ اِبْنُهُ فَالْقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ وَاِنِ ادَّعَاهُ اِثْنَانِ وَ وَصَفَ اَحَدُهُمَا عَلَامَةً فِىْ جَسَدِهِ فَهُوَ اَوْلٰى بِهِ وَاِذَا وُجِدَ فِىْ مِصْرٍ مِنْ اَمْصَارِ الْمُسْلِمِيْنَ اَوْفِىْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَاهُمْ فَادَّعٰى ذِمِّىٌّ اَنَّهُ اِبْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ مُسْلِمًا وَاِنْ وُجِدَ فِىْ قَرْيَةٍ مِنْ قُرٰى اَهْلِ الذِّمَّةِ اَوْ فِىْ بِيْعَةٍ اَوْ كَنِيْسَةٍ كَانَ ذِمِّيًّا وَمَنِ ادَّعٰى اَنَّ اللَّقِيْطَ عَبْدُهُ اَوْ اَمَتُهُ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا وَاِنِ ادَّعٰى عَبْدٌ اَنَّهُ اِبْنُهُ ثَبَتَ نَسَبُهُ مِنْهُ وَكَانَ حُرًّا وَاِنْ وُجِدَ مَعَ اللَّقِيْطِ مَالٌ مَشْدُوْدٌ عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُ وَلَا يَجُوْزُ تَزْوِيْجُ الْمُلْتَقِطِ وَلَا تَصَرُّفُهُ فِىْ مَالِ اللَّقِيْطِ وَيَجُوْزُ اَنْ يَّقْبِضَ بِهِ الْهِبَةَ وَيُسَلِّمَهُ فِىْ صَنَاعَةٍ وَيُوَاجِرَهُ ـ

পতিত শিশু পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ পতিত শিশু স্বাধীন। তার সকল ব্যয় বায়তুল-মাল (সরকারি কোষাগার) থেকে সরবরাহ করা হবে। যদি কোন ব্যক্তি তাকে তুলে নেয়, তবে অন্য কারো জন্য তাকে তার হাত থেকে নেয়ার অধিকার থাকবে না। যকি কেউ শিশুটিকে নিজের পুত্র বলে দাবি করে, তবে কসম করে বললে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে। আর যদি দু' ব্যক্তি দাবি করে এবং তাদের একজন শিশুর দেহস্থিত কিছু লক্ষণের বর্ণনা করে দেয়, তবে সেই তার ব্যাপারে অগ্রাধিকার পাবে। যদি শিশুটি মুসলিম অধ্যুষিত কোন শহর বা গ্রামে পাওয়া যায় আর কোন জিম্মি তাকে নিজ পুত্র দাবি করে, তবে সে তার সন্তান সাব্যস্ত হবে এবং (শিশুটি) মুসলমান গণ্য হবে। আর যদি জিম্মি অধ্যুষিত কোন গ্রাম বা মন্দির অথবা গির্জায় পাওয়া যায়, তাহলে সে জিম্মি সাব্যস্ত হবে। যে ব্যক্তি দাবি করে যে পতিত শিশুটি তার গোলাম কিংবা বাঁদি তবে তার কথা গ্রাহ্য হবে না; সে স্বাধীনই গণ্য হবে। আর যদি কোন গোলাম তাকে নিজ পুত্র দাবি করে, তবে তার থেকে তার বংশ সাব্যস্ত হবে এবং স্বাধীন ধর্তব্য হবে। পতিত শিশুর সাথে গ্রথিত কোন অর্থ-সম্পদ পাওয়া গেলে তা তারই মালিকানা সাব্যস্ত হবে। কুড়িয়ে নেয়া ব্যক্তির জন্য উক্ত শিশুকে বিয়ে করা এবং তার সম্পদে হস্তক্ষেপ করা জায়েয নেই। (অবশ্য) সে তার পক্ষে হিবা করায়ত্ত করতে পারবে এবং পারবে তাকে কোন শিল্প শিক্ষা ও উপার্জনমূলক কাজে নিয়োগ করতে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَللَّقِيْطُ -এর সংজ্ঞা ঃ اَللَّقِيْطُ শব্দটি فَعِيْلٌ -এর ওযনে ব্যবহৃত হয়ে مَفْعُوْلٌ -এর অর্থ প্রদান করে। শাব্দিক অর্থ– আশ্রয়-ঠিকানাহীন পড়ে থাকা শিশু। শরীয়তের পরিভাষায় লাক্বীত্ব হল, পড়ে থাকা এমন মানব-শিশু যাকে তার অভিভাবক দারিদ্র্য কিংবা যিনার অপবাদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে ফেলে দিয়েছে। শিশুটির প্রাণ নাশের আশঙ্কা না থাকলে তাকে সযত্নে তুলে নিয়ে আসা মানবিক দায়িত্ব ও মুস্তাহাব। আর যদি প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, তবে তুলে নেয়া ওয়াজিব।

اَللَّقِيطُ حُرٌّ الخ -এর আলোচনা ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের অনুকরণে لَقِيط বা প্রাপ্ত শিশুকে মুসলমান ও আযাদ সাব্যস্ত করা হবে। চাই مُلْتَقَط আযাদ হোক বা গোলাম হোক। কেননা আদম সন্তানের মূল হচ্ছে– স্বাধীন হওয়া। আর কোন কারণ বশত কখনো কখনো তা তার মধ্যে رِقِّيَّت তথা গোলামি চলে আসে। এবং لَقِيط -এর সকল খরচ বাইতুল মাল হতে গ্রহণ করা হবে। যেমনিভাবে তার পরিত্যাক্ত সম্পতি বাইতুল মালে চলে যায় এবং তার অপরাধের ক্ষতিপূরণও বাইতুল মালের পক্ষ হতেই দেয়া হবে।

وَإِنْ اِدَّعَاهُ اِثْنَانِ الخ -এর আলোচনা ঃ উভয়ের থেকে কোন একজন তার শরীরের (لَقِيط)-এর কোন চিহ্নের বর্ণনা দিয়ে দেয়। তখন সে তার জন্য অধিক উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি مُرَجَّح বা প্রাধান্য দেয়ার দলিল-প্রমাণ বিদ্যমান না থাকে, তখন তার বংশ পরম্পরা উভয়ের থেকেই সাব্যস্ত হবে। যেরূপভাবে কোন বাঁদি দু'জনের মালিকানায় থাকে এবং উভয়েই বাচ্চার দাবি করে, তখন তার বংশ পরম্পরা উভয়ের থেকেই সাব্যস্ত হবে।

وَلَايَجُوزُ تَزْوِيجُ الخ -এর আলোচনা ঃ مُلْتَقِط -এর জন্য لَقِيط -কে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। এজন্য لَقِيط -এর ওপর مُلْتَقِط -এর কোন প্রকারের وِلَايَت বা অভিভাবকত্ব নেই। কাজেই বাদশাহ তার বিয়ে-শাদীর ব্যবস্থা করে দেবে।

اَلتَّمْرِينُ [অনুশীলনী]

১। لَقِيط -এর সংজ্ঞা তার হুকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর।

২। لَقِيط ও مُلْتَقَط -এর মধ্যে পার্থক্য কি? লিখ।

৩। لَقِيط -এর অভিভাবক কে হবে? তার খরচ কোথা হতে বহন করা হবে? লিখ।

كِتَابُ اللُّقْطَةِ

اَللُّقْطَةُ اَمَانَةٌ فِيْ يَدِ الْمُلْتَقِطِ اِذَا اَشْهَدَ الْمُلْتَقِطُ اَنَّهُ يَاْخُذُهَا لِيَحْفَظَهَا وَيَرُدَّهَا عَلٰى صَاحِبِهَا فَاِنْ كَانَتْ اَقَلَّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ عَرَّفَهَا اَيَّامًا وَاِنْ كَانَ عَشَرَةً فَصَاعِدًا عَرَّفَهَا حَوْلًا كَامِلًا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَاِلَّا تَصَدَّقَ بِهَا فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَهُوَ قَدْ تَصَدَّقَ بِهَا فَهُوَ بِالْخِيَارِ اِنْ شَاءَ اَمْضَى الصَّدَقَةَ وَاِنْ شَاءَ ضَمَّنَ الْمُلْتَقِطَ وَيَجُوْزُ اِلْتِقَاطُ الشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَالْبَعِيْرِ فَاِنْ اَنْفَقَ الْمُلْتَقِطُ عَلَيْهَا بِغَيْرِ اِذْنِ الْحَاكِمِ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ وَاِنْ اَنْفَقَ بِاِذْنِهِ كَانَ ذٰلِكَ دَيْنًا عَلٰى صَاحِبِهَا وَاِذَا رَفَعَ ذٰلِكَ اِلَى الْحَاكِمِ نَظَرَ فِيْهِ فَاِنْ كَانَ لِلْبَهِيْمَةِ مَنْفَعَةٌ اَجَرَهَا وَاَنْفَقَ عَلَيْهَا مِنْ اُجْرَتِهَا وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ وَخَافَ اَنْ يَسْتَغْرِقَ النَّفَقَةُ قِيْمَتَهَا بَاعَهَا الْحَاكِمُ وَاَمَرَ بِحِفْظِ ثَمَنِهَا وَاِنْ كَانَ الْاَصْلَحُ الْاِنْفَاقَ عَلَيْهَا اَذِنَ فِيْ ذٰلِكَ وَجَعَلَ النَّفَقَةَ دَيْنًا عَلٰى مَالِكِهَا فَاِذَا حَضَرَ مَالِكُهَا فَلِلْمُلْتَقِطِ اَنْ يَمْنَعَهُ مِنْهَا حَتّٰى يَاْخُذَ النَّفَقَةَ وَلُقْطَةُ الْحِلِّ وَالْحَرَمِ سَوَاءٌ۔

وَاِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعٰى اَنَّ اللُّقْطَةَ لَهُ لَمْ تُدْفَعْ اِلَيْهِ حَتّٰى يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ فَاِنْ اَعْطٰى عَلَامَتَهَا حَلَّ لِلْمُلْتَقِطِ اَنْ يَدْفَعَهَا اِلَيْهِ وَلَا يُجْبَرُ عَلٰى ذٰلِكَ فِي الْقَضَاءِ وَلَا يَتَصَدَّقُ بِاللُّقْطَةِ عَلٰى غَنِيٍّ وَاِنْ كَانَ الْمُلْتَقِطُ غَنِيًّا لَمْ يَجُزْ اَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَاِنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلَا بَأْسَ بِاَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا وَيَجُوْزُ اَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا اِذَا كَانَ غَنِيًّا عَلٰى اَبِيْهِ وَاِبْنِهِ وَاُمِّهِ وَ زَوْجَتِهِ اِذَا كَانُوْا فُقَرَاءَ۔

পতিত সম্পদ পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ পতিত দ্রব্য (লুক্বতা) সংগ্রহকারীর হাতে আমানত গণ্য হবে– যখন সে (তুলে নেয়ার সময় কাউকে) সাক্ষী রেখে বলে যে, এটা সে সংরক্ষণ ও মালিকের হাতে পৌঁছে দেয়ার জন্য তুলেছে। অতঃপর দ্রব্যটির মূল্য যদি দশ দিরহাম থেকে কম হয়, তবে কিছু দিন তা প্রচার করবে। আর যদি দশ দিরহাম বা তার চেয়ে বেশি (মূল্যের) হয়, তবে পূর্ণ এক বছর (সাধ্যমত) প্রচার করবে। এর মধ্যে যদি মালিক এসে যায় তবে তো ভালো, নতুবা তা সদকা করে দেবে। সদকা করে দেয়ার পর যদি মালিক এসে উপস্থিত হয়, তবে তার এখতিয়ার রয়েছে– ইচ্ছা করলে সদকা বলবৎ রাখবে, তা না হয় সংগ্রহকারী থেকে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেবে। (হারানো) ছাগল, গরু, উট ধরে নিয়ে (হেফাজত করা) জায়েয আছে। অতঃপর হেফাজতকারী যদি আদালতের অনুমতি ব্যতীত এদের পিছনে কিছু ব্যয় করে, তবে অনুগ্রহকারী হবে। আর অনুমতি সাপেক্ষে ব্যয় করলে তা মালিকের ওপর ঋণ হয়ে থাকবে। যখন হাকিমের নিকট এ (ধরনের) মুকাদ্দমা দায়ের করা হবে, তখন তিনি খতিয়ে দেখবেন। যদি

জন্তুটি লাভজনক হয়, তবে একে ভাড়ায় খাটিয়ে প্রাপ্ত ভাড়া থেকে এর পিছনে ব্যয় করবেন। আর যদি লাভজনক না হয় এবং প্রতিপালন ব্যয় তার মূল্যশুদ্ধ গ্রাস করে নেয়ার আশঙ্কা করে, তবে হাকিম জন্তুটি বিক্রি করে তার দাম হেফাজত করার নির্দেশ প্রদান করবেন। পক্ষান্তরে যদি তার পিছনে ব্যয় করাই লাভজনক হয়, তবে তিনি তাই করতে বলবেন এবং ব্যয়িত অর্থ মালিকের দায়িত্বে ঋণ হিসেবে ধরে দেবেন। অতঃপর যখন মালিক (জন্তু নিতে) আসবে তখন হেফাজতকারী তার ব্যয়িত অর্থ বুঝে না পাওয়া পর্যন্ত মালিককে তা থেকে বারণ করতে পারবে। হারাম ও তৎবহির্ভূত এলাকার লুকত্বার হুকুম একই সমান।

কোন ব্যক্তি এসে নিজেকে লোকতার মালিক বলে দাবি করলে উপযুক্ত প্রমাণ পেশ না করা পর্যন্ত সেটা তার হাতে সমর্পণ করা হবে না। অবশ্য যদি লুকত্বার কোন আলামত বলে দেয়, তবে সংগ্রহকারীর জন্য তাকে সেটা দিয়ে দেয়া জায়েয আছে, তবে দেয়ার জন্য তাকে আইনত বাধ্য করা যাবে না। কোন ধনী ব্যক্তিকে লুকত্বা সদকা করা যাবে না। যদি সংগ্রহকারী ধনী হয় তবে সে নিজেও তা দ্বারা ফায়দা নিতে পারবে না। হাঁ যদি দরিদ্র হয়, তবে ফায়দা উঠানো দোষণীয় নয়। সংগ্রহকারী নিজে ধনী হওয়া সত্ত্বেও যদি তার পিতা, মাতা ও স্ত্রী দরিদ্র হয়, তবে সে তাদেরকে তা সদকা করতে পারবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَللُّقْطَةُ -এর সংজ্ঞা ঃ কুড়িয়ে পাওয়া অরক্ষিত সম্পদকে লুকত্বা বলে। লুকত্বা তুলে এনে রক্ষণাবেক্ষণ করা খুব উত্তম কাজ। কিন্তু বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলে তুলে নেয়া আবশ্যক। তবে মালিকের নিকট পৌঁছে দেয়ার নিয়ত থাকতে হবে। সম্পদের পরিমাণ বা তার মূল্য যদি দশ দিরহাম (আনুমানিক পাঁচশ' টাকা) বা তার চেয়ে বেশি হয়, তবে এক বছর পর্যন্ত সাধ্যমত তা প্রচার করতে থাকবে। অবশেষে তার প্রকৃত মালিক না পেলে সদকা করে দেবে। প্রচারণার সময়সীমা সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) থেকে এক বৎসরের কথা বর্ণিত আছে। ইমাম মালেক (রঃ)-এরও অনুরূপ মত। তবে সর্বশেষ কথা হল সংগ্রহকারীর মনে যখন এ ধারণা বদ্ধমূল হবে যে, মালিক আর ফিরে আসবে না তখন সে তা সদকা করে দিতে পারবে। এরই ওপর ফতোয়া।

فَاِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا الخ -এর আলোচনা ঃ পতিত জিনিসকে উঠিয়ে নিয়ে দান করে দেয়ার পর যদি মালিক এসে যায়, তখন মালিক ইচ্ছে করলে সদকা মেনে নিয়ে ছওয়াবের অধিকারী হবে বা مُلْتَقِط হতে ক্ষতিপূরণ নিয়ে নেবে। কেননা مُلْتَقِط অন্যের সম্পদ তার সম্মতি ব্যতীত ব্যবহার করেছেন এবং ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর مُلْتَقِط ফকীরদের থেকে তা আর আদায় করে নিতে পারবে না।

وَيَجُوْزُ الْاِلْتِقَاطُ الخ -এর আলোচনা ঃ যখন পতিত সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সন্দেহ হয়। যথা– জঙ্গলে বাঘ বা শহরে চোরের আনা গোনা থাকে, তখন গাভী, বকরি, উট ইত্যাদিকে তুলে নেয়া বৈধ। আর যদি এগুলো ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকে, তখন বকরি ছাড়া অন্য কোন প্রাণী উঠিয়ে নেয়া বৈধ নয়। কেননা মহানবী (সাঃ) বলেছেন– خُذْهَا فَاِنَّمَا هِيَ لَكَ اَوْ لِاَخِيْكَ اَوْ لِلذِّئْبِ অর্থাৎ উহাকে (বকরি) তুমি উঠিয়ে নাও। কেননা তা তোমার জন্য বা তোমার ভাইয়ের জন্য বা বাঘের জন্য।

اِنْ اَنْفَقَ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি مُلْتَقِط পতিত জিনিস উঠিয়ে নেয়ার পর তাতে কিছু ব্যয় করে ফেলে, তবে তা প্রকৃত মালিক হতে আদায় করতে পারবে না। হাঁ যদি তা বিচারকের অনুমতিক্রমে খরচ করে থাকে, তবে প্রকৃত মালিক হতে তা আদায় করে নিতে হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَللُّقْطَةُ কাকে বলে? এর হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।
২। اَللُّقَطَةُ হস্তান্তরের নিয়মাবলী বিশদভাবে আলোচনা কর।
৩। বকরি ও উটের لُقْطَة-এর পার্থক্য বর্ণনা কর।
৪। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَاِذَا حَضَرَ الرَّجُلُ فَادَّعٰى اَنَّ اللُّقْطَةَ لَهٗ لَمْ تُدْفَعْ اِلَيْهِ حَتّٰى يُقِيْمَ الْبَيِّنَةَ الخ ۔

كِتَابُ الْخُنْثٰى

إِذَا كَانَ لِلْمَوْلُوْدِ فَرْجٌ وَذَكَرٌ فَهُوَ خُنْثٰى فَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الذَّكَرِ فَهُوَ غُلَامٌ وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنَ الْفَرَجِ فَهُوَ أُنْثٰى وَإِنْ كَانَ يَبُوْلُ مِنْهُمَا وَالْبَوْلُ يَسْبِقُ مِنْ أَحَدِهِمَا نُصِبَ إِلَى الْأَسْبَقِ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ فِي السَّبَقِ سَوَاءٌ فَلَا يُعْتَبَرُ بِالْكَثْرَةِ عِنْدَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يُنْسَبُ إِلٰى أَكْثَرِهِمَا بَوْلًا وَإِذَا بَلَغَ الْخُنْثٰى وَخَرَجَتْ لَهُ لِحْيَةٌ أَوْ وَصَلَ إِلَى النِّسَاءِ فَهُوَ رَجُلٌ وَإِنْ ظَهَرَ لَهُ ثَدْيٌ كَثَدْيِ الْمَرْأَةِ أَوْ نَزَلَ لَهُ لَبَنٌ فِيْ ثَدْيَيْهِ أَوْ حَاضَ أَوْ حَبِلَ أَوْ أَمْكَنَ الْوُصُوْلُ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْفَرْجِ فَهُوَ امْرَأَةٌ فَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ إِحْدٰى هٰذِهِ الْعَلَامَاتِ فَهُوَ خُنْثٰى مُشْكِلٌ۔

হিজড়া (Hermaphrodite) পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন নবজাতকের যোনী ও পুরুষাঙ্গ উভয়ই বিদ্যমান থাকে, তখন সে হল খুনছা (উভলিঙ্গ)। এমতাবস্থায় সে যদি তার পুরুষাঙ্গ দ্বারা পেশাব করে তবে বালক, আর যোনী পথে পেশাব করলে সে হল বালিকা। কিন্তু যদি উভয় লিঙ্গে পেশাব করে এবং তন্মধ্যে একটি দিয়ে পেশাব আগে বেরিয়ে আসে তবে এই অগ্রবর্তী লিঙ্গের প্রতি তাকে সম্বন্ধ (বালক বা বালিকা গণ্য) করা হবে। আর যদি অগ্র-পশ্চাৎ প্রশ্নে উভয় লিঙ্গের অবস্থা সমান হয়, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে, প্রস্রাবের আধিক্য বিবেচনায় আনা হবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, অধিক প্রস্রাব নির্গমনকারী লিঙ্গের দিকে সম্বন্ধ করা হবে। যখন উভলিঙ্গ (খুনছা) পরিণত বয়সে পৌছবে এবং তার দাড়ি গজাবে বা সে স্ত্রী গমন করবে, তবে সে হল পুরুষ। আর যদি নারীদের ন্যায় স্তন উৎপন্ন হয় বা স্তন যুগলে দুধ নেমে আসে বা হায়েযগ্রস্ত হয় কিংবা গর্ভ সঞ্চার হয় অথবা তার যোনীপথে সহবাস সম্ভব হয়, তবে সে হল নারী। কিন্তু যদি তার এ সমস্ত আলামতের কোন একটিও পরিস্ফুট না হয়, তবে সে হল খুনছা-মুশকিল বা জটিল উভলিঙ্গ।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

خُنْثٰى-এর সংজ্ঞা ঃ এর শাব্দিক অর্থ হল- হিজড়া (Hermaphrodite) مُعَرَّب -এর মধ্যে রয়েছে এটা تَكَبُّر ও نَرْمِى -এর সংমিশ্রণকে বুঝায়। مُخَنَّثٌ ব্যক্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নরম ও তার কথাবার্তায় নমনীয়তার ভাব পরিলক্ষিত হয় বিধায় তাকে اَلْمُخَنَّثُ বলা হয়। যে ব্যক্তির فَرْج ও ذَكَر উভয়ই থাকে, তখন সে যদি ذَكَر -এর মাধ্যমে পেশাব করে তখন তাকে ছেলে ধরা হবে, আর فَرْج -এর মাধ্যমে করলে তাকে মহিলা ধরা হবে।

আর যদি ذَكَر ও فَرْج উভয় রাস্তা দিয়েই পেশাব করে, তবে যে রাস্তা দিয়ে প্রথমে বের হয় তার ধর্তব্য হবে। আর যদি উভয় রাস্তা দিয়ে একত্রে বের হয়, তবে তার ব্যাপারটি মশকিল। সাহেবাইনের মতে, যে রাস্তা দিয়ে পেশাব বেশি নির্গত হয় তাকে সে জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হবে। আর ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট নির্গত হওয়ার রাস্তার প্রশস্ততার হিসেবে ধর্তব্য হবে। যদি فَرْج -এর প্রশস্ততা বেশি হয় তখন তাকে মহিলা হিসেবে গণ্য করা হবে, আর যদি ذَكَر -এর প্রশস্ততা বেশি হয় তখন তাকে পুরুষের হিসেবে গণ্য করা হবে।

وَإِذَا وَقَفَ خَلْفَ الْإِمَامِ قَامَ بَيْنَ صَفِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَتُبْتَاعُ لَهُ أَمَةٌ مِنْ مَالِهِ تَخْتِنُهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اِبْتَاعَ لَهُ الْإِمَامُ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ أَمَةً فَإِذَا اِخْتَتَنَتْهُ بَاعَهَا وَرَدَّ ثَمَنَهَا إِلَى بَيْتِ الْمَالِ وَإِنْ مَاتَ أَبُوهُ وَخَلَّفَ اِبْنًا وَخُنْثَى فَالْمَالُ بَيْنَهُمَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى ثَلٰثَةِ أَسْهُمٍ لِلْاِبْنِ سَهْمَانِ وَلِلْخُنْثٰى سَهْمٌ وَهُوَ أُنْثٰى عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِي الْمِيرَاثِ إِلَّا أَنْ يَّثْبُتَ غَيْرُ ذٰلِكَ وَقَالَا لِلْخُنْثٰى نِصْفُ مِيرَاثِ الذَّكَرِ وَنِصْفُ مِيرَاثِ الْأُنْثٰى وَهُوَ قَوْلُ الشَّعْبِيِّ وَاخْتَلَفَا فِي قِيَاسِ قَوْلِهِ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى سَبْعَةِ أَسْهُمٍ لِلْاِبْنِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى ثَلٰثَةٌ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى اِثْنَيْ عَشَرَ سَهْمًا لِلْاِبْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى خَمْسَةٌ۔

সরল অনুবাদ ঃ যখন সে ইমামের পিছনে নামায আদায় করবে তখন পুরুষ ও নারীদের মধ্যবর্তী সারিতে দণ্ডায়মান হবে। যদি খুনছা মুশকিলের অর্থ-সম্পদ থাকে, তবে তার অর্থে একটি দাসী ক্রয় করা হবে যে তাকে খতনা করবে। আর যদি অর্থ-সম্পদ না থাকে, তবে সরকার বায়তুল-মালের অর্থে তার জন্য দাসী ক্রয় করবে। অতঃপর যখন সে খতনা সমাধা করবে, তখন তাকে বিক্রি করে দেবে এবং তার দাম পুনরায় বায়তুল-মালে জমা করে নেবে। যদি খুনছার পিতা মৃত্যুর সময় এক পুত্র ও তাকে রেখে যায়, তবে ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে (তার পরিত্যাজ্য) সম্পদ তিন ভাগে বণ্টিত হয়ে দু' ভাগ পুত্র এবং এক ভাগ খুনছা প্রাপ্ত হবে। ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতানুসারে খুনছা উত্তরাধিকার বন্টনে নারী ধর্তব্য হবে, যদি না ব্যতিক্রম কিছু প্রমাণিত হয়। কিন্তু সাহেবাইন (রহঃ) বলেন, খুনছার জন্য পুরুষের অর্ধেক এবং নারীর অর্ধেক মিরাস প্রাপ্য হবে। ইমাম শা'বীর মত এটাই। অবশ্য এ মতের বাস্তব রূপদানে ইমাম সাহেবাইন (রঃ) পরস্পরে মতপার্থক্য করেন। ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) বলেন, সম্পদ তাদের দু'জনের মধ্যে সাত ভাগে বিভক্ত হয়ে চার ভাগ পুত্র আর তিন ভাগ খুনছা পাবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, সম্পদ তাদের মাঝে মোট বার ভাগে বিভক্ত হবে। সাত ভাগ পুত্র আর পাঁচ ভাগ খুনছা প্রাপ্য হবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

قَامَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ -এর আলোচনা ঃ হিজড়াগণ নামাযে পুরুষ ও মহিলার মাঝে কাতার বেঁধে দাঁড়াবে। কেননা সে যদি পুরুষের কাতারে দণ্ডায়মান হয়, তবে সে মহিলা হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় পুরুষের নামাযকে নষ্ট করে দেবে। আর যদি মেয়েদের কাতারে দাঁড়ায়, তবে পুরুষ হওয়ার সম্ভাবনা থাকায় মেয়েদের নামাযকে নষ্ট করে দেবে। এ কারণেই উভয়ের মাঝে দাঁড়ানোর জন্য তাদেরকে বিধান দেয়া হয়েছে। কেননা এদের শরয়ী বিধানের ক্ষেত্রে খুব বেশি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কাজেই যদি হিজড়া ব্যক্তি মেয়েদের মাঝে দাঁড়ায়, তবে সে স্বীয় নামাযকে পুনরায় আদায় করে নেবে, আর যদি পুরুষের সাথে দাড়ায় তখন তার নামায হয়ে যাবে এবং যে ব্যক্তি তার বামে ও ডানে ও সোজা পিছনে দাঁড়াবে এরা সকলেই (তিনজন) সতর্কতামূলক স্বীয় নামাযকে পুনরায় আদায় করে নেবে। কেননা হিজড়া ব্যাক্তি মহিলা হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে।

আহনাফের মতে, হিজড়া ব্যক্তিবর্গের মেয়েদের ন্যায় পর্দা করা ও নামাযে মেয়েদের ন্যায় বসা মুস্তাহাব।

وَقَالَ اَبُوْ يُوْسُفَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ইমাম আবূ ইউসুফ (রঃ) পুত্র ও খুনছা প্রত্যেকের ঐ অংশ অনুযায়ী হিসাব করেন যা তাদের একা ওয়ারিশ থাকা অবস্থায় পাওনা হয়। কেননা যদি পুত্র একা ওয়ারিশ হয়, তখন সে সম্পূর্ণ সম্পদ পাওনা হয়। আর খুনছা একা থাকলে তাকে পুরুষ ধরা হলে সম্পূর্ণ সম্পদ আর নারী ধরা হলে অর্ধেক সম্পদ প্রাপ্য হয়। কাজেই খুনছা উভয় অংশের অর্ধেক অর্ধেক পাবে। অর্থাৎ মোটের অর্ধেক এবং অর্ধাংশের অর্ধেক। এতে তার প্রাপ্য হল মোট সম্পদের তিন চতুর্থাংশ। অপরদিকে পুত্র পায় সম্পূর্ণ সম্পদ তথা পূর্ণ ৪ অংশ। সুতরাং সম্পদ মোট সাত ভাগে বিভক্ত করে তা থেকে $\frac{৪}{৭}$ পুত্রকে এবং অবশিষ্ট $\frac{৩}{৭}$ খুনছাকে দেয়া হবে।

اِثْنَا عَشَرَ الخ **-এর আলোচনা ঃ** ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) পুত্র এবং খুনছার ঐ অংশ অনুযায়ী হিসাব করেন যা তাদের একত্রে ওয়ারিশ হওয়া অবস্থায় পাওনা হয়। কেননা যদি পুত্রের সাথে খুনছাকে পুরুষ ধরা হয়, তখন সম্পদ আধা-আধি ভাগ হবে। আর যদি নারী ধরা হয়, তবে $\frac{২}{৩}$ ও $\frac{১}{৩}$ হারে ভাগ হবে। সুতরাং সম্পদ খুনছাকে পুরুষ (পুত্র) ধরা হলে ২ আর নারী (কন্যা) ধরা হলে ৩ দ্বারা ভাগ হবে। দুই এবং তিন সামঞ্জস্যহীন সংখ্যা বিধায় একটিকে অপরটির মধ্যে গুণ করতে হবে এবং তাতে গুণফল দাঁড়াবে ৬। তা থেকে খুনছার অংশ নারী হিসাবে $\frac{১}{৩}$ অর্থাৎ দুই আর পুরুষ হিসাবে $\frac{১}{২}$ অর্থাৎ তিন হয়। সুতরাং তারা এ উভয় অংশের অর্ধেক অর্ধেক প্রাপ্য হবে। সে মতে দুই এর $\frac{১}{২}$ অর্ধেক ভগ্নাংশমুক্ত থাকলেও তিন এর অর্ধেক দেড় ভগ্নাংশ মুক্ত নয়। এ জন্য উক্ত ছয়কে দুই দ্বারা গুণ করে ১২ করতে হবে। এবার ১২ থেকে খুনছার জন্য পুরুষ হিসাবে ৬ আর নারী হিসাবে ৪ নিয়ে প্রতিটির অর্ধেক করলে তার প্রাপ্য হয় পাঁচ এবং তা হয় ভগ্নাংশমুক্ত।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْخُنْثٰى -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার হুকুম কি? বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

২। اَلْخُنْثٰى -কে কখন নারী রূপে গণ্য করা হয় এবং কখন পুরুষ হিসেবে গণ্য করা হয়? বিস্তারিত লিখ।

৩। اَلْخُنْثٰى -এর নামায আদায় পদ্ধতি আলোচনা কর।

৪। ব্যাখ্যা কর ঃ

وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمَالُ بَيْنَهُمَا عَلٰى اِثْنَا عَشَرَ سَهْمًا لِلْاِبْنِ سَبْعَةٌ وَلِلْخُنْثٰى خَمْسَةٌ .

كِتَابُ الْمَفْقُوْدِ

إِذَا غَابَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُعْرَفْ لَهُ مَوْضِعٌ وَلَا يُعْلَمُ أَحَيٌّ هُوَ أَمْ مَيِّتٌ نَصَبَ الْقَاضِي مَنْ يَحْفَظُ مَالَهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ وَيَسْتَوْفِي حُقُوقَهُ وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ مِنْ مَالِهِ وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمِ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ امْرَأَتُهُ وَقُسِمَ مَالُهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمَوْجُوْدِيْنَ فِي ذٰلِكَ الْوَقْتِ وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذٰلِكَ لَمْ يَرِثْ مِنْهُ شَيْئًا وَلَا يَرِثُ الْمَفْقُوْدُ مِنْ أَحَدٍ مَاتَ فِي حَالِ فَقْدِهِ ـ

নিরুদ্দেশ ব্যক্তির পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন লোক নিরুদ্দেশ হয় এবং সে কোথায় আছে, জীবিত না মৃত জানা না যায়, তখন কাজি (তার পক্ষে একজন ওসী) নিযুক্ত করবে যে তার সহায়-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধান এবং তার পাওনাদি উসুল করবে এবং তার স্ত্রী ও নাবালেগ সন্তানদের ব্যয় তার সম্পদ থেকে ব্যবস্থা করবে। তার ও তার স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করবে না। জন্মদিন থেকে হিসাব করে যখন তার বয়স একশ বিশ বছর পূর্ণ হবে, তখন আমরা (হানাফীগণ) সে মরে গেছে বলে সিদ্ধান্ত দেব। তখন তার স্ত্রী ইদ্দত পালন করবে এবং যে সমস্ত ওয়ারিশ সে সময় বিদ্যামান থাকবে তাদের মাঝে তার অর্থ-সম্পত্তি বন্টন করা হবে। ইতঃপূর্বে যে ওয়ারিশ মরে গিয়েছে সে মিরাস পাবে না। নিরুদ্দেশ ব্যক্তি নিজেও এমন কারো থেকে মিরাস পাবে না, যে তার নিরুদ্দেশ থাকা কালে মৃত্যুবরণ করেছে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمَفْقُوْدُ-এর সংজ্ঞা ঃ اَلْمَفْقُوْدُ শব্দটি فَقْدٌ মাসদার হতে اِسْم مَفْعُوْل-এর সীগাহ্। এর অর্থ হল– যা হারিয়ে গেছে। শরীয়তের পরিভাষায়, যে ব্যক্তির কোন খোঁজ-খবর নেই যে, সে কোথায় আছে? কি করছে? জীবিত না মৃত্যু তাও জানা নেই। এমন ব্যক্তিকে اَلْمَفْقُوْدُ বলে সম্বোধন করা হয়েছে।

اَلْمَفْقُوْدُ-এর বিধান ঃ اَلْمَفْقُوْدُ-এর বিধানের ক্ষেত্রে মূলনীতি হল, তাকে তার নিজের ব্যাপারে জীবিত ধরা হবে। এ জন্যই তার স্ত্রী অন্য কারো সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারবে না; তার সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে বন্টন করা যাবে না এবং তার ইজারাও ভঙ্গ করা হবে না ইত্যাদি। অন্যের ব্যাপারে তাকে মৃত ধরা হবে। কাজেই সে অন্যের ওয়ারিশ হবে না। আর যদি তার জন্য কেউ অসিয়ত করে মৃত্যুবরণ করে, তবে তা مَفْقُوْد ব্যক্তি অসিয়তকৃত সম্পদের প্রাপক হবে না; বরং তার অংশ তার সমকক্ষদের মৃত্যু পর্যন্ত সংরক্ষণ করা হবে।

وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ الخ-এর আলোচনা ঃ নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রী সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা ও শাফেয়ী (রঃ)-এর মত হল, স্বামীর মৃত্যুর ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত সে দ্বিতীয় কোন বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে না; বরং স্বামীর অপেক্ষায় থাকবে। অপেক্ষার সময়সীমা কারো মতে নব্বই বছর, আবার কারো মতে একশ' বিশ বছর। কারণ সাধারণত মানুষ তার চেয়ে বেশি আয়ু পায় না। সে মতে উক্ত সময়সীমা অতিবাহিত হলে ইদ্দত পালন পূর্বক স্ত্রী অন্যত্র বিবাহে আবদ্ধ হতে পারবে। কিন্তু ইমাম মালেক ও আহমদ (রঃ)-এর মতানুসারে চার বছর অপেক্ষার পর স্ত্রী আবেদন করলে তাকে দ্বিতীয় বিবাহের সম্মতি দেয়া যেতে পারে। নৈতিক দৃষ্টিকোণ ও বৈবাহিক সম্পর্কের পবিত্রতা ও মর্যাদার বিচারে যদিও ইমাম শফেয়ী ও আবূ হানীফা (রঃ)-এর মত খুবই দামি ও গুরুত্ববহ, কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে নারী-পুরুষ কারো মধ্যেই যেহেতু সেই চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্ব বাকি নেই। সে কারণে হানাফী ফকীহগণ ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতের ওপর

ফতোয়া দেয়ার সম্মতি দিয়েছেন। তবে দ্বিতীয় বিয়ের সম্মতি নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে হতে হবে– (১) নিরুদ্দেশ ব্যক্তির স্ত্রী সর্বপ্রথম শরীয়া আদালতে নতুবা কোন ইসলামী জামাআতের সামনে এ কথা দাবি করবে যে, তার স্বামী এতদিন থেকে নিখোঁজ এবং তার জীবিকা নির্বাহের কোন ব্যবস্থা নেই। (২) স্ত্রী দু'জন সাক্ষীর মাধ্যমে প্রমাণ করবে যে, নিরুদ্দেশ ব্যক্তির সাথে তার বিয়ে হয়েছিল, বর্তমানে সে এতদিন থেকে নিখোঁজ এবং সে কারণে এখন সে বিবাহ ছিন্ন করতে চায়। (৩) মামলা দায়ের হওয়ার পর হাকিম বা সে ইসলামী জামাআত সম্ভাব্য সকল উপায়ে নিরুদ্দেশ ব্যক্তির অনুসন্ধান চালাবে। এক পর্যায়ে যখন নিরাশ হয়ে যাবে তখন মহিলাকে ডেকে চার বছর অপেক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করবে। চার বছর পরও যদি স্বামীর কোন খোঁজ পাওয়া না যায়, তবে সে মৃত বলে সাব্যস্ত হবে। এবার স্ত্রী পুনরায় আদালত কিংবা ইসলামী জামাআতের সামনে উপস্থিত হয়ে স্বামীর মৃত্যু-পরওয়ানা সংগ্রহ পূর্বক দ্বিতীয় বিয়ের সম্মতি নেবে। অতঃপর চারমাস দশদিন ইদ্দত পালন করে বিয়ের যোগ্যতা অর্জন করবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْمَفْقُوْدُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার বিধান কি? এ ক্ষেত্রে মূলনীতি কি? বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

২। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اِمْرَأَتِهِ فَإِذَا تَمَّ لَهُ مِائَةٌ وَّعِشْرُونَ سَنَةً مِنْ يَوْمٍ وُلِدَ حَكَمْنَا بِمَوْتِهِ وَاعْتَدَّتْ اِمْرَأَتُهُ الخ ·

كِتَابُ الْاِبَاقِ

وَإِذَا اَبَقَ الْمَمْلُوكُ فَرَدَّهُ رَجُلٌ عَلٰى مَوْلَاهُ مِنْ مَسِيْرَةِ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا فَلَهُ عَلَيْهِ جُعْلُهُ وَهُوَ اَرْبَعُوْنَ دِرْهَمًا وَاِنْ رَدَّهُ لِاَقَلِّ مِنْ ذَالِكَ فَبِحِسَابِهِ وَاِنْ كَانَتْ قِيْمَتُهُ اَقَلَّ مِنْ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا قَضٰى لَهُ بِقِيْمَتِهِ اِلَّا دِرْهَمًا وَاِنْ اَبَقَ مِنَ الَّذِىْ رَدَّهُ فَلَا شَئَ عَلَيْهِ وَلَا جُعْلَ لَهُ وَيَنْبَغِىْ اَنْ يَّشْهَدَ اِذَا اَخَذَهُ اَنَّهُ يَاخُذُ لِيَرُدَّ عَلٰى صَاحِبِهِ فَاِنْ كَانَ الْعَبْدُ الْاٰبِقُ رِهْنًا فَالْجُعْلُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ـ

পলাতক কৃতদাসের পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন কৃতদাস পালিয়ে যায়, অতঃপর কোন স্বহৃদয় ব্যক্তি যদি তিন দিন ভ্রমণের দূরত্ব (৪৮ মাইল) বা বেশি হতে এনে তা ফিরিয়ে দেয়, তবে তার জন্য ৪০ দিরহাম মজুরি হবে। আর যদি দূরত্ব তার চেয়ে কম হয়, তবে তার হিসাব অনুপাতে হবে। আর যদি তার মূল্য চল্লিশ দিরহামের কম হয়, তবে এক দিরহাম কম তার মূল্যের ফয়সালা দেয়া হবে। আর যদি ফেরতদাতা পালিয়ে যায়, তবে তার ওপর কোন কিছুই নেই এবং তার জন্য মজুরি হবে না। গোলাম আটক করার সময় সাক্ষী রাখা উচিত যে, আমি একে মালিকের নিকট পৌছানোর জন্য আটক করছি। পলাতক গোলাম যদি বন্ধকী সম্পদ হয়, তবে তার মজুরি مرتهن -এর ওপর বর্তাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْاِبَاقُ -এর সংজ্ঞা ঃ اَلْاِبَاقُ শব্দটি বাবে ضَرَبَ -এর মাসদার, অর্থ হল– পলায়ন করা, গোলাম তার মনিবের নিকট থেকে পলায়ন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, যে সকল গোলাম ও বাঁদি স্বীয় মনিবের কাজ-কর্মের তোয়াক্কা না করে পালিয়ে অন্যত্র চলে যায়, তাদেরকে اَلْاِبَاقُ বলা হয়।

গোলাম ও বাঁদির সংরক্ষণে সক্ষম হলে মালিকের নিকট পৌছে দেয়ার শর্তে পলাতক গোলাম বাঁদিকে আটক করা মুস্তাহাব।

فَبِحِسَابِهِ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি তিন দিনের কম দূরত্বের পথ হয়, তবে তিন দিনকে ভাগ করে প্রতি দিনের জন্য ১৩ দিরহাম ও এক দিরহামের এক তৃতীয়াংশ হিসেবে মজুরি দেবে। কেউ কেউ বলেছেন, বিচারকের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতেই মজুরি প্রদান করা হবে। (এর ওপরই ফতোয়া) ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর নিকট যদি মনিব মজুরি প্রদানের শর্ত করে তবে তা পাবে, অন্যথা পাবে না। আমাদের দলিল হল, এক্ষেত্রে মজুরি প্রদানের ব্যাপারে হযরত সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর ইজমা রয়েছে। শুধুমাত্র পরিমাণের ক্ষেত্রে মতানৈক্য রয়েছে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْاِبَاقُ -এর শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ লিখ।

২। اَلْاِبَاقُ -এর গ্রেফতার করা সম্পর্কে যা জান লিখ।

৩। وَاِنْ رَدَّهُ لِاَقَلِّ مِنْ ذَالِكَ فَبِحِسَابِهِ الخ -এর ব্যাখ্যা লিখ।

كِتَابُ إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ

اَلْمَوَاتُ مَالَا يُنْتَفَعُ بِهِ مِنَ الْاَرْضِ لِاِنْقِطَاعِ الْمَاءِ عَنْهُ اَوْ لِغَلَبَةِ الْمَاءِ عَلَيْهِ اَوْ مَا اَشْبَهَ ذٰلِكَ مِمَّا يَمْنَعُ الزِّرَاعَةَ فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًا لَامَالِكَ لَهُ اَوْ كَانَ مَمْلُوكًا فِى الْاِسْلَامِ وَلَا يُعْرَفُ لَهُ مَالِكٌ بِعَيْنِهِ وَهُوَ بَعِيدٌ مِنَ الْقَرْيَةِ بِحَيْثُ اِذَا وَقَفَ اِنْسَانٌ فِى اَقْصَى الْعَامِرِ فَصَاحَ لَمْ يُسْمَعِ الصَّوْتُ فِيهِ فَهُوَ مَوَاتٌ ـ مَنْ اَحْيَاهُ بِاِذْنِ الْاِمَامِ مَلَكَهُ وَاِنْ اَحْيَاهُ بِغَيْرِ اِذْنِهِ لَمْ يَمْلِكْهُ عِنْدَ اَبِى حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُهُ وَيَمْلِكُهُ الذِّمِّىُّ بِالْاِحْيَاءِ كَمَا يَمْلِكُهُ الْمُسْلِمُ ـ

পতিত ভূমি পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ পানি সরবরাহ কিংবা জলাবদ্ধতা অথবা চাষাবাদের পথে অন্তরায় অন্য কোন অসুবিধার দরুন যে ভূমি ভোগ-ব্যবহার করা যায় না (আভিধানিক অর্থে) তাকে পতিত ভূমি বলে। এ ধরনের ভূমি দীর্ঘ দিন থেকে যদি মালিকানাবিহীন পড়ে থাকে অথবা দেশ ইসলামের দখলে আসার পর (কোন মুসলিম বা জিম্মির) মালিকানাভুক্ত থাকলেও বর্তমানে নির্দিষ্ট কোন মালিকের সন্ধান পাওয়া না যায় এবং সেটা জনপদ থেকে এতদূরে অবস্থিত হয় যে, জনপদের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে কেউ চিৎকার দিয়ে ডাকলেও জমি থেকে আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায় না, তবে তা (শরয়ী দৃষ্টিতে) পতিত। সরকারের অনুমতি সাপেক্ষে কেউ তা আবাদ করলে সে তার মালিক হয়ে যাবে। আর যে অনুমতিবিহীন আবাদ করে, তবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে মালিক হবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, মালিক হয়ে যাবে। কোন জিম্মি নাগরিক পতিত ভূমি আবাদ করলে মুসলমানের ন্যায় সেও তার মালিক হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ -এর আলোচনা ঃ إِحْيَاء -এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল জমিনের মধ্যে কৃষিকাজ করার মতো শক্তির সঞ্চার করা বা অনাবাদী ভূমিকে আবাদ করা। اَلْمَوَاتُ শব্দের আভিধানিক অর্থ-মৃত বা মালিকানাহীন জমি। শরীয়তের পরিভাষায়, লোকালয় থেকে দূরে অবস্থিত মালিকানাহীন অনাবাদ পড়ে থাকা জমিকে 'মাওয়াত' বলা হয়। মনে রাখতে হবে, ইসলামের ভূমিনীতিতে মালিকানা লাভ ও ভোগ দখলের দৃষ্টিতে জমিকে চারটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে।

প্রথমত ঃ আবাদ ও মালিকানাধীন জমি। কেউনা কেউ তা আবাদ করে তাতে বসবাস কিংবা কৃষিকাজ ইত্যাদি উপায়ে ভোগ করে আসছে।

দ্বিতীয়ত ঃ কারো মালিকানাভুক্ত জমি বটে কিন্তু তা অনাবাদ পড়ে রয়েছে। এতে পানি সেচ করা হয় না। আগাছা বা জঙ্গল পরিষ্কার করা হয় না এবং চাষাবাদ বা বসবাসের কাজেও ব্যবহার করা হয় না। এ উভয় প্রকার জমি মালিকেরই অধিকারভুক্ত থাকবে। মালিকের বৈধ সম্মতি ছাড়া অপর কেউ তা ভোগ-ব্যবহার বা দখল করতে পারবে না। তবে রাষ্ট্র ও জাতির বৃহত্তর কোন কল্যাণের প্রশ্ন দেখা দিলে তখন ব্যাপারটি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিবেচনা করতে হবে।

তৃতীয়ত ঃ জনগণের সাধারণ কল্যাণের জন্য নির্দিষ্ট জমি। এক গ্রামবাসীর গৃহ-পালিত পশুর জন্য নির্দিষ্ট চারণভূমি কিংবা কাঠ আহরণক্ষেত্র অথবা মসজিদ, ঈদগাহ বা কবরস্থান প্রভৃতি সার্বজনীন কাজের জন্য নির্ধারিত জমি এ পর্যায়ে গণ্য। এ শ্রেণীর জমির বিধান হল, এককভাবে কেউ তা মালিক হতে পারবে না; বরং তা ব্যবহার করা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার অধিকার সর্বসাধারণের জন্য সর্বদা উন্মুক্ত থাকবে।

চতুর্থত ঃ অনাবাদী ও পরিত্যক্ত জমি যার কোন মালিক নেই এবং কেউ তা ভোগ ব্যবহারও করছে না। এ পর্যায়ের জমি-জায়গাকে ইসলামী অর্থনীতির পরিভাষায় মাওয়াত (مَوَات) বলা হয়। যেমন– নতুন চরাভূমি, বন-জঙ্গল বা পড়ো জমি। এ প্রকার জমির বিধান হল, কোন ব্যক্তি সরকারের অনুমতিক্রমে তা আবাদ করলে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে।

فَمَا كَانَ مِنْهَا عَادِيًا الخ -এর আলোচনা ঃ عَادِيًّا অর্থ– পুরাতন জিনিস। প্রকাশ থাকে যে, কোন দেশে ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হওয়ার সময় সে দেশের জমি-ক্ষেতের সাধারণত কয়েকটি অবস্থা থাকতে পারে। (ক) অনাবাদী পড়ে থাকা জমি অর্থাৎ এমন জমি যার ওপর এখনো কারো মালিকানা স্থাপিত হয়নি। (যেমন– নতুন চরাভূমি, বন-জঙ্গল বা পরিত্যক্ত জমি) কিংবা যার মালিক মৃত বা লুপ্ত হয়ে গিয়েছে, উত্তরাধিকারী কেউ নেই। (খ) মুসলমানদের ভোগাধিকারভুক্ত জমি। (গ) অমুসলিমদের ভোগাধিকার-ভুক্ত জমি। (ঘ) যে সমস্ত জায়গা-জমিকে পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি রূপে নির্ধারিত করা হয়েছে। ইসলামী অর্থনীতির ভাষায় যাকে খালেসা (خَالِصَه) বলা হয়।

ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম হওয়ার পর শেষোক্ত প্রকার জমি পূর্বানুরূপ রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বাধীন থাকবে। রাষ্ট্র তা নিজস্ব কাজে ব্যবহার করবে কিংবা তা থেকে অর্থ সরকারি কাজে ব্যয় করবে। প্রথমোক্ত প্রকার জমি-জায়গা আবাদ ও চাষ উপযোগী করে তাতে ফসল উৎপাদনের জন্য ভূমিহীন লোকদের মধ্যে সুবিচারমূলক নীতি অনুযায়ী বন্টন করতে হবে। এভাবে একজন নাগরিক যে জমি লাভ করবে এবং তা আবাদ ও চাষ-উপযোগী করে নেবে সে ঐ জমির মালিক বিবেচিত হবে।

بِإِذْنِ الْإِمَامِ الخ -এর আলোচনা ঃ ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট বিচারকের সম্মতিক্রমে সে মালিক হয়ে যাবে। আর সাহেবাইনের নিকট বিচারকের সম্মতি ব্যতীতই সে উহার মালিক হয়ে যাবে।

وَمَنْ أَحْيَاهُ الخ -এর আলোচনা ঃ إِحْيَاءٌ অর্থ–সঞ্জীবিত করা, আবাদ করা। আবাদ করার অর্থ হল, জমিনে বন-জঙ্গল ও আগাছা-পরগাছা থাকলে কেটে সাফ করা, পানি না থাকলে তা সিঞ্চন করা এবং পানিতে ডুবে থাকলে তা নিষ্কাষণ করা, চাষাবাদ করা, কিংবা ঘরবাড়ি নির্মাণ করা।

وَمَنْ حَجَرَ اَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلٰثَ سِنِيْنَ اَخَذَهَا الْاِمَامُ مِنْهُ وَدَفَعَهَا اِلٰى غَيْرِهٖ وَلَا
يَجُوْزُ اِحْيَاءُ مَا قَرُبَ مِنَ الْعَامِرِ وَيُتْرَكُ مَرْعًى لِاَهْلِ الْقَرْيَةِ وَمَطْرَحًا لِحَصَائِدِهِمْ
وَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِىْ بَرِّيَّةٍ فَلَهٗ حَرِيْمُهَا فَاِنْ كَانَتْ لِلْعَطَنِ فَحَرِيْمُهَا اَرْبَعُوْنَ ذِرَاعًا وَاِنْ
كَانَتْ لِلنَّاضِحِ فَحَرِيْمُهَا سِتُّوْنَ ذِرَاعًا وَاِنْ كَانَتْ عَيْنًا فَحَرِيْمُهَا خَمْسُمِائَةِ ذِرَاعٍ
فَمَنْ اَرَادَ اَنْ يَّحْفِرَ بِئْرًا فِىْ حَرِيْمِهَا مُنِعَ مِنْهُ وَمَا تَرَكَ الْفُرَاتُ وَالدِّجْلَةُ وَعَدَلَ عَنْهُ
الْمَاءُ فَاِنْ كَانَ يَجُوْزُ عَوْدُهٗ اِلَيْهِ لَمْ يَجُزْ اِحْيَاؤُهٗ وَاِنْ كَانَ لَا يَجُوْزُ اَنْ يَعُوْدَ اِلَيْهِ فَهُوَ
كَالْمَوَاتِ اِذَا لَمْ يَكُنْ حَرِيْمًا لِعَامِرٍ يَمْلِكُهٗ مَنْ اَحْيَاهُ بِاِذْنِ الْاِمَامِ وَمَنْ كَانَ لَهٗ نَهْرٌ
فِىْ اَرْضِ غَيْرِهٖ فَلَيْسَ لَهٗ حَرِيْمٌ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ
الْبَيِّنَةُ عَلٰى ذٰلِكَ وَعِنْدَهُمَا لَهٗ مُسَنَّاةُ النَّهْرِ يَمْشِىْ عَلَيْهَا وَيُلْقِىْ عَلَيْهَا طِيْنَهٗ۔

সরল অনুবাদ ঃ যদি কোন ব্যক্তি জমি বেড়া দিয়ে তিন বছর যাবৎ অনাবাদ ফেলে রাখে তবে সরকার সে জমি তার থেকে নিয়ে অন্য (দক্ষ পরিশ্রমী কৃষক) কে দিয়ে দেবে। জনবসতির নিকটস্থ পতিত ভূমি আবাদ করা যাবে না। জনপদবাসীর জন্য চারণভূমি ও ক্ষেতিফসল শুকানোর মাঠস্বরূপ তা রেখে দিতে হবে। অনাবাদী বন-জঙ্গলে কোন ব্যক্তি কূপ খনন করলে কূপের চতুষ্পার্শ্বও তার প্রাপ্য হবে; কূপ পশুপালের পানি পানের জন্য হলে চতুষ্পার্শ্ব সাব্যস্ত হবে প্রত্যেক দিকে চল্লিশ হাত করে। আর জমি সেচের জন্য হলে চতুষ্পার্শ্ব হবে ষাট হাত করে এবং ঝর্না হলে প্রাপ্য হবে পাঁচ শত হাত। অপর কেউ এ পরিসীমার মধ্যে কূপ খনন করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়া হবে। ফোরাত (ইউফ্রেটিস) এবং দাজলা (তাইগ্রিস) নদী যদি কোন চরা ফেলে এবং পানির গতিপ্রবাহ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়, তবে যদি এ শ্রোতধারা পুনরায় এ দিকে ফিরে আসার সম্ভাবনা না থাকে এবং কোন জনপদের পাদদেশে অবস্থিত না হয়, তবে তা পতিততুল্য হবে। সরকারের অনুমতিক্রমে কেউ তা আবাদ করলে তাতে তার মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হবে। কোন ব্যক্তির প্রণালী (Drain) অপরের ভূমি সংলগ্ন হলে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর মতে সে উপযুক্ত প্রমাণাদি ব্যতীত প্রণালীর পার্শ্বদেশের অধিকারী হবে না। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, প্রণালীর পাড় তার প্রাপ্য হবে– তার ওপর সে চলাচল করবে এবং (জমে যাওয়া) পলি কেটে তথায় ফেলবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَخَذَهَا الْاِمَامُ مِنْهُ الخ -এর আলোচনা ঃ যে ব্যক্তি পতিত জমিতে পাথর ইত্যাদি স্তুপ আকারে বা সারিবদ্ধ ভাবে রেখে দেয় এবং এ ভাবেই তিন বৎসর পর্যন্ত ছেড়ে রাখে আর তাতে হাল-চাষ না করে, তবে এ কাজের কারণে সে ঐ জমিনের মালিক হবে না বরং তার থেকে জমিন নিয়ে অন্যকে দিয়ে দেয়া হবে। যাতে করে সে উহাকে কৃষি উপযোগী করে তোলে। কেননা হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন– لَيْسَ لِلْمُحْتَجِرِ حَقٌّ بَعْدَ ثَلَاثِ سِنِيْنَ অর্থাৎ পাথর স্থাপন কারীর জন্য তিন বৎসর পর আর কোন অধিকার নেই। এবং পাথর রেখে দেয়া বা দেয়াল করা এটা দ্বারা اِحْيَاءُ مَوَاتٍ হয় না; বরং এটাতো শুধু একটি নিদর্শন মাত্র।

وَمَنْ كَانَ لَهُ نَهْرٌ الخ -এর আলোচনা ঃ অপরের মালিকানাভুক্ত জমিতে কারো নর্দমা বা খাল থাকলে ইমাম সাহেবের মতে পাড় (আল) প্রাপ্য হবে না। (যদি না তার নিকট কোন প্রমাণ থাকে।) কিন্তু সাহেবাইনের মতে সে এ পরিমাণ আলের অধিকারী হবে, যাতে সে চলাচল করতে পারে এবং প্রয়োজনে তলায় জমে যাওয়া মাটি কেটে সেখানে ফেলতে পারে। এরই ওপর ফতোয়া।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ -এর সংজ্ঞা দাও এবং তার বিধান বিস্তারিতভাবে আলোচনা কর।

২। وَمَنْ حَجَرَ أَرْضًا وَلَمْ يَعْمُرْهَا ثَلَاثَ سِنِيْنَ أَخَذَهَا الْإِمَامُ مِنْهُ الخ -এর ব্যাখ্যা কর।

كِتَابُ الْمَاذُوْنِ

اِذَا اَذِنَ الْمَوْلٰى لِعَبْدِهٖ اِذْنًا عَامًّا جَازَ تَصَرُّفُهٗ فِىْ سَائِرِ التِّجَارَاتِ وَلَهٗ اَنْ يَّشْتَرِىَ وَيَبِيْعَ وَيَرْهَنَ وَيَسْتَرْهِنَ وَاِنْ اَذِنَ لَهٗ فِىْ نَوْعٍ مِّنْهَا دُوْنَ غَيْرِهٖ فَهُوَ مَاذُوْنٌ فِىْ جَمِيْعِهَا فَاِذَا اَذِنَ لَهٗ فِىْ شَئٍ بِعَيْنِهٖ فَلَيْسَ بِمَاذُوْنٍ وَاِقْرَارُ الْمَاذُوْنِ بِالدُّيُوْنِ وَالْغُصُوْبِ جَائِزٌ ـ وَلَيْسَ لَهٗ اَنْ يَّتَزَوَّجَ وَلَا اَنْ يُّزَوِّجَ مَمَالِيْكَهٗ وَلَا يُكَاتِبَ وَلَا يُعْتِقَ عَلٰى مَالٍ وَلَا يَهَبَ بِعَوْضٍ وَلَا بِغَيْرِ عَوَضٍ اِلَّا اَنْ يَّهْدِىَ الْيَسِيْرَ مِنَ الطَّعَامِ اَوْ يُضَيِّفَ مَنْ يُّطْعِمُهٗ وَدُيُوْنُهٗ مُتَعَلِّقَةٌ بِرَقَبَتِهٖ يُبَاعُ فِيْهَا لِلْغُرَمَاءِ اِلَّا اَنْ يَّفْدِيَهُ الْمَوْلٰى وَيُقَسَّمُ ثَمَنُهٗ بَيْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ دُيُوْنِهٖ شَئٌ طُوْلِبَ بِهٖ بَعْدَ الْحُرِّيَّةِ وَاِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ لَمْ يَصِرْ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ حَتّٰى يَظْهَرَ الْحَجْرُ بَيْنَ اَهْلِ السُّوْقِ ـ فَاِنْ مَاتَ الْمَوْلٰى اَوْ جُنَّ اَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ مُرْتَدًّا صَارَ الْمَاذُوْنُ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ وَلَوْ اَبَقَ الْعَبْدُ الْمَاذُوْنُ صَارَ مَحْجُوْرًا عَلَيْهِ وَاِذَا حَجَرَ عَلَيْهِ فَاِقْرَارُهٗ جَائِزٌ فِيْمَا فِىْ يَدِهٖ مِنَ الْمَالِ عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا لَايَصِحُّ اِقْرَارُهٗ ـ

অনুমতি প্রাপ্ত দাসের পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ যখন কোন মনিব স্বীয় গোলামকে সাধারণ অনুমতি প্রদান করে, তখন সকল ব্যবসার ক্ষেত্রেই তার হস্তক্ষেপ বৈধ হবে। এবং তার ক্রয়-বিক্রয়, জমা রাখা, জমা দেয়ার স্বাধীনতা থাকবে। যদি তাকে কোন একটির ক্ষেত্রে অনুমতি প্রদান করে অন্য গুলোর ক্ষেত্রে নয়, তবুও প্রত্যেক ব্যবসায়ই সে অনুমতি প্রাপ্ত বলে বিবেচিত হবে। হাঁ, যদি কোন নির্দিষ্ট বস্তুতে অনুমতি প্রদান করে, তবে সে অনুমতি প্রাপ্ত বা اَلْمَاذُوْنُ হিসেবে বিবেচিত হবে না। اَلْمَاذُوْنُ -এর স্বীকারোক্তি ঋণ ও ছিনাতাইকৃত বস্তুর ক্ষেত্রে বৈধ হবে। এবং সে নিজেও বিবাহ করতে পারবে না এবং অন্যান্য ভৃত্যদেরকেও বিবাহ করাতে পারবে না, মুকাতাবও বানাতে পারবে না এবং সম্পদের বিনিময় মুক্তও করতে পারবে না, বিনিময় বা বিনিময়হীন ভাবে দানও করতে পারবে না। কিন্তু সামান্য খাবার تُحْفَه হিসেবে প্রদান করলে অথবা যে ব্যক্তি তাকে মেহমানদারী করেছে তাকে সে ভক্ষণ করালে, তার ঋণ তারই ওপর বর্তাবে, যার মধ্যে ঋণ গ্রহীতাদের জন্য উহাকে বিক্রি করে দেয়া হবে। তবে তার মনিব তার প্রতিদান দিয়ে দেবে এবং তার মূল্য বন্টন করা হবে অংশ অনুপাতে। এরপরও যদি কিছু ঋণ থেকে যায়, তবে সে মুক্ত হওয়ার পর তার থেকে তা চাওয়া হবে। এরপর যদি মনিব তার ওপর حَجَر করে দেয়, তবে সে مَحْجُوْر হবে না। এমনকি حَجَر টা বাজারীদের মধ্যে প্রকাশ হয়ে যাবে। সুতরাং যদি মনিব মৃত্যুবরণ করে অথবা মুরতাদ হয়ে দারুল হরবে চলে যায়, তখন অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি اَلْمَحْجُوْر عَلَيْه হবে। আর যদি অনুমতি প্রাপ্ত কৃতদাস পলায়ন করে, তবে সে مَحْجُوْر عَلَيْه হয়ে যাবে। এবং যখন حَجَر করে দেয়া হল তখন তার অধীনস্থ সম্পদের ক্ষেত্রে তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ)-এর নিকট। আর সাহেবাইনের নিকট তার স্বীকারোক্তি বৈধ হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمَاذُوْنُ-এর সংজ্ঞা ঃ اَلْمَاذُوْنُ শব্দটি اِسْم مَفْعُوْل -এর وَاحِد مُذَكَّر -এর সীগাহ। اَلْإِذْنُ মাসদার হতে। এর অর্থ হল অনুমতি প্রাপ্ত। শরীয়তের পরিভাষায়, কোন কৃতদাসের স্বীয় মালিকের পক্ষ হতে সন্তুষ্ট চিত্তে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অনুমতি প্রাপ্ত হওয়াকে اَلْمَاذُوْنُ বলা হয়।

اِذْنًا عَامًّا الخ-এর আলোচনা ঃ যেমন বলল, আমি তোমায় ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করলাম, তখন কৃতদাস সর্বপ্রকার ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত হবে। কেননা মতলক অনুমতি সকল প্রকারের ব্যবসাকে শামিল করবে। যদি মনিব কোন বিশেষ প্রকারের ব্যবসার অনুমতি প্রদান করে তবুও আমাদের নিকট সব ধরনের ব্যবসার অনুমতি প্রাপ্ত হবে। ইমাম যুফার, শাফেয়ী ও আহমদ (রঃ)-এর নিকট শুধুমাত্র সেই প্রকারের ব্যবসা করারই অনুমতি প্রাপ্ত হবে যার সে অনুমতি দিয়েছে। কেননা তাদের নিকট অনুমতি দেয়ার অর্থ হল উকিল ও প্রতিনিধি বানানো। কাজেই মালিক যে জিনিসের সাথে হুকুমকে নির্দিষ্ট করবে তা তার সাথে নির্দিষ্ট থাকবে। আর আমাদের নিকট অনুমতি দেয়ার অর্থ হল, প্রতিবন্ধকতা দূর করা ও স্বীয় অধিকারে ছাড় দেয়া। এবং প্রতিবন্ধকতা দূর হওয়ার পর কৃতদাস স্বীয় যোগ্যতার ভিত্তিতে تَصَرُّف করতে সক্ষম হয়। কাজেই সকল প্রকারেই تَصَرُّف করতে পারবে। হ্যাঁ, তবে যদি কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের ক্ষেত্রে অনুমতি দেয়, তবে সে مَاذُوْن হবে না, কেননা এটা বাস্তবিক পক্ষে اِسْتِخْدَام হয়ে থাকে; اذن নয়।

وَاِنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الخ-এর আলোচনা ঃ যদি মনিব ماذون কৃতদাসকে مَحْجُوْرُ التَّصَرُّفِ করে দেয়, তবে সে مَحْجُوْرُ التَّصَرُّفِ হয়ে যাবে। তবে শর্ত হল, এ বিষয়ে তার ও বাজারী ব্যক্তিবর্গের অবহিত হতে হবে, যাতে করে তার সাথে লেনদেন করে অন্যরা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়। কিন্তু আইম্মায়ে ছালাছার নিকট এ শর্ত নেই। আমরা বলব যে, যদি এ ব্যাপারে জানানো ব্যতীত তাকে مَحْجُوْر স্বীকৃতি দেয়া হয়, তবে حَجَر-এর পর সে যে সকল تَصَرُّف করেছে, সে ঋণ তাকে মুক্ত হওয়ার পর পরিশোধ করতে হবে। আর এতে লেনদেনকারীদের অধিকার প্রাপ্তিতে বিলম্বিত হয়ে পড়বে, যাতে তাদের জন্য ক্ষতি রয়েছে।

وَاِذَا اَلْزَمَتْهُ دُيُوْنٌ تُحِيْطُ بِمَالِهٖ وَ رَقَبَتِهٖ لَمْ يَمْلِكِ الْمَوْلٰى مَافِىْ يَدِهٖ فَاِنْ اَعْتَقَ عَبِيْدَهٗ لَمْ يُعْتَقُوْا عِنْدَ اَبِىْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى وَقَالَا رَحِمَهُمَا اللّٰهُ تَعَالٰى يَمْلِكُ مَافِىْ يَدِهٖ - وَاِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ مِنَ الْمَوْلٰى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ جَازَ وَاِنْ بَاعَ بِنُقْصَانٍ لَمْ يَجُزْ وَاِنْ بَاعَهُ الْمَوْلٰى شَيْئًا بِمِثْلِ الْقِيْمَةِ اَوْ اَقَلَّ جَازَ الْبَيْعُ فَاِنْ سَلَّمَهٗ اِلَيْهِ قَبْلَ قَبْضِ الثَّمَنِ بَطَلَ الثَّمَنُ وَاِنْ اَمْسَكَهٗ فِىْ يَدِهٖ حَتّٰى يَسْتَوْفِىَ الثَّمَنَ جَازَ - وَاِنْ اَعْتَقَ الْمَوْلٰى الْعَبْدَ الْمَاذُوْنَ وَعَلَيْهِ دُيُوْنٌ فَعِتْقُهٗ جَائِزٌ وَالْمَوْلٰى ضَامِنٌ بِقِيْمَتِهٖ لِلْغُرَمَاءِ وَمَا بَقِىَ مِنَ الدُّيُوْنِ يُطَالَبُ بِهِ الْمُعْتَقُ وَاِذَا وَلَدَتِ الْمَاذُوْنَةُ مِنْ مَوْلٰهَا فَذَالِكَ حَجْرٌ عَلَيْهَا وَاِنْ اَذِنَ وَلِىُّ الصَّبِىِّ لِلصَّبِىِّ فِى التِّجَارَةِ فَهُوَ فِى الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ كَالْعَبْدِ الْمَاذُوْنِ اِذَا كَانَ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ -

সরল অনুবাদ ঃ এবং যখন তার জিম্মায় তার সম্পদ ও জানের চেয়েও বেশি ঋণ হয়, তখন মনিব তার নিকট রক্ষিত সম্পদের মালিক হবে না। কাজেই সে যদি তার কৃতদাসদের মুক্ত করে দেয়, তবে ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট তারা মুক্ত হবে না। সাহেবাইন (রঃ) বলেন যে, মালিক সে সম্পদের মালিক হবে। যদি مَاذُوْن গোলাম স্বীয় মনিবের নিকট কোন জিনিস مِثْل قِيْمَت বা সমমূল্যের সাথে বিক্রি করে, তবে তা বৈধ হবে। আর যদি লোকসানে বিক্রি করে, তবে তা বৈধ নয়। আর যদি مِثْل قِيْمَت তথা সমমূল্য বা তার চেয়ে কমে মনিব তার নিকট কোন কিছু বিক্রি করে, তবে সে بَيْع বৈধ হবে। যদি তা ثَمَن নেয়ার পূর্বেই অর্পণ করে দেয়, তবে ثَمَن বাতিল হয়ে যাবে। আর যদি মনিব عَبْد مَاذُوْن-কে মূল্য আদায় করা পর্যন্ত আটকে রাখে, তবে তা বৈধ হবে। আর যদি মনিব عَبْد مَاذُوْن-কে তার ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মুক্ত করে দেয়, তবে তা বৈধ হবে এবং মনিব ঋণ দাতাদের জন্য তার মূল্যের ضَامِن হবে। এরপরও যা বাকি থাকে তা مُعْتَق থেকে চাওয়া হবে। আর যদি اَلْمَاذُوْنَةُ বাঁদি সন্তান প্রসব করে তার মনিবের থেকে, তখন এটা তার ওপর হাজরের কারণ হবে। যদি কোন বাচ্চাকে তার ওলী ব্যবসার অনুমতি দেয়, তবে সে বেচাকেনার ক্ষেত্রে অনুমতি প্রাপ্ত কৃতদাসের ন্যায়; যদি সে বেচাকেনা সম্পর্কে বুঝমান হয়ে থাকে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَاِذَا بَاعَ عَبْدٌ مَاذُوْنٌ الخ-এর আলোচনা ঃ যদি مَاذُوْن গোলাম স্বীয় মনিবের সাথে উপযুক্ত মূল্যে কোন বেচাকেনা করে, তবে তা বৈধ হবে। তবে এটা ঐ অবস্থায় হবে যখন কৃতদাস ঋণী হবে। কেননা সে সময় তার মনিব তার উপার্জনের ব্যাপারে অপরিচিতের ন্যায়। আর যদি সে ঋণী না হয়, তবে তাদের মধ্যে বেচাকেনা বৈধ হবে না। কেননা গোলাম ও তার সম্পদ সবই তার মনিবের জন্য। আর যদি عَبْد مَاذُوْن স্বীয় মনিবের নিকট লোকসানের সাথে বিক্রি করে, তবে তা বৈধ নয়। কেননা এতে অপবাদের সম্ভাবনা রয়েছে। এটা ইমাম আযমের (রহঃ) নিকট। সাহেবাইনের নিকট এটাও জায়েয।

وَاِنْ اَعْتَقَ الْمَوْلٰى الخ -এর আলোচনা ঃ মনিব তার مَاذُوْن গোলামকে মুক্ত করতে পারে। কেননা তাতে তার মালিকানা বহাল রয়েছে। এতে কারো দ্বিমত নেই। দ্বিমত হল যখন গোলামের উপার্জনের ক্ষেত্রে তার ওপর دَيْن مُحِيْط থাকে, তখন মনিব আযাদ করে দিলে গোলামের সমমূল্যের ক্ষতিপূরণ মনিবকে দিতে হবে। কেননা তাদের অধিকার গোলামের সত্তার সাথে সম্পৃক্ত। আর মনিব তাকে মুক্ত করে দেয়ায় তার ওপরই তা বর্তাবে। আর যদি গোলামের সমমূল্যের চেয়েও বেশি ঋণ থাকে, তবে বাকি ঋণ গোলামের থেকে আদায় করা হবে।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। اَلْمَاذُوْن -এর সংজ্ঞা দাও এবং এর হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।
২। اَلْمَاذُوْنَة বাঁদি যদি সন্তান প্রসব করে তখন তার বিধান কি? বুঝিয়ে দাও।
৩। عَبْد مَاذُوْن -এর অনুমতি কখন রহিত হয়ে যায়? বিশদভাবে আলোচনা কর।
৪। عَبْد مَاذُوْن ঋণগ্রস্ত হলে তার হুকুম কি? এবং এমতাবস্থায় তাকে মুক্ত করা হলে সে মুক্ত হবে কিনা? বিস্তারিত লিখ।
৫। عَبْد مَاذُوْن -এর সাথে তার মনিব বেচাকেনা করতে পারে কিনা? বুঝিয়ে দাও।

كِتَابُ الْمُزَارَعَةِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ بَاطِلَةٌ وَقَالَا جَائِزَةٌ وَهِىَ عِنْدَهُمَا عَلٰى اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ : اِذَا كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَذْرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ - وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ وَالْبَقَرُ وَالْبَذْرُ لِاٰخَرَ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ - وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَذْرُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ جَازَتْ - وَاِنْ كَانَتِ الْاَرْضُ وَالْبَقَرُ لِوَاحِدٍ وَالْبَذْرُ وَالْعَمَلُ لِوَاحِدٍ فَهِىَ بَاطِلَةٌ - وَلَا تَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ اِلَّا عَلٰى مُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ وَاَنْ يَكُوْنَ الْخَارِجُ بَيْنَهُمَا مُشَاعًا فَاِنْ شَرَطَا لِاَحَدِهِمَا قُفْزَانًا مُسَمَّاةً فَهِىَ بَاطِلَةٌ وَكَذٰلِكَ اِذَا شَرَطَا مَا عَلَى الْمَاذِيَانَاتِ وَالسَّوَاقِىْ وَاِذَا صَحَّتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ بَيْنَهُمَا عَلَى الشَّرْطِ وَاِنْ لَمْ تَخْرُجِ الْاَرْضُ شَيْئًا فَلَا شَيْئَ لِلْعَامِلِ -

পারস্পরিক চাষাবাদ পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, উৎপন্ন ফসলের তৃতীয়াংশ বা চতুর্থাংশের বিনিময়ে পারস্পরিক চাষ (বর্গাচাষ) বৈধ নয়। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, তা বৈধ। তাঁদের মতে, পারস্পরিক কৃষি কাজের চারটি ধরন হতে পারে– (ক) ভূমি ও বীজ একজনের আর শ্রম ও কৃষি যন্ত্র অন্য জনের। এভাবে মুযারা'আহ জায়েয আছে। (খ) যদি ভূমি একজনের হয় আর শ্রম, কৃষি এবং বীজ হয় অপরজনের তাতেও মুযারা'আহ (পারস্পরিক কৃষি) জায়েয। (গ) ভূমি, বীজ ও কৃষি উপকরণ একজনের হবে আর শ্রম হবে অন্য জনের, তাতেও জায়েয। (ঘ) কিন্তু যদি ভূমি ও কৃষি যন্ত্র একজনের হয় আর বীজ ও শ্রম হয় দ্বিতীয় জনের, তবে তা বৈধ নয়। নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং উৎপন্ন ফসলে উভয়ের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে না হলে মুযারা'আহ বৈধ হবে না। সুতরাং যদি তারা তাদের একজনের জন্য নির্দিষ্ট কয়েক কফিয রেখে দেয়ার শর্ত আরোপ করে, তবে মুযারা'আহ বাতিল গণ্য হবে। অনুরূপভাবে যদি খাল বা প্রণালী সংলগ্ন অংশের ফসল একজনের জন্য রাখার শর্ত আরোপ করে, তবে মুযারা'আহ বাতিল হবে। (বর্ণিত নিয়ম মাফিক) যখন মুযারা'আহ শুদ্ধ হবে, তখন উৎপন্ন ফসল উভয়ের মাঝে শর্ত মোতাবেক বণ্টিত হবে। যদি জমিতে মোটেই ফসল না ফলে, তবে চাষী কিছুই প্রাপ্য হবে না।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

اَلْمُزَارَعَةُ-এর সংজ্ঞা ঃ اَلْمُزَارَعَةُ শব্দটি زَرْعٌ হতে বাবে مُفَاعَلَةٌ-এর মাসদার। এর অর্থ হল– রোপণ করা, বীজ ফেলা, বীজ বপন করা। اَلْمُزَارَعَةُ-কে مُخَابَرَةٌ ، مُحَاقَلَةٌ ও বলা হয়। ইরাকীগণ একে قَرَاحٌ বলে থাকেন।

শরীয়তের পরিভাষায়, ভূমিজাত দ্রব্যের এক তৃতীয়াংশ বা এক চতুর্থাংশের ওপর প্রতিষ্ঠিত عَقْدٌ-কে مُزَارَعَةٌ বলা হয় বা যৌথভাবে কৃষি কার্য করাকে اَلْمُزَارَعَةُ বলা হয়। ইমাম আযম (রঃ)-এর নিকট اَلْمُزَارَعَةُ বৈধ নয়। কেননা মহানবী (সাঃ) এটাকে নিষেধ করেছেন।

তবে সাহেবাইনের নিকট তা বৈধ। এবং এর ওপরই ফতোয়া দেয়া হয়েছে। কেননা মহানবী (সাঃ) খায়বরের খেজুর বাগান مُعَامَلَةٌ-এর ভিত্তিতে ও তথাকার ভূমি مُزَارَعَةٌ-এর ভিত্তিতে তাদের অধিবাসীদেরকে প্রদান করেছিলেন। এবং এর

ওপরই সাহাবা ও তাবেয়ীদের আমল রয়েছে এবং অদ্যাবধি তা বিরাজমান রয়েছে, কাজেই خَبَر وَاحِد এবং قِيَاس -এর ভিত্তিতে এটাকে পরিত্যাগ করা যায় না।

ওপরে উল্লিখিত হয়েছে যে, মানুষ যে সকল ব্যবস্থা ও উপায়ে জীবিকা ও অন্যান্য জীবন-উপকরণ সংস্থান করে, তার প্রধানতম দু'টি মাধ্যমের একটি হল ব্যবসা, আর অপরটি কৃষি। ব্যবসায়ের আলোচনা সবিস্তারে ওপরে বর্ণনা করা হয়েছে। এখন দ্বিতীয় মাধ্যম কৃষির আলোচনা করা হচ্ছে।

কৃষিকাজের দু'টো অবস্থা রয়েছে- (ক) নিজের মালিকানাভুক্ত ভূমিতে নিজেই পরিশ্রম করে ফসল ফলানো। (খ) নিজের কোন ব্যস্ততা বা অসুবিধার কারণে অন্যের সাহায্যে কর্ষণ করিয়ে ফসল লাভ করা। কর্ষণ কার্যে নিয়ম অনুযায়ী অপরের সাহায্য গ্রহণের সম্মতি শরীয়তে রয়েছে। এ সাহায্য লাভ কয়েকভাবে হতে পারে- (১) অপরের নিকট ভূমি বর্গা দেবে এবং উৎপাদিত ফসল নির্দিষ্ট হারে উভয়ে বণ্টন করে নেবে। (২) নির্দিষ্ট পরিমাণ নগদ অর্থে কারো কাছে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য জমি ভাড়া দেবে। এতে চাষী লগ্নির নির্ধারিত টাকা মালিককে দিয়ে পুরো ফসল নিজের ঘরে তুলবে। (৩) বীজ, কৃষি যন্ত্র ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি ভূমি-মালিক যোগান দেবে এবং নির্দিষ্ট বেতনে শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে শ্রম নেবে। এতে শ্রমিক তার শ্রমের মজুরি পাবে আর পুরো ফসল ঘরে তুলবে ভূমির মালিক। শেষোক্ত দু'অবস্থার আলোচনা ইতোপূর্বে ইজারা অধ্যায়ে করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে প্রথম প্রকারের আলোচনা পেশ করাই মুখ্য উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকার মুযারা'আত বা পারস্পরিক চাষাবাদের চারটি পন্থা উল্লেখ পূর্বক বলেছেন, প্রথমোক্ত তিন প্রকার মুযারা'আত জায়েয এবং শেষোক্ত প্রকার না জায়েয। মুযারা'আত বা পারস্পরিক কৃষিনীতি সম্পর্কে ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) থেকে যে নেতিবাচক মত প্রকাশ হয়েছে তা তার সাধারণ নীতি নয়। তিনি কেবল ইরাকের শস্য-শ্যামল উর্বর ভূমির ক্ষেত্রেই মুযারা'আতকে সমর্থন করেননি। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তিনি নীতিগত ভাবেই একে সঙ্গত মনে করতেন না। অসংখ্য হাদীস এবং বাস্তব কর্মপদ্ধতি যেখানে মুযারা'আত সম্পর্কে বিদ্যমান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে তিনি কিরূপেই বা না নাজায়েয বলতে পারেন? আসল ব্যাপার হল ইরাকের উল্লিখিত ভূমিগুলো রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ছিল, যেগুলো সেখানকার জিম্মিদের মালিকানাভুক্ত জমি ছিল। তা অনিশ্চিত ছিল এবং সে সম্পর্কে বিশেষ মতানৈক্য দেখা দিয়েছিল। কাজেই তা কোন ব্যক্তির পক্ষে খরিদ করা এবং অপরের দ্বারা চাষ করানোকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি।

وَقَالَا جَائِزَةٌ الخ -এর আলোচনা ঃ ইমাম সাহেবাইনের নিকট مُزَارَعَت -এর চারটি সুরত রয়েছে, তন্মধ্যে একটি না জায়েয বাকিগুলো জায়েয। বৈধ তিনটি সুরত হল নিম্নরূপ—

১. জমিন ও বীজ একজনের পক্ষ থেকে হবে, আর গরু ও কাজ অন্যজনের পক্ষ হতে হবে।

২. ভূমি একজনের পক্ষ থেকে হবে, আর বীজ, গরু, কাজ অপর জনের পক্ষ থেকে হবে।

৩. ভূমি, বীজ ও গরু একজনের হবে, আর শুধুমাত্র কর্ম অপরজনের পক্ষ থেকে হবে।

এ তিন সুরত সম্পূর্ণ রূপে বৈধ। অবৈধ সুরতটি হল- (৪) ভূমি ও গরু (হাল চাষের যন্ত্র) একজনের পক্ষ থেকে হবে, আর বীজ ও কর্ম অপরজনের পক্ষ থেকে হবে। যাহিরে রেওয়াতের ভিত্তিতে এ সুরতটা বাতিল, কেননা এতে গরুকে (কৃষি কাজের যন্ত্র) উৎপাদিত ফসলের বিনিময়ে নেয়া আবশ্যক হচ্ছে, আর এটাই অবৈধ। তদ্রূপ যদি বীজ ও গরু একজনের হয় এবং ভূমি ও কর্ম অপরজনের হয় বা শুধুমাত্র গরু একজনের হয় আর অন্যান্য বস্তুগুলো অপরজনের হয় বা শুধুমাত্র বীজ একজনের বাকিগুলো অপরজনের হয়, এ সকল সুরত গুলোই বাতিল।

এ সুরতগুলো কবিতা আকারে সুবিন্যাস্ত করা হয়েছে-

أَرْضٌ وَبَذْرٌ كَذَا أَرْضٌ كَذَا عَمَلٌ * مِنْ وَاحِدٍ ذِي ثُلُثِهَا كُلُّهَا قُبِلَتْ
وَالْبَذْرُ مَعَ بَقَرٍ أَوْ لَا كَذَا بَقَرٌ لَاغَيْرُ * أَوْ مَعَ أَرْضٍ أَرْبَعٌ بَطَلَتْ

وَلَاتَصِحُّ الْمُزَارَعَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ এখানে সাহেবাইনের (রঃ) নিকট مُزَارَعَة বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কতিপয় শর্তের বর্ণনা দেয়া হয়েছে। শর্তগুলো নিম্নরূপ-

১. কৃষকদের মাঝে প্রচলিত مُزَارَعَت -এর সময় নির্ধারণ করা। যথা- এক বছর বা দু'বছর।

২. উৎপন্ন ফসলে উভয়ের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। কাজেই কারো জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বা স্থানের ফসলের শর্তারোপ করা যাবে না।

৩. ভূমি কৃষি কাজের উপযোগী হতে হবে। লোনা বা মরুভূমি হলে চলবে না। কেননা তাতে কৃষি কাজের মূল উদ্দেশ্যই অর্জিত হয় না।

৪. বীজ দাতার নির্ধারণ করতে হবে।

৫. বীজের جِنْس বা জাত নির্ধারণ করা, তা কি গম হবে নাকি ধান হবে ইত্যাদি।

৬. যার পক্ষ হতে বীজ নেই তার অংশ নির্ধারণ করতে হবে।

وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ فَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ رَبِّ الْأَرْضِ فَلِلْعَامِلِ أَجْرُ مِثْلِهِ لَايُزَادُ عَلَى مِقْدَارِ مَاشُرِطَ لَهُ مِنَ الْخَارِجِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى لَهُ أَجْرُ مِثْلِهِ بَالِغًا مَابَلَغَ وَإِنْ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ قِبَلِ الْعَامِلِ فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَجْرُ مِثْلِهَا ـ وَإِذَا عَقَدَتِ الْمُزَارَعَةَ فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الْبَذْرِ مِنَ الْعَمَلِ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ وَإِنِ امْتَنَعَ الَّذِي لَيْسَ مِنْ قِبَلِهِ الْبَذْرُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَى الْعَمَلِ وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَعَاقِدَيْنِ بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ وَإِذَا انْقَضَتْ مُدَّةُ الْمُزَارَعَةِ وَالزَّرْعُ لَمْ يُدْرِكْ كَانَ عَلَى الْمُزَارِعِ أَجْرُ مِثْلِ نَصِيْبِهِ مِنَ الْأَرْضِ إِلَى أَنْ يَسْتَحْصِدَ وَالنَّفَقَةُ عَلَى الزَّرْعِ عَلَيْهِمَا عَلَى مِقْدَارِ حُقُوقِهِمَا وَأُجْرَةُ الْحَصَادِ وَالدِّيَاسِ وَالرِّفَاعِ وَالتَّذْرِيَةِ عَلَيْهِمَا بِالْحِصَصِ فَإِنْ شَرَطَاهُ فِي الْمُزَارَعَةِ عَلَى الْعَامِلِ فَسَدَتْ ـ

সরল অনুবাদ ঃ কোন কারণে মুযারা'আহ ফাসিদ হয়ে গেলে সমস্ত ফসল বীজদাতার প্রাপ্য হবে। বীজ যদি ভূমি মালিকের হয়, তবে চাষী প্রচলিত নিয়মে মজুরি পাবে, তবে এ মজুরি ফসলের মধ্যে তার জন্য শর্তকৃত অংশের চেয়ে অধিক হবে না। কিন্তু ইমাম মুহাম্মদ (রঃ) বলেন, প্রচলিত মজুরির পরিমাণ যাই হোক সে তা পাবে। আর যদি বীজ চাষী সরবরাহ করে থাকে, তবে ভূমি মালিক ভূমির প্রচলিত ভাড়া পাবে। মুযারা'আহ চুক্তি পাকাপাকি হওয়ার পর বীজদাতা যদি কাজে অনীহা প্রকাশ করে, তবে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কিন্তু যার দায়িত্বে বীজ নয় সে যদি পিছপা হয়, তবে আদালত তাকে কাজের জন্য বাধ্য করবে। দুই কারবারীর কোন একজন মৃত্যুবরণ করলে মুযারা'আহ চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। ফসল পাকার পূর্বেই যদি মুযারা'আর মেয়াদ শেষ হয়ে যায়, তবে কৃষক তখন থেকে ফসল কাটা পর্যন্ত সময়ের জন্য তার অংশ পরিমাণ ভূমির প্রচলিত ভাড়া মালিককে প্রদান করবে। এমতাবস্থায় বাকি দিনগুলোর উৎপাদন-ব্যয়ে উভয়কে প্রাপ্যানুপাতে অংশ নিতে হবে। ফসল কাটা, মাড়াই, একত্রিকরণ এবং পরিষ্কার করার ব্যয় মালিক ও কৃষক উভয়ের ওপর তাদের প্রাপ্যাংশ অনুপাতে বর্তাবে। যদি চুক্তির সময় এ সকল ব্যয় কৃষক বহন করার শর্ত রাখে, তবে মুযারা'আহ ফাসিদ হয়ে যাবে।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ এ সুরতে ভূমির উৎপন্ন ফসল বীজ ওয়ালার হবে। কেননা তা তার মালিকানার উৎপন্ন ফসল।

فَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ الخ -এর আলোচনা ঃ তবে ভূমির মালিকের জন্য أَجْرُ مِثْلٍ হবে। কেননা সে ফাসিদ হতে مَنَافِع -কে আদায় করে নিয়েছে। আর যদি ভূমি ও গরুর মাঝে একত্রিত করে ফেলে এমন কি مزارعة নষ্ট হয়ে যায়, তখন عَامِل -এর ওপর ভূমি ও গরুর أُجْرَتُ الْمِثْلِ ওয়াজিব হবে, আর এটাই বিশুদ্ধ।

بَطَلَتِ الْمُزَارَعَةُ الخ -এর আলোচনা ঃ الْمُزَارَعَة বাতিল হয়ে যাবে। কেননা এটা إِجَارَة -এর একটি প্রকার মাত্র, কাজেই মৃত্যু দ্বারা তা রহিত হয়ে যাবে। যেমনটি সকল إِجَارَة মৃত্যুর কারণে রহিত হয়ে যায়।

اَلتَّمْرِيْنُ [অনুশীলনী]

১। الْمُزَارَعَةُ -এর সংজ্ঞা দাও এবং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা কর।
২। الْمُزَارَعَةُ জায়েয আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামদের মতামত কি? বিস্তারিত আলোচনা কর।
৩। الْمُزَارَعَةُ -এর সমার্থবোধক শব্দগুলো কি কি? সুন্দরভাবে সাজিয়ে লেখে প্রত্যেকটির وَجْه تَسْمِيَة বর্ণনা কর।
৪। الْمُزَارَعَةُ -এর প্রকারভেদ সম্পর্কে যা জান বিস্তারিত লিখ।
৫। الْمُزَارَعَةُ বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য কি কি শর্ত রয়েছে ? সাজিয়ে গুছিয়ে লিখ।
৬। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ وَإِذَا فَسَدَتِ الْمُزَارَعَةُ فَالْخَارِجُ لِصَاحِبِ الْبَذْرِ الخ
৭। কুরআন-হাদীসের আলোকে الْمُزَارَعَةُ সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ লিখ।

كِتَابُ الْمُسَاقَاتِ

قَالَ اَبُوْ حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى اَلْمُسَاقَاتُ بِجُزْءٍ مِّنَ الثَّمَرَةِ بَاطِلَةٌ وَقَالَا جَائِزَةٌ اِذَا ذَكَرَا مُدَّةً مَعْلُوْمَةً وَسَمَّى جُزْءً مِنَ الثَّمَرَةِ مُشَاعًا وَتَجُوْزُ الْمُسَاقَاتُ فِى النَّخْلِ وَالشَّجَرِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَاُصُوْلِ الْبَاذِنْجَانِ فَاِنْ دَفَعَ نَخْلًا فِيْهِ ثَمَرَةٌ مُسَاقَاةً وَالثَّمَرَةُ تَزِيْدُ بِالْعَمَلِ جَازَ وَاِنْ كَانَتْ قَدِ انْتَهَتْ لَمْ يَجُزْ وَاِذَا فَسَدَتِ الْمُسَاقَاتُ فَلِلْعَامِلِ اَجْرُ مِثْلِهِ وَتَبْطُلُ الْمُسَاقَاتُ بِالْمَوْتِ وَتَفْسَخُ بِالْاَعْذَارِ كَمَا تَفْسَخُ الْاِجَارَةُ ـ

বাগান বর্গা পর্ব

সরল অনুবাদ ঃ ইমাম আবূ হানীফা (রঃ) বলেন, ফলের গাছ বা বাগান উৎপন্ন ফলের কিছু অংশের বিনিময়ে বর্গা দেয়া না নেয়া জায়েয নেই। কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন, নির্দিষ্ট মেয়াদ উল্লেখ করে নিলে এবং বিনিময়স্বরূপ ফলের একটা যুক্ত হিস্সা ধার্য করে নিলে তা বৈধ হবে। খেজুর, আঙ্গুর, সবজি, বেগুন (এবং অন্যান্য ফলবান) বৃক্ষে মুসাকাত (পারস্পরিক সেচ) জায়েয। যদি কোন ব্যক্তি এমন ফলবান খেজুর বৃক্ষ মুসাকাতের ভিত্তিতে প্রদান করে যার ফলগুলো শ্রম দিলে আরো পরিপুষ্ট হবে, তবে তা জায়েয। পরিপুষ্টতার পর দিলে তা জায়েয হবে না। যদি মুসাকাত ফাসিদ হয়ে যায়, তবে শ্রমিক প্রচলিত নিয়মে মজুরি পাবে (ফলের অংশ পাবে না)। (উভয় পক্ষের কেউ) মারা গেলে মুসাকাত-চুক্তি ভেঙ্গে যাবে। ইজারা-চুক্তি যেমন বিভিন্ন ওজর-আপত্তিতে রহিত হয়ে যায়, তদ্রূপ মুসাকাত চুক্তিও রহিত হয়ে যায়।

প্রাসঙ্গিক আলোচনা

কতিপয় শব্দার্থ ঃ اَلثَّمَرَةُ – ফল, مُدَّةٌ – সময়, اَلْكَرْمُ – আঙুর, اَلرِّطَابُ – শাক-সবজিসমূহ, اُصُوْلٌ –গোড়াসমূহ, اَعْذَار – ওজর-আপত্তিসমূহ, بَاذِنْجَان – বেগুন।

اَلْمُسَاقَاتُ-এর সংজ্ঞা ঃ اَلْمُسَاقَاتُ শব্দটি سَقْيٌ হতে বাবে مُفَاعَلَة-এর মাসদার, এর অর্থ হল– পানি সিঞ্চন করা, পানি পান করানো। শরীয়তের পরিভাষায় المساقات বলা হয়, কোন ব্যক্তি স্বীয় ফল বাগান অন্যকে এ জন্য দিয়ে দেয়া যে, সে গাছগুলোর লালন-পালন ও দেখা-শুনা করবে এবং সে বাগানে যে ফলন হবে তা উভয়ের মাঝে বন্টিত হবে।

اَلْمُزَارَعَةُ-এর ন্যায় اَلْمُسَاقَاتُ-এর মধ্যেও ইমাম আযম (রঃ) ও সাহেবাইন (রঃ)-এর মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। অর্থাৎ ইমাম আযম (রঃ)-এর মতে اَلْمُسَاقَاتُ জায়েয নেই, আর সাহেবাইনের নিকট জায়েয আছে। আর এর ওপরই ফতোয়া রয়েছে।

وَتَجُوْزُ الْمُسَاقَاتُ الخ-এর আলোচনা ঃ খেজুর, আঙুর, তরিতরকারি, বেগুন, গাছের গোড়া ইত্যাদিতে اَلْمُسَاقَاتُ বৈধ। তবে ইমাম শাফেয়ী (রঃ)-এর قول جديد অনুযায়ী শুধুমাত্র খেজুর বৃক্ষ ও আঙুরের ক্ষেত্রে اَلْمُسَاقَاتُ বৈধ, অন্যগুলোতে বৈধ নয়। আর এটা خِلَافِ قِيَاس হিসেবে সাব্যস্ত। কাজেই হাদীসে যেহেতু খেজুর ও আঙুরের কথা উল্লেখ রয়েছে, তাই এ বিষয়টিকে এ দুটির মধ্যেই সীমা বদ্ধ রাখা হবে।

কিন্তু সাহেবাইন (রঃ) বলেন যে, মহানবী (সাঃ)-এর বাণী– اِنَّهُ ع عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ تَمْرٍ اَوْ زَرْعٍ। হাদীসটি مُطْلَق আর হাদীসের مُطْلَق বিধানকে مُقَيَّد করা যাবে না। বিধায় আঙুর ও খেজুরের ন্যায় অন্যান্য বিষয়াবলীতে اَلْمُسَاقَاتُ বৈধ হবে।

فَإِنْ دَفَعَ الخ -এর আলোচনা ঃ যদি কেউ খেজুর গাছের গোড়াকে مُسَاقَات ওপর প্রদান করল, যাতে কাঁচা ফল রয়েছে, যা عَامِل -এর পরিশ্রম দ্বারা আরো বৃদ্ধি পেতে পারে, তখন مُسَاقَات বৈধ হবে। আর যদি ফল পেকে যায় এবং উহার বৃদ্ধিতা শেষ হয়ে যায়, তখন مُسَاقَات সহীহ হবে না। কেননা- عَامِل স্বীয় আমলের কারণেই তো অংশীদার হয়। আর যখন ফল পেকেই গেল, তখন তাতে তার আমলের কোন মূল্যই হল না। কাজেই যদি পাকার পরেও مُسَاقَات -কে বৈধ বলা হয়, তাহলে عَامِل -এর আমল বা পরিশ্রম করা ব্যতীত-ই অংশীদারি হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। অথচ এ ব্যাপারে শরীয়তের কোন বিধান নেই।

التمرين [অনুশীলনী]

১। اَلْمُسَاقَاتُ কাকে বলে এবং এর হুকুম কি? বিস্তারিত লিখ।

২। اَلْمُسَاقَاتُ -এর বৈধতার প্রমাণ উপস্থাপন কর।

৩। اَلْمُسَاقَاتُ ও اَلْمُزَارَعَةُ -এর পার্থক্য নিরূপণ কর।

৪। নিম্নোক্ত ইবারতের ব্যাখ্যা কর ঃ

وَتَجُوزُ الْمُسَاقَاتُ فِى النَّخْلِ وَالشَّجَرَةِ وَالْكَرْمِ وَالرِّطَابِ وَأُصُولِ الْبَاذِنْجَانِ الخ ·